গজেন্দ্রকুমার মিত্র

রচনাবলী

প্রথম খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ, ১৩৬১

সম্পাদক :

সবিতেন্দ্রনাথ রায়

মণীশ চক্রবর্তী

প্রচ্ছদপট

অঙ্কন : পূর্ণেন্দু রায়

মুদ্রণ : সিল্ক স্ক্রীন

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও বাণী মুদ্রণ, ১২ নরেন সেন স্কোয়ার
কলিকাতা-৯ হইতে শ্রীবংশীধর সিংহ কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

ভূপেন্দ্র সেকেণ্ড ইয়ার ক্লাসের ছাত্র। সে রাশি রাশি কবিতা লেখে, কলেজ-ম্যাগাজিনে গরম-গরম প্রবন্ধ দেয়, ছাত্র ফেডারেশন লইয়া মাতামাতি করে, রাত জাগিয়া বিজয়লালের কবিতা মুখস্থ করে, খবরের কাগজের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ পড়িয়া লাফাইতে থাকে এবং জওহরলালজীকে দেখিবার জন্য তিন ঘণ্টা রৌদ্রে দাঁড়াইয়া থাকিয়া জ্বর ভোগ করে। অর্থাৎ এক কথায়, সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্রের পক্ষে যাহা করা স্বাভাবিক তাহাই করে। এবং কেহ যদি তাহাকে সেই কথাটাই স্মরণ করাইয়া দেয় ত চটিয়া আগুন হইয়া উঠে।

বন্ধু-বান্ধবদের উপর ভূপেনের অবজ্ঞার সীমা নাই। পৃথিবীতে এত আহাম্মক লোক আছে—আশ্চর্য! এই নির্বোধ লোকগুলির সঙ্গেই তাহাকে দিন রাতের বেশির ভাগ সময় কাটাইতে হয়, সেজন্য তাহার পরিতাপের সীমা থাকে না, অথচ সে যে এই নির্বোধ লোকগুলির কাছেই নিজের অদ্ভুত বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিয়া অপরিসীম আত্মতৃপ্তি লাভ করে, ইহাও সত্য কথা। বাবাকে সে একটু করুণার চোখে দেখে। তিনি দরিদ্র এবং সেই হেতু অত্যন্ত নির্বোধ সন্দেহ নাই; তবে নাকি তাঁহার সামান্য উপার্জন দিয়াই তিনি প্রাণপণে তাহার স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করেন, এই প্রায়শ্চিত্তই যথেষ্ট মনে করিয়া ভূপেন তাঁহাকে মার্জনা করে। নিজে একটা ট্যুইশনি করিয়া নিজের সাবান, স্নো, স্লিপার প্রভৃতির খরচা সংগ্রহ করে, আর তাহার একান্ত মূল্যবান সময়ের অনেকখানি এইভাবে নষ্ট হয় মনে করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

প্রায় সমস্ত কলেজের ছাত্রদের মতই ভূপেনের বিশ্বাস যে, তাহার চিন্তা ও জীবন-যাত্রায় সে অসাধারণ! এবং প্রায় সমস্ত আধুনিক বাঙালী ছাত্রদের মতই সে শেলী ও বার্ণার্ড শ-র অদ্ভুত একটা সংমিশ্রণের ফল। প্রেমকে সে বলে লিভারের অসুখ, রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে বলে সেণ্টিমেণ্টাল রাবিশ, অথচ শরৎচন্দ্রের চমক-প্রদ প্রেমের কাহিনী পড়িয়া রাত্রে তাহার ঘুম হয় না এবং কলেজ ম্যাগাজিনে প্রবন্ধ লিখিবার সময় রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য কবিতাংশ উদ্ধার করে। রোমাণ্টিক চিন্তায় ও কল্পনায় প্রায় দিন-রাতই ডুবিয়া থাকে, যদিচ মুখে আওড়ায় বার্ণার্ড শ!

খালি একটা ব্যাপারে তাহার কিছু অসাধারণত্ব সত্যই ছিল। তাহার স্কুল ও

কলেজের অন্যান্য বন্ধুরা ইতিমধ্যেই মেয়েদের প্রেমে পড়িয়াছে, পড়িতেছে কিম্বা সম্প্রতি ক্লান্ত হইয়া ও-বস্তুটিকে ছাড়িয়া দিয়াছে—এই কথাটা সে নিত্য শোনে; কিন্তু তাহার নিজের এখনও সে সুযোগ ঘটে নাই। স্কুলে পড়িতে পড়িতেই যাহারা প্রণয়ের হাতে-খড়ি শুরু করিয়াছে, অপদার্থ-জ্ঞানে তাহাদের সে যেমন একটু ঘৃণা করে, তেমনি যে-সব ছেলে সম্প্রতি প্রেমে পড়িবার অত্যাশ্চর্য বিবরণ প্রত্যহই শোনাইতে থাকে, তাহাদের একটু হিংসা না করিয়াও পারে না। কারণ, যদিও মুখে সে বলে যে-কোন মেয়ের সঙ্গেই আধ ঘণ্টার বেশী আলাপ করা যায় না, সুতরাং প্রেমে পড়াটা অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত ব্যাপার, আসলে কিন্তু তরুণী মেয়েদের সহিত মিশিবার সুযোগ তাহার হয় নাই বলিয়া সে একটু দুঃখিতই।

দারিদ্র্যের জন্য আত্মীয়-স্বজনদের সহিত বহু দিন হইতেই সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, আর ঠিক সেই কারণেই বন্ধু-বান্ধবদের অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকার পায় নাই। সুতরাং তরুণীদের সহিত তাহার যা-কিছু পরিচয়, তাহা শুধু বন্ধু-বান্ধবদের মুখে ও আধুনিক উপন্যাসে।

টাকার প্রয়োজন যেমন তাহার সর্বাপেক্ষা অধিক, তেমনি টাকা উপার্জনের জন্য যাহারা ভূতের মত খাটে, ভূপেন্দ্র তাহাদেরই ঘৃণা করে সকলের চেয়ে বেশী। প্রায়ই সে বন্ধু-বান্ধবদের বলে, 'silly goat'-এর মত দিনরাত টাকার পেছনে ঘুরে বেড়ানোই কি মনুষ্য-জীবনের একান্ত সার্থকতা? তার কি আর কোন কাজ নেই?' —অথচ ছেলে পড়ানোর টাকাটা একদিন পাইতে দেরি হইলেই যে কি 'সঙ্কটজনক পরিস্থিতি'র মধ্যে তাহাকে পড়িতে হয়, তাহা ভূপেনের মত আর কে অনুভব করে?

আমাদের বর্তমান গ্রন্থের নায়কের চরিত্রটা মোটামুটি ইহাই। এ-হেন ভূপেনের জীবনে সেদিন যে অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়া গেল, সেই কথাটা বলিয়াই আমরা আখ্যায়িকা শুরু করিব।

তিন দিন পর-পর ছুটি গিয়াছে, আজ চতুর্থ ও শেষ দিন। ঘণ্টা-তিনেক দিবানিদ্রা দিয়া উঠিয়া মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চাহিয়া ভূপেন সহসা অনুভব করিল যে তাহার বন্ধু-বান্ধব বিশেষ কেহ নাই। এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটে, আমরাও মধ্যে মধ্যে অনুভব করি, ইংরাজীতে যাহাকে বলে sudden realisation যে, আমাদের পরিচিত বহু লোক থাকিলেও বন্ধুর সংখ্যা খুব কম। এবং সেই বিশেষ বন্ধু, নাটকীয় ভাষায় যাহাকে 'আত্মার আত্মীয়' বলে, তাহার প্রয়োজন মানুষের এক-একটা মুহূর্তে বড় বেশি হইয়া পড়ে।

ভূপেনেরও সেদিন সেই অবস্থা। তাহার অনুরক্ত সহপাঠীর সংখ্যা কম ছিল

না, কিন্তু মনে মনে তাহাদের চিরদিন অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছে বলিয়াই কেহ কোনদিন অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিতে পারে নাই। অথচ আজ সে বোধ করি প্রথম বুঝিতে পারিল যে, অন্তরঙ্গ কাহাকেও তাহার দরকার—বিশেষ প্রয়োজন! সুরেশ বেশ হাসাইতে পারে, কিন্তু বড় বেশী রকমের ভাসা-ভাসা; নিখিলের সঙ্গ আধ ঘণ্টার বেশী সহ্য করা যায় না, বঙ্কিম পড়াশুনা ঢের করিয়াছে, গল্প বলিতেও জানে, কিন্তু বিপদ হইতেছে এই যে, সে উত্তম-পুরুষ সংক্রান্ত গল্প ছাড়া একটি কথাও বলে না এবং যত কিছু কথা বলা সে একচেটে করিতে চায়। একমাত্র বিশু, বিশুর সহিত এই সময়টা কাটানো চলিত, কারণ, ভূপেনের কাছে বিশুর সবচেয়ে বড় গুণ, সে কথা বলেক ম– কিন্তু, দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত ভূপেনের কথাটা মনে পড়িল, বিশু দেশে গিয়াছে। অর্থাৎ ঠিক এই মুহূর্তে যাহার কাছে যাওয়া যায়, এমন একটিও বন্ধু-বান্ধব তাহার নাই।

কিন্তু 'এমন দিনে' ঘরে থাকাও অসহ্য, সুতরাং জামাটা গায়ে চড়াইয়া পথে বাহির হইয়া পড়া ছাড়া উপায় নাই। ভূপেনও বাহির হইয়া পড়িল। সিমলার সংকীর্ণ গলি পার হইয়াই কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কিন্তু সেদিন সে-পথও যেন জনহীন বলিয়া বোধ হইল। ভালো লাগিল না। তখন সে স্থির করিল, একা হাঁটিতে হাঁটিতে ইডেন গার্ডেনেই যাইবে।

চলিতে চলিতে তাহার ভালোই লাগিল। আকাশটা মেঘলা করিয়া আছে বলিয়া গরম যেন একটু বেশী, তবু সবটা জড়াইয়া মোটের উপর ঘরের চেয়ে অনেক ভালো। বৌবাজার পার হইয়া তাহার উৎসাহ যেন আরও বাড়িয়া গেল। সে বেশ জোরে জোরে চলিতে লাগিল এবং শীঘ্রই এক সময়ে ধর্মতলার মোড়ে আসিয়া পৌছিল।

কিন্তু এতক্ষণ, বোধ করি উৎসাহের আতিশয্যেই, আকাশের দিকে সে একবারও চাহিয়া দেখে নাই, এখন হঠাৎ গড়ের মাঠের রাস্তায় পড়িতেই বড় বড় জলের ফোঁটা নামিতে শুরু করিল। তখন সচেতন হইয়া চাহিয়া দেখিল যে, সে এমন একটা জায়গায় আসিয়া পড়িয়াছে, যেখান হইতে যে-কোন আশ্রয়ে পৌছিতে গেলেও অন্ততঃ দশ-পনের মিনিট পথ হাঁটিতে হইবে। এধারে জলও বেশ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, এখন মাঠের পথ ধরিলেও চৌরঙ্গী পৌছিবার পূর্বেই ভিজিয়া যাইবে। সুতরাং আর কোন উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া একটা বড় গাছের তলাতেই আশ্রয় লইল এবং নিজেকে 'নিবোধ' 'ইডিয়ট' বলিয়া গালি দিতে লাগিল। কিন্তু সেখানে দাঁড়াইয়া যে সে আরও কত আহম্মকি করিল তাহা বোঝা গেল আর একটু পরেই! বৃষ্টির বেগ ত কমিলই না, ক্রমশঃ তাহা মুষলধারে

পরিণত হইল। গাছের পত্রাচ্ছাদনে সে জল বাধা মানিল না, দেখিতে দেখিতে জামাকাপড় ভিজিয়া ঝড়ো-কাকের মত অবস্থা দাঁড়াইল তাহার। অথচ তখন সেটুকু আশ্রয়ও ছাড়া চলে না—জলের এমনই বেগ।

আরও মিনিট-কয়েক এইভাবে কাটিবার পর যখন ব্যাপারটা প্রায় অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, তখন পিছন হইতে সহসা একখানা প্রকাণ্ড গাড়ি হুস্ করিয়া আসিয়া ঠিক তাহারই সামনে সশব্দে ব্রেক কষিল। ভূপেন বিস্মিত হইল। মোটরধারী কোন লোকের সহিত তাহার পরিচয় নাই, থাকিবার কথাও নয়। সে অবাক হইয়া গাড়িটার দিকে চাহিয়া আছে, এমন সময় একটা গবাক্ষের কাচ একটু নামিয়া গেল এবং বছর দশ-বারোর একটি ফুটফুটে মেয়ে মুখ বাড়াইয়া কহিল—ও মশাই, অমন ক'রে দাঁড়িয়ে ভিজছেন কেন? আসুন আসুন, গাড়ির মধ্যে এসে উঠুন।

ভূপেন ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া চাহিয়া রহিল। মেয়েটি আবার কহিল—চলে আসুন না চট্ ক'রে। আমি সুদ্ধ ভিজে গেলুম যে। কি জ্বালা!

ভূপেনের তখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটে নাই, তবু সে কহিল—কিন্তু আমি যে ভীষণ ভিজে গেছি খুকী, গাড়িতে উঠলে গাড়িময় জল হয়ে যাবে যে।

মেয়েটি জবাব দিল, তা হোক্, আমাদের চামড়ার গদি, কিচ্ছু হবে না। চলে আসুন।

সে দুয়ারটা ফাঁক করিয়া ধরিল। অগত্যা ভূপেন গাছতলা ছাড়িয়া কোন মতে গাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। মেয়েটিও দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া জানালার কাচ তুলিয়া দিল।

গাড়ি ততক্ষণে চলিতে শুরু করিয়াছে। ভূপেন পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখ ও মাথা মুছিতে মুছিতে একবার গাড়ির মধ্যে চোখ বুলাইয়া লইল। সেই মেয়েটি ছাড়া গাড়িতে আর কোন আরোহী নাই, থাকিবার মধ্যে আছে এক বৃদ্ধ পাঞ্জাবী শোফেয়র। মস্ত বড় গাড়ি এবং শোফেয়রের উর্দি মালিকের ধনাঢ্যতার পরিচয় দেয়—যদিচ মেয়েটির বেশভূষা নিতান্তই সাধারণ, সাদা আদ্দির ফ্রক ও হাতে একগাছি করিয়া চুড়ি। না আছে অলঙ্কারের প্রাচুর্য আর না আছে রেশমের বাহার।

জামা হইতে জল গড়াইয়া চামড়ার গদীর খাঁজে ততক্ষণে পুকুর সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে, ভূপেন সেদিকে একবার কুণ্ঠিত ভাবে চাহিল, কিন্তু কি করা কর্তব্য বুঝিতে পারিল না। মেয়েটি তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া জলের দিকে চাহিয়া কহিল, জামাটা খুলে বসুন না, না হ'লে আপনার অসুখ করতে পারে। যা জল,

বাব্বা!

জামাটা খুলিতে বোধ হয় ভূপেনের লজ্জা করিতেছিল, কিন্তু আর কোন উপায় নাই দেখিয়া জামা খুলিয়া সামনের চকচকে লোহার আলনায় ঝুলাইয়া রাখিল। তাহার পর অপেক্ষাকৃত স্থির হইয়া বসিতে তাহার হুঁশ হইল যে, গাড়ি কোথায় যাইতেছে তাহা জানা দরকার এবং সে নিজেও কোথায় যাইতে চায় তাহাও জানানো দরকার। একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, তোমরা এখন কোন্ দিকে যাবে খুকী?

খুকী তাহার ডাগর চক্ষু মেলিয়া তাহাকেই দেখিতেছিল, কহিল—আমার নাম সন্ধ্যা। তবে আমার দাদু খুকী বলেও ডাকেন। আমরা এখন বাড়ি যাচ্ছি।

ভূপেন প্রশ্ন করিল—কোথায় বাড়ি তোমাদের?

—এই যে, চোরবাগানে। ঐখানেই আমরা নামব। আপনি ভিজে জামাকাপড় ছেড়ে, ওখান থেকে চা খেয়ে তারপর বাড়ি যাবেন, কেমন?

এইটুকু মেয়ের এতখানি সৌজন্যে ভূপেন বিস্মিত হইল। কিন্তু কহিল—না, আর জামা-কাপড় ছাড়বার দরকার হবে না, আমার বাড়ি ঐ কাছেই। আমি সিমলেয় থাকি। চোরবাগান থেকে আর কতটুকু। চট্ ক'রে চলে যাব এখন।

সন্ধ্যা তাহার নিবিড় অথচ খাটো চুলের গুচ্ছ দুলাইয়া কহিল—পাগল নাকি! এত ভিজে কাপড় পরে থাকলে আপনার অসুখ করবে যে! সে আপনি কিচ্ছু ভাববেন না, আমার দাদুর একটা ফর্সা কাপড় আর একটা গেঞ্জি দিয়ে দেবো'খন, তাই পরে বাড়ি চলে যাবেন, তারপর সময়মত একদিন ফিরিয়ে দিলেই চলবে।

ভূপেনের কৌতুক বোধ হইল। সে কহিল, দাদুর কাপড় দিয়ে দেবে, দাদু যদি রাগ করেন?

—ইস্!

সন্ধ্যা করুণার দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল। কহিল—দাদুর বাড়ির গিন্নীই ত আমি। দাদুর কখানা কাপড়-জামা, দাদু কি কিছু খবর রাখে না কি? যা করি সবই ত আমি।

সগর্বে সে আর একবার মাথাটা দুলাইল।

গাড়ি ততক্ষণে চোরবাগানের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। মুহূর্ত-কয়েক পরেই বিরাট একটা বাড়ির ফটকের মধ্য দিয়া গাড়ি-বারান্দার ভিতর প্রবেশ করিল।

সাবেককালের বাড়ি। এখন কিছু হয়ত মলিন, কিন্তু অন্যান্য সাবেকী বাড়ির মত হতশ্রী নয়। বাড়িওয়ালার ঐশ্বর্য যে শুধু এখন বাড়ির ইট কখানাতেই পর্য-বসিত হয় নাই, একবার চাহিলেই তাহা বোঝা যায়।

গাড়ি থামিতেই এক দারোয়ান আসিয়া দরজা খুলিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। সন্ধ্যা অটল গাম্ভীর্যের সহিত ঈষৎ মাথা হেলাইয়া সেলামটা গ্রহণ করিল, তাহার পর গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িয়া কহিল—আসুন আসুন, চট্ ক'রে নেমে আসুন।

কিন্তু বাড়ি ও দারোয়ানের পোশাক দেখিবার পর ভূপেনের সেখানে প্রবেশ করিতে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল, বিশেষতঃ সেই অবস্থায়। সে নামিল বটে, কিন্তু জামাটা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া কুন্ঠিত ভাবে কহিল—থাক, এটুকু আমি হেঁটেই চলে যাই। জল ত কমে এসেছে।

সন্ধ্যা কিন্তু তাহার কথায় কান দিল না। কহিল—কিচ্ছু জল কমে নি। আপনি আসুন ভিতরে, তারপর দেখা যাবে।

অগত্যা ভূপেনকে ভিতরে আসিতে হইল। লজ্জায় তাহার দুই কান আগুন হইয়া উঠিয়াছিল, কোন মতে ঘাড় গুঁজিয়া সে সন্ধ্যার পিছনে পিছনে চলিতে লাগিল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল যে, চারিদিকে ভৃত্যের দল কৌতুহলী, হয়ত বা পরিহাসের দৃষ্টি মেলিয়াই চাহিয়া আছে।

একটা দালান পার হইয়া ভিতরের একটা ঘরে লইয়া গিয়া সন্ধ্যা হুকুমের স্বরে কহিল—এইখানে দাঁড়ান লক্ষ্মী ছেলের মত—আমি কাপড়-জামা নিয়ে আসছি।

সে চলিয়া গেল।

ভূপেন অসহায়ের মত দাঁড়াইয়া ঘরের চারিদিকে একবার চোখ বুলাইয়া লইল। মাঝারি সাইজের ঘর, একপাশে দেওয়ালের দিকে গুটি-দুই আলমারিতে কতকগুলি আইনের বই এবং বাঁধানো মাসিকপত্র পাশাপাশি সাজানো রহিয়াছে। মধ্যে একটা টেবিল, তাহাতে ছেঁড়াখোঁড়া কয়েকখানা বই-খাতা ছড়ানো এবং খান দুই চেয়ার। আর কোন সরঞ্জামই নজরে পড়ে না। বোধ হয় এই ঘরে বসিয়াই মেয়েটি লেখাপড়া করে।

মিনিট-খানেক পরেই সন্ধ্যা ঘরে ঢুকিল, হাতে একখানা ধোপদস্ত কাপড়, একটা তোয়ালে, আর ধোয়া গেঞ্জি। কাপড়-জামাগুলা হাতে দিয়া কহিল—নিন, পরে ফেলুন। ইস্, কি ভেজাই ভিজেছেন!

সত্যই ভূপেনের তখন কষ্ট হইতেছিল। বহুক্ষণ ভিজা কাপড়ে থাকিবার ফলে শীত করিতেছিল রীতিমত। সে আর কোনরূপ প্রতিবাদ না করিয়া ভিজা কাপড়-জামাগুলা ছাড়িয়া ফেলিল এবং তোয়ালে দিয়া মাথাটা মুছিয়া অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইল।

নিজেই সে ভিজা কাপড়-জামাগুলা তুলিয়া লইতেছিল, বাধা দিয়া সন্ধ্যা কহিল—ও থাক। ও আমি কাচিয়ে কাগজে জড়িয়ে দিচ্ছি ঠিক ক'রে। আপনি এখন ও

ঘরে চলুন, চা আনতে বলেছি।

তাহার পাকা গৃহিণীর মত চালচলন দেখিয়া ভূপেন না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। হাসিয়া কহিল—আবার চা-ও খাওয়াবে! চলো, তাতে আমার বিশেষ আপত্তি নেই। কিন্তু তোমার দাদু কোথায়? তোমার বাবা-মা?

তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে যাইতে গম্ভীর ভাবে সন্ধ্যা জবাব দিল, বাবা-মা আমার কেউ নেই। ভাই-বোনও নেই—শুধু আমি আর দাদু।

কথাটা সে বেশ সহজ ভাবেই কহিল, কিন্তু ভূপেন ব্যথিত হইয়া উঠিল। একটু যেন অপ্রস্তুতও হইল। তাড়াতাড়ি কহিল, তোমার দাদু বাড়ি আছেন ত?

—না, তিনি এখনও আদালতে। আমাদের যে গাড়ি পৌঁছে দিল, সেই গাড়িই গেছে তাঁকে আনতে।

এবার তাহারা যে ঘরটিতে আসিল সেটি বৈঠকখানাই। মহার্ঘ আসবাবপত্র এবং কৌচ-কেদারায় পরিপূর্ণ। একটা গদী-আঁটা চেয়ার দেখাইয়া দিয়া সন্ধ্যা নিজে একটা সেটীতে বসিয়া পড়িয়া কহিল—আপনি কি করেন?

প্রশ্নটা ঐটুকু মেয়ের মুখে একেবারেই মানায় না। কিন্তু তবু তাহার প্রশ্ন করিবার ভঙ্গীতে এমন সারল্য ছিল যে, ভূপেন বিরক্তি বোধ করিল না, বরং প্রসন্ন মুখেই জবাব দিল, কলেজে পড়ি।

—আর কি করেন?

—আর?—হাসিয়া ভূপেন জবাব দিল,—আর ছেলে পড়াই।

এতক্ষণে বোধ হয় সন্ধ্যার একটু সম্ভ্রম বোধ হইল। সে কিছুক্ষণ তাহার ডাগর চোখ মেলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল—কি পড়ান তাদের?

—সব। অঙ্ক, ইংরেজী, ইতিহাস, ভূগোল, আরও কত কি।

—ও!

ইহার পর দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ। ইতিমধ্যে চা আসিয়া পৌঁছিল। একটা ডিসে দুটি সন্দেশ, দুখানি নিমকি এবং সুন্দর একটি কাপে এক কাপ চা।

ভূপেন বিস্মিত হইয়া কহিল, তুমি চা খাবে না?

সন্ধ্যা জবাব দিল, দাদু না খেলে আমি খাই না। আপনি খান।

ভূপেন কহিল, কিন্তু সে যে বড় খারাপ দেখাবে খুকী!

সন্ধ্যা মাথা দুলাইয়া কহিল, কিচ্ছু খারাপ দেখাবে না। আপনি ভিজে এসেছেন ভীষণ, আমি ত আর ভিজি নি।

অগত্যা ভূপেন খাবারের ডিসে মন দিল। খাবার শেষ করিয়া চায়ে সবে চুমুক দিয়াছে, এমন সময় সন্ধ্যা বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, একটা কাজ করবেন?

ভূপেন বিস্মিত হইয়া কহিল, কি কাজ ?

—আপনি আমাকে পড়াবেন ? পড়ান না !

ভূপেন সহসা কি জবাব দিবে ভাবিয়া পাইল না। কহিল, কেন, যিনি তোমাকে পড়াচ্ছেন, তাঁর কি হলো ?

সন্ধ্যা মাথা নাড়িয়া কহিল, তিনি দিন পনেরোর উপর হলো দেশে চলে গেছেন। সেখানকার ইস্কুলে তিনি কাজ পেয়েছেন, তাই আর ফিরবেন না।

তবু ভূপেন কোন জবাব দিতে পারিল না। এমন অদ্ভুত প্রস্তাবে কি-ই বা জবাব দেওয়া যায় ! সে নীরবে চা পান করিতে লাগিল। সন্ধ্যা কিন্তু তাহার মৌন ভাবকে সম্মতির লক্ষণ বলিয়াই ধরিয়া লইল। খুশী হইয়া মাথা নাড়িয়া কহিল, তা'হলে ঐ কথাই রইলো, কাল থেকে পড়াবেন আপনি, কেমন ? বাঃ, এই বেশ হলো !

ভূপেন হাসিয়া কহিল, তুমি ত দিব্যি সব ঠিক ক'রে ফেললে, কিন্তু তোমার দাদু যদি রাজী না হন ?

সন্ধ্যা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, আপনি বড় বোকা মাস্টার-মশাই। আমি পড়ব, দাদু রাজী হবেন না কেন ? আচ্ছা, বেশ, ঐ ত দাদু এসে গেছেন, এখনই ওঁকে জিজ্ঞেস করছি।

সত্যই গাড়ি তখন ফটক পার হইতেছে। এক প্রিয়দর্শন বৃদ্ধ ভদ্রলোক সাহেবী পোশাক পরিয়া গাড়ি হইতে নামিয়া সরাসরি তাহাদের ঘরেই প্রবেশ করিলেন। টুপিটা চাকরের হাতে দিয়া সহাস্য বদনে প্রশ্ন করিলেন, গিন্নী কখন এলে গো ?

সন্ধ্যা জবাব দিল, আমাকে পৌঁছেই গাড়ি গিয়েছিল তোমাকে আনতে।

সন্ধ্যার দাদুর নাম মোহিত রায় ; মোহিতবাবুর এতক্ষণে চোখ পড়িল ভূপেনের দিকে। তিনি সস্মিত-জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। ভূপেন ঘামিয়া উঠিল, কিন্তু সন্ধ্যা বেশ সপ্রতিভ, সে জবাব দিল, উনি আমার নতুন মাস্টারমশাই।

—নতুন মাস্টারমশাই ?—বিস্মিত হইয়া মোহিতবাবু প্রশ্ন করিলেন।

সন্ধ্যা ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল—হ্যাঁ। আজ যখন পিসিমার ওখান থেকে ফিরছি, দেখি উনি গড়ের মাঠের এক গাছতলায় দাঁড়িয়ে ভিজছেন। সঙ্গে ক'রে তাই এনেছি, কাল থেকে উনিই আমাকে পড়াবেন। সে সব কথা ঠিক ক'রে ফেলেছি।

ইহার উত্তরে কিছু তিরস্কারই ভূপেন আশা করিয়াছিল, কিন্তু মোহিতবাবু একটু হাসিলেন। কহিলেন, ঠিক ক'রে ফেলেছ একেবারে ? বেশ ত !—তাহার

পর একটা সোফায় বসিয়া পড়িয়া কহিলেন, তোমার নামটি কি বাবা ?

ভূপেন এতক্ষণে একটু হাঁফ ছাড়িল। সে মোহিতবাবুর প্রশ্নের উত্তরে নাম-ধাম-পেশা সবই খুলিয়া বলিল। সব শুনিয়া মোহিতবাবু কহিলেন, তুমি সত্যিই ওকে পড়াতে পারবে বাবা ?

ভূপেন মাথা নিচু করিয়া জবাব দিল, আপনি যদি আদেশ করেন ত চেষ্টা করি।

মোহিতবাবু তাড়াতাড়ি কহিলেন, না, না, আদেশ-টাদেশ করার কথাই নয়। আমার ও গিন্নী আবার এক-রকমের মানুষ। মাস্টার ওঁর সহজে পছন্দ হয় না, আর পছন্দ না হলে পড়তে চান না একটি বর্ণও। অথচ যাঁকে ভালো লাগে তাঁর কাছে একেবারে ভেরি গুড্ গার্ল! তুমি যদি পার ত আমি বেঁচে যাই। কদিন ধরেই ভাবছি যে আবার কে আসবে!

ভূপেন কহিল, কোন্ ক্লাসে পড়ে ও ?

—উঁহু, ক্লাসে-টাসে নয়। ইস্কুলে দেওয়ার পক্ষপাতী নই আমি। মেয়েদের ইস্কুলে লেখাপড়া যা শেখানো হয় তা আমি জানি। মেয়ে-মাস্টারনীও ঠিক সেই কারণে আমি রাখি না। দু'-একজনকে চেষ্টা ক'রে দেখেছি—লেখা-পড়া ওরা কিছু জানে না। আর আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যে সব মেয়ে ইস্কুলে যায় তাদেরও ত দেখি—ইস্কুলে গিয়ে শেখে নানারকম ক'রে প্রসাধন করতে, সুর ক'রে কথা বলতে, কতকগুলো মুদ্রাদোষ অভ্যাস করতে এবং—থাক্, তুমি ছেলেমানুষ!

ভূপেন একটু হাসিল শুধু।

—তোমার ও হাসি জানি বাবা, অর্থাৎ আমার এটা বাড়াবাড়ি, এই ত ? তা হোক্—আমি সেকেলে মানুষ, আমার মত অত সহজে বদলায় না। ইস্কুলে দেওয়ার পক্ষপাতী আমি নই। বাড়িতেই পড়ে। তবে স্ট্যাণ্ডার্ড একটা ঠিক আছে বৈকি। বোধ হয় ক্লাস সিক্স-এর মত হবে। এখনও অ্যালজেব্রায় হাত দেয় নি।

ভূপেন কহিল, আচ্ছা, সে আমি দেখে নেবো'খন।

তাহার পরের কথাটা সে লজ্জায় উত্থাপন করিতে পারিল না। তাহার এই অল্প-বয়সের অভিজ্ঞতাতেই এটা জানিতে পারিয়াছিল যে যাহারা 'বড়লোক' নয় শুধু ধনী, তাহাদের সহিত দরদস্তুর করিয়া না লইলে পরে ঠকিতে হয়। কিন্তু মোহিতবাবুকে ঠিক কোন্ পর্যায়ে ফেলা উচিত, তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

মোহিতবাবু নিজেই কিন্তু কথাটা পাড়িলেন। সন্ধ্যার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, গিন্নী, একটু ওঘরে যাও ত।—হ্যাঁ বাবা, কাজের কথাটা বলে নিই। সকালে

বিকেলে যখন খুশি তুমি পড়িও, সময়ের হিসেবও আমি নেবো না। দরকার মত দু ঘণ্টাও পড়াবে আবার উভয় পক্ষের সুবিধামতো দশ মিনিট পড়িয়েও চলে যেতে পারো—দুদিন কামাই করলেও কিছু বলব না। কারণ, আমি জানি এটা বাজারের কেনা-বেচা নয়, কাঁটায় তৌল করতে গেলে ঠকতে হয়। বিশেষ আমি ছাত্র-ছাত্রীর সামনে মাস্টারদের বেতনের কথাটা তুলতেই চাই না, তাতে অশ্রদ্ধার সঞ্চার হ'তে পারে। কিন্তু একটা কথা, আমি ওকে ইস্কুলে দিই নি কি কারণে তা ত শুনলে, আমি চাই ওকে সত্যিকারের লেখাপড়া শেখাতে। ওরও জ্ঞান-পিপাসা আছে খুব, তা আমি জানি। ওকে বাইরের বই পড়াতে চাই, তোমাকেও পড়ে তৈরি হ'তে হবে। দরকার হ'লে ইম্পিরীয়াল লাইব্রেরীতে যাবে, অসুবিধা হয় বই কিনবে, আমি দাম দেবো। কিন্তু ও যেন সব প্রশ্নের জবাব পায়। তুমিই ওর জন্যে গল্পের বই বেছে দেবে—লিস্ট্ ক'রে সরকারকে দিলে, সে কিনে আনবে। এতে রাজী আছ ত?

ভূপেন ঘাড় হেঁট করিয়া কহিল, তাতে আর আপত্তির কি আছে বলুন? পড়ার ইচ্ছা জানবার ইচ্ছা আমারও কম নয়। তবে—

—তবের ব্যবস্থা করব বই কি বাবা। আগের মাস্টারমশাইকে আমি ত্রিশ টাকা দিতুম। কিন্তু তার চেয়ে বেশী দিতেও আপত্তি নেই। তুমি খুশী হয়ে আমাকে খুশী করবে, এই আমি চাই।

ত্রিশ টাকা! ভূপেনের মনে পড়িল বর্তমান টিউশনির কথা, দু ঘণ্টা পড়াইয়া আট টাকা পায় মোটে। সে মাথা নাড়িয়া কহিল—ত্রিশ টাকাই যথেষ্ট। বেশ, কাল থেকেই আমি আসব, তবে সন্ধ্যের সময়—?

—হ্যাঁ, সন্ধ্যের সময়ই ভালো।

ভূপেন উঠিয়া দাঁড়াইল। মোহিতবাবু সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া ডাক দিলেন—গিন্নী কোথায় গো? তোমার মাস্টারমশাই বাড়ি যাচ্ছেন যে।

সন্ধ্যা কাছেই কোথায় ছিল, সে একটা খবরের কাগজের পুলিন্দা হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিল।

—এই নিন আপনার ভিজে কাপড়-জামা।

মোহিতবাবু কহিলেন—তাহলে উনি কাল থেকেই আসবেন। বুঝলে, তৈরি থেকো। এখন ওঁকে প্রণাম করো। উনিই তোমার মাস্টারমশাই হলেন।

ভূপেন বিব্রত হইয়া কোন বাধা দিবার পূর্বেই সন্ধ্যা হেঁট হইয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া একেবারে পায়ের ধুলা লইল।

মোহিতবাবু ভূপেনের সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া আসিয়া কহিলেন—না, না

বাবা। আমি এখানে অন্য কোন সামাজিক নিয়ম মানি না। গুরু আর ছাত্রের সম্পর্ক যতটা সম্ভব শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই ভালো, তাতে শুধু যে ছাত্রের ভালো হয় তাই নয়, গুরুকে সতর্ক থাকতে হয়। ফল পাওয়া যায় ভালো।

ভূপেন তাঁহাকে যথারীতি নমস্কার করিয়া বাড়ির পথ ধরিল।

২

বাড়ি কিরিতে ফিরিতে সমস্ত ব্যাপারটা মনে মনে চিন্তা করিয়া ভূপেনের হাসি পাইতে লাগিল। ঘটনাটা বদি কোন বন্ধুকে আগাগোড়া শোনানো যায় তাহা হইলে সে রীতিমত ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিবে হয়ত—অবশ্য মেয়েটির বয়স বাদ দিয়া বলিলে। নাটকীয় রোমান্সের কিছুই বাকি নাই, শুধু ঐ একটা বড়-রকমের ফাঁক, নায়িকা নিতান্ত বালিকা। রোমান্সের সাধ তাহার মনে ইদানীং দেখা দিয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু সে সাধ লইয়া ভগবান যে এমন পরিহাস করিবেন, তাহা কে জানিত!

তা হোক্—তবু ত্রিশ টাকা অনেক টাকা। বহুদিনের শখ একটা টেবিল-ল্যাম্পের। প্রথম মাসের মাহিনা পাইলেই কেনা যাইতে পারে। খান-তুই ভালো চেয়ারেরও বড় অভাব। সব চেয়ে বড় অভাব যেটা, একটা স্বতন্ত্র ঘরের। সকলে মিলিয়া তুখানা ঘরের মধ্যে গুঁতাগুঁতি করিলে আর যাহাই হউক, পড়া হয় না। বাড়িওয়ালাকে বলিয়া বর্তমান ভাড়ার উপর গোটা চার-পাঁচ টাকা বাড়াইলে হয়ত তিনতলায় টালির ঘরটা পাওয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে সে বাঁচিয়া যায়—নিচেকার কোন গোলমাল সেখানে পৌঁছায় না।

পুরাতন টিউশনিটা অবশ্য ছাড়িয়া দিতে হইবে, কিন্তু এখন নয়। ভূপেন্দ্র টাকাকড়ির ব্যাপারে যতই ঔদাসীন্য দেখাক, অভাবের সংসারে কতকগুলা সাধারণ জ্ঞান তাহার হইয়াছিল। এ টিউশনিটা টেঁকে কিনা, তাহার ঠিক কি? এখন বলিয়া কহিয়া দিন দশেকের ছুটি লইবে। দিন দশেকের মধ্যে কি আর মোহিত-বাবুদের চেনা যাইবে না? তখন হয় মোহিতবাবু, নয় পুরানো মক্কেল—যাহাকে 'হউক জবাব দিলেই চলিবে।

কিন্তু আজও টিউশনি আছে। আজিকার দিনটা অন্ততঃ সারিয়া আসা দরকার, নহিলে অভদ্রতা হয়। সে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরিয়া ভিজা কাপড়-জামাগুলি বোনের হাতে দিয়া চা তৈরি করিতে বলিল। তুটি অনূঢ়া বোন তাহার কিন্তু তার জন্য ভূপেনের তুঃখ ছিল না। বোন থাকায় অসুবিধা যেমন আছে, সুবিধাও কম নাই। অহরহ হুকুম করা যায়, এবং তাহারাও কলেজীদাদার ফরমাশ খাটাকেই জীবনের একমাত্র কর্তব্য বলিয়া মনে করে।

বোন শান্তি বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, এ কাপড়-জামা কোথা থেকে এল আবার ?

—ও আমার এক বন্ধুর বাড়ি থেকে বদলে এসেছি, কাল ফেরত দিলেই চলবে। ভূপেন সংক্ষেপে জবাব দিল। তাহার বাবাকে সে চেনে, বেশী মাহিনার টিউশনির সংবাদ কানে গেলে আর রক্ষা থাকিবে না, তৎক্ষণাৎ তিনি সংসার-খরচের জন্য কিছু দাবি করিয়া বসিবেন। এমনিতেই বলেন, মাসে মাসে আটটা ক'রে টাকা পাস, কি করিস ? কলেজের মাইনে, বইয়ের দাম সবই ত আমি দিই, তোর এত খরচ কিসের ?

ভূপেন খাবার ও চা খাইয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল, তখন সন্ধ্যার দেরি নাই। বাগবাজারে তাঁহাদের ওখানে পৌছিতে পৌছিতে সাড়ে সাতটা বাজিয়া যাইবে—বাড়ি ফিরিতে দশটা। কোন মতে জামাটা কাঁধে গলাইতে গলাইতে সে দ্রুত সিঁড়ি বাহিয়া নিচে নামিতে লাগিল।

সদরের কাছে নিচের তলার ভাড়াটে অবিনাশবাবুর সহিত দেখা। রোগা একহারা চেহারা, পান-দোক্তার কষ দুই চোয়ালে সর্বদাই লাগিয়া থাকে ; ফলে দাঁত ও মুখ-গহ্বর চির-রক্তবর্ণ। সেদিকে চাহিলে যেন ভয় করে—হাতে একটা আধ-খাওয়া বিড়ি এবং ময়লা হাফ-শার্ট—যখনই দেখা হয়, এই চেহারাই ভূপেনের নজরে পড়ে। আজও তাহার অন্যথা হইল না, পাকা উচ্ছের বীচির মত দাঁত বাহির করিয়া কহিলেন—কি বাবাজী, দেশলাইটা দেবে একবার ?

ভূপেনের কাছে তিনি পূর্বেও বারকয়েক এ চেষ্টা করিয়াছেন। সে অসহিষ্ণু-ভাবে কহিল, আপনাকে আর কতবার এ জবাব দেব কাকাবাবু, যে আমি বিড়ি-সিগারেট খাই না।

মুখে এক প্রকার অদ্ভুত শব্দ করিয়া অবিনাশ কহিলেন, কি রকম যে কলেজে পড়ো, বুঝি না। কলেজের ছেলে সিগারেট খায় না, এ শুনি নি কখনও। আমরাও এককালে কলেজে ভর্তি হয়েছিলুম হে, তখন সিগারেট খেলে মাথা ঘুরত, তবু জোর ক'রে খেতুম, পাছে অন্য ছেলেরা ঠাট্টা করে। যাক্ বাবা, **better late than never,** ওটা ধরে ফেলো—আমাদের একটু অসুবিধে হয়।

রাগে ভূপেনের সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। সে জবাব দিল—ধরতে ত বলছেন, শেষে আপনার মত অবস্থা হবে ত, এর-ওর কাছে ভিক্ষে ক'রে বেড়াতে হবে। খরচ দেবে কে ?

—আহা বাবাজী, তোমরা খালি মাথা গরম করতেই পারো, সুবিধেগুলো ভেবে দেখো না। ঐ তোমাদের দোষ। বলি তবে টিউশনি করো কি করতে ?

যেখানে যাবে আগে ছাত্রটিকে ঐ নেশা ধরিয়ে দেবে। ব্যস—তারপর আর কোন গোলমাল নেই! সে বেটা বাপের পকেট মেরে দামী সিগারেট কিনবে আর তুমি তার মাথায় হাত বুলোবে। ও ভারি সুবিধে! আমি ত টিউশনি করেছি ঢের, যেখানে যেতুম, আগেই ঐ নেশাটি ধরিয়ে দিতুম। ওতে কোন পাপ নেই বাবাজী। ধরবেই ত, দুদিন আগে আর দুদিন পিছে—

তাঁহার নির্লজ্জতায় ভূপেন নির্বাক হইয়া গেল। বয়স্ক লোক, ইহার পর জবাব দিতে গেলে মারামারি করিতে হয়। সে এক রকম তাঁহাকে ধাক্কা দিয়াই সরাইয়া বাহির হইয়া পড়িল, কিন্তু পথে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কথাগুলা মনে করিয়া তাহার মন বিষাক্ত হইয়া রহিল।

তাহার পুরাতন ছাত্রদের বাড়ি বাগবাজারের একটা গলির ভিতর। ছোট বাড়ি। একটি মাত্র বাহিরের ঘর, তাহারই মাঝে একটা মোটা চটের পর্দা ঝুলাইয়া দু ভাগ করা হইয়াছে, একদিকে কর্তা সন্ধ্যার পর বন্ধু-বান্ধব লইয়া তাস খেলিতে বসেন, আর একদিকে ছেলেরা পড়ে। ফল হয় এই যে, তাঁহাদের পাশবিক চিৎকারে ছেলেরা পড়ায় মন দিতে পারে না, বার বার অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে। তা ছাড়া অধিকাংশ সময়েই রসনাকে ভদ্র ভাষার গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখিতে পারেন না, খেলায় হারিবার মাথায় এমন সব কথা বাহির হইতে থাকে যাহা কোন মতেই শিক্ষক-ছাত্র একত্র বসিয়া শোনা যায় না। আগে আগে ভূপেন এ সম্বন্ধে অনুযোগ তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। কর্তা বলিয়াছেন—তা বাপু, নিজের বাড়ি থাকতে কি ফুটপাথে বসে তাস খেলব? তা ছাড়া এ ত তাস খেলা, কোন বদখেয়ালী ত করি না। তাস ত বাপ-ছেলেতে বসে খেলা যায়।

আর একদিন বলিয়াছিলেন, সত্যি কথা বলতে কি, অমনি মাস্টারদের ওপর নজর রাখাও হয়। মাস্টারদের ত জানি, ফাঁকি দিতে পারলে আর কিছু চায় না। দু ঘণ্টা পড়ানো—তাও যেন বাঘ মনে হয় তাদের কাছে।

ভূপেন আর কিছু বলিবার চেষ্টা করে নাই। পড়ানো বলিতে ইঁহারা ঘণ্টাটাই বোঝেন। তাস খেলায় যতই উন্মত্ত থাকুন না কেন, প্রতিদিন ভূপেনের বাড়ি ফিরিবার সময় ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখেন যে দুই ঘণ্টা পুরা হইল কিনা।

সেদিনও সে যখন গেল, তখন তাঁহাদের তাসের আড্ডা বসিয়া গিয়াছে। ভূপেনকে দেখিয়া একবার ঘড়িটার দিকে চাহিয়া কহিলেন – কি মাস্টার, এত দেরি যে? আমি ভাবলুম, আজ আর এলেই না। এই ভীম, ওরে ভীমে—মাস্টারমশাই এসেছেন যে! হারামজাদা নাম্ না নিচে তাড়াতাড়ি।

ভূপেন কোন কথা না বলিয়া পর্দার ওপারে গিয়া পড়াইতে বসিল। এ টিউশনি ছাড়িয়া দিতে পারিলে বাঁচা যায়; দুটি ছেলে, একটি একেবারে দ্বিতীয় ভাগ পড়ে, আর একটির ক্লাস ফাইভ। ছোটটি বরং ভাল কিন্তু বড়টি যেমন নির্বোধ তেমনি ফাঁকিবাজ, আর তেমনি অসভ্য। কোন মতে দুটি ঘণ্টা কাটাইতে ভূপেনের প্রত্যহ প্রাণান্ত হয়।

আজও অঙ্ক কষিতে কষিতে বড়টি মুখ তুলিয়া কহিল, স্যার চণ্ডীদাস ছবি দেখেছেন? খুব নাকি ভাল হয়েছে?

ভূপেন ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া কহিল, আবার বায়োস্কোপের কথা! একদিন বারণ ক'রে দিয়েছি না?

ছাত্র হি-হি করিয়া হাসিয়া জবাব দিল, আপনি ত দেখেছেন স্যার, বলুন না কেমন হয়েছে!...দেখব আমি নিশ্চয়ই, বাবা পয়সা না দেয়, মায়ের কাছ থেকে আদায় করবো—হি হি!

সজোরে তাহার কানটা মলিয়া দিয়া ভূপেন কহিল,—অঙ্কে মন দাও, বাঁদর কোথাকার!

এবারে সে ক্রুদ্ধ হইল, ঘাড় হেঁট করিয়া আঁক কষিবার ভান করিতে করিতে দাঁতে দাঁত চাপিয়া কহিল—উনি দেখতে পারেন, বাবা নিজে তিনবার দেখতে পারেন, আর আমি বললেই বাঁদর হলুম! দেখবই আমি।

ভূপেন ছোটটির দিকে মনোযোগ দিল। সে একটা লজেঞ্জস্ মুখে পুরিয়া নামতা মুখস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছিল; ভূপেন কহিল—ও কি হচ্ছে? ওটা হয় ফেলে দাও, নয় গিলে ফেলো। লজেঞ্জস্ মুখে পুরে পড়া হয় না।

সে লজেঞ্জস্ কড়মড় করিয়া চিবাইতে চিবাইতে কহিল,—দাদা আজ দুপুর-বেলা আপনাকে কি বলছিল জানেন স্যার? বলে দিই দাদা?

দাদা সহসা যেন ক্ষেপিয়া গিয়া ঠাস্-ঠাস্ করিয়া তাহাকে ঘা-কতক চড়াইয়া দিল, স্টুপিড কম্‌নেকার! মেরে হাড় গুঁড়ো ক'রে দেব।

ছোটটি কাঁদিল না। সে শিক্ষাই নাই তাহার। সে মুখ-চোখের চেহারা ভীষণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর পাগলের মত দাদার ঘাড়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কিল-চড়-ঘুষি বর্ষণ করিতে লাগিল। সে এক কুরুক্ষেত্র ব্যাপার! টেবিলটা উল্টাইয়া যাইবার উপক্রম, ছাড়াইতে গিয়া ভূপেনের উপরও দুই-এক ঘা পড়িল।

অবশেষে যখন উভয় পক্ষই শান্ত হইল, তখন ছোটটির ঠোঁট কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে এবং বড়টির জামা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। সে সরিয়া বসিয়া গজ্‌রাইতে

লাগিল—দেখে নেব তোমাকে, শূয়ার কোথাকার। চামড়া কেটে তাতে নুন ছিটিয়ে দেব। শূয়ার! শূয়ার।

ছোটটি মুখের রক্ত জামার হাতায় মুছিয়া ফেলিয়া শুধু জবাব দিল—যা! যা!

ইহাও প্রায় প্রাত্যহিক ঘটনা। অথচ পর্দার আড়ালে তাস খেলার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় না। একদিন ভূপেন নালিশ করিতে গিয়াছিল, কোন ফল হয় নাই; কর্তা বরং অপ্রসন্ন মুখে কহিয়াছিলেন—তুমি থাকতে ওরা মারামারি করে কেন? শাসন করতে পারো না? সেইজন্যেই ত তোমাকে এক গাদা টাকা খরচ করে রাখা।

আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত শান্ত হইলে ভূপেন আসল কথাটা পাড়িল, বলিল—দ্যাখো, আমি বোধ হয় দিন আষ্টেক-দশ আসতে পারবো না!

বড় ছেলেটির মুখ নিমেষে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে কহিল—বাবাকে বলেছেন? না আমি বলব?

কিন্তু বোধ হয় কথাটা মনে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই বাবার চেহারাটা চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল—কহিল, বাবা কি অত দিন ছাড়বে ভেবেছেন আপনাকে? দ্যুৎ?

—কিন্তু ছাড়তেই হবে আমাকে। আমার বিশেষ কাজ আছে। আমি আসতে পারবো না।

—অন্য মাস্টার দেখবে তাহ'লে। বাবা যা, লেখাপড়াটা যদি আমাদের গিলিয়ে দিতে পারতো ত ভাল হতো।

দেখা গেল ছেলেটি এধারে যতই নির্বোধ হউক, বাবাকে ভালই চেনে। পড়ানো শেষ করিয়া ভূপেন গিয়া কথাটা পাড়িতেই তিনি কহিলেন—আট-দশ দিন? সে কি! আমার ছেলেরা এমনিই কিছু করে না, তার ওপর আট-দশ দিন কামাই করলে আবার ক-খ থেকে শুরু করাতে হবে। সে আমি পারবো না।

শান্ত দৃঢ়স্বরে ভূপেন কহিল—কিন্তু আমার বিশেষ কাজ আছে, আমি আসতে পারবো না।

ঠিক সেই সুরেই কর্তা জবাব দিলেন—তাহ'লে অন্য মাস্টার দেখতে হবে। ছেলেদের ত আমি উচ্ছন্নয় দিতে পারি না।

রাগে ভূপেনের মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিল। সে কোনমতে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া কহিল—বেশ, তাহ'লে তাই দেখবেন। আমার টাকাটা মিটিয়ে দিন।

—এখন টাকা? ক্ষেপেছ নাকি? মাসের শেষে তুমি হঠাৎ চাকরি ছেড়ে দেবে বলে আমি তোমার জন্যে টাকা নিয়ে বসে থাকব, তা ত আর হয় না। সেই মাস-কাবারে চুকিয়ে নিয়ে যেও। এমনিই ত নোটিসের জন্যে পনের দিনের টাকা কাটা উচিত।

ভূপেনের একবার মনে হইল বলে যে, ও টাকাটা আপনিই রেখে দেবেন। কিন্তু পরক্ষণেই নিজের সহস্র প্রয়োজনের কথা মনে পড়িতেই উদ্গত বাক্যটা দমন করিয়া লইল। বলিল—তাই হবে।

কোনমতে একটা শুষ্ক নমস্কার করিয়া সে বাহির হইয়া আসিল। পর্দার ওপার হইতে তখন তাহার ছাত্রদের একটা চাপা উল্লাসের শব্দ শোনা যাইতেছে। এখন অন্ততঃ তিনটা দিনের জন্য তাহারা নিশ্চিন্ত!

৩

পরের দিন যথাসম্ভব প্রস্তুত হইয়া সে সন্ধ্যাদের বাড়ি গেল। সংবাদপত্র সে নিয়মিত পড়ে; সাধারণ ছাত্রদের চেয়ে অনেক কিছুই বেশী জানা ছিল তাহার, তবু ভয়ে-ভয়েই পড়াইতে গেল। কাল মোহিতবাবুর কথা শুনিয়া বুঝিয়াছে যে, আর যাহাই হউক—ফাঁকি সেখানে চলিবে না। আর মোহিতবাবুকে তুষ্ট করা ছাড়া তখন আর কোন উপায়ও ছিল না, সামান্য আট টাকা মাহিনার টিউশনি, তাহাও ত গেল।

তাহার হাতে ছিল আগের দিনের কাপড়-গেঞ্জির পুলিন্দা। ভয়ে ভয়ে ফটক পার হইতেই দারোয়ান সেলাম করিয়া তাহার হাত হইতে পুলিন্দাটা চাহিয়া লইল, তাহার পর পথ দেখাইয়া সন্ধ্যার সেই পড়ার ঘরটিতে লইয়া গেল। আজ ঘরটিকে কিছু পরিষ্কার করা হইয়াছে। বই-খাতাগুলি টেবিলের একধারে গোছানো, দোয়াত-কলমেও নূতন কালি ও নিবের আভাস পাওয়া যাইতেছে—এক কথায় সমস্ত আয়োজনই প্রস্তুত। বইগুলি সে খুলিয়া দেখিল। মোহিতবাবু ঠিকই বলিয়াছেন, বইগুলি সবই ক্লাস সিক্স-এর। একটু পরে চাকর আসিয়া এক পেয়ালা চা ও এক প্লেট খাবার দিয়া গেল—লুচি, আলুভাজা ও রসগোল্লা। এই সৌজন্যে ভূপেন বিস্মিত হইল। তাহার গত দুই বৎসরের টিউশনির অভিজ্ঞতায় এমনটি একদিনও ঘটে নাই। সে চা খাইয়া আসিয়াছিল, তবু সুদৃশ্য কাপ ও সুগন্ধি চায়ের লোভ সামলাইতে পারিল না—দুই-এক চুমুক পান করিল।

এইবার আসিল সন্ধ্যা। আগের দিনের মতোই সাদা এক ফ্রক পরনে, কোথাও কোন আড়ম্বর নাই, প্রসাধনের চেষ্টা পর্যন্ত দেখা যায় না। আসিয়াই প্রশ্ন করিল —কাল অত ভিজে আপনার অসুখ করে নি ত মাস্টারমশাই? সর্দি?

—না। বাড়ি গিয়েই আদা দিয়ে গরম চা এক কাপ খেয়ে ফেললুম, ব্যস সব ঠিক হয়ে গেল।

—তাহ'লেই ভালো। আমি ভাবলুম, নিশ্চয় আপনার অসুখ করবে। যা কাঁপছিলেন আপনি ঠাণ্ডায়!

ইহার পর পড়াশুনা শুরু হইল। একটু পরীক্ষা করিবার পরই ভূপেন বুঝিতে পারিল, সে যাহা আশঙ্কা করিয়াছিল তাহাই ঠিক। দুনিয়ার খবর সন্ধ্যা রীতিমতোই রাখে। ইহাতে যেমন তাহার পরিশ্রমের আশঙ্কা বাড়িল, তেমনি আর একটি তথ্য লক্ষ্য করিয়া খুশীও হইল। দেখিল সন্ধ্যার পড়াশুনায় মনোযোগ আছে, তাহাকে বোঝানোও সহজ। এক কথা বার বার বলিতে হয় না, শ্রদ্ধা-সহকারে শোনে এবং বুঝিবার চেষ্টা করে। যেটুকু প্রশ্ন করে, তাহাতেও তাহার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু অঙ্কে একটু কাঁচা, তাও এমন কিছু নয়।

শেষের দিকে মোহিতবাবু আসিয়া বসিলেন। পড়ানো শেষ হইলে সন্ধ্যা ভিতরে চলিয়া গেল। তখন তিনি প্রশ্ন করিলেন—কেমন দেখলে বাবা?

সোৎসাহে ভূপেন জবাব দিল—খুব ভালো। এতটা আমি আশা করি নি। এমন স্টুডেন্টকে পড়িয়ে সুখ আছে।

মোহিতবাবু কহিলেন—তোমার পড়ানোর পদ্ধতিটিও ভালো। আমি ও-ঘর থেকে কিছু কিছু শুনতে পেয়েছি। বিশেষ করে ডিকেন্সের ঐ গল্পটি শোনানোতে আমি ভারি খুশী হয়েছি। এই ত চাই, পড়া বলতে শুধু নীরস পাঠ্য পুস্তক পড়া বোঝাবে কেন? গল্পও যে পড়া হ'তে পারে, আমাদের দেশের অনেকে তা জানে না। তোমার দেখছি সাহিত্যে বেশ অনুরাগ আছে। যদি দেরি হবার ভয় না থাকে ত চলো, তোমাকে আমার লাইব্রেরী দেখিয়ে আনি।

দোতলার এক প্রকাণ্ড ঘরে মোহিতবাবুর লাইব্রেরী। গোটা তিন-চার আলমারিতে শুধু আইনের বই ঠাসা, বাকি সব কয়টি, অন্তত: বারোটার কম নয়, সাহিত্যের বই-ভর্তি। ইংরাজী-বাংলা-সংস্কৃত, কাব্য-প্রবন্ধ-উপন্যাস কিছুরই অভাব নাই। দামী অভিধান এবং অন্যান্য রেফারেন্স-বইও প্রচুর। দেখিতে দেখিতে ভূপেনের চক্ষু লোলুপ হইয়া উঠিল। তাহা লক্ষ্য করিয়া মোহিতবাবু বলিলেন—আলমারির চাবি খুকীর কাছেই থাকে। তোমার যখন যেটা পড়তে ইচ্ছে হবে, ওকে বলো, বার ক'রে দেবে 'খন।

সে দিনের মত বিদায় লইয়া ভূপেন বাড়ি ফিরিল। তাহার মাথাটা অপরাহ্নের কিছু পূর্ব হইতেই একটু একটু ধরিয়াছিল, কিন্তু নূতন অভিজ্ঞতার উত্তেজনায় অতটা গ্রাহ্য করে নাই। এখন পথে বাহির হইয়া সেই সামান্য যন্ত্রণাই প্রবল হইয়া দেখা দিল। বাড়ি ফিরিয়া আর এক মিনিট দাঁড়াইতে বা বসিতে পারিল না, একেবারে শয্যা গ্রহণ করিতে হইল। মা ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিলেন, কহিলেন—কি হয়েছে রে?

—মাথাটা বড্ড ধরেছে মা।

মা গায়ে হাত দিয়া দেখিয়া কহিলেন—যা ভেবেছি, তাই। এই যে, গা-ও দিব্যি গরম হয়েছে দেখছি। যা ভেজা, জ্বর হবার আর অপরাধ কি!

—আজকেই জ্বর হ'লো—তাই তো!

এইটাই ভূপেনের সর্বপ্রথম চিন্তা। নূতন টিউশনি এবং বহুদিনের বাঞ্ছিত টিউশনি—দ্বিতীয় দিনেই কামাই হইলে কি থাকিবে? সে সাধ্যমত সতর্ক হইল, কিন্তু তখন আর সতর্ক হইবার সময় ছিল না, জ্বর ক্রমে বাড়িতে লাগিল, একশ চারে উঠিল! বাবা আসিয়া অভ্যাসমত বকাবকি শুরু করিলেন। এটা তাঁহার অভ্যাস। ছেলে-মেয়েদের অসুখকরিলে তিনি খানিকটা বিলাপ এবং খানিকটা বকুনি দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করিতে পারেন না। এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল না। খানিকটা শুনিয়া অসহ্য বোধ হইলে ভূপেনের মা তাঁহাকে ধমক দিয়া উঠিলেন। তাহা লইয়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ছোটখাট বিবাদ বাধিল—খানিকটা চেঁচামেচি, তারপর আবার চুপচাপ।

এমনি প্রত্যহ হয়। ভূপেনের সে-দিকে কান ছিল না, মন ত নয়ই। সে শুধু ভাবিতেছিল মোহিতবাবুদের কথা। দুশ্চিন্তায় মাথার যন্ত্রণা আরও খানিকটা বাড়িয়া গেল। এ-রোগটা তাহার বহুকালের, এবং সেইজন্যই বোধ হয় কতকটা গা-সওয়া হইয়াছে। অনেকদিন আগে বাবা একবার ডাক্তার দেখাইয়াছিলেন। ডাক্তার বলিয়াছিল, পুষ্টিকর খাদ্য এবং ব্যায়াম প্রয়োজন। দুইটার কোনটাই অবশ্য হয় নাই, চিকিৎসার অপর কোন চেষ্টাও সম্ভব ছিল না। তাহার জ্বর প্রায়ই হয়। জ্বর হইলে রাত্রিটা উপবাস দিয়া পরের দিন আবার যথারীতি স্নান, আহার, কলেজ ইত্যাদি চলে। আজও তাহার তেমনি আশা ছিল—কিন্তু ভগবান যেন ইচ্ছা করিয়াই বাদ সাধিলেন। পরের দিন সকালেও দেখা গেল, মাথার যন্ত্রণা বা জ্বর কোনটাই কমে নাই। সেদিন ভালো ছেলের মত শুধু জল-সাগু খাইয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল, তবু অপরাহ্ণে দেখা গেল জ্বর তখনও তেমনি আছে, মাথার যন্ত্রণাও তথৈবচ।

তাহার দুর্ভাবনার সীমা রহিল না। উঠিবার মত অবস্থা নয়, অন্যদিন হইলে উঠিবার কল্পনাও করিতে পারিত না, কিন্তু আজ না উঠিলে চলে কি করিয়া? একেবারে দ্বিতীয় দিনে কামাই? তাঁহারা কি মনে করিবেন? এই সব কথা ভাবিয়া শেষ পর্যন্ত উঠিয়া পড়িল। মা হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিলেন—তোর মাথা খারাপ হ'লো নাকি?

অগত্যা পারিশ্রমিকের অঙ্ক চাপিয়া নূতন টিউশনির কথা বলিতে হইল।

পুরাতনটি গিয়াছে, কাল হইতে নূতন টিউশনি ধরিয়াছে—আজ সবে দ্বিতীয় দিন।

মা তবু বকাবকি করিতে লাগিলেন,—অসুখ-বিসুখ হ'লে মানুষ যায় কি ক'রে? তোর যে দেখছি সাহেবের চাকরির বাড়া হ'লো!

ভূপেন সে-দিকে কান না দিয়া কতকটা মরীয়া হইয়াই বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু বাহিরে আসিয়া বুঝিল, হাঁটা অসম্ভব। মাথা খাড়া রাখা যাইতেছে না, পা টলিতেছে। তখন বোধ হয় জ্বর একশ চার। অগত্যা একটা রিক্সা লইল এবং সন্ধ্যাদের বাড়ি পৌঁছিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় নিজের অবস্থা চাকর দারোয়ানদের কাছে গোপন করিয়া ভিতরে গিয়া বসিল।

সেদিনও আগের মত চা-জলখাবার আসিল। ভূপেন সাগ্রহে চা-টা টানিয়া লইল। এত দুর্বল—সেই মুহূর্তে মনে হইতেছিল বুঝি অজ্ঞান হইয়া যাইবে।

একটু পরেই ঘরে ঢুকিল সন্ধ্যা। ভূপেন খাবারের থালা স্পর্শ না করিয়াই চা খাইতেছে দেখিয়া একটা কড়া রকমের ভৎ'সনা করিতে গিয়া সহসা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সে থামিয়া গেল। স্ফীত থমথমে মুখ, রক্তবর্ণ চক্ষু—চাহিলে ভয় করে!

—এ কি মাস্টারমশাই, আপনার জ্বর হয়েছে?

কাছে আসিয়া পাকা গৃহিণীর মত তাহার কপালে হাত দিয়া জ্বরটা অনুভব করিল, তাহার পর কহিল—ইস, এ-যে একেবারে গা পুড়ে যাচ্ছে! আমি দাদুকে ডেকে আনছি।

ভূপেন ব্যাকুল হইয়া উঠিল—না, না সন্ধ্যা, যেয়ো না। এ কিছু নয়, ঠিক হয়ে যাবে এখুনি। যেয়ো না মিছিমিছি।

কিন্তু কে কাহার কথা শোনে! সন্ধ্যা ততক্ষণে ভিতরে চলিয়া গিয়াছে। মিনিট দুই পরে সে মোহিতবাবুকে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিল। মোহিতবাবু তাহার ললাটে হাত দিয়া বলিলেন—সত্যিই তো ভীষণ জ্বর দেখছি। তুমি এই জ্বর নিয়ে এলে কি করতে বাবা? কাজটা ভালো হয় নি, জ্বর অন্ততঃ তিন!

কোন উত্তর যেন ভূপেনের মাথায় আসিল না। আসল কথাটা কি করিয়াই বা বলা যায়! কিন্তু মোহিতবাবু নিজেই তাহা অনুমান করিয়া লইলেন। বলিলেন—একদিন পরেই অসুখের অজুহাত দিলে আমরা কি মনে করবো, এই কথা ভেবেছিলে, না? একেই বলে ছেলেমানুষ। এখন যাও, আর এক মিনিট দেরি নয়। লক্ষ্মী ছেলের মত বাড়িতে গিয়ে শুয়ে পড়গে।

ভূপেন যেন লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল। কোনমতে সে বলিয়া ফেলিল—এ রকম আমার প্রায়ই হয়। অবশ্য এতটা হয় না।

—কিন্তু আজ ত এতটা হয়েছে, আজ বেরুলে কি বলে? তুমি মনে সঙ্কোচ

ক'রো না, জ্বর একেবারে ভালো না হ'লে আসবার দরকার নেই। তুমি বরং বসো, আমি একটা ওষুধ দিচ্ছি, বাড়ি গিয়ে সেটা খেয়ে ফেলো।

তিনি শুধু ঔষধই দিলেন না, নিজের গাড়ির ব্যবস্থা করিলেন। ভূপেন সঙ্কোচে ঘামিয়া উঠিতেছিল, বাধা দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কোন কথা তিনি শুনিলেন না। অগত্যা তাঁহার মোটরে চাপিয়া ভূপেন বাড়ি ফিরিয়া আসিল এবং টিউশনিটা যাইবার আশু কোন আশঙ্কা নাই বুঝিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

৪

ইহার পর হইতে সে যথানিয়মে পড়াইতে লাগিল। আগে পড়াইতে যাইবার নামে তাহার গায়ে জ্বর আসিত, এখন ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। ছুটির দিনগুলিই বরং বিশ্রী লাগে। বাস্তবিক, পড়ানো যে এত আনন্দের তাহা আগে কল্পনার অতীত ছিল।

ইহার জন্য দায়ী অবশ্য তাহার ছাত্রীই। সন্ধ্যার এমন কিছু অসাধারণ মেধা নয়, কিন্তু প্রখর সহজ বুদ্ধিতে সে অভাবটুকু ঢাকিয়া যাইত। তবু এইটাই বড় কথা নয়—পাঠে তাহার ঐকান্তিক মনোযোগ ও শ্রদ্ধা দেখিয়াই ভূপেন খুশী হয় বেশী, তাহার কাজও সহজ এবং প্রীতিকর হইয়া ওঠে। সে যাহা বুঝায় তাহা সন্ধ্যা প্রাণপণে বুঝিবার চেষ্টা করে এবং একবার মাথায় গেলে সহজে ভোলে না। জ্ঞান-পিপাসা তাহার অপরিসীম—ঐটুকু মেয়ের জানিবার মত এত কথা থাকিতে পারে, তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করা কঠিন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন-বর্ষণে সন্ধ্যা ভূপেনকে জর্জরিত করে, কিন্তু তাহাতে সে বিরক্তি বোধ করে না একটুও। কারণ, এ প্রশ্নের মধ্যে শিক্ষককে অপ্রতিভ করার চেষ্টা নাই ; আছে শুধু জানিবার জন্য আন্তরিক আগ্রহ।

ভূপেন আগে হইতেই তাহার প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত থাকে, তবু সব সময়ে তাহার বিদ্যায় কুলাইয়া ওঠে না। অবশ্য এজন্য অপ্রস্তুত হইবার কোন কারণ নাই। কারণ, তাহাদের গুরু-শিষ্যার সম্পর্কটা অনেক সহজ হইয়া আসিয়াছে। ভূপেন বই দেখিয়া সেই সব প্রশ্নের জবাব দেয়। বইয়ের অভাব আর নাই, মোহিতবাবুর লাইব্রেরীতে সমস্ত রকম বই-ই আছে—সেগুলি সে যথেচ্ছ নাড়াচাড়া করে। শুধু তাহাই নয়, কোন বই—যা তাঁহার আলমারিতে নাই—সে পড়িতে চায় শুনিলেই তিনি সেই বই কেনেন। ভূপেনের এক-আধখানা পাঠ্যপুস্তকের অভাব ছিল, তিনি তাহাও কিনিয়া দিয়াছেন।

পড়াশুনার মধ্যে গল্পই চলে বেশী। ইতিহাস পড়াইতে বসিয়া ভূপেন সেই

ছোট পাঠ্যপুস্তকখানি হইতে বহু দূরে চলিয়া যায়। ইতিহাস ও সাহিত্যে তাহার অনুরাগ ছিল খুব বেশী, ইতিহাসের অনেক বই-ই সে পড়িয়াছে, সেই সব বই হইতে সে গল্প করে—পৃথিবীর নানা দেশের উত্থান-পতনের কাহিনী। এ দেশেরও যে সব ইতিহাস ছোট পাঠ্যপুস্তকে লেখা থাকে না, তাহারও গল্প বলে সে। আর গল্প বলে সাহিত্যের। বড় বড় ইংরেজী বই-এর আখ্যানভাগ সে এক একদিন বলিয়া যায় আর সন্ধ্যা মর্মর-মূর্তির মত বসিয়া শোনে। এ বিষয়ে মোহিতবাবুরও উৎসাহ অসাধারণ, সময় পাইলে তিনিও সেই গল্পের মজলিসে আসিয়া বসেন।

এমনি করিয়া দিন কাটিতে লাগিল। ভূপেন বেশ ভালো ভাবে ইণ্টার-মিডিয়েট পাশ করিল, যদিও খুব নাম করিবার মত কিছু করিতে পারিল না। তাহার কারণ কতকটা মোহিতবাবুর লাইব্রেরী! লাইব্রেরীটি তাহার জ্ঞানের ভাণ্ডার বৃদ্ধি করিলেও পাশের পড়ায় কিছু ব্যাঘাত ঘটাইত। যাহা হউক—ভূপেন বি-এ ক্লাসে ভর্তি হইল, মোহিতবাবুর পরামর্শ মত ইংরেজীতে অনার্স লইল। মোহিতবাবু কহিলেন—তোমার সাহিত্য যা পড়া আছে, অনার্সের জন্যে বেশী খাটতে হবে না।

অনার্স লইয়া বি-এ পড়িবে, ভূপেনের বহুদিনের স্বপ্ন। সে স্বপ্ন অবশেষে সার্থক হইল—তবু ভূপেন কিন্তু এ পড়ায় কোন সুখ পায় না। ছেলেবেলা হইতে সে কলেজে-পড়ার আশায় দিন গণিত, মনে হইত, তাহার চেয়ে গৌরব আর কিছু নাই! একখানি বই আর একখানি খাতা কিংবা শুধু একখানি খাতা লইয়া যখন পাড়ার ছেলেরা কলেজে যাইত, তখন সে সসম্ভ্রম ঈর্ষায় চাহিয়া থাকিত আর হিসাব করিত তাহার স্কুলের পর্ব শেষ হইবার আর দেরি কত! কিন্তু কলেজে উঠিয়া দেখিল, স্কুলই ঢের ভালো ছিল। শিক্ষকদের সহিত স্নেহের সম্পর্ক ছিল, বন্ধুদের সহিত ছিল প্রীতির বন্ধন। ম্যাট্রিক পাশ করিবার পর তাহারা কে কোথায় ছড়াইয়া পড়িল, সে যে কলেজে ঢুকিল, সেখানে পড়িল সে একা।

এ যেন অরণ্য! অধ্যাপকরা এক-একজন এক এক রকমের। কোন বাঙলার অধ্যাপক হয়তো রবীন্দ্রনাথের কাব্যাংশ পড়াইতে পড়াইতে কাঁদিয়া ফেলেন, কেহ বা আসিয়াই শুরু করেন তাঁহাকে গালি দিতে। এক ভদ্রলোক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেন, জাদুবিদ্যার খেলা দেখান, অর্থপুস্তক লেখেন এবং মক্কেল পাইলে ওকালতি করিতে ছোটেন। খান দুই উপন্যাস লিখিয়া অর্থব্যয় করিয়া ছাপিয়াছেনও, যদিও সেগুলি বিক্রয় হয় না, ফাঁক পাইলে ছাত্রমহলে তাহার বিজ্ঞাপন প্রচার করিতেও ছাড়েন না। এক কথায় অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ছাড়া আর সবই করেন। আর এক অধ্যাপক ক্লাসে ছাত্রদের পড়াইবার সময়টুকু

যে অপব্যয় হয়, তাহা ছাত্রদের কাছেই স্বীকার করেন। শুধু তাই নয়, এমন অধ্যাপকও আছেন, যিনি অধ্যাপকদের ঘরে বসিয়া এমন সরবে অশ্লীল রসিকতা করেন যে, বাহিরে তাহা ছাত্রদের কানে পৌঁছিতে কোন অসুবিধাই হয় না।

তবু যখন ইণ্টারমিডিয়েট পড়িত তখন সান্ত্বনা ছিল যে ইহারা ছোট দরের অধ্যাপক, বি-এ পড়িবার সময় ভালো অধ্যাপকদের কাছে এ দুঃখ ঘুচিবে। কিন্তু থার্ড ইয়ারে উঠিয়া সে স্বপ্নও ভাঙ্গিল। নাম-করা অধ্যাপক দু-একজন পাওয়া গেল, কিন্তু তাঁহারা এতই ব্যস্ত যে, না পাওয়া যায় তাঁহাদের সান্নিধ্য, না পাওয়া যায় তাঁহাদের উপদেশ। যদিও তাঁহারা মাহিনা বেশী পান, তবু অর্থলোভ আর যায় না তাঁহাদের। পাঠ্যপুস্তক লিখিয়া, নোট লিখিয়া, অসংখ্য টিউশনি করিয়া নিজেদের এমন জখম করিয়া রাখেন যে ক্লাসে যখন আসেন তখন দেখা যায় তাঁহারা যেমন ক্লান্ত তেমনই অন্যমনস্ক। কেহ কেহ অবসর সময় সংবাদপত্রের অফিসে সম্পাদনার কাজ করেন, কেহ আবার করেন ওকালতি। দু-একজনের ব্যবসাও আছে। যখন ভালো অধ্যাপক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন তখনকার অভ্যাসটা মাত্র আছে হয়ত, মুখস্থ বলিবার মত বলিয়া যান, তাহার বেশী আর পৌঁছানো যায় না। যদি বা দু-একজন ছাত্রদের সঙ্গে একটু সহজ হইবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা আবার ক্লাসে আসিয়া পড়ানো বন্ধ করিয়া ধরেন রাজনীতির চর্চা, ফলে অধ্যয়ন যে তপস্যা, তাহা ছাত্ররাও ভুলিয়াছে, অধ্যাপকরাও ভুলিতে বসিয়াছেন।

অবশ্য ইহার মধ্যে দুই-চারিজন যে ধারালো অধ্যাপক নাই, এমন নহে, কিন্তু ভূপেন তাঁহাদের কাছে ঘেঁষিতে পারে না। তাছাড়া চারিপাশের আবহাওয়ায় তাঁহারাও এমন রিরক্ত যে, অতিরিক্ত গাম্ভীর্যের আবরণে আত্মরক্ষা ছাড়া তাঁহাদের আর কোন উপায় থাকে না। তবু এইসব অধ্যাপকের কাছে প্রশ্ন করিয়া ভালো রকম উত্তর পাওয়া যায়, বাকি অধিকাংশ অধ্যাপকেরই দৌড় সেই বিশেষ পাঠ্যাংশের বিশেষ পাঠ্য-পুস্তকটি পর্যন্ত। তাহার বাহিরে কোন প্রশ্ন করিতে গেলে হয় বিরক্ত হইয়া ধমক দেন, নয় কথাটা কোনমতে এড়াইয়া যান। যেটুকু পড়াইবার কথা, সেইটুকুই তৈরী করিয়া আসেন বা দীর্ঘ দিনের অভ্যাসে তাহা তৈরীই থাকে, সেটার অধিক কিছু পড়িবার সময়ও নাই, ইচ্ছাও নাই তাঁহাদের। নিজেদের বিষয়-বস্তুর বাহিরে তাঁহাদের জ্ঞান এমন সঙ্কীর্ণ যে, এক-একদিন দৈবাৎ তাহা আবিষ্কার করিয়া ভূপেনের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। আবার এমন অধ্যাপকও আছেন, যাঁহারা সত্য সত্যই দিনরাত অধ্যয়নে ডুবিয়া থাকেন, যাঁহাদের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই, অথচ তাঁহারা একেবারেই পড়াইতে পারেন না। ছাত্ররা বিরক্ত হয়, গোলমাল করে, ক্লাসে সে বিষয়টাই মাটি হইতে থাকে। কর্তৃপক্ষ

এই ব্যর্থতাকে ছাত্রদেরই দুর্বিনয় এবং দুর্ভাগ্যের উপর বরাত দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, মধ্যে মধ্যে গালিও দেন।

কিন্তু সকলের চেয়ে বিস্মিত হয় ভূপেন ছাত্রদের দেখিয়া। বাল্যকালে শিক্ষকদের কাছে এবং পরে মোহিতবাবুর কাছে সে বারবার শুনিয়াছে, অধ্যয়ন ছাত্রদের কাছে তপস্যা। কিন্তু এ কি তপস্যা ? ছেলেগুলি কলেজে আসে যেন পড়াশুনা ছাড়া আর সব কিছুর জন্য। একটি কি দুটি ছেলে ছাড়া আর কেহই বোধ হয় অধ্যয়নকে শ্রদ্ধাসহকারে গ্রহণ করে নাই! প্রথম প্রথম ভূপেন কলেজে গিয়া হাঁপাইয়া উঠিত। শিক্ষালয় নয়, এ যেন বাজার! এত হল্লা, এত গোলমাল যে কোন শিক্ষায়তনে হইতে পারে, তাহা ছিল ভূপেনের স্বপ্নেরও অগোচর! প্রীতির সামান্য সূত্র কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—আছে রেষারেষি দলাদলি। তাহারা ছাত্রসঙ্ঘ করে, সেখানেও দুই-তিনটি দল—ইনস্টিট্যুটে যায় দলাদলি করিতে। ভোট-গ্রহণ, ঝগড়া, দলাদলি এমন কি মারামারিতে পৌঁছিতেও বাধা নাই। অতি সামান্য কারণেই কলেজে ধর্মঘট হয়, কলেজেরই উঠানে দাঁড়াইয়া রাজনীতি সংক্রান্ত গরম-গরম বক্তৃতা চলে এবং সভা ভাঙ্গিলে চাঙ্গোয়ায় কিংবা সিনেমায় যাইতে এতটুকু সঙ্কোচ থাকে না। অধ্যাপকরা কোনমতে নিজেদের সম্মান বাঁচাইয়া চুপ করিয়া থাকেন।

গোড়ার দিকে ভূপেন চুপ করিয়া থাকিত। কিন্তু শেষে এক সময় অসহ্য হইয়া উঠিল। দেখিত, তাহার যে সব বন্ধু পৃথিবীতে অচিরে সাম্যবাদ স্থাপনের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, এবং নিপীড়িত, নির্যাতিত, দরিদ্র, বুভুক্ষু ভারতবাসীর জন্য যাহাদের দুঃখ ও বিক্ষোভের সীমা নাই—তাহারাই গোঁফ-কামানো মুখে মেয়েদের মত প্রচুর স্নো ও পাউডার মাখিয়া সবচেয়ে পাতলা আদ্দি কিংবা রেশমের জামা গায়ে দিয়া কলেজে আসে, মুহুর্মুহুঃ বিলাতি সিগারেট খায়, চৌরঙ্গি-পাড়ার হোটেলে জলযোগ করে এবং এক-একখানা বাংলা ছবি তিন-চার বার দেখে। তাহাতেও ভূপেনের আপত্তি ছিল না। ইহাদের বক্তৃতায় যখন দেশপূজ্য নেতারা পর্যন্ত কুৎসিতভাবে লাঞ্ছিত হইতেন, তখন সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিত না। শ্রদ্ধা কথাটার সঙ্গেই যেন ইহাদের পরিচয় নাই। রাজনীতি করে করুক, কিন্তু নিজেরা কিছু ভাবে না, ভাবিবার চেষ্টাও করে না, তাহাতেই ভূপেনের আপত্তি। কতকগুলি বিদেশী বাঁধা বুলি আওড়ায় মাত্র। বক্তৃতা করে রুশীয় সাহিত্যের ইংরাজী অনুবাদের তর্জমা পড়িয়া—বিপ্লবের বুলি আওড়ায় উর্দু ভাষায়, শ্লোগানটা পর্যন্ত নিজেরা তৈয়ারী করিতে পারে না। প্রথম কলেজ-জীবনে সে-ও যে ইহাদেরই একজন ছিল, ভাবিয়া ভূপেন আজ লজ্জা পায়।

মোহিতবাবুর সহিত এ বিষয়ে তাহার প্রায়ই আলোচনা হইত। ভূপেনের

উত্তাপের পরিবর্তে তিনি হাসিয়া বলিতেন—ওদের ওপর রাগ ক'রো না বাবা, ওদের জন্য দুঃখ করো। ওরা নিজেরাই জানে না যে ওদের বক্তব্য কি, ওরা কি চায়। এখন যেমন দেশের দুর্গতদের শ্রমিকদের প্রপীড়িতদের দুঃখে গভীর উত্তেজনায় বক্তৃতা করে, বক্তৃতায় অশ্রুমোচন করার পরেই বিলাতী স্নো, বিলাতী খানা ও বিলাতী সিনেমার মধ্যে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে, তেমনি একদিন ওদের মধ্যে শতকরা নব্বই জনই অনায়াসে পাশের বাড়ির বা কুটুম্বদের কোন মেয়ের সঙ্গে প্রেমে পড়বে, অবশ্য যদি না ইতিমধ্যেই পড়ে থাকে! তারপর অর্থ-প্রাপ্তির আশায় বা দৈহিক প্রয়োজনে নিঃশব্দে বাপ-মার বেছে-দেওয়া মেয়েকে বিবাহ করবে এবং যেখানে হোক একটা চাকরি যোগাড় করে শান্তিতে ঘর-সংসার করবে। তখন আবার এরাই তখনকার দিনের তরুণদের কষে গালাগাল দেবে। এখন এরা যেমন জানে না জীবনের উদ্দেশ্য কি, কি ওদের প্রয়োজন, তখনও জানবে না। এদের ওপর কি রাগ করতে আছে!

কিন্তু মোহিতবাবু যত সহজে কথাটা উড়াইয়া দিতেন, ভূপেন তত সহজে উড়াইতে পারিত না। সে তর্ক করিতে যাইত, যুক্তি দিয়া তাহাদের ভুল ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু ফল হইত বিপরীত। যে-সব ছেলে স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়া ঘন ঘন স্ট্রাইক ও মুহুর্মুহুঃ বক্তৃতা করে, তাহারাই বিন্দুমাত্র প্রতিবাদে অসহিষ্ণু হইয়া ওঠে, অপর পক্ষকে কিছুতেই কথা কহিতে দেয় না।

অথচ, ইহার মধ্যে সব চেয়ে মজার কথা এই যে, তাহার সহপাঠীরা তাহাকে সম্পূর্ণ অবহেলাও করিতে পারিত না। তাহার কারণ, একমাত্র সে-ই ক্লাসে অধ্যাপকদের নানারূপ প্রশ্ন করিত, তাঁহাদের সঙ্গে আলোচনা করিত এবং তাঁহারা কোন প্রশ্ন করিলে এমন জবাব দিত, যাহাতে তাহার সত্যকারের লেখাপড়ার আগ্রহ ও চেষ্টা প্রকাশ পাইত। ভালো ছেলে বলিয়া এই সামান্য সুনাম রটনাতেই তাহাকে দলে পাইবার জন্য সমস্ত দলেরই আগ্রহ ছিল প্রচুর।

অবশ্য তাহার এই ছাত্রজীবনের মধ্যে যে একেবারে কোথাও এতটুকু আলো ছিল না এমন নয়। কতকগুলি ছাত্র সব কলেজের সব ক্লাসেই থাকে, যাহারা সত্যই বিদ্যানুরাগ লইয়া আসে—তাহারা নিজেদের প্রচার করে না, খুঁজিয়া তাহাদিগকে বাহির করিতে হয়। ভূপেন এই শ্রেণীর ছাত্রদের সন্ধান পাইয়া যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। ইহাদের সহিত লেখাপড়ার চর্চা করিয়া সত্যই শিক্ষায় আগ্রহ ও অনুরাগ বাড়ে। ইহারাও রাজনীতির চর্চা করে এবং দেখিয়া অবাক হইয়া গেল যে, রাজনীতি ইহারা অনেকের চেয়েই ভালো বোঝে। তাছাড়া অধ্যাপকরাও ইহাদের ভাল করিয়া পড়াইতে চান, খোলাখুলি ভাবে, সহজ ভাবে

মেশেন। এক কথায় এই বিশেষ দলটির আওতায় আসিয়া সে যেন বাঁচিয়া গেল।

প্রথম দিকে একদিন সে মোহিতবাবুর কাছে দুঃখ করিয়া বলিয়াছিল যে—সামান্য বেশী খরচার জন্য কোন বড় কলেজে ভর্তি হলুম না, এখন আফসোস হচ্ছে।

উত্তরে মোহিতবাবু সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছিলেন—সব কলেজেই ভালো অধ্যাপক আর ভালো ছাত্র আছেন বাবা, খুঁজে নিতে হয়।

সে কথার সত্যতা ভূপেন ক্রমে বুঝিতে পারিল।

এই সমস্ত তিক্ততার মধ্যে তাহার গভীর সান্ত্বনা ও শান্তি ছিল সন্ধ্যাদের বাড়ি। এ সময়টায় সে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিত। তাহার এ টিউশনি শুধু অর্থের প্রয়োজনে নয়, আত্মার প্রয়োজনেও।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যার পড়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। ভূপেনকে ঠিক ক্লাসের পাঠ্য-তালিকা ধরিয়া পড়াইতে হয় নাই বলিয়া সে সহজে এক-একটা স্তর পার হইয়া গিয়াছে। ভূপেন যখন ফোর্থ ইয়ারে, সন্ধ্যা তখন ম্যাট্রিকের পুঁথিতে হাত দিয়াছে। ভূপেন মাঝে মাঝে ঠাট্টা করিয়া বলিত—তুমি যে ভাবে এগিয়ে যাচ্ছ সন্ধ্যা, তাতে কিছুদিনের মধ্যেই আমার চাকরিটি খাবে দেখছি।

সন্ধ্যা হাসিয়া জবাব দিত—আপনিও ছুটুন আমার আগে আগে, তাহলে আমার গরজে আপনি একদিন তবু বিদ্যাসাগর হতে পারবেন।

সন্ধ্যা কিছুতেই ভাবিতে পারিত না যে, ভূপেনের বিদ্যার স্তরে সেও একদিন পৌঁছাইতে পারিবে। তাহার কিশোর-মনে ভূপেনের স্থান এমনি শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল।

এখন সে তর্জমা ছাড়িয়া সোজাসুজি ইংরেজী বই-ই ধরিয়াছে। ভূপেন তাহাকে সহজ অথচ কাহিনী-প্রধান বইগুলি বাছিয়া দিত। প্রথমেই দিয়াছিল ডুমার 'কাউন্ট অফ মন্টিক্রিস্টো'। এ বইটির গল্পাংশ সন্ধ্যা বার দুই-তিন ভূপেনের মুখে শুনিয়াছিল—গল্পটা তাহার এত ভাল লাগিত। সে-বইটি শেষ করিবার পর ডিকেন্সের 'অলিভার টুইস্ট'। এমনি করিয়া সন্ধ্যার লেখাপড়াতে যেমন দ্রুত অগ্রগতি হইতে লাগিল, সাহিত্যেও তেমনি পাইল ডবল প্রমোশন। মোহিতবাবু প্রস্তাব করিয়াছিলেন, ছোট ছোট ইংরাজী বই কিনিয়া দিবার, কিন্তু ভূপেন আপত্তি তুলিয়াছিল। মোহিতবাবু আর কিছু বলেন নাই।

ক্রমে ভূপেনের বি-এ পরীক্ষার সময় আসিল। মোহিতবাবু একদিন ডাকিয়া বলিলেন—বাবা ভূপেন, এবার তুমি কদিন পড়ানো বন্ধ করো।

ভূপেন অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল—কেন?

মোহিতবাবু জবাব দিলেন—তোমার পরীক্ষার তো মোটে আর একুশ দিন

বাকি। এখন অতটা করে সময় নষ্ট করা কি উচিত? এ একটা মাস ও নিজে নিজেই পড়তে পারবে'খন!

ভূপেন কিন্তু সরবে প্রতিবাদ করিয়া উঠিল—না, না, এতে আর আমার কতটুকু সময় বা যায়! তা ছাড়া দিন-রাত বাড়িতে বসে পড়া—সে আমার ধাতে সয় না। খানিকটা ত বেড়াতেই হতো - সেই সময়টা না হয় ওকে পড়াই।

মোহিতবাবু কহিলেন—কিন্তু এমনি ঠাণ্ডা বাতাসে বেড়ানো আর মস্তিষ্কচালনা ক'রে বকা এক জিনিস নয়।

ভূপেন মাথা নাড়িয়া কহিল—না, না, সন্ধ্যাকে পড়ানোই একটা রিক্রিয়েশন। ওর সঙ্গে মোটে বকতে হয় না।

মোহিতবাবু হাসিয়া জবাব দিলেন—তোমার যদি ক্ষতি না হয়, তুমি এসো - **so much the better.**

৫

ভূপেন সসম্মানে বি-এ পাশ করিল। শুধু যে ফার্স্ট্‌ক্লাস অনার্স পাইল তাহা নয়, তালিকায় তাহার নামটা গোড়ার দিকেই ছাপা হইল!

এ সম্বন্ধে তাহার মনের মধ্যে একটু ভয়ই ছিল। সে পরীক্ষার আগের দিন পর্যন্ত ত পড়াইতে গিয়াছেও, পরীক্ষার মধ্যেও কামাই করে নাই। মোহিতবাবু নিষেধ করা সত্ত্বেও সে শোনে নাই। ফল বাহির হইতে সে তাড়াতাড়ি মোহিত-বাবুকে সংবাদটা দিয়া প্রণাম করিল, তিনি হাসিয়া বলিলেন—ঐ সময়টা বেশী পড়লে ফার্স্ট হতে পারতে!

ভূপেনও হাসিয়া জবাব দিল—বলা যায় না। এখানে না এলে হয়ত সিনেমায় যেতুম। তাতে ফল আরও খারাপ হতো।

পরীক্ষা দিবার পর তাহার এক মাসিমা লক্ষ্ণৌ হইতে চিঠি দিয়াছিলেন সেখানে বেড়াইতে যাইবার জন্য। খরচা তিনিই দিবেন এমন প্রতিশ্রুতিও ছিল চিঠির মধ্যে, তবু ভূপেন যায় নাই। সে কোথাও না-যাওয়াতে তাহার বন্ধু-বান্ধবরা একটু বিস্মিতই হইল। অবশ্য সে ক্ষতি তাহার পূর্ণ করিয়া দিলেন মোহিতবাবুই। তিনি দিন পনেরোর জন্য দার্জিলিং গেলেন, সঙ্গে সন্ধ্যা ও ভূপেন দুজনকেই লইয়া গেলেন। ভূপেন একটু ইতস্ততঃ করিয়াছিল, তাহার সংকোচে বাধিতেছিল কিন্তু সন্ধ্যা দুই ধমক দিয়া সেটা দূর করিল; কহিল, আমার সঙ্গে যাবেন তাতেও বুঝি আপনার আত্মসম্মানে বাধছে? তার মানে এখনও আমাদের আপনি পর ভাবেন।

মোহিতবাবুও খুব পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন। সে ত যাইতেই চায়, দার্জিলিং ও কাঞ্চনজঙ্ঘা—কত দিনের আশা তাহার! তাহার উপর মোহিতবাবুর সঙ্গ, একেবারে মণি-কাঞ্চন যোগ যাহাকে বলে। সে রাজী হইয়া গেল। বন্ধু বিশুর বাড়ি হইতে দুই-একটা গরম জামা ও নিজের পৈতৃক শাল সংগ্রহ করিয়া বন্ধুবান্ধব সকলকেই প্রায় সংবাদটা পৌছাইয়া দিয়া সে একদিন দার্জিলিং মেলে চড়িয়া বসিল। সেকেণ্ড ক্লাসে বার্থ রিজার্ভ করিয়া কোনদিন সে দার্জিলিং যাইতে পারিবে, এ ছিল তাহার কল্পনার অতীত। শুধু এই যাওয়াটাই তাহার জীবনে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

আর দার্জিলিং! পৃথিবীতে এত সুন্দর স্থান যে আছে তাহা সে কোনদিন ভাবিতেও পারে নাই। মেঘ ও কুয়াশার সহিত আলোকের সেখানে নিত্য লুকোচুরি চলে, মনে হয় তাহারা আছে মেঘলোকের উর্ধ্বে, বাকি সমস্ত পৃথিবীটা পড়িয়া আছে অনেক নিচে, তাহাদের পায়ের তলায়। ফুলের মেলা চারিদিকে, ঘাস-ফুলের মতই অজস্র গোলাপ ফুটিয়া আছে। সাধারণ একটা বনফুলের সৌন্দর্য দেখিয়া সে দিশাহারা হইয়া যাইত এক-একদিন। তাহার মনে হইত, এই যদি স্বর্গরাজ্য না হয় ত স্বর্গ ইহার চেয়ে খারাপ জায়গা নিশ্চয়ই!

মোহিতবাবু সন্ধ্যাকে পাঠ্যপুস্তক কিছুই লইতে দেন নাই। সে শুধু একখানা 'সঞ্চয়িতা' লইয়াছিল; মোহিতবাবু ভূপেনকে বলিয়াছিলেন অবসর সময়ে দুই-একটি কবিতা বুঝাইয়া দিবার জন্য। এক একদিন তাহারা বই হাতে করিয়াই বাহির হইয়া পড়িত। হয়ত জলা-পাহাড়ে উঠিবার পথে কোন একটা বেঞ্চের উপর, কিম্বা বোটানিক্যাল গার্ডেনে ঘাসের উপর বসিয়া চলিত তাহাদের কাব্যচর্চা। তাহাকে চর্চা বলিলে ভুল হইবে, সন্ধ্যা এক একটি কবিতা বাছিয়া দিত, ভূপেন সেই কবিতাটি একবার আবৃত্তি করিয়া লইবার পর বুঝাইতে শুরু করিত। তাহার সৌভাগ্যক্রমে দু-একজন নাম্‌-করা অধ্যাপকের সঙ্গ পাওয়াতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা সে অনেকটা বুঝিতে শিখিয়াছিল—কিন্তু তবু ভালভাবে হয়ত তাহার নিজে নিজে কোন দিনই বোঝা সম্ভব হইত না, সেটাও অনেক সময়ে সন্ধ্যার প্রশ্নে যেন তাহার মানসচক্ষুর সামনে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হইয়া যাইত। এই মেয়েটির কাছে কোন ব্যাপারেই ফাঁকি চলিত না, সেইজন্য কি পাঠ্য, কি কবিতা পড়াইতে বসিয়া সর্বদা নিজের বুদ্ধিবৃত্তিকে সজাগ-সতর্ক রাখিতে হইত।...এমনি করিয়া সেই চিরতুষারাবৃত মৌন হিমাদ্রি-শিখরের সামনে বসিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া চলিত তাহাদের কাব্যপাঠ—ভূপেন আপন মনে বলিয়া যাইত আর সন্ধ্যা তাহার শ্রদ্ধাপূর্ণ শান্ত চোখ দু'টি মেলিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিত। যেদিন মোহিতবাবু

তাহাদের সঙ্গে থাকিতেন, সেদিন ভূপেন কিছুতেই পড়িতে চাহিত না, কারণ, তাঁহার সম্বন্ধে সম্ভ্রমের সঙ্গে একটা ভয়ও ছিল তাহার মনে। মোহিতবাবু নিজেই দুই-একটা কবিতা আবৃত্তি করিয়া শোনাইতেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর ছিল মিষ্ট এবং বাচনভঙ্গী অত্যন্ত স্পষ্ট ও অর্থবোধক—ভূপেন তাঁহার আবৃত্তি হইতেই অনেক জিনিস বুঝিতে পারিত, যা এতদিন বার-বার পড়িয়াও নিজে বুঝিতে পারে নাই।

এমনি করিয়া দিন-কুড়ি কাটিয়া গেল। অবশেষে যখন বিদায়ের সময় ঘনাইয়া আসিল তখন ভূপেন প্রথম আবিষ্কার করিল যে, তাহারা তিন সপ্তাহ হইল এখানে আসিয়াছে। সে খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া করুণকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, আমাদের তাহ'লে কালই যেতে হবে।

মোহিতবাবু হাসিয়া বলিলেন, হ্যাঁ বাবা, কালই নামতে হবে। পরশু আমার একটা জরুরী কেস আছে, না গেলে তারা অত্যন্ত বিপদে পড়বে, তা ছাড়া আমারও কথার খেলাপ হবে।

অগত্যা একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে ভূপেন সেই 'স্বর্গ হইতে বিদায়ের' জন্য প্রস্তুত হইল। সেদিন দুপুর বেলায় একাই খানিকটা ঘুরিয়া আসিল সে। দুপুর-বেলা দার্জিলিংয়ের নির্জন রাস্তার কেমন একটা মায়া আছে। যাহারা সে সন্ধান পাইয়াছে তাহারা এমনি করিয়াই বাহির হইয়া পড়ে। অনেকখানি ঘুরিয়া ক্লান্তদেহে যখন সে ফিরিয়া আসিল তখন সন্ধ্যা অনুযোগের সুরে কহিল, বাঃ রে, আপনি ত বেশ লোক মাস্টারমশাই, দিব্যি একা-একা ঘুরে এলেন। আজই ত শেষ দিন, আমি বুঝি আর বেরোব না?

অপ্রতিভ ভাবে ভূপেন জবাব দিল—বেশ ত চলো না, আর খানিকটা ঘুরে আসি—

সন্ধ্যা কহিল—হ্যাঁ, তাই বই কি! আপনি কত ঘুরে এলেন, এখনও হাঁপাচ্ছেন—আবার এখনই বেরোলে আপনার কষ্ট হবে।

ভূপেন জিদ ধরিয়া কহিল, কিচ্ছু কষ্ট হবে না। আর তা ছাড়া আজই ত শেষ, কষ্ট একটু হ'লই না হয়, তবু যতটা বেড়িয়ে নিতে পারি।

—তবে একটু দাঁড়ান, আপনার জন্যে এক পেয়ালা চা ক'রে আনি।

ভূপেন বিস্মিত হইয়া কহিল, সে কি, এখনও ত তিনটেই বাজে নি, এরই মধ্যে চা?

সন্ধ্যা জবাব দিল, হ'লই বা এরই মধ্যে। এক কাপ না হয় বেশিই খেলেন। কি রকম পরিশ্রমটা হয়েছে, তা ত আপনি বুঝছেন না—এই শীতে এখনও ঘামছেন।

কথাটা বলিতে বলিতেই সে চলিয়া গেল, উত্তরের অপেক্ষাও করিল না। খানিক পরে নিজেই এক পেয়ালা চা প্রস্তুত করিয়া আনিয়া দিয়া কহিল, নিন চট্ ক'রে খেয়ে নিয়ে চলুন ঘুরে আসি। দাদুকে বলে এসেছি—পাঁচটা নাগাদ ফিরে এসে চা খেয়ে আবার বেরোব সবাই মিলে।

ভূপেন 'চলো' বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, বই নিলে না?

সন্ধ্যা কহিল, আজ বই থাক মাস্টারমশাই—আজ শুধু দেখব।

অনেকক্ষণ দুজনে নিঃশব্দে হাঁটিবার পর বার্চ হিলের রাস্তায় পড়িয়া সন্ধ্যা অনুতপ্ত স্বরে কহিল—না, আপনাকে টেনে আনা অন্যায় হয়েছে, আপনি দস্তুরমত ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন!...আর গিয়ে দরকার নেই, এইখানটাতেই একটু বসি, আসুন—

ভূপেন সত্যই শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সে প্রতিবাদ-মাত্র না করিয়া পথের ধারে একটা বেঞ্চে বসিয়া পড়িল। দুইজনে কিছুক্ষণ পাশাপাশি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পর সন্ধ্যাই আবার কথা কহিল, মাস্টারমশাই, বি-এ ত পাশ করলেন এবার নিশ্চয়ই এম-এ পড়বেন। তার পর কি করবেন?

ভূপেন একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, তার পর যে কি করব এখনও বুঝতে পারছি না। বাবার ইচ্ছে আমি তাঁর অফিসে ঢুকি। এম-এ পড়ার কোন অর্থ নেই তাঁর কাছে—তিনি এই পরীক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দরখাস্ত করতে বলছিলেন। এ যাত্রা কোন রকমে ফাঁড়া কাটিয়েছি।

সন্ধ্যা যেন একটা রূঢ় আঘাত পাইল, কহিল, আপনি অপিসে চাকরি করবেন?

ভূপেন হাসিয়া জবাব দিল, করবই যে তা এখনও ঠিক হয় নি—তবে করবারই ত কথা।...আমার মত অবস্থার শতকরা সাড়ে নিরেনব্বই জন ছেলেরই ত ঐ গতি।

সন্ধ্যা যেন একটু শিহরিয়া উঠিল। কহিল, না মাস্টারমশাই, আপনি কেরানী-গিরি করবেন, এ আমি ভাবতেই পারি না।

ভূপেন কহিল, তোমার দাদু বলছিলেন যে, এম-এ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আইনটা পড়ে ফেলতে, তাহ'লে উনি আমায় পসারের একটা উপায় ক'রে দিতে পারবেন অনায়াসে। কিন্তু মুশকিল এই—ওকালতীও আমার ভাল লাগে না।

বয়স্কা অভিভাবিকার মতই ঘাড় নাড়িয়া সন্ধ্যা কহিল, না, না, ওতে বড় মিথ্যে কথা বলতে হয়, তাছাড়া ও সংসর্গটাই খারাপ। আমি বলব, আপনি কি হবেন?

—বলো।...ভূপেন সকৌতুক দৃষ্টি মেলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

সন্ধ্যা কহিল, আপনি অধ্যাপক হবেন কোন কলেজে। আপনি পড়ানো ছাড়া

অন্য কিছু কাজ করছেন, এ আমি কল্পনাও করতে পারি না।

ভূপেন মাথা নিচু করিয়া একটা ঘাস ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে কহিল, অধ্যাপকের কাজ পেলে আমিও আর কিছু চাই না, কিন্তু সে কি আর হবে? কত এম-এ পাশ ছেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, প্রোফেসারের চাকরি আর কটা। তা ছাড়া, আমার তেমন কেউ জানাশুনো লোকও নেই যে, তদ্বির ক'রে কোন কলেজে ঢুকিয়ে দেবে।

সন্ধ্যা আশ্বাস দিয়া কহিল, সে আপনি কিছু ভাববেন না মাস্টারমশাই, যাহোক ক'রে একটা উপায় হয়েই যাবে। না হয় আর একটা এম-এ পাশ দিয়ে নেবেন। ডবল এম-এ হ'লে অনেকটা জোর হবে না?

ভূপেন তাহার কথা বলিবার ভঙ্গীতে হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, দেখা যাক।

সন্ধ্যা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না, না, ঐ কথাই ঠিক রইল; অধ্যাপক আপনাকে হ'তেই হবে। আর কোন কাজ আমি করতে দেবো না।

ভূপেন অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আমরা বড় গরিব, সন্ধ্যা! বাংলা দেশে আমাদের মত গরিব, অথচ ভদ্রঘরের ছেলেরা যে কত অসহায় তা তুমি শুধু আজ নয়, কোনদিনই বুঝতে পারবে না। ইচ্ছে করলেই আমরা কিছু হ'তে পারি না। সমস্তটাই ভাগ্যের উপর নির্ভর করে।

কথাটা তাহার বুঝিবার কথা নয়,তবু ভূপেনের কণ্ঠস্বরে সন্ধ্যা স্তব্ধ হইয়া গেল, আর জবাব দিতে পারিল না।

ভূপেনের ঐ কথাটা যে কি মর্মান্তিক সত্য, তাহা বোধ হয় বলিবার সময় নিজেও ঠিক বুঝিতে পারে নাই, বুঝিতে পারিল আরও মাস-কয়েক পরে, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবেই একদিন।

দার্জিলিং হইতে নামিয়া যথারীতি সে এম-এ ক্লাসে ভর্তি হইয়াছিল। ইদানীং মোহিতবাবু তাহাকে চল্লিশ টাকা বেতন দিতেন—একটা কেরানীর বেতন—সুতরাং বাবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভর্তি হইতে তাহার বাধে নাই। নিজের সব খরচ সে নিজেই চালায়, উপরন্তু সংসারেও কিছু দেয় বলিয়া তাহার বাবা আজকাল তাহাকে একটু সমীহ করিয়াই চলিতেন। কিন্তু মাস-কয়েক কাটিয়া যাইবার পর সহসা একদিন মোহিতবাবু তাহাকে নিজের অফিস-ঘরে ডাকিয়া পাঠাইলেন, কহিলেন, দেখ বাবা, তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা আজ আলোচনা করব।

ভূপেন চুপ করিয়া জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিয়া বসিয়া রহিল। কি কথা তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই, শুধু মোহিতবাবুর কণ্ঠস্বরে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

মোহিতবাবু মুহূর্ত কয়েক স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া কহিলেন, কিন্তু তার আগে তোমাকে একটা কথা দিতে হবে বাবা। হঠাৎ তুমি কোন জবাব দিও না, বা মন স্থির ক'রো না। আমি যা বলব মন দিয়ে শুনবে আর তার সব অর্থটা বোঝবার চেষ্টা করবে—এই আমার অনুরোধ। অর্থাৎ আমায় ভুল বুঝো না।···ঠিক ত?

ভূপেন একটু হাসিয়া জবাব দিল, আপনার অতি তুচ্ছ কথাও আমি মন দিয়ে শুনি, সুতরাং সেদিক দিয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। ওটা আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

মোহিতবাবু তবুও যেন খানিকটা ইতস্তত করিয়া কহিলেন, কথাটা সন্ধ্যাকে নিয়েই। সন্ধ্যা পনেরো পূর্ণ হয়ে ষোলয় পড়েছে—এই গত আশ্বিন মাসে। ঠিক অতটা বয়স ওর দেখায় না বটে, কিন্তু আমাদের দেশের হিসেবে ওটা বিবেচনাযোগ্য বয়স।···তা ছাড়া আমার বিশ্বাস, আমাদের দেশে মেয়েদের মন এই বয়সেই পরিণতির দিকে বা পরিণত ধারণার দিকে মোড় ফেরে—সুতরাং এই সময় থেকেই সাবধান হওয়া উচিত।

এই পর্যন্ত বলিয়া মোহিতবাবু আরও একবার চুপ করিলেন। তাঁহার বক্তব্যটা ঠিক বুঝিতে না পারিলেও একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় ভূপেনের বুক কাঁপিয়া উঠিতেছিল, সেও কথা কহিতে পারিল না।

মোহিতবাবু আবার শুরু করিলেন, সন্ধ্যা তোমাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে তা আমি জানি, অত শ্রদ্ধা সে এখন আমাকেও করে কিনা সন্দেহ। সে শ্রদ্ধার সঙ্গে আছে স্নেহ মেশানো। যাক্—কিন্তু আমি আশঙ্কা করছি যে আরও কিছু দিন গেলে সেটা অন্য দিকেও মোড় ফিরতে পারে। এবং সেটা আমি চাই না।

এই সংবাদ, এই আশঙ্কাটা ভূপেনের কাছে এতই অভাবনীয় যে, সে রীতিমত একটা প্রবল বিস্ময়ের আঘাত অনুভব করিল। সন্ধ্যাকে অত অল্প বয়স হইতে দেখিয়াছে এবং তাহাদের সম্পর্কটা প্রথম হইতেই এমন একটা মধুর যে, সেখানে অন্য কোন গভীরতর সম্পর্কের সম্ভাবনাই তাহার কোন দিন মনে পড়ে নাই। সে কথাটা সম্পূর্ণ বিশ্বাসও করিল না, কেমন একটা আচ্ছন্ন ভাবে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

মোহিতবাবু বলিয়াই চলিলেন, এই না-চাওয়ার একটা ইতিহাস আছে বাবা। তোমাকে আমি ভাল ছেলে বলেই জানি, তোমার উপর আমার অনেক আশা আছে। যদিও তোমরা ঠিক আমাদের পাল্‌টি ঘর নও, তবুও সে রকম প্রয়োজন হ'লে আমি তোমার হাতে তাকে তুলে দিতে একটুও ইতস্তত করতুম না, কিন্তু এক্ষেত্রে আমার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নেই। ওর মাকে আমি একটি সৎপাত্র দেখে

গরিবের ঘরে দিয়েছিলুম—বোধ হয় সে কিছু দুঃখ পেয়েছিল তার ফলে।…যাই হোক্, মরবার সময় আমাকে দিয়ে সে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল যে তার মেয়েকে আমি যেন কখনও গরিবের ঘরে না দিই। এ কথাটা আমার কাছে অত্যন্ত লজ্জার —আমার সমস্ত ফিলজফীর বিরোধী এটা—কিন্তু তবু আমি তার কথাটাও ঠেলতে পারব না বাবা, বিশেষ ক'রে সে একটা কথা আমাকে মনে করিয়ে দিয়ে গেছে— 'আপনার মেয়েকে আপনি যেখানে খুশি দিয়েছিলেন, আমার মেয়েকে আমি তা দিতে দেবো না।'

মোহিতবাবু এই পর্যন্ত বলিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, বোধ করি কন্যার মৃত্যুশয্যার ছবিটাই চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিয়া তাঁহাকে কিছুক্ষণের জন্য অভিভূত করিয়া দিল।…মিনিট তিন-চার পরে যেন তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠিলেন, আমার কথাটা ঠিক বুঝতে পেরেছো বাবা?

এতক্ষণ পরে ভূপেন কথা কহিল, কিন্তু এ সম্ভাবনা যে একটুও আছে, তাই যে আমার মনে হয় না—

—সম্ভাবনা আছে কিনা জানি নে বাবা, আশঙ্কা আছে। আর সেটা যখন আছে তখন আগে থাকতে সাবধান হওয়া ভাল নয়কি? আজ যেটা অসম্ভব মনে হচ্ছে, কাল যদি সেটা সম্ভব হয়ে পড়ে, তখন ত আর ফেরার পথ থাকবে না!

ভূপেন একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, বেশ, আপনিই তাহ'লে বলুন কি করা উচিত?

মোহিতবাবু বলিলেন, সন্ধ্যা যা পড়াশুনো করেছে তাতে এখন থেকে ও নিজেই পড়তে পারবে বলে মনে হয়—ও বলছিল, পরীক্ষাগুলো একে একে দিয়ে রাখতে চায়—কিন্তু সে ও নিজে নিজেই দিতে পারবে।…তবে একটা কথা, তোমার পরীক্ষাটাও দেওয়া দরকার। তোমার কথা তুমি সবই আমাকে বলেছ, সেই জন্যই সাহস ক'রে একটা অনুরোধ করছি—আর স্নেহেরও একটা অধিকার আছে, তোমার এম-এ পরীক্ষা দেওয়া পর্যন্ত তোমার খরচ আমার কাছ থেকেই নিতে হবে।…তোমার উপর অনেক আশা আমার, মিথ্যা অভিমানের বশে নিজের কোন ক্ষতি ক'রো না, এই অনুরোধ।

মোহিতবাবুর কথা বলার ধরনে প্রথম হইতেই ভূপেন একটা বড় রকমের আশঙ্কা করিতেছিল বটে, তবু আঘাতটার আকস্মিকতা তাহাকে কিছুকালের জন্য যেন জড় অনড় করিয়া দিল। অনেকক্ষণ পরে, প্রাণপণ চেষ্টায় কণ্ঠস্বরকে স্বাভাবিক করিয়া কহিল, কিন্তু সেটা কি সম্ভব? আপনি এ অবস্থায় পড়লে কি এ ভিক্ষা নিতে পারতেন?

মোহিতবাবু মাথা নিচু করিয়া জবাব দিলেন, তুমি খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছ বলে এত বড় কথাটা বললে বাবা, কিন্তু আমার ধারণা ছিল যে, আমাদের ঠিক এতটা দূরত্ব আর নেই। বেশ, তুমি এই টাকাটা ঋণ বলেই নাও, এর পরে তোমার সময়মত শোধ দিও। কিন্তু তোমার ভবিষ্যৎটা মাটি ক'রো না!

শেষের কথাগুলি মোহিতবাবু কতকটা মিনতির সুরেই বলিলেন। ভূপেন ততক্ষণে নিজের রূঢ়তায় নিজেই একটু লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল, খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, সন্ধ্যাকে বলেছেন এ কথা?

মোহিতবাবু ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, না। তাকে পরে বলব। সে আঘাত পাবে নিশ্চয়—কিন্তু আমার উপর তার বিশ্বাস আছে, সে আমাকে ভুল বুঝবে না।

ভূপেন হেঁট হয়ে তাঁহার পায়ের ধুলা লইয়া কহিল, আমাকে মাপ করবেন। এ সমস্ত কথাগুলোই এত আকস্মিক আর অভাবনীয় যে আমি এখন কিছু ঠিক ক'রে ভাবতেই পারছি না।

মোহিতবাবুর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তিনি ভূপেনের মাথায় হাত রাখিয়া কহিলেন, এই ভয়টাই এতদিন আমাকে পীড়া দিচ্ছিল যে তুমি আমাকে ভুল না বোঝো। তুমি এখন বাড়ি যাও, ভাল ক'রে সব ভেবে ছাখোগে! শুধু এইটে মনে রেখো যে, এখন যদি তুমি পড়াশুনো ছেড়ে দাও তাহ'লে আমার আত্মীয়বিয়োগের মতই তা প্রাণে লাগবে।

ভূপেন উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আমি সব কথা আর একবার আগাগোড়া না ভেবে আপনাকে কিছুই বলতে পারছি না।

সে আর অপেক্ষা করিল না। তাহার মানসিক জড়তা এখনও কাটে নাই বলিয়া আঘাতের তীব্রতাটা সে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারে নাই; কিন্তু একটা অপরিসীম দৈহিক দুর্বলতাতে পা দুইটা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। কোনমতে সিঁড়িটা পার হইয়া রাস্তায় পড়িয়া সামনেই যে রিক্সাটা দেখিতে পাইল সেইটাতেই চড়িয়া বসিল। একটা ভয় ছিল, পাছে এই অবস্থাতে সন্ধ্যার সামনে পড়িতে হয়—কোন প্রকারের জবাবদিহি এবং পীড়াপীড়ির কথা তখন সে ভাবিতেই পারিতেছিল না,—কিন্তু দৈবক্রমে সে পরীক্ষায় আর তাহাকে পড়িতে হইল না।

৬

কোন্‌টা যে তাহার বড় আঘাত, সেইটা বুঝিতেই ভূপেনের অনেকক্ষণ সময় লাগিল। আর্থিক ক্ষতিটাও তাহার বর্তমান অবস্থাতে অনেকখানি সন্দেহ নাই এবং হয়ত সেজন্য তাহাকে, এই অসময়েই, ভবিষ্যতের সমস্ত স্বপ্ন রূঢ় ভাবে ভাঙ্গিয়া দিয়া

উন্নতির প্রথম অধ্যায়েই পূর্ণচ্ছেদ টানিতে হইবে। কারণ মোহিতবাবু যত আত্মীয়তার দাবিই করুন, যেটা তিনি দিতে চাহিতেছেন সেটা দয়া ছাড়া আর কিছু নয়, সে দান কোন অবস্থাতে, কোন বিবেচনাতেই গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু তাহার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতি সেই মুহূর্তে তাহার মনে হইতেছিল সন্ধ্যাকে হারানোটা। তাহার এই ছাত্রীটি নিঃশব্দে কখন যে ছাত্রীর পদ হইতে বন্ধুর আসনে চলিয়া আসিয়াছিল তাহা সে বুঝিতেও পারে নাই, কিন্তু তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়াই যে ভূপেন এতদিন নিজেকে বিকশিত করিয়া তুলিতেছিল, এইবার সেটা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়া গেল। মোহিতবাবু যে সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিলেন, সেটা ভূপেনের কাছে অবিশ্বাস্য—সুদূর কল্পনারও অতীত! সন্ধ্যা বালিকা কি কিশোরী, সে কথা লইয়া মাথা ঘামানো দূরে থাক ভূপেন নিজের মনে বার বার শুধু এই কথাটাই অনুপস্থিত মোহিতবাবুকে বুঝাইতে চাহিল—সে পুরুষ কি নারী সেই তথ্যটাই সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছিল যে। সব চেয়ে—সে কেমন দেখিতে, ফর্সা না কালো, সুন্দরী না কুরূপা, এটাও ভূপেন কোনদিন ভাল করিয়া চাহিয়া দেখে নাই। সন্ধ্যা শুধু সন্ধ্যাই—সে তাহার ছাত্রী। তাহার কথা মনে হইলে শুধু তাহার সশ্রদ্ধ, একাগ্র চোখ দুটির কথা, শিক্ষা সম্বন্ধে তাহার অসীম কৌতূহল ও একান্ত নিষ্ঠার কথাই মনে পড়ে। সন্ধ্যা সেই ছাত্রী, যাহার শ্রদ্ধা হারাইবার ভয়ে নিজেকে অনেক যত্নে প্রস্তুত করিতে হয়, রাত জাগিয়া মোটা মোটা বই পড়িতে হয়। যাহার অন্তরের মাধুর্য ও তপস্যা পবিত্র দীপশিখার মত জ্বলিয়া গুরুর অন্তরকে সুদ্ধ দীপ্ত করিয়া তোলে।

ক্ষতির পরিমাণটা উপলব্ধি করিবার সঙ্গে সঙ্গে ভূপেন মোহিতবাবু সম্বন্ধে একটা প্রবল অভিমান ও ক্ষোভ অনুভব করিতে লাগিল। মোহিতবাবুকে সে শ্রদ্ধা ত করিতই, ভালও বাসিত। সেইজন্যই অভিমানটা তাহার এত উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। তাছাড়া, মানুষের যখন স্বার্থে আঘাত লাগে তখন অপর দিকটা সে কিছুতেই বিবেচনা করিতে পারে না! ভূপেনও, মোহিতবাবুর কথার মধ্যে যত যুক্তি যত আন্তরিকতাই থাক, তিনি যে নিতান্ত অকারণে তাহার প্রতি একটা গুরুতর অবিচার করিলেন, এ কথাটা না ভাবিয়া পারিল না।

তবে একটা প্রতিজ্ঞা সে ইতিমধ্যেই মনে মনে করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহার বেদনাবোধের তীব্রতা না কমা পর্যন্ত মোহিতবাবুকে সে কোন উত্তর দিবে না। ...কিন্তু সেটা কমিতেও অনেকখানি সময় লাগিল। সে-রাত্রে ত সে ঘুমাইতে পারিলই না, পরের দিনও সমস্ত সকালটা পাগলের মত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইল। মনে মনে কেমন একটা অপরিসীম শূন্যতা অনুভব করিতে লাগিল

সে—কি যেন তাহার হারাইয়া গেছে, মূল্যবান কিছু, যা আর কোনদিন ফিরিয়া পাইবে না। অনেকক্ষণ, প্রায় বারটা পর্যন্ত এইভাবে ঘুরিয়া আসিয়া অবশেষে যখন জোর করিয়া সে স্নানাহার সারিয়া পড়ার টেবিলের কাছে বসিল তখন সে অনেকটা শান্ত হইয়া আসিয়াছে—বরং নিজের এই অপরিসীম চিত্ত-ক্ষোভের জন্য নিজের কাছেই যেন সে একটু লজ্জিত।

মোহিতবাবু তাহাকে অবশ্য একেবারে বাড়ি যাইতে নিষেধ করেন নাই, আজ হইতেই যে পড়ানো বন্ধ করিতে হইবে এমন কথাও বলেন নাই, তবু আর ও-বাড়ি যাওয়া যায় না। মোহিতবাবুকে যাহা বলিবার চিঠি দিয়াই জানাইতে হইবে। সন্ধ্যা হয়ত তাহাকে আশা করিবে, কিন্তু আজ সেখানে গেলে তাহার সহিত দেখা করিয়া বিদায় লইয়া আসিতে হয়, অথচ কী-ই বা বলিবে তাহাকে! আর মোহিত-বাবু যে আশঙ্কা করিতেছেন যদি আলোচনা-প্রসঙ্গে সে কথার আভাসমাত্র সন্ধ্যার কাছে প্রকাশ পায় ত সে লজ্জায় মরিয়া যাইবে। তাছাড়া, কোনরূপ নাটকীয় বিদায় লইবার সম্পর্ক ত তাহাদের নয়—কোন পক্ষেই কিছু বলিবার নাই। ক্ষতি যেটুকু সেটুকু একান্ত অন্তরের, তাহা মনেই থাক।

সে প্যাড ও কলম লইয়া মোহিতবাবুকে চিঠি লিখিতে বসিল। 'শ্রীচরণেষু' পাঠ পর্যন্ত লিখিয়া অনেকক্ষণ স্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিল। চিঠিতে কোন দুঃখ, কোন আবেগ না প্রকাশ পায়। অথচ যে ভাষা প্রথমেই বাহির হইয়া আসিতে চায়, তাহা সবই অভিমানের। অতি কষ্টে, কঠোর শাসনে মনকে সংযত করিয়া সে লিখিল—
শ্রীচরণেষু—

বাড়িতে আসিয়া আপনার কথাগুলি ভাল করিয়াই ভাবিয়া দেখিলাম। আপনি যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে আপনার আন্তরিক স্নেহ এবং মহত্ত্বই প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু স্নেহ স্নেহই—সেটা যখন আর্থিক মূল্যে পরিণত হয়, তখন সেটাকে আমরা দান বলিয়া মনে না করিয়া পারি না এবং সে দান গ্রহণ করিলে আপনার চোখে আমি খানিকটা ছোট হইয়া যাইবই—অন্তত আমার তাই বিশ্বাস। সুতরাং আপনার স্নেহ যদি আজ মাথা পাতিয়া না লইতে পারি ত তাহাকে অকৃতজ্ঞতা বা স্পর্ধা বলিয়া মনে করিবেন না। বরং আপনি আশীর্বাদ করুন, আমি যেন সর্বতোভাবে আপনার স্নেহের উপযুক্ত হইয়া উঠিতে পারি। আমার মনে হয়, আমি যদি নিজের চেষ্টাতেই নিজের ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিতে পারি, তবেই আপনাদের স্নেহ ও আশীর্বাদের মর্যাদা থাকিবে। আপনি ক্ষুণ্ণ হইবেন না—আপনার কাছে আমার প্রতিজ্ঞা রহিল—যে এম-এ পাস করা পর্যন্ত আপনি আমাকে আর্থিক সাহায্য করিতে চাহিয়াছিলেন সে এম-এ পরীক্ষা আমি দিবই।

তাহার জন্য যদি কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করিতে হয় তাহাও করিব।

কাল যে কথা-বার্তা হইয়াছে তাহার পর আর আপনার বাড়ি যাওয়া বাঞ্ছনীয় কিনা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া ডাকেই চিঠি দিলাম। এই সঙ্গে সন্ধ্যাকে একখানি চিঠি দিলাম, যদি বাধা না থাকে, তাহাকে দিবেন। প্রণাম লইবেন। ইতি—

প্রণত ভূপেন্দ্র

সন্ধ্যাকে চিঠি লিখিল সে তিন ছত্র—

কল্যাণীয়াসু—

কোন কারণে তোমাকে পড়াতে যাওয়া আর আমার পক্ষে সম্ভব হ'ল না। কারণটা দাদুর কাছ থেকেই শুনো। মন দিয়ে পড়াশুনো ক'রো—আর কারুর সাহায্য লাগবে বলে মনে হয় না। আমি যেখানেই থাকি, আমার আশীর্বাদ ও কল্যাণ-কামনা তোমাকে নিরন্তর ঘিরে থাকবে। ইতি—

মাস্টারমশাই

চিঠিখানা খামে মুড়িবার আগে, 'কারণটা দাদুর কাছ থেকেই শুনো' লাইনটা কাটিয়া দিল। থাক—সন্ধ্যা যদি তাহাকে অকৃতজ্ঞ, স্নেহহীন ভাবে সে-ও ভাল, তবু কোন কদর্য সংশয়ের কালি তাহাকে যেন স্পর্শ না করে।

চিঠি সে নিজেই ডাকে দিয়া আসিল।

মুক্তি!

যত বেদনাদায়কই হোক্—মুক্তির একটা আনন্দ আছেই। চিঠি ডাকে দিয়া কতকটা সেই আনন্দেই ভূপেন যেন নিজেকে অনেকখানি হাল্‌কা বোধ করিল। সে উদ্দেশ্যহীন ভাবে কলিকাতার পথে ঘুরিতে ঘুরিতে নিজের মনকে প্রবোধ দিতে লাগিল, যাক্—বাঁচিলাম! কাল হইতে যে অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ মনকে ভারী করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার হাত হইতে ত অন্তত অব্যাহতি পাইলাম। তা ছাড়া কৃতজ্ঞতা ও স্নেহের সহিত কর্তব্য মিশিয়া ক্রমশই ওখানে একটা বন্ধন দৃঢ় হইতেছিল, সেটার হাত হইতেও অব্যাহতি পাইলাম। ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য। এ এক রকম ভালই হইল।

কিন্তু খানিকটা ঘুরিবার পরই কেমন একটা অবসাদে পা দুইটা ভাঙ্গিয়া আসিতে লাগিল। বাড়ি ফিরিতে ইচ্ছা করে না কিন্তু পথে থাকা আরও অসম্ভব। কোথায় যেন কি একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, কি যেন এক শোচনীয় দুর্ভাগ্যের ইঙ্গিত চারিদিকের আবহাওয়ায়।...অবশেষে কতকটা নিজের উপর বিরক্ত হইয়াই বাড়ি ফিরিল।

বাড়ি ঢুকিতেই প্রথম দেখা হইল অবিনাশবাবুর সঙ্গে। কানে একটা আধ-

পোড়া বিড়ি এবং হাতে পানের বোঁটায় চুন—ব্যস্তভাবে কোথায় যাইতেছিলেন, ভূপেনকে দেখিয়াই কালো দাঁতগুলি বাহির করিয়া কহিলেন, কি বাবাজী, এমন সন্ধ্যের সময় বাড়ি ফিরলে যে! তোমার সেই টিউশনি নেই? বড়লোকের মেয়ে, গেঁথেছ মন্দ নয়—এখন খেলিয়ে তুলতে পারলে হয়!

সাধারণতঃ অবিনাশবাবুর কথায় কান দিত না ভূপেন, লোকটির কথার ভঙ্গিতে সর্বদা এমন একটা নোংরামির ইঙ্গিত থাকে যে তাঁহাকে দেখিলেই তাহার গা ঘিন্ ঘিন্ করিত। কিন্তু সেদিন পাশ কাটাইতে গিয়াও তাহার মনে পড়িয়া গেল যে এই লোকটির হাতে ছোটখাটো বিস্তর টিউশনি থাকে—সে কোনমতে ঢোঁক গিলিয়া বলিয়া ফেলিল, সে টিউশনি ছেড়ে দিয়েছি—আমাকে—আমাকে আর একটা দেখে দিতে পারেন?

খানিকটা তাহার মুখের পানে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকিবার পর অত্যন্ত অর্থ-পূর্ণ একটা হাসিতে অবিনাশবাবুর মুখ রঞ্জিত হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, ছেড়েছ না ছাড়িয়েছে? ও আমি আগেই জানতুম বাবাজী, বাঙালীর ছেলে মেয়েমানুষ দেখেছে কি অমনি এমন বাড়াবাড়ি শুরু ক'রে দেয়···যাক, দুঃখ ক'রো না, ও অমন হয়েই থাকে। মোদ্দা, এত দিন রাজত্ব ক'রে এসে এখন কি আমাদের এই আট-দশ টাকার টিউশনি করতে পারবে?

অবিনাশবাবু যতটা বলিলেন তাহার চেয়ে ঢের বেশী কদর্যতা প্রকাশ পাইল তাঁহার মুখভঙ্গীতে। সেদিকে চাহিয়া রাগে ভূপেনের সর্বদেহ জ্বলিয়া গেল, সে তাঁহার কথার উত্তর না দিয়াই উপরে উঠিতে শুরু করিল। কিন্তু অপরের সৌজন্যের অভাবে উৎসাহ কমিবে অবিনাশবাবু তেমন লোক নন—উপরে পৌঁছিয়াও ভূপেনের কানে গেল অবিনাশবাবু বাঙালীর ছেলের নৈতিক চরিত্রের উপর বক্তৃতা করিতেছেন।

ঝোঁকের মাথায় কথাটা তাঁহাকে বলার জন্য ভূপেনের অনুতাপের সীমা রহিল না। সবচেয়ে বেশী ভয় তাহার বাবাকে, অবিনাশবাবু প্রথমেই তাঁহাকে সংবাদটা দিবেন। এবং টীকা-ভাষ্য সমেত দিবেন। অথচ আবার সেই অবিনাশবাবুর আট টাকার টিউশনি করা কি সত্যই সম্ভব? ভূপেন আপন মনেই মাথা নাড়িল, না, আর তা সম্ভব নয়।

সে যখন উপরে আসিল তখন মা রান্নাঘরে বিষম ব্যস্ত; কেন সে আজ পড়াইতে গেল না, সে কৈফিয়ত চাহিবার সময় সেটা নয়। আপাতত জবাবদিহির হাত হইতে রক্ষা পাইয়া সে একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল। এটি তাহার নিজস্ব ঘর, মোহিতবাবুর কৃপায় এত বড় বিলাসও তাহার

সম্ভব হইয়াছিল, কিন্তু এখন—

একটু পরেই বাবা ফিরিলেন। অফিস হইতে ফিরিবার সময় প্রত্যহই বাজার হইয়া আসেন—আজও সেই পু্ঁটলিটি হাতে ছিল কিন্তু আজ সোজা রান্নাঘরে না গিয়া তিনি পুঁটলি সমেত এ ঘরেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, হাঁ রে, তোর টিউশনিটা নাকি গেছে?

অর্থাৎ অবিনাশবাবু ইতিমধ্যেই তাঁহার কাজ সারিয়াছেন। বাবার প্রশ্ন করিবার ধরনে ভূপেনের সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল, তবু কোনমতে আত্মসম্বরণ করিয়া কহিল, হ্যাঁ, আমি ছেড়ে দিয়েছি।

—বেশ করেছ! কণ্ঠে তাঁহার বিরক্তি আর চাপা রহিল না।—আজকালের বাজারে অমন একটা টিউশনি পাওয়া কি সোজা কথা! এখন খরচ চলবে কিসে শুনি?

এতক্ষণের সঞ্চিত সমস্ত ক্ষোভ এখন বাবার উপরই গিয়া পড়িল, সে তিক্ত কণ্ঠে কহিল, সে ভাবনায় আপনার দরকার কি বাবা, এ টিউশনি কি আপনি যোগাড় ক'রে দিয়েছিলেন?

উত্তরটাতে দমিয়া গেলেও উপেনবাবু হাল ছাড়িলেন না, গলার স্বর যতটা সম্ভব আহত শোনাইবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, একসঙ্গে থাকতে গেলেই দুটো একটা কথা কইতে হয়, তা ছেলের মেজাজ দেখ না! তবু যদি চার চালের ভার নিতে। সংসার করতে হয় না বলেই অত মেজাজ রাখতে পেরেছ, সংসারের ভার ঘাড়ে পড়লে বুঝতে!...ঐ মেজাজের জন্যই ত সব গেল—টিউশনি হ'ল চাকর-মনিব সম্পর্ক, চাকরি যেখানে করতে হবে—সেখানে কি মান-অভিমান রাখতে গেলে চলে, মন যুগিয়ে চলতেই হবে! ঐ যে কথায় বলে না—

ভূপেন বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িয়া আবার জামাটা টানিয়া লইল। উপেন-বাবুকে সে ভাল করিয়াই চিনিত, তিনি এখন সহজে থামিবেন না। অথচ তাহার বর্তমান মানসিক অবস্থায় ধৈর্য রাখাও কঠিন। সে জুতা পরিতেছে দেখিয়া উপেনবাবু রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াইলেন, কিন্তু বক্তৃতা তখনও তাঁহার থামে নাই, তিনি চলিতে চলিতেই বাড়িসুদ্ধ লোককে শুনাইয়া বলিতে লাগিলেন, ঐ জন্যেই তখন বলেছিলুম যে, বি-এ পাস করলি, এইবার চাকরিতে ঢুকে পড়্। তখনও গস্ সাহেব ছিল, অনায়াসে ঢোকানো যেত—চাই কি এতদিনে এক বছর হয়ে গিয়ে একটা ইন্‌ক্রিমেণ্ট পেতিস। সেই চাকরিই যখন করতে হবে, তখন মিছি-মিছি এম-এ পাস ক'রে সময় নষ্ট করবার কি দরকার বুঝি নে—

ভূপেন দ্রুতগতিতে সিঁড়ি কটা পার হইয়া রাস্তায় পড়িয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া

বাঁচিল। কিন্তু বাবার শেষ কথাগুলা তখনও তাহার কানে বাজিতেছিল, তাহাদের জ্বালা হইতে সে অত সহজে অব্যাহতি পাইল না। 'চাকরিই যখন করতে হবে' —সত্যই ত, আর কি আশা তাহার আছে? এম-এ পাস করিয়াই বা কি তাহার হাত-পা গজাইবে, কোন্ পথ তাহার সামনে খোলা পাইবে সে! এত দিন বড়লোকের সহিত ঘনিষ্ঠতা করার ফলেই এই অনিষ্টটি হইয়াছে তাহার, নিজের অবস্থার কথা যেন ভুলিয়াই গিয়াছে। কোথা দিয়া কি করিয়া যেন ইদানীং তাহার একটা ধারণা হইয়া গিয়াছিল যে, এম-এ পাস করিবার পরও শিক্ষার পথ তাহার কাছে বন্ধ হইয়া যাইবে না, সাধনা চলিবে অব্যাহত গতিতে। ...হায় রে!

ভুপেনের হাসি পাইল। কত আশা তাহার!...গরীব হইয়া নিজের অবস্থার কথা ভুলিয়া যাওয়ার মত অপরাধ আর নাই।...না, মোহ যখন তাহার ঘুচিয়াছেই, তখন আর বৃথা আশার পিছনে দৌড়াইয়া সময় নষ্ট করিবে না। ভুপেন যেন একবার নিজেকে একটু নাড়া দিয়া প্রকৃতিস্থ করিবার চেষ্টা করিল—এম-এ পড়া থাক, চাকরির চেষ্টা দেখাই ভাল।

সে ঘুরিতে ঘুরিতে হেদোতে আসিয়া অবসন্ন ভাবে একটা বেঞ্চিতে বসিয়া পড়িল। চাকরি করাই উচিত, কিন্তু তবু—সে আজই মোহিতবাবুকে কথা দিয়াছে যে সে এম-এ পাস করিবেই। তাছাড়া সন্ধ্যা—সন্ধ্যা বড় দুঃখ পাইবে! সে লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়াছে শুনিলে তাহার দৃষ্টিতে যে বেদনা ফুটিয়া উঠিবে, কল্পনায় তাহার আভাসমাত্র পাইয়াই ভুপেন অস্থির হইয়া উঠিল। অথচ উপায়ই বা কি, বাবার যা আয় তাহাতে সংসারই চলে না, পড়ার খরচ সেখান হইতে আশা করা বৃথা। টিউশনি করিবে? ইতিপূর্বেকার ছোট ছোট টিউশনির যে তীব্র অভিজ্ঞতা ভুপেনের ছিল, মানসচক্ষে তাহার ছবিটা মনে করিবার চেষ্টা করিতেই সে শিহরিয়া উঠিল। না, তখন যাহা সম্ভব ছিল এখন আর তাহা নাই। গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক সম্বন্ধে সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গীই তাহার বদলাইয়া গিয়াছে—সে অপমান, শিক্ষার সে অমর্যাদা আর সহিতে পারিবে না।

কিন্তু চাকরিই বা কোথায়? কি কাজ পাইবে সে? বাবার সেই সওদাগরী অফিসে হয়ত এখনও একটা কেরানীগিরি মিলিতে পারে—হয়ত বাবা চেষ্টা করিলে সেটা যোগাড় করা এমন কিছু কঠিন হইবে না। কিন্তু এই জন্যই কি সে এত লেখাপড়া শিখিল? বছরের পর বছর সেই একই চেয়ারে বসিয়া ঘাড় গুঁজিয়া কাজ করিয়া যাওয়া, এবং বয়স ও সম্পর্ক-নির্বিশেষে অশ্লীল রসিকতা করা? পঁয়তাল্লিশ টাকা হইতে শুরু, মরিবার বয়সে একশ পনের টাকায় অব্যাহতি, সব ক্ষেত্রে তাও নয়। এই ত সে চাকরির মূল্য!

ভূপেন আর একবার শিহরিয়া উঠিল। তার চেয়ে আত্মহত্যা করা ভাল। মনে পড়িল সন্ধ্যার কথা, তাহার ইচ্ছা ছিল—ভূপেন অধ্যাপকের কাজ করে। দার্জিলিং-এর সেই নিভৃত বেঞ্চিতে বসিয়া বলা কথাগুলো যেন আজও কানে বাজিতেছিল, 'আপনি আর কিছু করছেন, এ আমি ভাবতেই পারি না!'

হতাশা ও ক্ষোভে ভূপেনের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল; অধ্যাপকের পদ পাওয়ার কল্পনা পর্যন্ত তাহার কাছে হাস্যকর। প্রথমত এম-এ পাস করার সমস্যা, দ্বিতীয়ত শুধু এম-এ পাস করিয়া প্রোফেসারী করিতে ঢুকিবার আগে অনেকগুলি মুরুব্বির প্রয়োজন হয়। সে মুরুব্বি তাহার নাই। না, ও-সব কথা ভুলিয়া যাওয়াই ভাল।

ভূপেন জোর করিয়া উঠিয়া পড়িল। গরীব কেরানীর ছেলে সে—স্বপ্ন দেখার সময় নাই।…কিন্তু সে আজই মোহিতবাবুকে সদম্ভে চিঠি দিয়াছে, তাঁহার সাহায্য ছাড়াও সে এম-এ পরীক্ষা দিবে, সে কি এতই ভুয়া, একান্ত অন্তঃসারশূন্য?… একটা উপায় আছে প্রাইভেটে দেওয়া—কিন্তু সওদাগরী অফিসের চাকরির সহিত শিক্ষার সাধনা—এ কি সম্ভব!…তা ছাড়া, অধ্যাপনা ও অধ্যয়ন ছাড়া আর কিছু করিতেছে, এ কথা আজ যেন সেও ভাবিতে পারে না।…টিউশনি ছাড়া অন্য কোন রকমে শিক্ষায়তনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকা যায় না।

অকস্মাৎ তাহার চোখ দুটি জ্বলিয়া উঠিল। ঠিক ত—ইস্কুল মাস্টারী ত সে অনায়াসে করিতে পারে। তাহার অনার্স-এর এটুকু মূল্যও কি মিলিবে না? বাংলা দেশের ইস্কুল-মাস্টারীর বেতন সামান্য—কিন্তু তাহাতে তাহার নিজের খরচা ত চলিবে!…তা ছাড়া সেক্ষেত্রে এম-এ পরীক্ষা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে, অবসর বেশী, পড়াশুনার সময় পাওয়া যায়। তাতেও যদি সে নিজের উন্নতি করিতে না পারে ত সেটা তাহার নিজেরই অক্ষমতা।

ভূপেন বাড়ি ফিরিতে ফিরিতে মন স্থির করিয়া ফেলিল—ইস্কুল মাস্টারীর চেষ্টাই দেখিবে সে, 'তাই হোক সন্ধ্যা—তোমার চোখে আমি কিছুতেই ছোট হবো না!'

৭

পরের দিন সকালবেলাই সে পাড়ার লাইব্রেরীতে গিয়া ইংরেজী বাংলা সংবাদ-পত্রগুলির কর্মখালির পৃষ্ঠা খুলিয়া বসিল। ইস্কুল মাস্টারী খালি হওয়ার সময় সেটা নয়, সুতরাং বিজ্ঞাপন অল্পই থাকে। তবু সব কয়টা কাগজ খুঁজিয়া দশ-বারোটা বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করিল। এমনি ভাবে প্রত্যহ ঘণ্টা-দুই বিজ্ঞাপন ঘাঁটিয়া তিন দিনে প্রায় গোটা-চল্লিশেক দরখাস্ত ছাড়িয়া সে কতকটা সুস্থ হইল।

বলা বাহুল্য, ইহার সব কয়টিই মফস্বলের ইস্কুল! কলিকাতার কোন ইস্কুলের বিজ্ঞাপন চোখে পড়িল না, পড়িলেও সে দরখাস্ত করিত না—কারণ, কলিকাতা সে ছাড়িতেই চায়! ছিল দুটো একটা শহরতলীর ইস্কুল, কিন্তু সেও সেই এক কথা। সেখানে মাস্টারী করিলে বাড়ি ছাড়ার কোন অজুহাত থাকিবে না, মিছামিছি ট্রামে-বাসে কতকগুলি বাড়তি পয়সা ও সময় নষ্ট হইবে।

না, কলিকাতায় থাকা তার পক্ষে এখন সম্ভব নয়। এখানে সময় নষ্ট হইবার অজস্র ফাঁদ পাতা আছে চারিদিকে, চাকরি করিয়া নিজের পড়াশুনা করা প্রায় দুঃসাধ্য। তাহার উপর বাড়ির আব্‌হাওয়াও তাহার বর্তমান মানসিক অবস্থায় অসহ্য। ইস্কুল-কলেজ ছাড়া পড়িবার কথা তাহারা চিন্তা করিতে পারে না, সুতরাং এখন তাহার পড়াশুনার সময় যেটুকু সমীহ করে, তখন সেটুকু থাকিবে না। তাহার উপর এই স্কুল-মাস্টারীতে তাহার বাবা যে ঘোরতর আপত্তি করিবেন, এ বিষয়ে ভূপেনের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না—প্রতিদিনই কানের কাছে শোনাইবেন যে, চাকরি যদি করিতেই হয় ত সাহেবের চাকরিই করা উচিত। তাঁহার কথা অমান্য করিয়া সে যে বড়লোকের ভরসায় এম-এ পড়িতে গিয়াছিল, সে অপরাধ তিনি কোন দিনই ক্ষমা করেন নাই—সুযোগ পাইয়া নিষ্ঠুর বিদ্রূপে এই কয় দিনেই তাহাকে জর্জরিত করিয়া তুলিয়াছেন। এখন তবু অনেকটা সময় সে বাহিরে বাহিরে কাটাইয়া আসে কিন্তু বারো মাস ত আর সেটা সম্ভব নয়, আর তাহা হইলে পড়াশুনাই বা সে করিবে কখন? তার চেয়ে যত দূর পল্লীগ্রামে চলিয়া যাইতে পারে ততই ভাল। এখানকার এই সব হৃদয়হীন বিরক্তিকর আক্রমণ সেখানে পৌঁছিবে না—বড় জোর কয়েকদিন অন্তর দু-একটা চিঠি সেটা তত অসহ্য হইবে না।

দরখাস্ত পাঠাইয়া সে যেন প্রতিটি মুহূর্ত গণিতে লাগিল। চাকরির দরখাস্তের কি ফল হয় তাহা অনেকের মুখেই শুনিয়াছে, তবে এক্ষেত্রে ভরসা এই যে, মফস্বলের ইস্কুল-মাস্টারী নিতান্ত নিরুপায় না হইলে কেহ করিতে চায় না। চল্লিশ বিয়াল্লিশটা দরখাস্তের মধ্যে একটা অন্তত কোথাও লাগিয়া যাইবে—এ ভরসা তাহার ছিল। দিন যেন আর কাটে না, ইউনিভারসিটি যাওয়া সে ছাড়িয়া দিয়াছে; এম-এ পড়া যখন কিছুতেই সম্ভব হইবে না তখন শুধু মায়া বাড়াইয়া লাভ কি? কি-ই বা বলিবে সে সহপাঠীদের? তাহাদের সেই নিশ্চিন্ত কল-কোলাহলের মধ্যে তাহার আশাভঙ্গের বেদনা অধিকতর আঘাত পাইবে; এই মাত্র। ও সংস্রব ত্যাগ করাই ভাল। দুই-একটি বন্ধু হয়ত খুঁজিবে, হয়ত তাহার এই আকস্মিক অন্তর্ধানে বিস্ময় প্রকাশ করিবে, তাহার পর একেবারে ভুলিয়া

যাইবে—তাহার পরিণতি বা পরিণাম লইয়া কেহই বেশী মাথা ঘামাইবে না।... সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, আবার যদি কোন দিন ওদের যোগ্য হয়ে এসে দাঁড়াতে পারি তবেই দেখা দেব, নইলে এই ভাল। বড় জোর ভাববে আমি বকে গেছি কিংবা মরেই গেছি।

দীর্ঘ দিন এবং দীর্ঘ রাত্রি। সকালবেলাটা কাটে লাইব্রেরীতে, বাবা অফিসে চলিয়া গেলে বাড়ি ফেরে—তাহার পর লম্বা দিবা-নিদ্রা দিয়া আবার সন্ধ্যার পূর্বেই বাহির হইয়া পড়ে, রাত্রি গভীর হইবার আগে আর বাড়ি আসে না! কিন্তু সে-ও বিপদ কম নয়, কলেজ স্কোয়ার, ইডেন গার্ডেন প্রভৃতি পরিচিত ও প্রিয় জায়গাগুলি তাহাকে এড়াইয়া চলিতে হয়, পাছে কোন চেনা লোক বা সহপাঠীর সঙ্গে দেখা হয়। অপেক্ষাকৃত নির্জন এবং দূর কোন একটা পার্কে চুপ করিয়া বসিয়াই বেশীর ভাগ সময় কাটায় সে। এ নিষ্ক্রিয়তা তাহার অসহ্য লাগে, অথচ কোন উপায়ও খুঁজিয়া পায় না।

সন্ধ্যার কথা তাহার প্রতি মুহূর্তেই মনে পড়ে। মনে হয় সে তাহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন হইবার আগে যদি এমন কোন দুর্ভাগ্যের মধ্যে পড়িত, তাহা হইলে বোধ হয় এতটা দুঃখ ভোগ করিতে হইত না—তাহার কাছে সান্ত্বনা মিলিত অতি সহজে। শুধু তাহার সাহচর্যই ত একটা মস্ত সান্ত্বনা। এই মুহূর্তে সে যদি সন্ধ্যার কাছে বসিয়া আবার আগেকার মত সাহিত্য বা অন্য লেখা-পড়ার কথা আলোচনা করিতে পাইত, তাহা হইলেই এই সমস্ত বেদনা, সমস্ত গ্লানির আর চিহ্নমাত্র থাকিত না তাহার মনে।

একটা কথা তাহার মনে হয় সব চেয়ে বেশী—একটা কৌতূহল। আচ্ছা, সন্ধ্যাও কি তাহার অভাব অনুভব করে? প্রশ্ন জাগে বার বার—বার বারই সে নিজের অন্তরের মধ্যে উত্তর খুঁজিয়া পায়। সন্ধ্যার সেই সশ্রদ্ধ জ্ঞানপিপাসু চোখ দুইটি—ভূপেনের সম্বন্ধে শ্রদ্ধা, উদ্বেগ এবং প্রীতি যেন সে দুইটি চোখে ভরিয়া থাকিত। না, সে এত সহজে ভূপেনকে ভুলিয়া যাইবে না। সেই আশ্বাস-বাক্যটিই তাহার এই অপরিসীম নৈরাশ্যের মধ্যে যেন তাহাকে বাঁচিবার পাথেয় যোগায়।

তৃতীয় দিন ডাকে দুইখানি চিঠি আসিয়া পৌছিল। দুটি হস্তাক্ষরই তাহার পরিচিত। একটি সন্ধ্যার, আর একটি মোহিতবাবুর।

প্রথমেই সে সন্ধ্যার চিঠিটা খুলিল। সে লিখিয়াছে—

শ্রীচরণেষু,—

আপনার চিঠি পেলাম দাদুর হাতে। কেন যে আপনি সহসা আমাদের ত্যাগ

করলেন তা বুঝতে পারলাম না। সেদিন দাদুর সঙ্গে কথা কইবার পর সেই যে আপনি চলে গেলেন আর এলেন না, তাতে শুধু এইটে অনুমান করতে পেরেছিলাম যে, সেই আলোচনার সঙ্গেই আপনার অনুপস্থিতির যোগাযোগ আছে। আজ দাদু আপনার চিঠিখানা আমার হাতে দিয়ে বললেন, গিন্নিভাই, দোষ আমারই—ভূপেন খুব আঘাত পেয়েছে, কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো আমার অন্য উপায় ছিল না!—কি কারণ, কেন আপনি আঘাত পেলেন তা জানি না, জানবার অধিকারও হয়ত আমার নেই। তবে দাদু যে কখনও কারুর প্রতি অন্যায় ব্যবহার করবেন না, এটা আমি জানি। অথচ আপনাকেও জানি, আপনিও অকারণে অভিমান করবেন কেন? এ সমস্যা আমার সাধ্যাতীত - তা নিয়ে মাথাও ঘামাবো না। কারণ যা-ই হোক—আপনাকে হারাতে হ'ল এইটাই আমার কাছে বড় কথা। আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কোন দিনই ঘুচে যাবার নয়—যেটুকু আজ জেনেছি, শিখেছি তা আপনারই জন্যে, এটা আপনিও কোন দিন ভুলতে পারবেন না; আর এইজন্যেই আমার ভরসা আছে যে আমার প্রতি আপনার স্নেহও কোন দিন যাবে না। যেখানেই থাকুন—আমি জানি আপনার স্নেহ ও আশীর্বাদ আমি পাবো। আপনি যখন খুব বড় হবেন, খুব বড় পণ্ডিত বলে দেশবিদেশে আপনার খ্যাতি যখন ছড়িয়ে পড়বে—তখন আর সব কথা ভুলে যান ক্ষতি নেই, শুধু এইটে মনে রাখবেন যে সেদিন আর কেউ-ই আমার চেয়ে বেশী খুশী হবে না। আপনার সম্বন্ধে আমার অনেক আশা মাস্টারমশাই, আমার সে আশা পূর্ণ হবে তাও আমি জানি।

আপনি দেখা আর না দিতে চান দেবেন না, কিন্তু চিঠি দেবেন ত?

আমার শত কোটি প্রণাম নেবেন। ইতি—

আপনার সন্ধ্যা

চিঠিখানা পড়িতে পড়িতে ভূপেনের দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া আসিল। সে নিজের মনকে বার বার এই বলিয়া সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিল যে,আর তাহার কোন দুঃখ নাই, অন্তর ভরিয়া গিয়াছে, সন্ধ্যার এই শ্রদ্ধা এবং প্রীতিটুকুই তাহার সমস্ত বেদনাকে নিঃশেষে মুছিয়া লইয়াছে; কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত একটা অপরিসীম ক্ষতিবোধই মনের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিয়া তাহার চক্ষুকে সজল করিয়া তুলিল।

মোহিতবাবু লিখিয়াছেন—

কল্যাণীয়বরেষু—

তোমার চিঠি পড়িয়া, তুমি যে আমাকে ভুল বুঝিয়াছ সেজন্য যেমন দুঃখিত হইলাম, তেমনি আমি যে তোমাকে ভুল বুঝি নাই এজন্য একটু গর্ব বোধ না

করিয়াও পারিলাম না। তুমি যে আত্মসম্মান-বোধের পরিচয় দিয়াছ তাহা তোমারই উপযুক্ত হইয়াছে এবং এখন আর স্বীকার করিতে বাধা নাই, আমি তাহা তোমার কাছে আশাই করিয়াছিলাম। আশীর্বাদ করি, তুমি জয়ী হও, যশস্বী হও—তোমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হউক। তবে একটা অনুরোধ, যদি কখনও ঋণ করিবার প্রয়োজন হয় তখন অন্তত যেন এই বৃদ্ধের কথা আগে মনে পড়ে। আর্থিক সাহায্য ছাড়াও অন্য কোন সাহায্যের প্রয়োজন হইতে পারে, তখন আমাকে ক্ষমা করিবার চেষ্টা করিও, তখন যদি অভিমান করিয়া দূরে রাখো তাহা হইলে ক্ষুণ্ণ হইব। মধ্যে মধ্যে পত্র দিও। ইতি—

আশীর্বাদক—তোমার দাদু

চিঠিখানা বার-দুই পড়িবার পর পুনরায় খামে মুড়িয়া রাখিয়া ভূপেন স্থির হইয়া বসিল। হয়ত সে মোহিতবাবুকে ভুলই বুঝিয়াছে কিন্তু তাঁহার দান প্রত্যাখ্যান করিয়া ভুল যে করে নাই, তাহারও নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল।... এই পরিবারটির প্রীতি, শ্রদ্ধা এবং—যে স্নেহ স্নেহাস্পদের সম্বন্ধে অনেক আশা পোষণ করে—সেই সত্যকার স্নেহের পরিচয় সে বার বার পাইয়াছে, আজও একবার পাইল। বোধ হয় এই জন্যই ক্ষতিবোধ তাহার এত প্রবল, এই জন্যই তাহার বেদনার পরিমাণ এত বেশী। তবু এইটিই তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয় হইয়া রহিল, জীবন-যুদ্ধের রহিল প্রধান অস্ত্র।

সন্ধ্যার খোলা চিঠিখানা চোখের সামনে মেলিয়া ধরিয়া আর একবার সে মনে মনে বলিয়া উঠিল, তাই হবে সন্ধ্যা, আমি তোমার জন্যই বড় হবো। নিশ্চয়ই বড় হবো, তুমি দেখে নিও।...

দিন পাঁচ-ছয় প্রতীক্ষা করার পর যখন চিত্ত তাহার ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছে, যখন হতাশ হইবার আর খুব বেশী দেরি নাই, তখন হঠাৎ একদিন সকালে খান-দুই চিঠি আসিয়া পৌঁছিল। একটি আসিয়াছে কোন্ এম-ই বা মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে—ইহারা বিজ্ঞাপনে মাহিনার কথা জানান নাই, এখন তাহাকে ঐ পদে বহাল করিয়া জানাইয়াছেন যে, আপাতত কুড়ি টাকার বেশী বেতন দিতে পারিবেন না। আর একটি—বীরভূম জেলার এক গ্রাম্য হাই স্কুল হইতে আসিয়াছে, তাহার নিয়োগপত্রে লেখা আছে মাসিক পঞ্চান্ন টাকা বেতনে তাহাকে চতুর্থ শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করা হইল; কিন্তু সেই খামের মধ্যেই এক-ব্যক্তিগত চিঠিতে হেডমাস্টার মহাশয় জানাইয়াছেন যে, খাতায় কলমে পঞ্চান্ন টাকা থাকিলেও আসল মাহিনা তাহার তেতাল্লিশ টাকা আট আনা, সে যেন কোনরূপ ভুল বুঝিয়া না আসে। এখানে প্রাইভেট টিউশনিরও কোন সম্ভাবনা নাই—

অপেক্ষাকৃত যাহাদের অবস্থা ভাল তাহাদের লইয়া একটা কোচিং ক্লাস মত আছে, কিন্তু সে-সবই পুরাতন শিক্ষকরা দখল করিয়া আছেন। সে যদি হোস্টেলেই থাকিতে চায় তাহা হইলে মাসিক চার টাকা খরচ পড়িবে থাকা এবং খাওয়ার। ইত্যাদি—

এদেশে মাস্টারীর মাহিনা খুবই কম—এ কথাটা আরও অনেকের মুখে ভূপেন শুনিয়াছিল; সুতরাং তেতাল্লিশ টাকা আট আনাতে সে ভয় পাইল না। বরং সে হয়ত আরও কমই আশা করিয়াছিল। কিন্তু হোস্টেল চার্জ-এর পরিমাণ দেখিয়া সে বিস্মিত না হইয়া পারিল না। চার টাকায় খাওয়া ও থাকা? সে কেমন দেশ!

সেই দিনই সে সেক্রেটারীর নামে ইংরেজীতে একখানি এবং হেডমাস্টার মহাশয়ের নামে বাংলায় একখানা চিঠি লিখিয়া ছাড়িয়া দিল। দুজনকেই জানাইল দিন-আষ্টেকের মধ্যে সে ওখানে পৌছিবে।

বাড়িতে এতদিন সে কিছুই বলে নাই। কথাটা শুনিলেই একটা চেঁচামেচি, এমন কি কান্নাকাটি পড়িয়া যাইবে। সব চেয়ে বিপদ বাবাকে লইয়া, মুখে তিনি যাহাই বলুন, সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে স্নেহ তিনি যে তাহাকেই করেন তা ভূপেন জানে। আশা ভরসা সবই তাঁহার এই একমাত্র পুত্র-সন্তানটির উপর। এ ক্ষেত্রে কথাটা কি করিয়া পাড়া যায় সেইটাই হইল বড় সমস্যা। অনেকক্ষণ ভাবিবার পর সে সর্বাপেক্ষা সহজ উপায়টাই বাছিয়া লইল। সন্ধ্যার পূর্বেই সংবাদটা মাকে জানাইয়া, তিনি প্রাথমিক স্তম্ভিত ভাবটা কাটাইয়া উঠিবার আগেই বাহির হইয়া পড়িল এবং ফিরিল রাত্রি এগারোটার পরে।

কিন্তু বাড়িতে পা দিয়াই সে বুঝিল ঝড় তখনও কাটে নাই। বাবা তখনও চিৎকার করিতেছেন, নিচের তলার অবিনাশবাবুরা সকলে উপরে বসিয়া জটলা করিতেছেন আর মায়ের অবস্থা বর্ণনা না করাই ভাল। তাহাকে দেখিয়া বাবা গলাটা আর এক পর্দা চড়াইয়া দিলেন। সেই সুদূর বীরভূম, ম্যালেরিয়া-জলকষ্ট-মহামারীর দেশ, সেইখানে সে সামান্য কয়টা টাকার জন্য যাইতেছে ইস্কুল-মাস্টারী করিতে? কেন, তিনি কি মরিয়া গিয়াছেন? না হয় গস্ সাহেব নাই, তাই বলিয়া তাঁহার এতদিনের সার্ভিসের কি কোন মূল্য পাওয়া যাইবে না? তিনি যে এখনও মরা-হাতী লাখ টাকা। নিজের ছেলে গিয়া দাঁড়াইলে বিশেষত যে ছেলে গ্র্যাজুয়েট, এখনও তিনি পঁয়তাল্লিশ টাকায় ঢুকাইয়া দিতে পারেন যে-কোনদিন। তারপর ইন্‌ক্রিমেণ্ট? সে তো তাঁহাদেরই হাতে, তা-ছাড়া যদি দুইটা বৎসর তিনি বাঁচিয়া থাকেন, মাহিনা যা-ই বাড়ুক, বিল সেক্‌শানে তিনি যেমন করিয়াই হউক ঢুকাইয়া দিবেন তাহাকে—তারপর আর ভাবনা কি? হাজার

টাকার বিলে দশটা টাকা করিয়া লইলেও মাস গেলে যেমন করিয়া হউক উপরি দুশটি টাকা পকেটে আসিবে। ঐ করিয়া পুলিনদা' কলিকাতাতে দুইখানা বাড়িই কিনিলেন, মাহিনা ত পান মাত্র দেড়শ টাকা! ইত্যাদি—

অনেকক্ষণ ধরিয়া এক নিঃশ্বাসে বকিয়া যাইবার পর, বোধ করি দম লইবার জন্যই উপেনবাবু চুপ করিলেন। বিরক্তিতে ভূপেনের মুখ অন্ধকার হইয়া আসিয়াছিল, একে সে নিজের অন্তরের দ্বন্দ্বে ক্লান্ত, তাহার উপর বাবার অফিসের এই মহিমা সে বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছে। তবু সে নিজেকে সংযত রাখিয়াই কহিল, চাকরি আমার ভাল লাগে না বাবা, সে ত আপনি জানেন!

উপেনবাবু একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন, তা ভাল লাগবে কেন? ইস্কুল মাস্টারীটা চাকরি নয়—না? ওরে হাজার হোক এ হ'ল সাহেবের চাকরি, এর কত সুবিধে! আর সে দেখবে হাজারটা মনিব। এই ত আমাদের অফিসের প্রাণকেষ্ট, এম-এ পাস করে মাস্টারী করতে ঢুকেছিল। বড় ইস্কুল, মাইনেও পাচ্ছিল ভাল—দুটি বছর যেতে না যেতে পালিয়ে আসতে পথ পেলে না! পাঁচ টাকা কম মাইনেতেই আমাদের অফিসে এসে ঢুকল। বলে, দাদা এ ঢের ভাল। সেখানে সেই সেক্রেটারী থেকে, ম্যানেজিং কমিটির মেম্বার থেকে হেড মাস্টার এস্তক পঞ্চাশটা মনিব—সে সহ্য হয় না। তা ছাড়া, যদি মাস্টারীই করতে হয় ত এখানে চেষ্টা কর, সেই ধাবধাড়া গোবিন্দপুর না গেলে হয় না!

অবিনাশবাবু এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া বিড়ি টানিতেছিলেন, এইবার তিনি কথা কহিলেন। বলিলেন, ছাখো বাবাজী, একটা কথা শুনে রাখো, আমার বয়স ঢের হয়েছে, অনেক দেখলুম—বিলেতের খবর জানি না অবিশ্যি, কিন্তু এখানে ইস্কুল-মাস্টারদের লোকে মানুষের মধ্যে গণ্য করে না। মাস্টার শুনলেই সবাই মুখ টিপে হাসে—ঠাট্টা করে। আমাদের দেশে ফার্স্ট-ক্লাস লোক যারা তারা ব্যবসা করে কিংবা সিভিলিয়ান বা উকিল-ব্যারিস্টার হয়, সেকেণ্ড-ক্লাস লোক হয় ডাক্তার কিংবা ইঞ্জিনিয়ার, থার্ড-ক্লাস লোক চাকরি করে, ফোর্থ-ক্লাস লোক প্রফেসার হয় আর যাদের কিছু জোটে না তারাই যায় মাস্টারী করতে।···তুমি বাবাজী কোন্ দুঃখে মাস্টারী করতে যাবে? তুমি বিদ্বান বুদ্ধিমান ছেলে, তোমার উন্নতির কত পথ খোলা।

এবার আর ভূপেন বিরক্তি চাপিয়া রাখিতে পারিল না। ঈষৎ তীক্ষ্ণকণ্ঠেই কহিল,—আমি ত আর চিরকালের জন্য মাস্টারী করতে যাচ্ছি না—আপনারা এতই বা উতলা হচ্ছেন কেন? চাকরিতে ঢুকলে আমার এম-এ পাস করার কোন সম্ভাবনাই থাকবে না, লেখা-পড়ার আশা চিরকালের মত জলাঞ্জলি দিতে হবে।

মাস্টারীতে অবসর বেশী, পড়ার স্থবিধেও ঢের, সেই জন্যেই মাস্টারী করতে যাচ্ছি। আর সেই জন্যেই কলকাতাতে থাকবার আমার ইচ্ছে নেই।

উপেনবাবু কহিলেন, কেন কলকাতাতে থাকলে তোমার কি অস্থবিধা হবে শুনি? এখানে থেকে কেউ পাস করে না? বাড়িতে থেকে পড়াশুনো হচ্ছিল না এত দিন? তার পর—সেখানে গিয়ে যখন ম্যালেরিয়ায় কোঁ কোঁ ক'রে পড়বে— তখন কে মুখে জল দেবে? তখন ত আবার এই পাষণ্ড বাপ-মার কাছেই আসতে হবে! ওঃ, বাপ রে! বাপ-মা এত মন্দ যে পাছে বাড়ি থাকতে হয় বলে সেই নিবান্ধা যমপুরে যাওয়া—

ভূপেন তাঁহার দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—কলকাতার ইস্কুলে মাস্টারী নিয়ে ত কেউ বসে নেই। আর সে শুধু দরখাস্ত করে পাওয়াও যায় না —ঢের ধর-পাকড় করতে হয়। যেখানে যাচ্ছি সে দেশেও মানুষ বাস করে নিশ্চয়, সবাই যদি ম্যালেরিয়ায় মরে যেত তাহ'লে ইস্কুলটাও চলত না। এ আমরা সহজ-বুদ্ধিতেই বুঝি—

সে আর তর্ক-বিতর্কের অবসর না দিয়া রান্না-ঘরে গিয়া কহিল, মা ভাত দাও।

মা তখন উনানের সামনে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আঁচলে চোখ মুছিতেছিলেন, ছেলেকে দেখিয়াই কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিলেন,—আমি যে তোর ওপর অনেক আশা ক'রে বসে আছি বাবা—

ভূপেন ধমক দিয়া কহিল—হ্যাঁ, তা হয়েছে কি? আমি কি মরে গেছি? না মরতে যাচ্ছি? যদি সবাই মিলে তোমরা অমন করো তাহ'লে আমি এই দণ্ডেই চলে যাবো বলে রাখছি।

ভয় দেখানোতে ভাল কাজ হইল। মা চোখের জল মুছিয়া তাড়াতাড়ি ভাত বাড়িয়া দিলেন। ভূপেন ভাত খাইতে বসিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া দেখিল যে, তাহার বোনদেরও মুখ থম্‌থম্ করিতেছে, যেন তাহার একটা মহা সর্বনাশ হইতে চলিয়াছে। ইহারা কিছুই বোঝে না, শুধু বাবার বিলাপ হইতে ধরিয়া লইয়াছে যে ভূপেন মফঃস্বলে ইস্কুল মাস্টারী লইয়া তাহাদের সকলকার সমস্ত আশা ভরসায় জলাঞ্জলি দিতে বসিয়াছে। ভূপেনের মনে মনে যেটুকু দ্বিধা ছিল সেটুকুও চলিয়া গেল; এ সংসর্গে কয়েকটা দিন থাকিলেই লেখাপড়ার সমস্ত আশা বিসর্জন দিয়া তাহাকে চাকুরিতে ঢুকিতে হইবে।

তাহার খানিকটা খাওয়া হইয়া গেলে মা আবার ভরসা করিয়া মুখ খুলিলেন —তা এখন কি আর যাওয়াটা বন্ধ করার উপায় নেই, হ্যাঁ রে?

ভূপেন গম্ভীর ভাবে জবাব দিল, আমি তাঁদের কথা দিয়েছি। তাছাড়া বন্ধ

করার কোন দরকারও ত দেখছি না।

আরও ভয়ে ভয়ে মা বলিলেন—ইস্কুল মাস্টারী ত খুব খারাপ কাজ শুনেছি বাবা।

—হ্যাঁ, চুরি-ডাকাতির অধম! এ সব কথা কে বুঝিয়েছে তোমাকে, বাবা বুঝি? তাঁর অফিসে ঐ গস্‌ সাহেবকেও এক দিন ইস্কুল মাস্টারের কাছে লেখাপড়া শিখতে হয়েছে, বাবাও যেটুকু শিখে চাকরি করছেন সেটুকুর জন্যও ঐ মাস্টারদের কাছেই তিনি ঋণী। আশু মুখুজ্জে, সি আর দাস, গান্ধী যে বড় সবাই জানে মা, কিন্তু তাঁদের বড় যারা করলে তারা কি এতই হেয়? তুমি অমন করছ কেন? অফিসে কেরানীগিরি করার থেকে ইস্কুল-মাস্টারী করা অনেক গৌরবের কাজ বলেই মনে করি আমি।

মা যে কতকটা ছেলের ধমকের ভয়েই চুপ করিয়া গেলেন তা তাঁহার মুখ দেখিয়াই ভূপেন বুঝিতে পারিল। কিন্তু তাহারও আর কথা বাড়াইতে ইচ্ছা হইল না, কোনমতে আহার সারিয়া উঠিয়া পড়িল।

রান্না-ঘর হইতে বাহির হইয়া সে যখন নিজের ঘরে যাইতেছে, তখনও উপেন-বাবুদের বৈঠক ভাঙে নাই। সে আর সেখানে দাঁড়াইল না বটে, কিন্তু অবিনাশ-বাবুর উৎসাহ তাহাতে কমিবার কথা নয়, তিনি তাহার উদ্দেশ্যে গলা চড়াইয়া কহিলেন,—কাজটা ভাল করলে না বাবাজী! আমাদের দেশে একটা কথা আছে যে পাঁচ বছর কেরানীগিরি আর তিন বছর মাস্টারী করলে মানুষ গাধা হয়। তবু ছুটো বছর সময় পেতে!

ভূপেন তাহার নূতন মনিবদের কাছে আটদিন সময় লইয়াছিল, কিন্তু এখন আর অত দিনও অপেক্ষা করিবার ইচ্ছা রহিল না। বাবা যতটুকু সময় বাড়ি থাকেন, বিলাপ করেন আর বক্তৃতা দেন; মা নিঃশব্দে চোখ মোছেন এবং বোনেরা গম্ভীর মুখে ঘুরিয়া বেড়ায়। অথচ উপায়ই বা কি, সে নিজে আটদিন সময় লইয়াছে এখন আবার কি অছিলায় আগে যায়?

তাহাকে বাঁচাইয়া দিলেন ইস্কুলের কর্তৃপক্ষই। ভূপেনের সম্মতিপত্র পাঠাইবার দ্বিতীয় দিনেই এক টেলিগ্রাম আসিয়া হাজির হইল। তাহাতে লেখা আছে—'এখনই যোগ দিন—কবে যাত্রা করিবেন তার করিয়া জানান।' ভূপেন আর এক মুহূর্তও ইতস্তত করিল না, তখনই ডাকঘরে গিয়া তার পাঠাইয়া দিল—'কালই যাইতেছি।' তার পর বাড়ি ফিরিয়া যাত্রার আয়োজন শুরু করিয়া দিল। অবশ্য ঘটা করিয়া আয়োজন করিবার মত এমন কিছু ছিলও না—মোহিতবাবুর চেক

ভাঙ্গাইয়া সে ইতিমধ্যেই আংশিক বাড়ি-ভাড়া প্রভৃতি তাহার যাহা দেয়, তাহা মিটাইয়া দিয়াছিল, বাকী টাকা যা, তুই একখানা কাপড় জামা, বিছানার একটা চাদর এবং ফাইবারের একটা সুটকেস কিনিতেই শেষ হইয়া গেল। মাস কয়েক আগে টাকা জমাইবার শুভবুদ্ধি মাথায় দেখা দিয়াছিল, সেই সময় পোস্ট অফিসে একটা হিসাবও খুলিয়াছিল। এখন খাতাটা খুলিয়া দেখা গেল তাহাতে মাত্র আটটি টাকা পড়িয়া আছে। বিছানার তুই-একটা জিনিস কিনিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এই আর্থিক অবস্থায় তাহা আর সম্ভব হইল না—অগত্যা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে তাহার পুরাতন বিছানার মধ্য হইতেই অপেক্ষাকৃত ভদ্র কিছু খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বোনগুলি মুখভার করিয়াই থাক বা গোপনে রোদনই করুক—শেষ পর্যন্ত তাহাদের সাহায্যেই সুটকেস ও বিছানা ঠিক করিয়া রাখিয়া সন্ধ্যার মুখে আবার বাহির হইয়া পড়িল। কতদিনের জন্য কলিকাতা ছাড়িয়া যাত্রা করিতেছে কে জানে! দীর্ঘকাল, হয়ত বা জীবনের মতই—কিছুই বিচিত্র নয়। এই শেষ সন্ধ্যাটি সে একটু রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইবে।

মন খারাপ হয় বৈকি! জন্ম হইতে সিমলার এই সংকীর্ণ গলি এবং কলিকাতার অতি-পরিচিত রাস্তাগুলি দেখিয়া আসিতেছে। এত দিন বোঝা যায় নাই, কখন অজ্ঞাতসারে এই কদর্য পথগুলি তাহার মনে মায়া বিস্তার করিয়াছিল। যে ট্রাম-বাসের কোলাহল চিরকাল অসহ্য বোধ হইয়াছে, আজ যেন তাহাদের ছাড়িয়া যাইতে কষ্ট বোধ হইতেছে।...মা কাঁদিতেছেন, বাবাও বাড়ি আসিয়া খবর পাইলে প্রকাশ্যে না হোক গোপনে চোখের জল ফেলিবেন। যে বোনগুলির স্বাচ্ছন্দ্যের কথা সে কখনও চিন্তা করে নাই, তাহাদেরও চোখ ছল ছল করিতেছে। এই সব স্নেহের বন্ধন তুচ্ছ করিয়া, চিরপরিচিত এবং প্রিয় আবেষ্টনী পিছনে ফেলিয়া সে সম্পূর্ণ অজানা কোন্ দেশে যাত্রা করিতেছে—কি সেখানে মিলিবে কে জানে! হয়ত এই কষ্ট করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, বাবার উপদেশ শুনিয়া অফিসে চাকরি লইলে এক রকম করিয়া জীবন কাটিয়াই যাইত, সম্ভবত শান্তিতেই কাটিত। আর পাঁচটা মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর ছেলের যেমন করিয়া জীবন কাটে—চাকরি করিয়া, বিবাহ করিয়া, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রতিপালন করিয়া—অভাবে ও দারিদ্র্যে—তাহার জীবনও না হয় তেমনি করিয়াই কাটিত, দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াও আদর্শবাদী হইতে গিয়া হয়ত সে ভুলই করিল।

এই সব চিন্তার মধ্যে মন যখন অত্যন্ত ক্লিষ্ট, সহসা যেন দৃষ্টির সামনে সন্ধ্যার

শান্ত একাগ্র চোখ ফুটিয়া উঠিল। সে চোখের চাহনি যেন আর একবার মনে করাইয়া দিল, 'আপনার সম্বন্ধে আমার অনেক আশা মাস্টারমশাই, আপনি কেরানীগিরি করছেন এ আমি ভাবতেই পারি না।' সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দুর্বলতা মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়া আবার নিজেকে কঠিন করিয়া লইল। পিছনের দিকে, আরামের পঙ্কশয্যার দিকে তাকাইলে চলিবে না। তাহাকে বড় হইতেই হইবে, ধনী নয়—শিক্ষিত হইতে হইবে।

তরুণ বয়স তাহার—জীবনের অন্ধকার দিকের ছায়া তাহার কল্পনাকে তখনও মলিন করিতে পারে নাই, পূর্বপুরুষদের দাসত্বের সংস্কার তখনও তাহার আশা ও আদর্শবাদকে সংকীর্ণ করিয়া তুলিতে পারে নাই—তাই সেদিন সন্ধ্যারই জয় হইল, সহজ জীবনযাত্রার প্রলোভন ফেলিয়া যশের জয়তিলকই জীবনের কাম্য বলিয়া বাছিয়া লইতে পারিল।

অন্যমনস্ক ভাবে পথ চলিতে চলিতে অভ্যস্ত পা কখন চোরবাগানে মোহিত-বাবুদের বাড়ির সামনে আসিয়া পড়িয়াছিল তাহা ভূপেন বুঝিতেও পারে নাই। সহসা দূর হইতে পরিচিত দারোয়ানকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। বহু দিনের জন্যই কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতেছে সে, দেখা করিবার অজুহাতের অভাব নাই। একবার ঢুকিয়া পড়িবে নাকি বাড়ির মধ্যে? চলিয়া যাইবার আগে আর একবার সন্ধ্যাকে দেখিবার ইচ্ছা তাহার মনের অবচেতন অবস্থায় বরাবরই ছিল, এখন দুর্নিবার লোভে বুক দুলিয়া উঠিল। উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল, সন্ধ্যার ঘরে আলো জলিতেছে, লাইব্রেরী ঘরেরও জানালা খোলা—সম্ভবত দুজনেই আছেন। কিন্তু—না, ছিঃ! মনে পড়িয়া গেল চিঠিতে মোহিতবাবু দেখা করার কথা উল্লেখ পর্যন্ত করেন নাই। এ অবস্থায় গেলে মোহিতবাবুর চোখে ছোট হইয়া যাইতে হইবে। কোন কারণে, অন্তরের কোন তাগিদেই সে তাঁহাদের কাছে ছোট হইতে পারিবে না।

সে জোর করিয়া নিজেকে ফিরাইয়া লইল। আর ঘুরিবারও ইচ্ছা নাই, এতক্ষণ হাঁটার ক্লান্তিতে এইবার যেন পা ভাঙ্গিয়া আসিতেছে, সে বাড়ির দিকেই ফিরিল।...

পরের দিন সকাল দশটায় গাড়ি, মা-বাবা সারা রাতই ঘুমাইলেন না। মা শেষ-রাত্রে উঠিয়া রান্না করিতে গেলেন, বাবা তখনই তাহাকে ঘুম হইতে তুলিয়া নানাবিধ উপদেশ দিতে লাগিলেন। যাওয়া বন্ধ করার আর কোন উপায় নাই দেখিয়া কাল হইতে আর সে-কথা তুলেন নাই। এখন শুধু স্নান আহার বিশ্রাম

সম্বন্ধে উপদেশ। বীরভূম সাপের দেশ, সাদা করবীর ডাল বিছানার নিচে রাখিয়া দিলে সাপ আসে না, ঐ ডালেরই একটা ছড়ি করিয়া লইলে পথেও নিরাপদ থাকা যায়। জল সর্বদা গরম করিয়া খাইবে, হোস্টেলে সম্ভব না হইলে নিজেই যেন বন্দোবস্ত করিয়া লয়, স্নান বেশী না করাই ভাল, করিলেও গরম জল ব্যবহার করা উচিত। ধান ক্ষেত, নদীর ধার এবং জঙ্গল এই স্থানগুলি সর্বদা পরিত্যাজ্য—ইত্যাদি।

ভূপেনের নিজের মানসিক অবস্থা এমনিতেই খারাপ ছিল, তাহার উপর এই সব অবান্তর উপদেশ অত্যন্ত বিরক্তিকর। তবু সে শান্তভাবেই সব শুনিয়া গেল, শেষ দিনে আর কোন আঘাত দিতে ইচ্ছা হইল না। আজ সে বুঝিল কেন হিন্দুস্থানীরা হাজার মাইল দূর হইতে এদেশে আসিয়া অর্থ উপার্জন করে এবং বাঙ্গালীর ছেলেরা ঘর ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারে না। শেষ পর্যন্ত সে বলিয়াই ফেলিল, আমি ত মাত্র সওয়া-শ মাইল যাচ্ছি বাবা—তাইতেই আপনারা এমন করছেন, আপনার অফিসের সাহেবরা রোজগার করবার জন্যে কত দূর এসেছে, আর কী দেশ ছেড়ে কী দেশে এসেছে ভেবে দেখুন দিকি!

বলা বাহুল্য, উপেনবাবুর উদ্বেগ তাহাতে কিছুমাত্র কমিল না, কোনমতে স্নানাহারের সময় হইয়াছে এই কথাটা স্মরণ করাইয়া দিয়া সে অব্যাহতি পাইল এবং যথেষ্ট সময় হাতে থাকা সত্ত্বেও সাড়ে আটটার মধ্যেই বাড়ি হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

প্যাসেঞ্জার ট্রেন মন্থর-গতিতে চলিয়া যখন তাহার বিশেষ স্টেশনটিতে পৌঁছিল তখন সন্ধ্যার কিছু দেরি থাকিলেও হেমন্তের সূর্য ম্লান হইয়া আসিয়াছে। ছোট স্টেশন, লোকজন ওঠা-নামা করে কম—সুতরাং ট্রেন পুরা এক মিনিটও বোধ হয় দাঁড়ায় না। ভূপেন আগে হইতেই কামরার দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, প্ল্যাটফর্মে গাড়ি ঢুকিবার সঙ্গে সঙ্গেই 'কুলী'—'কুলী' করিয়া ডাকাডাকি শুরু করিল—কিন্তু কোথায় কুলী। কাছাকাছি কোথাও কুলী বা ঐ জাতীয় কাহারও চিহ্নমাত্র পাওয়া গেল না। এধারে তখনই গাড়ি ছাড়িবার ঘণ্টা দিয়া দিয়াছে, অগত্যা সে নিজেই সুটকেস ও ভারী বিছানার বাণ্ডিলটা লইয়া কোনমতে গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িল।

এইবার ভূপেন স্টেশনটার দিকে চোখ বুলাইবার অবকাশ পাইল। নিতান্তই ছোট স্টেশন—কাছাকাছি লোকালয়ও বিশেষ আছে বলিয়া মনে হয় না। যে

দিকে চোখ ফেরায় শুধু মাঠ ধু ধু করিতেছে। সেই দিগ্‌দিগন্ত জোড়া মাঠেরই মধ্য দিয়া দুইগাছি কালো সুতার মত কালো রেললাইন যেন একদিকের আকাশের কোল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া অপর দিকের আকাশে গিয়া মিশিয়াছে। স্টেশনের কাছাকাছি আসিলে সেটাকে লাইন বলিয়া বোঝা যায়—সেইখানে আরও গোটাকতক লাইন বাহির হইয়াছে। ওপাশে মাল নামাইবার একটা প্ল্যাটফর্ম আছে—এ ধারের যাত্রীবাহী প্ল্যাটফর্মটাও খুব ছোট নয় কিন্তু সে সবই ফাঁকা, জনহীন। অন্য সময় কখনও এ সবের প্রয়োজন হয় কিনা বোঝা কঠিন—এখন এগুলিকে নিতান্ত পরিহাস বলিয়াই মনে হইতেছে। টিনের ছোট স্টেশন ঘরটা না থাকিলে ইহাকে স্টেশন বলিয়া চেনাও মুশকিল হইত। স্টেশন বলিতে এতদিন যে সব ছবি ভুপেনের মনের মধ্যে ছিল, তাহার কোনটার সঙ্গেই যেন মেলে না—কুলীর গোলমাল নাই—খাবারওয়ালা এমন কি একটা পান-বিড়ি বিক্রেতা পর্যন্ত চোখে পড়ে না।

এই জনহীন স্টেশন-মরুতে 'কুলী' খুঁজিবার প্রবৃত্তি তাহার আর ছিল না, কিন্তু দুই দুইটা ভারী জিনিস বহন করিয়া কতদূরই বা লইয়া যাইবে। কোন্ দিকে তার স্কুল তাও সে জানে না, কতটা পথ হাঁটিতে হইবে তাহারও ঠিক নাই। যাই হোক্ সে আর একবার ব্যাকুলভাবে চারিদিকে চাহিতেই তাহার নজরে পড়িল একটি মধ্যবয়সী লোকের সঙ্গে গুটি-তিনেক ছেলে মাঠ ভাঙ্গিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে স্টেশনের দিকে ছুটিতেছে এবং তাহার দিকে হাত নাড়িয়া কী ইঙ্গিত করিতেছে।

অগত্যা সে সেইখানেই অপেক্ষা করিতে লাগিল। ততক্ষণে স্টেশন-মাস্টার তাঁহার খোপে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন। প্ল্যাটফর্মে আর দ্বিতীয় প্রাণী নাই। একটু পরেই সেই দলটি হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া হাজির হইল। লোকটির বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, কিন্তু এই বয়সেই গায়ের চামড়া কুঁচ্‌কাইয়া গিয়াছে বৃদ্ধদের মত, গায়ের রংও হয়ত এককালে ফরসা ছিল, গলার খাঁজের দিকে চাহিলে সেটা বোঝা যায় কিন্তু মুখখানা যেন পুড়িয়া কালো হইয়া গিয়াছে। পরনে একটি খাটো কাপড়, গায়ে অত্যন্ত মলিন হাফশার্ট—পা খালি, একেবারে খালি নয়—হাঁটু পর্যন্ত ধুলায় ঢাকিয়া গিয়াছে। সঙ্গের ছেলেগুলির বেশভূষা আরও দীন—কাহারও গায়ে জামা নাই, শুধু গেঞ্জি ভরসা। বলা বাহুল্য, পা সকলকারই খালি।

ইহারা স্কুল হইতে আসিয়াছে, একথা বিশ্বাস করা কঠিন, তবু ভুপেন তাহাদেরই দিকে জিজ্ঞাসু-নেত্রে চাহিয়া রহিল। বয়স্ক লোকটি একটু দম লইয়া কহিল, আপনিই কি নতুন মাস্টারমশাই এলেন কলকাতা থেকে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ভুপেন জবাব দিল,—আমার নাম শ্রীভুপেন্দ্রনাথ রায়।

লোকটি আসিয়াই একবার ঘটা করিয়া নমস্কার করিয়াছিল, এখন আর একবার নমস্কার করিয়া কহিল, আমরা আপনাকেই নিতে এসেছি। আমার নাম শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র মণ্ডল, আমি এখানকার থার্ড মাস্টার।

তারপর, ভূপেনের স্তম্ভিত ভাব কাটিবার পূর্বেই, তিনি নিজে তাহার স্যুটকেসটা তুলিয়া লইয়া ছেলেদের কহিলেন, নে রে, তোরা কেউ বিছানাটা নে।

ভূপেন বিশেষ লজ্জিত হইয়া তাঁহার হাত হইতে স্যুটকেসটা ফিরাইতে লইতে গেল, ওটা আমাকে দিন, ছি-ছি আপনি কেন নিচ্ছেন—আমিই—

কিন্তু অক্ষয়বাবু ততক্ষণে চলিতে শুরু করিয়াছেন, তিনি প্রবল বেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, না না বাবু, আপনাদের এসব অভ্যাস নাই, আপনারা কি পারেন বইতে? তাছাড়া পথও ত কম নয়, প্রায় আধ ক্রোশ। অবিশ্যি আমাদের এ পথ কিছু লাগে না, আমরা রোজই ধরুন এখানে বেড়াতে আসি, কিন্তু আপনাদের কথা আলাদা। ট্রামে-বাসে চলা অভ্যাস আপনাদের—

তারপর সখেদে কহিলেন, এটা কি একটা দেশ নাকি? না একটা গাড়িঘোড়া, না একটা কুলী। পয়সা দিয়েও ইচ্ছামত একটা খাবার পাবেন না। নিতান্ত পেটের দায়ে পড়ে থাকা।

তিনি স্যুটকেসটা হাতে করিয়া হাঁটিতে শুরু করিলেন। ছেলের দলও বিছানাটা তুলিয়া লইয়াছে; অগত্যা ভূপেন বাধ্য হইয়াই অক্ষয়বাবুর অনুসরণ করিল। কিন্তু ব্যাপারটার গ্লানি ও লজ্জা তাহাকে অত্যন্ত পীড়া দিতে লাগিল।

স্টেশনের সীমানা পার হইয়া রাস্তায় পড়িতেই ভূপেন বুঝিল কেন ইহারা সকলে খালি পায়ে আসিয়াছে। পথ পাকা নয়, তা না হউক, কিন্তু কাঁচা রাস্তা বলিতে ভূপেনের যে ধারণা ছিল তাহার সহিতও ইহার কিছুই মেলে না। অনেক দিন আগে সে কি একটা উপলক্ষে আঁদুল স্টেশনে নামিয়া ভিতরের দিকে অনেকটা গিয়াছিল। সেখানেও কাঁচা রাস্তা, তবে এ রাস্তার তুলনায় সে কিছুই নয়। সেখানে স্বচ্ছন্দে জুতা পায়ে ঘুরিয়া আসা গিয়াছিল, কিন্তু এখানে প্রথম পা দেওয়া মাত্র ময়দার মত ধূলায় তাহার পায়ের গোছ-সুদ্ধ ডুবিয়া গেল। হাত তিন-চার পথ যাইবার পরই তাহার নূতন জুতাটার যে অবস্থা হইল, তাহাতে জুতা বলিয়া চেনাই কঠিন। ভূপেনের একবার ইচ্ছা হইল জুতাটা খুলিয়া হাতে করে কিন্তু নিতান্ত চক্ষুলজ্জাতেই পারিল না।

সে বার বার পায়ের দিকে চাহিতেছে লক্ষ্য করিয়া অক্ষয়বাবু বলিলেন, ও আর কি দেখছেন। জুতো পায়ে দেওয়া এখানে চলে না। নেহাৎ যদি চান ত হোস্টেল থেকে বেরিয়ে ইস্কুলটা পর্যন্ত যেতে পারেন, পথে বেরোনো চলবে না।...

তা এক রকম ভাল, জুতোর খরচটা বেঁচে যায়, কি বলেন?

তিনি নিজের রসিকতায় নিজেই এক চোট হাসিয়া লইলেন, তারপর কহিলেন, অসুবিধা হয় ত ঐ ছেলেগুলোর কাউকে দিন না জুতোটা খুলে—নিয়ে চলুক।

ভূপেন প্রবল বেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না, না, কিছু দরকার নেই।...তা ছাড়া এখনও ত আপনাদের দেশে অভ্যস্ত হই নি—খালি পায়ে চলতে পারব না।

স্টেশনের তারের বেড়া পার হইয়া আসিয়াই একটা বড় চালার নিচে পাশাপাশি ঘরে পোস্টঅফিস, মনোহারীর দোকান ও একটা খাবারের দোকান পড়িল। স্টেশনের মালের শেড্‌টা আড়াল ছিল বলিয়া প্ল্যাটফর্ম হইতে ভূপেন দেখিতে পায় নাই। খাবারের দোকান বলিয়াও চেনা যাইত না, যদি না মোদকের পুত্র সেই সময়ই রসগোল্লা পাক করিতে বসিত—কারণ ধূলার ভয়ে এখানে খাদ্যদ্রব্য বাহিরে সাজানোর রীতি নাই, সাধারণ ঘরের মধ্যেই দোকান। কেরোসিনের পুরানো টিনে রসগোল্লা থাকে বারকোশ চাপা, খরিদ্দার চাহিলে অন্ধকার ঘরের মধ্য হইতে বাহির করিয়া দেয়। পাশের মনোহারী দোকানটিতে কিছু কিছু মাল বাহিরের দিকে সাজানো আছে বটে কিন্তু তাহার প্রত্যেকটির উপর যে পরিমাণ ধুলা জমিয়াছে তাহাতে কোনটা কি জিনিস, দূর হইতে চিনিবার আর কিছুমাত্র উপায় নাই।

তবু, লোকালয়ের চিহ্ন ঐ তিনটি ঘরেই কিছু মেলে, সেই চালাটা ছাড়াইয়া আসিয়া পথ চলিতে চলিতে ভূপেন যেদিকেই চায় শুধু মাঠ। মধ্যে দু-এক টুকরা ধান-জমি আছে, সেইটুকুতেই দৃষ্টি যা আরাম পায়, নহিলে শুধুই ডাঙ্গা—রুক্ষ, অনুর্বর, তৃণশূন্য কঠিন সে ভূমি, সেদিকে চাহিলে বাংলা দেশের গ্রাম বলিয়াই চেনা যায় না। গাছের মধ্যে দু-একটা জায়গায় কাঁটা গাছ, আর দূরে দূরে এক-একটা তালের কুঞ্জ। বহু দূরে, মাঠের প্রায় প্রান্তে দু-একটা চালার মত কি নজরে পড়ে। তাহারই সঙ্গে গাছপালার একটা সবুজ রেখা তৃষিত পথিকের প্রাণে আশা জাগাইয়া আকাশের কোলে আঁকা রহিয়াছে। কিন্তু সে এতই দূরে যে, ভয় হয়, বুঝিবা ওটা চোখেরই ভ্রম।...

অনেকক্ষণ হাঁটিবার পর, যেটাকে আগে মাঠের প্রান্ত বলিয়া বোধ হইয়াছিল তাহার কাছাকাছি আসিয়া, হঠাৎ পথ এবং সেখানের জমি, দুই-ই নিচের দিকে হেলিয়া পড়িতে দেখা গেল, সামনেই অনেকগুলি চালাঘর জড়াজড়ি করিয়া রহিয়াছে, গাছ-পালারও খুব অভাব নাই। অর্থাৎ—এইটিই গ্রাম। শুধু চালাবাড়ি নয়, দুই-একটি পাকা বাড়িও নজরে পড়িল, যদিচ ধুলায় তাহাদের দেওয়ালের

চুনের মৌলিক রঙ অনেক দিনই চাপা পড়িয়াছে।

অক্ষয়বাবু বুঝাইয়া দিলেন, এইটেই হ'ল এখানকার গ্রাম। ইস্কুলটা কিন্তু আর একটু দূরে—ঐ সামনের মাঠটা পেরিয়ে। এখানকার জমিদার ইস্কুলের জমি বাড়ি দুই-ই দান করেছেন কিনা, কাছাকাছি জমি পাওয়া যায় নি।...এইটে হ'ল এখানকার ডাক্তারের বাড়ি, ইনিই এখানকার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট। আর এই হ'ল তারিণীবাবুর বাড়ি, খুব সাধক লোক ছিলেন, সম্প্রতি মারা গেছেন। ওঁর ছেলে আছে অবিনাশ, সে-ও খুব বিদ্বান, সদরে ওকালতি করে। ভদ্রপাড়া বলতে এই সাত-আট ঘর, বাকী সবই ছোট জাত।

ক্লান্ত ভূপেন সব কথা মন দিয়া শুনিল না, শুধু অবসন্নভাবে একবার চাহিয়া দেখিল মাত্র। জুতার মধ্যে ধূলা জমিয়া জুতা ভারী হইয়াছে, মেঠোপথে চলিয়া পা-ও আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—এখন সে কোথাও একটু বসিতে পারিলে বাঁচে।

অক্ষয়বাবু তখনও বক্তৃতা করিয়াই চলিয়াছেন, দূরে থাকা একরকম ভাল, বুঝলেন না? গরম পড়লেই কলেরা, আর ফি বৎসর গ্রাম যেন উজোড় হয়ে যায়, আমাদের ওটা অনেক দূরে বলে বেঁচে গিয়েছি, তাও মশায় কুয়ো নিয়ে বিভ্রাট, খুব যখন রোগটা চাপে তখন সারা রাত জেগে কুয়ো পাহারা দিতে হয়।

ভূপেন বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, কেন?

—কুয়ো ত এদিকে খুব বেশী নাই, থাকলেও অত খরচ করে কে কাটাবে মশাই? অধিকাংশ কূয়োতেই জল যায় শুকিয়ে—গরম না পড়তে পড়তে। তখন সব ছোটে হোস্টেলের কূয়োয় জল নিতে, আমাদের চাকরই তুলে দেয় যতটা পারে—কিন্তু যখন-তখন ত আর তুলে দেওয়া সম্ভব নয়। অথচ ওদের তুলতে দিলেই সর্বনাশ, স্যানিটেশনের জ্ঞান ত একেবারে নাই, নোংরা বালতি দড়ি—যা পাবে তাই ডোবাবে, ফলে এই জলটি সুদ্ধ যাবার দাখিল হয়, বুঝলেন—না? অথচ অতগুলো ছেলের জীবন-মরণ নির্ভর করছে এটুকু জলের ওপর, সে রিস্ক্ ত কম নয়!

ততক্ষণে তাহারা মাঠ পার হইয়া ইস্কুলের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। একেবারেই যে ফাঁকা তা নয়, দুই-একটি ঘর এখানেও আছে, তবু খুব ঘন-সন্নিবিষ্ট নয়। ইস্কুল বাড়িটা পাকা, খুব ছোটও নয়, ইংরাজী 'ই' অক্ষরের মাঝখানের ছোট টানটা বাদ দিলে যেমন দাঁড়ায় সেইভাবে একতলা ঘরের শ্রেণী চলিয়া গিয়াছে। সামনে অনেকটা ফাঁকা জমি, সেটা খেলার মাঠও নয় বাগানও নয়। উঁচু-নিচু পতিত জমি, গাছপালা ত নাই-ই, ঘাসও অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিতে হয় এমনি দুরবস্থা। সীমানা ঘেরা নাই, পাঁচিল দিবার ইচ্ছা ছিল—সেটা বোঝা যায়

মাঝখানে পাকা ফটকের দুইটা থাম দেখিয়া—কিন্তু আর কিছুই করা হইয়া ওঠে নাই।

ইস্কুলের ঠিক সামনেই হোস্টেলবাড়ি, সেটিও খুব ছোট নয় কিন্তু কাঁচা। শক্ত মাটির দেওয়ালের উপর খড়ের চালা, সামনে খানিকটা করিয়া টানা রোয়াক। তবে মাটির দেওয়াল হইলেও সে মাটি এতই কঠিন যে ভিতরের চুনের কাজ দেখিলে মাটি বলিয়া চেনা যায় না। মেঝেও সিমেণ্ট করা—অর্থাৎ মেটে ঘরের অসুবিধা কোনটাই নাই। আর সবচেয়ে যেটা ভাল লাগিল ভূপেনের, হোস্টেলের উঠানটি কাঁটাতার দিয়া ঘেরা এবং ভিতরে অসংখ্য ফুল ও ফলের গাছ। সেটা, অক্ষয়বাবু বুঝাইয়া দিলেন, কূয়াটা থাকার জন্যই সম্ভব হইয়াছে। ছেলেদের স্নান ও অন্যান্য কাজ-কর্মের সমস্ত জলটা বাগানে আসে বলিয়াই এতগুলি গাছপালা, এমন কি কলাগাছ পর্যন্ত বাঁচানো সম্ভব হইয়াছে—আর শুধু এই বস্তুটির অভাবেই ইস্কুলের উঠানটাতে কিছু করা যায় নাই।

উহাদের দলটিকে কাছাকাছি আসিতে দেখিয়া হেডমাস্টার ও ছেলের দল ভিড় করিয়া আগাইয়া আসিল। পিছনে অন্য তিনজন শিক্ষক ছিলেন। হেডমাস্টার প্রবীণলোক, সৌম্যদর্শন, কাঁচা-পাকা দাড়ি; বেঁটে-খাটো লোকটি। গলায় মোটা তুলসীর কণ্ঠি, কপালে তিলক অর্থাৎ ঘোর বৈষ্ণব। এই মানুষটি সম্বন্ধে ভূপেনের একটু ভয় ছিল, ইনিই বারো-আনা মনিব, কেমন লোক হইবেন কে জানে! কিন্তু মানুষটি দেখিয়া সে আশ্বস্ত হইল। মধুর হাসিয়া তিনি অভ্যর্থনা জানাইলেন, আসুন! আসুন! আপনি বোধ হয় ভূপেনবাবু! আমার নাম শ্রীভবদেব দাস, আমিই এখানকার হেডমাস্টার।

ছেলেগুলির দিকে চাহিয়া কহিলেন, ওরে নতুন মাস্টারমশাইয়ের বাক্স-বিছানাটা ঐ ও-পাশের ছোট ঘরটায় নিয়ে যা, যতীনবাবুর ঘরে। যতীনবাবু, আপনি ওগুলোর একটু তত্ত্বাবধান করুন গে—কেমন?—আসুন ভূপেনবাবু—এদিকে! বাবা ভজহরি, বাবুর মুখ-হাত ধোবার জল দাও একটু—

হোস্টেলের ঠিক মাঝখানের ঘরটিতে ভবদেববাবু থাকেন। সামনে বড় দুইটি মাদুর পাতা রহিয়াছে, বোধ হয় এতক্ষণ ইঁহারা এইখানেই বসিয়াছিলেন। ভবদেববাবু ভূপেনকে সঙ্গে করিয়া সেইখানেই লইয়া গেলেন, মাদুরটা দেখাইয়া কহিলেন, বসুন, বসুন, একটু বিশ্রাম করুন। ওরে ভজহরি, বাবা জল দিলি? পা-টা একেবারে ধুয়েই বসুন, কেমন?

ভজহরি বালতিতে জল দিয়া গেল। ভবদেববাবুর ইঙ্গিতে একটা ছেলে কোথা হইতে অত্যন্ত মলিন একটা তোয়ালেও লইয়া আসিয়াছিল। ভূপেন কোনমতে

আলতো জলটা মুছিয়া লইয়া মাদুরে আসিয়া বসিল, তারপর অন্যের অলক্ষিতে পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিল।

সকলে বসিলে ভবদেববাবু হাঁক দিলেন, ঠাকুর, চা হয়েছে?

স্টেশন হইতে আসিবার সময় একটি ছেলে ময়রার দোকানের কাছে পিছাইয়া পড়িয়াছিল—এতক্ষণে তাহার কারণটা স্পষ্ট হইল। ঠাকুর একটি প্লেটে করিয়া গুটিচারেক রসগোল্লা এবং একটা কানাভাঙা কাপে এক কাপ চা রাখিয়া গেল। আরও দুই পাত্র চা আসিল ছোট কলাই করা মগে, হেডমাস্টার নিজে একটা এবং একজন শিক্ষক আর একটা লইলেন। বাকী যে কজন শিক্ষক ছিলেন তাঁহাদের দিকে ভূপেন কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে চাহিতেছে দেখিয়া ভবদেববাবু তাড়াতাড়ি কহিলেন, ওঁরা কেউ চা খান না।

তারপর পশ্চিমের দিগন্তজোড়া মাঠটার দিকে তাকাইয়া কহিলেন, সন্ধ্যে অবিশ্যি হয়েছে—কিন্তু রাত হয় নি একেবারে, কী বলেন? চা খাওয়া চলে? য়্যাঁ—

সামনেই যিনি বসিয়াছিলেন তিনি কহিলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ,—স্বচ্ছন্দে। তা ছাড়া আমার গুরুদেব বলেছেন—পানকে দোষ নেই।

ভবদেববাবু একটু অপ্রতিভভাবে ভূপেনের দিকে চাহিয়া কহিলেন, মানে এখনও সন্ধ্যা করা হয় নি কিনা—নিন, নিন ভূপেনবাবু, চা জুড়িয়ে গেল।

বলিয়া তিনি নিজেই বেশ বড় করিয়া একটা চুমুক দিলেন।

কুৎসিত অপেয় চা—চা না বলিয়া গরম জলই বলা উচিত। তবু এই ট্রেন ভ্রমণ এবং পথশ্রমের পর ভূপেনের আরামই লাগিল। রসগোল্লাগুলিও ভাল—দোষের মধ্যে একটু যা মাধুর্যের আতিশয্য।

চা খাইতে খাইতে ভবদেববাবু সকলের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিলেন।—ভূপেনবাবু, আসুন এঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হলেন অপূর্বকৃষ্ণ পাল, য়্যাসিস্টাণ্ট হেডমাস্টার মশাই, হায়ার ক্লাসে অঙ্ক আর জিওগ্রাফী পড়ান। এঁর সঙ্গে ত আপনার আলাপই হয়েছে, অক্ষয়বাবু। উনি যতীনবাবু, হিস্ট্রির মাস্টার, ইনি হলেন রাধাকমল বিদ্যাভূষণ, হেডপণ্ডিত, আর আপনার পিছনে উনি বিজয়-বাবু, বিজয়বাবু হোস্টেলে থাকেন না অবিশ্যি, উনি স্থানীয় লোক—শুধু আপনার সঙ্গে আলাপ করবেন বলেই বসে আছেন।

যথারীতি নমস্কার বিনিময়ের পর আলাপ জমিয়া উঠিল। অপূর্ববাবুই অগ্রণী হইয়া আলাপ চালাইলেন—কলিকাতার হালচাল কি, জিনিসপত্রের দর কত, মাছ সব রকম পাওয়া যায় কিনা, দুধের কি দর, ভূপেন কেন এম-এ পড়া ছাড়িল,

রিপন কলেজে আজকাল কে কে প্রফেসার আছেন, বঙ্গবাসী কলেজের নূতন প্রিন্সিপাল কেমন লোক—বাপের নাম রাখিতে পারিবেন কিনা, এই সব রকমারি প্রশ্ন।

ছেলেদের দল তখনও কৌতূহলী হইয়া চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। অধিকাংশই ক্ষীণকায়, ম্যালেরিয়া ও খাদ্যাভাবে শুধু শীর্ণ নয়—অপুষ্টও বটে। প্রথম শীত হইলেও ঠাণ্ডার আমেজ বেশ আছে—কিন্তু বেশীর ভাগ ছেলের গায়েই একটা গেঞ্জি পর্যন্ত নাই। ময়লা খাটো কাপড়—দুই-একজনের একটু আধুনিকতার ছোঁয়াচ আছে—হাফ প্যান্ট। ভূপেন দুই-একবার তাহাদের দিকে চাহিতেই অপূর্ববাবু প্রচণ্ড ধমক দিলেন, এই, তোরা এখানে কেন রে। যা সব পড়তে বসগে যা—

তাড়া খাইয়া সকলেই চলিয়া যাইতেছিল, ভবদেববাবু তাহাদেব মধ্যে দুইজনকে ইঙ্গিতে ডাকিলেন। দুইজনেই সমবয়সী, বছর-ষোল হইবে—শ্যামবর্ণ,—একটি ইহারই মধ্যে একটু বলিষ্ঠ গঠনের। ভবদেববাবু গলা নামাইয়া কহিলেন, এই দুটি ছেলে এবার সেকেণ্ড ক্লাসে উঠবে, দুটিই বড় ভাল ছেলে—যত্ন নিতে পারলে ইস্কুলের নাম রাখবে। ওরে পদন, নতুন মাস্টারমশাইকে পেন্নাম কর্। কৈ রে সালেক—আয় আয়।

বলিষ্ঠ ছেলেটিই পদন—হরিপদ নাম সংক্ষিপ্ত হইয়া পদনে দাঁড়াইয়াছে। অপর ছেলেটি মুসলমান, শোনা গেল মাইল আষ্টেক দূরে কি একটা গ্রামে বাড়ি, ছাত্রবৃত্তি পাইয়া হাই স্কুলে পড়িতে আসিয়াছিল, এখন ফ্রী পড়ে। অবস্থা খুবই খারাপ—কোনমতে হোস্টেলের খরচটা বাপ চালায়, তাও বোধ হয় ঘটিবাটি বেচিয়া। ভরসা—ছেলে ভাল করিয়া পাস করিলে দুঃখ ঘুচিবে। তাহারা প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। সালেক ছেলেটি হোস্টেলের কম্পাউণ্ড পার হইয়া মাঠের পথ ধরায় ভূপেন বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, ও ছেলেটি যাচ্ছে কোথায়? হোস্টেলে থাকে না?

ভবদেববাবু তাড়াতাড়ি কহিলেন, ঐ যে দূরের চালাটা দেখছেন, ঐটেই হ'ল মুসলমানদের হোস্টেল। একটা ঘর—গোটা চারেক সীট আছে। ইনস্পেক্টারের পেড়াপীড়িতে করতে হয়েছিল। দুটি মাত্র ছাত্র আছে মোটে—ওদের আর কে লেখাপড়া শিখছে, আপনিও যেমন। এই ছেলেটি দেখছি যা, দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ।

ভূপেন একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল, তা ওদের খাওয়া-দাওয়া?

—এখানেই খায়। খাবার ঘণ্টা পড়লে ওদের থালা গেলাস নিয়ে এসে উঠোনে পাতে, ভাত ডাল ঢেলে দেওয়া হয়। ওরা ওখানে নিয়ে গিয়ে খায়।

নিজেদের থালা বাসন নিজেরাই মেজে নেয়—ঘর-দোরও ওদের ঝাঁট দিতে হয়। কী করব বলুন, দুটি ছাত্রের জন্য ত আর মুসলমান চাকর রাখা সম্ভব নয়।

শুধু তাই নয়, পরে ভূপেন জানিয়াছিল, স্নানের ও পানের জলের জন্যও ইহাদের এখানকার চাকরের দয়ার উপর নির্ভর করিতে হয়—কুয়া হইতে জল তুলিয়া লইবার অধিকার ইহাদের নাই।

ছেলেরা চলিয়া যাইবার পর হইতেই অপূর্ববাবু ভূপেনকে দখল করিবার জন্য অসহিষ্ণুভাবে অপেক্ষা করিতেছিলেন, ভবদেববাবু চুপ করিতেই আবার তিনি উপর্যুপরি প্রশ্ন করিলেন। এই ভদ্রলোকটিকে প্রথম দর্শনেই ভূপেন যেন অবাক হইয়া গিয়াছিল। শ্যামবর্ণের দোহারা দীর্ঘাকৃতি মানুষটি, চেহারায় কোথাও অসাধারণত্ব নাই। শুধু তাঁহার চশমার বিদ্যুতোজ্জ্বল লোহার ফ্রেমটা দ্রুত প্রশ্ন করিবার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুততর মস্তক-চালনায় ক্ষীণ হ্যারিকেনের আলোতেই বার বার চোখের সামনে ঝিলিক মারিতেছিল। কিন্তু সেজন্যও নয়, লোকটি কথা কহিতে পারেন দ্রুত এবং প্রশ্নগুলি এমন ভাবে শুরু করিয়াছিলেন যে ভূপেনের মনে হইল বহুদিন হইতে তাহারই অপেক্ষায় এগুলি তিনি মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছেন।

কলিকাতার হাল-চাল হইতে শীঘ্রই অপূর্ববাবু ব্যাঙ্কিং-এ চলিয়া আসিলেন। কোন্ ব্যাঙ্ক কেমন চলে, কে কত সুদ দেয়, ক মাসের ফিক্‌স্‌ড্ ডিপোজিটে কত সুদ পাওয়া যায়, কোম্পানীর কাগজের কি দাম, ওখানে তেজারতি কেমন চলে,—এই ধরনের অজস্র প্রশ্ন। ভূপেনের ইহার কোনটাই ভাল করিয়া জানা ছিল না—সেজন্য অপূর্ববাবু যেন একটু ক্ষুণ্ণই হইলেন।

খানিক পরে ভবদেববাবুই ভূপেনকে বাঁচাইয়া দিলেন, একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, আপনারা তাহলে গল্প করুন, আমি সন্ধ্যেটা সেরে নিই—কী বলেন? যতীনবাবু, আপনি না হয় ততক্ষণ ভূপেনবাবুকে ঘরেই নিয়ে যান, যদি জামাকাপড় কিছু ছাড়তে চান।

যতীনবাবু ভূপেনের কানে কানে কহিলেন, তাই চলুন ভূপেনবাবু, মাস্টার মশায়ের সন্ধ্যে মানে দুটি ঘণ্টা—

অপূর্ববাবুও এদিক ওদিক চাহিয়া কহিলেন, আমিও উঠি, পণ্ডিতমশায় কই, সরে পড়েছেন বুঝি? আমিও যাই ভূপেনবাবু—আবার একটা কোচিং ক্লাস আছে কিনা।

উঠিয়া দাঁড়াইতে এতক্ষণ পরে ভূপেনের নজর পড়িল ভবদেববাবুর ঘরের ভিতর দিকটায়। সামনেই একটা জলচৌকিতে বিভিন্ন দেবতার ছবি ও এক জোড়া খড়ম মালা-চন্দন প্রভৃতিতে রীতিমতো সাজানো। সামনে পূজার সমস্ত উপকরণ—

ঠাকুর-ঘরের মতই। পাশে একটা প্রদীপ জ্বলিতেছিল, তাহার ক্ষীণ আলোতে ঠাকুরের চৌকির উপরের দেওয়ালে যে প্রকাণ্ড ছবিটা টাঙ্গানো রহিয়াছে সেটা ভাল করিয়া দেখা না গেলেও ছবিটা যে কোন জটা-জুটধারী সন্ন্যাসীর তাহা পরিষ্কার বোঝা যায়, খুব সম্ভব ভবদেববাবুর গুরুদেব হইবেন।

ভবদেববাবু ঈষৎ আবেগ-কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, এই নিয়েই আছি ভূপেনবাবু, শুধু ঠাট, ভজন-পূজন ত দূরের কথা, ওঁকে ডাকবারই বা কতটুকু সময় পাই।··· আহা-হা, হরি বল, হরি বল—

যতীনবাবু ভূপেনকে একরকম টানিয়াই লইয়া আসিলেন, নিজের ঘরে। একেবারে হোস্টেলের একপ্রান্তে ছোট একটি ঘরে দুইটি তক্তপোশ পাতা—তাহার একটাতে যতীনবাবু থাকেন। আর একটা খালি ছিল, সম্প্রতি তাহার উপর ছেলেরা অপটুহস্তে ভূপেনের বিছানা খুলিয়া বিছাইয়া দিয়াছে। যতীনবাবু ঘরে ঢুকিয়া সশব্দে কপাটটা ভেজাইয়া দিয়া কহিলেন, বাপ রে, ওর হাত থেকে পরিত্রাণ কি পাওয়া যায় সহজে? কী বে-আক্কেলে লোক দেখেছেন ত! আপনি এলেন তেতে-পুড়ে, একটু বিশ্রাম করতে ত দেওয়া উচিত! তা ছাড়া আমরাও ত পাঁচ-জনে একটু আলাপ করতে চাই—বিজয়বাবু বেচারা বুড়ো মানুষ, দুটি ঘণ্টা ধরে ঠায় বসে ছিলেন ঐ জন্যে শুধু। তা কি কোন বিবেচনা আছে—কুচক্করে, স্বার্থপর লোক!

ভূপেন বুঝিল অপূর্ববাবুর কথা হইতেছে, কিন্তু এতটা ঝাঁজের কারণ কিছু অনুমান করিতে পারিল না। সে স্যুটকেস খুলিয়া ধোয়া কাপড় বাহির করিতেছে, যতীনবাবুই আবার ফিস্‌ফিস্ করিয়া কহিলেন, দেশে ঢের জমিজমা আছে মশাই, ভাইদের ফাঁকি দিয়ে, মামলা-মোকদ্দমা করে সব ও নিজে নিয়েছে—হ'লে কি হবে, পয়সার আহিক্কে কিছুতেই যায় না। এখানে যে মাইনে পায় সব তেজারতীতে খাটায়। এত টাকা ছড়িয়েছে মশাই যে, ছুটিতেও এখন বাড়ি যেতে পারে না। সুদই কি কম, গত শ্রাবণ মাসে মেয়েটা টাইফয়েডে যায়-যায় হয়েছিল, তিরিশটি টাকা ধার নিয়েছিলুম, বলব কি মশাই, মাস-কাবার হতে তর সয় না, ঘাড়ে জোল দিয়ে বসে এক টাকা চোদ্দ আনা আদায় করে নেয়। আবার বলে কিনা, তাই আমার লোকসান যাচ্ছে—চাষাভুষো হলে টাকায় দু-আনা পেতুম···চামার-চামার!

বোধকরি বা ঘৃণাতেই, তাঁহার কণ্ঠস্বর কিছুক্ষণের মত বাধিয়া গেল। সেই অবসরে ভূপেন একবার জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া কহিল, চলুন না একটু মাঠে গিয়ে বসি, চমৎকার চাঁদ উঠেছে।

যতীনবাবু অকস্মাৎ খুশী হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, মন্দ বলেন নি, তাই চলুন। এখানে আবার যে সব গুণধরেরা আছেন—আড়ি পাততেও পেছপা নন। ছুটো কথা যে কইব মশাই প্রাণ খুলে—সে উপায় নেই। রাঢ়ের লোকগুলোই পাজি। আপনি আসবেন শুনে আমি মাস্টারমশাইকে বলে আমার ঘরে ব্যবস্থা করলুম।

ভূপেন একটু বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, আপনিও কি কলকাতা থেকে এসেছেন?

ঈষৎ অপ্রতিভভাবে যতীনবাবু উত্তর দিলেন, না—আমার বাড়ি হুগলী জেলায়।

মাঠে তখন চমৎকার জ্যোৎস্না নামিয়াছে। তৃণশূন্য, বৃক্ষলতাশূন্য দিগন্তপ্রসারী মাঠে সে আলো কোথাও কিছুমাত্র ম্লান হইবার অবসর পায় নাই, পালিশকরা রূপার পাতের মতই চক্‌চক্‌ করিতেছে। সেদিকে চাহিয়া ভূপেনের বিস্ময়ের সীমা রহিল না—চাঁদের আলো যে এত উজ্জ্বল হয় তাহা সে এতদিন জানিত না, জ্যোৎস্নার এই অপরিসীম ঔজ্জ্বল্য আর কোথাও কোনদিন ইতিপূর্বে দেখে নাই।

হোস্টেল হইতে অনেকটা দূরে, অর্থাৎ সর্বপ্রকার শ্রবণ-সম্ভাবনার বাহিরে গিয়া যতীনবাবু বসিলেন। পকেট হইতে একটা বিড়ি বাহির করিয়া ধরাইতে ধরাইতে পূর্ব কথারই জের টানিয়া কহিলেন, একটা পয়সা খরচ নেই ভাই ওর, বললে বিশ্বাস করবেন না! হোস্টেল-খরচা মাসে চারটে টাকা, তাও ওর লাগে না। মাস্টারমশাইকে বলে কয়ে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পোস্টটাও নিয়ে নিয়েছে। মাস্টার-মশাই যখন নিজে হোস্টেলে থাকেন তখন ওঁরই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হওয়ার কথা—আর সত্যি-সত্যি দেখেন উনিই, মাঝখান থেকে ও চারটে টাকা বাঁচিয়ে নিলে। সে দিন-কতক কী ভাগবত পড়ার ধুম আর মাস্টারমশাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে মালা জপ করা। ব্যস্—উনি গেলেন গলে—ওঁকে বোঝালে কি জানেন? বললে, আপনি যদি এই সব নিয়ে থাকেন তাহলে সাধন-ভজন করবেন কখন? আমি থাকতে আপনাকে এভাবে সময় নষ্ট করতে দেবো না। অথচ চাকরিটি বাগাবার শুধু ওয়াস্তা, কোথায় বা গেল মালা, কোথায় বা গেল ভাগবত। মাস্টারমশাই এখন আর চক্ষুলজ্জাতে কেড়ে নিতেও পারেন না।

কথা কহিতে কহিতে বিড়ি নিভিয়া গিয়াছিল, সেটা আবার ধরাইয়া দুই তিনটা টান দিয়া যতীনবাবু শুরু করিলেন, অবিচারটা দেখুন, আমরা সবাই ওর চেয়ে কম মাইনে পাই, অবস্থাও আমাদের ঢের খারাপ, কিন্তু সে কথাটা মাস্টার-

মশাই একবারও ভেবে দেখলেন না। ঐ পণ্ডিতমশাই রয়েছেন, ছাপোষা লোক, মাইনে পান মোটে তিরিশটি টাকা—চারটে টাকা ওঁর বেঁচে গেলে কতখানি বাঁচত! তা ছাড়া অক্ষয় রয়েছে, আমি রয়েছি—এ কথাটা ওঁর ভেবে দেখা উচিত ছিল না?

তারপর অকারণেই গলার পর্দাটা নামাইয়া কহিলেন, ঐ অক্ষয়টাই কি কম নাকি, দিন-রাত মাস্টারমশাইয়ের ফরমাশ খেটে আর ওঁর সামনে লোক-দেখানো হরিনাম ক'রে এমন বাগিয়েছে যে চুরি করছে জেনেও মাস্টারমশাই ওকে কিছু বলেন না, ওর হাতেই সব বাজার, মায় ইস্কুলের যা কিছু খুচরো কেনা-কাটা খরচা, সব ওর হাতে। ইস্কুলেও কিছু করে না—এক নম্বরের ফাঁকিবাজ! আর চুক্‌লি খাবার একখানি। খালি মোসাহেবীর জোরে চাকরি করে খায় মশাই, নইলে অন্য ইস্কুল হলে একদিনও চাকরি থাকত না। কিচ্ছু জানে না মশাই, বিশ্বাস করুন। নতুন এসেছেন, ঐ চীজটিকে খুব সাবধান।

সব শুনিয়া ভূপেনের মনটা কেমন যেন দমিয়া যাইতেছিল। মানুষ মানুষই, কলিকাতাতেও অবিনাশবাবু আছেন—সুতরাং দুঃখ করিবার কিছু নাই, কিন্তু বাড়ি হইতে, শহর হইতে, এত দূরে এই নির্জন পল্লীগ্রামে যাহাদের সঙ্গে দিনের পর দিন কাটাইতে হইবে তাহাদের যে পরিচয় সে পাইতেছে, তাহাতে দমিয়া যাইবার কথা। বিশেষত এই যতীনবাবু, যে লোকটি তাহার ঘরেই থাকিবেন—আশ্চর্য, এতক্ষণ ধরিয়া সহকর্মীদের সম্বন্ধে বিষ উদ্গার করা ছাড়া আর কিছুই করেন নাই। কাহারও সম্বন্ধে বলিবার মত ভাল কথা কি কিছুই নাই?

যেন তাহার মনের কথাটা বুঝিতে পারিয়াই যতীনবাবু পুনশ্চ কথা কহিলেন, হ্যাঁ, মানুষ বলি ঐ বিজয়বাবুকে, সাতেও নেই পাঁচেও নেই, একেবারে নিপাট ভাল মানুষ। মানুষের উপকার ছাড়া কখনও অপকার করেন না। অথচ তাঁরই সব চেয়ে দুরবস্থা, ঘরে একপাল ছেলে-নেয়ে, জমি বলতে বিশেষ কিছুই নেই, যা করে এখানের ঐ ক-টা টাকা মাইনে। ভাল লোক কি নেই, কাল চলুন ইস্কুলে সব পরিচয় করিয়ে দেব'খন—আমাদের অধর আছে, খাসা ছোকরা, একটু গান-বাজনার ঝোঁক আছে, তাই নিয়েই থাকে, কারুর কথায় কখনও নাক গলায় না।

তারপর হঠাৎ গলাটা আর একবার নিচু করিয়া প্রশ্ন করিলেন, আপনার ভাগবত পড়া আছে? চৈতন্যচরিতামৃত, নিদেন জয়দেবের দু-একটা শ্লোক?

ভূপেন তাঁহার কথা বলিবার ভঙ্গিতে হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, বিশেষ পড়া নেই, তবে দু-একবার উল্‌টে-পাল্‌টে দেখেছি বই কি। কেন বলুন ত?

যতীনবাবু যেন বিশেষ দুঃখিত হইয়া কহিলেন, তবে আর কি, আপনার চড়চড়

করে মাইনে বেড়ে যাবে। যেমন ইনি, তেমনি সেক্রেটারী—হরি-হরি করেই গেল। আমি মশাই কিছুতেই ঐগুলো পড়তে পারি নে। যদি বা পড়ি ওষুধ-গেলা করে, কাজের সময় কিছুই মনে পড়ে না।

একটু পরেই খাওয়ার ঘণ্টা পড়িল। ভূপেন যতীনবাবুর সঙ্গে খাবার ঘরে গিয়া আহারে বসিল। খাবার ঘর না বলিয়া সেটাকে একটা আটচালা বলাই উচিত—রান্নাঘরের সংলগ্ন এমনি একটা স্থানে সার-সার আসন পড়িয়াছে। ছাত্র ও শিক্ষকেরা একসঙ্গেই বসিয়াছেন, কেবল শিক্ষকদের জন্য একটু স্বতন্ত্র পংক্তির ব্যবস্থা আছে এই মাত্র। ভবদেববাবু ভূপেনকে ডাকিয়া পাশে বসাইলেন, কহিলেন, বেড়াতে বেরিয়েছিলেন বুঝি যতীনবাবুর সঙ্গে? কেমন লাগল আমাদের দেশ?

ভূপেন একটু জোর দিয়াই কহিল, বেশ লাগল। সত্যি এমন চাঁদের আলো এর আগে আর কখনও দেখি নি। আপনার কি এই জেলাতেই বাড়ি?

ভবদেববাবু জবাব দিলেন, না, আমার বাড়ি বর্ধমান জেলায়,—তবে বেশী দূরে নয়। এখান থেকে নিকটেই—

সকলেই আসিয়াছিলেন, খালি পণ্ডিতমহাশয় ছাড়া। তাঁহার জন্য আসন একটি পাতাই ছিল। সেদিকে একবার চাহিয়া ভবদেববাবু হাঁক দিলেন, ঠাকুর, পণ্ডিত-মশাইয়ের ভাত হ'ল?

ভূপেনের দিকে ফিরিয়া ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিলেন, পণ্ডিতমশাই কারুর হাতে ভাত খান না। সব রান্না হয়ে গেলে ওঁর একটি ছোট হাঁড়ি আছে পেতলের, তাতেই ভাত চাপিয়ে দেওয়া হয়, উনি নামিয়ে নেন।

বলিতে বলিতেই পণ্ডিতমহাশয় একটা বেড়িতে করিয়া তাঁহার ছোট হাঁড়িটা ধরিয়া প্রবেশ করিলেন। ততক্ষণে অন্য সকলকেও ভাত দেওয়া হইয়া গিয়াছে—পণ্ডিতমহাশয় আসনে বসিতেই সকলে আহার শুরু করিয়া দিলেন। ভাত, একটা জলবৎ ডাল এবং আলু-বেগুন-কচুর একটা তরকারী। অন্য কোন উপকরণ নাই—ছাত্র ও শিক্ষকরা সকলেই সেই একমাত্র ব্যঞ্জন দিয়া আহার শেষ করিয়া উঠিলেন। এতক্ষণে ভূপেন বুঝিতে পারিল যে মাসিক চার টাকায় কেমন করিয়া খাওয়ানো সম্ভব হয় ইঁহাদের। ভবদেববাবু যেন কতকটা কৈফিয়ৎ দিবার মত করিয়াই কহিলেন, এখানে হপ্তায় দুদিন হাট হয় বটে, কিন্তু বিশেষ কিছুই মেলে না। বেগুন কচু আর কুমড়ো। কখনও কখনও উচ্ছে পাওয়া যায়—সেও দৈবাৎ!

ভূপেন পরে দেখিয়াছিল যে দৈবাৎ উচ্ছে পাওয়া গেলেও কোন সুবিধা হয়

না। সেদিনও সেই একটাই মাত্র ব্যঞ্জন হয়, সকলে আগাগোড়া তেতেরতা কারী দিয়া ভাত খাইয়া ওঠেন। বিশেষ কোনদিন ছাড়া দ্বিতীয় উপকরণের কথা ইঁহারা ভাবিতেও পারেন না—মাছ ত কল্পনার অতীত! জমিদার বাড়িতে কোন ক্রিয়া উপলক্ষে মাছ ধরানো হইলে, এক-একদিন তিনি হয়ত কিছু মাছ পাঠাইয়া দেন। বলা বাহুল্য, সেই সব দিনগুলিতে এখানে রীতিমত উৎসব পড়িয়া যায়।

আহারাদির পর ভবদেববাবু ভূপেনকে নিজের ঘরে আনিয়া বসাইলেন। সে যে জুতাটা বাহিরেই ছাড়িয়া আসিল তাহা লক্ষ্য করিয়া তিনি খুশী হইলেন। হুঁকাটার গা বাঁ-হাতে মুছিয়া লইয়া সেটাকে মুখের কাছে আনিয়া কহিলেন, যাক —আপনি তবু জুতোটা খুলে এলেন। আজকাল অনেকে ঠাকুরদেবতাদের ওটুকু সম্মানও দিতে চান না। ঠাকুর আছেন কি নেই—সেটা বড় তর্ক ভূপেনবাবু? থাকলেও আমার এইটুকুর মধ্যে আছেন কিনা সে কথাটাও আমি তুলব না, আমি শুধু বলতে চাই যে অপরের যদি বিশ্বাস থাকেই, সেটাকে আঘাত করে লাভটা কি বিশেষত যদি তাতে ক্ষতি না হয়—কি বলেন?

—সে ত বটেই! ভূপেন নির্বোধের মত ক্লান্ত কণ্ঠে সায় দিল।

হুঁকায় কয়েকটা টান দিয়া ভবদেববাবু কহিলেন, কেমন দেখছেন গ্রাম, থাকতে পারবেন? কখনও অভ্যেস নেই—মাস্টারী সহ্য হবে কি?

—খুব হবে। ভূপেন কণ্ঠস্বরে জোর দিয়া কহিল, ছেলে পড়াতে আমার খুব ভাল লাগে। এখানে ছাত্রগুলি কেমন?

ঈষৎ অবজ্ঞায় ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ভবদেববাবু কহিলেন,—ঐ একরকম। সত্যি কথা বলতে কি ও-কথা নিয়ে কখনও মাথা ঘামাই নি। জীবন-ধারণের জন্যে একটা বৃত্তি নেওয়া উচিত তাই একটা নিয়ে থাকা—কোনমতে দিনগত পাপক্ষয়। এমনিতেই সাধন-ভজনে বিঘ্নের অন্ত নেই—তার ওপর যদি দিনরাতই ঐ নিয়ে থাকব ত তাঁকে ডাকব কখন?

ভূপেন একটু বিস্মিত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। খানকটা পরে ধীরে ধীরে কহিল, তবু একটা দায়িত্ব ত আছে।

উচ্চাঙ্গের হাসি হাসিয়া ভবদেববাবু কহিলেন, কতটুকু ক্ষমতা আপনার ভূপেনবাবু, কী দায়িত্ব আপনি বইতে পারেন?···আমি ও-সব কিছু বুঝি না, জানি রাধারাণী আমাকে দিয়ে যা করিয়ে নেবার তা নেবেনই। তার বেশী হাঁকড়-পাকড় করে কোন লাভ নেই, তাতে ঠকতে হয়।

তারপর নীরবে কয়েকটা টান দিয়ে পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, আপনার এধারের সাহিত্য কিছু-কিছু পড়া আছে? শ্রীমদ্ভাগবত? আমি গীতার কথা বলছি না,

আমি বলছি ভগবানের—

—বুঝেছি। ভূপেন জবাব দিল, সামান্য সামান্য সামান্য পড়েছি বৈ কি।

—বেশ বেশ। ভালই হ'ল, আপনার সঙ্গে তবু মধ্যে মধ্যে একটু আধটু আলোচনা করা যাবে। বড় খুশী হলুম শুনে। এখন ত লোক ভাবে বুড়ো না হ'লে বুঝি ও-সব বই পড়তে নেই।...বড় রাত হয়ে গেছে, আপনিও ক্লান্ত—নইলে একটা বই একটু পড়ে শোনাতুম। বড় ভাল বই একটা হাতে এসেছে—

ভূপেন আর বেশী ভদ্রতা করিতে পারিল না, তাঁহার প্রথম কথাটারই সূত্র ধরিয়া একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইল। ভবদেববাবু কহিলেন, চললেন? আচ্ছা যান—শুয়ে পড়ুন গে। কাল তখন ভাল করে আলাপ হবে'খন।

ভূপেনের আসল ইচ্ছা ছিল হোস্টেলের ছেলেগুলির সহিত একটু আলাপ করিয়া বাজাইয়া দেখে কিন্তু তখন ক্লান্তিতে তাহার চোখের পাতা বুজিয়া আসিতেছে বলিয়া সে চেষ্টা আর করিল না। আন্দাজে আন্দাজে অন্ধকারেই নিজের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

যতীনবাবু বেচারা বসিয়া ঢুলিতেছিলেন, তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, যাক - তবু ভাল যে শিগ্‌গির ছাড়া পেলেন। আমি বলি এই রাত্রেই বুঝি আপনাকে ভাগবত শোনাতে বসে; নিন মশাই শুয়ে পড়ুন। রাত ঢের হয়েছে।

তিনি আলো নিভাইয়া নিজেও শুইয়া পড়িলেন। কিন্তু ভূপেন ঘুম পাওয়া সত্ত্বেও তখনই শুইতে পারিল না। বিছানায় বসিয়া জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। চাঁদের আলো তখন আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে যেন, বাহিরে মাঠের দিকে চাহিয়া থাকিলে চোখ ধাঁধিয়া যায়।

নির্জন, অতি নির্জন পল্লীগ্রাম। কোথাও কোন প্রাণের লক্ষণ নাই। অন্ধকারে বসিয়া বসিয়া সহসা ভূপেনের মনে হইল, সে যেন সেই সৃষ্টির প্রথম যুগে ফিরিয়া গিয়াছে, সে-ই এ পৃথিবীর প্রথম মানব। শহর, কোলাহল, আত্মীয়স্বজন—চির-পরিচিত সেই সব আবেষ্টনী যেন কোন সুদূর পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে। সে যেন কোন জন্মান্তরের কথা, সে সব যেন স্বপ্নে দেখা!

সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শুইয়া পড়িল। আশা-আকাঙ্ক্ষা, জীবনযুদ্ধ বলিতে আজ আর কিছু রহিল না—সমস্তই তাহার জীবন হইতে লেপিয়া মুছিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। এই জনহীন, কোলাহল-হীন, আশাহীন, নির্বান্ধব, অপরিচিত জীবনের মধ্যে তাহার যেন সমাধি লাভ ঘটিয়াছে।

যাক—হয়ত ভালই হইল। যাহা গিয়াছে, যাহাকে রাখিতে পারা যায় নাই, তাহার জন্য বৃথা শোক আর সে করিবে না; এমন কি এ সংশয়ও মনে রাখিবে

না যে ইহার প্রয়োজন ছিল কিনা।...

ঘুমে সমস্ত চৈতন্য শিথিল হইয়া আসিতেছে, তাহারই মধ্যে মনে পড়িল সন্ধ্যার কথা। কাল সকালে কি তাহাকে একখানা চিঠি দিবে? না, দরকার নাই—তাহাদের নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রার মধ্যে অবাঞ্ছিত নিজেকে সে বারবার নিক্ষেপ করিবে না কিছুতেই। সন্ধ্যা সুখী হোক—আর কিছুই সে চায় না।

॥ ৯ ॥

স্কুলটি ছোট—মোট শ-দুই ছাত্র। সে অনুপাতে শিক্ষকের সংখ্যা খুব কম নয়। যে সব শিক্ষক আছেন, বেশী খাটিবার প্রয়োজন নাই, তাঁহারা একটু মন দিলেই ইহাকে প্রথম শ্রেণীর বিদ্যায়তনে পরিণত করা যায়। কিন্তু কয়েকদিন পড়াইবার পরই ভূপেন বুঝিতে পারিল যে, এই ব্যাপারটা লইয়া এখানে কেহই মাথা ঘামায় না। স্কুলে একটাও খবরের কাগজ আসে না, গ্রামে নাকি মোটে একখানা কাগজ আসে জমিদারের বাড়ি, কিন্তু দুনিয়ার সংবাদের জন্য এত বেশী আগ্রহ ইঁহাদের কাহারও নাই যে সেখানে গিয়া পড়িয়া আসিবেন। কখনও কোন লোকের সঙ্গে দেখা হইলে ভাসা ভাসা দুই-একটা সংবাদ সংগ্রহ করেন—নহিলে অধিকাংশ সময়ই গ্রামের সাধারণ চাষীদের মধ্যে প্রচারিত এবং তাহাদের নিকট হইতে সংগৃহীত গুজব লইয়া আলোচনা করেন। শুধু বাহিরের খবর নয়, বইও দুষ্প্রাপ্য। গ্রামে লাইব্রেরী নাই, থাকা সম্ভব নয়—স্কুলের লাইব্রেরী আছে, বার্ষিক ষাট টাকা তাহার জন্য বরাদ্দও আছে, কিন্তু পুরাতন বই বাঁধাই, ম্যাপ প্রভৃতি কিনিতেই তাহার অর্ধেকের বেশী চলিয়া যায়, বাকী টাকায় গত কয়েক বৎসর ধরিয়া শুধু বৈষ্ণবধর্ম-সংক্রান্ত গ্রন্থ কেনা হইয়াছে—বলা বাহুল্য, ভবদেববাবু ছাড়া সে সব বই আর কেহই পড়েন না। কিন্তু সেজন্য কোন ক্ষোভ বা বেদনা-বোধও কাহারও মনে নাই, কেহ এ বিষয়ে প্রতিবাদ ত দূরের কথা, আলোচনা পর্যন্ত করেন না। অর্থাৎ সাহিত্য গ্রন্থ থাকিলেও যে তাঁহারা কেহ পড়িতেন, বিজ্ঞান কি ইতিহাস বা অন্য' কোন বিষয়ে জ্ঞানলাভে যে তাঁহাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ আছে, এমন সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। শুধু যতীনবাবু কী একটা নূতন উপন্যাস লাইব্রেরীতে কিনিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু ভবদেববাবু কেনেন নাই—এজন্য মধ্যে মধ্যে অনুযোগ করিয়া থাকেন। গত গরমের ছুটিতে একটা বিখ্যাত ফিল্‌ম্ তিনি দেখিয়া আসিয়াছিলেন, ঐ উপন্যাসখানিই নাকি সেই ফিল্‌মের ভিত্তি।

ফলে, বহুদিন আগে স্কুল কলেজে পড়িবার সময় যেটুকু বিদ্যা বা জ্ঞান শিক্ষকরা

আহরণ করিয়াছিলেন, তাহা বৃদ্ধি ত পায়ই নাই—এত দিনের অব্যবহারে তাহারও অনেকখানি মরিচা পড়িয়া গিয়াছে। সব চেয়ে দুর্দশা নিচের ক্লাসগুলিতে। ভূপেন নিজে যখন ছোট ছিল, তখন স্কুলে কি ভাবে পড়ানো হইয়াছে তাহা আজ আর তাহার মনে নাই। তাই মোহিতবাবু যখন বার বার দুঃখ করিয়া বলিতেন—যেখান থেকে শিক্ষার বনেদ গড়ে ওঠে, সেইখানেই আমাদের দেশে সবচেয়ে অবহেলা বাবা, এদিকে যত দিন না আমরা মন দিচ্ছি ততদিন আমাদের নতুন করে জেগে ওঠার কোন আশা নেই, অনার, প্রেস্টীজ, ন্যাশনালিজ্‌ম্—এ সমস্ত সেন্‌স্‌গুলো যদি বাল্যকাল থেকে গড়ে না ওঠে ত পরে হাজার ভাল কথা বললেও বোঝানো যাবে না—অথচ সে সব শেখাবে কারা! লেখাপড়াটাই ভাল করে শেখানো হয় না। যত অপদার্থ লোক সব দেওয়া হয় নিচের ক্লাসে। অথচ ও-দেশের বই-কাগজে অনবরত দেখি—শিশুদের কী করে লেখা-পড়া শেখাবে তাই নিয়ে ওদের দুশ্চিন্তার সীমা নেই—অনবরতই গবেষণা চলছে। আর ওদের কথাই বা শুনতে হবে কেন বাবা, এ ত সহজ কথা যে বনেদ শক্ত না হ'লে সারা ইমারতই দুর্বল হয়ে থাকে।...তখন সে কথার অর্থটা সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই—কথাটা মর্মে মর্মে অনুভব করিল আজ, সত্যের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াইয়া!

আমাদের দেশে শিক্ষার যে কয়টা স্বীকৃত মাপকাঠি আছে, নিচের ক্লাসে যাঁহারা পড়ান, সে মাপকাঠিতেও তাঁহারা বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। লেখাপড়া তাঁহাদের জানা ছিল নামমাত্র—সেই সামান্য সঞ্চয়টুকুই তাঁহারা অভাবে, অস্বাস্থ্যে ও অব্যবহারে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। মাহিনা পান অতি সামান্য—তাহাতে সংসার চলে না। কলিকাতায় সে নিজে টিউশনি করিতে গিয়া এই শ্রেণীর শিক্ষক কয়েকজনকে দেখিয়াছে, সেখানেও ইঁহারা মাহিনা পান লজ্জা-কর রকমের কম। সেজন্য সংখ্যা দিয়া সেটাকে পূরণ না করিলে চলে না। এক-একজন সকালে-বিকালে আটটা পর্যন্ত টিউশনি করেন, ফলে স্কুলে যখন যান তখন শ্রান্তিতে তাঁহাদের সমস্ত স্নায়ু অবশ হইয়া আসে। এখানে টিউশনি নাই কিন্তু জমি-জমা চাষ-বাস আছে। পয়সার জোর নাই বলিয়া সে ব্যাপারেও খাটিতে হয় বেশী—সংসারের কাজও শহরের তুলনায় পল্লীগ্রামে অনেক বেশী—স্কুলে আসিয়াই বলিতে গেলে তাঁহারা বিশ্রামের অবকাশ পান। সুতরাং ভাল করিয়া পড়ানো ত দূরের কথা, ছেলেদের দিকে চোখ মেলিয়া বসিয়া থাকাই সম্ভব হয় না। কোনমতে গতানুগতিক ভাবে পড়া দেওয়া ও পরের দিন পড়া ধরা হয়—সে পড়াটা যে স্কুলেই তৈরী করিয়া দেওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে কাহারও ধারণা পর্যন্ত

নাই। যেন পড়াটা ছেলেরা বাড়িতে তৈয়ারী করিয়াছে কিনা এইটা পরীক্ষা করিবার জন্যই শুধু তাঁহারা বেতন পান। অসহায় শিশুর দল ভুলে-ভরা অর্থপুস্তক মুখস্থ করিয়া কোনমতে ক্লাসে পড়া দেয় এবং পরীক্ষায় পাস করে। যতটা মুখস্থ করে তাহার মধ্য হইতে দুই-একটা বাক্য ছাড় পড়িলেও তাহারা ধরিতে পারে না—যেটুকু লিখিল তাহার অর্থ হয় কিনা সেটা বুঝিবার মত বিদ্যাও তাহাদের কাহারও নাই। শিক্ষকেরাও ইহাতে অভ্যস্ত, ছেলেদের উত্তর-পত্র দেখিয়া কে আশুতোষ দেব এবং সুবল মিত্রের অর্থপুস্তক ব্যবহার করে—এ নাকি তাঁহারা অনায়াসে বলিয়া দিতে পারেন, এ-ই তাঁহাদের গর্ব। তাঁহারা নম্বর দেন সেই-ভাবে, মধ্যে পদ বা বাক্য ছাড় পড়িলে সেই অনুপাতেই নম্বর কাটেন—সবটার অর্থ দাঁড়াইল কিনা সেটা বিবেচনা করিয়া পরীক্ষা করেন না, কারণ, তাহা হইলে না কি 'ঠগ বাছিতে গাঁ উজাড়' হয়।

সব চেয়ে মজার কথা এই যে, অঙ্ক পর্যন্ত এখানে মুখস্থ চলে। পরীক্ষার পূর্বে মাস্টারমশায়রা শক্ত শক্ত অঙ্কগুলি বোর্ডে কষিয়া দেন, ছেলেরা খাতায় হুবহু টুকিয়া লয়, এবং সেইভাবে মুখস্থ করিয়া গিয়া পরীক্ষাপত্রে লেখে। সেখানেও দুই-একটা ধাপ বাদ চলিয়া গেলে অসুবিধা নাই—তাহাতে দুই-এক নম্বর কাটা যায় মাত্র। উপরের ক্লাসে, হেডমাস্টা[illegible]র্জে যেখানে পড়ান, এমন কি সেখানেও, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষাতে কি[illegible]প্রশ্ন আসিতে পারে সেইটা হিসাব করিয়া পড়ানো হয়। কোন ধৃষ্ট ছাত্র যদি অ[illegible] দু-একটা প্রশ্ন করিয়া ফেলে ত মাস্টারমহাশয়রা অম্লানবদনে এই বলিয়া থামাইয়া দেন যে,—ও-সব কোশ্চেন আসে না কখনও। তার চেয়ে আমি যেগুলো বলি দাগ দিয়ে নে। এইগুলো ইম্পর্টেণ্ট, ওটা লিখে রাখ ভেরি ইম্পর্টেণ্ট।

ছেলেরা সেইভাবে তৈয়ারী হইতেছে। অপেক্ষাকৃত ভাল ছেলে যাহারা, তাহারা পূর্ব-পূর্ব বৎসরের ম্যাট্রিকের প্রশ্নপত্র এবং গত বৎসরের টেস্টপেপারগুলি হইতে কঠিন প্রশ্নের জবাব শিক্ষকদের নিকট হইতে লিখাইয়া লয় এবং সেই উত্তরগুলি রাত জাগিয়া মুখস্থ করে। ইহার বেশী তাহারাও জানিতে চাহে না, শিক্ষকরাও জানান না!

ভূপেনের মন এই দূষিত বাতাসে যেন হাঁপাইয়া ওঠে। তাহার স্বপ্ন, তাহার আদর্শ, শিক্ষার এই প্রহসনে বার বার অপমানিত হয়। তাহার ক্ষুব্ধ আত্মা অন্তরে অন্তরে গজরাইতে থাকে, মিছিমিছি ছেলেগুলির এ কৃচ্ছ্রসাধন কেন? এত কষ্ট করিয়া এ কিসের তপস্যা করিতেছে তাহারা? শিক্ষার, না জ্ঞানের, না পাস করার—না চাকরি করার? ছাত্র বা শিক্ষক কাহারও সামনেই শিক্ষার আদর্শ

নাই। ছাত্রদের একমাত্র চিন্তা পাস করিয়া শহরে চাকরি পাইব—শিক্ষকদের একমাত্র চিন্তা ইহাদের পাস করাইয়া চাকুরি বজায় রাখিব। দেশ বা ভবিষ্যৎ জাতি সম্বন্ধে তাঁহাদের যে এ বিষয়ে কোন দায়িত্ব আছে সে কথা স্মরণ করাইতে গেলে হয় ত বা তাঁহারা চমকাইয়া উঠিবেন। ভূপেনকে ক্লাস সেভেন ও এইট-এ ইংরাজী এবং ইতিহাস পড়াইতে দেওয়া হইয়াছিল। সে প্রথমটা পড়াইতে গিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িল। মোহিতবাবুর সংসর্গে আসিয়া শিক্ষাদান সম্বন্ধে তাহার সম্পূর্ণ অন্য রকমের ধারণা হইয়াছিল—শিক্ষাসম্পর্কিত বহু বৈজ্ঞানিক গ্রন্থও তিনি পড়াইয়াছিলেন ভূপেনকে—কিন্তু পড়ানোর সে সব পদ্ধতির সহিত এই ছাত্রগুলির পরিচয় মাত্র নাই—তাহারা শুধু অবাক হইয়া চাহিয়াই থাকে না, পরস্পরের মুখের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করে, হাসাহাসিও করে। ভূপেন যায় তাহাদের পড়াটা বুঝাইয়া দিতে, কিন্তু এই বোঝানোটা যে কি পদার্থ সেইটাই বুঝিতে না পারিয়া তাহারা অস্বস্তি বোধ করে। তাহাদের সেই বিস্মিত ও শূন্য-দৃষ্টির দিকে চাহিয়া ভূপেনের বুকের ভিতরটা ভারী হইয়া আসে—এই সব মূঢ়-ম্লান-মূক মুখে কোন দিন যে ভাষা ফুটাইতে পারিবে, সে আশা আর রাখা যেন সম্ভব হয় না।

পড়াইতে আরম্ভ করার দিন-পনেরোর মধ্যে বার-কয়েকই এই শিক্ষকতা ছাড়িয়া কলিকাতায় ফিরিবার সঙ্কল্প করিয়াছে ভূপেন, কিন্তু তাহার পিতার বিলাপ এবং অবিনাশবাবুর বিদ্রূপের হাসি কল্পনা করিয়া আবার মনকে দৃঢ় করিয়া ফেলিয়াছে। তা ছাড়া, সেখানে গিয়া করিবেই বা কি? এ তবু তাহার নেশার জিনিস, আশার জিনিসও বটে। সেখানে এখন ফিরিয়া গেলে ত সেই কেরানী-গিরি ছাড়া আর কোন পথ খোলা পাইবে না। সে যে কি ব্যাপার তাই বা কে জানে, সে যদি আরও অসহ্য বোধ হয়? তার চেয়ে এই ভাল—এখানে সে যদি একটি ছাত্রের মধ্যেও যথার্থ জ্ঞানের পিপাসা জাগাইতে পারে, যদি একটি ছেলেকেও অন্ধকারে আলোর সন্ধান দিতে পারে, তাহা হইলেও এ কষ্টভোগ, আত্মার এ অবমাননা হয় ত সার্থক হইবে।

ভূপেন একটা ব্যাপারে কিছু সুফলও পাইল। সে, পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে সাধারণ জ্ঞানের বৃদ্ধি হয় অথচ শিক্ষাতেও সাহায্য করে, অন্তত তাহাতে অনুরাগ বাড়ে এমন সব গল্প বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এবং সে ইচ্ছা করিয়াই পাঠ্য পুস্তকের অগ্রগতিকে সংহত করিয়া গল্পের সংখ্যা দিয়াছিল বাড়াইয়া। আর কোন ফল হউক না হউক—তাহার সম্বন্ধে প্রাথমিক একটা যে বিদ্বেষ ও অপরিচয়ের ভাব ছিল, ছেলেদের মন হইতে সেটা দ্রুত দূর হইয়া গেল—এখন বরং তাহারা আগ্রহের সহিতই ভূপেনের ক্লাসের অপেক্ষা করে। শুধু

তাই নয়, ভূপেন দেখিল, শিক্ষকেরা ছাত্রদের সম্বন্ধে যে অনুযোগ করেন, বুঝাইয়া দিলে তাহারা মনে রাখিতে পারে না বলিয়াই বাধ্য হইয়া তাঁহারা মুখস্থ করান, সেটা সম্পূর্ণ না হোক অংশত ভিত্তিহীন। কারণ, ভূপেন বহু দিন পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে যে, গল্পগুলি একবার মাত্র শুনিয়াই তাহারা মনে করিয়া রাখে এবং তাহাদের মধ্যে অনেকেই সেটা পরে আনুপূর্বিক বেশ গুছাইয়া বলিতে পারে। যাহারা এটা পারে, তাহারা যে পড়াটা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলে মনে রাখিতে বা লিখিতে পারিবে না কেন—এ কথাটা ভূপেনের মাথায় কিছুতেই যায় না।

কিন্তু এ-ধারে সুফল পাইলে কি হইবে, বিপদ ও বাধা আসিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে। হঠাৎ একদিন রাত্রে আহারের পর মাঠে বেড়াইতে যাইবার নাম করিয়া যতীনবাবু তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, ও মশাই, এ-ধারে শুনেছেন ঐ অক্ষয় শালা আপনার নামে কি লাগিয়েছে মাস্টারমশায়ের কাছে?

ভূপেন একেবারে আকাশ হইতে পড়িল। সে তাহাব সহকর্মীদের সহিত যথাসাধ্য সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহারই করে, কোথাও কোন ঔদ্ধত্য বা দুর্বিনয় প্রকাশ না পায় সেদিকে তাহার খুব সতর্ক দৃষ্টি থাকে—কিন্তু এ আবার কি কথা? তাহার সম্বন্ধে কাহারও বিদ্বেষ পোষণ করার ত কথা নয়!

সে কহিল—কৈ না ত! আমি আবার কি করলুম?

যতীনবাবু অকারণেই গলাটা খাটো করিয়া কহিলেন—আপনি নাকি বড্ড ফাঁকি দেন ক্লাসে, পড়ার ধার দিয়েও যান না, কেবল গল্প করেন—এই সব। মাস্টারমশাই সে কথা শুনে পদনকে ডেকে পাঠিয়ে কত কি জিজ্ঞেস করলেন—

ক্রোধে ও ক্ষোভে ভূপেনের ললাটের শিরা দুইটা যেন বেদনায় টন্‌টন্ করিতেছিল, সে কতকটা নিশ্বাস রোধ করিয়া প্রশ্ন করিল—কী বললে পদন?

যতীনবাবু কহিলেন—পদন আপনার খুব মুখরক্ষা করেছে। সে বলেছে, না, উনি গল্প ত এমনি করেন না, আমাদের পড়া বুঝিয়ে দেবার জন্যে মাঝে মাঝে উদাহরণস্বরূপ দু-একটা গল্প বলেন।

যতীনবাবু আরও কত কি বলিয়া গেলেন—তাহার একটি কথাও ভূপেনের মাথায় ঢুকিল না, সে শুধু একটা অসহ ও নিষ্ফল ক্রোধে জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। সমস্ত অন্তরটা তাহার রি-রি করিতেছিল। যাহারা যথার্থ ফাঁকি দেয়, যাহাদের শিক্ষা বা শিক্ষকতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র দায়িত্ববোধ নাই, তাহারাই কিনা অপরের ফাঁকি ধরিতে যায়! আশ্চর্য সাহস ত!

রাত্রে বিছানায় শুইয়া বিনিদ্র প্রহরগুলির ফাঁকে ফাঁকে বার বার মন স্থির

করিবার চেষ্টা করিল—এ প্রহসনে আর প্রয়োজন নাই, এইখানেই শেষ করিয়া চলিয়া যাইবে সে। কিন্তু বার বারই মোহিতবাবুর কথাগুলি তাহাকে সে সংকল্প হইতে ফিরাইয়া দিল। মনে পড়িল, মোহিতবাবু একবার কী একটা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, 'বাবা, কর্তব্যের দায়িত্ব বুঝে তা পালন করতে পারে, এমন কি করার চেষ্টাও করে, এ রকম লোক আমাদের দেশেই খুব কম। কাজেই কোথাও তার অভাব দেখলে দুঃখ ক'রো না।' এ ধরনের তুচ্ছ কারণে হয় ত এই কথা প্রয়োগ করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা, তবু সে এইকথাগুলি স্মরণ করিয়াই মনে বল পাইল। মোহিতবাবুকে সে শ্রদ্ধা করিত বটে, কিন্তু তাঁহার প্রত্যেকটি কথাই যে এমন করিয়া মনে গভীর রেখাপাত করিয়া গিয়াছে তাহা সেদিন ছিল কল্পনারও অতীত।

পরের দিন সেক্রেটারী আসিলেন স্কুল দেখিতে। সেক্রেটারী স্থানীয় জমিদার, তাঁহারই অর্থে স্কুলের পাকা বাড়ি হইয়াছে। লোকটি নাকি এককালে ইণ্টার-মিডিয়েট পাস করিয়া মেডিক্যাল কলেজেও ঢুকিয়াছিলেন, তাহার পর আর পড়াশুনা অগ্রসর হয় নাই। অবশ্য তাহাতে সেক্রেটারী হইতে বাধে নাই, কারণ অর্থবল ছিল এবং তিনিই গ্রামের মধ্যে একমাত্র লোক—স্কুলটি সম্বন্ধে যাঁহার কিছুমাত্র অনুরাগ আছে।

স্কুল দেখিতে আসিলেও তিনি কিন্তু অন্য কোথাও গেলেন না, অফিস-ঘরে বসিয়া দুই-একখানা চিঠি সই করিয়াই ভূপেনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ভূপেন তখন পাশের ঘরে অর্থাৎ শিক্ষকদের বসিবার ঘরেই ছিল, সে এ ঘরে আসিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, যতীনবাবু পাশ হইতে প্রায় বিবর্ণ মুখে কহিলেন,—খুব সাবধান ভাই, দেখবেন আপনার পড়ানো নিয়ে কথা উঠবে নিশ্চয়।

বিরক্তিতে ভূপেনের মন ভরিয়া গেল, তবু সে অতি কষ্টে চিত্ত দমন করিয়া শান্তমুখেই এ-ঘরে আসিল। সেক্রেটারী হাসি-হাসি মুখে অভ্যর্থনা করিলেন—এই যে আসুন ভূপেনবাবু, কেমন লাগছে আমাদের দেশ? বসুন, বসুন—

ভূপেন সবিনয়ে নমস্কার জানাইয়া উত্তর দিল—ভালই লাগছে। বেশ দেশ আপনাদের।

তার পর আরও দুই-একটা কুশল প্রশ্নের পর সেক্রেটারী কহিলেন—সামনে এগজামিন আসছে, এখন অবশ্য পড়াশুনোর কোন প্রশ্নই ওঠে না—তবু রিভিসনটা বেশ 'থরো' হওয়া দরকার। এই সময় একটু তাড়াতাড়ি করবেন, বুঝলেন? আপনাকে আর বেশী বলব কি, তবে আমাদের দেশের ছেলেরা বড় ব্যাকওয়ার্ড

বোঝেন ত, সারা বছরের পড়াটা এই সময় অরে একবার ঝালিয়ে না দিলে—বুঝলেন না? এটা পল্লীগ্রামের স্কুল বটে ত?

ভূপেনের কানের কাছটা অকারণেই কতকটা গরম হইয়া উঠিল। সে বুঝিল, যতীনবাবুর অনুমানই ঠিক। মুহূর্ত-কয়েক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—দেখুন, আপনাদের এখানে যে সিস্টেমে পড়ানো হয়, তা কোন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন লোক মেনে নিতে পারে না। আপনি রিভিসনের কথা বলছেন, আমি ত দেখছি, তাদের আদৌ পড়ানোই হয় নি—সেক্ষেত্রে রিভিসন কি করাব বলুন!

হেডমাস্টার ভবদেববাবুর মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল, পাশের ঘরের পর্দার আড়ালে দাঁড়াইয়া যতীনবাবুর দল ভূপেনের আসন্ন সর্বনাশের কথা চিন্তা করিয়া সেই শীতকালেই ঘামিয়া উঠিলেন। কিন্তু ভূপেন তখন মনস্থির করিয়া ফেলিয়াছে, সে যখন অন্যায় করে নাই তখন মাথা নিচু করিয়া তিরস্কার ত নয়ই, এমন কি তাহার কোন প্রকার ইঙ্গিত পর্যন্ত মানিয়া লইবে না।

সেক্রেটারী কতকটা স্তম্ভিত ভাবেই প্রশ্ন করিলেন—আ-আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলুম না ত!

ভূপেন কণ্ঠস্বরে বেশ জোর দিয়াই কহিল—ছেলেদের পড়াটা বুঝিয়ে দেওয়াই হ'ল পড়ানোর আসল উদ্দেশ্য, অন্তত আমরা তাই জানি, কিন্তু আপনাদের এখানে দেখি, বইয়ের খানিকটা জায়গা দেখিয়ে দেওয়া হয়, বড় জোর একবার নিজেরা রিডিং পড়ে দিয়ে সেটা বোঝবার এবং তৈরী করবার সমস্ত দায়িত্ব ছাত্রদের ওপরই ছেড়ে দেওয়া হয়। ফলে তারা কতকগুলো মানের বই দেখে রিডারগুলো পড়ে আর হিস্ট্রি জিওগ্রাফী—মাস্টারমশাইরা যেটাকে ইম্পর্টেণ্ট বলে দাগ দিয়ে দেন সেইগুলো মুখস্থ করে। তাই ওদের এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে অঙ্কসুদ্ধ ওরা মুখস্থ করতে চায়। একে কি আপনি পড়ানো বলেন? এ পড়া ওদের কি কাজে আসবে? এরই ফলে আমরা আজ জাতি হিসেবে সর্বত্র হটে যাচ্ছি। জেনেশুনে ছেলেদের এ সর্বনাশ করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

সেক্রেটারীর মুখ লাল হইয়া উঠিল, কহিলেন—তাহলে এঁরা কি সবাই ছেলেদের সর্বনাশই করছেন এখানে বসে?

—জেনে করছেন না। হয়ত এঁরা এত-সব কথা কোন দিন এভাবে ভেবেই দেখেন নি—গতানুগতিক ভাবে বহু দিন থেকে যে প্রথায় পড়ানো চলে আসছে তারই পুনরাবৃত্তি করছেন মাত্র। কিন্তু আমি এ নিয়ে ভেবেছি, বহু বইও পড়েছি। শিক্ষা সম্বন্ধে ও দেশে যে সব গবেষণা-আলোচনা চলছে তার সবটা না হোক খানিকটারও খবর রাখি। আমি যেটুকু পড়াচ্ছি সেটুকু যতক্ষণ না ছাত্ররা ভাল

করে এবং সহজে বুঝতে পারছে, ততক্ষণ আমি এগোতে পারব না। তাতে তাদের পরীক্ষার ফল ভাল হোক্ আর না হোক্—

তাহার কঠিন কণ্ঠস্বরে সেক্রেটারী বোধ করি একটু দমিয়াই গিয়াছিলেন। খানিকটা ইতস্তত করিয়া কহিলেন—কিন্তু পরীক্ষায় পাস করাটাও ত দরকার, গরিব ছেলে এখানকার, একটা বছর নষ্ট হ'লে ক্ষতি হবে না কি?

ভূপেন জবাব দিল—অন্য সাব্জেক্ট ত আছে, সেগুলোয় পাস করলে আমার সাব্জেক্টের জন্যে আটকাবে না। তা ছাড়া সারা বছরে অনেক মুখস্থ করেছে ওরা, তাতেই পরীক্ষা দিতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস! কিন্তু সেদিক দিয়ে একটু অসুবিধা হলেও, আমার কাছে যতটুকু পড়েছে সেটুকু তাদের সত্যিকার কাজে আসবে।

তারপর একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, অবশ্য আপনাদের যদি অসুবিধা হয় সে আলাদা কথা, সেক্ষেত্রে কোন রকম সঙ্কোচ না করে বলবেন আমি নিঃশব্দেই সরে যাবো। কিন্তু পড়ানোর দায়িত্ব যতক্ষণ আমার ওপর থাকবে, ততক্ষণ আমার বিবেক অনুসারেই আমি চলবো, নিজেকে ফাঁকি দিতে পারবো না। আচ্ছা, নমস্কার।

ভবদেববাবুকেও একটা নমস্কার করিয়া সে বাহির হইয়া আসিল।

॥ ১০ ॥

ব্যাপারটা লইয়া জল্পনা-কল্পনার অন্ত রহিল না। চাকরি যে ভূপেনের যাইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই—শুধু সেটা কবে, সেই তারিখটা লইয়াই যত কিছু আলোচনা। শুধু তাই নয়, ইহার পর দুই-তিন দিন এক বিজয়বাবু ছাড়া অন্য কোন শিক্ষক ভূপেনের সহিত প্রকাশ্যে কথা কহিতেই সাহস করিলেন না। শুধু পণ্ডিতমহাশয় আড়ালে ডাকিয়া কহিলেন, বেশ করেছ ভায়া। আমরা সংসারে জড়িয়ে পড়েছি, আমাদের এখন কোনমতে দিনগত-পাপক্ষয় ক'রে যাওয়া, কিন্তু তোমরা জেনেশুনে অন্যায় করবে কেন! ভালই বলেছ, এরা না রাখে তোমার মত কৃতী ছাত্রের মাস্টারীর অভাব হবে না।

আর প্রকাশ্যেই বাহবা দিলেন বিজয়বাবু। মানুষটি অত্যন্ত নিরীহ, তাঁহার দারিদ্র্যও সর্বজনবিদিত, কিন্তু তবু তিনিই সকলকার সামনে কমন-রুমে বসিয়া বলিলেন, তুমি ভাই আজ যা বলে এলে তাতে এক দিক দিয়ে আমাদেরই অপমান করা হ'ল বটে, কিন্তু অন্যদিক দিয়ে আমাদের মুখও রাখলে। আমাদের যে বিবেক আছে, দায়িত্ব আছে, একথাটা যেন আমরা ভুলেই গেছি। আর সত্যিই

ত, আমরা ছেলেদের পড়াবো আমাদের রিস্ক্-এ, সেখানে যদি অন্যায় কিছু না থাকে তাহ'লে ওঁদের কাছে আমরা ভয়-ভয় করেই বা চলবো কেন, আর ওঁদের ডিক্টেশানই বা মানবো কেন!

ইঁহারা যতটা ভয়ই করুন—ভূপেনের নিজের বিশ্বাস ছিল, শেষ পর্যন্ত সেক্রেটারী কথাটা হজমই করিবেন। সে যখন চলিয়া আসে তখন অন্তত তাঁহার মুখের চেহারায় সেই কথাই ছিল। আর হইলও তাই—একে একে দুই দিন চারি দিন কাটিয়া গেল, না সেক্রেটারী না হেডমাস্টার কাহারও তরফ হইতে কোন উচ্চবাচ্য হইল না। বরং ভবদেববাবু একদিন ভূপেনকে ডাকিয়া বলিলেন, কাল সেক্রেটারী আপনার পড়ানো আড়াল থেকে শুনেছেন। তিনি খুব প্রশংসা করলেন আপনার মেথডের। এসব কি আপনি বই পড়ে শিখেছেন?...হ্যাঁ, এডুকেশন সম্বন্ধে অনেক বই বেরিয়েছে বটে আজকাল, আমাদের প্রথম বয়সে এসব ছিল না, পড়িও নি। এখন আর সময় হয় না, কাজের বই—মানুষের জীবনে যা সত্যিকারের কাজে আসবে, তাই বা কখানা পড়তে পাই এখন!...রাধে রাধে,—জানি না রাধারাণী কোন দিন অবসর দেবেন কিনা আবার।

এক্ষেত্রেও মোহিতবাবুর কথাটা কাজে লাগিয়া গেল, তিনি প্রায়ই বলিতেন, 'মানুষকে যত ভয় করবে বাবা, তত সে পেয়ে বসবে। এক পক্ষ কঠিন হলেই দেখবে অপর পক্ষ নরম হয়ে গেছে। একটা কথা মনে রেখো, ভবিষ্যৎ জীবনে যদি কোথাও কোন বোঝাপড়া করার সময় আসে আর সে সময় যদি সত্য তোমার দিকে থাকে, তাহলে তুমিই আগে রুখে উঠবে—তা প্রতিপক্ষ যত প্রবলই হোক।'

কথাটা ভূপেন প্রচার না করিলেও চাপা রহিল না। ফল হইল এই যে, এবার শিক্ষক মহাশয়েরা দুটি বড় দলে ভাগ হইয়া গেলেন। একদল ভূপেনের অনুরাগী হইয়া উঠিলেন, আর এক দল মুখে মিষ্টি কথা বলিয়া এবং সমীহ করিয়া চলিলেও মনে মনে তাহার সম্বন্ধে অত্যন্ত বিদ্বেষ পোষণ করিতে লাগিলেন। শেষোক্ত দলের দলপতি হইলেন অপূর্ববাবু! ভূপেনের প্রথম হইতেই এই মানুষটিকে ভাল লাগে নাই, অপূর্ববাবুরও মনোভাব তাহার সম্বন্ধে কখনও ভাল ছিল না। এখন তিনি স্পষ্টই ভূপেনকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভূপেন এতদিন মোহিতবাবুর কাছে বৃথা শিক্ষা পায় নাই, সে নিজের শান্ত উপেক্ষার বর্মে তাঁহার সমস্ত আক্রমণই ফিরাইয়া দিত—কোন বিদ্রূপই তাহার সে বর্ম ভেদ করিয়া তাহাকে বিচলিত করিতে পারিত না।

কিন্তু এই সমস্ত দলাদলির মধ্যে একজন শুধু ছিলেন অত্যন্ত নির্বিরোধী, পবিত্র—তিনি বিজয়বাবু। যত দিন যাইতে লাগিল, ততই ভূপেন এই মধুর-

প্রকৃতি মানুষটির অনুরক্ত হইয়া উঠিল। লোকটি দরিদ্র, লেখাপড়াও ভাল করিতে পারেন নাই—বি-এ ফেল করিয়া মাস্টারী করিতে ঢুকিয়াছিলেন, সেদিন আশা ছিল যে, আর একবার পরীক্ষা দিয়া বি-এ এবং এম-এ পাস করিবেন চাকুরী করিতে-করিতেই; কিন্তু সংসারের চাপে সেটা আর কোন দিনই সম্ভব হইয়া ওঠে নাই। তাই আজও তাঁহাকে অল্প বেতনে নিচের ক্লাসেই মাস্টারী করিতে হয়—আজও প্রতিটি দিনের সমস্যা তাঁহার কাছে জীবন-মরণের সমস্যা হইয়া আছে; সন্ধ্যার পূর্বেই তাঁহাকে আহারাদি সারিয়া প্রদীপের সামান্য তেলটুকু বাঁচাইবার সাধনা করিতে হয়। অথচ—বিজয়বাবু একদিনমাত্র দুঃখ করিয়া তাহাকে বলিয়াছিলেন—তাঁহার এক দূর-সম্পর্কের মামা ছিলেন রেলের বড় অফিসার, তিনি বার বার বলিয়াছিলেন যে বি-এ পাস করিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিলেই তিনি একটা ভাল ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। গ্র্যাজুয়েট যে নয় তাহাকে আত্মীয় বলিয়া তিনি পরিচয় দিতে পারিবেন না, বা আত্মীয় পরিচয় দিয়া কোন ছোট কাজেও লাগাইতে পারিবেন না, কিন্তু সে সুযোগ বিজয়বাবু লইতে পারেন নাই—আর একটা বছর পড়িবার মত বা অপেক্ষা করিবার মত সংস্থান ছিল না বলিয়া।

ভূপেন প্রশ্ন করিয়াছিল, কিন্তু আপনি ফেলই বা করলেন কি করে। আপনাকে দেখে ত ঠিক সে শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন বলে মনে হয় না।

মিনিট দুই চুপ করিয়া থাকিয়া বিজয়বাবু উত্তর দিয়াছিলেন, ফোর্থ ইয়ারে উঠতেই মা মারা গেলেন, বাবা বুড়ো মানুষ, রাঁধতে পারতেন না, আমিও বড় অপটু ছিলাম ওসব ব্যাপারে। তাই বাধ্য হয়েই বাবা বিয়ে দিলেন। মায়ের মৃত্যু, তার ওপর পরীক্ষার ঠিক আগে বিয়ে—দুটো জড়িয়ে কেমন সব গোলমাল হয়ে গেল। নইলে পড়াশুনোয় আমার সত্যিই মন ছিল ভাই—আমরা বড় গরিব তা ত জানই, ছেলেবেলায় যখন খুব ক্ষিধে পেত, বই নিয়ে বসতুম। পড়তে বসলে আর ক্ষিধের কথা মনে থাকত না।

আরও একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বিজয়বাবু আবার বলিলেন, অবশ্য ফেল করার জন্যে আমি কারুরই দোষ দিই না, এমন কি অদৃষ্টেরও না—আমার স্ত্রী বড় মিষ্টি মেয়ে ছিলেন—হয়ত ঠিক রূপসী নন, তবু তাঁকে পেয়েই আমার জীবন ধন্য হয়েছে। দারিদ্র্য ত আছেই—চিরদিনই ছিল, চিরদিনই থাকবে—ওটা গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে; কিন্তু সে সমস্ত দুঃখ ছাপিয়েও তিনি যে মাধুর্য দিয়েছেন তাকে কোন দিনই অস্বীকার করতে পারব না। বিয়ের পর ছ'টি মাস যে স্বপ্নে কেটেছে তার স্মৃতি আমার মনে অক্ষয় হয়ে আছে, সেইটুকু সে দিন পেয়েছিলুম

বলেই আজ আমি অনায়াসে একটুও ইতস্তত না করে বলতে পারব যে, এ পৃথিবীতে আসা আমার সার্থক হয়েছে। তারপর অনেক দুঃখ পেয়েছি, তিনিও পেয়েছেন—গয়না ত দূরের কথা, একটা কাপড়ও কোনদিন কিনে দিতে পারি নি—এমন কি তাঁর অসুখের সময় চিকিৎসাও করাতে পারি নি। তবু মনে হয় কি জানো ভাই—মানুষ স্বার্থপর বলেই বোধ হয় মনে হয়—বাবা সেদিন বিয়ে দিয়ে ভালই করেছিলেন, আমি ত আমার জীবনের পাথেয় পেয়ে গেছি।

স্ত্রীর কথা বলিতে বলিতে তাঁহার চোখ দুটি ছল ছল করিয়া উঠিল।

ভূপেনের মন ব্যথায়, শ্রদ্ধায় ভরিয়া গিয়াছিল ; সে শুধু চুপিচুপি কহিল, বৌদি কি নেই দাদা ?

সহজকণ্ঠেই বিজয়বাবু উত্তর দিলেন, না ভাই, আজ বছর-পাঁচেক হ'ল নেই।

—তা হ'লে সংসার ?

—এক বিধবা দিদি আছেন, তা তিনি আবার চোখে ভাল দেখেন না। সংসার চালায় আমার বড় মেয়ে কল্যাণী। বড় লক্ষ্মী মেয়ে ভাই, বড় ঠাণ্ডা মেয়ে। মায়ের মতই স্বভাব হয়েছে, খাটতে পারে বরং তার চেয়েও বেশী···মেয়েটা বড় হয়ে উঠেছে ভাই, আঠারো বছরে পড়ল। কী ক'রে কার হাতে যে দেব তা জানি না। আর দিলেই বা চলবে কি ক'রে—দিন রাত আকাশ-পাতাল ভাবছি, ভেবে কূল-কিনারা পাই না।

বিজয়বাবু এমনিতে অত্যন্ত শান্ত, বরং চাপা বলাই ভাল। একদিন মাত্র মনের আবেগে কথা-কয়টি বলিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু ভূপেন সেটা ভুলিতে পারে নাই। ঐ কয়টি কথাতেই তাঁহার যে অন্তরের পরিচয় সে পাইয়াছিল, তাহাতেই তাহার তৃষ্ণার্ত হৃদয় তাঁহাকে অবলম্বন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এখানে আসিয়া পর্যন্ত মনে হইতেছিল যেন সে মরুভূমিতে আছে—অথচ একজনও যদি অন্তরঙ্গ না থাকে ত, মানুষ বাঁচে কি করিয়া ? বিজয়বাবুকে সে শ্রদ্ধা করিত বরাবরই, কারণ তিনিই স্কুলের মধ্যে বোধ হয় একমাত্র মানুষ—যাঁহাকে কখনও কাহারও সম্বন্ধে একটিও অপ্রিয় কথা বলিতে ভূপেন শোনে নাই। পৃথিবীতে কাহারও বিরুদ্ধে তাঁহার নালিশ ছিল না—না মানুষ, না ভগবান।

সেক্রেটারী-সংবাদের কয়েক দিন পরেই সহসা ভূপেন ছুটির পর একদিন বলিয়া বসিল, চলুন দাদা, আপনার বাড়ি ঘুরে আসি।

বিজয়বাবু যেন মুহূর্তের জন্য একটু বিব্রত হইয়া উঠিলেন, তাহার পরই সহজ-কণ্ঠে কহিলেন, চলো না ভাই, সে ত আমার সৌভাগ্য।

তাহার পর পথ চলিতে চলিতে প্রায় রুদ্ধ-কণ্ঠে কহিলেন, অনেক দিন এই কথা

আমার মনে হয়েছে ভাই—আর আমারই বলা উচিত ছিল আগে কিন্তু সাহস পাই নি, আমরা বড় গরিব ভাই—কি জানি কি ভাববে, তুমি, শহরের লোক। এ সঙ্কোচ রাখা হয়ত উচিত ছিল না—তবু এড়াতেও পারি নি।

ভূপেন স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, তাতে কি হয়েছে দাদা, আমি ত আপনার আহ্বান পর্যন্ত অপেক্ষা করি নি। তা ছাড়া সঙ্কোচ মানুষ মাত্রেরই থাকে।

বিজয়বাবুর বাড়িটি ছোট নয়, সাধারণ মাটির বাড়ি, কিন্তু বেশ বড়। ঘরও এককালে কম ছিল না, যদিচ তাহার অনেক কয়টাই সংস্কারের অভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, মাত্র দুইটি ব্যবহার করা যায়। কিন্তু সে দুটিও অবিলম্বে খড় না পড়িলে যে বেশীদিন টিকিবে না—তাহা একবার মাত্র চোখ বুলাইয়াই ভূপেন বুঝিতে পারিল। বাড়ির উঠানে একটা কঙ্কালসার গরু বাঁধা—একটা মরাইয়ের বেদিও আছে, অর্থাৎ সাধারণ গৃহস্থের যাহা থাকা উচিত তা এককালে সবই ছিল। কিন্তু আজ দারিদ্র্য ও লোকাভাবের ছাপ তাহার সর্বাঙ্গে মাখানো। উঠানে ভাঙ্গাচোরা কাঠ-কাঠরা, কতকগুলি পুরানো টিন স্তূপাকার করা—বোধহয় বহুকাল হইতেই ঐ ভাবে আছে—তাহাদের উপরে অসংখ্য বন্য গাছ লতাইয়া উঠিয়াছে।

কতকটা কৈফিয়তেরই সুরে বিজয়বাবু কহিলেন, ঐ ত একটা মেয়ে, সারাদিন রেঁধে, গরুর কাজ করে, বাসন মেজে আর এ-সব পরিষ্কার করা পেরে ওঠে না। ও মা কল্যাণী, এ-দিকে একবার এস মা।

—যাই বাবা!—বলিয়া বোধ করি রান্না-ঘর হইতেই একটি বছর-সতেরোর তরুণী মেয়ে বাহির হইয়া আসিল। তাহার রং ময়লা, যদিও একেবারে কালো নয়! সাধারণ ধরনের মুখ, একহারা ঢ্যাঙ্গা গঠন—তবু মোটের উপর একেবারে শ্রীর অভাব নাই—ভূপেনের বরং ভালই লাগিল।

সহসা বাহিরে আসিয়াই বিজয়বাবুর সহিত অপরিচিত লোককে দেখিয়া কল্যাণী থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। বিজয়বাবু কহিলেন, দাঁড়ালি কেন মা, আয় আয় —ইনিই সেই ভূপেনবাবু, আমাদের নতুন মাস্টারমশাই। এঁর কথা ত তোকে অনেক বলেছি মা।

তাহার পর ভূপেনের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, এই মেয়েটিই আমার এখন বন্ধু সেক্রেটারী সব—যা কিছু গল্প ওর সঙ্গেই করি।

কল্যাণী প্রথমটায় লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তাহার পর আর সঙ্কোচ করিল না। দাওয়ায় একটা মাদুর পাতিয়া দিয়া কহিল, বসুন আপনারা। চা হবে ত বাবা?

বিজয়বাবু কহিলেন, দুধ আছে কি!—আমি ত 'র' চা খাই—কিন্তু ভায়া আমার—

কল্যাণী নতমুখে কহিল, সে যা হয় হবে বাবা!

বিজয়বাবু নিশ্চিন্ত এবং খুশী হইয়া কহিলেন, 'বেশ, বেশ। ব'স ভাই, ব'স—'

একটু পরে কল্যাণীর ছোট একটি ভাই একটা বাটি হাতে কোথায় বাহির হইয়া গেল। ভূপেন বুঝিল যে, সে দুধের সন্ধানেই চলিয়াছে। এই অল্পবয়সী মেয়েটি যে দরিদ্রের সংসারের সব ভার নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছে, তাহা বুঝিয়া সে একটু বিস্মিত হইল। সে প্রশ্ন করিল, ছেলেমেয়ে কটি দাদা?

—মেয়ে ঐ একটি ভাই—ছেলে তিনটি। মেয়েটাই সকলের বড়।

আরও দুই-একটি কথার পর কল্যাণী চা লইয়া আসিল। একটা কলাইয়ের পাত্রে তেলমাখা মুড়ি, খানিকটা পাটালী গুড় এবং কলাইয়ের বাটিতে চা। বিজয়-বাবুর যেন হঠাৎ চমক ভাঙ্গিল—কহিলেন, চিনি ছিল মা?

সলজ্জ ভাবে হাসিয়া কল্যাণী কহিল, গুড় থেকেই চিনি করে নিয়েছি বাবা। কেন, গন্ধ হয়েছে গুড়ের?

বিজয়বাবু তাড়াতাড়ি কহিলেন, না—না, গন্ধ হবে কেন।

কল্যাণী মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, তোমার যা ব্যাপার, তোমাকে জিজ্ঞাসা করাই ভুল। ও-বেলা ডালে নুন দিতে ভুলে গিয়েছিলুম, তা ত তুমি একবারও বললে না বাবা, নুনও চাইলে না। তোমার কি জিভে স্বাদও লাগে না?

বিজয়বাবু অপ্রতিভ ভাবে কহিলেন, নুন কি হয় নি মা ডালে? কৈ, আমি ত বুঝতে পারি নি।

কী সর্বনাশ! হাসি চাপিতে গিয়া ভূপেনের বিষম লাগিয়া গেল। সে কহিল, স্রেফ্ আলুনি খেয়ে উঠে গেলেন? আশ্চর্য!

—অতটা বুঝতে পারিনি—বলিয়া বিজয়বাবু মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

কল্যাণী সস্নেহে অনুযোগের সুরে কহিল, কি লোককে নিয়ে যে আমায় ঘর করতে হয় তা যদি জানতেন! রাত্রে শোবার আগে কিছুতেই দোরে খিল দিতে দেন না, বলেন, আমরাও ভগবানের নাম করে শুই, চোরেরাও ভগবানের নাম ক'রে বেরোয়—তিনি যে-দিন যাকে যা দেবার দেবেনই। দোর বন্ধ ক'রে কাকে ঠেকাবি বল্!

হেমন্তের ম্লান গোধূলির আলোতে বিজয়বাবুর শীর্ণ বলিরেখাঙ্কিত মুখই যেন ভূপেনের চোখে পরম রমণীয় হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, এই দূর প্রবাসে দাসত্ব করিতে আসিয়া এই একান্ত ভাগবত মানুষটির সাহচর্যে তাহার একটা বড়

লাভ হইয়াছে।

ইহার পর গল্প জমিয়া উঠিল দ্রুত। মেয়েটি তাহার বাপ সম্বন্ধে বহু অনুযোগ করিল কিন্তু প্রত্যেকটিই তাঁহার প্রতি কন্যার গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগের পরিচায়ক! এমনি বহুক্ষণ ধরিয়া কল্যাণী ও বিজয়বাবুর সহিত গল্প করিয়া অনেক রাত্রে যখন সে আবার হোস্টেলের পথ ধরিল, তখন তাহার মনে হইল যে, অনেক দিন পরে তাহার মনটা কী কারণে যেন হাল্‌কা হইয়া গিয়াছে।

১১

এ স্কুলে আসিয়া ভূপেনের আর একটা বড় লাভ হইল, সে ঐ ছাত্র দুইটি—পদন ও সালেক।

সমস্ত স্কুলে, অন্তত ভূপেন যতটা পড়াইত তার মধ্যে, এই দুটি ছেলেই শুধু তাহাকে সন্ধ্যার কথাটা মধ্যে মধ্যে স্মরণ করাইয়া দিত। হয়ত ঠিক অতটা শ্রদ্ধা ছিল না লেখাপড়ার উপর—কিন্তু আগ্রহ ছিল। তাছাড়া পড়া বুঝাইতে গিয়া অপেক্ষাকৃত নীরস অংশ পড়াইবার সময় যখন অন্য সমস্ত ছাত্রের চোখই স্তিমিত বা অন্যমনস্ক হইয়া পড়িত, তখন মাত্র এই চারিটি চোখেই সে মনোযোগের আলো দেখিতে পাইত। তাহার অধ্যাপনার নূতন পদ্ধতির সহিতও এই দুইটি ছাত্রই প্রথম তাল রাখিয়া চলিতে শুরু করে। ইহাদের মধ্যে পদনের মাথাটা ছিল অপেক্ষাকৃত মোটা কিন্তু তাহার আগ্রহ এবং চেষ্টা ছিল খুব বেশী, সেজন্য বুদ্ধির সামান্য অভাবটুকু সে অধ্যবসায়ের দ্বারা পুরাইয়া লইত। সালেকের স্বাস্থ্য তত ভাল ছিল না বলিয়া পদনের সমান পরিশ্রম করিতে পারিত না বটে কিন্তু তাহার প্রয়োজনও হইত না, পড়াটা সহজেই তাহার মাথায় ঢুকিত। ফলে, পরীক্ষার সময় দুইজনেই কাছাকাছি থাকিত, একজন অপরকে ফেলিয়া বেশী দূর যাইতে পারিত না।

গুরুরও যেমন ছাত্রকে চিনিয়া লইতে দেরি হয় না, ছাত্ররাও তেমনি সহজে গুরুকে চিনিতে পারে। এই ছেলে দুইটিও কয়েক দিনের মধ্যেই ভূপেনের অনুরক্ত হইয়া উঠিল। স্কুলে ফুটবল বা ক্রিকেট ইত্যাদি কোন খেলার ব্যবস্থা ছিল না, বাহির হইতে যে সব ছেলেরা পড়িতে আসিত, ছুটির পর হাঁটিয়া বাড়ি ফিরিতেই তাহাদের ব্যায়ামের কাজ সারা হইত; হোস্টেলের ছেলেরা দুই-এক জন স্কুল হইতে ফিরিয়া ঘরেই বসিয়া থাকিত কিন্তু অধিকাংশ ছেলেই ছোট ছোট দলে ভাগ হইয়া গ্রাম্য-খেলায় অপরাহ্ণটা কাটাইত। পদন ছিল এই দলে কিন্তু সালেক ইহাদের সঙ্গে তেমন মিশিতে পারিত না, সে কোন দিন হয়ত নিজে নিজেই ঘুরিয়া বেড়াইত, কোন কোন দিন ইহাদের খেলার কাছে চুপ করিয়া বসিয়া দেখিত। ভূপেন

এখানে কয় দিন থাকিবার পর অন্যান্য মাস্টার মহাশয়দের সংসর্গে যখন প্রায় হাঁপাইয়া উঠিল, তখন নিজেই যাচিয়া এই ছেলে দুইটিকে সঙ্গী করিয়া লইল। সকালে সে ইচ্ছা করিয়াই বিনা পারিশ্রমিকে এই ছেলে দুইটিকে পড়াইতে বসিত, কোন দিন বা নিজেদের হোস্টেলের রোয়াকে, কোন দিন বা সালেকদের হোস্টেলের দাওয়ায়। এখানে গোলমাল বেশী, সালেকদের ওখানে পড়ানোর দিক দিয়া অনেক সুবিধা, কিন্তু ভূপেন ভরসা করিয়া সব দিন ওখানে যাইতে পারিত না—কারণ লক্ষ্য করিয়াছিল যে ভবদেববাবু বা অন্য মাস্টার মহাশয়রা কেহই ঠিক মুসলমান হোস্টেলের ছোঁয়াচ পছন্দ করেন না। তবে এক একদিন যখন এখানকার গোলমাল অসহ্য হইয়া উঠিত তখন প্রায় মরীয়া হইয়াই সে সালেকদের দাওয়ায় গিয়া বসিত।

সকালে চলিত স্কুলের পড়া—পরীক্ষার প্রস্তুতি, আর বিকালে শুরু হইত শখের পড়া। ভূপেন ছাত্র দুইটিকে লইয়া জলযোগের পর বাহির হইয়া পড়িত মাঠে—ধূলি-ধূসর পায়ে হাঁটা পথ ছাড়িয়া সে উঠিত ডাঙ্গায়, কোন কোন দিন বা ধান-ক্ষেতের মধ্য দিয়া গিয়া পড়িত নদীর ধারে। গ্রাম হইতে বহু দূরে আর একটি ছোট গ্রামের প্রান্তে অতি শীর্ণ জলের রেখা, নদী হিসাবে তাহার কোন মূল্যই নাই, সেটা নদীর পরিহাস মাত্র, তবু ভূপেনের মন কঠিন ধূলি-বিবর্ণ জলহীন দেশে থাকিতে থাকিতে সামান্য জলরেখাটির জন্যই তৃষিত হইয়া উঠিত—তাই মধ্যে মধ্যে এখানে না আসিয়া থাকিতে পারিত না। কিন্তু তবু এ বেড়ানোর মধ্যে ভ্রমণ বা ব্যায়ামটা বড় কথা নয়—পড়ানোটাই আসল। সে এই সময় স্কুলের পড়া বাদ দিয়া যতটা সম্ভব মুখে মুখে বাহিরের জগতের পরিচয় দিবার চেষ্টা করিত। দেশ-বিদেশের কথা, নানা জাতির ইতিহাস, ভাল ভাল বইয়ের গল্প, জননায়ক ও সাহিত্যিকদের জীবনী, বিজ্ঞানের চমকপ্রদ আবিষ্কারের কাহিনী—অর্থাৎ সাধারণ জ্ঞানের সব বিভাগই তাহাদের গল্পের মধ্যে আলোচিত হইত। প্রথম প্রথম এ সমস্ত কথা উহারা শুধু অবাক হইয়া শুনিত, প্রশ্ন করিতে পারিত না। তাহাদের ইস্কুল, এই কয়টি পরিচিত গ্রাম এবং লোকমুখে-শোনা কলিকাতা শহরের বাহিরে যে একটা বিরাট জগৎ পড়িয়া আছে, এ যেন তাহাদের কাছে বিশ্বাস করাই কঠিন। ক্রমে একটু একটু করিয়া বিস্ময়ের ঘোরটা কাটিলে তাহারা সাহস করিয়া প্রশ্ন করিতে শুরু করিল, তাহাদের কৌতূহল ভরসা পাইয়া নূতন জগতে প্রবেশের পথ খুঁজিতে লাগিল।

ভূপেনেও তাহাদের কাছে আশানুরূপ সাড়া পাইয়া উৎসাহ বোধ করিল। সে একটু একটু করিয়া এই ছেলে দুইটির কাছে তাহার ভাণ্ডার উজাড় করিয়া দিতে

লাগিল। এ যেন এক নূতন নেশা—সন্ধ্যার যোগ্যতা তাহাদের নাই সত্য কথা, তাহাকে এই সব গল্প বলিয়া যে আরাম পাওয়া যাইত তা এ ক্ষেত্রে পাওয়া সম্ভব নয়, তবু তাহার নিজের শক্তিকে বিকশিত করিয়া তুলিবার এ একটা পথ ত বটে! ক্রমে তাহাদের এই বেড়াইবার সময় দীর্ঘতর হইয়া উঠিতে লাগিল, ফিরিতে রোজই প্রায় সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যাইত কিন্তু তাহাতে কোন পক্ষেরই আপত্তি থাকিত না। হাঁটা এবং বকা এই ডবল পরিশ্রমে ভূপেনের অন্ততঃ ক্লান্তি বোধ করিবার কথা কিন্তু সে যেন ঘুরিয়া আসিবার পর নিজেকে অপেক্ষাকৃত সুস্থই মনে করিত। সে যে শিক্ষকতা করিতেছে না—সামান্য কয়েকটা টাকা বেতনে দাসত্ব করিতেছে, এই কথাটা সে এই সময়েই কতকটা ভুলিয়া থাকিতে পারিত।

কিন্তু মাস্টারমহাশয়রা তাহার এতটা বাড়াবাড়িকে মোটেই প্রীতির চোখে দেখিতেন না। যতীনবাবু প্রত্যহই রাত্রে অনুযোগ করিতেন, কী ক'রে যে মশাই ঐ দুটো পাড়াগেঁয়ে ভূতের সঙ্গে ঘুরে বেড়ান বুঝি না। আমার ত এদের সঙ্গে কথা কইতে ঘেন্না করে।

কোন দিন বা বলিতেন, আর বকেনই বা কী ক'রে অত মশাই? ইস্কুলে বকতে হয় নিতান্ত পেটের দায়ে। মাইনে নিচ্ছি ঐ জন্যে, না বকলে চলে না তাই—তার পরও আবার ঐ আহাম্মক ছোঁড়াগুলোর সঙ্গে বকতে ইচ্ছে করে আপনার? আশ্চর্য!

অপূর্ববাবুও একদিন টিফিনের সময় কথাটা পাড়িলেন, বন্ধু-বান্ধব সব ছেড়ে ঐ ছেলে-দুটোর সঙ্গে রোজ সকালে বিকেলে অতক্ষণ কাটান কি ক'রে মশাই? বিরক্তি বোধ হয় না?

ভূপেন এক কোণে বসিয়া কি একটা বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থ পড়িতেছিল, (বইটা কয়-দিন আগে ভবদেববাবু দিয়াছেন, রোজই তাগাদা করেন পড়া হইয়াছে কিনা) জবাব দিল, বিরক্তি বোধ করলে আর ও কাজ করব কেন বলুন! আমার ভালই লাগে।

রাধাকমলবাবু টিপ্পনী কাটিলেন, আসলে আমাদের সঙ্গ ওঁর ভাল লাগে না—আমাদের সঙ্গে গল্প করার চেয়ে ওদের সঙ্গে বক্-বক্ করাও ঢের ভাল, বুঝলে না?

ভূপেন মুহূর্তে নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইল। কণ্ঠস্বরে নিরাসক্তি আনিয়া উত্তর দিল, তা কথাটা এক রকম মন্দ বলেন নি পণ্ডিত মশাই। হাজার হোক ওরা ছেলে-মানুষ, আমাদের মত কুটিলতা বা সাংসারিক জ্ঞান ত ওদের মধ্যে এখনও ঢোকে নি! ওদের সঙ্গে গল্প ক'রে এখনও আনন্দ পাওয়া যায়।

যতীনবাবু ফস্ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, আপনি কি বলতে চান, আমরা সবাই কুটিল।

শান্তকণ্ঠে ভূপেন জবাব দিল, শুধু আপনারা কেন, আমরা সবাই কি অল্পবিস্তর সোফিস্টিকেটেড হ'তে বাধ্য হই নি, সংসারের ঘূর্ণিতে পড়ে?

যতীনবাবু তাহার কথাটার ঠিক জবাব না দিয়া বলিলেন, যতই সরল হোক মশাই, ঐ পাড়াগেঁয়ে ভূত-দুটোর সঙ্গে দিন-রাত বকার কথা আমি অন্তত ভাবতেই পারতুম না।

ভূপেন বইতে চোখ রাখিয়াই কহিল, আমাদের শহুরে বাড়ি, মুখ বদল হিসেবে পাড়াগাঁয়ের লোক ভালই লাগে। তা ছাড়া আপনারা এসেছেন চাকরি করতে, আমি এসেছি পড়াতে, পড়ানোই আমার শখ! ভাল ছেলে পেলে আমার খুশী হবারই কথা।...চাকরি করার দরকার হ'লে আমি এত দিন কলকাতার অফিসে পাকা হয়ে যেতে পারতুম।

অপূর্ববাবু মুখটা বিকৃত করিয়া কহিলেন, শখ ক'রে আবার কেউ পড়াতে আসে, আশ্চর্য!

সেদিনের মত কথাটা সেখানেই চাপা পড়িয়া গেল, যদিও আপস-আলোচনায় এটাই সাব্যস্ত হইল যে, নিরতিশয় দম্ভ-হেতু ভূপেন ইচ্ছা করিয়াই মাস্টার-মহাশয়দের সঙ্গ এড়াইয়া চলে; আর সেই জন্যই ঐ ছোঁড়া দুইটাকে লইয়া সময় কাটায়।

কিন্তু প্রসঙ্গটার ঐখানেই শেষ হইল না। স্বয়ং ভবদেববাবু একদিন তাহাকে ডাকিয়া কথাটা পাড়িলেন। বলিলেন, ভূপেনবাবু, ওদের নিয়ে অত রাত অবধি কোথায় বেড়ান? সাপখোপের দেশ মশাই, অতটা রাত না করাই ভাল।

ভূপেন সবিনয়ে কহিল, তা অবশ্য বটে, তবে শীতকাল, সাপের ভয় বিশেষ নেই শুনেছি।

নীরবে বার-দুই মালাটা ঘুরাইয়া লইয়া ভবদেববাবু পুনশ্চ কহিলেন, তা ছাড়া অপূর্ববাবু বলছিলেন যে অত রাত ক'রে ফেরার ফলে ছেলে দুটির নাকি পড়ারও অসুবিধা হচ্ছে, ফিরে এসে হাত-পা ধুয়ে বই নিয়ে বসতে না বসতেই খাবার ঘণ্টা পড়ে—খেয়ে এসে ঘুমোয়। পরীক্ষার সময় ঘনিয়ে এল, এখন একটু না পড়লে পেরে উঠবে না, বুঝলেন না?

ভূপেন অতিকষ্টে রাগ দমন করিয়া কহিল, সে ক্ষতি-পূরণের ব্যবস্থা ত আমি করেইছি মাস্টারমশাই, আমি নিজে ওদের রোজ পড়াই। বেড়াতে যে যাই, সে সময়টুকুও আমি অপব্যয় হ'তে দিই নে, মুখে মুখে পড়ানোই চলে। আমার ক্লাস-গুলোর মধ্যে ঐ ছেলে দুটোর সম্বন্ধেই যা কিছু ভরসা রাখি—ওরা যদি তৈরী

হয়ে ভবিষ্যতে ভাল রেজাণ্ট করে তা'হলে আপনারই সুনাম।

ভবদেববাবু কহিলেন, তা ঠিক! তবে কি জানেন, আমি বুঝি ও-সব ঝামেলায় যাবার দরকার কি? যেটুকু না করলে নয় সেটুকু করা—সময় যদি সব নষ্টই করলুম ত নিজের কাজ কখন সারব বলুন। একে ত সময় নেই, তার ওপর—। যাক আপনি যদি বোঝেন যে ওদের ক্ষতি হবে না, তাহলে অবশ্য অন্য কথা—জয় রাধে! জয় রাধে! রাসপঞ্চাধ্যায় পড়ছেন বেশ মন দিয়ে? ওটা শেষ হ'লে আর একটা বই দেব আপনাকে—

তার পর যেন ঈষৎ ক্ষুণ্ণ কণ্ঠেই কহিলেন, একটু সকাল ক'রে ফিরলে আপনার নিজের পড়াশুনোরও ত সুবিধা হয়।

ভূপেন কি একটা উত্তর দিতে গিয়াও চাপিয়া গেল। বোধ করি এ বিষয় লইয়া যুক্তি-তর্ক প্রয়োগ করিতে তাহার ঘৃণাই বোধ হইল। কেন যে ইহাদের এই অহেতুক আক্রমণ তাহা বুঝা না গেলেও তাহার বিরুদ্ধে যে বড় একটা দল গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সব চেয়ে দুঃখের কথা এই যে, সাতটা সাড়ে-সাতটার মধ্যেই তাহারা ফেরে, সেটা ভবদেববাবু দালানে বসিয়া মালা জপ করিতে করিতে প্রত্যহই দেখেন অথচ তিনি অপূর্ববাবুর কথার প্রতিবাদ না করিয়া তাহাকেই সে অনুযোগ শুনাইতে বসিলেন। খাবার ঘণ্টা পড়ে ঠিক নটায়—অর্থাৎ সাড়ে-সাতটায় ফিরিলেও দেড় ঘণ্টা সময় হাতে থাকার কথা এবং পদন অন্ততঃ যে সে দেড় ঘণ্টার অপব্যয় করে না তাহা সকলেই জানে। কিন্তু এ-সব কোন যুক্তি দিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না—সে নিঃশব্দে খানিকটা বসিয়া উঠিয়া গেল।

তবে ইহার পর সে ইচ্ছা করিয়াই সালেকদের সহিত বেড়াইতে যাওয়া বন্ধ করিল। ছুটির পর অধিকাংশ দিন সে বিজয়বাবুর সহিত তাঁহাদের বাড়িতে পর্যন্ত আগাইয়া যাইত। কল্যাণীর সহিত বহু বিবাদ করিবার পর সে নিজের জন্যও দুগ্ধহীন চায়ের ব্যবস্থা পাকা করিয়া লইয়াছিল, মুড়ি ও সেই চা খাইয়া বিজয়বাবুর সহিত গল্প করিয়া সে যখন ফিরিত তখন তাহার শুধু ভ্রমণের কাজটাই সারা হইত না—যথার্থ ভদ্র ও ভগবদ্‌ভক্ত লোকের সংসর্গ করার ফলে মনটাও সুস্থ বোধ হইত।

পদনদের সহিত বেড়ানো বন্ধ করিলেও আসল কাজটা সে ভোলে নাই। সন্ধ্যার পর হোস্টেলে ফিরিয়া সে সকালের মতই পদনদের লইয়া আবার পড়াইতে বসিত, তবে এ সময়টা ইচ্ছা করিয়াই সামনে বই খুলিয়া রাখিয়া গল্প করিত—সাধারণ জ্ঞানের গল্প। পড়ার বইয়ের সঙ্গে সে সময় সম্পর্ক থাকিত খুব কম।...

অপূর্ববাবুর দল এটাকেও তাঁহাদের প্রতি ভূপেনের তাচ্ছিল্যের আর এক দফা নিদর্শন বলিয়া ধরিয়া মনে মনে বিষম চটিয়া গেলেন কিন্তু এ ব্যবস্থাটা রদ করিবার আর কোন উপায় খুঁজিয়া পাইলেন না।

পরীক্ষা আসিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হইল পাঠ্য-পুস্তক নির্বাচনের হুড়াহুড়ি। এ ব্যাপারটার মধ্যে যে এতটা কদর্যতা আছে, তাহা ভূপেন আগে কল্পনাও করে নাই। মাস্টারমহাশয়দের কথাবার্তার মধ্যে এমনি একটা ইঙ্গিত সে মধ্যে মধ্যে পাইয়াছে বটে কিন্তু তখন এতটা বোঝা সম্ভব ছিল না। ছেলেবেলায় নিজে যখন স্কুলে পড়িত তখন এ-সব লক্ষ্য করিবার কথা নয়, বছরের শেষে একটা পাঠ্য-পুস্তকের তালিকা পাওয়া যায় এবং কতকগুলি চকচকে নতুন বই হাতে আসে—এইটুকুই শুধু জানিত। এখন যতই ব্যাপারটা দেখিতে লাগিল ততই ঘৃণায় মন রি-রি করিয়া উঠিল। বিভিন্ন প্রকাশকদের প্রচারক বা ক্যান্‌ভাসারের দল পাঠ্যপুস্তকের বোঝা লইয়া দলে দলে এই সময় আসিতে থাকে। ইহাদের অধিকাংশই অশিক্ষিত, যে কাজে আসিয়াছে সেটাও ভদ্র ও সুচারু ভাবে সম্পন্ন করিবার ক্ষমতা অনেকের নাই; লোভ ও স্বার্থপরতার যে মাত্রা ও সীমা আছে, সে কথাটা ইহাদের অভিধানের বাহিরে। অবশ্য ইহাদের উপর রাগ বা ঘৃণা করা অন্যায়; সকলেই অত্যন্ত দরিদ্র, বৎসরের শেষে এই কয়টা কাঁচা টাকার মুখ চাহিয়া থাকে সারা বছর, মাহিনা ও রাহা খরচের উদ্‌বৃত্ত (অর্থাৎ চুরি) মিলিয়া বেশীর ভাগ ক্যান্‌ভাসারেরই পঞ্চাশ-ষাট টাকার বেশী থাকে না। এই সামান্য টাকার লোভে ভাল বা বুদ্ধিমান লোক যে কেহ আসিবে না তাহা বলাই বাহুল্য। ইহাদের মধ্যে অনেকেই খাওয়া ও শোওয়ার কাজটা হোস্টেলে হোস্টেলে সারিয়া দৈনিক আট আনা দশ আনা বাঁচায়। মাস্টারমহাশয়রা এই অবাঞ্ছিত অতিথিদের ঠিক প্রীতির চোখে না দেখিলেও চক্ষুলজ্জা এড়াইতে পারেন না—আশ্রয় ও আহার দিতে বাধ্য হন।

আসেও এক-একটি অদ্ভুত জীব—কেহ কেহ একেবারে একবস্ত্রে বাহির হয়, মুটে ভাড়া দিবার ভয়ে বইয়ের ব্যাগ ছাড়া আর কিছুই আনে না। এমন কি দ্বিতীয় বস্ত্র পর্যন্ত না। কেহ বা বইয়ের সঙ্গেই একখানি ময়লা কাপড় ও তেলচিটে গামছা ঐ অদ্বিতীয় সুটকেসে ভরিয়া লইয়া আসে। একটি ক্যান্‌ভাসার ঢাকা হইতে ঘুরিতে ঘুরিতে তিন সপ্তাহ পরে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে—তাহার সহিত আলাপ করিয়া ভূপেন জানিল, সে তিন সপ্তাহের মধ্যে কাপড় জামা ত ছাড়েই নাই—স্নানও করে নাই। ম্যালেরিয়ার ভয়ে জল

গায়েও ঢালে না, পেটেও না। 'স্রেফ চা খেয়ে আছি মশাই, এই একুশ দিন!' বলিয়া সে সগর্বে ভূপেনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ফলে তাহার সাদা জিনের কোট এবং কালো মাথার চুল দুই-ই বীরভূমের লাল ধূলির রঙে সম্পূর্ণ মিশিয়া গিয়াছে।

কিন্তু শুধু যদি এই সব ক্যানভাসারের দল নিজেদের বইয়ের জন্য আসিয়া ধর-পাকড় করিত বা হেডমাস্টার মহাশয়ের নির্লজ্জ স্তাবকতা করিত ত ভূপেনের অতটা অসহ্য বোধ হইত না। স্কুলের কমিটি-মেম্বারেরা প্রায় সকলেই থাকেন কলিকাতাতে। গ্রামের যে-সব ভদ্রলোকেরা লেখাপড়া শিখিয়া কলিকাতাতে ওকালতি, ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবসা করেন—অন্ততপক্ষে অধ্যাপনা বা সরকারী চাকুরি—তাঁহাদেরই, অনেক সময় ইচ্ছার বিরুদ্ধেও, ধরিয়া স্কুল-কমিটির মেম্বার করা হয়। সারা বছরে তাঁহাদের কোন পাত্তা পাওয়া যায় না কিন্তু এই সময়ে তাঁহারা প্রায় সকলেই বিভিন্ন প্রকাশক ও পাঠ্যপুস্তক-লেখকদের তদ্বিরের ফলে হেডমাস্টার ও সেক্রেটারীর কাছে এক-দুই কিংবা ততোধিক বইয়ের জন্য সুপারিশ করিয়া দীর্ঘ চিঠি লেখেন। শুধু তাই নয়, যে সমস্ত মেম্বারদের খুব জরুরী কমিটি মিটিং-এ যোগ দিবারও সময় হয় না, তাঁহারা, হয়ত বা পরিচিত প্রকাশকদের অর্থেই, পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের সভাটিতে হাজির হন—এবং অনেক সময়ে ঝগড়া-বিবাদ করিয়াও নিজেদের জিদ্ বজায় রাখেন। আগে হেডমাস্টার ও শিক্ষক মহাশয়দের উপরই পুরাপুরি এ ভার ছিল; কিন্তু তাঁহারা নাকি এই সব ক্যানভাসারদের অনুরোধে অনেক সময়ে ভাল বইয়ের উপর ঠিক সুবিচার না করিয়া 'খাতিরে'রই প্রাধান্য দেন—সেই জন্য, সেই অনাচার বাঁচাইবার জন্যই মেম্বাররা স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহারাই বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকদের ও হেডমাস্টার মহাশয়ের সাহায্য লইয়া পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ নির্বাচন করিবেন। ফলে যাঁহারা সারা বছর ধরিয়া ছেলে পড়ান, তাঁহাদের সুবিধা-অসুবিধা কিছুমাত্র বিবেচিত না হইয়া পাঠ্যতালিকা প্রস্তুত হয়। হয়ত বা উকীলের অনুরোধে স্বাস্থ্য, ডাক্তারের অনুরোধে ইতিহাস, এবং ইঞ্জিনিয়ারের অনুরোধে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃত বই নির্বাচিত হয়। কেহ কেহ এমন কথাও বলিয়া থাকেন (ভূপেনের কাছে কথাটা স্পর্ধা বলিয়াই মনে হইল) যে, বইগুলি তাঁহারা আদ্যোপান্ত পড়িয়াই সুপারিশ করিতেছেন!

তবু ভূপেনের অনেক শিক্ষা বাকি ছিল। এক দিন কথাটা উঠিতে পণ্ডিত মহাশয় বিদ্রূপ করিয়া কহিলেন, শুধু এদের দোষ দিলে চলবে কেন ভায়া। মাস্টারমশাইদের হাতে ভার থাকলেই কি আর ভাল বই বেছে ধরানো হ'ত মনে

করো? আমার শালা কলকাতার এক মস্ত ইস্কুলে হেডপণ্ডিতি করে, সেখানে কমিটির অত জুলুম চলে না, মাস্টারমশাইদের বিশেষ করে হেডমাস্টারের খুব হাত আছে, কিন্তু সেখানেও কি হয় জানো? হেডমাস্টার, জয়েন্ট হেডমাস্টার সকলেরই দু-একখানা করে পাঠ্যপুস্তক আছে, তাঁরা সেইগুলো নিয়ে বদলা-বদলি করেন। মানে, ধরো আমার আছে ক্লাস থ্রি-র একখানা বাংলা বই, তোমার আছে ফাইভ-সিক্সের ইতিহাস, আমি তোমার বইটা ধরাবো যদি তুমি আমার বইটা ধরাও! বুঝলে ব্যাপারটা? এর ওপরই বই ধরানো হয় সেখানে, ভাল মন্দ কিছু বিচার করা হয় না!

যত শোনে ভূপেনের মন তত হতাশায় ভরিয়া আসে। শিক্ষাদানের এই পুণ্য-ক্ষেত্রে হয়ত আরও কত অনাচার চলে—যা সে এখনও শোনে নাই। কিন্তু এখনই যে তার প্রায় দম বন্ধ হইয়া আসিল! কেমন করিয়া সে এখানে টিকিয়া থাকিবে! মনে পড়ে সন্ধ্যা আর মোহিতবাবুর কথা—হায় রে! শিক্ষার দায়িত্ব ও কর্তব্য লইয়া কত বড় বড় কথাই না তাঁহারা আলোচনা করেন—কোথায় তাহার ভিত্তি যদি জানিতেন!...

এক দিন, তখন প্রায় স্কুল বন্ধের সময় হইয়া আসিয়াছে, কলিকাতার এক নাম-করা অর্থ-পুস্তক-ব্যবসায়ীর লোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন ভাঙ্গা-হাট, ইস্কুলের কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে, যেটুকু কাজ বাকী আছে সেটুকু অফিস-ঘরেই চলে—মাস্টারমহাশয়দের হাজিরা দেওয়া ছাড়া বিশেষ কোন দায়িত্ব নাই। ভূপেন সকাল করিয়া হোস্টেলে ফিরিয়া আসিয়াছে—বাড়িতে একটা চিঠি লেখা দরকার, সেটা সারিয়া একেবারে বাহির হইবে এই ইচ্ছা। বিজয়-বাবুর বাড়ি সেদিন সন্ধ্যার অনেক আগেই যাওয়ার কথা, কল্যাণী কি-সব পিঠা প্রস্তুত করিয়াছে, তাহার বিশেষ নিমন্ত্রণ। কয়েক দিন আগে একটা ইংরাজী বইয়ের গল্প সে কল্যাণী ও তাহার ভাইদের বলিতে শুরু করিয়াছিল, সেটা শেষ হয় নাই বলিয়া বিজয়বাবুর বড় ছেলেটির কড়া তাগাদা আছে, সেটার জন্যও খানিকটা সময় লাগিবে। এধারে তিনটার মধ্যে চিঠি ডাকে না দিলে আজ যাইবে না—সবটা জড়াইয়া তাহার তাড়াই ছিল। সুতরাং সহসা যতীনবাবুর সঙ্গে একটি অপরিচিত 'ক্যান্‌ভাসার'-মার্কা ভদ্রলোককে ব্যাগ হাতে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া বিরক্তিতে তাহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। তবু সে কোন প্রশ্ন না করিয়া শুধু যতীনবাবুকে বলিল, আসুন।

যতীনবাবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কেমন যেন থতমত খাইয়া গেলেন। কহিলেন, এই—ইনি ভাই একটু আপনার কাছেই এসেছেন।

—আমার কাছে? কেন বলুন ত?…বিস্মিত ভূপেন প্রশ্ন করিল।

সে ভদ্রলোক আগাইয়া আসিয়া বিনা নিমন্ত্রণেই ভূপেনের বিছানায় বসিলেন, তাহার পর ব্যাগটা খুলিয়া মোটা মোটা খান্-দুই অভিধান বাহির করিয়া কহিলেন, আমাদের মালিক এইগুলো আপনাকে পাঠিয়েছেন।

আরও বিস্মিত হইয়া ভূপেন প্রশ্ন করিল, আমাকে? আপনি কোথা থেকে আসছেন বলুন ত?

সে ভদ্রলোক তাঁহার ফার্মের নাম করিলেন। ভূপেন কহিল, কিন্তু তাঁর সঙ্গে ত আমার পরিচয় নেই, তিনি শুধু শুধু আমাকে উপহার পাঠাবেন কেন? আপনার নিশ্চয়ই ভুল হচ্ছে—

ক্যান্‌ভাসারটি ঢোঁক গিলিয়া কহিলেন, আপনাকে, মানে আপনার নাম কি আর তিনি জানেন?—তবে—মানে ঐ ক্লাস এইট-নাইনে আপনিই ত ইংরাজী পড়ান?

এবার ভূপেন একটু অসহিষ্ণুভাবেই কহিল, ব্যাপারটা কি খুলে বলুন দেখি, আমাকে কি করতে হবে?

—না, না, করতে কিছুই হবে না—তবে এই ছেলেদের যদি দরকার হয়, মানে মানের বই বা অভিধান ওদের দরকার ত হয়ই—সেই সময় যদি আমাদের কথাটা একটু বলে দেন। বই আমাদের খুবই ভাল, সে স্যার আপনি ত উল্‌টে দেখলেই বুঝতে পারবেন, আপনাকে আর কি বলব—মানে—

ভূপেন বাধা দিয়া কহিল, মানে ঘুষ, এই ত?

—ছি ছি, এ কী বলছেন স্যার। ঘুষ নয়, তবে—যদি দরকার হয়, বুঝলেন না,—বইটা দেখা না থাকলে ত আর আপনি বলতে পারবেন না—

ভূপেন কহিল, মানের বইয়ের চলন ইস্কুল থেকে ওঠাব, এই আমার সাধনা। আর অভিধানের কথা, সে যদি ছেলেরা আমাকে কখনও প্রশ্ন করে, লাইব্রেরীতে সব অভিধানই আছে; দেখে যেটা ভাল মনে হয় সেইটার কথাই বলে দেব। সুতরাং আপনার ও অভিধান কোনোই দরকারে লাগবে না। আপনি ওগুলো নিয়ে যান—

ভদ্রলোক যেন বিষম অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন, না না স্যার, আপনার নাম ক'রে নিয়ে এসেছি যখন, তখন ও অনুরোধ আর করবেন না। রেখে দিন, বাড়ির ছেলেপুলেদের ত কাজে লাগবে, না হয় আমাদেরটা রেকমেণ্ড নাই করলেন।

—ছেলেপুলেদের দরকার লাগলে আমি কিনে দিতে পারব। শুধু শুধু অপরিচিত লোকের দান নেওয়া আমি পছন্দ করি না, ও আপনি নিয়ে যান—

যতীনবাবু অনেক আশা করিয়া ভদ্রলোককে পথ দেখাইয়া আনিয়াছিলেন, ভূপেনের দুইখানা অভিধানের একখানিতে ত ভাগ বসানো যাইবেই, চাই কি উহার কাছ হইতেও ভাইপোর নাম করিয়া একটা বাগানো যাইতে পারে। এখন সব যায় দেখিয়া তিনি ভূপেনের মুখের দিকে চাহিয়া একবার চোখ টিপিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, রেখে দাও না ভায়া, ভদ্রলোক তোমার নাম ক'রে বার করলেন বই দুটো, ফিরিয়ে দিলে অপমান বোধ করবেন হয়ত!

ভূপেন ঈষৎ কঠিন কণ্ঠেই কহিল, কিন্তু নিলে আমি নিজে ঢের বেশী অপমানিত বোধ করব যে! দোহাই আপনার যতীনবাবু, এ-সব ব্যাপার আপনাদের ভাল লাগে, আপনারাই নিয়ে থাকবেন, এ ঝামেলা আর আমার কাছে টেনে আনবেন না।...আপনি কিছু মনে করবেন না, মোদ্দা আপনার ঘুষ আমি নিতে পারব না। আপনি ও নিয়ে যান—

ভদ্রলোক আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু ভূপেন বাধা দিয়া কহিল, আপনি যতই বোঝাবার চেষ্টা করুন যে ওটা ঘুষ নয়, কিছুতেই পেরে উঠবেন না। তাছাড়া আপনি নিজেও বেশ জানেন যে ওটা ঘুষই। আপনি যদি ওগুলো জোর ক'রে রেখে যান তাহ'লে যদি-বা এমনি কোন দিন ভাল-মন্দ বিচারে আপনাদের বই রেকমেণ্ড করবার সম্ভাবনা থাকত, এখন আর থাকবে না। আমি আপনাদের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা চালাব—

এ কথার পরে আর তিনি বই রাখিয়া যাইতে সাহস পাইলেন না—পুনশ্চ ব্যাগে পুরিয়া উঠিয়া পড়িলেন। যাইবার সময় শুষ্ক হাসি হাসিয়া নমস্কার করিয়া কহিলেন, তাহলে আসি স্যার—একটু দেখবেন গরীবদের—আসুন যতীনবাবু।

যতীনবাবু ক্ষোভ আর চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া চাপা-গলায় বলিয়া ফেলিলেন, মাইনে ত প্যান তেতাল্লিশ টাকা, অত তেজ কিসের বুঝি না! পৈতৃক বোধ হয় কিছু আছে। দুটো বই মিলিয়ে বারো টাকা দাম, অনায়াসে আটটা টাকায় বেচা যেত। আমাদের ত আর উপরি কিছু নেই—ঐগুলোই উপরি। যত সব আহাম্মক!

তিনি মুখ কালি করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। ভূপেনেরও আর চিঠি লেখা হইল না, যেটুকু লেখা হইয়াছিল প্যাডের মধ্যে চাপা দিয়া রাখিয়া সে কোনমতে জামাটা গায়ে গলাইয়া বাহির হইয়া পড়িল। যতীনবাবুর শেষ কথাটায় আরও একটা কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। নমুনা-কপি পাঠ্যপুস্তকে অফিস-ঘর ভরিয়া গিয়াছে। এতগুলি বই কি হইবে প্রশ্ন করায় অপূর্ববাবু বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন, কেন, বিক্রী হবে! দেখুন না, দুদিন পরেই পুরোনো বইওয়ালারা আসতে

শুরু করবে। যা নতুন দাম তার অর্ধেক পর্যন্ত পাওয়া যায়।

ভূপেন অবাক হইয়া বলিয়াছিল, কিন্তু এতে ত প্রকাশকদের ক্ষতি। তার চেয়ে বই না রাখলেই হয় ?

—অত সাধু হ'লে চলে না ভায়া, ঐটেই আমাদের উপরি—অপূর্ববাবু জবাব দিয়াছিলেন। সেই কথাটাও এখন মনে পড়িয়া লজ্জায় ঘৃণায় ভূপেনের ভিতরটা কেমন যেন সির-সির করিয়া উঠিল। সে যেন এই অস্বস্তিকর চিন্তাটাকে ঝাড়িয়া ফেলিবার জন্যই গতিটা আরও বাড়াইয়া দিল। এ অস্বস্তি হইতে দূরে কোথাও যাওয়া দরকার। বিজয়বাবু ও কল্যাণীর কথাটা মনে পড়িয়া গেল। একজোড়া স্নেহকোমল চক্ষুর উদ্বিগ্ন দৃষ্টি তাহার পথ চাহিয়া আছে—সেখানে দারিদ্র্য থাকিতে পারে, নীচতা নাই ; আতিথ্য সেখানে আড়ম্বরহীন কিন্তু আন্তরিক। সেই স্নিগ্ধ মানসিক আবহাওয়ার মধ্যে পৌঁছিতে না পারা পর্যন্ত যেন শান্তি নাই।

॥ ১২ ॥

বড়দিনের ছুটিতে ভূপেন বাড়ি যাইবে না বলিয়াই স্থির করিয়াছিল কিন্তু বিশ-একুশ তারিখ নাগাদ হোস্টেল একেবারে ফাঁকা হইয়া আসিলে সে একটু দ্বিধায় পড়িল। তবু হয়ত শেষ পর্যন্ত সে থাকিয়াই যাইত যদি না সহসা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে শান্তির চিঠির সহিত মোহিতবাবুর একখানা চিঠি আসিয়া হাজির হইত।

ভূপেন এখানে আসিবার আগে বাড়ির লোকেদের প্রত্যেককে সাবধান করিয়া দিয়া আসিয়াছিল যে তাহার ঠিকানা যেন কাহাকেও দেওয়া না হয়। সন্ধ্যারা তাহার ঠিকানা খোঁজ করিয়া তাহাকে চিঠি দিবার চেষ্টা করিবে তাহা সে জানিত, আর সেইটাতেই ছিল তাহার আপত্তি। কালের ব্যবধানে একদিন হয়ত সে তাহার বেদনা, তাহার আশাভঙ্গের গ্লানি ভুলিয়া যাইতে পারিবে, বর্তমান ব্যবস্থাতেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবে, কিন্তু সন্ধ্যাদের সহিত যোগাযোগ থাকিলে সে বিস্মৃতি আর সম্ভব নয়। তাহারা যখন ছাঁটিয়াই ফেলিয়াছে ভূপেনকে তখন কী অধিকার আছে তাহাদের মধ্যে মধ্যে চিঠি লিখিয়া শান্তিভঙ্গ করার ? তাহারা ধনী, তাহাদের সহিত ভূপেনের জীবনের কোথাও সমতা নাই—কী প্রয়োজন মিছামিছি অকারণ নিষ্ফল সম্পর্ক রাখার ! তাহারা তাহাদের নিজ কক্ষপথে সুখে ঘুরিয়া বেড়াক—ভূপেনের মনে কোন ক্ষোভ কোন ঈর্ষা নাই। উপগ্রহের অধিকার সে চায় না, সে-মর্যাদাকে সে অপমান বলিয়াই মনে করে।

তাহার অনুমান যে মিথ্যা নয় তা সে ইতিমধ্যে শান্তির পত্রে কয়েকবারই জানিয়াছে। ও-বাড়ির দারোয়ান বার বার তাহার ঠিকানা জানিতে আসিয়াছিল, বার বার তাহারা মিথ্যা বলিয়া ফিরাইয়া দিয়াছে। শেষকালে বুঝি উপেনবাবু বলিয়াই দিয়াছিলেন, বাবুকে ব'লো, ছেলে কাউকে ঠিকানা দিতে বারণ করেছে।

তাহার পর আর কেহ খোঁজ করিতে আসে নাই। ভূপেন তারপর হইতে বাড়ির প্রত্যেক চিঠিখানি খুলিবার সময়ই মনে করিয়াছিল যে, তবু হয়ত সন্ধ্যারা হাল ছাড়ে নাই, তবুও আবার লোক পাঠাইয়াছে কিন্তু আর কোন চিঠিতেই সে কথার উল্লেখ না পাইয়া নিশ্চিন্তও হইয়াছে যেমন—অবুঝ মন তাহার কোথায় যেন একটু ক্ষুণ্ণও হইয়াছে। মনে হইয়াছে যে, এই তাহাদের ভূপেনের সংবাদের জন্য আকুলতা! সন্ধ্যা ত নিজে আসিয়া জোর করিয়া ঠিকানা জানিয়া যাইতে পারিত। সে আসিলে কি আর কেহ 'না' বলিত? পরক্ষণেই নিজেকে সান্ত্বনা দিয়াছে, এ অবশ্য ভালই হইল, ও জের না রাখাই ভাল। সে যাহা চাহিয়াছিল তাহাই হইয়াছে, জীবনের দুটা স্রোত পরস্পর হইতে এতই দূরে যে, সে ব্যবধানে সেতু রচনা করিতে যাওয়াই মূর্খতা!

তাই, আজ এতদিন পরে হঠাৎ মোহিতবাবুর চিঠি পাইয়া সে চমকিয়া উঠিল। কিন্তু আগে খুলিল বোনের চিঠিই—! শান্তি এ-কথা সে-কথার পর একেবারে শেষের দিকে লিখিয়াছে সন্ধ্যার কথা!—হ্যাঁ, তোমার ছাত্রী সন্ধ্যা হঠাৎ সেদিন এসে হাজির হয়েছিল। ওদের দারোয়ান বার-কতক তোমার ঠিকানার জন্যে এসে ঘুরে গেছে বটে, কিন্তু কর্তা বা তোমার ছাত্রী এতদিন কেউ আসে নি। আমি ওকে কখনও দেখি নি, তুমিও কোনদিন ওর কোন বর্ণনা দাও নি, কিন্তু তবু সেদিন দেখেই চিনতে পারলুম। বেশ মেয়েটি, সত্যি! মুখখানি খুব মিষ্টি, না? আহা, ওর অবস্থা বড় করুণ। কথাটা কিছু ভাঙল না, কিন্তু ভাবে বুঝলুম যে তুমি কোন কারণে ওদের ওপর রাগ করেছ, আর সে দোষটা তাদেরই! তাই জোর করবার সাহস নেই, শুধু খবরটা কোন মতে পাবার জন্য সে কী ব্যাকুলতা! শেষে বলে কি জানো? বলে, 'ভাই বড়দিনের ছুটিতে মাস্টারমশাই আসবেন ত? আচ্ছা তিনি যদি আমার মুখ না দেখেন, যখন দুপুরবেলা ঘুমিয়ে থাকবেন চুপি-চুপি এসে দেখে যাবো, কেমন? কতকাল দেখি নি ভাই, কেবলই মনে হয় এত-দিনে কেমন দেখতে হয়েছেন—কে জানে।' আহা বেচারী! একবার নিজেই বললে, 'আমাকে কি আর এত কাল মনে আছে? কে জানে!' তার পরই আবার জোর দিয়ে বললে, 'নিশ্চয়ই মনে আছে। দেখো ভাই তোমার দাদা কখনও আমাকে ভুলতে পারবেন না, আমি কি তাঁকে কম জ্বালাতন করেছি। অন্ততঃ সে

জন্যেও ত আমাকে মনে থাকবে, কি বলো?' গলা জড়িয়ে ধরে আমার সঙ্গে কত গল্পই করলে, যেন কত কালের চেনা। অত ত বড়লোক, কিন্তু এতটুকু দেমাক নেই, না?...এসেছিল একখানা সাদা শাড়ী পরে—মা গো! সোনারত্তি গায়ে নেই। ওর দাদু কিনে ছায় না, না ও পরে না?...তা তুমি এসে একবার ওর সঙ্গে দেখা ক'রো, কেমন? লক্ষ্মীটি।...আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, ওরা যদি অত বড়লোক না হ'ত ত ওকে আমার বৌদি করতুম।...ইত্যাদি।

বহু বহু দিনের পর যেন আবার সেই পাষাণ-ভারটা বুকের মধ্যে অনুভব করিল ভূপেন। শুধু সে কষ্ট পাইয়াছে, সে আঘাত পাইয়াছে; বেদনা বোধ করিবার, নিজেকে অপমানিত বোধ করিবার কারণ একমাত্র তাহারই ঘটিয়াছে—এতদিন এইটাই ছিল তাহার বড় সান্ত্বনা—আজ এতকাল পরে সন্ধ্যার আকুলতার এই কাহিনী তাহার সেই সান্ত্বনা ও অভিমানের মূলে যেন বড় একটা আঘাত করিল। তাহা হইলে সন্ধ্যাই শুধু তাহার আত্মার সহিত জড়াইয়া যায় নাই; সন্ধ্যার মনে তাহারও একটা মূল্যবান আসন আছে!...আর তাহার অভাবে সন্ধ্যাও কষ্ট পাইতেছে। মনে মনে শান্তির কথাটার প্রতিধ্বনি করিয়াই সে যেন বলিল, আহা বেচারী! আমার তবু এখানে কাজ-কর্ম আছে, ছাত্ররা আছে, বিজয়বাবু আছেন, কিন্তু তার দিন কী ক'রে কাটছে কে জানে! পড়াশুনো হয়ত বন্ধই হয়ে গেছে! অন্য মাস্টার এলে কি আর আমার মত যত্ন নিয়ে পড়াবে? মনে ত হয় না।

অনেকক্ষণ পরে সে মোহিতবাবুর চিঠিটা খুলিল, তিনি বাড়ির ঠিকানাতেই চিঠি দিয়াছেন, সেই চিঠি ঠিকানা বদলাইয়া এখানে আসিয়াছে! মোহিতবাবু লিখিয়াছেন:

কল্যাণীয়েষু—

বাবা ভূপেন, তোমার খবর জানি না, তবে শুনলুম যে, তুমি মাস্টারী করছ কোথায় মফঃস্বলে। বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের স্কুল, মাইনে কম এবং কাজ বেশী—তা ছাড়া ম্যালেরিয়ার ভয় ত আছেই। তুমি যে অভিমান ক'রে এমন একটা কাজ করবে তা ভাবি নি। এর জন্য নিজেকেই যেন সর্বদা অপরাধী মনে করি। তুমি যে আমাকে বুঝতে পারো নি এবং ক্ষমা করো নি এ তারই প্রমাণ! যাক্—তবু আমি অভিযোগ করব না! কারণ অন্যায় হয়ত আমারই। সন্ধ্যা নিজেই পড়াশুনো করে, কী করে তা আমি জানি না, কারণ আমার শরীর বড় খারাপ হয়ে পড়েছে হঠাৎ—আমি আর কিছুই দেখতে পারি না। অন্য মাস্টার রাখতে চেয়েছিলুম, সে রাজী হয় নি—সাধারণ প্রাইভেট টিউটর তার পছন্দ হবে না জানি বলে আমিও জোর করি নি! ও একটু মন-মরা হয়েই থাকে বুঝতে পারি,

তারই ফলে এ ক'মাসে একটু যেন রোগাও হয়ে গেছে, কিন্তু আমি নিরুপায়। ভাল করলুম কি মন্দ করলুম এ কথাটা যেন ভেবে দেখবারও সাহস নেই—কেননা যদি বিবেক বলে যে মন্দই করেছি, তখন হয়ত কন্যার মৃত্যুশয্যায় করা শপথ আমাকে ভাঙ্গতে হবে। যা করেছি, তার মুখ চেয়েই করেছি, এই আমার একমাত্র সান্ত্বনা। যাক্—তোমার কাছে আমার একটি অনুনয় আছে,—রাখবে বলেই আশা করি, বড়দিনের ছুটিতে কলকাতায় এসে একবার অন্ততঃ আমার সঙ্গে দেখা করবে—জরুরী দরকার আছে। আমার দিন ফুরিয়ে আসছে, এটা আমি বেশ বুঝতে পারছি, আর সময় নেই।…তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানবে। ইতি—

সন্ধ্যা কৃশ হইয়া গিয়াছে, সে মন-মরা হইয়া থাকে। আর সমস্ত কথা ছাপাইয়া এই কথাটাই বার বার ভূপেনের মনকে আলোড়িত করিতে লাগিল। বেচারী সন্ধ্যা! সেই প্রথম দিন হইতে শুরু করিয়া সে-দিন পর্যন্ত তাহার আচরণ, তাহার কথাবার্তার প্রতিটি খুঁটিনাটি ভূপেনের মনে পড়িতে লাগিল। এমন শ্রদ্ধা বোধ হয় আজ পর্যন্ত কোন ছাত্র-ছাত্রী কোন গুরুকে করে নাই, সে দিক দিয়া ভূপেনের জীবন ধন্য হইয়া গিয়াছে, সার্থক হইয়া গিয়াছে, আজ আর তাহার কোন ক্ষোভ নাই। বরং এই নির্জন বিদেশে সে সব কথা স্মরণ করিয়াই দুই চক্ষু বার বার সজল হইয়া উঠিল। শিক্ষায় এত অনুরাগ এত নিষ্ঠা, সবই হয়ত বেচারীর ব্যর্থ হইতে চলিল। অথচ ভূপেনের কত আশাই ছিল, প্রাচীনকালের ব্রহ্মবাদিনী ঋষি-কন্যাদের মত এই মেয়েটি একদিন তাহার পাণ্ডিত্য লইয়া পৃথিবীর সামনে দাঁড়াইবে, আর সেই সুদুর্লভ সম্মানের অংশ পাইয়া, উহার গুরুর মর্যাদা পাইয়া সেও ধন্য ও কৃতার্থ হইবে—এই ছিল উহার অন্তরের গোপনতম স্বপ্ন!…মানুষের অতি স্থূল দেহের প্রশ্ন, সাধারণ নর-নারীর অতি সাধারণ মোহের প্রশ্নই কিনা বড় হইয়া উহার এত বড় আশাকে ব্যর্থ করিয়া দিল! এ ক্ষোভ ভূপেনের ঘুচিবে না।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পর ভূপেন উঠিয়া পড়িল। না, কলিকাতায় সে যাইবে এবং আজই। কোন মতে জামাটা গায়ে চড়াইয়া বাহিরে আসিল—অপূর্ববাবু নাই, দেশে গিয়াছেন। ভবদেববাবু আছেন আর আছেন অক্ষয়বাবু। নূতন ছাত্র ভর্তি ও বদলির সময় বলিয়াই ভবদেববাবু এখনও যাইতে পারেন নাই—বড়দিনের দিন যাইবেন, এইরূপ কথা আছে। সে তাঁহার কাছে গিয়া কথাটা পাড়িতেই তিনি বলিলেন, ও, আপনি তাহ'লে যাচ্ছেন? এ আমি

জানতুম—হোস্টেল খালি হয়ে গেলে আর মন টেঁকে না এখানে···যাক্ ভালই হ'ল, আমার একখানা বই একটু খোঁজ করবেন ওখানে? শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত—বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের লেখা; অনেক আগে ছাপা হয়েছিল, এখন নাকি আর পাওয়া যাচ্ছে না। একটু যদি পুরনো বইয়ের দোকানে-টোকানে খোঁজ করেন—চার টাকা পাঁচ টাকা যা দাম হয় নেবেন। বরং এই পাঁচটা টাকা রাখুন আপনার কাছে।

ভূপেন তাড়াতাড়ি কহিল—না, না, ও টাকা এখন থাক্—বই যদি পাওয়া যায় নিশ্চয়ই আনব, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।···আর সেই বুকাননের বইটা যে এবার আনাবেন বলেছিলেন, সেটা দেখ্‌ব নাকি?

ভবদেববাবু যেন একটু দ্বিধায় পড়িলেন। একটুখানি আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিলেন, ওটা? ওটা বরং এ-যাত্রা থাক্। এবার যদি কিছু বাঁচাতে পারি বরং সামনের গরমের ছুটিতে,—আরও দু-একখানা এডুকেশন সিস্টেমের বইসুদ্ধ এক-সঙ্গে কিনব।···মোদ্দা এটা যেন ভুলবেন না—আচ্ছা এক মিনিট দাঁড়ান, আমি নামটা লিখে দিই—

তিনি ভূপেনের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় রাস্তায় আসিয়া নাম-লেখা চিরকুটটা দিয়া গেলেন। এ বইটিও যে স্কুলের টাকাতেই কেনা হইবে, ভূপেন তাহা জানে, অথচ অত্যন্ত দরকারী বই কিনিবার সময়েও ভবদেববাবু কত না ইতস্ততঃ করেন।

আর একটা বিদায় নেওয়া বাকী আছে—সে বিজয়বাবুদের কাছে। ভূপেন হিসাব করিয়া দেখিল যে, দুই ঘণ্টার মধ্যে হোস্টেলে ফিরিয়া আসিতে না পারিলে পাঁচটার ট্রেনটা কোন মতেই ধরা যাইবে না। সুতরাং খুবই জোরে পা চালাইতে হইবে। যাতায়াতেই প্রায় তিন কোয়ার্টার সময় চলিয়া যায়, তার উপর বিজয়-বাবুর বাড়ি একবার গিয়া পড়িলে উঠিয়া আসা শক্ত; এমন করিয়া সকলে মিলিয়া অনুরোধ করেন আর একটু বসিবার জন্য যে, কোনমতেই ওঠা যায় না। বিশেষতঃ কল্যাণী, প্রতিদিনই একরকম জোর করিয়া ভূপেনকে চলিয়া আসিতে হয়, কোন দিন সে সহজ সম্মতি দেয় না।

আজও তাহার কলিকাতায় যাইবার সংবাদটা শুনিবামাত্র, সকলে হৈ-হৈ করিয়া উঠিল। কল্যাণী কহিল, বা-রে, আমি ক'দিনে কত কী সব পিঠে তৈরী করব মনে ক'রে রেখেছি, আর আপনি অমনি না বলা-কওয়া বাড়ি চললেন? সে হবে না। এখন দু-তিনদিন ত নয়ই।

বিজয়বাবু সস্নেহ-ধমক দিয়া কহিলেন, তাই বলে ও বেচারী বাড়ি যাবে না!

সেখানে ওর বাবা-মা ভাই-বোন ওর পথ চেয়ে নেই? তারা বুঝি কেউ নয়? না যাওয়াটাই বরং অন্যায় হ'ত।

অভিমান-ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে কল্যাণী কহিল, আমি কি তাই বলছি? উনি আগে বললেন কেন যে যাবেন না? তাই ত আমি আশা ক'রে আয়োজন করলুম—

ভূপেন কহিল, তুমি দুঃখ করছ কেন ভাই, আমি পাঁচ-ছ'দিনের মধ্যেই ফিরে আসছি ত, স্কুল খোলবার আগেই এসে পৌঁছব—তখন বরং এইগুলো ক'রো; দু'দিন না হয় মুলতুবী থাক্ না!

বিজয়বাবুও খুশী হইয়া কহিলেন, সে ভাল কথা। এ ক'দিন না হয় বন্ধ থাক্।

কিন্তু কল্যাণীর মনের মেঘ কাটিল না। সে কহিল, হ্যাঁ, তাই নাকি হয়! সব ঠিক-ঠাক—এখন নাকি বন্ধ রাখা যায়!

তার পরই কি ভাবিয়া কণ্ঠস্বরে জোর দিয়া কহিল, আচ্ছা, সে যাই হোক্ এখনও ত দেরি আছে, দেখি এর মধ্যেই কিছু করা যায় কিনা।

হাত-ঘড়িটা দেখিয়া ভূপেন ব্যস্ত হইয়া উঠিল, ও কি, এখন হবে না কল্যাণী, এক ঘণ্টা সময়ও পুরো নেই। এখন থাক্, বুঝলে? মিছিমিছি ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই—ফিরে এসে হবে'খন্—এই কল্যাণী—

কিন্তু কল্যাণী ততক্ষণে রান্নাঘরের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। আর করিলও সে অসাধ্য-সাধন। একঘণ্টা পার হইবার আগেই কী একটা খাবার প্রস্তুত করিয়া লইয়া আসিল। এই অল্প সময়ের মধ্যে এইগুলি প্রস্তুত করিতে তাহাকে যে কী পরিমাণ পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, তা তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই ভূপেন বুঝিতে পারিল, ছুটাছুটিতে মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, এই শীতেও ললাটের প্রান্তে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমিয়া গিয়াছে।

জলযোগ শেষ করিয়াই ভূপেন উঠিয়া পড়িল। ছোট ছেলেমেয়েগুলির কাছে বিদায় লইয়া বিজয়বাবুকে প্রণাম করিয়া কল্যাণীর দিকে তাকাইতেই সে সহসা বলিয়া উঠিল, চলুন আপনাকে ঐ মোড়টা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।

ভূপেন খুশী হইয়া কহিল, সেই ভাল, চলো।

সকলের ছোট ভাইটির হাত ধরিয়া কল্যাণী তাহার পিছু পিছু অনেকখানি পথ কিন্তু নিঃশব্দেই আসিল। তারপর হঠাৎ এক সময়ে কহিল, আচ্ছা, এইবার আপনি যান, আমি ফিরি।

তারপর গলায় আঁচল দিয়া পথের উপরেই ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া উঠিয়া যেন কোন মতে প্রশ্নটা করিয়া ফেলিল, আবার আসবেন ত?

ভূপেন সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল, তাহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছে। সে কহিল, কেন,

সন্দেহ আছে নাকি ?

—যদি—যদি ভাল চাকরি পান অন্য কোথাও ?

অস্ফুট স্বরে প্রশ্নটা শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই অকস্মাৎ তাহার দুই চোখ ছাপাইয়া কপোল বাহিয়া অজস্র জল ঝরিয়া পড়িল।

সে-দিকে চাহিয়া মুহূর্তের জন্য ভূপেনের কেমন যেন সব গোলমাল হইয়া গেল। সে কল্যাণীর একখানা হাত নিজের মুঠার মধ্যে ধরিয়া ঈষৎ চাপ দিয়া গাঢ়কণ্ঠে কহিল, আমি নিশ্চয়ই ফিরে আসব কল্যাণী, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো!

বোধ হয় নিজের দুর্বলতায় কল্যাণী নিজেই লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল—সে নীরবে ভূপেনের হাতের মধ্য হইতে হাতটা টানিয়া লইয়া দ্রুতপদে বাড়ির রাস্তা ধরিল।...

কল্যাণীর এ ব্যবহার যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি অভাবনীয়। দুই তিন মাসের যাতায়াত ও ঘনিষ্ঠতায় বিজয়বাবুর পরিবারের সকলের প্রতিই সে আকৃষ্ট হইয়াছে সত্য কথা, তাঁহারাও সকলে তাহাকে স্নেহ করেন, কিন্তু সে সম্পর্ক যে কোনদিন সাধারণ প্রীতির স্তর হইতে অন্তরঙ্গতর হইতে পারে—এ-কথা ভূপেন একদিনও ভাবিয়া দেখে নাই। বিজয়বাবু লোকটি ভাল, ছেলেমেয়েগুলিও ভদ্র ও মিষ্ট স্বভাবের, এই জন্যই একটা আকর্ষণ ছিল ভূপেনের। কিন্তু—। অবশ্য এটা কল্যাণীর স্নেহ-কোমল হৃদয়ের অত্যন্ত স্বাভাবিক বিকাশ হইতে পারে আর সেইটাই বেশী সম্ভব, ভূপেন নিজেকে বার বার এই কথাটাই বুঝাইল। কল্যাণীর এত দিনের ব্যবহারে এখনও এমন কোন বিশেষ সুর বাজে নাই যে আজ অন্য কথা ধারণা করা যায়।...তবু, ফিরিবার পথে সারাটা সময় সেই কিশোরী মেয়েটির কয়েক ফোঁটা অশ্রু তাহাকে উন্মনা করিয়া রাখিল।

১৩

বাড়ি পৌঁছিয়া ভূপেন শান্তির মুখে শুনিল, সন্ধ্যা সেদিনও তাহার খবর লইয়া গিয়াছে। মোহিতবাবুর শরীর নাকি খুবই খারাপ—অতিরিক্ত ব্লাডপ্রেসার, ঘরের বাহিরে আসাও নিষেধ। যে কোন মুহূর্তেই হৃদযন্ত্র বিকল হইয়া যাইতে পারে।

শান্তি প্রশ্ন করিল, আজ রাত্রেই যাবে নাকি দাদা ওখানে ?

অকস্মাৎ যেন ভূপেন শান্তির উপর বিরক্ত হইয়া উঠিল, হ্যাঁ—তা যাবো না! সবে আস্‌ছি তেতে-পুড়ে, আমার আর বিশ্রামের দরকার নেই!

অপ্রতিভ হইয়া শান্তি কহিল, না—অত অসুখ, তাই জিজ্ঞেস করছিলুম। হঠাৎ যদি কিছু ভালমন্দ হয় ত—

—হয় ত আমি কি করব ! আমি ত আর ডাক্তার নই—ভগবানও নই ।

শান্তি আর কথা কহিল না। ভূপেন কাপড়-জামা ছাড়িয়া বাথরুমের দিকে চলিয়া গেল মুখ-হাত ধুইতে। রাস্তার ধুলা তাহার সর্বাঙ্গে, মাথার চুলে পর্যন্ত যেন পুরু হইয়া জমিয়াছে। বহুদিন কলের জলে স্নান করিলে তবে যদি একটু পরিষ্কার হয় ।

মা বলিলেন, কী কালো হয়ে গেছিস্ রে ! একেবারে চেনা যায় না যেন !

ভূপেনের তখনও বিরক্তি কাটে নাই, সে ঈষৎ তীক্ষ্ণ কণ্ঠেই জবাব দিল, আমি ত মেয়েছেলে নই যে, রং ফরসা রাখার জন্যে ভাবতে হবে ।

আসল কথা, বিরক্তিটা তাহার নিজের উপরই। সে আসিতে আসিতে এই কথাটাই ভাবিতেছিল যে আজ রাত্রেই সন্ধ্যার বাড়ি যাওয়া যায় কিনা। সন্ধ্যা কৃশ হইয়া গিয়াছে, সন্ধ্যা ম্লান হইয়া থাকে—এই সংবাদটার সহিত তাহার মনের আবেগ জড়াইয়া কী এক দুর্বার আকর্ষণে টানিতেছে তাহাকে ঐ দিকেই—আর সেই জন্যই সে যেন নিজের উপর বিরক্ত। যাহাদের সহিত প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক ছাড়া আর কিছু ছিল না, থাকা সম্ভব নয়—তাহাদের সম্বন্ধে মনে এ রকম দুর্বলতা থাকা অন্যায়। ইহাকে সে কিছুতেই প্রশ্রয় দিবে না।

মা জলখাবার ও চা দিয়া বলিলেন, এখনই কি ভাত খাবি, না ওখান থেকে ঘুরে আসবি আগে ?

—কোথা থেকে ঘুরে আসব ?…চায়ের পেয়ালাতে চুমুক দিতে গিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করে ভূপেন।

—সন্ধ্যাদের বাড়ি থেকে ? না, কাল সকালে যাবি ? ওর দাদু নাকি এখন-তখন।

—তোমাদের অত দরদ থাকে তোমরা যাও—আমি এই রাত্রে কোথাও বেরোতে পারব না।

সত্য সত্যই সে-দিন গেল না সে। হয়ত ইহা অকৃতজ্ঞতা, মোহিতবাবুর সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হইবার, কৃতজ্ঞ বোধ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে তাহার—তবু মা-বোনের এই উদ্বেগ এবং ধারণা যেন কেমন একটা অকারণেই তাহাকে বিগড়াইয়া দিল। ইহারা কথাটা না পাড়িলে হয়ত এক সময়ে তাহার মনে স্বাভাবিক আকর্ষণেরই জয় হইত—কিন্তু এখন এমনই একটা অভিমান উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে যে, আর যেন কোন মতেই আজ রাত্রে যাওয়া যায় না। সে-জন্য—রাত্রি যখন সত্য সত্যই গভীর হইয়া আসিল, যাওয়ার সম্ভাবনা সত্যই আর রহিল না, তখন সে অনুতপ্ত হইয়া উঠিল এবং বহু রাত্রি পর্যন্ত ঘুমাইতে

পারিল না।

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙিতেই মুখ-হাত ধুইয়া বাহির হইয়া পড়িল—জলযোগের জন্য দশ মিনিটও অপব্যয় করিতে ইচ্ছা হইল না। কিন্তু চোরবাগানে সেই বিশেষ পরিচিত গলিটার মোড়ে পৌছিয়া নানা রকমের বিভিন্ন মনোভাব একই সঙ্গে যেন তাহাকে কেমন বিহ্বল ও আচ্ছন্ন করিয়া দিল। পা যেন আর চলে না। কত আশা, ভবিষ্যতের কত স্বপ্ন এইখানে তাহার মনে গড়িয়া উঠিয়াছিল—কত স্নেহ ও শ্রদ্ধা তাহার প্রাপ্য বলিয়া মনে হইয়াছিল সেদিন, তারপর একদিন আবার এইখানেই সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বর্তমান অবজ্ঞাত, অখ্যাত, আশাহীন ভবিষ্যৎহীন জীবনযাত্রার সূচনা হইল—এই বাড়িটি তাহার জীবনের সব চেয়ে বড় সৌভাগ্যের ও দুর্ভাগ্যের উৎস।

কিন্তু না, সে জোর করিয়া পা চালাইল, স্বপ্ন যদি কিছু দেখিয়া থাকে ত সে-ই অন্যায় করিয়াছে। তাহার জীবন যা হইতে পারিত তাহাই হইয়াছে। কী পায় নাই, কী হইতে পারিত সে হিসাব আজ থাক্—যেটুকু অযাচিত ভাবে, কল্পনার অতিরিক্তরূপে সে পাইয়াছে, সেইজন্যই যেন কৃতজ্ঞ থাকে সে চিরদিন—সেইটাই মনুষ্যত্ব।

দারোয়ান সেলাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দাসী-চাকরদের সকলের মুখেই অভ্যর্থনার হাসি। এ বাড়ির সবই তাহার জানা, সেও সকলের পরিচিত সুতরাং কেহই ভিতরে সংবাদ দিবার বা পথ দেখাইবার চেষ্টা করিল না। বুকের অকারণ স্পন্দনকে প্রাণপণে দমন করিতে করিতে সে নিজেই যতদূর সম্ভব সহজ ভাবে উপরে উঠিয়া গেল। কিন্তু সিঁড়ির মোড়টা ঘুরিতেই অকস্মাৎ তাহার চোখে পড়িল সন্ধ্যা নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই দেখা হওয়াটা লইয়া তাহার মনে মনে বহুদিনের একটা প্রতীক্ষা ছিল—প্রস্তুতিও ছিল, তবু এই আকস্মিক সাক্ষাতে সেও কিছুক্ষণ যেন অনড় অচল হইয়া দাঁড়াইয়া গেল, কোন সম্ভাষণ বা কোন প্রশ্ন তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

সন্ধ্যা কাল রাত্রেই ভূপেনকে আশা করিয়াছিল, না আসাতে উদ্বিগ্নও হইয়াছিল। সেই জন্য ভোর হইতেই তাহার একটা কান পাতা ছিল বাহিরের দিকে—একটি বহু-পরিচিত পদধ্বনির আশায়। ভূপেন বাড়িতে পা দিতেই তাই সে সংবাদ সকলের আগে তাহার কানে পৌছিয়াছে। আগেকার দিন হইলে সে ছুটিতে ছুটিতে নিচে আসিয়া ভূপেনকে অভ্যর্থনা করিত কিন্তু আজ যেন কেমন সঙ্কোচে বাধিল! সব কথা সে জানে না, শুধু এইটুকু জানে যে তাহাদের দিক হইতেই কি একটা অন্যায় হইয়াছে আর সেই জন্যই মাস্টারমশাই পড়াশুনা ছাড়িয়া

ভবিষ্যতের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া সেই সুদূর পল্লীগ্রামে নিজেকে একরূপ সমাহিত করিয়াছেন এবং সেই অপরাধেই খুব সম্ভব তাহাদের সহিত পত্রালাপ পর্যন্ত রাখিতে চান না।

এই সব কথা মনে ছিল বলিয়াই হউক, আর এই দেখা বহুদিনের ঈপ্সিত বলিয়াই হউক—চোখোচোখি হওয়ার পর মুহূর্ত-কয়েক সন্ধ্যারও যেন পা চলিল না। তারপর অবশ্য সে-ই নিজেকে সামলাইয়া লইল, তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া সেই মধ্য-পথেই ভুপেনকে প্রণাম করিয়া অর্ধস্ফুট কণ্ঠে কহিল, বড্ড রোগা আর কালো হয়ে গেছেন মাস্টারমশাই!

ভুপেনের বিহ্বলতাটা তখনও যেন কাটে নাই। তবু সে চেষ্টা করিয়া হাসিল। কহিল, আমি ত পাড়াগাঁয়ে পড়ে ছিলুম, ভাল ক'রে খাওয়াই হয় নি অর্ধেক দিন। কিন্তু তোমারও ত শরীর খুব ভাল দেখছি না।

সত্যই সন্ধ্যা কৃশ হইয়া গিয়াছে। আর লম্বাও হইয়াছে যেন অনেকখানি। সন্ধ্যার দেহে কৈশোরের ছোঁয়াচ লাগার বহু পূর্ব হইতে সে তাহাকে পড়াইতেছে—প্রতিদিনকার দেখার ফাঁকে ফাঁকে তাই কখন যে তাহার দেহে কৈশোরের সঞ্চার হইয়াছিল তাহা ভুপেন বুঝিতেও পারে নাই। আজ সে প্রথম লক্ষ্য করিল যে, কৈশোরও তাহার যায় যায়—এমন কি সন্ধ্যাকে তরুণী আখ্যা দিলেও খুব বেমানান হয় না। হয়ত ইহার সবটা স্বাভাবিক নয়। ভুপেন চলিয়া যাওয়াতে লেখাপড়া এক রকম বন্ধ হইয়াই গেছে, অথচ কী প্রচণ্ড নেশা ছিল তাহার লেখাপড়ায়, তা ভুপেন ছাড়া এত বেশী আর কে জানে! সেই ক্ষোভ—এবং এ পৃথিবীতে তাহার একমাত্র আত্মীয় দাদুর অসুখের জন্য দুশ্চিন্তাই খুব সম্ভব তাহাকে এই প্রবীণতা আনিয়া দিয়াছে, কিশোরীকে সহসা দেখিলে তরুণী মেয়ে বলিয়া সমীহ হয়।

ভুপেন বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। এই কয়মাসে যেন কত পরিবর্তনই হইয়া গিয়াছে, সন্ধ্যাকে চেনাই কঠিন আজ। শুধু তাহার সেই আশ্চর্য চোখ দুটি, শ্রদ্ধায় ও জিজ্ঞাসায় পূর্ণ সেই স্থির দৃষ্টিটুকুই তেমনি আছে—একমাত্র সেই চোখ দুটির দিকে চাহিলেই তাহার সেই ছোট্ট ছাত্রীটিকে মনে পড়ে।

সন্ধ্যা একটু হাসিয়া কহিল, কি দেখছেন অবাক হয়ে, আমাকে কি চিনতে পারছেন না?

ভুপেনও এতক্ষণে সামলাইয়া উঠিয়াছে, সেও হাসিয়াই জবাব দিল, সেই রকমই বটে।···যাক—কেমন আছেন দাদু?

দাদুর প্রসঙ্গে সন্ধ্যার মুখের প্রস্ফুট শতদলটি যেন নিমেষে মুদিয়া গেল। ছল-

ছল চোখে কহিল, কি জানি, কিছুই ত বুঝতে পারছি না। উঠতে ত পারেনই না, এক দিককার পা-টাও যেন কম-জোর হয়ে গেছে, প্যারালিসিসের মত। এছাড়া আর কোন রকম অসুখ নেই, জ্বর-টর বা কোন উপসর্গও নেই। কিন্তু ডাক্তাররা বলছেন যে ব্লাডপ্রেসার একটু কমলেও উনি আর কাজ-টাজ কোন দিন করতে পারবেন না। চলুন না—দাদু উঠেছেন এতক্ষণে।

সন্ধ্যার পিছনে পিছনে ভূপেন মোহিতবাবুর ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। মোহিতবাবুও শীর্ণ হইয়া গিয়াছেন, মুখে একটা অস্বাভাবিক পাণ্ডুর আভা। ভূপেনের মনে হইল, তিনি যেন এই কয়ালেই অতিরিক্ত বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন।

ভূপেনকে দেখিয়া তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কহিলেন, তুমি এসেছ? বাঁচলুম। জানতুম যে আমার এই রকম খবর পেলে তুমি না এসে থাকতে পারবে না।···গিন্নী, মাস্টারমশাইকে চা-টা দাও।

সন্ধ্যা কহিল, আর তোমার ওষুধ—দাদু?

—দাও ওষুধ। তারপর ভূপেনের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, ওষুধে ত এর কিছু হয় না। নিয়মিত ডায়েট আর বিশ্রাম। তারপর হঠাৎ একদিন ডাক আসবে, বিনা নোটিশেই চলে যেতে হবে। তবু ডাক্তাররা ছাড়ে না, সব জেনে-শুনেও ওষুধের স্তোক দেয়।

ভূপেন এতক্ষণে প্রশ্ন করিল, এখন কেমন আছেন? একটু ভাল বোধ করছেন?

—ভাল?···মোহিতবাবুর প্রশান্ত মুখ নির্মল হাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, ভাল কি আর বোধ করা সম্ভব বাবা? বয়স ত কম হ'ল না, খাটছিও বহুদিন ধরে। প্রকৃতি তার শোধ নেবে বই কি। তবে একটা কথা বিশ্বাস করো, ঠিক পয়সা রোজগারের জন্যেই এতদিন খাটি নি, অর্থলোভ আমার এত প্রবল নয়—খাটতুম শুধু একটা অভ্যাসে, অনেক-কিছু ভুলে থাকবার জন্য। যাক—বাজে কথা বেশী বলব না, কারণ, একটু বেশী কথা কইলেই মাথার মধ্যে কেমন ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে, বুকের মধ্যেও একটা যন্ত্রণা হয়। আর বেশী দিন নয় এটা ঠিক—বাঁ পা-টা পড়ে গেছে, ওদিককার চোখেও মোটে দেখতে পাই নে। বুকের অবস্থা খুব খারাপ। এইবার একদিন হঠাৎ ডাক আসবে, তারই অপেক্ষা করছি।

তারপর চোখ বুজিয়া একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, অবশ্য তার জন্যে আমার মনে কোন ক্ষোভ নেই। আমি বহুদিন ধরেই প্রস্তুত আছি। এমন কি, যদি এই মুহূর্তেই চলে যেতে হয় তবে এ নালিশও করব না যে, অমুক জরুরী কাজটা সারা হ'ল না, কিংবা সন্ধ্যার একটা ব্যবস্থা ক'রে যেতে পারলুম

না। আমরা বিষয়ী লোক—যত দিনই বাঁচি না কেন, কতকগুলো কাজ চিরদিনই অসমাপ্ত থেকে যাবে। স্নেহের বন্ধন থেকেও ত স্বেচ্ছায় মুক্তি নিতে পারব না!

সন্ধ্যা মোহিতবাবুকে ঔষধ খাওয়াইয়া চলিয়া গিয়াছিল; এইবার ভূপেনের চা ও জলখাবার লইয়া প্রবেশ করিল। তাহার চোখ দুইটি আরক্ত, চোখের পাতাও ভিজা। বোধ হয় মোহিতবাবুর কথাগুলি তাহার কানে গিয়াছে। সে-দিকে চাহিয়া মোহিতবাবু হাসিলেন, কহিলেন, গিন্নী, চিরদিন কি আমাকে ধরে রাখতে চাও? তুমি ত সাধারণ মেয়ের মত অবুঝ নও ভাই—তবে অত সহজে চোখে জল আসে কেন—ছিঃ?...আচ্ছা, তুমি এখন একটু ওদিকে দেখাশোনা করো গে, আমি মাস্টারমশায়ের সঙ্গে জরুরী কথাটা সেরে নিই।

সন্ধ্যার সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার কপোল বাহিয়া অবাধ্য দুটি ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল, পাছে আরও অপ্রস্তুত হয় এই ভয়ে সে একটু দ্রুতই বাহির হইয়া গেল। মোহিতবাবু মুহূর্ত-কয়েক তাহার অপস্রিয়মাণ মূর্তির দিকে চাহিয়া থাকিয়া ক্লান্তভাবে চোখ বুজিলেন। তিনি বিশ্রাম করিতেছিলেন কিংবা প্রাণপণ চেষ্টায় নিজের হৃদয়াবেগ দমন করিতেছিলেন—তাহা সেই মুহূর্তে বোঝা শক্ত, ভূপেন তাহা বুঝিবার চেষ্টাও করিল না, শান্ত ভাবেই অপেক্ষা করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে মোহিতবাবু আবার কথা কহিলেন। বলিলেন, সন্ধ্যার নিকট-আত্মীয় বলতে যা বোঝায় তার অভাব নেই। অর্থাৎ রক্তের সম্পর্কে তারা খুবই নিকট কিন্তু আত্মীয় কেউ নয়। এদের হাত থেকে সন্ধ্যাকে কে রক্ষা করবে সেই আমার ভাবনা। সন্ধ্যার যা বিষয় থাকবে তা খুব সামান্য নয়—সে লোভে যদি কেউ কিছু অন্যায় ক'রে ফেলেই ত তাকে দোষ দিতে পারব না। অথচ এই চিন্তাই আমার যাবার মুহূর্তকে ভারাক্রান্ত ক'রে রেখেছে—মুখে যতই যা বলি না কেন, নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বুজতে পারব না, ওর একটা ব্যবস্থা না ক'রে।... তাই এমন একজনের ওপর আমি ভার দিয়ে যেতে চাই যে ওর সম্বন্ধে নিজের স্বার্থ সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে চিন্তা করতে পারবে, ওর যথার্থ কল্যাণের দিকটাই শুধু চিন্তা করবে। অনেক ভেবেও বাবা, একমাত্র তুমি ছাড়া আর কারুর নাম মনে পড়ল না, তাই আমার উইলে তোমাকেই ওর অভিভাবক ও একজিকিউটার ক'রে রেখে গেলাম!

—আমাকে? সে কি!...অতি কষ্টে ভূপেনের কণ্ঠ ভেদিয়া এই দুটি কথা শুধু বাহির হইল।

মোহিতবাবু ম্লান হাসিয়া কহিলেন, অদৃষ্টের পরিহাস বলে মনে হচ্ছে, না?

কিন্তু এ আপৎকালে আর কাউকেই খুঁজে পেলাম না বাবা ; আমি জানি সন্ধ্যাকে তুমি কত স্নেহ করো—আমি জানি কি জন্যে সেই সুদূর পল্লীগ্রামে গিয়ে আশাহীন, আনন্দহীন, কীর্তিহীন জীবন যাপন করছো! তুমিই ওর ভার নাও—

ভূপেন ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল, কিন্তু আমি যে এর কিছুই জানি না। আইন-কানুন সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই নেই আমার।

—আইন-কানুন জানো না বলেই ত অত বিশ্বাস তোমার ওপর বাবা, ও জ্ঞানটা মানুষকে বড্ড বিপথে নিয়ে যায়। নিজের নির্মল বিচার-বুদ্ধি ও সহজ কল্যাণবুদ্ধির কাছে জগতের কোন আইন দাঁড়াতে পারে না! তাছাড়া—ব্যবহারিক আইনের কোন কথা যদি কোন দিন জানবার দরকার হয়—আমার জুনিয়র যিনি আছেন আমাদের অফিসে, তাঁর শরণাপন্ন হয়ো। তিনি পাকা লোক এবং অকারণে সন্ধ্যার অনিষ্ট করবেন না।

ভূপেন স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। এ যেন অবিশ্বাস্য কথা—শুনিবার পরও পরিহাস বলিয়া মনে হয়। সে ইহাদের কাছে অজ্ঞাতকুলশীল, দরিদ্র, অপরিণামদর্শী তরুণ যুবক। পাছে তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতায় সন্ধ্যার ভাগ্য তাহার মত লোকের সঙ্গে গ্রন্থি বাঁধে, এই ভয়ে একদিন তাহাকে ইহারা বিদায় দিয়াছিলেন, আজ আবার তাহাকেই ডাকিয়া সেই সন্ধ্যার সম্পূর্ণ ভার তাহার হাতে তুলিয়া দিলেন! তাছাড়া মোহিতবাবু তাহার কীই-বা জানেন, কতটুকুই বা জানেন? সে যে নিজেই ভালো করিয়া জানে না নিজেকে, কোন দিন চিনিবার চেষ্টা করে নাই তেমন করিয়া। যদি সে এতখানি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখিতে না পারে!...

এক মুহূর্তের মধ্যে অসংখ্য এলোমেলো চিন্তা তাহার মাথায় ভিড় করিয়া আসিয়া কিছুকালের মত যেন তাহাকে নির্বাক, জড় করিয়া দিয়া গেল।

মোহিতবাবুর কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য নাই, তিনি বলিয়াই চলিয়াছেন, ওর একুশ বছর বয়স পর্যন্ত বিবাহ সম্বন্ধে কতকগুলো বাধা-নিষেধ রেখে গেলাম। তার বেশী রাখবার আমার অধিকার নেই, বেঁচে থাকলেও সে অধিকার থাকত না। এটুকুও রাখলাম আমার মরা-মেয়ের মুখ চেয়ে—তার মৃত্যু শয্যায় করা শপথের অজুহাতে সন্ধ্যার যখন এত বড় অনিষ্টই করলাম তখন শেষ পর্যন্ত সেটা পালন ক'রেই যাব, তার ঋণ কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করব। টাকাকড়ির বিস্তৃত বিবরণ উইলেই পাবে, সব পাকা ব্যবস্থা করা আছে। অর্ধেক আছে দান—বাকী অর্ধেক সব সন্ধ্যার। একুশ বছর বয়স পার হ'লে সবই ও নিঃশর্তে পাবে। শুধু আমার দানের সঙ্গে যে সম্পত্তিগুলোর যোগ আছে সেইগুলো থাকবে তোমার হাতে।

আমি ওকে কোন বন্ধনে বেঁধে রাখতে চাই না—ওর পথ ওর সামনে খোলা রইল। সন্ধ্যা এই বাড়িতেই থাকবে—আগ্‌লাবার জন্য কোন লোকের দরকার নেই, আমার ঝি-চাকর সব বহু দিনের, ওরা সন্ধ্যাকে স্নেহ করে। রক্তের সম্পর্কের চেয়ে হৃদয়ের সম্পর্ক বড়—এ আমি চিরদিন বিশ্বাস করি।

ভূপেনের যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতেছিল, সে একপ্রকার আর্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, কিন্তু এ ভার কি আমি একা বইতে পারবো? আর অন্তত একজনকেও দিয়ে যান আমার সঙ্গে—

মোহিতবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, আর কাউকে এ ভার দেওয়া যায় না বলেই ত তোমাকে জড়াতে হল বাবা। তুমিই পারবে, আমি আশীর্বাদ করছি। সন্ধ্যার কল্যাণ-চিন্তা তোমাকে তোমার কর্তব্য-পথ দেখিয়ে দেবে। নিজের সহজ-বুদ্ধির ওপর বেশী নির্ভর ক'রো—এ আমার অভিজ্ঞতার কথাই তোমাকে বলে গেলাম। সব প্রস্তুত আছে, আমার মুহুরী সত্যবাবুও নিচে আছেন, তিনিই তোমাকে দেখিয়ে দেবেন—কোথায় কী সই করতে হবে, সব বলে দেবেন। হয়ত তোমাকে একবার আমার আফিসেও যেতে হবে।

মোহিতবাবু, বোধ করি এতক্ষণ কথা কহিবার শ্রান্তিতেই, আবার চোখ বুজিলেন। ভূপেনও স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। কাজ করিবার, কথা কহিবার এমন কি এ দায়িত্ব বহনের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবার একটা উপায় পর্যন্ত চিন্তা করিবারও শক্তি যেন লোপ পাইয়াছে তখন তাহার। শুধু নির্বোধের মত শূন্যদৃষ্টিতে মোহিতবাবুর অনড় দেহটার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে মোহিতবাবুই আবার কথা কহিলেন। বলিলেন, তা'হলে আর আটকাবো না। তুমি সব দেখে শুনে নাও গে। যদি কিছু প্রশ্ন করবার থাকে এখনও উত্তর পাবে—এর পর সব ঘোলাটে হয়ে যাবে—বেঁচে থাকলেও কাজে আসবো না।

ভূপেন উঠিয়া দাঁড়াইতে তিনি ইঙ্গিত করিয়া কাছে ডাকিলেন। চুপি চুপি কহিলেন, তোমাকে কিছু দেবার সাহস আমার হয়নি, তবে এমন ব্যবস্থা আছে যে, ইচ্ছে করলে অনেক কিছু নিতে পারবে। এই অনুরোধটি আমার রেখো তুমি—যদি তোমার প্রয়োজন পড়ে নিতে ইতস্তত ক'রো না। আশীর্বাদ করি তুমি মানুষের মত মানুষ হয়ে ওঠো, একদিন তোমার কীর্তি, তোমার যশ যেন সারা দেশে ছড়িয়ে যায়। আমাদের জন্যে যে অনিষ্ট তোমার হ'লো তা যেন এক দিন ব্যর্থ হয়!…আমি যে ভুল করলুম তা যেন কোন দিন তোমাদের করতে না হয়—যে কর্তব্য সহজে সামনে আসে তাকেই যেন বরণ ক'রে নিতে পারো—যা

ভুল, যা শুধু একটা সংস্কার, মানুষের কল্যাণ বুদ্ধির যা বিরোধী এমন কোন-কিছু যেন তোমার জীবনের স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক পথকে মলিন বা বিড়ম্বিত না করে। আজ একটা কথা তোমাকে অকপটে বলে যাই বাবা, ভুল আমি করি নি, সন্ধ্যার মন কোন দিকে যাচ্ছে তা আমি ঠিকই অনুভব করতে পেরেছিলাম—তবুও, আমি যেটাকে অনিষ্ট বলে আশঙ্কা করেছিলাম তাকেও বোধ হয় ঠেকাতে পারলাম না শেষ পর্যন্ত। মিছিমিছি সব যেন গোলমাল হয়ে গেল। তোমার প্রতি সন্ধ্যার যে শ্রদ্ধা, তার সঙ্গে কতটা স্নেহ মেশানো ছিল তা তুমি ত বুঝতে পারোই নি, আমিও বুঝি নি। সেই জন্যেই অনুতাপ হয় বাবা—মিথ্যা মোহকে, সম্মানবোধকে আঁকড়ে না ধরে থাকলেই হ'তো। প্রতিজ্ঞা বা শপথ প্রাণপণে রক্ষা করাই বীরত্ব নয় শুধু—অনেক সময়ে তাকে লঙ্ঘন করা আরও বেশী সৎসাহসের কাজ—তাতে বীরত্ব আরও বেশী। যাক—আবারও তোমাকে হয়ত আর একটা বিড়ম্বনা আর কষ্টকর বন্ধনের মধ্যে ফেললাম—কিন্তু কোন উপায় ছিল না। সন্ধ্যার ভার তুমি ছাড়া আর কে নেবে বলো ?…

অতিরিক্ত আবেগ ও ক্লান্তিতে মোহিতবাবু যেন হাঁপাইতে লাগিলেন। তাঁহার দুই চোখ দিয়া কয়েক ফোঁটা জলও গড়াইয়া পড়িল। সেদিকে চাহিয়া, যেটুকু ক্ষোভ বা নালিশ ভূপেনের মনে ছিল, সব ধুইয়া মুছিয়া, নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। পাছে তাহারও চোখে জল আসিয়া পড়ে এই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।…

সন্ধ্যা পাশের ঘরে অর্থাৎ তাহার নিজের শোবার ঘরে জানালার সামনে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ভূপেন মোহিতবাবুর ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ঈষৎ রুদ্ধ কণ্ঠে যখন তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল তখন সে যেন প্রথমটা চমকিয়া উঠিল। তারপর তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া কহিল, আপনি চললেন ?

—হ্যাঁ সন্ধ্যা, নিচে আমার কাজ আছে। তুমি দাদুর কাছে যাও।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া সন্ধ্যা কহিল, আর কি আপনার দেখা পাবো না ?

—পাবে বৈ কি—নিশ্চয়ই পাবে। এখন ত আসতেই হবে আমাকে। তোমার দাদু যে—আচ্ছা থাক সে সব কথা, পরে বলব এখন।

তখন তাহার নিজের কথাবার্তার উপর, নিজের চিন্তা-শক্তির উপর যেন কিছু-মাত্র আস্থা ছিল না। কোন মতে প্রয়োজনীয় কাজটা সারিয়া নির্জনে কোথাও যাইতে পারিলে যেন বাঁচে। তাই সন্ধ্যার প্রণাম শেষ হইবার আগেই সে স্খলিত অথচ দ্রুতগতিতে নামিয়া আসিল।

১৪

শুধু ঐ উইল সম্পর্কে বিষয়সম্পত্তির বন্দোবস্তগুলা বুঝিয়া লইবার জন্য যে দুই-তিনটা দিন কলিকাতায় থাকিবার প্রয়োজন হইল তাহার বেশী আর এক দিনও ভূপেন থাকিতে পারিল না ; স্কুল খুলিবার দুই-তিনদিন আগেই, বলিতে গেলে এক রকম পলাইয়া গেল। কিন্তু এ পলায়ন যে কাহার কাছ হইতে—সে প্রশ্ন তাহাকে করিলে সে বলিতে পারিত না।

এ কয় দিন সন্ধ্যার সহিত যে দেখা হয় নাই তাহা নহে ; কিন্তু সে দেখা হওয়াটাকে কিছুতেই দুই-এক মিনিটের বেশী যাইতে দেয় নাই ভূপেন। কথা যা হইয়াছে তা-ও নিতান্তই কাজের কথা—যেগুলি না কহিলেই নয়। তাহার এই ইচ্ছা করিয়াই এড়াইয়া যাওয়া সন্ধ্যাও লক্ষ্য করিয়াছিল, কিন্তু মুখে কোন নালিশ জানায় নাই—শুধু তাহার মুখের করুণ বিষণ্নতা বিষণ্নতর হইয়া উঠিয়াছিল মাত্র। শেষ দিনে মোহিতবাবুর খবর লইয়া যখন সে চলিয়া আসিতেছে তখন সিঁড়ির মুখের কাছে দাঁড়াইয়া সন্ধ্যা একটি মাত্র অনুরোধ জানাইয়াছিল, দেখুন মাস্টারমশাই—আমার এখন ঠিক ইস্কুল কলেজের কোন কোর্স পড়ে যেতে ইচ্ছা করছে না। এমনি খান-কতক ভাল ভাল বইয়ের তালিকা যদি তৈরী ক'রে দিতেন ত বড় ভাল হ'ত!

এ প্রসঙ্গ আগে উঠিলে ভূপেন সব কাজ ফেলিয়া বোধ হয় তখনই ফর্দ তৈয়ারী করিতে বসিত—কিন্তু আজ শুধু একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, আচ্ছা আমি ওখানে গিয়ে তোমাকে লিখে জানাবো সন্ধ্যা।

আসল কথা, সন্ধ্যার সান্নিধ্যে তাহার যেন বড় ভয় করে। মোহিতবাবুর সেদিনকার ইঙ্গিতটা পাইবার পূর্বে সে কখনও ভাবিয়া দেখে নাই যে, সন্ধ্যার সহিত তাহার সম্পর্কে নিতান্ত গুরু-শিষ্যের সুগভীর আত্মীয়তা-বোধ ছাড়া অন্য কোন অন্তরঙ্গ ছায়া পড়িয়াছে কি না। প্রথম তাহার সন্দেহ হইয়াছিল সন্ধ্যার আচরণের সংবাদে। সে ম্লান হইয়া থাকে, সে কৃশ হইয়া গিয়াছে, পড়াশুনায় তাহার আর আগের মত অনুরাগ নাই—সব কয়টি সংবাদই নূতন একটা বিশেষ সম্ভাবনার আভাস দিয়াছিল। এবার মোহিতবাবুর কথায় সে সন্দেহ যখন দৃঢ়মূল হইয়া গেল তখন সে প্রথম নিজের মনটার দিকে দৃষ্টি দিতে গিয়া শিহরিয়া উঠিল, ভাল করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার সাহস রহিল না। তাই, কতকটা সে যেন নিজের কাছে ধরা পড়িবার ভয়েই কলিকাতা ছাড়িয়া সন্ধ্যাকে ছাড়িয়া সুদূর বীরভূমের

পল্লীতে পলাইয়া গেল। সন্ধ্যা মিষ্ট, সন্ধ্যার সঙ্গ লোভনীয়, সে তাহার আত্মার আনন্দ—তবু সে সুদূর, সে শুধু মরীচিকা। সে যত দূরে থাকে ততই ভাল। যে সম্ভাবনা আজ অঙ্কুর—তাহাকে অঙ্কুরেই নষ্ট করা প্রয়োজন—কোন মতে তাহাতে না পত্রোদ্গম হয়। মোহিতবাবু যেদিন এই সম্ভাবনা আশঙ্কা করিয়া তাহাকে সরাইয়া দিয়াছিলেন সেদিন হইতে আজ তাহার দায়িত্ব আরও বেশী—কঠিন তাহাকে হইতেই হইবে, নহিলে নিজের কর্তব্য পালনে হয়ত ত্রুটি ঘটিবে, হয়ত-বা প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে। কলিকাতার বাতাসে তাহার যৌবন-স্বপ্নের জাল বোনা আছে—সেখানে ভবিষ্যতের অনেক স্বপ্ন সে দেখিয়াছে—সে যে এক দিন বড় হইতে চাহিয়াছিল, নিজের প্রিয় ছাত্রীকে বড় করিতে চাহিয়াছিল সে কথা আজও সেখানে গেলে মনে পড়ে। আজও সন্ধ্যার চোখের দিকে চাহিলে সমস্ত দায়িত্ব, সমস্ত রূঢ় বাস্তব যেন ভুল হইয়া যায়—লোভে মন দুলিয়া ওঠে। তার চেয়ে এই ভাল। অল্প বেতন, কদর্য আহার, অন্ধকার ভবিষ্যৎ—এই ভাল। ভাল তাহার এই সহকর্মীদের সঙ্গ, ভাল এখানকার রুক্ষ বাতাসে বাহিত পর্যাপ্ত ধুলা! স্বপ্ন সে আর দেখিবে না, দেখিবার অধিকার তাহার নাই।

এবার স্কুল খুলিবার পর ভূপেন যেন কতকটা নিজের মনের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্যই শিক্ষকতার কাজে নিজেকে একেবারে ডুবাইয়া দিল। সে আসিবার সময় নিজের টাকাতেই শিক্ষা সম্পর্কে আধুনিক দুই-একখানা বই কিনিয়া আনিয়াছিল। সেগুলি সে এখন লাল পেন্সিলে দাগ দিয়া জোর করিয়া মাস্টারমহাশয়দের পড়াইতে লাগিল। টিফিনের সময় মাস্টারমহাশয়রা একত্র হইলেই সে ভাল ভাল বাংলা বই হইতে খানিকটা করিয়া পড়িয়া শুনাইত। শুধু তাই নয়—এবারে সে সেক্রেটারীকে বলিয়া পদন, সালেক এবং আরও দুই-তিনটি ছেলের কোচিং-এর ভার নিজের হাতে ও নিজের দায়িত্বে তুলিয়া লইল। অর্থাৎ ইচ্ছামত যাহাতে সে পড়ার বইয়ের বদলে গল্পের বই-ও পড়াইতে পারে, সে অধিকারটুকু রাখিয়া দিল।

মাস্টারমহাশয়রা সকলেই তাহাকে পাগল ঠাওরাইয়াছিলেন। কেবল অপূর্ববাবু প্রভৃতি দুই-একজন এই পাগলামির মধ্যেও মতলব খুঁজিয়া বাহির করার চেষ্টা করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহাদের এ অসহযোগ ভূপেনের গা-সওয়া হইয়া গিয়াছিল, সেটা আর সে গ্রাহ্যই করিত না; তবু এক এক সময় হতাশ হইয়া পড়িত বৈকি! বহুদিনের অজ্ঞতায়, মূর্খতায় ও অমনোযোগে যে অশিক্ষা, যে অন্ধকার ছেলেদের মনে জমিয়া উঠিয়াছে তাহাকে দূর করিবার চেষ্টা করা নিজের কাছেও মধ্যে মধ্যে

বাতুলতা বলিয়া বোধ হইত। তাহার উপর—সব চেয়ে বড় কথা, পড়াইবে সে কাহাকে? কী ভীষণ দারিদ্র্য ইহাদের, এর মধ্যে লেখাপড়ার প্রসঙ্গটাই যে অশোভন ঠেকে। এই পৌষ মাস, সবে ধান উঠিয়াছে চাষীদের ঘরে, তবু অর্ধেক ছেলে একবেলা বেগুনসিদ্ধ খাইয়া থাকে—কেহ বা খালি পেটে স্কুলে আসে—ফিরিয়া গিয়া একেবারে ভাত খায়! গরম জামা শতকরা একটা ছেলেরও নাই, জুতা ত স্বপ্ন।···অধিকাংশ ছেলেই খালি পায়ে সুদ্ধমাত্র একটা ছেঁড়া গেঞ্জি গায়ে ইস্কুলে আসে। অপেক্ষাকৃত যাহাদের অবস্থা ভাল, তাহারাই ছেলেদের বোর্ডিং-এ রাখে, তবু সারা বোর্ডিং খুঁজিয়াও একটা আস্ত জামা বাহির হইবে না। পড়াইতে বসিয়া ভুপেনের খালি মনে হয় যাহাদের আগে পেট ভরিয়া ভাত খাওয়ানোই উচিত—তাহাদের মাথা ভরিয়া বিদ্যা ঠাসিয়া দিলে কি হইবে!

তবে এবারে সে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে আর একটি লোককে নিজের দলে পাইয়া গেল। বিজয়বাবু নির্বিরোধী লোক, তিনি কখনও ভুপেনকে নিরুৎসাহ করেন নাই। বরং এই কাজগুলিই যে কর্তব্য, ভুপেনের পথই যে শিক্ষকের আদর্শ ও একমাত্র পথ তাহাও বার বার স্বীকার করিয়াছেন, তবু কোথায় যেন তাঁহার মনের মধ্যে এ বিষয়ে একটা উপহাসের, হতাশার সুর ছিল—তিনি কখনও তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য আগাইয়া আসেন নাই। বরাবরই যেমন নির্লিপ্ত ও উদাসীন থাকিতেন তেমনিই রহিয়া গেলেন। কিন্তু যাঁহার সব চেয়ে গোঁড়া ও প্রাচীনপন্থী হইবার কথা, সেই রাধাকমলবাবুই সামান্য একটা ব্যাপারে ভুপেনের অনুরক্ত হইয়া উঠিলেন।

কথাটা আর কিছুই নয়—একদিন টিফিনের সময় ভুপেন রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা পড়িতেছে, রাধাকমলবাবু ঠাট্টা করিয়া কহিলেন, ঘুমের ওষুধের ব্যবস্থা ত করেছ ভালোই—কিন্তু সময় যে বড় অল্প, কাঁচা ঘুম চটে গেলে অসুখ করবে যে!

এ শ্রেণীর পরিহাস ভুপেনের নিত্য-সহচর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সে কোন কথাই কহিল না, কিন্তু জবাব দিলেন যতীনবাবু। যতীনবাবু সেই অভিধানের শোক ভুলিতে পারেন নাই—সুযোগ-সুবিধা পাইলেই আজকাল ভুপেনকে খোঁচা দেন। তিনি কহিলেন, কেন পণ্ডিতমশাই, ঘুমের ওষুধ কেন?

রাধাকমলবাবু কহিলেন, ও রবি ঠাকুরের কবিতা, ও ত বোঝবার নয়—শুধু শোনবার। কানের কাছে একজন ছড়া পড়লে কার না ঘুম পায় বলো—

অন্য দিন হইলে ভুপেন এ কথাটাও এড়াইয়া যাইত কিন্তু আজ কি খেয়াল হইল, সে পণ্ডিতমহাশয়ের পাশে গিয়া বসিয়া কহিল, দাদা, আপনাকে আজ

বলতে হবে, কেন আপনি এ কবিতা বুঝতে পারেন না।—কোন্ কথাটার মানে জানেন না!

রাধাকমলবাবু একটু বিপন্ন বোধ করিলেও হাল ছাড়িলেন না। কহিলেন—কথার মানে জানলে কি হবে বলো—ও যে সবটাই ধোঁয়া—মোদ্দা কথাটা কিছুতেই বোঝা যায় না।

—কবে আপনি বোঝবার চেষ্টা করেছেন বলুন—ভূপেন চাপিয়া ধরিল—এই কবিতাটাই ধরুন, কোনখানটায় আপনার ধোঁয়া লাগছে দেখিয়ে দিন।

এমনি করিয়া সে রাধাকমলবাবুকে দিয়াই পর পর দুই-তিনটি কবিতা পড়াইয়া লইল। একটু ইঙ্গিত দিতে রাধাকমলবাবু নিজেই সব পরিষ্কার বুঝিলেন, তখন আগ্রহ করিয়া 'সঞ্চয়িতা'খানা ভূপেনের কাছ হইতে চাহিয়া লইলেন। ভূপেন তাহার সহিত, রবীন্দ্রনাথের যে বইখানা সে কিছুতেই কাছছাড়া করিত না, সেই শান্তিনিকেতন দুটি-খণ্ডও তাঁহাকে গছাইয়া দিল—বিশেষ করিয়া কয়েকটি প্রবন্ধ দাগ দিয়া। তারপর রাধাকমলবাবু যেন পাগল হইয়া উঠিলেন—এ যেন একটা নূতন রাজ্য তাঁহার সামনে খুলিয়া গেল। তিনি এখন সবিনয়েই ভূপেনের কাছ হইতে বই চাহিয়া লন—কোথাও সন্দেহ থাকিলে আলোচনা করেন এবং স্বেচ্ছায় এক একদিন ভূপেনের কোচিং ক্লাসে যোগ দিয়া তাহাকে সাহায্য করেন। অপূর্ববাবু বলেন বাড়াবাড়ি, যতীনবাবু বলেন ভীমরতি—তবে একটা সুবিধা এই যে, রাধাকমলবাবুকে সবাই সমীহ করেন বলিয়া সামনে কিছু বলিতে সাহস করেন না।

এই ভাবে কোথা দিয়া দুই-তিন মাস কাটিয়া গেল কাজের চাপে ভূপেনের খেয়ালও রহিল না। যে ব্যথা, যে আশঙ্কা ভুলিবার জন্য তাহার এত আয়োজন, আশাভঙ্গের সেই বেদনা এবং দুরাশার সেই আশঙ্কা হইতে সে সত্যই দূরে থাকিতে পারিয়াছিল। সন্ধ্যা ইতিমধ্যে খান-দুই চিঠি দিয়াছিল, তবে সে খুবই সংক্ষিপ্ত চিঠি। মোহিতবাবু একটু সুস্থ আছেন—কাজ-কর্ম করিবার মত সুস্থ না হইলেও উঠিয়া বারান্দায় গিয়া বসিতে পারেন, কথাবার্তা গল্পগুজব করিতে কষ্ট হয় না। হয়ত, এ-যাত্রা বড় আঁশকাটা কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার চিঠিতে এই সংবাদই থাকে শুধু—আগেকার সে অন্তরঙ্গ সুরটি, বিশ্বাস ও নির্ভরতার সেই সরল সহজ ছন্দটি আর প্রকাশ পায় না। হয়ত এ অভিমান, হয়ত এ সঙ্কোচ—ভূপেন কারণটা ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করে না। এমন কি চিঠির এই শুষ্কতায় ব্যথা পাইলেও মনে মনে ধন্যবাদ দেয় ঈশ্বরকে—তাহার কণ্টকমুকুট অকারণে ভারী ও অসহ করিয়া না তুলিবার জন্য। সেও চিঠি দেয়—শুষ্ক, সংক্ষিপ্ত; দুই-একটি

গতানুগতিক কথা ছাড়া আর কিছু থাকে না তাহাতে। কাজের চাপে পড়িয়া হউক, ইচ্ছা করিয়া হউক—এই ভাবে তাহারা যদি পরস্পরকে ভুলিতে পারে—তাহা হইলে দুইজনেরই মঙ্গল।

কিন্তু ফাল্গুন মাসের শেষের দিকে একটা ব্যাপারে তাহাকে সন্ধ্যার কথা মনে করিতেই হইল। হঠাৎ একদিন বিজয়বাবু স্কুলে আসিলেন না—ছেলে বলিল, বাবার শরীর খারাপ করেছে; শুয়ে আছেন। ইদানীং—কলিকাতা হইতে ফিরিবার পর—সে বিজয়বাবুদের বাড়ি যাওয়াটা কমাইয়া দিয়াছিল, গেলেও কোচিং ক্লাসের অজুহাতে সকাল করিয়া উঠিয়া পড়িত। তাহার কারণ প্রথমত কলিকাতাতে যাইবার দিনের বিদায়-দৃশ্যটি তাহার মনে ছিল, তারপর এখানে ফিরিয়াও বোধ হয় সেই কারণেই লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছিল যে, সে আসিলে কল্যাণী খুশী হয়, তাহার মুখ হইয়া ওঠে উজ্জ্বল এবং উঠিয়া আসিবার সময় আর একটু ধরিয়া রাখিবার আগ্রহটা তাহারই সবচেয়ে বেশী। পাছে আর একটা ভুল হয়—সেই জন্য এবারে সে প্রথম হইতেই সতর্ক হইয়াছিল, আসা-যাওয়ার সংখ্যা ও সময়, দুই-ই ক্রমশ কমাইয়া আনিতেছিল। তবুও—অসুখের কথা শুনিবার পরও না গিয়া থাকা যায় না, সে ছুটির পর আর বোর্ডিং-এ না ফিরিয়া সোজা বিজয়বাবুর বাড়ির পথই ধরিল।

অবশ্য এটা শুধু খবর লইতে যাওয়া—কতকটা কর্তব্য পালনের জন্যই, অসুখ যে গুরুতর কিছু হইতে পারে একথা তাহার সুদূর কল্পনাতেও ছিল না, তাই বাড়ির বাহিরে পথের উপরেই কল্যাণীকে শুষ্ক বিবর্ণ মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সে বিস্মিত হইল, ঈষৎ শঙ্কিত কণ্ঠেই প্রশ্ন করিল, ব্যাপার কি কল্যাণী, কী অসুখ বিজয়বাবুর?

কল্যাণী খুব সম্ভব তাহার আশাতেই উদ্বিগ্নচিত্তে অপেক্ষা করিতেছিল, তবু উত্তর দিতে গিয়া তাহার ওষ্ঠই নড়িল শুধু—কণ্ঠ ভেদিয়া স্বর বাহির হইল না। দুই-একবার কথা কহিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

ভূপেন আরও ভয় পাইয়া গেল, কিন্তু সেখানে আর মিছামিছি সময় নষ্ট না করিয়া তাড়াতাড়ি কল্যাণীকে পাশ কাটাইয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। বিজয়বাবু দাওয়াতে পাতা চৌকিটার উপর পড়িয়া আছেন অন্য দিনের মতই—মুখের ভাব তেমনি প্রশান্ত, তেমনি নিরুদ্বিগ্ন। ভূপেন তাঁহাকে ঐ ভাবে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া তবু একটু আশ্বস্ত হইল, কাছে আসিয়া প্রশ্ন করিল, ব্যাপার কি বিজয়বাবু, জ্বর?

বিজয়বাবু কেমন যেন শূন্যদৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া একটু হাসিলেন।

কহিলেন, জ্বর হলে ত বাঁচতুম ভাই। কাল ইস্কুল থেকে ফিরে রাত্রে হারিকেনের আলোতে বই পড়তে গেছি—সেই তোমার বইখানা—কেমন যেন ঝাপ্‌সা লাগল। বিরক্ত হয়ে আলোটার দিকে চাইতে গিয়ে দেখি আলোটার চারপাশে রামধনু। তখনই ভয় হ'ল, বই বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়লুম। তবু তখনও ছেলে-মেয়েদের কিছু বলি নি। আজ সকালে উঠে মনে হল তখনও যেন রাত রয়েছে, এমনি সব অন্ধকার। খুব ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা লাগছিল সব, কল্যাণীকে জিজ্ঞাসা করলুম—সে অবাক হয়ে বললে, সে কি বাবা, রোদ উঠেছে যে!...বুঝলুম ব্যাপারটা—শুয়েই রইলুম। কিন্তু এবেলা ঘুমিয়ে উঠে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, সব অন্ধকার।

ভূপেন কথাটা শুনিয়া যেন পাথর হইয়া গেল। এ যে বেরিবেরির লক্ষণ! সে কহিল, কিন্তু দাদা, এ যা বললেন এ ত গ্লোকুমা—আপনি কি বেরিবেরি একটুও টের পান নি এতদিন?

বিজয়বাবু বলিলেন, না। ইদানীং দু-একদিন মনে হচ্ছিল বটে যে ইস্কুল থেকে এতটা হেঁটে আসতে যেন বড্ড বেশী হাঁপিয়ে পড়ছি। একটু বুক ধড়ফড়ও করত—তবে সেটা বয়সের ধর্ম বলেই মনে করেছিলুম।

ইহাদের অবস্থা ভূপেন জানিত। সংস্থান কিছুমাত্র নাই—জমিজমাও না থাকিবার মধ্যে। মাহিনার টাকা কয়টি না পাইলে সব কটি প্রাণীকে উপবাস করিতে হইবে। ভগবানের এ কি মার!

এবার কথা কহিতে গিয়া তাহার গলা কাঁপিয়া গেল। সে প্রশ্ন করিল, আপনার নিকট-আত্মীয় কি কেউ কোথাও নেই?

শান্তকণ্ঠেই বিজয়বাবু জবাব দিলেন, না ভাই। আর থাকা সম্ভবও ত নয়—আমরা কখনও কারুর কোন উপকারে আসতে পারি নি, আত্মীয়তা থাকবে কি করে বলো।

কল্যাণী ভূপেনের মুখের উপর একাগ্র নির্ভয়ে চাহিয়া ছিল, যেন সে ইচ্ছা করিলেই একটা প্রতিকার করিতে পারে। সুতরাং বিপদ যে কত বেশী, এ রোগ সারিবার সম্ভাবনা যে কত কম সে কথা ভূপেন মুখে ত উচ্চারণ করিতে পারিলই না—ভাব-ভঙ্গীতেও কোনরূপ অধীরতা প্রকাশ করিতে পারিল না। তাহা হইলে এই ছেলেমানুষের দল এখনই ভাঙ্গিয়া পড়িবে। সে প্রাণপণ চেষ্টায় কণ্ঠস্বর সহজ করিয়া কহিল, তুমি একটু বসো কল্যাণী, আমি এখনই আসছি।

গেল সে গ্রামের ডাক্তারের কাছে। তিনিও বিজয়বাবুকে শ্রদ্ধা করিতেন। সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিলেন, কিন্তু একটু পরীক্ষা করিয়াই তাঁহার মুখ গম্ভীর

হইয়া গেল। ভূপেনকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, এত সিরিয়াস্ টাইপের গ্লোকুমা আমি দেখিনি, এক রাত্রের মধ্যে অন্ধ হয়ে গেল, আশ্চর্য ! যাই হোক—এখনও উপায় থাকতে পারে হয়ত—কিন্তু সে এখানে কিছুই হবে না, কারণ, আমরা এর কিছু জানি না। কলকাতায় কোন বড় চোখের ডাক্তারের কাছে এখনই যদি নিয়ে গিয়ে ফেলা যায়, হয়ত কিছুটা দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে পারেন। তবু সে আশাও আমি বেশী রাখতে বলি না। দেখুন না, এত বড় রোগ—বছর বছর এতগুলো লোক মরছে, হাজার হাজার লোক ভুগছে, তবু আজ পর্যন্ত কোন ওষুধ বেরোল না। কোন্ রোগের ওষুধ বেরিয়েছে বলুন—বেরিবেরি, প্লেগ, কলেরা, টাইফয়েড—কোনটারই ঠিক ওষুধ বলতে যা বোঝায়, তা নেই। এ যদি ওদের দেশ হ'ত ত ওদের চিকিৎসকরা বা বৈজ্ঞানিকরা যেমন ক'রে হোক ঐ সব রোগের ওষুধ বার ক'রে ফেলত। একেবারে যে হয় না তা বলছি না, কিন্তু আমাদের দেশের তুলনায় কিছুই নয়। আরে মশাই, রিসার্চ করা তো চুলোয় যাক, আমাদের দেশের ছেলেরা একবার ডিগ্রিটা নিয়ে বেরোবার পর আর কোন বই-ই পড়ে না ! অথচ রোজ কত ওষুধ ওদের দেশে বেরোচ্ছে, কত নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হচ্ছে, তার সঙ্গে যোগাযোগ না থাকলে কি চিকিৎসা করবে বলুন দেখি ? শুধু মামুলী কতকগুলো মিক্সচার আর ইন্‌জেকশান—তাতে কি হয় !···আমরা না হয় গরীব পাড়াগাঁয়ের ডাক্তার, বই কেনার পয়সা নেই, যাদের আছে তারাও ত পড়তে চায় না—

এমনি আরও খানিকটা বক্তৃতা করার পর ডাক্তার বিদায় লইলেন কিন্তু ভূপেনের সেদিকে কান ছিল না। সে নিজেই যেন ইহাদের কথা ভাবিয়া চোখে অন্ধকার দেখিতেছিল। বিজয়বাবুকে প্রশ্ন করিয়া জানা গেল স্ত্রীর গহনা বলিতে কোথাও কিছু নাই, যা আছে ঐ দু-গাছা পেটি কল্যাণীর হাতে, উহাতে বোধ হয় আধ-ভরি সোনাও নাই। আর সবসুদ্ধ, মাকড়ী প্রভৃতি দুই-একটা কুঁচা জিনিস জড়াইয়া, বড় জোর আনা-পাঁচ-ছয় সোনা মিলিতে পারে। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা হইতেও দুটা বড় রকমের ঋণ লওয়া আছে, সেখানেও আর ধার পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। নিঃস্বতার এরূপ ভয়াবহ চেহারা ইতিপূর্বে আর ভূপেন দেখে নাই—সে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

অথচ উপায়ও একটা না করিলে নয়। যত দিন যাইবে ততই রোগটা চিকিৎসার বাহিরে চলিয়া যাইবে—তা সে জানে, কিন্তু কী-ই বা করা যায় ! ইস্কুল হইতে বসাইয়া মাহিনা দিবে না, বড় জোর মাস-দুই-এর ছুটি মিলিতে পারে। তারপর ? প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকাতে, সে হিসাব করিয়া দেখিল,

ইহাদের মাস-আষ্টেক চলিবে। তারপর সোজাসুজি উপবাস শুরু হইবে, আর কোথাও কিছু নাই। বড়ছেলে এখনও ম্যাট্রিকটা পর্যন্ত পাস করে নাই, তাহার দ্বারাই বা কি উপার্জন হইতে পারে? এসব ক্ষেত্রে তাহাদের কলিকাতার ইস্কুলে সে দেখিয়াছে, ছেলেরা ও শিক্ষকর্য়া কিছু কিছু চাঁদা তুলিয়া দেন। সে অবশ্য বেশী কিছু নয়—তবু একশ দেড়শ টাকা সেখানে অনায়াসে ওঠে, কিন্তু এখানে সে কথা মনে করাই বিড়ম্বনা। ছেলেরা এত গরীব যে, সেখানে চাঁদার খাতা ধরিতে গেলে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়—আর শিক্ষকদের কথা বাদ দেওয়াই ভাল। অপূর্ববাবু বুঝি গত মাসে গোটাপাঁচেক টাকা ধার দিয়াছিলেন বিজয়বাবুকে, এখন কি করিয়া সে টাকাটা চাওয়া যায়, এই ভাবনাতে তাঁহার ঘুম হইতেছে না।

ভূপেন সেদিন রাত্রে ঘুমাইতে পারিল না। ভবিষ্যতের কথা পরে হইবে, এখন চিকিৎসার প্রয়োজন। সে আত্মীয়ও নয়, এত অল্প দিনে বন্ধুত্বের দাবিও করিতে পারে না—তবু দায়িত্ব যেন সব তাহার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। মোহিতবাবু বলিতেন, 'যে পাশ কাটাতে পারে তার কোন দায়িত্বই নেই—বিবেচনা যার আছে, দায়িত্ব বলো কর্তব্য বলো সবই তার।' সত্যই—ইহারা ত খবরটা শুনিয়া বেশ নিশ্চিন্তই আছেন—ভবদেববাবু মালাটা শুধু একটু দ্রুত ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন, 'রাধারাণী! সবই তোমার ইচ্ছা প্রেমময়ী!' কিন্তু সে অত সহজে ছাড়িয়া দিতে পারিতেছে কৈ? বিজয়বাবু অবশ্য কিছুই আশা করেন না; তবু, সে যে তাঁহার সস্নেহ ব্যবহার, স্নিগ্ধ সহানুভূতির কথাটা ভুলিতে পারিতেছে না। কল্যাণী ইতিমধ্যেই কাঁদিয়া চোখ ফুলাইয়া ফেলিয়াছে। কী বলিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিবে, ভাবিয়া যেন কূলকিনারা পাওয়া যায় না। ছেলেমেয়েগুলি সকলে তাহারই মুখ চাহিয়া আছে—অথচ আকাশ-পাতাল ভাবিয়াও, কোথাও কোন পথ সে খুঁজিয়া পাইল না।

সারা রাত এ-পাশ ও-পাশ করার পর, ভোরের দিকে একটা কথা ভূপেনের মনে পড়িয়া গেল। মোহিতবাবুর এক বন্ধু আছেন খুব বড় চোখের ডাক্তার, খুবই অন্তরঙ্গ তাঁহার সঙ্গে, এমন কি দুই বন্ধুর পরিবারের মধ্যেও যাতায়াত আছে; যদি, সে সাহায্যটা পাওয়া যায়, তবে সে-ও অনেকটা হইবে বৈকি। এমনি কলিকাতা যাতায়াতে, ডাক্তার খরচাতে একশ টাকার ধাক্কা, তাহার উপর ঔষধপত্র ত আছেই।...যাহার এক পয়সাও সংস্থান নাই তাঁহার পক্ষে এ প্রস্তাব দুরাশাই। ভূপেনের হাতে উহার অর্ধেক টাকাও নাই। সুতরাং—যতই কথাটা সে ভাবিতে লাগিল ততই মনটা এই সুবিধা লওয়ার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িল। মোহিতবাবুদের কাছে কোন অনুগ্রহ ভিক্ষা করার কথা দুদিন আগে সে ভাবিতেও

পারিত না—কিন্তু এখন অতটা অভিমান আর নাই, বিশেষ করিয়া এ অনুগ্রহ ত সে নিজের জন্য লইতেছে না, পরের জন্য ভিক্ষা করাও লজ্জাকর নয়।

তবু সে সকালে উঠিয়াও অনেকটা ইতস্তত করিল। কিন্তু যেখানে একদিকে অর্থহীন সূক্ষ্ম আত্মসম্মান-বোধ আর একদিকে প্রয়োজন—এই দুইয়ে দ্বন্দ্ব বাধে, সেখানে শেষ পর্যন্ত প্রয়োজনেরই জয় হয়। সে অবিলম্বে উহাদের একখানা চিঠি লেখাই স্থির করিল। তবে সমস্যা এই যে কাহাকে লিখিবে? হিসাবমত মোহিত-বাবুকেই লেখা উচিত কিন্তু কোথায় যেন একটা সঙ্কোচে বাধে। মনের অবচেতন অবস্থায় এটি কখন স্বীকৃত হইয়া গিয়াছে যে, সন্ধ্যার উপর তাহার একটা জোর আছেই—তাহার কাছে সঙ্কোচের কারণ অপেক্ষাকৃত কম। পরিষ্কার এ কথাটা না ভাবিলেও সন্ধ্যাকে চিঠি লেখাটাই সহজ বলিয়া মনে হইল। সে সব কথা জানাইয়া তাহাকে একখানা দীর্ঘ চিঠি দিল এবং সকালেই নিজে হাতে ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিয়া আসিল।

সেদিন প্রায় সব মাস্টারমহাশয়ই ছুটির পর বিজয়বাবুকে দেখিতে গেলেন। অনেক ছাত্রও গেল। নির্বিরোধ ভগবদ্ভক্ত মানুষটিকে সকলেই শ্রদ্ধা করিতেন—ছেলেরা তাঁহার মিষ্ট স্বভাবের জন্য ভালবাসিত; সুতরাং সকলেরই যে অল্প-বিস্তর আঘাত লাগিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। তবু কী-ই বা করিবার আছে? কেহ উপদেশ দিলেন, কেহ পূর্বেই সাবধান না হইবার জন্য অনুযোগ করিলেন—কেহ বা আশ্বাস দিবার চেষ্টা করিলেন। পথ যে কোথাও নাই তা সকলেই জানেন; এ ভগবানের মার—এ মারের ভাগ নেওয়াও সম্ভব নয়, তাই সব কথাই ফাঁকা শোনাইল। এই সমস্ত সহানুভূতির মধ্যে বিজয়বাবু তেমনই শান্ত নম্রভাবে বসিয়া রহিলেন, যেমন চিরকাল থাকিতেন। হা-হুতাশ করিলেন না, ভবিষ্যতের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করিলেন না, ঈশ্বরের বিরুদ্ধেও অভিযোগ আনিলেন না। তাঁহার সেই অদ্ভুত ধৈর্য ও মনের উপর জোর দেখিয়া ভূপেনের মন শ্রদ্ধায় নত না হইয়া পারিল না।

কিন্তু বিজয়বাবু স্থির থাকিলেও তাহার পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। এই অসংখ্য লোকের ভিড়ের মধ্যেও বার বার কল্যাণীর ব্যথিত ব্যাকুল চক্ষু দুইটি তাহার দৃষ্টির মধ্যে আশ্বাস খুঁজিতেছিল! সব আশা-ভরসা যেন সে-ই, যা হয় একটা উপায় সে করিতে পারিবেই—সে দৃষ্টির মধ্যে এই নির্ভরতাটুকুও বোধ হয় ছিল। সেদিকে যতবার চোখ পড়িতেছিল, ততবারই তাহার দায়িত্বের গুরুত্বটা উপলব্ধি করিয়া সে শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিল। আশা যে কম তা সে-ও বোঝে কিন্তু

সত্যসত্যই যেদিন এই কথাটা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়া যাইবে যে, আশা একেবারেই নাই, সেদিন কি করিয়া ইহাদের দিকে চাহিবে, কি সান্ত্বনা দিবে, তাহা যেন সে কল্পনাও করিতে পারিতেছিল না। মনে মনে প্রশ্নটাকে সে যতই এড়াইয়া যাইতে চাহিতেছিল, ততই যেন ক্ষতস্থানে হাত পড়ার মত বার বার মন সেইখানেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া যাইতেছিল।

এমনি মানসিক কণ্টকশয্যার মধ্যে পরের দিনটাও কাটিল। সেদিন উত্তর আসিবার সম্ভাবনা নাই, তাহা সে জানে। তবু মনে মনে কোথায় একটা আশা ছিল, সন্ধ্যার পক্ষে সবই সম্ভব, হয়ত অপ্রত্যাশিত ভাবে সেই দিনই উত্তরটা আসিয়া যাইবে, হয়ত টেলিগ্রামই আসিবে। যদি জবাব না আসে, যদি সন্ধ্যা উপেক্ষা করে—এমন ভয় একবার যে মনে উঁকি মারে নাই তাহা নয়; তবে সে আশঙ্কা এক মুহূর্তের বেশী মনে দাঁড়ায় নাই। বরং সন্ধ্যার পর বিজয়বাবুর বাড়ি হইতে ফিরিবার সময় অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে আশাটাই প্রবল হইয়া উঠিতেছিল—বিজয়বাবুর একটা সুব্যবস্থা হইবে এজন্য ত বটেই, সন্ধ্যার চিঠি আসিবে এজন্যও কতকটা। সন্ধ্যার চিঠি আসিবে এবং সেই চিঠি প্রমাণ করিয়া দিবে যে ভূপেন বৃথা তাহার উপর আস্থা স্থাপন করে নাই—সন্ধ্যার উপর তাহার দাবি আছে, জোর আছে। যতই দূরে থাক তাহাদের আত্মার সম্বন্ধ একটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

মানুষ অনেক জিনিস অসম্ভব জানিয়াও আশা করে এবং আশা করিতে করিতেও মনের কাছে স্বীকার করে যে ইহা অসম্ভব, ইহা যদি না ঘটে তবে নিরুৎসাহ হইবার, ক্ষুব্ধ হইবার কারণ নাই। এমনি একটা মানসিক অবস্থা লইয়া বোর্ডিং-এ ফিরিতেই প্রথম তাহার নজরে পড়িল তাহাদের ঘরে, তাহারই বিছানার উপর বসিয়া আছেন সন্ধ্যাদের সরকারমশাই!

এ ঘটনা শুধু অপ্রত্যাশিত নয়, সমস্ত রকম অসম্ভব কল্পনারও অতীত। বিস্ময়ে কয়েক মুহূর্ত ভূপেনের মুখে কথা সরিল না। একটা ভয়ও মনে উঁকি মারিতেছিল, তবে কি মোহিতবাবুই—। সে অতি কষ্টে প্রশ্ন করিল, ব্যাপার কি সরকার মশাই?

সরকার প্রাণগোবিন্দবাবু পকেট হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া ভূপেনের হাতে দিয়া কহিলেন, দিদিভাই দিয়েছে। কাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে হবে তাই আমাকেই পাঠালে, বললে বন্দোবস্ত করে নিয়ে আসুন। হুকুম একবার যা মুখ দিয়ে বেরোবে তা আর 'না' হবে না—সে ত জানেনই।

তারপর যতীনবাবুর দিকে ফিরিয়া বোধ হয় পূর্ব কথারই জের টানিয়া

কহিলেন, ঐ যা বলছিলুম আপনাকে। যেমন কর্তা তেমনি আমার দিদিভাই —আপনাদের ভূপেনবাবুর ওপর যেমন বিশ্বাস তেমনি ভক্তি। এই ত কর্তা উইল করে দিয়েছেন শুনছি—সব আমার দিদিভাইয়ের, কিন্তু মাস্টারমশাইয়ের হুকুম ছাড়া কিছু খরচ হবে না। তাকেও চলতে হবে এঁর হুকুমে!…কেন যে উনি এমন জায়গায় পড়ে আছেন, তা উনিই জানেন—ওঁর ভাবনা কি, উনি যা বলতেন, কর্তাবাবু সেই ব্যবস্থাই ক'রে দিতেন। ব্যবসা, চাকরি, ওকালতি কিছুরই ভাবনা ছিল না।

বিস্মিত যতীনবাবু বলিয়া উঠিলেন, বলেন কি ? সত্যিই পাগল নাকি আপনি মশাই !

কিন্তু ভূপেনের এসব দিকে কান ছিল না। সে আলোটার সামনে চিঠিখানা মেলিয়া ধরিয়া পড়িতেছিল। সন্ধ্যা লিখিয়াছে :

শ্রীচরণেষু,

মাস্টারমশাই! আপনার চিঠি পেয়ে যেন একটা বোঝা নেমে গেল বুক থেকে। কিছুদিন থেকে কেবলই একটা ভয় পেয়ে বসেছিল যে, বুঝি আমরা চিরকালের মত পর হয়ে গেলাম আপনার কাছে। হয়ত কর্তব্য বা দায়িত্বের সম্পর্ক ছাড়া আর কোন সম্পর্ক থাকবে না আমাদের মধ্যে। সে যে কি দুঃখ আপনি বুঝবেন না। তাই হঠাৎ আপনার এই চিঠি পেয়ে এত আনন্দ হচ্ছে। আজও যে আমার উপর এটুকু আস্থা, এটুকু বিশ্বাস আছে—এ কথাটা নতুন ক'রে জানলুম। আপনার কোন কাজে লাগার চেয়ে অন্য সার্থকতার কথা ভাবতেই পারি না মাস্টারমশাই! এ কাজ আপনার নয়—তবু হুকুম ত আপনার মুখ থেকেই এল—এইতেই আমি সুখী।

যাক,—এবার কাজের কথা। দাদুকে সব কথা বলেছি, ডাক্তার-দাদুকেও ফোন ক'রে বলে রেখেছি। এখন শুধু ওঁকে নিয়ে আসা। আপনার পক্ষে আসার সুবিধা হবে কিনা জানি না, চিঠি পাঠাতেও অনর্থক দেরি হয়ে যাবে, এই সব পাঁচ-সাত ভেবে আমি সরকার মশাইকে পাঠালুম। তিনি বিজয়বাবুকে কাল সকালেই সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবেন—আমি ডাক্তার-দাদুকেও কাল বিকালে আসতে বলেছি। এসব ব্যাপারে দেরি না করাই ভাল। দাদু একটু ভাল আছেন। আপনি তাঁর আশীর্বাদ ও আমার প্রণাম নেবেন। ইতি—

চিঠি পড়িতে পড়িতে আজও ভূপেনের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল। সেই সন্ধ্যা, তাহার ছাত্রী, তাহার বন্ধু—তাহার আত্মার অংশ।…আজও তাহা হইলে তাহাদের অন্তরের সুর কাটে নাই। এত দিনের অদর্শন, এত মান-অভিমানের

ঘাত-প্রতিঘাতেও পরিচিত তন্ত্রীটি ঠিক বাজিয়া উঠিয়াছে।

ভূপেন চিঠিখানা আর একবার পড়িল। কতদিনের কত স্মৃতি এই কয়টি ছত্রের মধ্য দিয়া যেন ভিড় করিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যেটা সে ভুলিতেই বসিয়াছিল, সন্ধ্যার অন্তরের সেই প্রীতি, সেই শ্রদ্ধা তাহা হইলে ঠিক তেমনই আছে—কিছুই খোয়া যায় নাই…

আরও কতক্ষণ সে চিঠিখানা পড়িত কে জানে, সরকারমশাইয়ের আহ্বানে সহসা তাহার চমক ভাঙ্গিল, মাস্টারমশাই?

—ও, হ্যাঁ!

ভূপেন সোজা হইয়া দাঁড়াইল। কাল সকাল আটটায় গাড়ি। আজ রাত্রেই বিজয়বাবুর বাড়ি গিয়া যাত্রার ব্যবস্থা করা দরকার। কর্তব্য আগে—সামান্য চিঠি লইয়া নষ্ট করিবার মত সময় কৈ?…সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার বিজয়-বাবুর বাড়ির পথ ধরিল।

১৫

বিজয়বাবুকে পরের দিন সকালেই রওনা করিয়া দেওয়া হইল। প্রথমটা তিনি খুবই সঙ্কোচ বোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সন্ধ্যার আগ্রহের এই নিশ্চিত প্রমাণ পাইয়া এবং ভূপেনের পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত রাজী হইলেন। কল্যাণীও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে; অন্ধ পিতাকে একেবারে পরের ভরসায় ছাড়িতে চাহিল না, ভূপেনও জেদ করে নাই। সত্যই, বিজয়বাবু যে প্রকৃতির লোক, শত অসুবিধা হইলেও কাহাকেও মুখ ফুটিয়া বলিবেন না। তার চেয়ে কল্যাণী সঙ্গে থাকাই ভাল, তাহাকে আর বলিয়া দিতে হয় না, পিতার সামান্যতম সুবিধা-অসুবিধাও সে বোঝে। ছেলেদের লইয়া এখানে একটা সমস্যা উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু কল্যাণীর পিসিমা আশ্বাস দিলেন, চোখে না দেখিলেও দুই-তিনটা দিন চালাইয়া লইতে পারিবেন। তা ছাড়া ডাক্তারবাবুর বিধবা শ্যালিকাও এই কয়টা দিন এখানে আসিয়া থাকিবেন—ডাক্তারবাবু নিজেই উপযাচক হইয়া এই ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

বড় ডাক্তারের কাছেই পাঠানো হইল বটে, তবু ফলাফল সম্বন্ধে ভূপেনের যথেষ্ট সন্দেহ ছিল এবং যদি সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থই হয় ত কি উপায় হইবে, সে-অবস্থাটা সে কল্পনা পর্যন্ত করিতে পারিতেছিল না। এইভাবে আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া যখন সে ইহাদের প্রত্যাবর্তনের প্রহর গণিতেছে সেই সময় অকস্মাৎ আর একটি দায়িত্ব তাহার উপর আসিয়া পড়িল। বিজয়বাবুর অসুখের জন্যে এ কয়টা দিন

কোচিং ক্লাস না হইলেও সালেকের অসুখের খবরটা সে ক্লাসেই পাইয়াছিল। তাহার নাকি প্রবল জ্বর, সর্বাঙ্গে ব্যথা—খুব সম্ভব ইনফ্লুয়েঞ্জা। তবু কিছুতেই সময় করিয়া এ দুইটা দিন তাহার খবর লইতে যাওয়া হয় নাই, এজন্য ভূপেন মনে মনে লজ্জিতই ছিল। বিজয়বাবুদের ট্রেনে তুলিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিতে আসিতে সেই কথাটাই মনে পড়িয়া সে প্রতিজ্ঞা করিল যে, আজ স্কুলের ফেরত সোজা সালেকদের হোস্টেলেই ঢুকিবে।

কিন্তু স্কুলে পা দিতেই অপূর্ববাবু শুষ্ক মুখে বলিলেন, ও মশাই, শুনেছেন?

কিছু পূর্বেই সকলে হোস্টেলে একসঙ্গে বসিয়া আহার করিয়াছে, অপূর্ববাবু কয়েক মিনিট আগে আসিয়াছেন এইমাত্র—ইহার মধ্যেই শুনিবার মত কি ঘটিল অনুমান করিতে না পারিয়া ভূপেন বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল—না ত, কি হয়েছে?

মুখটা বিকৃত করিয়া অপূর্ববাবু কহিলেন, সালেকের গায়ে নাকি মার অনুগ্রহের গুটি বেরিয়েছে!

—সে কি!

—আবার কি, ঐ ত আব্বাস বলছে।

আব্বাস ঐ হোস্টেলের দ্বিতীয় এবং শেষ অধিবাসী। তাহাকে জেরা করিয়া ভূপেন জানিল কথাটা সত্যই। সে বেচারা ছেলেমানুষ, রীতিমত ভয় পাইয়া গিয়াছে। কাল নাকি যন্ত্রণায় সালেক সারারাত চেঁচাইয়াছে, তখন আব্বাস ঠিক বুঝিতে পারে নাই। সালেককে ভূতে পাইয়াছে এমনি একটা সন্দেহও হইয়াছিল তাহার; তারপর আজ সকালেও সালেক ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া কিছু দেখা যায় নাই, আব্বাসও খুব সম্ভব ভূতের ভয়েই, তাহাকে জাগাইবার চেষ্টা করে নাই। এইমাত্র দেখিতে পাইয়াই সে ছুটিয়া আসিয়াছে।

সংবাদটাতে ভূপেনের ভয় ততটা হইল না, যতটা হইল এ দুদিন সংবাদ না লইবার জন্য অনুশোচনা। সে অপূর্ববাবুকে প্রশ্ন করিল, এখন কি করবেন তাহ'লে?

—আমরা আর কি করব, হেডমাস্টার মশাই আসুন।

ভবদেববাবু সকালের দিকে প্রায় প্রত্যহই কিছু দেরি করিয়া আসেন। আহ্নিকপূজার চাপে সকালবেলা আর ঠিক অন্য মাস্টার মহাশয়দের সঙ্গে আহারে বসিতে পারেন না। এজন্য তিনি প্রথম ঘণ্টাটা নিজের খালি রাখিয়াই রুটিন করিয়াছেন। আজও ভবদেববাবু আসিলেন মিনিট পনেরো পরে। অপূর্ববাবুর মুখে সব বিবরণ শুনিয়া বলিলেন, তাই ত, রাধারাণীর আবার এ কি লীলা! জয় রাধে।

ভূপেন একটু অসহিষ্ণুভাবে জবাব দিল, কিন্তু রাধারাণী ত আর এখানে হেডমাস্টারী করেন না—এখানে দায়িত্ব আপনারই, একটা কিছু করুন।

ভবদেববাবু একটু অসহায় ভাবেই অপূর্ববাবুর মুখের দিকে চাহিলেন। অপূর্ববাবু কহিলেন, আব্বাসকে ত বাড়ি পাঠাতেই হবে—এ সব কেস অবিলম্বে সিগ্রিগেট করা দরকার। ওকেই বলুন যাবার সময় সালেকের বাড়ি খবর দিতে, ওর বাপ এসে নিয়ে যাক—

এই সহজ ব্যবস্থায় ভবদেববাবু খুশী হইয়া উঠিলেন। ভূপেন বিস্মিত হইয়া কহিল, কিন্তু কি ক'রে যাবে পক্স-এর কেস ?

—কেন, গো-গাড়ি করে নিয়ে যাবে।

—গোরুর গাড়ির গাড়োয়ান নিয়ে যেতে রাজী হবে ?

—ওরা যেখান থেকে হোক গাড়ি নিয়ে আসবে। তাছাড়া আমরা আর কি করব বলুন।

ব্যাপার যত সহজে ইঁহারা মিটাইয়া দিলেন তত সহজে কিন্তু মিটিল না। আব্বাস বিকালের দিকে আসিয়া খবর দিল সালেকের বাবা ও মা দুইজনেই ঘুটিয়ারী সরিফে বড় পীরের দরগায় বহুদিনের মানসিক পূজা দিতে কলিকাতায় গিয়াছেন, সেখান হইতে হুগলীতে কোথায় কুটুম্ববাড়ি দুই-একদিন কাটাইয়া দেশে ফিরিবেন। আর যাহারা বাড়ি আছে তাহারা কোন দায়িত্ব লইতে রাজী নয়।

এবার অপূর্ববাবুর মুখও অন্ধকার হইয়া উঠিল। সরকারী হাসপাতাল সেই সদরে, এখান হইতে ট্রেনে করিয়া লইয়া যাইতে হয়, নয়ত, গো-গাড়িতে আটাশ মাইল।

কি করা যায়—এই লইয়া যখন সকলে গবেষণা করিতেছেন তখন ভূপেনেরই একটা কথা মনে পড়িয়া গেল—এ কথা আগেই মনে আসা উচিত ছিল, নিতান্ত অন্যমনস্ক ছিল বলিয়াই এত বড় ভুল হইয়াছে। সে প্রশ্ন করিল, আচ্ছা ওর খাওয়া-দাওয়ার কি হচ্ছে ?

সকলে আব্বাসের মুখের দিকে চাহিল। সে মাথা চুলকাইয়া জবাব দিল, কদিন ত বার্লি আর মুড়িটুড়ি খাচ্ছিল। আজ—

—আজ কি ?

—আজ সকালেও বার্লি নিয়ে গিয়ে রেখেছিলুম বটে, কিন্তু সে ওকে দিয়ে আসা হয় নি। খাবার জলও—

—তার মানে কি ? ভূপেন প্রায় চেঁচাইয়া উঠিল, ঐ সাংঘাতিক রুগী বিনা

পথ্যে, বিনা জলে একা পড়ে আছে সমস্ত দিন? আর এই নতুন ভাতের সময়!

ভবদেববাবু অপ্রতিভ হইয়া দাড়িতে হাত বুলাইতে লাগিলেন, তাই ত! অপূর্ববাবু, এটা আপনাদের দেখা উচিত ছিল।

অপূর্ব্ববাবু আব্বাসকে ধমক দিয়া উঠিলেন। যেন সব দোষ তাহারই। ভূপেন একটু বিদ্রূপের স্বরে কহিল, আপনারা বয়স্ক লোক তাই ভয়ে মরে যাচ্ছেন—ও ত ছেলেমানুষ, ওর অপরাধ কি? আচ্ছা, কিছু করতে হবে না, আমিই যাচ্ছি। আব্বাস তুই বাড়ি চলে যা, যতদিন না ও ভাল হয় আমি ও হোস্টেলেই থাকব।

এই বলিয়া সে আর বাদানুবাদের অবকাশ না রাখিয়াই দ্রুত হোস্টেলের পথ ধরিল। অপূর্ববাবু পিছন হইতে হাঁকিয়া প্রশ্ন করিলেন, আপনার টিকে নেওয়া আছে ত?

—তা ত আছেই—ভূপেন চলিতে চলিতেই ঘাড় ঘুরাইয়া উত্তর দিল—তা ছাড়া জ্বর হ'লেই সরকারী হাসপাতালে চলে যাবো। আপনাদের ভয় নেই।

অপূর্ববাবুর মুখ লাল হইয়া উঠিল, কহিলেন, শুনলেন মাস্টার মশাই কথাটা। ওর এই ধরনের ইম্‌পার্টিনেন্স অসহ্য হয়ে উঠেছে।...আমার ডিউটি জিজ্ঞেস করা তাই—

কাছেই পণ্ডিতমশাই দাঁড়াইয়া ছিলেন, কহিলেন, ভায়ার আমার ডিউটিজ্ঞানে এতটুকু ত্রুটি নেই। তবে কি জানো ভাই, ওদের ওটা কাঁচা বয়সের গরম—

ভবদেববাবু একটা ছোটখাটো দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে অস্ফুট কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, রাধে! রাধে!

সালেকদের হোস্টেলে ঢুকিয়া ভূপেন দেখিল তাহার অনুমানই ঠিক। বেচারা জ্বরে ও যন্ত্রণায় প্রায় অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া আছে, পিপাসায় জিভ এত শুকাইয়া উঠিয়াছে যে, কথা কওয়া প্রায় অসম্ভব। প্রথমেই খানিকটা জল খাওয়াইয়া বার্লিটা পরীক্ষা করিয়া দেখিল, ভালই আছে। কিন্তু শুধু বার্লি—না চিনি, না নুন, লেবু ত কল্পনারও অতীত। অগত্যা সে নিজেদের হোস্টেলে গিয়া রান্নাঘরের বাহির হইতেই একটু চিনি চাহিয়া লইল এবং চাকরকে দুইটা টাকা দিয়া স্টেশনে পাঠাইল, যদি পাতিলেবু ও কমলা বা অন্য কোন ফল পায়।

তারপর সালেককে বার্লি খাওয়াইয়া সে ছুটিল ডাক্তারের বাড়ি। ডাক্তারবাবু সব শুনিয়া একটু হাসিলেন। কহিলেন, এসব রোগে এখানে কেউ ডাক্তার ডাকে না, বিশেষ ক'রে মুসলমানরা ত নয়ই। যা করে ঐ শেতলার বামুন।...তা ওকে

যে মাস্টারমশাইরা—এখনও হোস্টেলে রেখেছেন ?

—ইচ্ছে ক'রে রাখেন নি—দায়ে পড়ে রেখেছেন।

ভূপেন সে কাহিনীটাও খুলিয়া বলিল। ডাক্তার প্রশ্ন করিলেন, পান না আসল বসন্ত—চেনা যাচ্ছে ? না, এখন বোঝা সম্ভব নয় ?

ভূপেন মাথা নাড়িয়া কহিল, না—It's too early.

—তবে কালই আমি যাবো। আজ এই ওষুধটা নিয়ে যান !

তিনি একটা ঔষধ নিজেই তৈয়ারী করিয়া দিলেন। আহার্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া আবারও বলিয়া দিলেন, কাল আমি দুপুর নাগাদ যাবো—বুঝলেন ! ও ত তাড়াতাড়ি কিছু করবার নেই।

সেখান হইতে হোস্টেলে ফিরিয়া সালেককে ঔষধ খাওয়াইতে গেলে প্রথমটা সে রীতিমত আপত্তি করিল। এ-সব রোগ ডাক্তারী ঔষধ খাইলে নাকি ভীষণ বাড়িয়া যায়—এই তাহাদের বিশ্বাস। তাহারা মুসলমান বটে, তবু এসব রোগে শীতলার বামুনকেই তাহারা বরাবর ডাকে। অনেক বুঝাইয়া মৃদু ধমক দিয়া ভূপেন শেষ পর্যন্ত তাহাকে ঔষধ খাওয়াইল বটে, কিন্তু ভয়টা যে তাহার তবু কাটিল না—সেটা বেশ বুঝিতে পারিল। এই প্রসঙ্গে সালেক তাহার বোনের মৃত্যুর কাহিনীটাও শুনাইয়া দিল। মাত্র বৎসর কতক আগে তাহার এক বোনের হাম হইয়াছিল। খুব বাড়াবাড়ি দেখিয়া মা নিজে গিয়াছিলেন গ্রামান্তরের এক বসন্ত চিকিৎসকের বাড়ি। তিনিও শীতলার পূজারী, এই হিসাবে চিকিৎসক। তিনি বিধান দিলেন, সওয়া ছয়গণ্ডা লঙ্কা বাটিয়া চুনের সহিত মিশাইয়া প্রলেপ দিতে হইবে। বাড়ি ফিরিয়া প্রলেপ দিবার সঙ্গে সঙ্গে ছটফট করিয়া মেয়েটা মারা গেল—বোধ হয় আধ ঘণ্টার মধ্যে।

এসব কাহিনী শোনে আর ভূপেন শিহরিয়া ওঠে। অশিক্ষা ও কুসংস্কার দেশের মর্মমূলে বাসা বাঁধিয়াছে। দুঃখ করিয়া কোন লাভ নাই। আটশত বছরের পরাধীনতার ফল এই অবস্থা, ইহার চেয়ে খারাপ হয় নাই বলিয়াই বরং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। মাঝে মাঝে নেতাদের মধ্যে যখন এ বিষয়ে মতবিরোধ হয় তখন তাহারও ঐ প্রশ্নটা মনে জাগে। কোন্‌টা আগে—নিজেদের সংস্কার আগে, পরে স্বাধীনতা—না স্বাধীনতা আগে, পরে সংস্কার ? মনে হয় শেষেরটাই বোধ হয় সহজ ও স্বাভাবিক পরিণতি।...

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে। ভূপেনের হাতে কাজ নাই—বইও নাই। সে ইতিমধ্যেই সালেকের বিছানাটা পাল্‌টাইয়া দিয়াছে। ময়লা বিছানাগুলি কাল এখানেই সাবানজলে সিদ্ধ করিয়া কাচিয়া দিতে হইবে। চাকরদের উপর চাপানো

যাইবে না—তাহাদের যে ভয়, এসব ফরমাশ করিলে হয়ত কাজ ছাড়িয়াই পলায়ন করিবে। নিজে আব্বাসের বিছানাটাই চলনসই করিয়া লইয়াছে, নিজের বিছানা আনিয়া আবার হাঙ্গামা করিতে ইচ্ছা হয় নাই। আব্বাসের শয্যার মলিনতায় ও দৈন্যে প্রথমটা সঙ্কোচ আসিয়াছিল বটে, কিন্তু জোর করিয়া সে মনকে শাসন করিল।

বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া সালেক প্রশ্ন করিল; আপনি কখন ফিরবেন মাস্টারমশাই? (আগে সে মাস্টার সাহেব বলিত—ভূপেনই বলিয়া সেটা বদলাইয়াছে।)

আব্বাস নাই, একা থাকিতে হইবে জনমানবহীন পুরীতে, সেই প্রশ্নটাই তাহার মনকে তখন হইতে পীড়া দিতেছে। ভূপেন সেটা বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া কহিল, ভয় নেই, আমি তোমার কাছে থাকব রাত্রে।

—রাত্রেও থাকবেন আপনি?

বিস্ময়ে কৃতজ্ঞতায় সালেকের চক্ষু দুটি বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

—হ্যাঁ—যত দিন না তুমি সেরে ওঠ, আমি তোমার কাছেই থাকব সালেক। কিন্তু এরা এখনও তোমার বার্লি ফল দিয়ে যাচ্ছে না কেন। আলোতেও বেশী তেল নেই মনে হচ্ছে। তুমি একটু একা থাকতে পারবে? আমি একবার খোঁজ নিয়ে আসি।

সালেক কহিল, তা পারব, মাস্টারমশাই। তা ছাড়া আপনি দয়া না করলে ত সারা রাতই একা থাকতে হ'ত। আর কেউই আসত না—

হোস্টেলে গিয়া ভূপেন দেখিল, চাকরটি লেবু, ফল সবই আনিয়াছে, বার্লিও প্রস্তুত কিন্তু সে খবরটা পর্যন্ত কেহ দেয় নাই।

চাকরকে প্রশ্ন করিতে সে মাথা চুলকাইয়া কহিল, আজ্ঞে, ওখানে আমরা যেতে পারব না।

—আশ্চর্য! হ্যাঁ রে, তোদের কি অসুখ-বিসুখ করবে না কখনও? এত ভয় কেন?

চাকরও রুখিয়া উঠিল, মিছিমিছি শাপ-মন্যি দিও না বাবু। মুসলমানের অসুখে অত দায় আমরা নিতে পারব না। তাছাড়া পাল-বাবুও বারণ করেছেন—বলেন ছোঁয়াচ লেগে তোর অসুখ করলে, এখানে কাজকর্ম পণ্ড হবে।

পাল-বাবু অর্থাৎ অপূর্ববাবু। ভূপেন কথাটা বুঝিল। ভবদেববাবু বাহিরে বসিয়াই মালা জপ করিতেছিলেন, তাঁহার দিকে চাহিতেই তিনি কহিলেন, না না, মুসলমান বলে নয়। খাবারটা দিয়ে আসবে তাতে আর কি—তবে জানেন

ওরা ভীষণ ভয় পায় এসব রোগকে। দরকার হ'লে আমাদের কাউকেই দিয়ে আসতে হবে—

—অত কিছু করতে হবে না, আমিই নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আমার ভাতটাও কি তাহ'লে ওখানে পাঠানো সম্ভব হবে না?

—তা আর কি ক'রে হবে বলুন। সেই একই বাধা রয়েছে, বুঝলেন না! তা ছাড়াও হোস্টেলে আবার এখানকার বাসন পাঠানোর একটা মুস্কিল আছে—

—আপনি ত বৈষ্ণব মাস্টারমশাই? তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে ভূপেন প্রশ্ন করিল।

লজ্জিত হইয়া ভবদেববাবু বলিলেন, না, না, আমার কথা বলছি না। তবে পাঁচজনের পাঁচ রকম মত বোঝেন ত—

হ্যারিকেনে তেল ভরিয়া লইয়া ভূপেন ফিরিয়া গেল। ইহাদের সঙ্গে বাদানুবাদ করিতে কিংবা যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিতেও কেমন বিতৃষ্ণা বোধ হইল। মূল হইতে ডগা পর্যন্ত সমস্তটাই পচ্ ধরিয়াছে—কোন একটা অংশের চিকিৎসা করিতে যাওয়াই মূর্খতা!...

পরের দিন দুপুরে ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া গেলেন। অধিকাংশই পান-বসন্ত, তবে দুই-একটি তাহার মধ্যে আসল বসন্তের গুটিও আছে। বিশেষ ভয়ের কোন কারণ নাই, এই আশ্বাস এবং আর একটি ঔষধের ব্যবস্থা দিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

কিন্তু ভয়ের কোন কারণ না থাকিলেও ভূপেনকে দিন-রাত এই রোগীকে লইয়া বসিয়া থাকিতে হইল। একেবারে একা এই ছেলেমানুষকে ফেলিয়া এক পা-ও বাহিরে যাইতে ইচ্ছা হইল না। ঔষধ-পথ্য-শুশ্রূষা সবই তাহার হাতে। কোন শিক্ষক একবার উঁকি পর্যন্ত মারেন না! শুধু সে যখন খাবার ঘণ্টা পড়িলে কিংবা সালেকের পথ্য লইতে হোস্টেলে যায় তখন ভবদেববাবু ও পণ্ডিত মহাশয় দুই-একটি প্রশ্ন করিয়া নিজেদের কর্তব্য সমাধান করেন।

সব চেয়ে যে ব্যাপারটায় ভূপেনের হাসি পাইল সেটা হইতেছে অপূর্ববাবুর কাণ্ড দেখিয়া। তিনি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট—পাছে তাঁহাকে কর্তব্যের খাতিরে কোন খবরাখবর লইতে হয়, খুব সম্ভব সেই কারণেই, বিশেষ জরুরী কাজের অছিলায় বাড়ি চলিয়া গেলেন।

অবশ্য ইহার জন্য ভূপেনের কোন দুঃখ ছিল না। ঘৃণা বা ভয় তাহার যথেষ্ট ছিল, আগে হইলে সে-ও বোধ হয় এসব রোগের ত্রি-সীমানায় ঘেঁষিত না—কিন্তু এই কয় বৎসর মোহিতবাবুর সঙ্গ তাহার চরিত্রে আমূল পরিবর্তন আনিয়া দিয়াছে, সে-কথা সে যখন ভাবে তখন মনে মনে তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞতা বোধ না করিয়া

পারে না।…

সব চেয়ে সে বিব্রত বোধ করে কল্যাণীর ছোট ছোট ভাইগুলির খবর লইতে না পারার জন্য। তিন দিন হইয়া গেল বিজয়বাবুরা গিয়াছেন—কোন চিঠি বা সংবাদ কিছুই পাওয়া যায় নাই, খুব সম্ভব পরীক্ষা করিতেই দেরি হইতেছে। কিন্তু এদিকে দেখা-শুনা করিবার যে দায়িত্ব সে লইয়াছিল, সেটা ঠিকমত করিতে না পারায় জন্য লজ্জা ও উদ্বেগের সীমা ছিল না। অবশ্য ডাক্তারবাবু খবর লন, তাঁহার একটি অল্পবয়সী বিধবা শালীও আছেন—এ ছাড়া সে যতীনবাবুকে রোজই একবার করিয়া খবর লইতে পাঠায়—একরূপ জোর করিয়াই পাঠাইতে হয়—তবু যতীনবাবু শেষ পর্যন্ত যান—অন্য কাহাকেও রাজী করানোই যায় না। অনেকেরই মনে মনে ভয় যে, যদি বিজয়বাবু একেবারে অন্ধই হইয়া যান ত এখন যাহারা বেশী খবরা-খবর লইবেন—দুঃস্থ পরিবারকে সাহায্য করিবার ভারটাও তাঁহাদের উপরই আসিয়া পড়িবে। অত হাঙ্গামায় প্রয়োজন কি?

অবশেষে পঞ্চম দিনের দিন বিজয়বাবুর বড় ছেলেটির মুখে খবর পাওয়া গেল, কল্যাণী চিঠি দিয়াছে সেই দিনই সন্ধ্যার ট্রেনে তাহারা আসিয়া পৌঁছিবে। সে দিন সালেকও একটু সুস্থ ছিল, তাহার কাছে কথাটা পাড়িতেই, ঘরে আলো জ্বালা থাকিলে সন্ধ্যাটা সে স্বচ্ছন্দে একা থাকিতে পারিবে জানাইল। তখন ভূপেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া যতটা সম্ভব নিজেকে বীজাণুমুক্ত করিয়া বিজয়বাবুর বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল।

সে যখন পৌঁছিল, বিজয়বাবু তাহার কিছু পূর্বেই আসিয়াছেন। আগেকার মতই শান্ত ভাবে বাহিরের চৌকিটাতে পড়িয়া ছিলেন, চোখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, বোধ হয় ঔষধ লাগানো আছে। ভূপেনের পদশব্দে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, এস ভায়া, ভূপেনবাবু না?

—হ্যাঁ দাদা, আমি। খবর কি?

ভূপেন রুদ্ধনিশ্বাসে প্রশ্ন করিল।

—বলছি ভাই, সালেকের খবর কি, ভাল আছে একটু? সব শুনলুম আমি স্টেশনে নেমেই ছেলের মুখে। তোমারই সার্থক জন্ম ভাই, বহু মানুষের উপকারে লাগলে। তা তাকে একা রেখে এলে যে—অসুবিধা হবে না?

—না দাদা, সে সুস্থ আছে একটু। কিন্তু আপনার খবর কি বলুন?

সহজ সংযত কণ্ঠেই বিজয়বাবু উত্তর দিলেন, ডাক্তার ত তিন দিন ধরেই পরীক্ষা করলেন, ওষুধ দিয়েছেন—ডায়েটও ঠিক করে দিয়েছেন। সন্ধ্যা-মাও ত

আমার একগাদা ওষুধ কিনে সঙ্গে দিলেন, তবে আশা যে আর বিশেষ নেই তা ডাক্তারের কথাতেই বেশ বুঝতে পারা গেল।

এত নিশ্চিন্তভাবে তিনি কথাটা বলিলেন, যেন সেটা তাঁহার চরম দুর্ভাগ্যের কথা নয়—সাধারণ একটা সংবাদ মাত্র, তা-ও অপরের।

অনেকক্ষণ পরে ভূপেন যেন কণ্ঠস্বর খুঁজিয়া পাইল। প্রায় চুপি চুপি কহিল, বলেন কি দাদা? এত sudden—

—কি করবে ভাই—ভগবানের মার। প্রাণশক্তি নাকি একেবারেই ছিল না দেহে, তাই একটুও resist করতে পারে নি।

আরও খানিকটা দুইজনে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পর বিজয়বাবুই আবার কথা কহিলেন, মেয়েটা এসেই বোধ হয় ঘরের মধ্যে গিয়ে আছড়ে পড়েছে—একটু দেখগে ভাই, দুটো কথা বলোগে। ও বড় বেশী কাতর হয়ে পড়েছে—

কল্যাণীর অবস্থা ভূপেন আগেই খানিকটা কল্পনা করিয়াছিল। এক্ষেত্রে তাহাকে কি বলিবে, কি বলিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিবে তা তাহার মাথাতেই আসিতেছিল না, তবু উঠিতেই হইল! কল্যাণী ঘরের মেঝেতে মাটির উপর মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল। তাহার রোদনের কারণ ঠিক না বুঝিলেও ছোট দুটি ভাই পাশেতে শুষ্কমুখে বসিয়াছিল, এখন ভূপেনকে আসিতে দেখিয়া তাহারাও কাঁদিয়া ফেলিল। ভূপেন খানিকটা নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহার পাশে মাটিতেই বসিয়া কল্যাণীর পিঠে একটা হাত রাখিয়া আস্তে আস্তে ডাকিল, কল্যাণী!

কল্যাণী মুখ তুলিয়া প্রায় রুদ্ধ অথচ আর্তকণ্ঠে কহিল, শুনেছেন—বাবা আর কোন দিন বোধ হয় চোখে দেখতে পাবেন না—আর কোন দিন না!

ভূপেন তেমনিই কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। এ কথার কী-ই বা উত্তর দিবে! কল্যাণী মুহূর্তকয়েক যেন একটা কিছু সান্ত্বনার আশাতেই তাহার মুখের দিকে একান্ত আগ্রহে চাহিয়া রহিল, তার পর সেখানে কিছুমাত্র আশ্বাস খুঁজিয়া না পাইয়া তাহার পায়ের উপরেই মুখটা গুঁজিয়া হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, কাহিল, কি হবে ভূপেনবাবু আমাদের? বাবাকে, এই ছোট ছোট ভাইগুলোকে কি করে বাঁচাবো?

ভূপেনের চক্ষুও কান্নার ছোঁয়াচে সজল হইয়া উঠিয়াছিল, তবু সে জোর করিয়া কল্যাণীর মাথাটা কোলের উপর টানিয়া জবাব দিল, ভয় কি কল্যাণী, আমি—আমরা ত আছি!

১৬

সালেকের বাপ-মা দেশে পৌঁছিয়া খবর পাইয়াই ছুটিয়া আসিলেন। ততদিনে সালেকও একটু সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং ভূপেন কয়েকদিনের জন্য তাহাকে বাড়ি পাঠাইয়া দেওয়াই স্থির করিল। কিন্তু বিপদ বাধিল সালেককে লইয়া—সে মাস্টারমশাইকে ছাড়িয়া বাপ-মায়ের কাছেও যাইতে চায় না। ভূপেন অনেক করিয়া বুঝাইয়া, ধমক দিয়া তবে রাজী করাইল। সে কিছু ফল এবং এক শিশি ঔষধ উহাদের সঙ্গে দিল এবং কোন মতে ঠাণ্ডা না লাগে বা পেটের গোলমাল হইতে পারে, এমন খাদ্য না দেওয়া হয়—সে সম্বন্ধে বার বার সতর্ক করিয়া দিল।

সালেক গাড়িতে উঠিয়াও বহুক্ষণ তাহার হাতটা দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া রহিল, শেষে অসহিষ্ণু গাড়োয়ান গাড়ি ছাড়িয়া দিতে ভূপেন যখন এক রকম জোর করিয়াই হাতটা টানিয়া লইল তখন তাহার হাতের অনেকখানিই সালেকের চোখের জলে ভিজিয়া গিয়াছে। ইহারা কিশোর, ইহারা অল্পবয়সী—ইহাদের কৃতজ্ঞতা যতটা ভাবপ্রবণ ততটা স্থায়ী নয়, তবু ভূপেনের মনটা অনেকক্ষণ পর্যন্ত ভারী হইয়া রহিল। এখানে আসিয়া বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা হইয়াছে সত্য কথা, কিন্তু এই ছেলেগুলির যে প্রীতি সে পাইয়াছে তাহার মূল্য কি কম?

তবু সালেককে বিদায় দিয়া সে কতকটা নিশ্চিন্ত হইল। এই কয় দিনে সে দেহে ও মনে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার উপর বিজয়বাবুর চিন্তা অহরহ তাহার মস্তিষ্ককে পীড়িত করিতেছে। সে কল্যাণীকে আশ্বাস দিয়া আসিয়াছে, তাহারাও একান্ত নির্ভয়ে ভূপেনেরই মুখের দিকে চাহিয়া আছে—কিন্তু কী-ই বা সে করিতে পারে? স্কুল-কর্তৃপক্ষ স্থির করিয়াছেন যে, অসুস্থতার অজুহাতে আরও দুই মাস তাঁহারা পুরা বেতনে ছুটি দিবেন, তাহার পর দুই মাস অর্ধ বেতন—এর চেয়ে বেশী কিছু তাঁহারা করিতে পারেন না। স্কুলের যা আর্থিক অবস্থা তাহাতে আর কিছু করা সম্ভবও নয়। অর্থাৎ কায়ক্লেশে মাস চারেক কাটিতে পারে—কিন্তু তাহার পর?

হয়ত সন্ধ্যাদের বলিলে কিছু কিছু মাসিক সাহায্যের ব্যবস্থা হইতে পারে, কিন্তু সে ত ভিক্ষা। তা ছাড়া সে-ই বা কতটা চাওয়া যায়? যতটা পাওয়া যাইবে তাহাতে কতটা চলিবে তারও কিছু ঠিক নাই। এবং সে সাহায্য চাহিবার

কোন অধিকার ভূপেনের আছে কি না—সে সংশয়টাও বার বার ভূপেনের মনে জাগিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে সহসা একদিন কল্যাণী তাহাকে ডাকিয়া বলিল, একবার শুনুন!

ভূপেন রান্নাঘরের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইতেই সে বিনা ভূমিকায় বলিল, গদাধরপুর প্রাইমারী ইস্কুলে না কি একজন মাস্টারের চাকরি খালি আছে, মাইনে অবশ্য বেশী নয় কিন্তু তাদের তেমনি পাশ-টাশ করারও অত দরকার নেই···আমাদের রাখুকে দিলে কি হয়? আপনি একটু তদ্বির করলে হয়ত হয়ে যেতে পারে।

রাখু কল্যাণীর পরেই যে ভাই—ছেলেদের মধ্যে সে-ই বড়। বছর পনেরো-ষোল বয়স, সবে সেকেণ্ড ক্লাসে পড়িতেছে।

বিস্মিত হইয়া ভূপেন প্রশ্ন করিল, রাখু?···কিন্তু ও ত নিজেই ছেলেমানুষ।··· তাছাড়া সে মাইনেই বা আর কত পাবে?

নতমুখ কল্যাণী উত্তর দিল, শুনেছি টাকা দশেক। কিছুই নয় অবিশ্যি, কিন্তু উপোস করে মরার চেয়ে ত ভাল।

একটু যেন আহত কণ্ঠেই ভূপেন বলিল, উপোস ক'রে ত মরতে হয় নি এখনও —এরই মধ্যে অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? একটু ভাবতেই সময় দাও না।

কল্যাণী খুন্তিটা লইয়া মুহূর্ত কয়েক নাড়া-চাড়া করিয়া বলিল, আপনি যখন আছেন তখন যা হয় একটা উপায় হবেই জানি, কিন্তু সেটা ত আপনার ওপরই পীড়ন করা হবে। হয় নিজের পকেট থেকে দিতে হবে, নয় ত আপনাকেও ভিক্ষে ক'রে আনতে হবে।···তা ছাড়া সে ত রইলই—যদি কিছুও আনতে পারে রাখু, ক্ষতি কি? যতটা নিজের পায়ে ভর দিয়ে চলতে পারে ততটাই ভাল নয় কি?

ভূপেন কহিল—ভাল সন্দেহ নেই, কিন্তু ওটা ত পায়ে ভর দিয়ে চলা নয় কল্যাণী, ওটা খুঁড়িয়েই চলা। আর ওতে চিরকাল অমনি খুঁড়িয়েই চলতে হবে। ···বরং কোন মতে যদি ম্যাট্রিকটা পাস করতে পারে ত বহু দোরই খোলা থাকবে ওর সামনে।···আচ্ছা দেখি—

সে বাদানুবাদের অবসর না দিয়াই চলিয়া আসিল। কল্যাণী সম্পূর্ণ ভাবে তাহার উপর নির্ভর করিতে পারিতেছে না—এ কথাটা কাঁটার মতই বহুক্ষণ ধরিয়া খচ্ খচ্ করিতে লাগিল। তবে এ কথাটাও মনে মনে স্বীকার করিতে বাধ্য হইল যে, জোর করিয়া আশ্বাস দেয় সে কল্যাণীকে—আমি তোমাদের সমস্ত ভার লইলাম—এমন সাহসও ত তাহার নাই। তাহার ক্ষমতা কতটুকু, সে কথা তাহার

চেয়ে বেশী আর কে জানে।

সুতরাং দিন-দুই পরে একদিন তাহাকে গদাধরপুর যাত্রা করিতে হইল। কোন্ পথ, কোথা দিয়া যাইতে হয়—কত দূর, কিছুই ধারণা ছিল না। কোন মতে জিজ্ঞাসা করিয়া পৌঁছিল। এই গ্রামে সালেকদের বাড়ি, অনেক দিন আগে বেড়াইতে বাহির হইয়া সে-ই পথটা দেখাইয়া দিয়াছিল, সুতরাং মোটামুটি কোন্ দিকে গ্রামটা সে সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ধারণা তাহার ছিল।

সে স্কুলের ছুটির একটু আগেই বাহির হইয়াছিল, তবু সেখানে পৌঁছিতে তাহার অপরাহ্ণ গড়াইয়া আসিল। ছোট গ্রাম, কয়েক ঘর মাত্র লোক, তাহার মধ্যে মধ্যবিত্তের সংখ্যা খুবই কম। যে কয় জন লোক আছে তাহারাও এখানকার অন্য গ্রামের অধিবাসীদের মতই অর্ধমৃত—দারিদ্র্যে, অনাহারে, ম্যালেরিয়ায় ও অশিক্ষায়—একেবারে পুরোপুরি পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী। প্রশ্ন করিলে তাকাইয়া থাকে, কথা বুঝিতে দেরি হয়। মনে হয় বুঝি উত্তর দিবার মত দৈহিক শক্তিও আর তাহাদের অবশিষ্ট নাই।

ভূপেন গ্রামে প্রবেশ করিতে এখানকার সব গ্রামের মতই উলঙ্গ, কৃষ্ণকায়, শীর্ণ ছেলেমেয়ের দল ঘিরিয়া দাঁড়াইল, দুই-একজন যথারীতি 'আপনার নিবাস কোথায় ?' তা-ও প্রশ্ন করিল, কিন্তু পাঠশালাটা যে কোন্ দিকে সে উত্তরটা তাহাদের নিকট হইতে আদায় করিতে ভূপেনকে রীতিমত বেগ পাইতে হইল। অনেক বকাবকির পর তাহার প্রশ্নটা বুঝিতে পারিয়া একটি ছোকরা যখন 'মশাই' বা পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়িটা দেখাইয়া দিল, তখন সন্ধ্যার আর খুব বেশী দেরি নাই।

সৌভাগ্যবশত পণ্ডিতমশাই বাড়িতেই ছিলেন। বাহিরে আসিয়া পরিচয় পাইতেই বিশেষ সমারোহ করিয়া বসাইলেন। এমন কি অনেক চেষ্টা ও তদ্বিরের পর রসগোল্লা ও খাস-বালুসাহীর সঙ্গে এক কাপ চা-ও আসিয়া পৌঁছিল।

জলযোগ ও কুশল-বিনিময়ের পর ভূপেন সরাসরি কাজের কথাই পাড়িল। কথাটা শুনিয়া পণ্ডিতমশাই অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, বিজয়বাবুকে আমি ভাল ক'রেই চিনি বাবু, অমন মানুষ হয় না। তাঁর ছেলেকে আমি কাজ দেব এতে আর কোন কথাই চলে না। তাঁর বিপদের কথাও শুনেছি সব—এ অঞ্চলে বেরিবেরি হয়ে বহু লোকেরই চোখ গেছে বাবু, তবে অমন হঠাৎ যেতে শুনি নি আর কখনও। হবে কি বাবু, তেলে যে কি ভেজাল না দিচ্ছে তা বলতে পারি না। সের-করা এক-পো সর্বেও থাকে না। কি করব ঐ আমাদের খেতে হয়—উপায় কি ? যাক যা বলছিলুম, ওঁর ছেলের কাজের কথা—মাইনে ত বাবু সাত্তই

টাকার বেশী আমি দিতে পারবো না। তাতে কি ওদের পোষাবে? এই দেড় ক্রোশ পথ হেঁটে যাওয়া-আসা!

—মোটে সাত টাকা!—বিস্মিত ভূপেন প্রশ্ন করিল।

লজ্জিত মুখে পণ্ডিতমশাই উত্তর দিলেন, তার বেশী আর কোথা থেকে দেব বলুন! সরকারী গ্র্যাণ্ট পাই মোটে কুড়িটি টাকা। মাইনে ওঠে কোন মাসে দশ, কোন মাসে বারো—যে মাসে খুব বেশী ওঠে, পনেরো টাকা। আট আনা আর চার আনা মাইনে, তাও অর্ধেক ছেলেই দিতে পারে না। এখানে কি ইস্কুল চলে? চলে না। আমাদের উপায় নেই বলেই জোর ক'রে চালানো। আমি নিই পনেরো টাকা—আমার ভাইকে দিই দশ। তার কমে আমাদের সংসার চলে না। বাকী কি থাকে আর তা থেকে কি দেবো বলুন দিকি! অথচ আর একটা মাস্টার না রাখলে ইন্সপেক্টার বকাবকি করে। কে আসবে ঐ মাইনেতে!··· আমাদেরই কি পোষায়? কলাটা মূলোটা আদায় হয় মধ্যে মধ্যে—কেউ বা ঘর থেকে লাউ এনে দেয়, কেউ বা একটা সূয্যি কুমড়ো। আর আয়ের মধ্যে কখানা বই বিক্রী হয় বছরের গোড়াতে, তাই বা কটা ছেলে বই কিনতে পারে? যা-ও কেনে তা-ও ধারে। সম্বচ্ছর ধরে বইয়ের দাম আদায় দিতে হয়।

ভূপেন প্রশ্ন করিল, আপনারাই বই বেচেন?

—বেচি বৈ কি। নইলে চলবে কি ক'রে? ঐ সিজিন-এর মুখে বই-ওলারা আসে, যার বইয়ে বেশী কমিশন তার বই-ই খানকতক নিয়ে রাখি—সেই বই-ই পড়াই। পেটের দায়ে সবই করতে হয় বাবু, খারাপ বই পড়াতে অসুবিধা হয়, তবু বেশী কমিশন পাই বলে তা-ই ইস্কুলে ধরাই। নইলে চলবে কেন?

—খারাপ বই জেনেও ধরান?

—কি করব বলুন? এ ত আপনাদের হাই-স্কুল নয়—এখানে ঐ কমিশনের ওপরই বই চলে। কেউ হয়ত শতকরা পঁচিশ-টাকা কমিশন দেবে বললে, তার বই রাখলুম খানকতক—আর একজন ত্রিশ টাকা কি তেত্রিশ টাকা পাঁচ আনা বললে—এর বইটা চালালুম, ওর ফেরত দিলুম। তবে বই দু-একখানা ক'রে চেয়ে-চিন্তে সকলের কাছ থেকেই আদায় ক'রে রাখি। সেই বই-ই প্রাইজে চালাই। প্রাইজ খাতে খরচ দেখাতে হবে ত? টাকা পাবো কোথায়—ঐ সব চক্‌চকে পাঠ্যপুস্তকই চালিয়ে দিই। ঐটেই একটা খরিদ দেখানো হয়। উপায় কি বাবু?

ভূপেন স্তম্ভিত হইয়া শুনিতেছিল, সে আস্তে আস্তে প্রশ্ন করিল, কিন্তু এতে ত ছেলে-পিলেদের পড়ার ক্ষতি হয়?

—কিছু না, কিছু না! ওদের কি কারো লেখাপড়া হবে ভেবেছেন? কারো

না, ও শুধু-শুধুই পণ্ডশ্রম। আর এরা পড়বেই নাকি কেউ এর পরে? ঐ যা হ'ল হ'ল, তারপর ত বাড়ি বসে ম্যালেরিয়ায় ভুগবে আর যাদের জমি আছে তারা চাষ করবে।...আপনিও যেমন বাবু, ওদের পেছনে খেটে লাভ কি? পড়াশুনো হয় শহর-বাজারের ছেলেদের—তারাই পাস-টাস করে, চাকরি-বাকরি তাদের হয়। এরা কি চাকরি করতে যাবে?...দিচ্ছেই বা কে এদের চাকরি বলুন—বেশী পড়ে লাভ কি?

তবু ভুপেন হাল ছাড়িল না—মৃদু প্রতিবাদের সুরে কহিল, কিন্তু চাকরিটাই ত আর লেখাপড়া শেখার প্রধান উদ্দেশ্য নয়—

—তা ছাড়া আর কি বলুন!—পণ্ডিতমশাই প্রবল বেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, কেউ না হয় কেরানী হ'ল—কেউ বা জজ-ম্যাজিস্ট্রেট, যা-ই বলুন না কেন, চাকরি ত? ডাক্তার উকীল আর ক'টা হচ্ছে, তা ছাড়া লেখাপড়া একটা ভাগ্যের কথা, যাদের হবার ঠিক হয়। এই ত কত বড়লোকের ছেলে দেখছি—বাপ-মা কত চেষ্টা করে, কত পয়সা খরচ করে, কিচ্ছু হয় না। আবার রাঁধুনী বামুনের ছেলে বিদ্যাসাগর হয়। তা ছাড়া বই কি আর এমন কিছু ইতর-বিশেষ হ'তে পারে—গুণ-ভাগ সব অঙ্কের বইতেই আছে, বোঝেন না?

তারপর একটু থামিয়া কহিলেন, তা ছাড়া ভাল বই কি আর পাস হয় বাবু? এক দফা সরকার বই পাস ক'রে দিলে ইস্কুলের জন্য, আবার এক দফা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড থেকে পাস করাতে হয়। আমাদের প্রাইমারী বইতে ঝঞ্চাট কত।...ঐ মিটিং-এর সময় যে কেরানীবাবুকে আর মেম্বারদের মোটা ঘুষ দিতে পারবে তারই বই পাস হবে। এ বছর আমাদের জেলায় একখানা মোটে ব্যাকরণ পাস হ'ল, বলব কি বাবু, আড়াই শ'র ওপর ভুল বইটায়! শুনলুম ঐ বইয়ের যে প্রকাশক সে নাকি চেয়ারম্যানের বৌকে আমলেট গড়িয়ে দিয়েছে।

ইহার পর আর ভুপেনের বেশী শুনিবার ইচ্ছা ছিল না। সে দুই-একটা কথা কহিয়াই উঠিয়া পড়িতে গেল কিন্তু পণ্ডিতমশাই বিনয় করিয়া কহিলেন, বাবু চললেন—কিন্তু আমার একটা ভিক্ষা আছে।

—কি ব্যাপার?—ভুপেন যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইয়া গেল। তাহার কাছে আবার কি ভিক্ষা?

পণ্ডিতমশাই মাথাটা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিলেন, অনেক দিন ধরেই ভাবছি ওপরওলাদের কাছে আর কিছু গ্র্যাণ্ট বাড়াবার জন্যে দরখাস্ত করব তা লেখবার লোকের অভাবে হয়ে উঠছে না। আজ যখন ভগবান আপনাকে এনে দিয়েছেন তখন আর ছাড়ছি না। হাজার হোক আপনারা হাই-স্কুলের মাস্টার,

গ্র্যাজুয়েট নিশ্চয়ই—আপনারা লিখে দিলে অবিশ্যি গ্র্যাণ্ট বাড়বে! আর যদি পাঁচটা টাকাও বাড়ে তাহ'লে আমি বিজয়বাবুর ছেলেটাকে দশ টাকা মাইনে দিতে পারি। ওকে নিলে অবিশ্যি আমার লোকসান নেই, এখানে পড়াশুনোর তেমন চাপ নেই—চাই কি দুপুরের দিকে আমার কয়লার দোকানের খাতাটাও ওকে দিয়ে লিখিয়ে নিতে পারি—

—আপনার আবার কয়লার দোকান আছে নাকি?

সবিনয় হাস্যে পণ্ডিতমশাই জবাব দিলেন—সম্প্রতি করেছি, সেই ইস্টিশানের ধারে। ছোট্ট দোকান—এখানে ক'টা লোকই বা কয়লা পোড়ায়! তবু, বলি যা কিছু আসে, দুটো পয়সাই বা দেয় কে? তবে বলতে নেই, কয়লা লক্ষ্মী। ঐ ত আপনি যে ইস্কুলে মাস্টারী করছেন, ভবদেববাবুর আগে ওখানে হেডমাস্টার ছিলেন বঙ্কিমবাবু—আগে ভদ্রলোক সদর বাজারে কয়লার দোকান দিলেন, তারপর বইয়ের দোকান, সব শেষে কাপড়ের। তিনটে দোকানই চলছে, ছেলে, ভাইপো, ভাগ্নে—সকলকারই ভাত-কাপড় হচ্ছে ঐ দোকান থেকে। তা ছাড়া জোর কত! দোকানগুলো চালু হওয়ায় ইদানীং প্রায়ই ওঁর কামাই হ'ত। তাতেই বুঝি সেক্রেটারী একদিন কি বলেছিল—দিলেন এক কথায় চাকরি ছেড়ে। আমাদের অবিশ্যি সে বরাত নয়, তবু চেষ্টা ক'রে দেখতে দোষ কি! সত্যি কথা বলতে কি বাবু, এ গরু চরানো আর ভাল লাগে না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পণ্ডিতমশাই ঘরের মধ্য হইতে কাগজ কলম আনিয়া দিলেন। কোন মতে একটা দরখাস্ত লিখিয়া দিয়া ভূপেন যখন উঠিয়া পড়িতেছে, তখন পণ্ডিতমশাই ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, তাই ত, ওধারে সন্ধ্যাও উত্তীর্ণ হয়ে গেল। আপনি কি এতটা পথ চিনে যেতে পারবেন? তার চেয়ে আজ গরীবের ঘরেই যা হোক দুটো শাক-ভাত খেয়ে কাটিয়ে গেলে হ'ত না রাতটা?

দৃঢ় কণ্ঠেই ভূপেন কহিল, না, আমাকে ফিরতেই হবে। এখানে আমাদের এক ছাত্র আছে সালেক বলে, গফুর শেখের ছেলে, তার সঙ্গে দেখা করলে সে-ই আমাকে পথ দেখিয়ে দিতে পারবে।

—ও, গফুর শেখের বাড়ি! তা সে ত এখানে নয়, প্রায় আধ ক্রোশ তফাৎ আরও, রায়না গ্রাম। তবে রাস্তা এই সিধে—মাঠের ওপর দিয়ে, ঘোর-প্যাঁচ নেই। অন্ধকার রাত এই যা…

—আমার কাছে টর্চ আছে—

এই বলিয়া—ভূপেন আর কথাবার্তার সুযোগ না দিয়াই বাহিরে আসিয়া পড়িল। কঠিন ডাঙ্গার উপর দিয়া শীর্ণ পায়ে-হাঁটা পথ, ভুল হইবার কোন কারণ

নাই। সে দ্রুত হাঁটিতে শুরু করিল।

সালেক প্রথমটা যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করিতে পারে নাই—পরে যখন সন্দেহের অবকাশ রহিল না, তখন ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া প্রায় তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। তারপর কোথায় তাহাকে বসিতে দিবে—কি পাতিয়া দিবে কিছু যেন সে ভাবিয়া পায় না, একেবারে দিশেহারা হইয়া পড়িল। গফুর ও তাহার স্ত্রীও ছুটাছুটি শুরু করিয়া দিলেন, ভূপেন তাঁহাদের ছেলের ঐ সাংঘাতিক অসুখের সময় যা করিয়াছে—যে অসুখে লোক ছায়া মাড়ায় না, সেই অসুখে নিজের প্রাণের ভয় না করিয়া যে অক্লান্ত সেবা করিয়াছে—তাহার কৃতজ্ঞতা মুখে প্রকাশ করিবার যেন তাঁহাদের ভাষা নাই। স্বামী ও স্ত্রী, দুজনেই সে কথা বলিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

এমনি প্রথম খানিকটা আলাপ সম্ভাষণের পর ভূপেন ফিরিবার প্রস্তাব করিতেই সকলে লাফাইয়া উঠিলেন। গফুর কহিলেন, পথ বলে দেবার জন্য কিছু নয় বাবু মশাই। সে আপনি যদি নিতান্তই যেতে চান তাহ'লে আমি যেমন ক'রেই হোক্ পৌঁছে দিয়ে আসব—কিন্তু এখনই ত প্রায় এক পহর রাত হয়ে গেল—কখনই বা পৌঁছবেন ওখানে? তাছাড়া আমাদের ঘরে যখন পায়ের ধুলো পড়লই—একটা রাতও কি সেবা করতে পারব না? আজকের রাতটা থেকেই যান না বাবু, কী আর ক্ষতি হবে?...আমাদের এখানে থাকতে কি ঘেন্না করবে?

—ছি ছি, কি বলেন গফুর মিয়া। ভূপেন লজ্জিত ও অপ্রস্তুত হইয়া উঠিল।

—তবে থেকেই যান মাস্টারমশাই।

সালেক ছল-ছল চোখে অনুরোধ করিল।

তখন রাত হইয়াছে অনেকটা, ভূপেনেরও অনভ্যস্ত পা একটানা এতটা হাঁটিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার উপর এখানে এই ঐকান্তিক মিনতি, সবটা জড়াইয়া ভূপেন যেন কেমন অভিভূত হইয়া পড়িল। ঠিক থাকিবার ইচ্ছা না থাকিলেও কহিল, আচ্ছা তাই হবে।

কিন্তু গফুর মিঞা যখন প্রস্তাব করিলেন যে, তাঁহারা আয়োজন করিয়া দিবেন, ভূপেনকে রাঁধিয়া লইতে হইবে এবং রান্না ও খাওয়ার জলটাও কুয়া হইতে তাহাকেই তুলিতে হইবে—তখন সে রীতিমত বাঁকিয়া দাঁড়াইল। বলিল, তাহ'লে কিন্তু আমি এখনই চলে যাবো। আমি সে রকম ভাবলে আসতুম না—থাকা ত দূরের কথা।...আপনারা যা খাবেন আমিও তাই খাবো। আপনারা শ্রদ্ধা করে

যা রেঁধে দেবেন তা কি অখাদ্য ?

কথাটা সালেক বুঝিল কিন্তু গফুর রীতিমত বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। এক দিনের জন্য হিন্দু ভদ্রলোককে তাঁহাদের রান্না খাওয়াইতে কিছুতেই মন উঠিল না তাঁহার। শেষ পর্যন্ত আহার্য যখন আসিয়া পৌছিল তখন দেখা গেল যে ভূপেনের জাত বাঁচাইবার জন্য তিনি যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন, ঘন দুধ, খই, কলা এবং মোণ্ডার ব্যবস্থা হইয়াছে। রীতিমত ফলারের আয়োজন। শুধু তাই নয়, পাড়ার একটি হিন্দু ছেলে আসিয়া পানীয় জলটাও তুলিয়া দিয়া গেল। ভূপেন তখন অত্যন্ত ক্লান্ত, একটু বিশ্রাম করিতে পারিলে বাঁচে, সে আর প্রতিবাদ করিল না, কোন মতে আহার শেষ করিয়া উঠিয়া পড়িল।

কিন্তু সব চেয়ে তাহার হাসি পাইল যখন সে শুইয়া পড়িতে সালেক আসিয়া পদসেবা করিতে বসিল। সে পা-টা টানিয়া লইবার চেষ্টা করিয়া ঈষৎ তিরস্কারের ভঙ্গিতে কহিল—ও কি সালেক, ছিঃ!

সালেক তাহার পা-দুটা সজোরে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, না স্যার, আজ আমি কোন কথা শুনব না। আজ আমার কত ভাগ্য আপনি আমার বাড়ি এসেছেন—এ দিন কি আর পাবো!

তাহার মনের আবেগ বুঝিতে পারিয়া ভূপেন আর বাধা দিল না। শুধু বলিল —পা টিপতে হবে না, যদি দিতেই হয় ত এমনি হাত বুলিয়ে দাও।

তারপর দুটো একটা কথা কহিতে কহিতেই সে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, সালেক কতক্ষণ পর্যন্ত এমনি বসিয়া তাহার সেবা করিয়াছে, সে জানিতেও পারে নাই। ঘুম যখন ভাঙিল তখন দেখিল তাহার পায়ের কাছে, অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ-পরিসর স্থানের মধ্যেই সালেক তাহার পা-দুটা জড়াইয়া ধরিয়া ঘুমাইতেছে।

প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার এই সহজ ও সুন্দর প্রকাশ দেখিয়া সে সন্ধ্যাকেই স্মরণ করিল, মনে মনে বলিল, যত গ্লানি, যত কষ্টই থাক—তবু জীবিকা-উপার্জনের এই পথই আমার ভাল। তোমাকে ধন্যবাদ সন্ধ্যা, এই পথ তুমিই দেখিয়ে দিয়েছ।

১৭

ভূপেন হোস্টেলে আসিয়া পৌছিতে সবাই ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন—কী ব্যাপার মশাই? কোথায় ছিলেন সারারাত? পথ হারান নি ত? আমরা ভেবে মরি! —ইত্যাদি প্রশ্ন ও মন্তব্য চারিদিকে।

সে যখন সংক্ষেপে সব কথা খুলিয়া বলিল, তখন আর সকলেই নিশ্চিন্ত

হইলেন বটে, অপূর্ববাবুর মুখ কিন্তু অন্ধকার হইয়া উঠিল। সে গাম্ভীর্যের কারণ তখন ঠিক বোঝা না গেলেও আহারের সময় কাহারও আর বুঝিতে বাকী রহিল না। সকলকারই থালায় খাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে, শুধু ভূপেনের আসনের সামনে পাতা। সে একটু বিস্মিত হইয়া অপূর্ববাবুর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, থালা কি কম পড়েছে অপূর্ববাবু?···চুরি-টুরি গেল নাকি?

মুখ কালি করিয়া তিনি জবাব দিলেন, না, তা ঠিক নয়।···আমাকে ত মশাই ঝি-চাকর টিকিয়ে রাখতে হবে, ওরা কেউ আর আপনার বাসন মাজতে চায় না।

—তার মানে?

আশেপাশের অন্যান্য মাস্টার মহাশয়রা অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন। ভবদেববাবুর ত কথাই নাই। কিন্তু অপূর্ববাবু সঙ্কোচের ধার ধারেন না, তিনি বলিলেন, আপনি মুসলমানের ছোঁয়া খেয়ে এসেছেন—হাজার হোক এরা পাড়া-গাঁয়ের মানুষ, ওদের নানা রকম কুসংস্কার আছে, তা ত জানেনই।

ভূপেন আসনের উপরই উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, ওদের ওপর দোষ দিচ্ছেন কেন অপূর্ববাবু? ওদের ত এরই মধ্যে এ খবর শোনবার কথা নয়, আমি বলেছি আপনাদেরই। অবশ্য আপনাদের মতে জাত যায় এমন কোন ঘটনাই সেখানে ঘটে নি, তাঁরা জলটি পর্যন্ত তুলিয়ে দিয়েছেন অন্য লোককে দিয়ে, তবে আমার কোন আপত্তি ছিল না ওঁদের হাতে খেতে। সে যাই হোক—আমি এমনি অনায়াসে পাতায় খেতে পারতাম কিন্তু এ অবস্থায় খাবো না।

ব্যাপারটা অনেকেরই দৃষ্টিকটু হইয়া পড়িয়াছিল, যতীনবাবু আর থাকিতে না পারিয়া খপ্‌ করিয়া ভূপেনের হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া কহিলেন, ভাত খাবার সময় এসব আবার কি! বসুন বসুন ভূপেনবাবু, অপূর্ববাবুর সব তাইতে বাড়াবাড়ি। কলকাতায় থেকে কলেজে পড়েছেন, মুসলমানের ছোঁয়া খান নি কে বলুন ত! এখন আবার ঐসব মানতে হবে নাকি?

ভবদেববাবুও বিষম বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি কহিলেন, তা ছাড়া এক্ষেত্রে ত সে কথা উঠতে পারে না—উনি যা বললেন, তাতে ত—দাও দাও ঠাকুর মশাই থালা দাও।

যতীনবাবু ততক্ষণে জোর করিয়া ভূপেনকে বসাইয়া দিয়াছেন—সুতরাং ব্যাপারটা তখনকার মত ঐখানেই মিটিয়া গেল।

কিন্তু একেবারে যে মিটিল না, সেটা বোঝা গেল দুই চারি দিন বাদে, সালেক ফিরিয়া আসিতে। সালেকের অল্পবয়স, কৃতজ্ঞতাবোধটা সহজে মন হইতে মুছিয়া যাইবার কথা নয়—সুতরাং এবারে বাড়ি হইতে ফিরিয়া সে ছায়ার মতই ভূপেনের

সহিত লাগিয়া রহিল। ভূপেনের কোচিং ক্লাসে পদন প্রভৃতি আরও কয়েকটি ছেলে আছে, সেখানে সে মনের মত করিয়া সকলকেই শিখাইতেছে বটে কিন্তু সালেককে এত কাছে পাইয়া সে-ও যেন উৎসাহ বোধ করিল। এই ছেলেটির মাথা ভাল, সেটা বরাবরই সে লক্ষ্য করিয়াছে, তবে খাটিবার শক্তি তাহার কম। কিন্তু সে যদি একেবারে এত ঘনিষ্ঠ ভাবে উহাকে কাছ পায় তাহা হইলে সালেককে বেশী খাটিতেও হইবে না—হয়ত এই ছেলেটিকে তাহার আশানুরূপই মানুষ করিয়া তুলিতে পারিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি, অন্তত ভূপেনের কাছে, বড় কথা নয়—তাহার আশা অনেক বেশী। বৃত্তি পদনও পাইবে—অবশ্য যদি এমনি ভাবে তাহাদের সে পড়াইতে পারে—কিন্তু সালেক একদিন মানুষের মত মানুষ হইয়া উঠিবে, এ স্বপ্ন ভূপেন ইতিমধ্যেই দেখিতে শুরু করিয়াছে। সন্ধ্যার মত প্রখর বুদ্ধির আভা সালেকের চোখে নাই সত্য কথা, রোগে ও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে তাহার প্রাণশক্তিই স্তিমিত, তবু তাহার প্রত্যেকটি কথা সে তেমনি শ্রদ্ধার সঙ্গেই শোনে এবং বুঝিতে পারে। এইটিই ছিল ভূপেনের বড় আশ্বাস, ইহার বেশী ছাত্রের কাছে সে আর কিছু চায় না।

সুতরাং সে সালেকের এই কৃতজ্ঞতা ও প্রীতির সুযোগ পূর্ণমাত্রাতেই গ্রহণ করিল। সকাল বেলা উঠিয়া দাঁতন করিতে করিতে সে যখন মাঠে পায়চারি করে, সালেক তখনই যে তাহার সঙ্গ গ্রহণ করে আর ছাড়ে না,—কোচিং ক্লাস পর্যন্ত সারিয়া একেবারে স্নানাহারের সময় সে নিজেদের হোস্টেলে ফেরে; ছুটির পরও কোন মতে বই ক'খানা রাখিয়া আসিতে যা দেরি, যেদিন ভূপেন এমনি মাঠে মাঠে বেড়ায় সেদিন ত সঙ্গে থাকেই,—যেদিন বিজয়বাবুদের বাড়ি যায় সেদিনও ছাড়ে না। ভূপেন যখন ভিতরে ঢোকে তখন সে বাহিরের মাঠে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, নয়ত রাখুর সহিত গল্প করে, আবার ফিরিবার সময় একসঙ্গে ফেরে। হোস্টেলে ফিরিয়া ভূপেন আবারও তাহাদের লইয়া পড়িতে বসে অর্থাৎ তখনও সালেকের আর নিজেদের হোস্টেলে ফিরিবার প্রয়োজন হয় না, রাত্রে আহারের ঘণ্টা না পড়া পর্যন্ত সে মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গেই থাকে।

এমনি ভাবে মাসখানেক কাটিবার পর হঠাৎ একদিন ভূপেন স্কুলে থাকিতে থাকিতেই সেক্রেটারীর দুই ছত্র চিঠি পাইল—

'একবার দয়া ক'রে আসবেন? বাতে শয্যাগত বলে আমি নিজে যেতে পারলুম না।'

ব্যাপারটা ঠিক না বুঝিলেও অপূর্ববাবুর সহিত এই আহ্বানের যে একটা যোগাযোগ আছে সেটা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। কারণ, আগের দিনই রাত্রে

সে যতীনের মুখে খবর পাইয়াছে, সুদখোরটা রোজ রোজ সেক্রেটারীর বাড়ি কেন যাচ্ছে বলুন ত? নিশ্চয়ই কারোর নামে লাগাতে যায় মশাই। খুব সাবধান, ওর মতলব ভাল নয়, তা আমি বলে দিচ্ছি—দেখে নেবেন বরং—

তখন সে অতটা গ্রাহ্য করে নাই কিন্তু এখন কথাটা মনে পড়িয়া গেল। তবু চিঠির যা ভাষা তাহাতে না যাওয়াটা অভদ্রতা, তা ছাড়া তাহার না যাওয়ার কারণও কিছু ছিল না। সুতরাং সেই দিনই সে ছুটির পর হোস্টেলে না ফিরিয়া সোজা সেক্রেটারীর বাড়িতে উপস্থিত হইল।

তিনি খাতির করিয়া বসাইলেন, প্রচুর জলযোগ করাইলেন; তার পর ভূমিকা দিয়া শুরু করিলেন, আপনাকে একটা কথা বলব কিন্তু তার আগে আমাকে কথা দিন যে, কোন রকম অফেন্স নেবেন না!

ভূপেন বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, ব্যাপার কি বলুন ত? আবার নতুন কি অপরাধ ঘটল?

—ঐ ত মশাই! আপনি আগে থাকতেই চটে উঠলেন। না, সত্যি সত্যি আপনাকে কথা দিতে হবে।

হাসিয়া ভূপেন জবাব দিল, বেশ অভয় দিলাম—আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বলুন।

তবু তিনি তখনই কথাটা পাড়িতে পারিলেন না, অনেক ইতস্ততঃ করিয়া মাথা চুলকাইয়া কহিলেন, দেখুন আমি বলছিলুম কি, মাস্টারদের সঙ্গে ছাত্রদের খুব বেশী মাথামাখি করা ঠিক নয়—এটা মানেন ত?

—না, মানি না।

—মানেন না?—বিস্মিত হইয়া সেক্রেটারী প্রশ্ন করিলেন।

—না। বরং আমার ধারণা ঠিক বিপরীত। অবশ্য সমবয়সী ভাল ছেলেদের সঙ্গেও কিছু মেলামেশা করার প্রয়োজন আছে, এটা আমি স্বীকার করি কিন্তু শিক্ষকদের সঙ্গে ওদের যদি একটা ঘনিষ্ঠ এবং অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠে সেটা কি সব দিক দিয়ে নিরাপদ নয়? ছেলেদের বিগড়োবার সম্ভাবনা কমে যায়, তা ছাড়া ওদের শিক্ষারও সুযোগ ঢের বেশী বাড়ে তাতে। রুটিন-বাঁধা পড়াশুনোয় কতটুকু শিক্ষালাভ হয় বলুন ত? মাস্টারমশাইদের সঙ্গে সঙ্গে থাকলে অনেক কিছু ওরা শিখতে পারে, পড়াশুনোর দিকে ঝোঁকটাও বাড়ে ক্রমশঃ। তাই নয় কি?

সেক্রেটারী যেন একটু বিপন্ন বোধ করিলেন। কহিলেন, তা অবশ্য বটে, তবে এর আর একটা দিকও আছে ভূপেনবাবু। আমি আপনাকে চিনি, আপনি যে খাঁটি ইস্পাত তাও আমার জানতে বাকী নেই, তবে আপনাদের যা প্রফেসন তাতে পাঁচজনকে পাঁচ কথা বলবার সুযোগ দেওয়াও ঠিক নয়। তাতে ক'রে অন্য

ছেলেদের মনের ওপর ব্যাড এফেক্ট হয়।

ভূপেন কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কহিল, কিন্তু আপনার এসব কথাগুলোর সঙ্গে আমার কি ব্যক্তিগত ভাবে কোন সম্পর্ক আছে? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

—মানে—ঐ ক্লাস নাইনের সালেক ছোক্‌রা—ও আজকাল দিন-রাতই প্রায় আপনার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, এতে সবাই নানারকমের ঠাট্টা-তামাশা করছে। একটু সাবধানে চলাই ভাল নয় কি?

তখনও আসল কথাটা ভূপেনের মাথায় ঢুকিল না। সে খানিকটা বিহ্বল দৃষ্টিতে মহেশবাবুর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু এতে ঠাট্টা-তামাশা করার কি আছে তা ত আমি অনেক চেষ্টা ক'রেও বুঝতে পারছি না; একটু খুলে বলুন—

মহেশবাবু বলিলেন, সব কথা খুলে বলা সম্ভব নয় ভূপেনবাবু। তবে আপনাদের সম্পর্কটা সম্বন্ধে—মানে আপনারা ত বন্ধু নন—অথচ অ-সমবয়সী দু'জন লোকের অমন সব সময়ে একসঙ্গে চলাফেরা করাটা···একটু দৃষ্টিকটু হয়, এই আর কি।

—স্কাউণ্ড্রেল!···ভূপেন এতক্ষণে কিছু আলো দেখিতে পাইয়া যেন গর্জন করিয়া উঠিল, ঐ অপূর্ববাবু বলেছেন ত! আশ্চর্য, এসব কথা ওঁদের মাথাতেও যায়! মন না আঁস্তাকুড়?

অপ্রতিভ হইয়া মহেশবাবু বলিলেন, না, দেখুন সত্য কথা বলতে কি একা অপূর্ববাবু নন, এই শ্রেণীর ইঙ্গিত গত সপ্তাহে আরও দু-একজনের কথা থেকে পেয়েছি। আপনি রাগ করবেন না, এর মধ্যে খারাপ কিছু নেই তা জানি, তবে যদি সম্ভব হয় ব্যাপারটাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে দোষ কি! নিন্দুকের রসনাকে স্বয়ং রামচন্দ্রও ভয় ক'রে গেছেন।

বহুক্ষণ গুম্ হইয়া বসিয়া থাকিয়া ভূপেন কহিল, ঐ ছেলেটার দ্বারা হয়ত একদিন আপনাদের স্কুলের গৌরব বৃদ্ধি হ'তে পারত মহেশবাবু। সেই চেষ্টাই করছিলুম। এখন বুঝতে পারছি, বাঙালীর ছেলেরা কেরানীগিরির চেয়ে মাস্টারীকে কেন ছোট মনে করে।

একটু হাসিয়া মহেশবাবু কহিলেন, কিছুই বুঝতে পারেন নি ভূপেনবাবু, কেরানীগিরি করতে গেলে আরও বেশী তিক্ত অভিজ্ঞতা হ'ত। আপনাকে এখন অনেক ঘা খেতে হবে। সংসার বড় কঠিন জায়গা।

—তা বটে। ভূপেন একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আপনাদের এখানে

এসে পর্যন্ত যা তিক্ত অভিজ্ঞতা হচ্ছে তাতেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।...তা দেখুন আমাকে দিয়ে যদি আপনাদের সুবিধা না হয় তাহ'লে আমি বরং আনন্দের সঙ্গেই বিদায় নিচ্ছি—

—না, না,—ঐ দেখুন! ঐ জন্যেই আমি আগে আপনার কাছ থেকে কথা নিয়েছিলুম! সে কথাই নয়। তবে আপনাদের দায়িত্ব যে কত বেশী তা ত জানেনই, এসব ক্ষেত্রে একটু সাবধানে চলাই ভাল নয় কি? সেই জন্যই আমি কথাটা আপনাকে জানিয়ে দিলুম। আপনি তা বলে রাগ করতে পারবেন না—

—না, না, আমি একটুও রাগ করিনি, আপনি বিশ্বাস করুন। শুধু এই সব ব্যাপারে মনটা বড় ভেঙে যায়। আচ্ছা, নমস্কার।

ভূপেন আর উত্তর-প্রত্যুত্তরের অবকাশ না দিয়া একেবারে বাহির হইয়া আসিল। রাস্তায় পড়িয়া প্রথমেই যে চিন্তাটা তাহার মনের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিল, সেটা হইতেছে অবিলম্বে স্কুলের চাকরি ছাড়ার কথা। প্রতিদিনকার নিত্য-নূতন অভিজ্ঞতায় সত্যই সে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে, আর ভাল লাগে না। এমন করিয়া মানুষের অকারণ বিদ্বেষের সঙ্গে আর কত লড়াই করা যায়! একটা কথা ইদানীং সে লক্ষ্য করিয়াছে যে অপূর্ববাবু এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ দুই-একজন শিক্ষক সুযোগ ও সুবিধা পাইলেই আড়াল হইতে তাহার কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন এবং অনেক ভাল কথারও বাঁকা অর্থ গড়িয়া লইয়া যথাস্থানে অর্থাৎ হেডমাস্টারের কাছে লাগাইয়া আসেন। তাহার প্রমাণও ভবদেববাবুর কথাবার্তা হইতে একাধিক দিন সে পাইয়াছে। শুধু শুধু এই সামান্য বেতনের জন্য অহোরাত্র ইতরদের সঙ্গে লড়াই করিয়া পড়িয়া থাকার প্রয়োজন কি? চল্লিশ টাকার মাস্টারী বাংলা দেশে আরও ঢের পাওয়া যাইবে।

কিন্তু ফাঁকা মাঠের মধ্য দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে উত্তেজনাটা যখন কিছু কমিয়া আসিল তখন মনে হইল যে, অপূর্ববাবুর দল পৃথিবীতে হয়ত সর্বত্রই আছে। যদি শিক্ষকতা করিতেই হয় ত এরূপ অপ্রীতিকর অবস্থার অভাব ঘটিবে না—হয়ত ঢের বেশী তিক্ততা সহ্য করিতে হইবে। তবু ত এখানে সে সেক্রেটারীকে সহায় পাইয়াছে —যতীনবাবুর মুখে অন্য স্কুলের সেক্রেটারী ও মেম্বারদের যে সব জুলুমের কথা শুনিয়াছে, তাহাতে সেখানে আত্মসম্মান বজায় রাখা হয়ত শুধু দুঃসাধ্য নয়— অসম্ভব হইয়া পড়িবে। কতবারই বা স্কুল বদল করিবে সে? তাছাড়া তবু এখানে রাধাকমলবাবু আছেন, ভবদেববাবু আছেন, ইঁহারা লোক তত খারাপ নন। ইহার পর অদৃষ্টে কি জুটিবে তাহার ঠিক কি? এখানকার ছাত্রগুলিও বড় নিরীহ, বড়

বেচারা! ইতিমধ্যেই তাহারা ভূপেনের মনে অত্যন্ত মায়ার সঞ্চার করিয়াছে, ইহাদের ছাড়িয়া যাইতেও খানিকটা কষ্ট হইবে বৈ কি!…আর সব চেয়ে বড় কথা কল্যাণীরা। অন্ধ বিজয়বাবু একান্ত ভাবে তাহারই উপর নির্ভর করিয়া আছেন। অবশ্য সে আর কতটুকু করিতে পারিবে, তবু এমন ভাবে ছাড়িয়া যাওয়া যায় না।

না, বাধ্য না হইলে সে এখানকার চাকরি ছাড়িবে না। কিন্তু, বেচারী সালেক! চাকরি যদি ছাড়া সম্ভব না-ই হয় তাহা হইলে তাহাকে একটু সতর্ক হইতেই হইবে। এমনি ত ব্যাপারটা যথেষ্ট খারাপ দাঁড়াইয়াছে, তাহার উপর সে সরিয়া না দাঁড়াইলে সালেকের উপর কী অত্যাচার হইবে তাহারই বা ঠিক কি!…

বড় ডাঙ্গাটা পার হইয়া তালবনের বাঁকে পড়িতেই ভূপেনের সহিত প্রথম যাহার দেখা হইল সে সালেক। সন্ধ্যার আব্‌ছায়া আলোতেও দূর হইতে দেখিয়াই সে চিনিতে পারিল। অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়াইয়া তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছে।

সে কাছে আসিতে সালেক একটু অনুযোগের স্বরেই কহিল, কোথায় গিয়েছিলেন মাস্টার মশাই? কাউকে কিছু বলে যান নি!

ভূপেনের দুই চোখ জ্বালা করিয়া যেন জল ভরিয়া আসিল, সে সহসা দুই হাতে সালেককে একেবারে বুকের মধ্যে টানিয়া আনিয়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, কেন, মাস্টার মশাইয়ের জন্যে তোর মন-কেমন কচ্ছিল? সেক্রেটারীর বাড়ি গিয়েছিলুম।

সালেক বিস্মিত হইয়া ভূপেনের মুখের দিকে চাহিল। শুধু যে এই আবেগটা আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত তাহাই নয়—ভূপেনের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া গিয়াছিল। ভূপেনও সালেকের বিস্ময় লক্ষ্য করিয়া একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল, তবু সে তাহাকে ছাড়িল না, বরং আরও জোরে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, সালেক, একটা কথা বলব, তুই কিছু মনে করিস নি।…তুই—তুই আর যখন-তখন আমার কাছে আসিস নি ভাই—শুধু যখন কোচিং ক্লাস নেব তখন সকলকার সঙ্গেই পড়তে আসিস।

একটা আশঙ্কা ও ব্যথা একই সঙ্গে সালেকের দৃষ্টিতে ঘনাইয়া আসিল। সে একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, সেক্রেটারী কি সেজন্যে রাগ করেছেন মাস্টারমশাই?…আমারই অন্যায় হয়েছিল, মুসলমানের সঙ্গে অত মেলামেশা—

—ওরে না, না, সেজন্যে নয়। তুই বিশ্বাস কর্, আমি সত্যিই বলছি—অন্য

কারণ আছে। কিন্তু সে আর না-ই বা শুনলি। ওঁরা অসন্তুষ্ট হচ্ছেন তাই ত যথেষ্ট।

সালেক আর একটিও কথা কহিল না, শুধু ধীরে ধীরে নিজেকে ভূপেনের হাতের মধ্য হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া তাহাকে একটি ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিল, তাহার পর নিঃশব্দ-দ্রুত গতিতে নিজেদের হোস্টেলের পথ ধরিল।

সে যে তাহার ক্ষুদ্র বুকখানিতে কী সুগভীর অভিমান বহিয়া লইয়া গেল, তাহা ভূপেন ভাল করিয়াই বুঝিল; তবু সে আর তাহাকে ডাকিবার বা ফিরাইবার চেষ্টা করিল না, শুধু অনেকক্ষণ সেই অন্ধকারের মধ্যেই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ইহার পর মাসখানেক একপ্রকার শান্তিতেই কাটিল। অপূর্ববাবু ব্যাপারটাকে তাঁহার ব্যক্তিগত জয়লাভ বলিয়া ধরিয়া লইয়া সগৌরবে পাঁচজনের কাছে গল্প করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন কিন্তু ভূপেন তাহা গায়ে মাখিল না—শুধু সাধ্যমত তাঁহার দলটিকে এড়াইয়া চলিতে শুরু করিল। তবে অপূর্ববাবু যে তাহার কোচিং ক্লাসটি বন্ধ করিবার জন্যও চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু সেক্রেটারী সে কথা একেবারেই কানে তোলেন নাই বরং তাঁহাকেই ধমক দিয়াছেন—এ কথাটাও ভূপেনের অগোচর রহিল না, যতীনবাবুর কৃপায় সবই সে শুনিতে পাইল। সে অবশ্য যতীনবাবুর কাছে এসব কথা শুনিতে চায় না—যতীনবাবুই গায়ে পড়িয়া বলেন। তাঁহার স্বভাবটাই কিছু অদ্ভুত। তিনি ভূপেনকেও ঈর্ষা করেন এবং অপূর্ববাবুদের চক্রান্তেও তাঁহার উৎসাহের অভাব নাই, অথচ ভূপেনের বিরুদ্ধে যত কিছু ষড়যন্ত্র হয় সে কথাগুলিও তাহাকে না বলিয়া থাকিতে পারেন না, আর সে সময় অপূর্ববাবুর সম্বন্ধে এমন চোখা চোখা গালাগালি উচ্চারণ করিতে থাকেন যে, সে সব শুনিয়া এখনও ভূপেনের মুখ লাল হইয়া ওঠে। ভূপেন একটা কথারও জবাব দেয় না—কোনদিন কোন প্রকার আগ্রহ প্রকাশ করে না, সেজন্য যতীনবাবু ক্ষুন্ন হন কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার তরফ হইতে উৎসাহের অভাব ঘটে না। সবটা জড়াইয়া যতীনবাবু মানুষটি ভালই—ভূপেন মনে মনে ভাবে, এবং তাঁহার কথা মনে হইলে সে আপন মনেই হাসিয়া ওঠে।

কিন্তু ইতিমধ্যে স্কুলে যে সকলের অলক্ষ্যে একটা মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছিল এ কথাটা যতীনবাবুও জানিতেন না। সেক্রেটারী কয়েক দিন যাবৎই ঘন ঘন স্কুলে আসিতেছেন এবং আসিবার সঙ্গে সঙ্গে হেডমাস্টার মহাশয়ের সহিত অফিস-ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া কী পরামর্শ করিতেছেন সেটা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছিল;

আর সেজন্য একটু অস্বস্তিও বোধ করিতেছিল কিন্তু তাহার আসল কারণটা কাহারও কল্পনাতে পর্যন্ত আসে নাই, এমন কি অতি-চতুর অপূর্ববাবুরও না। যতীনবাবুর ধারণা যে এবার সকলকার একটা সাধারণ মাহিনা-বৃদ্ধির জল্পনা চলিতেছে—রাধাকমলবাবুর ধারণা, স্কুলের খরচা কিছু না কমাইলে চলিতেছে না, পরামর্শটা হইতেছে সেই দিক ঘেঁষিয়া। কিন্তু আসল কথাটা একদিন একেবারে বিনামেঘে বজ্রপাতের মতই তাহাদের কানে আসিয়া বাজিল।

দিন-পনেরো আগে অক্ষয়বাবু সহসা কী একটা কাজের অছিলায় বাড়ি চলিয়া যান আর ফিরিয়া আসেন নাই। অবশ্য সে অছিলাও যে তিনি দিয়াছিলেন এটা অনুমান মাত্র, কেহ দিতে শোনে নাই। শুধু অল্প লোকের মধ্যে একজন অনুপস্থিত থাকায় অসুবিধাটা সকলেই ভোগ করিতেছিলেন এবং মনে-মনে অক্ষয় সম্বন্ধে অপ্রীতিকর মন্তব্য করিতেছিলেন। ইহারই মধ্যে একদিন সকালবেলায় খবর পাওয়া গেল যে, অক্ষয়বাবু আর একেবারেই ফিরিবেন না, তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন।

তারপরই সব খবর একেবারে একসঙ্গে বাহির হইয়া আসিল। অক্ষয়বাবু ইদানীং হেডমাস্টার মহাশয়ের একটু বেশী রকম প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন—বিশ্বস্তও বটে। স্কুলের টাকাকড়ির যে ভার তাঁহার ব্যক্তিগত সেটা তিনি সম্পূর্ণই অক্ষয়ের উপর ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে সাধন-ভজন করিতেছিলেন। এই অবসরে অক্ষয় স্কুলের অনেকগুলি টাকা ভাঙ্গিয়াছেন, সম্ভবত বহু দিন ধরিয়াই তিনি কিছু কিছু করিয়া খরচ করিয়াছেন। আরও ঢের আগেই ধরা পড়িবার কথা কিন্তু ভবদেববাবু ইতিমধ্যে একবারও হিসাব দেখিবার চেষ্টা করেন নাই। বৎসর শেষ হওয়ার অনেক পরেও যখন হিসাব-নিকাশ শেষ হইল না তখন সেক্রেটারী তাগাদা দেওয়ায় ভবদেববাবু হিসাবটা দেখিতে চান—সে সময়ে আর কথাটা চাপিয়া রাখা সম্ভব হয় না। অক্ষয়বাবু পলাইয়া যান এবং কর্তারা দুইজনে মিলিয়া অনেক কষ্টে সেই হিসাব উদ্ধার করেন। স্কুলের টাকা তছরুপের ব্যাপার—অগত্যা শেষ পর্যন্ত পুলিশেও খবর দিতে হইল। অক্ষয়বাবু বেচারা কোন মতেই টাকাটার যোগাড় করিতে না পারিয়া জেলে যাইবার ভয়ে আত্মহত্যা করিলেন।

ইহার পরের ব্যাপারটাও কম অপ্রীতিকর নয়। টাকাটা ভবদেববাবু নিজে নেন নাই সত্য কথা (যদিও যতীনবাবুর সে বিষয়ে একটা সন্দেহ থাকিয়াই গেল —তাঁহার বিশ্বাস, 'ঐ বেটা ভণ্ডই অক্ষয়কে জড়িয়েছে, ও কম নাকি!')—তবু দায়িত্বটা যে তাঁহারই, তাহাতেও সন্দেহ নাই। সুতরাং অনেক টানা-হেঁচড়ার

পর তিনি জেলটা যদি-বা এড়াইলেন, চাকরিটা আর রহিল না। চুরি ধরা পড়িবার সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁহাকে ছাড়াইয়া দেওয়া হইল—তাঁহার বদলে অপূর্ববাবু একটিনি করিতে লাগিলেন এবং সংবাদপত্রে নূতন হেডমাস্টারের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল।

ভবদেববাবু কয়েকদিন হোস্টেলে রহিলেন—ব্যাপারটা না মেটা পর্যন্ত তাঁহাকে বাড়ি যাইতে দেওয়া হইল না। যে শিক্ষক মহাশয়রা এত দিন তাঁহাকে তোষামোদ করিয়া চলিতেন, তাঁহারাই সুযোগ-সুবিধা পাইয়া উদ্ধত ও অপমান-সূচক ব্যবহার করিতে ছাড়িলেন না। বিশেষতঃ ছেলেদের মধ্যেও কথাটা ছড়াইয়া পড়িল, তাহারা প্রকাশ্যেই আলোচনা করিতে লাগিল। সে লজ্জা যেন ভবদেব-বাবুর চেয়ে অনেক বেশী বাজিল ভূপেনকে—কিন্তু উপায়ই বা কি! সে অপমানের হাত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিল না বটে, তবে যতটা সম্ভব তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিল। আগে সে বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলে কখনও ভবদেববাবুর ঘরে যাইত না, এখন একমাত্র সে-ই প্রত্যহ তাঁহার কাছে গিয়া বসিয়া গল্প করিতে লাগিল এবং যতটা সম্ভব আলোচনাটা বৈষ্ণবশাস্ত্র ঘেঁষিয়া চালাইতে লাগিল। ভবদেববাবু খুব মুষড়াইয়া পড়িয়াছিলেন, গুম্ খাইয়াই বসিয়া থাকিতেন অধিকাংশ সময়—কেবল ঈশ্বর উপাসনার এই বিশেষ ধারাটির প্রসঙ্গ উঠিলেই তিনি একটু তাতিয়া উঠিতেন, সেই সময়ই শুধু তাঁহাকে সুস্থ এবং প্রকৃতিস্থ দেখাইত; সেইজন্য ভূপেন প্রাণপণে চেষ্টা করিত যাহাতে ঐ বিষয়েই কথাটা আবদ্ধ থাকে।

বিদায়ের দিন ভবদেববাবু সজল নেত্রে ভূপেনের হাতটা ধরিয়া বলিলেন, বিপদে না পড়লে বন্ধুকে চেনা যায় না ভূপেনবাবু। বিপদে ফেলে রাধারাণী আপনাকে চিনিয়ে দিলেন। হয়ত অবস্থাগতিকে আপনার ওপর অবিচারই করেছি সময়ে সময়ে, পারেন ত আমাকে মাপ করবেন।

তাহার পর বাক্স খুলিয়া এক খণ্ড 'হরিভক্তিবিলাস' তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, বইখানা বড় ভাল বই, মধ্যে মধ্যে পড়বেন। আর ত আমার কিছুই নেই, এইখানা রেখে দিন, তবু আমার কথা মনে পড়বে।

বৃদ্ধের অসহায় ও করুণ মুখের দিকে চাহিয়া ভূপেনের চক্ষুও সজল হইয়া আসিয়াছিল—সে একটি কথাও বলিতে পারিল না, বইখানি তাঁহার হাত হইতে লইয়া নীরবে শুধু একটা নমস্কার করিল।

॥ ১৮ ॥

নূতন হেডমাস্টারের জন্য যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল তাহাতে দরখাস্ত আসিল একশতেরও বেশী, তাহারই মধ্য হইতে বাছিয়া একজনকে নিয়োগ করা হইল বটে কিন্তু সে ভদ্রলোককে নিয়োগ-পত্র পাঠানো হইল দেড় মাস পরের তারিখ হইতে। অর্থাৎ সামনেই গ্রীষ্মের ছুটি—আর দিন দশ-বারো মাত্র বাকী আছে, মিছামিছি এই কয় দিনের জন্য আর ছুটির বেতন দেওয়া হয় কেন! স্থির হইল, অপূর্ব্ববাবুই এই কদিন কাজ চালাইবেন।

ভবদেববাবুর লাঞ্ছনার সময় অপূর্ব্ববাবু সেক্রেটারীর বাড়ি খুব হাঁটাহাঁটি করিয়াছিলেন, তাঁহার আশা ছিল যে শেষ পর্যন্ত তিনিই হয়ত হেডমাস্টারীটা পাইবেন। কিন্তু তিনি ইংরেজীর লোক নন, এমন কি বি-টি পাসও করেন নাই, এই জন্য তাঁহার দাবী শেষ পর্যন্ত টিকিল না, স্কুল কমিটির কোন মেম্বারই সে প্রস্তাব কানে তুলিলেন না। অপূর্ব্ববাবু ঐ মর্মে একটা দরখাস্তও করিয়াছিলেন—তাহাতে আবার এক মেম্বার একটু ধমক দিয়াছেন, আপনার কি মাথা খারাপ না কি! জানেন না, হেডমাস্টারীর কোয়ালিফেকেসন্ আপনার একটাও নেই?

অপূর্ব্ববাবু অত্যন্ত মনঃক্ষুন্ন হইলেন। শুধু যে পদোন্নতি হইল না সে জন্যও নয়, নূতন হেডমাস্টার আসিলে তাঁহার এত প্রতাপ থাকিবে কিনা সে সম্বন্ধেও সন্দেহ রহিয়াছে—হয়ত বা হোস্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেন্টগিরির কয়টা অতিরিক্ত টাকাও চলিয়া যাইবে। সুতরাং ক্ষোভে ও আশঙ্কায় যত তিনি জ্বলিতে লাগিলেন ততই তাঁহার সমস্ত ঝালটা আসিয়া পড়িল ভূপেনের উপর। আরও রাগের কারণ, ভূপেনের কোচিং ক্লাসটা সেক্রেটারীকে অনেক বলিয়াও বন্ধ করিতে পারেন্ নাই, ফলে তাঁহার মাসিক চার-আনা বেতনের কোচিং ক্লাসের ছাত্রগুলি বিনা মাহিনার অথচ ভাল কোচিং ক্লাসের দিকে ঝুঁকিতে শুরু করিয়াছে। একটা দৈববল এই যে, ভূপেন ভাল ছাত্র ছাড়া তাহার কোচিং ক্লাসে নেয় না। তবু ত দেখিতে দেখিতে গুটি আষ্টেক ছেলে সে লইয়াছে, হঠাৎ যদি সংখ্যা বাড়াইয়া দেয়, বিশ্বাস কি?

অপূর্ব্ববাবুর অত্যাচারে ভূপেনের তিষ্ঠানো প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিল বটে, তবে একটা সুবিধা এই যে, অপূর্ব্ববাবুর ক্ষমতা বেশী দিন নয় এটা বুঝিতে পারিয়া অন্য মাস্টার মহাশয়রা কেহ সেদিকে যোগ দিলেন না। এবং সে-ও অল্প সময়ের

ব্যাপার জানিয়া প্রাণপণে দাঁতে দাঁত দিয়া সব কিছুই সহিয়া গেল। তাহার সহ্য গুণ দেখিয়া আজকাল সে নিজেই অবাক্ হইয়া যায়—দিনে-রাতে সহস্রবার ইচ্ছা হয় কাজ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে, আবার নিজেকে সংযত করিয়া নেয়। মনকে প্রবোধ দেয়, দারিদ্র্যের মধ্যে যখন সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, দাসত্ব করিয়াই যখন জীবনধারণ করিতে হইবে তখন চামড়া অত পাতলা রাখিলে চলিবে কেন? সবকিছু সহ্য করিতে হইবে। আত্মসম্মান জ্ঞান বা অভিমান রাখিবার মত ভাগ্য তাহাদের নয়।...

গরমের ছুটিতে সকলেই বাড়ি চলিয়া যাইবে, ঠাকুর-চাকররা পর্যন্ত—হোস্টেল বন্ধ থাকিবে। ভূপেন কিন্তু বাড়ি যাইবে না বলিয়াই স্থির করিল। তাহার সামান্য বেতন হইতে বাড়িতেও কিছু টাকা পাঠাইতে হয়—এখানকার খরচ আছে, তাহার উপর বিজয়বাবুকে আগামী মাস হইতে কিছু কিছু সাহায্য করিতেই হইবে। তাহার মনের মধ্যে একটা গোপন আশা ছিল যে, সন্ধ্যা হয়ত নিজে হতেই বিজয়বাবুদের খোঁজ লইবে, তাহাদের সাহায্য করিবার কথা পাড়িবে। কারণ, এ শ্রেণীর মাসিক সাহায্য মোহিতবাবুর অনেকগুলিই আছে—সে সংখ্যা একটা বৃদ্ধি হইলে কিছুই আসিয়া যাইবে না। ভূপেন অবশ্য নিজের মনকে এই বলিয়াই সে চিন্তার সময় প্রবঞ্চনা করিত যে, উহারা সাহায্য করিতে চাহিলেও সে সহজে লইবে না, বিজয়বাবুদের ভার সে নিজেই বহন করিবে, যেমন করিয়া হউক—অথচ সে যে এই আশাটার উপর কতখানি ভরসা করিয়াছিল তাহা নিজের মনের কাছে একদা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল, যখন পরপর তিনখানি চিঠির মধ্যেও সন্ধ্যা সে কথার কোন উল্লেখ করিল না। বিজয়-বাবুদের কুশল প্রশ্ন সে করে, কিন্তু কোন প্রকার সাহায্যের কথা বা কি করিয়া তাঁহাদের দিন চলিতেছে, সে কথার উল্লেখ পর্যন্তও করে না।

ইদানীং সন্ধ্যার চিঠিও আসে কম—যেগুলি আসে তাহারও বক্তব্য ক্রমশঃ সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছে। ইহাতে ভূপেন মনে মনে একটা অভিমান বোধ করে। কিন্তু সে নিজে যে সন্ধ্যার দুইখানা চিঠি এড়াইয়া গিয়া তৃতীয়খানার জবাব দেয়, এবং সে চিঠির দৈর্ঘ্য যে সন্ধ্যার সংক্ষিপ্ত চিঠির চেয়েও কম, সে কথাটাও মনে মনে স্বীকার না করিয়া পারে না। তবু মানুষের সহজ স্বার্থপরতায় দেওয়ার কথাটা ভুলিয়া সে পাওয়ার দিকটাই দেখে এবং সন্ধ্যার চিঠিতেই ইদানীং যে একটা সূক্ষ্ম অভিমানের সুর বাজে তাহার কোন কারণই খুঁজিয়া পায় না। সে অভিমান প্রকাশ পায় ছোট ছোট বিদ্রূপে, খোঁচা দেওয়া ইঙ্গিতে। এ যেন আর এক সন্ধ্যা—তাহার সহজ, সুন্দর, সশ্রদ্ধ অন্তঃকরণকে যেন আর আগেকার মত চিঠির লাইনে লাইনে

খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ একটা চিঠি সম্বন্ধে ভূপেনের প্রবল আপত্তি ছিল। যে চিঠির বক্তব্যকে অকারণ নীচতা বলিয়াই মনে হইয়াছিল ভূপেনের। সে লিখিয়াছিল, 'কল্যাণীদির আপনার সম্বন্ধে কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই, একথা বললে তাঁর মনোভাব কিছুই প্রকাশ করা হয় না। আপনার কথা বলতে গেলেই তাঁর চোখ ছল্ ছল্ ক'রে ওঠে, দৃষ্টি চলে যায় কোন্ অতলে, যে দেবতাকে ধ্যান করতেও ভয় করে—সেই সুদূর অথচ অন্তরবাসী দেবতার খোঁজে। আর সে সময়ে এমন একটি দীপ্তি ওঁর মুখে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে যে ওঁর মত সাধারণ চেহারার মেয়েকেও সুন্দরী দেখায়। আপনার ভাগ্য ভাল মাস্টারমশাই, অনেকেরই অন্তরের পূজা এজন্মে আপনি পেয়ে গেলেন।…আচ্ছা, বিজয়বাবুরা আপনাদেরই সজাতি, না?' তাহার পরই সে প্রসঙ্গান্তরে চলিয়া গেছে বটে কিন্তু শেষের এই খাপছাড়া প্রশ্নটির মধ্যে যে ইঙ্গিত ছিল তাহাতে ভূপেন বিরক্তই হইয়াছে।

সুতরাং ইহার পর নিজ হইতে মোহিতবাবুর কাছে কল্যাণীদের কথা তোলা কোনমতেই সম্ভব নয়—সে নিজেই চালাইবে যেমন করিয়াই হউক। তাহার জন্য কৃচ্ছ্রসাধন করিতে হয় করিবে। সেই জন্য সে কলিকাতায় যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ করিল। যাওয়া-আসার গাড়ি ভাড়া ত আছেই, তা ছাড়া শহরে গেলে সমস্ত পুরাতন অভ্যাস যেন একসঙ্গে মাথা চাড়া দেয়, সহস্র রকমের খরচ সামনে আসে। মা-বোনেরা খুবই ক্ষুণ্ণ হইবেন সত্য কথা কিন্তু উপায় নাই। তাঁহাদের চিঠি লিখিয়া দিল যে, এই ছুটিটা নির্জনে থাকিয়া এম-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবে। কথাটা খুব মিথ্যা নয়, সে সংকল্প তাহার ছিলই।

সন্ধ্যার চিঠির জবাবেও সেই কথাই সে লিখিয়াছিল, কারণ সত্য কথা লিখিলে পরোক্ষভাবে তাহার কাছে সাহায্য চাওয়াই হইবে। পরীক্ষার কথা লিখিয়া শেষে লিখিল, 'কষ্ট খুবই হবে তাতে সন্দেহ নেই। এখন থেকেই মাঠে যেন আগুন-বৃষ্টি হ'তে শুরু হয়েছে, জ্যৈষ্ঠ মাসে যে কী হবে তা ভাবতেও পারি না। তবে নতুন একটা অভিজ্ঞতাও হবে বৈ কি; একেবারে এই নির্জন জায়গায় এক মাস বাস করা, ভাবতে ভালই লাগছে। একেবারে রীতিমত তপস্যা! কী বলো?'

সে স্থির করিয়াছিল হোস্টেলে বাস করিবে এবং যে চাকরটি থাকিবে ইস্কুল ও হোস্টেল-বাড়ি পাহারা দিবার জন্য, তাহার সহিতই একটা বন্দোবস্ত করিবে আহারাদির। কিন্তু কল্যাণীর কাছে কথাটা পাড়িতে সে প্রবল আপত্তি জানাইল, কহিল, তাই কখনও হয়। একা ঐ তেপান্তরের মাঠে পড়ে থাকবেন? অসুখ আছে বিসুখ আছে—তাছাড়া আমরা থাকতে আপনি চাকরের হাতে খাবেন? যদি থাকতেই হয় ত আপনি এখানে এসেই থাকুন। আমাদের

থাকতে কষ্ট হবে, তবু চোখের সামনে থাকবেন, সেবাযত্ন ত করতে পারব।

ভূপেন লেখা-পড়ার কথা তুলিয়া কী একটা আপত্তি জানাইতে গেল, বাধা দিয়া কল্যাণী বলিয়া উঠিল, আপনার পড়াশুনোর কোন ব্যাঘাত হবে না, আমি কথা দিচ্ছি, ভাইদের আমি সামলে রাখব। দোহাই, আপনার পায়ে পড়ি, আর অন্য মত করবেন না। আপনি যদি ওখানে একা পড়ে থাকেন তাহ'লে আমি অন্নজল ত্যাগ করব, তা বলে রাখলুম।

শেষের দিকে তাহার কণ্ঠস্বর যেন একটু বেশী রকমের ব্যাকুল শোনাইল। ভূপেন সে আকুলতায় বিস্মিত হইলেও ঠিক সে-দিকে তাহার মন ছিল না, ভাবিয়া দেখিল এই বন্দোবস্তই সুবিধা। এমনি ত একা থাকার অসুবিধা আছেই, তা ছাড়া একেবারে হাত পাতিয়া টাকাটা লইতে গেলে ইহাদের মাথা কাটা যাইবে, বাড়িতে থাকিলে বাজার করার অছিলায় তাহার যাহা দেয়, আস্তে আস্তে দিতে পারিবে। এই এক মাসে ব্যাপারটা সহিয়া গেলে পরের মাস হইতে হয়ত অত লজ্জায় বাধিবে না। যাহারা কখনও পরের দয়ায় জীবন ধারণ করে নাই, প্রথম সাহায্যটা তাহাদের বড়ই আঘাত দেয়।

কল্যাণী ব্যগ্রভাবে সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার উত্তর আশা করিতেছিল, ভূপেনকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া সহসা বলিয়া উঠিল, সন্ধ্যাদি আপত্তি করবেন, তাই ভাবছেন?

তাহার কণ্ঠে কোথায় যেন একটা অভিমানের সুর। ভূপেন ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জবাব দিল, আমি সমস্ত কাজ সন্ধ্যার মত নিয়ে করি, এমন কথা তোমার মনে এল কি ক'রে?

ভূপেন সত্যই বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং তিক্ততা তাহার গোপন করিবারও চেষ্টা ছিল না। কল্যাণী কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই লজ্জায় লাল হইয়া উঠিয়াছিল, এখন মাথা নত করিয়া কহিল, না, আমার অন্যায় হয়েছে ও কথা বলা। কিন্তু থাকবেন ত এখানে? নইলে—নইলে বাবা বড় দুঃখ পাবেন। ভাববেন, আমরা বড় গরীব বলেই—

কণ্ঠস্বরে অকারণ জোর দিয়া ভূপেন কহিল, না এখানেই থাকব।

কল্যাণীর মুখ একবার উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াই আবার ম্লান হইয়া গেল। একটু যেন ভয়ে ভয়েই বলিল, আপনার কিন্তু অসুবিধা হবে—

হোস্টেলে একা থাকলে আরও অসুবিধা হ'ত।

আর বাদানুবাদের অবকাশ না দিয়া ভূপেন বাহির হইয়া পড়িল। সেই দিনই সকালে স্কুলের ছুটি হইয়া গিয়াছিল। সে বৈকালে যখন কল্যাণীদের

বাড়ি যায় তখনই দেখিয়া গিয়াছে যে হোস্টেল ফাঁকা—অধিকাংশ ছাত্র ও শিক্ষকই ইতিমধ্যে চলিয়া গিয়াছেন। যে দুই-একজন ছিলেন, রাত্রে ফিরিয়া দেখিল তাঁহারাও কেহ নাই। এ হোস্টেলে থাকিবার মধ্যে আছেন অপূর্ববাবু আর ঠাকুর-চাকর। অপূর্ববাবুর হিসাব-নিকাশ মেটে নাই বলিয়াই রাতটা থাকিতে হইয়াছে, তাঁহারা কাল ভোরেই রওনা হইবেন। আর নাকি ও-হোস্টেলে সালেক এখনও আছে। তাহার কি একটা প্রয়োজন আছে, সেও কাল সকালে চলিয়া যাইবে।

ভূপেনের ইচ্ছা হইল সালেককে একবার ডাকিয়া পাঠায় কিন্তু অপূর্ববাবুর কথাটা মনে পড়িয়া বিরত হইল। সে বেচারা সে-ই যে সেদিন ম্লানমুখে চলিয়া গিয়াছে, আর এক দিনও ভূপেনের সঙ্গে একা দেখা করে নাই। কোচিং ক্লাসে আসিলেও কোন কথা বলে না, শুধু ভূপেন প্রশ্ন করিলে প্রয়োজন-মত জবাব দেয়। এমন কি, সে যেন তাহার চোখে চোখ পড়িবার ভয়েই সর্বক্ষণ মাথা নীচু করিয়া থাকে। এ যে তাহার অভিমান তা ভূপেন বোঝে কিন্তু সে নিরুপায়। ঐ নির্মল সরল ছেলেটিকে সে কী করিয়া সব কথা বোঝাইবে? তার চেয়ে ও যা বোঝে তাই বুঝুক, মোটের উপর দূরে থাকিলেই ভাল। কাছে ডাকিয়া সান্ত্বনা দিতে গেলেও হয়ত তাহার কদর্থ হইবে। কাজ নাই আর ঝামেলা বাড়াইয়া।...আজও সেই জন্যই সে ইচ্ছাটা চাপিয়া গেল; বরং এক মাস যদি এখানে একা থাকিতেই হয় ত সেই সময় একদিন সালেকদের বাড়ি গেলেই চলিবে।

আহারাদির পর অপূর্ববাবুর সঙ্গে দুই-একটি কথা সারিয়া সে ঘরে আসিয়া বসিল। তাহারও জিনিসপত্র ঠিক করিয়া লওয়া দরকার। কথা আছে হোস্টেলের চাকরই ভোরবেলা তাহার বাক্স-বিছানা বিজয়বাবুদের বাড়ি পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবে।

সে বই-কাগজ-পত্রগুলি গুছাইয়া রাখিয়া আরও কিছুক্ষণ প্রায় ঘণ্টাদেড়েক বসিয়া একখানা বই পড়িল। ততক্ষণে হোস্টেল নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, অপূর্ববাবুও বোধ করি হিসাবের কাজ সারিয়া শুইয়া পড়িয়াছেন—ঘরে ও বাহিরে কয়েকটা ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক ছাড়া কোন শব্দ নাই। এ নিস্তব্ধতায় মন ভারি হইয়া ওঠে, শহরের মানুষ ভয় পায়।

ভূপেন আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু সহজে তাহার ঘুম আসিল না। অপূর্ববাবুর বিদায়-সম্ভাষণটা বার বার মনে পড়িতেছিল। কথাগুলি ভদ্র, সাধারণ অর্থে ভালই—তিনি বলিয়াছেন, 'তাই ত, আপনার তাহ'লে দেশে যাওয়া হ'ল না ভূপেনবাবু।...রাঢ়ের মায়া আপনাকে বেঁধেছে বটে! নইলে এই গরমে—আমরাই ঝলসে যাচ্ছি, আর আপনি ঘর-বাড়ি থাকতেও—। অবিশ্যি বিজয়বাবুর বাড়িতে

আপনার কোন কষ্ট হবে না, মেয়েটি শুনেছি ভালই, যত্ন-আত্তি করে খুব। তা ছাড়া, এখন ত প্রকৃতপক্ষে আপনিই ওদের অভিভাবক!...বাস্তবিক বিজয়বাবু আপনাকে পেয়ে বেঁচে গেলেন, আমরা ত ওঁর কোন উপকারেই আসতে পারলুম না —তবু আপনি ছিলেন তাই। ভগবান যে কাকে দিয়ে কী করান।' ইত্যাদি—কিন্তু এই কথার মধ্যে কণ্ঠস্বর এবং দৃষ্টিতে কোথায় যেন একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের আভাস ছিল—সেইটাই ভূপেনের অস্বস্তির কারণ হইয়া উঠিয়াছে। ঠিক যে তিনি বিদ্রূপই করিতে চাহিয়াছেন এমন কথাও সে হলপ করিয়া বলিতে পারে না, অথচ কী যে, তাহাও বলা শক্ত। মোটের উপর, এখন যদি ব্যবস্থাটা বদল করা চলিত ত সে বোধ হয় রাজী ছিল, কিন্তু সে পরিবর্তনটা নিতান্ত অপূর্ববাবুর ভয়েই করিতে হইবে, এই লজ্জায় সে আর কিছু করিল না।

সে জোর করিয়া মনকে শান্ত করিল বটে, কিন্তু অস্বস্তিটা যেন আর কিছুতেই যাইতে চায় না। কী যেন একটা নোংরা ক্লেদাক্ত, জিনিস সে স্পর্শ করিয়াছে, এমনি একটা অনুভূতি বহু রাত্রি পর্যন্ত তাহাকে অতন্দ্র রাখিল। অবশেষে এক সময় যখন সমস্তটা আচ্ছন্ন হইয়া আসিয়াছে, তখন হঠাৎ কী একটা শব্দে তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া দেখিল, তাহার খোলা জানালাটার কাছে কে যেন দাঁড়াইয়া আছে। চমকিয়া প্রশ্ন করিল, কে?

খুব চুপি চুপি কে উত্তর দিল, আমি!

কে, সালেক? বিস্মিত হইয়া ভূপেন উঠিয়া বসিল—কী রে?

সালেক যেন অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে চুপি চুপি বলিল, আমি, আমি একটু আপনার কাছে আসব?

আয়, আয়। ভূপেন উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল। সালেক নিঃশব্দে রক পার হইয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। তত রাত্রে কেহই জাগিয়া নাই, তবু সে ঘরে ঢুকিবার আগে একবার সসঙ্কোচে অপূর্ববাবুর ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিল।

ভূপেন আবার কপাট বন্ধ করিয়া দিয়া কহিল, যা বিছানায় গিয়ে বোস—

সালেক কিন্তু গেল না; রাজ্যের লজ্জা এবং সঙ্কোচ যেন তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে অবশ করিয়া দিয়াছিল, কোন মতে গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া কহিল, আমি আপনার সঙ্গে একবার দেখা না ক'রে কিছুতেই বাড়ি যেতে পারলাম না। আপনি, আপনি কি আমার ওপর রাগ করলেন?

ছি! রাগ করব কেন? আয় আয়—। ভূপেন তাহার একটা হাত ধরিয়া টানিতেই সে সহসা একেবারে ভূপেনের বুকের মধ্যে আসিয়া পড়িল। তার পর তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বুকের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া সালেকের সে কী কান্না! এত

দিনের সমস্ত বেদনা ও অভিমান যেন জমাট হইয়া ছিল, আজ ভূপেনের স্নেহের উত্তাপে গলিয়া অশ্রুর আকারে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল—কোন লজ্জা, কোন ভয়ের বাধা মানিল না?

ভূপেনের খালি গা তাহার চোখের জলে ও দেহের ঘামে ভিজিয়া উঠিল কিন্তু সে বাধা দিল না, বরং এক হাতে তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া আর এক হাত তাহার মাথায় পিঠে বুলাইতে লাগিল। এই মুহূর্তে সেই শীর্ণকায়, শ্যামবর্ণ মুসলমান বালকটি তাহার অন্তরের মহিমায় ভূপেনের চোখে যেন এক অপূর্ব দীপ্তিতে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারও এই শ্রদ্ধাবান ছাত্রটি সম্বন্ধে যত স্নেহ এত দিন প্রকাশের পথ খুঁজিয়া পায় নাই, আজ সমস্তটাই যেন নীরবে তাহার সর্বাঙ্গে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ, কিছুটা লজ্জিত হইয়া সালেক তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া কহিল, আমি তবে যাই মাস্টারমশাই—

ভূপেন মাথা নাড়িয়া কহিল, না, এখন আর ও হোস্টেলে ফিরে যেতে হবে না। আমার কাছেই থাক্। ভোরে উঠে চলে যাস—

না মাস্টারমশাই, আমি ফিরেই যাই।

তাহার সঙ্কোচের কারণটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া সস্নেহে পিঠের ওপর একটা হাত রাখিয়া ভূপেন প্রশ্ন করিল, কেন রে? ভয় করছে? থাক্ না একটু আমার কাছে।

সালেক যতীনবাবুর খালি চৌকিটার দিকে চাহিয়া রাজী হইয়া গেল। কহিল, আচ্ছা, আমি ঐ চৌকিটার ওপর থাকব এখন। ও-ত কাঠের চৌকি, ওতে কি দোষ হবে?

ও হরি! তুই বুঝি ঐ কথা ভাবছিস্? তাই এতক্ষণ বিছানায় বসিস্ নি? মানুষের বিছানায় মানুষ বসলে কোন দোষ হয় না রে। নোংরা মানুষ হলেই ঘেন্না করে—নইলে করবে কেন?

সে এক-রকম জোর করিয়াই সালেককে তাহার বিছানায় শোয়াইয়া দিল, তার পর নিজেও তার পাশে ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া সেই সঙ্কীর্ণ শয্যার উপরই আশ্রয় লইল। সে রাত্রে তাহাদের কাহারও ঘুম হইল না, সালেক ছেলেমানুষের মতই দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া গল্প করিয়া যাইতে লাগিল। অত গরমে ঐ ভাবে শুইয়া থাকিতে ভূপেনের খুব কষ্ট হইলেও, সে তাহার উৎসাহে বাধা দিল না বরং সারা রাত সে-ও উৎসাহের সহিতই বকিয়া চলিল। সালেক মধ্যে মধ্যে বলে, পাখাটা দিন মাস্টারমশাই, আপনাকে একটু হাওয়া করি—আপনার বড্ড

কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু পরক্ষণেই সে কথা ভুলিয়া নূতন কোন প্রশ্নে চলিয়া যায়। এমনি করিয়া কোথা দিয়া রাত কাটিয়া গেল তাহা দু'জনের একজনও জানিতে পারিল না—একেবারে পূর্বাকাশ ফরসা হইয়া উঠিতে চৈতন্য হইল। সালেক তাড়াতাড়ি উঠিয়া ভূপেনকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, তাহ'লে একদিন যাবেন ত মাস্টারমশাই—ঠিক ? আমি কিন্তু আপনার পথ চেয়ে থাকব।

পায়ের উপর হইতে তাহাকে তুলিয়া ধরিয়া ভূপেন হাসিয়া জবাব দিল, যাবো রে, যাবো।

১৯

বিজয়বাবুদের দারিদ্র্যের চেহারাটা সম্বন্ধে ভূপেন যত কিছুই অনুমান করিয়া থাক, এখানে বাস করিতে আসিয়া দেখিল যে, তাহার কোনটাই আসলের সহিত মেলে না। কল্যাণী সযত্নে গোপন করিবার চেষ্টা করে বটে কিন্তু একই বাড়িতে বাস করিতে গেলে সবটা গোপন করা যায় না। ডাল এবং যে-কোন একটা ব্যঞ্জন হয় শুধু বিজয়বাবু, তাঁহার দিদি আর ভূপেনের জন্য। তাহাদের ভাতের ফ্যানও গালা হয় ; বাকী ভাতের সহিত সমস্ত ফ্যানটা মিশাইয়া একটু নুন দিয়া কল্যাণী ও তাহার ভাই-বোনেরা খায়। তাও পরিমাণে যে পর্যাপ্ত নয় তাহা ছেলেমেয়েগুলির অপরিসীম কৃশতার দিকে চাহিলেই বোঝা যায়।

ভূপেনের হাতে যে টাকা ছিল তাহাতে কিছু কিছু বাজার-হাট সে করিতে পারিত কিন্তু কলিকাতা হইতে আসিয়া দীর্ঘ দিন এখানে থাকিবার ফলে মানুষের বড় অভাব কোন্‌টা তাহা সে বুঝিতে শিখিয়াছিল, তাই কোন প্রকার রসনা-তৃপ্তির আয়োজন না করিয়া সে একেবারে মণ-দুই চাল ও সব চেয়ে সস্তা যে ডাল—খ্যাসারি ও মটর, তাই দশ সের হিসাবে কিনিয়া দিল। কল্যাণী কী একটা মৃদু অনুযোগ করিতে গিয়াও চাপিয়া গেল। আজ হউক কাল হউক যখন এই লোকটির কাছে হাত পাতিতেই হইবে তখন আর সঙ্কোচ করিয়া লাভ কি। তবু সে পুরা একটি দিন কিছুতেই যেন আর ভূপেনের চোখের দিকে চাহিতে পারিল না।

কল্যাণী তাহাকে পড়াশুনা সম্বন্ধে যে আশ্বাস দিয়াছিল, তাহা পুরাপুরিই সে মিলাইয়া পাইল। একটা ঘর সম্পূর্ণ ভূপেনকে ছাড়িয়া দিয়া তাহারা সকলে অপর একখানি ঘরে আশ্রয় লইয়াছিল। তা ছাড়া সকালে ও সন্ধ্যায় ভূপেনের পড়াশুনার সময় কোন ভাই-বোন না ঘরে ঢোকে কিংবা ঘরের সামনে না চেঁচামেচি করে, সেদিকেও কল্যাণীর প্রখর দৃষ্টি থাকিত। তাহার ছোটখাটো যত্ন এবং

সেবার ত তুলনাই হয় না। ভূপেন চিরদিন আরাম-প্রিয়, চিরকাল বোনদের কাছ হইতে সেবা লওয়াই তাহার অভ্যাস ; তবু তাহার মনে হয় এ সেবার তুলনা নাই। শান্তি খুবই বুদ্ধিমতী—কিন্তু তাহাকেও ইচ্ছাটা মধ্যে মধ্যে জানাইতে হইত কিন্তু কল্যাণী প্রত্যেকটি কাজ তাহার মন বুঝিয়া আগে হইতে করে। এমন কি, দূরে থাকিয়াও যেন সে বুঝিতে পারে কখন কি প্রয়োজন ভূপেনের হইবে। এই দেবতার মত সেবায় সে একটু সঙ্কোচ অনুভব করে, বিশেষতঃ একটি ব্যাপারে তাহার লজ্জা যেন দুর্নিবার হইয়া ওঠে—এ বাড়িতে জলখাবারের পাট কাহারও নাই কিন্তু কল্যাণী প্রাণপণ চেষ্টায় যেমন করিয়াই হউক, দুই বেলাই তাহার একটা কিছু জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া দেয়। অতগুলি বুভুক্ষু বালকের মধ্যে বসিয়া মুড়ি খাইতেও যেন তাহার গলায় বাঁধে, অথচ উপায়ই বা কি ? পর্যাপ্ত ভাতই যাহাদের কাছে বিলাস, তাহাদের সম্বন্ধে জলখাবারের কথা চিন্তা করাও বাতুলতা ; তবু কল্যাণী এই পর্বটার আগে সকলকে সরাইয়া দেয় এবং বরাবরই তাহার ঘরে খাবার পৌছাইয়া দিয়া আসে।

এমনি করিয়া ভূপেনের দিন রাত্রি কাটে, সুখে না হোক আরামে। কলিকাতার কথা যেন সে ভুলিয়াই গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে শান্তি অনুযোগ ও আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া চিঠি লেখে—'কত দিন তোমাকে দেখি নি, মা রোজ লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদেন ! দু'দিনের জন্য এলেও কি পড়ার ক্ষতি হ'ত ? ঐ গরমে —শুনেছি বীরভূমের গরম কাশী-টাসীর চেয়েও বেশী—যদি অসুখ-বিসুখ করে ?' ইত্যাদি। আর লেখে সন্ধ্যা—দুই-চার ছত্র চিঠি, তবে তাহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদ্বেগ সন্ধ্যারও কম নয়, 'অত গরম কি সহ্য করতে পারবেন ? অসুখ-বিসুখ না হ'লেই বাঁচি'—এ ছাড়া অন্য কোন যোগসূত্রই নাই তাহার বাহিরের পৃথিবীর সহিত। স্কুল বন্ধ থাকায় বিজয়বাবুদের বাড়ি কেহ আসে না, সে-ও কাহারও সহিত দেখা করিতে যায় না। রৌদ্রের তাপ এত বেশী যে, সকাল ন'টার পর আর বাহির হওয়া যায় না, এধারেও তাপ কমিতে কমিতে সন্ধ্যা হইয়া যায়। গ্রামে জলকষ্টও অত্যন্ত, বার বার ত নয়ই, একবার স্নান করাই কষ্টকর। প্রায় সব কুয়াতেই জল শুকাইয়া আসিয়াছে, একটি কুয়ায় কিছু জল জমে—সারা রাত ধরিয়া পাড়ার মেয়েরা সেই কুয়া হইতে জল সংগ্রহ করে, কল্যাণীও ছোট ভাইকে সঙ্গে করিয়া সেইখানে যায়, কোন দিন তিন বাল্‌তি কোন দিন বা দুই বাল্‌তি জল পায়। তাও এক-একদিন শেষের দিকে যাওয়ার জন্য কাদা ঘোলা থাকে, থিতাইয়া ছাঁকিয়া লইতে হয়। সুতরাং সে জলে স্নান করিবার কথা কেহ কল্পনাও করিতে পারে না। নিকটেই একটি পুকুরে কিছু জল আছে—সেইখান হইতে পানা

সরাইয়া কল্যাণী ঘড়া করিয়া জল আনিয়া দেয়—কোন মতে তাহাতেই একবার স্নান সারিতে হয়। সব বিলাসিতাই তাহার গিয়াছে, কিন্তু পুকুরে নামিয়া পানা সরাইয়া স্নান করিতে এখনও যেন কোথায় বাধে। অথচ এত কষ্টের তোলা-জলে দুইবার স্নান করিবার কথা ভাবিতেও লজ্জা হয়—সে অধিকাংশ সময়ই রৌদ্র ও ধূলা হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া ঘরে বসিয়া থাকে, যাহাতে দ্বিতীয় বার স্নান করিবার প্রয়োজন না পড়ে।

দুপুরে খুবই গরম, তবে সকাল হইতে দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া ঘরটাকে ঠাণ্ডা রাখা হয়। ফলে রৌদ্রের ঝাঁজটা আসে না বটে, ঘাম হয় অতিরিক্ত। তবু তাহারই মধ্যে ঘুম তাহার ভালই হয়। অবশ্য কেন যে হয়, সে কারণটা একদিন আবিষ্কার করিয়া সে দস্তুরমত লজ্জিত এবং শঙ্কিত হইয়া উঠিল। সহসা একদিন কী কারণে ঘুমটা ভাঙ্গিয়া গিয়া দেখিল যে, কল্যাণী তাহার তক্তপোশের পাশে দাঁড়াইয়া যতটা সম্ভব সন্তর্পণে এবং নিঃশব্দে বাতাস করিতেছে। ফলে ভূপেন আরামে ঘুমাইতেছে বটে কিন্তু কল্যাণী নিজে যেন স্নান করিয়া উঠিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি হাত হইতে পাখাটা কাড়িয়া লইয়া বলিল—আরে! তুমি কি রোজ এম্‌নি বাতাস করো নাকি? এ কি কাণ্ড! ছি, ছি, এ ভারি অন্যায়!

কল্যাণী লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিয়া কহিল, না, না, রোজ নয়। এমনি, হঠাৎ একটা কাজে এসে পড়েছিলুম, দেখলুম আপনার বালিশ-বিছানা ভিজে উঠেছে একেবারে, তাই—

সে আর দাঁড়াইল না, কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়াই এক প্রকার ছুটিয়া পলাইয়া গেল।...

সে অস্বীকার করিল বটে কিন্তু ভূপেনের বিশ্বাস, সে এমনি রোজই বাতাস করে আর সেই জন্যই এত গরমের মধ্যেও তাহার বেশ ঘুম হয়। পরের দিন সে সতর্ক হইয়া শুইয়া রহিল, খানিকটা ঘুমের ভান করিয়াও রহিল—কিন্তু সেদিন আর কল্যাণী আসিল না। ধরা পড়িয়া যথেষ্ট লজ্জা পাইয়াছে মনে করিয়া ভূপেন নিশ্চিন্ত হইল।

কিন্তু তিন-চার দিন পরে আবার একদিন কী একটা শব্দে সহসা জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, কল্যাণী তেমনি দাঁড়াইয়া বাতাস করিতেছে। তাহার যে ঘুম ভাঙ্গিয়াছে কল্যাণী বুঝিতে পারে নাই—ভূপেন সহসা তাহার একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া টানিয়া কাছে বসাইয়া কহিল, রোজ রোজ এ কী অত্যাচার বলো ত! এমন করলে কিন্তু আমি আজই হোস্টেলে চলে যাব।

হাতটা ছাড়াইয়া লইবার খানিকটা বৃথা চেষ্টা করিয়া কল্যাণী লজ্জাজড়িত কণ্ঠে

প্রশ্ন করিল, কেন, কি করেছি!

—কী করেছ! একটা লোক আরামে ঘুমোবে, আর তুমি এই গরমে দাঁড়িয়ে বাতাস করবে। বা-রে!

কল্যাণী মাথা নিচু করিয়া কহিল, মানুষের জন্যে কি মানুষ করে না? আমার বাবা, ভাইদেরও ত আমি বাতাস করি, শুধু ত আপনাকে না!

ভূপেন নিজের কোঁচার খুঁট দিয়া তাহার ললাট ও কণ্ঠের ঘাম মুছাইয়া দিয়া জোর করিয়া কল্যাণীর হাত হইতে পাখাটা কাড়িয়া লইয়া বাতাস করিতে করিতে কহিল, বেশ তাহ'লে এখন আমি তোমাকে খানিকটা বাতাস করি, তুমি ঘুমোও—

কল্যাণী প্রাণপণে তাহার মুঠির মধ্য হইতে নিজের হাতটা ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে করিতে কহিল, ওমা, ও কি। ছি, ছি, ছাড়ুন—ওতে যে আমার পাপ হয়—ছি, আপনার দুটি পায়ে পড়ি—

—কেন?—বিদ্রূপের সুরে ভূপেন কহিল, মানুষের জন্যে কি মানুষ করে না?

দুমড়াইয়া মুচ্‌ড়াইয়া বাঁকিয়া চুরিয়া কোনমতে হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া কল্যাণী ছুটিয়া পলাইয়া গেল। ভূপেন হাসিয়া পিছন হইতে ডাকিয়া কহিল, মনে থাকে যেন!

ইহার পর তিন-চার দিন ভূপেন একেবারেই দুপুরে ঘুমাইল না। এত গরমে আহারের পর অন্ধকার ঘরে চোখ আপনিই বুজিয়া আসিতে চায়—রাজ্যের ঘুম আসিয়া যেন আক্রমণ করে কিন্তু তবু ভূপেন বহু চেষ্টা করিয়া জাগিয়াই রহিল। সে বুঝিয়াছিল যে, ঘুমাইয়া পড়িলেই কল্যাণী আবার অমনি বাতাস করিতে আসিবে। তাহার কষ্ট হইতেছে কল্পনা করিয়া কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিবে না।…কল্যাণীর এই নিঃশব্দ সেবায় সে মুগ্ধও হয় বৈকি!…এখানকার এই সহস্র অসুবিধা, দারিদ্র্যের বীভৎস নগ্ন রূপের মধ্যেও এক-এক সময় যে তাহার মনে হয় 'বেশ আছি'—ইস্কুলের ছুটি ফুরাইয়া আসিবার কথা মনে পড়িলে মনটা খারাপ হইয়া যায়; এখান হইতে নড়িতে ইচ্ছা করে না—তাহার মূলেও আছে একমাত্র এই মেয়েটিরই অক্লান্ত এবং সজাগ সেবা, সে কথা ভূপেন আর নিজের কাছে অস্বীকার করিতে পারে না। কল্যাণীর অন্তরের সমস্ত চিন্তা যে তাহার দিকে একাগ্র হইয়া আছে, সে কথা মনে করিয়া হয়ত শঙ্কিত হওয়ারই কথা কিন্তু সে যেন কেমন একটা পুলকও অনুভব করে। এই পূজার মধ্যে আত্ম-প্রসাদ অনুভব করিবার যে কারণ আছে, তাহা পৌরুষের অহঙ্কারে সুড়সুড়ি দিয়া মনে মনে যেন নেশার আমেজ ধরাইয়া দেয়। তবু মনের দুর্বলতার চেয়ে

কর্তব্যবুদ্ধিই প্রবল হইল, সে আর কিছুতেই দুপুরে ঘুমাইয়া এই ঘটনার পুনরাবৃত্তির সুযোগ দিবে না স্থির করিল। নিজের দৈহিক আরামের জন্য অপরকে এত কষ্ট দিবার তাহার অধিকার নাই, তা হউক না কেন সে কষ্টস্বীকার স্বতঃপ্রবৃত্ত!

তবে দুপুরের ঘুমটা ছাড়িয়া দিয়া অসুবিধা হইল এই যে, মোটের উপর ঘুমটাই তাহাকে কমাইয়া দিতে হইল। কারণ, রাত্রে গরমটা তাহার বেশী লাগিত বলিয়া অনেকখানি সময়েই তাহাকে এপাশ-ওপাশ করিয়া, হাওয়া ও জল খাইয়া জাগিয়া থাকিতে হইত—সে ঘুমটা আগে পোষাইয়া লইত দুপুরে। রাত্রে বাকী সকলেই বাহিরের দাওয়ায় শোয়, কিন্তু তাহাকে কিছুতেই কল্যাণী বাহিরে থাকিতে দেয় না। এ দেশে গরমে নাকি ভয়ানক সাপের উপদ্রব হয়—কল্যাণী তাহার বাবা ও ভাইদের হাতে শ্বেত করবীর ডালের মাদুলী করিয়া দিয়াছে, তাহাতে সাপের ভয় থাকে না, কল্যাণীর অন্ততঃ তাই বিশ্বাস। ভূপেন মাদুলী পরিতে কোনমতেই রাজী হয় নাই—কল্যাণীও তাহাকে বাহিরে শুইতে দেয় নাই। একমাত্র সে-ই ঘরে চৌকির উপর শয়ন করিত। ফলে তাহার কষ্ট হইত সব চেয়ে বেশী। আর এই ব্যাপারকে উপলক্ষ করিয়াই সে-দিন এক অঘটন ঘটিয়া গেল—

ভূপেন যখন পড়াশুনা বন্ধ করিয়া শোয়, কল্যাণীর জল-তোলা তখনও শেষ হয় না বলিয়া—তাহার ঘরের দরজা খোলাই থাকিত। কাজ সারা হইলে কল্যাণী এ দরজা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দু'টি ঘরের মধ্যবর্তী দরজা দিয়া ওঘরে যাইত এবং ও-ঘরের কপাটে বাহির হইতে তালা লাগাইয়া সে পিসীমার বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িত। প্রতিদিনই এই ব্যাপার চলে বলিয়া ভূপেন ইদানীং আলোও নিভাইত না, সে কাজটাও কল্যাণী সারিয়া চলিয়া যাইত। আগে আগে ভূপেন তখনও জাগিয়া থাকিত প্রায়ই, কল্যাণী চলিয়া যাইবার সময় হয়ত দু'একটা কথাও কহিত—কিন্তু এখন দিনের বেলা ঘুমটা বাদ দেওয়ার ফলে প্রথম রাত্রিতে যত গরমই থাক্, সে ঘুমাইয়া পড়ে খুব তাড়াতাড়ি। এদিনও সে ঘুমাইতেছিল অগাধেই—কল্যাণীর আগমন তাহার টের পাইবার কথা নয় কিন্তু হঠাৎ কি কারণে তন্দ্রার ঘোরটা কাটিয়া গেল; চৈতন্য ফিরিয়া আসিতে সে চোখ বুজিয়া বুজিয়াই অনুভব করিল যে ঘরে তখনও আলো জ্বলিতেছে—তখন ধীরে ধীরে চোখ খুলিতে প্রথমেই নজরে পড়িল তাহার বিছানার অত্যন্ত কাছে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে কল্যাণী। হয়ত কাজ সারা হইয়া গিয়াছে—আলোটা নিভাইবার জন্য এখানে আসিয়া ঘুমন্ত ভূপেনের দিকে চাহিয়া থাকিবার লোভটা সামলাইতে পারে নাই। তাহার চমকিয়া

উঠিবারই কথা কিন্তু কী একটা অদ্ভুত কারণে ভূপেন চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না, এমন কি সে যে জাগিয়া চোখ মেলিয়াছে, সে কথাটাও প্রায়-নিবন্ত লণ্ঠনের অল্প আলোয় কল্যাণী বুঝিতে পারিল না। আরও মুহূর্ত কয়েক তেমনি চুপ করিয়াই দাঁড়াইয়া থাকিবার পর সে নিঃশব্দে আরও খানিকটা কাছে আসিয়া হেঁট হইয়া আঁচলের কাপড় দিয়া সন্তর্পণে তাহার কণ্ঠ-ললাট-বুক মুছিয়া লইল।

লণ্ঠনের আলো সামান্যই, ভূপেনের চক্ষুও অর্ধ নিমীলিত, তবু সে মুহূর্তে ঐ মেয়েটির মুখের দিকে চাহিয়া তাহার যেন বহুদিন পূর্বের দেখা কোন্ এক স্বপ্নের কথাই মনে পড়িয়া গেল। বোধ করি অর্ধাশনক্লিষ্ট শীর্ণ মুখে সেবা ও প্রেমের একটি অনির্বচনীয় দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়া তাহার সেই অতি-সাধারণ মুখকেও রমণীয় ও লোভনীয় করিয়া তুলিয়াছিল। আত্মনিবেদনের এই গোপন এবং নিঃশব্দ প্রকাশে কয়েক মুহূর্তের জন্য ভূপেনের মাথায় যেন সব গোলমাল হইয়া গেল—তাহার যাহা কিছু শিক্ষা, সংস্কার, আদর্শ সব যেন একাকার হইয়া আবেগের বন্যায় কোথায় ভাসিয়া তলাইয়া গেল; সে সহসা কল্যাণীকে দুই হাতে ধরিয়া বুকের উপর টানিয়া লইল।

ঘটনাটা এমনই অপ্রত্যাশিত, অবিশ্বাস্য, আর অতর্কিত যে, কল্যাণী ত বাধা দিতে পারিলই না—ব্যাপারটা অনুভব করিতেই তাহার একটু দেরি লাগিল। তাছাড়া যে বস্তু ছিল তাহার সুদূরতম কল্পনায় দুঃসাহসিক স্বপ্ন হইয়া—সেই প্রিয়তমের আকস্মিক স্পর্শ—কিছুক্ষণের জন্য তাহাকে বিহ্বল করিয়া দিল। সে তাই ভূপেনের বুকের উপর তেমনিই পড়িয়া রহিল। এমন কি, অন্তর যে তাহার কাজ আপনিই করিয়া যাইতেছে, বহু দিনের বেদনা যে দয়িতের স্নেহের স্পর্শে অশ্রুর আকারে ঝরিয়া পড়িতেছে, তাহাও সে বুঝিতে পারে নাই—একেবারে সম্বিৎ ফিরিল ভূপেনের তপ্ত চুম্বন যখন তাহার সমস্ত দেহে বিদ্যুতের শিহরণ সঞ্চারিত করিয়া দিল। সে অস্ফুটকণ্ঠে 'মা গো!' বলিয়া একটা আর্তনাদ করিয়া উঠিয়া সবেগে নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

॥ ২০ ॥

তাহার পরদিন ভূপেন আর কিছুতেই মুখ তুলিয়া কল্যাণীর দিকে চাহিতে পারিল না। শুধু যে একটা অন্যায় করিয়াছে সে জন্যই নয়—কাজটার বহুদূরপ্রসারী ফলাফল চিন্তা করিয়াও বটে। দরিদ্রের রূপহীনা কন্যার মনে যে আশা কখনও জাগিত না, জাগিতে সাহস করিত না—যে অনুরাগ শুধু মাত্র থাকিত একতরফা, যাহার কোন প্রতিদান না পাইলেও আশাভঙ্গের বেদনা সহ্য করিতে হইত না—

সেই আশা ও অনুরাগকে অকারণে প্রশ্রয় দিবার কোন অধিকার পর্যন্ত তাহার নাই। কল্যাণীও লজ্জায় সঙ্কোচে প্রাণপণে সারাদিন তাহাকে এড়াইয়া চলিল। অবশেষে সন্ধ্যার কিছু আগেই ভূপেন বাড়ি হইতে বাহির হইয়া পড়িয়া, সাময়িক ভাবে অন্তত, এই দুর্নিবার লজ্জা ও আত্মগ্লানির হাত হইতে অব্যাহতি পাইল। যাইবার সময় শুধু রাখুকে বলিয়া গেল, আমি সালেকদের বাড়ি যাচ্ছি, রাত্রে আর ফেরা হবে না।

সালেকদের বাড়ি নিশ্চয় একদিন যাইবে, কথা দিয়াছিল ; কিন্তু এতদিন একটা সুগভীর আলস্য ও আরামে এমনই জড়ত্বের মধ্যে দিন কাটিয়াছে যে, যাই-যাই করিয়াও কিছুতেই যাওয়া ঘটিয়া ওঠে নাই। এধারে ছুটিরও এক মাস কাটিয়া গিয়াছে, আর চার-পাঁচ দিন বাদেই স্কুল খুলিবে, এখন আর না গেলে প্রতিশ্রুতিটা রাখা যায় না। সুতরাং সেজন্যও কতকটা তাহাকে মরীয়াভাবে বাহির হইতে হইল।

সালেক এতদিনে আশা ছাড়িয়াই দিয়াছিল, সহসা ভূপেনকে দেখিয়া সে প্রায় নাচিতেই শুরু করিয়া দিল। গফুর মিঞাও যথেষ্ট ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন—তখনই হিন্দুপাড়া হইতে লুচি ভাজাইয়া আনিবার ব্যবস্থা করিলেন ; ঘরে শুধু গরু দুইয়া ক্ষীর হইল অর্থাৎ তাহার জাতিটা রক্ষা করা চাই-ই। এমন কি তাহার স্নানের জল পর্যন্ত তিনি হিন্দুকে দিয়াই তোলাইয়া দিলেন।

আহারাদির পর বাহিরেই চৌকি পড়িল। সেদিনও সালেক আসিয়া বসিয়াছিল—তাহার পদসেবা করিতে। কিন্তু ভূপেন তাহাকে পায়ে হাত দিতে দিল না, জোর করিয়া কাছে টানিয়া আনিল। তারপর চলিল গল্প—অধিকাংশ লেখাপড়ার কথা। সালেক কি কি পড়িয়াছে এই ছুটির মধ্যে, কোন্‌টি কোন্‌টি বুঝিতে পারে নাই—তাহারই বিবরণ। শেষ পর্যন্ত উৎসাহের আতিশয্যে রাত দুটা নাগাদ সালেক উঠিয়া লণ্ঠন জ্বালিয়া এবং বই-খাতা লইয়া রীতিমত পড়িতে বসিল। একেবারে যখন দুজনেরই হুঁশ হইল তখন পূর্বাকাশ রীতিমত লাল হইয়া উঠিয়াছে। সালেক একটু লজ্জিত ও ব্যস্ত হইয়া উঠিল কিন্তু তখন আর নূতন করিয়া ঘুমাইতে ইচ্ছা হইল না ভূপেনের, সে একেবারে মুখ-হাত ধুইয়া বিদায় লইল।

বিজয়বাবুদের বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া তাহার তখনও লজ্জাই বোধ হইতেছিল ; কিন্তু কল্যাণী আজ তাহার সহিত সহজভাবেই কথাবার্তা বলিল। স্নানের ব্যবস্থা করা, জলযোগের আয়োজন—সবই নিত্যকার মত চলিতে লাগিল, যেন কোথাও কোন সঙ্কোচের কারণ ঘটে নাই। বোধ হয়, সে মনে করিয়াছিল যে, তাহার আগের দিনের অপ্রতিভ ভাবটাই ভূপেনকে বাড়িছাড়া করিয়াছে, সেই জন্য

আজ সে জোর করিয়াই সহজ হইল।

ভূপেনেরও ক্রমে ক্রমে লজ্জাটা কাটিয়া গেল, যদিও রাত্রে সে অত্যধিক গরমের অজুহাতে কল্যাণীর কোন নিষেধ না শুনিয়া, একরকম জোর করিয়াই, বাহিরে বিজয়বাবুর পাশে শয়নের ব্যবস্থা করিয়া লইল।

চার-পাঁচদিনের মধ্যেই ছুটি শেষ হইল, নূতন হেডমাস্টারও আসিয়া পৌঁছাইলেন। এ ভদ্রলোকের নাম ললিতবাবু—ইঁহার বয়স বেশী না হইলেও ইতিমধ্যে অনেক ঘাটের জল খাইয়াছেন, ঘুরিয়াছেন বহু ইস্কুল। সে জন্য বিশ্বাস করেন না কাহাকেও, অত্যন্ত সন্দিগ্ধ ও হুঁশিয়ার। তাহার উপর ভবদেববাবুর চাকুরি কেন গিয়াছে, সে খবরটা তিনি ইতিমধ্যেই পাইয়াছেন, ফলে সতর্কতার মাত্রা আরও বাড়িয়াছে। অবশ্য বিশ্বাস যেমন পরকেও করেন না, তেমনি নিজের সহজ বিচার-বুদ্ধিকেও না। কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেই আগে আইন খুঁজিতে বসেন, অর্থাৎ ইস্কুলে কী নিয়ম চলিয়াছে এতদিন। যেখানে সে রকম কিছু খুঁজিয়া পাওয়া না যায়, সেখানে সেক্রেটারীকে প্রশ্ন করিয়া পাঠান ; চারটি পয়সা খরচাও তিনি নিজের দায়িত্বে করেন না, একটি বেয়ারিং চিঠি রাখিবেন কিনা, একদিন এ অনুমতির জন্যও সেক্রেটারীর কাছে লোক পাঠাইয়াছিলেন।…শিক্ষকরা কর্মব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিলে অত্যন্ত বিব্রত বোধ করেন।

সুতরাং বিপদ বাধিল তাঁহার সব চেয়ে ভূপেনকে লইয়া। তাহার ধরন-ধারণ, পড়াইবার পদ্ধতিও সব যেন নূতন, সেজন্য তাঁহার প্রথম প্রথম দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না। পরে যখন জানিলেন যে, এ ব্যাপারে সেক্রেটারীর অনুমোদন আছে, তখন কতকটা আশ্বস্ত হইলেন, যদিও অস্বস্তিটা কিছুতেই গেল না। একদিন এই প্রসঙ্গে ভূপেন তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে, ছাত্ররা পড়িতেই আসে এখানে, সে সম্বন্ধে শিক্ষকদের দায়িত্ব অনেকখানি। পড়ানোটা কেমন করিয়া ভাল হয়, সেইটাই সর্বাগ্রে দেখা প্রয়োজন তাঁহাদের, আর সেজন্য যদি নূতন কোন পদ্ধতি ভাল বলিয়া মনে হয় কিম্বা সেটার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পান ত, সেই পদ্ধতি অবলম্বন করিতে ক্ষতি কি ? কিন্তু ললিতবাবু দায়িত্বটা ষোল আনা মানিয়া লইলেও নূতন কোন পথ পরীক্ষা করিবার অধিকার তাঁহাদের আছে, এ কথাটা কিছুতেই বুঝিতে পারিলেন না, সেখানে কোন যুক্তিই তাঁহাকে ভূপেনের সহিত একমত করিতে পারিল না। যুক্তির জবাব দিতে পারেন না এটাও যেমন ঠিক, তেমনি কথাটা যে মানিয়া লইতে পারেন না এটাও ঠিক। বহু দিনের অনভ্যাসে তাঁহার বিচার-বুদ্ধি যেন একেবারে অকর্মণ্য হইয়া গিয়াছে। মন কোন কাজকে

সঙ্গত মনে করিলেও সেটাকে করিতে সাহস করেন না, যতক্ষণ না উপরওয়ালাদের কাছ হইতে অনুমোদন আসে। তাঁহার সেই এক বুলি, ভাল-মন্দ বুঝিনে মশাই, যা চলে আসছে, তাই চলুক। কী দরকার অত ঝামেলায়?

এটা যদি শুধু তাঁহার নিজেরই সব কাজে প্রযোজ্য হইত ত ভূপেন অতটা উদ্বিগ্ন হইত না। সে এতদিনের চেষ্টায় অন্য মাষ্টার মহাশয়দের শিক্ষকতার দায়িত্ব সম্বন্ধে কতকটা সচেতন করিয়া আনিয়াছিল, এখন আবার তাঁহারা গা ঢালিয়া দিলেন। তাঁহাদের যুক্তিও প্রায় অকাট্য, আমাদের ওপরও'লা যদি আমাদের কাছে ফাঁকিই চায় ত, কি দরকার ভাই বেশী পরিশ্রমে?

একা ভূপেন প্রাণপণে চেষ্টা করে নিজের কর্তব্য পালন করিতে কিন্তু মনে মনে একটা ক্লান্তি, একটা হতাশাও যেন অনুভব করে। মনে হয়—হয়ত এ অসম্ভব, এদেশে আর কিছুতেই কিছু করা যাইবে না।

এধারে সহসা আর এক বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল।

গ্রামটি খুবই ছোট বলিয়া এখানে কোন বেশ্যা-পল্লী ছিল না। সহসা আষাঢ়ের শেষের দিকে দুই ঘর হাড়ি আসিয়া ইস্কুলের ওধারের ডাঙ্গাটায় ঘর বাঁধিতে শুরু করিল। ভূপেন এসব খবর কিছুই জানিত না, সংবাদটা দিলেন পণ্ডিতমশাই। এ অঞ্চলে নাকি এই ডোমপাড়া বা হাড়ীপাড়া এক সাংঘাতিক স্থান। ইহারা গৃহস্থের মত সংসারও করে আবার ইহাদের স্ত্রীলোকেরা প্রকাশ্যেই বেশ্যাবৃত্তি করে। এখানকার অপেক্ষাকৃত বর্ধিষ্ণু গ্রাম যে সব, সেখানকার বহু কিশোর এবং তরুণেরই নাকি বহু সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে এই হাড়ীপাড়ায়। শুধু যে নৈতিক সর্বনাশ হইয়াছে তাহা নয়, সঙ্গে সঙ্গে দৈহিকও। এমন সব কুৎসিত ব্যাধি ইহাদের কাছ হইতে আসে, যাহার আর কোন চিকিৎসাও সম্ভব হয় না—ফলে বংশপরম্পরায় নানা রকমের রোগ ও অকালমৃত্যু চলিতে থাকে।

সব সংবাদ ও তথ্য শেষ করিয়া রাধাকমলবাবু শুষ্ক মুখে বলিলেন, তোমার এত শখ ভাই ছেলেদের মানুষ ক'রে তোলবার, কিন্তু আর বোধ হয় পারলে না। এই যা ঘা, এতেই সব যাবে।...

ভূপেন উত্তেজিত হইয়া কহিল, কিন্তু এর একটা ব্যবস্থা করবেন না আপনারা? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই সর্বনাশটা দেখবেন?

—কি করবো ভাই? আমি একা কি করতে পারি? তাছাড়া শহর বাজারের তারাই পারলে না কিছু করতে—তা আমরা—

ভূপেন হেডমাস্টারের কাছে গেল। কহিল, এর একটা বিহিত করবার চেষ্টাও করবেন না স্যার! এমন একটা কাণ্ড বিনা-বাধায় ঘটবে?

ললিতবাবু বলিলেন—বিলক্ষণ! একে আমি নতুন লোক, তায় মাস্টার! মাস্টারদের কথা কি কেউ শোনে মশাই? কেউ শোনে না। আর ওরা ঘর বাঁধছে অত দূরে, আপনার ছাত্রদের সঙ্গে কতটুকু সম্পর্ক বলুন। আপনারাই না হয় একটু সাবধানে থাকবেন।

ভূপেন তবুও যখন জেদ্ করিতে লাগিল তখন তিনি পরিষ্কারই বলিলেন, ওসব আমার দ্বারা হবে না মশাই, সাফ কথা। আমি এসেছি চাকরি করতে—সোস্যাল রিফর্ম করতে ত আসি নি। কার এত দায় যে ঐ সব ক'রে বেড়াবে এখন। আর তাছাড়া কেউ যে কাজ করতে পারলে না, আমি কী এমন মহাবীর যে সেই গন্ধমাদন ধারণ করব।

তার পর একটু থামিয়া যেন ঈষৎ বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন, সেক্রেটারী ত আপনার হাত-ধরা, তাঁকেই বলুন না?

—তাঁকেই বলব।—সংক্ষেপে উত্তর দিয়া ভূপেন চলিয়া গেল। কাছেই ছিলেন অপূর্ববাবু, হাসিয়া কহিলেন, ওরা কলকাতার ছেলে মাস্টার মশাই, ওরা সব পারে। দেখুন না, আপনাকেই শাসিয়ে গেল! 'সেক্রেটারীকে বলব' কথাটার মানে বুঝলেন না?

অপূর্ববাবু আবার মিষ্ট ভাবে হাসিলেন।

শুধু একটা 'হুঁ' বলিয়া ললিতবাবু মুখ কালি করিয়া বসিয়া রহিলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

সেক্রেটারীর কাছে কথাটা পাড়িতে তিনি একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন। কহিলেন, মশাই, যত ঝঞ্ঝাট কি আপনাকে নিয়ে! আমার ও ডাঙ্গাটা অনেক দিন ধরে পড়ে ছিল—ভাবলুম যাহোক দু'ঘর প্রজা বসল। তা ছাড়া ওরা যেখানে থাকে দু-এক ঘর থাকে না, দেখতে দেখতে আরও দু-চার ঘর এসে পড়বে। আমার আয় বাড়ল এই কথাই ভাবছি, তা আপনি আবার সেখানেও এলেন বাগড়া দিতে।

ভূপেন কহিল, কিন্তু আপনার আয় ওতে সামান্যই বাড়বে, অথচ কতগুলো ছেলের সর্বনাশ হ'তে পারে একবার ভেবে দেখুন দিকি! আমি ত এখানে নতুন লোক, কিছুই জানি না, কিন্তু আপনি ত সব খবর রাখেন—কত ছেলের ইহকাল পরকাল ওরা নষ্ট ক'রে দিয়েছে, আপনিই বলুন।

চিন্তাক্লিষ্ট মুখে সেক্রেটারী জবাব দিলেন, তা অবশ্য বটে। অতটা আমি ভেবে দেখি নি। ওরা ত প্রায় সব জনবসতির ধারেই থাকে, যারা নষ্ট হবার

তারাই হয়—যারা ভাল থাকবার তারা ঠিকই থাকে, এই কথাই ভেবেছিলুম। ...আমারই এক শালীর ছেলে মশাই, fine young man, বাপ-মায়ের একমাত্র ছেলে, অগাধ বিষয়। ইস্কুলে পড়তে পড়তেই বিয়ে হয়েছিল, বৌও খুব সুন্দরী —অথচ কলেজে পড়বার সময় কী যে দুর্মতি হ'ল, দু-তিনজন বদ্ বন্ধুর সঙ্গে হাড়ীপাড়ায় যেতে শুরু করলে। ব্যস্।...বছর তিনেক ভুগে মারা গেল। কত পয়সা খরচ করা হ'ল—কিছুতেই কিছু হ'ল না। বোলপুর শহরে তিন মহল বাড়ি খাঁ খাঁ করছে—শুধু দুটি বিধবা থাকে।

ভূপেন বিস্মিত হইয়া কহিল, কিন্তু এসব জেনেও এই সর্বনাশ করবেন আপনি?

—তাই ত! সেক্রেটারী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, কিন্তু দলিল-টলিল সব হয়ে গেছে, তা-বাদে আমার ত একলার জমি নয়, অন্য সরিকরাও আছেন, এখন কি আর কিছু করা সম্ভব হবে?

কিছু একটা করতেই হবে আপনাকে। দুই হাত জোড় করিয়া ভূপেন কহিল, দোহাই আপনার! আমার নিজের দেশ নয়, আজ আছি কাল হয়ত থাকব না, কিন্তু এ আপনারই ত দেশ, আপনারও ছেলে-মেয়ে আছে, তাদের কথা ভাবুন।

আরও বার-কয়েক শুধু 'তাই ত' বলিয়া একসময় সেক্রেটারী উঠিয়া পড়িলেন। কহিলেন, দেখি, কি করতে পারি। একবার এস-ডি-ওর সঙ্গে দেখা করতে হবে, যা বুঝতে পারছি। আচ্ছা, আপনি যান, যা হয় একটা কিছু করা যাবে।

উজ্জ্বল মুখে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদটা দিতে ললিতবাবুর কালিমাখা মুখে কে যেন আরও খানিকটা কালি মাড়িয়া দিল। তিনি কোন কথাই কহিলেন না, শুধু অপূর্ববাবু জবাব দিলেন, দুর্নীতি আর কত বাঁচাবেন ভূপেনবাবু! আমাদের সকলেরই ত ঐ অবস্থা। সমাজের চারিদিকেই ঘুণ ধরেছে। বলি, ভদ্রলোকের বাড়ির মেয়েদের নিয়ে টানাটানি করার চেয়ে ত বেশ্যাবাড়ি যাওয়া ভাল! কি বলেন আপনি?

অপূর্ববাবু শেষের কথাগুলি বলিয়া যেন কী এক অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার এই বক্রোক্তির ঠিক অর্থটা না বুঝিলেও অকস্মাৎ ভূপেনের সর্বাঙ্গে যেন কে বিষ ছড়াইয়া দিল, সে আর নিজেকে সামলাইতে না পারিয়া কহিল, তাই বা জোর ক'রে বলি কি ক'রে বলুন। ওতে অন্তত রোগের হাত থেকে ত বাঁচা যায়! কিন্তু এসব প্রসঙ্গ থাক্—খারাপ যা তার সবটাই খারাপ, প্রয়োজন হ'লে সবটার সঙ্গেই লড়াই করতে হবে।

সে আর উত্তর-প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সোজা হোস্টেলের পথ ধরিল।

অপূর্ববাবুর বাঁকা মন্তব্যের সোজা অর্থটা বোঝা গেল কয়েক দিন পরেই।

ছুটির পর হোস্টেলে ফিরিয়া আসিলেও ভূপেন প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই বিজয়বাবুদের বাড়ি যাইত এবং অনেক রাত্রি পর্যন্ত বসিয়া গল্প-গুজব করিত। ইতিমধ্যে মাহিনার টাকা পাইয়া উহাদের আরও কিছু চাল-ডাল-আটা কিনিয়া দিয়াছে সে। এবারও কল্যাণী কোন আপত্তি করে নাই; কারণ, করিবার উপায় নাই তাহা সে ভাল করিয়াই জানে, শুধু মাথাটা তাহার আরও নত হইয়া গিয়াছে মাত্র।

অর্থাৎ এক কথায় ইহাদের পরিবারের সম্পূর্ণ ভারই সে নিজের হাতে তুলিয়া লইল। যদিও তাহার ফলে বাড়িতে সে যে টাকা পাঠাইত তাহার পরিমাণটা অত্যন্ত কমিয়া যাওয়াতে, সেখান হইতে পিতৃদেবের অত্যন্ত কড়া এবং করুণ চিঠি আসিয়া তাহাকে বিব্রতই করিয়া তুলিয়াছে। এসব ক্ষেত্রে স্বভাবতই মনে পড়ে সন্ধ্যার কথা, কিন্তু ধনী-দুহিতা সন্ধ্যার চিঠি আজকাল সংখ্যায় ও আকারে এতই কমিয়া আসিয়াছে যে, সে চিন্তাটা শুধু অভিমান নয়, ব্যথারও কারণ হইয়া উঠিয়াছে ভূপেনের কাছে। তাই সে সন্ধ্যার চিঠিতে সে কথাটার আভাস পর্যন্ত দেয় না।

সে যাই হোক্—সে দিনও ছুটির পর সে অভ্যাস-মত বিজয়বাবুর বাড়ি উপস্থিত হইল। কিন্তু আজ আর বিজয়বাবু অন্য দিনের মত কলরব করিয়া সাদর সম্ভাষণ জানাইলেন না—বরং অভ্যর্থনার বাণী উচ্চারণ করিবার সময় তাঁহার কণ্ঠস্বর যেন করুণ ও গম্ভীর শোনাইল। শুধু তা-ই নয়, অন্য দিন তাহার গলা পাইলেই কল্যাণী ছুটিয়া আসে—চা করিয়া দিবার চেষ্টা করে, হাসিতে, গল্পে মুখরিত হইয়া ওঠে, কিন্তু আজ কোথাও তাহার চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া গেল না। সে-যে ইচ্ছা করিয়াই বাহির হইল না—এটা বেশ স্পষ্ট বোঝা গেল।

অর্থাৎ কিছু একটা ঘটিয়াছে। কিন্তু সেটা যে কি তাহা কিছুতেই সে অনুমান করিতে পারিল না। শেষে বিজয়বাবুর সহিত' মিনিট-কয়েক গল্প জমাইবার বৃথা চেষ্টা করিয়া একসময় সে সোজাসুজি প্রশ্ন করিল, কল্যাণীকে দেখছি না কেন? তার অসুখ-বিসুখ করে নি ত?

—না-না! বিজয়বাবু যেন মুহূর্ত কয়েক ইতস্ততঃ করিলেন, তাহার পর উত্তর দিলেন, ভালই আছে, রান্না করছে বোধ হয়।

—দেখি তার ব্যাপার কি! এতক্ষণের মধ্যে একবারও তার টিকি দেখা গেল না—এত কী রান্না করছে সে!

ভূপেন উঠিয়া গিয়া রান্নাঘরের সামনে দাঁড়াইল। উনানে কিছুই নাই—কিন্তু তাহারই সামনে স্তব্ধ হইয়া নতমুখে বসিয়া আছে কল্যাণী। দরজার দিকে পিছন

ফেরা বলিয়া মুখটা দেখা গেল না বটে, তবু তাহার বসিয়া থাকিবার ভঙ্গিটাই যথেষ্ট উদ্বেগজনক। ভূপেন আশা করিয়াছিল, তাহার পদশব্দে কল্যাণী নিজেই মুখ তুলিয়া চাহিবে কিন্তু মিনিট দুই দ্বার পথে দাঁড়াইয়া থাকিবার পরও যখন ও-পক্ষ হইতে কোন সাড়া মিলিল না, তখন সে নিজেই ডাকিল, কল্যাণী!

কল্যাণী যেন সে ডাকে একবার শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু মাথাও তুলিল না কিংবা সাড়াও দিল না।

ভূপেন পুনশ্চ ডাকিল, কী হয়েছে কল্যাণী?

তবুও কোন সাড়া নেই।

এতক্ষণে ভূপেনের সন্দেহ হইল যে কল্যাণী নিঃশব্দে কাঁদিতেছে। সে তখন জুতা খুলিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পিছন হইতে জোর করিয়া তাহার মুখখানা তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিল। দেখিল, তাহার অনুমানই ঠিক, বহুক্ষণ রোদনের ফলে কল্যাণীর শীর্ণ মুখখানি প্লাবিত হইয়া বুকের আঁচল পর্যন্ত অনেকখানি ভিজিয়া উঠিয়াছে। এতখানি বেদনার কি এমন কারণ ঘটিতে পারে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কতকটা হতভম্বের মতই ভূপেন প্রশ্ন করিল, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না কল্যাণী, কি হয়েছে বলবে না? কোন বিপদ-আপদের খবর এসেছে কি?

কল্যাণী যেন কি একটা উত্তর দিতে গেল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহার কণ্ঠ ভেদিয়া কোন স্বরই বাহির হইল না, বরং এই চেষ্টাতেই সে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। অকস্মাৎ সেই মেঝের উপরই লুটাইয়া পড়িয়া ভূপেনের দুই পায়ের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া আকুলভাবে কাঁদিয়া উঠিল।

ভূপেন বিষম বিব্রত হইয়া উঠিল; কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবে বুঝিতে না পারিয়া বলিতে লাগিল, ছি, ছি, কল্যাণী, লক্ষ্মীটি, অমন ক'রে কাঁদে না। তুমি ত অত দুর্বল নও, তুমি এমন ছেলেমানুষি করলে চলে কি ক'রে? বলো আমায় কি হয়েছে—খুলে না বললে যে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। ওঠো, লক্ষ্মীটি ওঠো—

অনেকক্ষণ পরে, বোধ হয় নিজেকে কতকটা সামলাইয়া লইয়া কল্যাণী উঠিয়া বসিল বটে কিন্তু একটি কথাও কহিতে পারিল না, মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিতে বিজয়বাবু যেদিকে বসিয়া ছিলেন, বাহিরের সেই দিকটা শুধু দেখাইয়া দিল।

ভূপেনও তাহার অবস্থা বুঝিয়া আর পীড়াপীড়ি করিল না, সান্ত্বনা দিবারও বৃথা চেষ্টা করিল না, ফিরিয়া আসিয়া বিজয়বাবুরই চৌকিতে বসিয়া পড়িয়া কহিল, ব্যাপার কি বলুন ত? কি হয়েছে? কল্যাণী ছেলেমানুষ, সে বলতে পারলে না, কিন্তু আপনিও যদি ইতস্ততঃ করেন তাহলে চলে কি ক'রে?

তবুও বিজয়বাবু খানিকক্ষণ চুপ করিয়াই রহিলেন ; তারপর ধীরে ধীরে কহিলেন, ভাই, এ কথাটা মুখ দিয়া উচ্চারণ করবার আগে মৃত্যু হওয়াই ভাল ছিল বোধ হয়, কিন্তু তাঁর ইচ্ছাই বড়, তিনি মৃত্যু না দিলে ত মরতে পারব না !

তারপর আর একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি কহিলেন, তোমার কাছ থেকে আর কোন সাহায্য নেওয়া ভাই আমাদের সম্ভব হবে না। এতে আমাদের ব্যক্তিগত ক্ষতি যা হচ্ছে সে আশঙ্কার চেয়ে বড় আশঙ্কা আমার এই যে, তুমি আমাদের কত না অকৃতজ্ঞ ভাববে কিন্তু তবু এইটেই বলতে হ'ল।

ভূপেন কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। খাটা যে এই দিক ঘেঁষিয়া যাইবে তাহা সে কল্পনাও করে নাই। তাহার অপরাধী অন্তরে একটা কথা বার বার উঁকি মারিতে লাগিল, তবে কি সে-রাত্রের কথাটাই কোনমতে বিজয়বাবু জানিতে পারিয়াছেন ? সে মুহূর্ত-কয়েক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু কেন তাও কি আমাকে বলতে পারবেন না ? মনে হচ্ছে অন্যায়টা আমারই—অপরাধীর অপরাধের কথাটা না জানিয়ে শাস্তি দেওয়াটা কি উচিত ?

—ছি ছি ! বিজয়বাবু ব্যাকুল ভাবে সোজা হইয়া বসিলেন, ও-কথা বলতে নেই ভাই। তোমার পক্ষে যে কোন অপরাধ করা সম্ভব নয় তা আমার চেয়ে বেশী কেউ জানে না।...সে বড় নোংরা কথা ব'লেই বলতে চাই নি—যাঁরা বলেছেন তাঁরা হয়ত সত্য ব'লে বিশ্বাস করেন ব'লেই বলেছেন, তবু সে কথাটা নোংরাই।...পাড়ায় নাকি কথা উঠেছে—পাড়ায় কেন সমস্ত গ্রামেই—যে আমি, আমার কন্যাকে বেচে খাচ্ছি ! এর চেয়ে মৃত্যু যে অনেক ভাল ভাই !

অসহায়ভাবে অন্ধ চোখ দুইটি মেলিয়া বিজয়বাবু চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার দুই চোখের কোল বাহিয়া টস্ টস্ করিয়া জলে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। খানিকক্ষণ পরে, যেন চুপি চুপি কহিলেন, আমার জন্য ভাবি না, এমন কি কল্যাণীর জন্যেও না—কিন্তু তোমার মত দেবতার গায়েও যদি কালি লাগে ত সইব কেমন ক'রে ? তোমার সাহায্যের যদি এই কদর্থ হয়—। শুনেছি আমার সহকর্মীরাও এই কথা বিশ্বাস করেন, কেমন ক'রে তা সম্ভব হ'ল তাই ভাবছি।

তাঁহার ভগ্ন-কণ্ঠ যেন একেবারেই বুজিয়া আসিল, কিন্তু ভূপেনও কোন কথা কহিতে পারিল না। শুধু পায়ের যেখানটা তখনও কল্যাণীর অশ্রুতে ভিজা, সেখানটায় যেন একটু বেশী রকমের হিম হিম বোধ হইতে লাগিল। এসব কথা কাহাকেও বলিবার নয়, অন্য লোকে কল্পনা পর্যন্ত করিতে পারিবে না, কিন্তু কল্যাণীর এই কান্নার সম্পূর্ণ অর্থটা তাহার বোধগম্য হইয়া ভূপেনকে কিছুক্ষণের

জন্য যেন জড়, অনড় করিয়া দিয়া গেল।

সে বহুক্ষণ আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবার পর কোনমতে শুধু প্রশ্ন করিল, আচ্ছা আমি যদি নিজে আর না আসি, অন্য কোন লোক মারফৎ কিছু পাঠাই তা'হলেও কি নিতে পারেন না?

অতি শান্ত কণ্ঠে বিজয়বাবু উত্তর দিলেন, না ভাই, তাতে ক'রে আমি তোমার কাছে নিজেকে অপরাধী বোধ করব। সেটা অন্যায় হবে।

একবার ভূপেনের মনে হইল, সে প্রশ্ন করে, তাহলে উপায়? কিন্তু পরক্ষণেই সে প্রশ্নের মূঢ়তাটা নিজের কাছেই ধরা পড়িয়া যাওয়াতে লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া গেল। বিজয়বাবু নিশ্চিন্ত হইয়া ভগবানকে দেখাইয়া দিবেন।

আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া সে এক সময়ে উঠিয়া পড়িল।

১২

এত তাড়াতাড়ি এমন একটা সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে, তাহা ভূপেন একবারও ভাবে নাই। বিজয়বাবু ঈশ্বরের উপর বরাত দিয়া যতটা সহজে নিশ্চিন্ত হইলেন, ততটা সহজে সে নিশ্চিন্ত হইতে পারে কৈ? প্রায় সওয়া একমাস ইঁহাদের ঘরে বাস করিয়া দারিদ্র্য ও অভাবের যে চেহারাটা সে দেখিয়াছে, তাহার পরও চুপ করিয়া বসিয়া থাকা আর ইচ্ছা-পূর্বক মৃত্যুর মধ্যে ঠেলিয়া দেওয়া একই ব্যাপার। এক-একবার সে মনকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে, সে ত কল্যাণীদের কেহ হয় না। সেও যেমন অপ্রত্যাশিত ভাবে আসিয়া পড়িয়াছে, তেমনি ভাবেই হয়ত আর কেহ আসিয়া পড়িবে, ভগবান কাহার মারফৎ কখন কি সাহায্য পাঠান তা কে বলিতে পারে? কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ হয়—কেমন যেন সর্বদা নিজেকে অপরাধী বলিয়া মনে হয়। রোরুদ্যমান সেই শীর্ণ মুখে সেদিন যদি কোন অভিযোগ থাকিত, কোন ভৎর্সনা থাকিত কিংবা কোন আশাও থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয় ভূপেনকে এতটা চঞ্চল করিতে পারিত না। অভিযোগের মধ্যে যে আশাভঙ্গের কথাটা আছে সেটুকু আশাও সে মেয়েটি রাখে না, সে জানে এটা কত অসম্ভব। ভূপেন তাহাকে লইয়া যদি আরও খানিকটা খেলা করিত তাহা হইলেও বোধ হয় কল্যাণীর মনে অন্য কোন সম্ভাবনা, কোন আশা দেখা দিত না; সে জানে এ আশা তাহার অন্যায়, এ কল্পনাও অসম্ভব। ভূপেন অনেক উঁচুতে, ভূপেন অনেক সুদূর—কল্যাণীর মত মেয়ের কোন তপস্যাই তাহাকে কোন দিন ধরিতে পারিবে না।…তাই সেদিন তাহার চোখে শুধু নিরতিশয় বেদনা ও দুঃখেরই একটা

মর্মান্তিক অভিব্যক্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সেই দুঃখই সে শুধু নিবেদন করিয়াছিল ভূপেনের পায়ে মাথা রাখিয়া—অবোধ, মূক এক প্রকারের দুঃখ, যাহা প্রতিকার খোঁজে না, দেবতার পায়ে নিবেদিত হইয়া নিশ্চিন্ত হয়।

উপায় অবশ্য আছে একটা। এই দুর্নামটাকে স্বীকার করিয়া লইয়া মেয়েটিকে বিবাহ করিলে কোন কথাই কাহারও বলিবার থাকে না।

কিন্তু বিবাহ করা? এখন? ঐ মেয়েটিকে?

তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা বলিয়া ওঠে—না, না, এ অসম্ভব! এ কখনও হইতে পারে না। এত তাড়াতাড়ি এ বন্ধন সে মানিয়া লইতে পারিবে না।

একদিন শিক্ষকতার কাজ সে লইয়াছিল নিতান্তই সাময়িক ভাবে, উন্নতির পথে সোপান হিসাবে, কিন্তু আজ তাহার দৃষ্টিভঙ্গী বদলাইয়াছে, আজ বুঝিয়াছে যে ঈশ্বর বা অদৃষ্ট—যদি ঐ রকম কোন একটা শক্তি থাকে ত সেই শক্তিই তাহাকে এখানে আনিয়া ফেলিয়াছেন কোন বৃহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই। তাহার দেশের, তাহার জাতির যত কিছু দৈন্য, যত কিছু ত্রুটির মূল কারণটা সে বুঝিতে পারিয়াছে, আসল গলদটা আর তাহার অজানা নাই। সেই ত্রুটি, সেই গলদ, জাতির যত কিছু অপমান ও দুঃখের সেই মূল কারণ দূর করাকেই সে তাহার জীবনের ব্রত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে। হয়ত তাহার একার পক্ষে এ দুরূহ ব্রত উদ্‌যাপন করা সম্ভব হইবে না—তবু যদি সে কিছুটাও করিয়া যাইতে পারে ত জীবন সার্থক হইয়া যাইবে। সাধারণ ভাবে বাঁচা ও সাধারণ ভাবে মরার অর্থ সে কোনও দিনই খুঁজিয়া পায় না। ছেলেবেলায় স্বপ্ন ছিল অন্য—খুব বড়লোক হইবে সে—হয় প্রকাণ্ড ব্যবসায়ী নয়ত মহান্ দেশনেতা। ঐশ্বর্য ও যশ, এই ছিল তাহার স্বপ্নের চরম কথা। কিন্তু আজ সে ভাবে, যদি একটি ছেলেকেও সে মানুষ করিয়া তুলিতে পারে—একটি ছেলেকেও যদি সে বুঝাইয়া দিতে পারে প্রকৃত শিক্ষা কি, মানুষের জীবনে আত্মসম্মান-বোধের মূল্য কতটা, আর পরাধীন দাস-জাতির আত্মসম্মান-জ্ঞান কী—তাহা হইলেই তাহার জীবন সার্থক হইয়া যাইবে। কারণ সেই যে একটি ছাত্র তৈয়ারী হইবে—সেই ত বীজ, আবার কত বীজের সম্ভাবনা সেই একটি মাত্র বীজ বহন করিবে।

কিন্তু সে তপস্যার মধ্যে বিবাহ, ঘরকন্না করা—বাসা বাঁধিবার স্থান কোথায়? দরিদ্রের সংসার মানেই ত পাপ। 'পাপের দুয়ারে পাপ সহায় মাগিছে'। এক পাপই ত অন্য পাপ ডাকিয়া আনে। একটা দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতা, একটা আত্ম-অবমাননা মানুষকে আর একটার মধ্যে নিক্ষেপ করে। একা একটা লোক সব কিছু সহ্য করিতে পারে কিন্তু স্ত্রী-পুত্র-কন্যার দুঃখ দেখা অত্যন্ত কঠিন, তাহা সে নিজে

বিবাহ না করিয়াও বুঝিতে শিখিয়াছে। তাছাড়া তাহার বাবা আছেন, মা আছেন, অবিবাহিতা বোনেরা আছে—সংসারের প্রতি এমনিই অনেক কর্তব্য আছে তাহার। সে সব ত কিছু কিছু করিতেই হইবে। আবার নিজের সংসারের বোঝা বহন করা—

না, না, সে হয় না। সংসারে দুঃখ-কষ্ট আছেই। এমন হয়ত কত পরিবারেই ঘটিতেছে। কোন একটি দরিদ্র পরিবারের অভাব মোচনের জন্য নিজেকে সে চিরকালের মত অভাবের মধ্যে, দারিদ্র্যের মধ্যে ফেলিতে পারিবে না। দুটি কি তিনটি মানুষের জন্য সে নিজের তপস্যাকে নষ্ট করিতে পারিবে না। কল্যাণীদের দুঃখ সহিতে হয়—উপায় কি? তাহার জীবনের উদ্দেশ্য, তাহার ব্রত আরও অনেক বড়। এই বিশেষ দুটি-তিনটি লোকের কষ্টের কথা ভুলিলে হয়ত পৃথিবীর আরও বহু লোকের দুঃখ-কষ্ট সে দূর করিতে পারিবে।

কিন্তু প্রতিজ্ঞা যত বড়ই হোক—শেষ পর্যন্ত তাহা পালন করা কষ্টকর হইয়া ওঠে। কথাটা কাঁটার মতই অহোরাত্র মনের মধ্যে খচ্‌খচ্‌ করিতে থাকে। আর হয়ত কয়টা দিন, চার-পাঁচদিন বাদেই সকলের উপবাস শুরু হইবে—এই কথাটা যখনই মনে পড়ে, তখনই তাহাদের সব কয়জনের সেবাযত্নের স্মৃতিটা মনে পড়িয়া মুখের মধ্যেকার আহার্য বিষাইয়া ওঠে, বহু রাত্রি পর্যন্ত চোখের পাতায় তন্দ্রা নামে না। বিশেষ করিয়া কল্যাণী, তাহার সেই সজাগ সতর্ক সেবা ও অতন্দ্র মনোযোগ বারবার ভূপেনকে উন্মনা করিয়া তোলে। তখন মনে হয়—মনুষ্যত্বের এত বড় অপমান করিয়া সে কী মানুষ গড়িয়া তুলিবার স্বপ্ন দেখে? সে যা করিতে চাহিতেছে আজ, তাহাকেই ত বলে পলায়নী-বৃত্তি, যা তাহার অসংখ্য দেশবাসী প্রতিদিনই অবলম্বন বলিয়া ধরিতেছে। নিজের কর্তব্য পালনের জন্য সে যদি কোন স্বার্থত্যাগ করিতে না পারে ত অপরকে স্বার্থত্যাগের কথা শিখাইতে যাইবে কোন্ লজ্জায়!...

এমনি দ্বিধার মধ্যে তাহার দিন এবং রাত্রি কাটে। না পারে মন স্থির করিতে, না পারে মন হইতে কথাটা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিতে। সব সময়েই সে অন্যমনস্ক থাকে, ছাত্ররা প্রশ্ন করিয়া কথার জবাব পায় না, শিক্ষকরা বিদ্রূপ করেন।

অথচ দিনের পর দিন সংবাদ আসিয়া পৌঁছায়—পাড়ার লোক কিছু কিছু ভিক্ষা দেয় তবে বিজয়বাবুদের সংসারে মধ্যে মধ্যে হাঁড়ি চড়ে।...রাগ হয় তাহার অপূর্ববাবুদের দলের উপর কিন্তু নিষ্ফল ক্রোধে নিজেরই অন্তর তিক্ততায় ভরিয়া ওঠে—অপূর্ববাবুদের কোন ক্ষতি হয় না তাহাতে।

এমনি করিয়া অন্তরে অন্তরে ক্ষত-বিক্ষত হইতে হইতে সহসা একদিন ভূপেন আবিষ্কার করিল যে শুধুই পরোপকার প্রবৃত্তি নয়, তাহার এই অশান্তির মধ্যে আর একটা বড় রকমের শূন্যতা-বোধ আছে—সে সম্বন্ধে এতদিন সে, কতকটা জোর করিয়াই, নিজেকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে। আজ সে নিজের কাছে স্বীকার করিতে বাধ্য হইল যে ইতিমধ্যেই ঐ রূপহীনা, শীর্ণা মেয়েটি তাহার মনের অনেকখানি দখল করিয়া বসিয়াছে। শেষের দিকে বিজয়বাবুদের বাড়ি সে শুধু বিজয়বাবুর জন্যই যাইত না এবং ছেলেমেয়েদের প্রতি তাহায় অপক্ষপাত স্নেহও ছিল না। টান তাহার সব চেয়ে বেশী ছিল কল্যাণীর উপরই তাহার কথা, তাহার সেবা, তাহার শ্রদ্ধা ও প্রীতি নেশার মতই তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। যে ঘটনাকে সে এতদিন নিতান্তই আকস্মিক বলিয়া মনে করিয়া অনুতপ্ত হইতেছিল, তাহার ভিতরে মনের অবচেতন গহ্বর হইতে একটা অনুমোদন ছিলই।

সত্যটা অনুভব করিবার সঙ্গে-সঙ্গেই লজ্জায় ভয়ে সে যেন মুষড়াইয়া পড়িল। ছি! ছি! এ কী দুর্বলতা তাহার—এত ছোট, এত সাধারণ সে? সব চেয়ে আঘাত লাগিল তাহার এইখানটায়—তাহার আত্মসম্মানে। এতদিন যে ধারণা ছিল সে অসাধারণ, সে বিশু বা তাহার আর পাঁচজন সহপাঠীদের মত নয়—এইবার সেই ভুলটা ভাঙিতেই সে যেন মর্মান্তিক লজ্জা পাইল। তাহা হইলে সে-ও এই?

তবু শেষ পর্যন্ত সত্যকে স্বীকার করিতেই হয়। সত্য যখন এমনি করিয়া স্ব-মহিমায় প্রকাশ পায়, তখন বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু তার আগে ঘটনাটা গোড়া হইতেই বলা দরকার।

আহারাদির যে ব্যবস্থাই হউক, রাখুদের সব কয়জনকেই সেক্রেটারী ইস্কুলে ফ্রী করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া পড়াশুনাটা তাহাদের বন্ধ হয় নাই। তাহারা নিয়মিতই আসিত, যদিচ ভূপেন সেদিন চলিয়া আসার পর হইতে আর কোন দিনই তাহাদের ডাকিয়া কোন কুশল প্রশ্ন করে নাই। সেটা করে নাই কোন রাগ বা অভিমানে নয়—অনর্থক বলিয়া। তাহাদের চেহারার ক্রমবর্ধমান শীর্ণতা ও মুখের অপরিসীম শুষ্কতাতেই সে যা জানিতে চায় তাহা প্রকাশ পাইত, সুতরাং অনর্থক প্রশ্ন করিয়া লাভ কি? কোন প্রতিকার যখন সে করিতে পারিবে না তখন দুঃখের সংবাদটা জানিয়া শুধু মন-খারাপ করার প্রয়োজন নাই।

কিন্তু সেদিন কি জানি কেন ভূপেন কিছুতেই নিজেকে সংযত করিতে পারিল না। ইস্কুলের ছুটির পরই দ্রুতপদে গিয়া মাঠটার বাঁকে দাঁড়াইয়া রহিল, এই পথেই রাখুদের যাইতে হইবে—এইখানে দেখা করাই নিরাপদ।

রাখুকে ডাকিতে সে শান্ত মুখে কাছে আসিল। ছেলেটি বরাবরই একটু বেশী

শান্ত, এখন যেন সে ভাবটা আরও বাড়িয়াছে। তবু সে যে খুশী হইয়াছে সেটা তাহার দৃষ্টিতেই বোঝা গেল। কিন্তু ভূপেনের প্রধান সমস্যা হইল, কেমন করিয়া এই বালকের কাছে কথাটা পাড়িবে ; অনেক ইতস্তত করিয়া, কতকগুলা নিরর্থক কুশল প্রশ্নের পর এক সময়ে সে প্রায় মরীয়া হইয়াই বলিয়া ফেলিল, আচ্ছা, শুনেছিলুম মহেশবাবু ইস্কুল থেকে কিছু কিছু সাহায্য দেবার চেষ্টা করছেন, কিছু করেছেন কি ?

নতমুখে রাখু জবাব দিল, এই মাস থেকে দশটা ক'রে টাকা পাওয়া যাবে।

—মাত্র দশ টাকা !

ভূপেন কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর শুধু প্রশ্ন করিল, কিন্তু তাতেই ত চলবে না, আর কি উপায় হচ্ছে ?

রাখুও একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, দিদি বাড়িতেই একটা পাঠশালা বসাবার চেষ্টা করেছিল—ভেবেছিল অ আ শেখাবে, যা দু-এক আনা পাওয়া যায় —কিন্তু সে সুবিধে হয় নি। এখন—ঐ ডাক্তারবাবুর স্ত্রী আর শালী দু'জনেরই শরীর খারাপ বলে দিদি ওঁদের রান্না ক'রে দিয়ে আসে ; উনি দশ সের চাল পাঠিয়ে দিয়েছেন সেদিন, আর তিন টাকা ক'রে দেবেন বলেছেন।

কথা কয়টা চাবুকের মতই আঘাত করিল ভূপেনকে। কল্যাণী রাঁধুনীর কাজ লইয়াছে ! পরের বাড়ি তিন টাকা বেতনে দাসীবৃত্তি করিতেছে !

অথচ আর কী-ই বা সে করিতে পারিত ? আর ত কোথাও কোন পথ খোলা নাই !

রাখুকে বিদায় দিয়া সেদিন বহু রাত্রি পর্যন্ত ভূপেন মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইল। দেশের আর পাঁচজন দরিদ্র সাধারণ মানুষের মতই কল্যাণীর চিন্তা যে সহজে মন হইতে নামাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে না, এই কথাটা সেই দিনই প্রথম সে নিজের মনের কাছে মানিতে বাধ্য হইল। কিন্তু প্রতিকারের পথ কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না—যে একমাত্র পথ খোলা আছে সেটাকে বাছিয়া লইতে গেলে নিজের সমস্ত আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জন দিতে হয়—চিরকালের মতই ভবিষ্যৎকে বাঁধা দিতে হয়। তা ছাড়া তাহার কী-ই বা বয়স এতগুলি অনূঢ়া ভগ্নী থাকিতে এই বয়সে বিবাহ করিলে লোকেই বা কি বলিবে ? সে যে এখানে জড়াইয়া পড়িয়াছে, বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছে, এমনি একটা বিশ্রী ইঙ্গিত উঠিবে না কি ? কথাটা যে সে রকম কিছু নয়, এ কথা খুব অন্তরঙ্গ বন্ধুর পক্ষেও বিশ্বাস করা কঠিন হইবে। এমন কি, এই সমস্ত গোলমালের মূলে যে, সেই অপূর্ববাবুর দলও তাঁহাদের মিথ্যা অপবাদকে সত্য প্রমাণ করিয়া লোকের কাছে

বাহবা লইবেন।

এমনি করিয়া মনে মনে শুধু আলোচনাই করে ভূপেন, কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারে না। শুধু ভাবিয়া ভাবিয়া ক্লান্ত ও উত্ত্যক্ত হইয়া ওঠে। অবশেষে রাখুর সহিত দেখা হইবারও দিন পাঁচেক পরে সহসা একদিন সে স্কুলের ছুটির পর আবার বিজয়বাবুদের বাড়ির পথ ধরিল। বিশেষ কিছু ভাবিয়া নয়—এমনিই, হয়ত অপূর্ববাবুর দলকে উপেক্ষা করাও একটা উদ্দেশ্য ছিল কিংবা কোন রকম মনস্থির করিবার পূর্বে আর একবার কল্যাণীর সঙ্গে দেখা হওয়া—

বিজয়বাবু তাহাকে আশা করেন নাই, তবু খুশী হইলেন, একটু লজ্জিতও হইলেন। আন্দাজে আন্দাজে দুইটা হাত বাড়াইয়া দিয়া টানিয়া কাছে বসাইলেন, কিন্তু কুশল প্রশ্ন ছাড়া একটিও কথা কহিতে পারিলেন না। অপরে কুৎসা রটাইয়াছে সে অপরাধও যেন তাঁহার—এমনি মনের ভাব তাঁর!

কথার ফাঁকে ফাঁকে ভূপেন চারিদিকে চোখ বুলাইল। বিজয়বাবু ছেলেমেয়েদের চেয়েও কৃশ হইয়া গিয়াছেন। জিনিসপত্র এমনিতেই কম ছিল, এখন যেন কিছুই নাই—এমন কি ঘরের মধ্যেকার কাঁঠাল কাঠের ভারী চৌকিটা পর্যন্ত অন্তর্হিত হইয়াছে।

একটু পরে বিজয়বাবু ঘরে গিয়া সান্ধ্য-পূজায় বসিলে কল্যাণী নিঃশব্দে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ভূপেন অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতে পারিল না—দৃষ্টি তাহার পায়ের কাছাকাছি মাটির উপরই স্থির হইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে কল্যাণীই প্রশ্ন করিল, ভালো আছেন?

—হ্যাঁ। কোনমতে জবাব দিল ভূপেন।

তারপর একটু ইতস্তত করিয়া, যেন চুপি চুপি প্রশ্ন করিল, তুমি কি ওঁদের বাড়ি সেরে এসেছ?

—না।

একটু বিস্মিত হইয়া ভূপেন বলিল, তবে কি এখন আবার যেতে হবে? এই সন্ধ্যাবেলা?

কল্যাণী মুহূর্তকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, না আর যেতে হবে না। আমি ওঁদের বাড়ির কাজ ছেড়ে দিয়েছি।

'কাজ ছেড়ে দিয়েছি' কথাটা যেন নূতন করিয়া আঘাত করিল ভূপেনকে, তবু কতকটা অন্যমনস্কভাবেই সে কহিল, ওখানে আর যাও না তুমি? কেন?

আবারও উত্তর দিতে সময় লাগিল কল্যাণীর। সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকারেও মনে হইল যেন সে শিহরিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ পরে, বোধ হয় বহু চেষ্টার পর কণ্ঠস্বর

সহজ করিয়া লইয়া সে জবাব দিল, সে কথা আপনার কাছে বলতে পারব না।

সে আর দাঁড়াইল না, যেন এইটুকু বলিয়া ফেলিয়াই লজ্জায় মরিয়া যাইতে-ছিল। কি একটা কাজের অছিলায় দ্রুতপদে রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

কল্যাণীর কম্পিত কণ্ঠের এই কয়টি শব্দ ক্ষণকালের জন্য তাহার সমস্ত দেহে যে আগুন ছড়াইয়া দিয়া গেল, তাহাতেই ভূপেন কল্যাণী সম্বন্ধে তাহার মনোভাব স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিল। ফলে তাহার লজ্জা ও আত্মধিক্কারের যেমন অবধি রহিল না, তেমনি তাহার কর্তব্য-পথও স্থির হইয়া গেল। সারারাত্রি জাগিয়া কাটাইবার পর মন ঠিক করিয়া ভোরের দিকে উঠিয়া সে মাকে চিঠি লিখিতে বসিল। পূর্বাপর সমস্ত কথা জানাইয়া, বিজয়বাবু সম্বন্ধে বহু উচ্ছ্বাস করিয়া ধীরে ধীরে জমিটা তৈয়ারী করিয়া লইল, তবু শেষ পর্যন্ত আসল বক্তব্যে পৌঁছিয়া কলম কাঁপিতে লাগিল। তাহার বাবা-মা তাহার সম্বন্ধে কত আশা পোষণ করিতেন তাহা সে জানে। এই রকম কিম্ভূতকিমাকার বিবাহে তাঁহাদের কতখানি আশাভঙ্গ হইবে তা ভূপেনের চেয়ে বেশী বোধ হয় কেহই বুঝিবে না। শুধু যে কন্যা রূপসী নয় বা সে মোটা যৌতুক হইতে বঞ্চিত হইল তাহাও নহে—বধূ শ্বশুরঘর করিতেও যাইতে পারিবে না, অন্ধ বিজয়বাবু ও ছেলে-মেয়েগুলির ভার কাহারও উপর দেওয়া চলিবে না, অন্ততঃ কল্যাণী এ অবস্থায় তাহার বাবাকে ফেলিয়া স্বর্গেও যাইবে না এটা ঠিক। সুতরাং রাখু বিবাহ করিয়া স্ত্রী-পুত্র-সংসার প্রতিপালন করিবার যোগ্যতা অর্জন না করা পর্যন্ত কল্যাণীকে এখান হইতে কোথাও লইয়া যাওয়া সম্ভব হইবে না।

যাই হোক—তবু শেষ পর্যন্ত সে চিঠি শেষ করিল। মোহিতবাবুর কাছে তাহার শিক্ষা—কর্তব্যকে এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা সে কখনও করিবে না। চিঠি খামে আঁটিয়া, ঠিকানা লিখিয়া সে অত ভোরেই বাহির হইয়া পড়িল এবং পাছে কোন রকম মানসিক দুর্বলতায় পরে আবার মত পরিবর্তন করিবার আশঙ্কা দেখা দেয়, এই জন্য তখনই ডাকবাক্সে চিঠিটা ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

নিজের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে সে নিশ্চিন্ত হইল বটে কিন্তু নিজের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারে কৈ?

বিনিদ্র রজনীর সমস্ত তাপ ও ক্লান্তি চোখের পাতায় বহন করিয়া সে মাঠের পর মাঠ ভাঙ্গিয়া চলিল সোজা পূর্ব দিক লক্ষ্য করিয়া। মনে কত ঝড় বহিতেছে তাহার যেন সীমা-পরিসীমা নাই। এক-একবার সমস্ত ব্যাপারের উপর বিরক্ত হইয়া ওঠে। মনে হয় এ সমস্তই কোন অদৃশ্য শক্তির চক্রান্ত। নিজের উপরও রাগ তখন কম হয় না—কী প্রয়োজন ছিল বিজয়বাবুদের সহিত এত

অন্তরঙ্গতা করার! এ বোঝা কেবলমাত্র তাহারই, এমন ভাব দেখানোরই বা কি এমন মাথা-ব্যথা পড়িয়া গিয়াছিল! বিজয়বাবু তাহার কে?

আবার এক সময়ে সেই ভগবদ্ভক্ত নিরীহ মানুষটির কথা মনে পড়িয়া মন স্নিগ্ধ হইয়া আসে। না, অনুতাপের কোন কারণ নাই। নাই বা গেল তাহার জীবনের স্রোত স্বচ্ছন্দ-গতিতে। তাহার অদৃষ্ট হাত ধরিয়া তাহাকে যে বিচিত্র পথে লইয়া যাইতেছে সেই পথেরই অভিজ্ঞতা থাক্ তাহার অন্তর ভরিয়া—

আচ্ছা, কল্যাণীকে কি সে ভালবাসে?

এ প্রশ্ন যেন নিজের কাছে করিতেও ভয় হয়। হয়ত ভালবাসা নয়। তাহার সেবা, তাহার ঐকান্তিকতা, তাহার চরিত্রের মাধুর্য ভূপেনকে মুগ্ধ করিয়াছে। তাহার কাছে গেলে ভাল লাগে, সে কষ্ট পাইতেছে মনে হইলে নিজেরও বেদনা-বোধ হয়—এই পর্যন্ত। কিন্তু ভালবাসাতে যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকে, কামনার সে অসহ তীব্রতা তাহার কৈ কল্যাণী সম্বন্ধে? তবে কি সে একটা মস্ত ভুলই করিতেছে? কোন স্ত্রীলোকের সহিত সারা জীবন কাটাইতেছে সে, এটা কল্পনা করিতে গেলেই যে রকম স্ত্রীলোকের কথা তাহার মনে হয়, অন্তরের সেই মানসীর সঙ্গে যেন সন্ধ্যার অনেকটা মিল আছে। সেই উৎসাহ, শিক্ষা সম্বন্ধে সেই শ্রদ্ধা আর সেই আশ্চর্য চোখ দুটি—

না, সন্ধ্যার কথা থাক।

সন্ধ্যা ধনী-দুহিতা, সন্ধ্যা সুদূর। সন্ধ্যা তাহার জীবনে শুধুই একটা অতৃপ্তি, একটা উচ্চাশার অভিশাপ! তাছাড়া সন্ধ্যা তাহার ছাত্রী, তাহার স্নেহের, আশীর্বাদের পাত্রী। সন্ধ্যা সম্বন্ধে কোন কলুষিত চিন্তা যেন মনে কখনও স্থান না পায়। তাহার আত্মার একমাত্র আনন্দ, দুর্দিনের একমাত্র আশ্রয়। হয়ত জীবনে আর তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা হইবে না—দু'জনের জীবনের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র দু'জনকে চিরকালের মতই বিচ্ছিন্ন ও দূরবর্তী করিয়া রাখিবে, তবু তাহার সম্বন্ধে চিন্তাটাও পবিত্র থাক। স্মৃতির মধ্যেও যেন একটা স্নিগ্ধতা, একটা আনন্দ মেলে!

হ্যাঁ—সন্ধ্যার কথা থাক্।

কল্যাণী সম্বন্ধে হয়ত ঠিক তেমন করিয়া ভাবা যায় না এখন। কিন্তু হিন্দুর ঘরে কোন্ স্বামীই বা স্ত্রীকে বিবাহের পূর্ব হইতেই কামনার সহিত কল্পনা করে? আমাদের দেশে বিবাহটা আগে, ভালবাসাটা পরে। কল্যাণীর সম্বন্ধেও সেই নিরানব্বইটি বিবাহের কথাই খাটিবে—হয়ত একদিন তাহার সম্বন্ধেও আকাঙ্ক্ষা ভূপেনের তীব্র হইয়া উঠিবে।

অন্ততঃ কল্যাণীকে লইয়া সে অসুখী হইবে না, এটা ঠিক। স্ত্রী স্বামীর মানসী

যদি বা না-ই হয়, ক্ষতি কি? গৃহিণী হইলেই চলিবে।

ভূপেন একরকম জোর করিয়াই মন হইতে সমস্ত দুশ্চিন্তা ও দ্বিধা সরাইয়া ফেলিল। কর্তব্য যখন স্থির করিয়া ফেলিয়াছে তখন আর এসব ভাবিয়া লাভ নাই। জীবনের পথ যে তাহার সুখের নয় তাহা ত আগেই বোঝা গিয়াছে।

সে হোস্টেলের পথ ধরিল, মনে মনে রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে।

আর সে কোন কথা ভাবিবে না। কিছুতে না।

বাড়ি হইতে চিঠি আসিল একদিন পরেই, বাবা ও মার পৃথক চিঠি।

মার চোখের জলে চিঠির কাগজ বার বার ভিজিয়া উঠিয়াছে—তাহার চিহ্ন স্পষ্ট। ওখানকার ডাইনী মেয়েটা যে ভূপেনকে 'গুণ' করিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই—নহিলে সে এমন কথা লিখিতে পারিল কি করিয়া? লোকটার চোখের মাথা খাইয়াও কি লজ্জা হয় নাই? মহাপাপ না থাকিলে এমন রোগ হয় না! আবারও মহাপাপে লিপ্ত হইতেছে কোন্ সাহসে? তাঁহার বাছাকে এই ভাবে ভুলাইয়া এত বড় সর্বনাশ করিতে তাহাদের বুক কাঁপিতেছে না? তাঁহার মাথার দিব্য রহিল—ভূপেন যেন পত্রপাঠ চাকরিটা ছাড়িয়া দিয়া ঐ ডাইনীদের সংস্পর্শ কাটাইয়া চলিয়া আসে। যদি এমনি না আসিতে পারে ত মায়ের অসুখ বলিয়া দুই দিনের ছুটিতে যেন বাড়ি আসে, তারপর এখান হইতে চাকরিটা ছাড়িয়া দিলেই চলিবে। পাত্রী তাঁহার হাতে ভালই আছে, যেমন রূপসী, তেমনি শান্ত। পয়সা-কড়িও কিছু দিবে। ভূপেনের যদি এতই বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে ত সে একটা মুখের কথা বলে নাই কেন? বাপ-মার কথা যদি সে নাও ভাবে, ছোট বোনগুলার কথা কি তাহার একবার মনে পড়িল না? ঐ মেয়েটার ছলাকলা ত দু'দিনের, তাহাতেই সে সব ভুলিয়া গেল—তাঁহাদের এত দিনের স্নেহ, এত যত্ন? আবারও মাথার দিব্য রহিল, সে যেন পত্র-পাঠ এখানে আসে। ইত্যাদি—

উপেনবাবুর চিঠি এতটা করুণ-রসাত্মক নয়, বরং তাহার বিপরীত। তিনি তাহাকে প্রথমেই কুলাঙ্গার, স্বেচ্ছাচারী, কামুক প্রভৃতি বহু গালাগালি দিয়া শেষে লিখিয়াছেন—

'তোমার যে এত বড় অধঃপতন হবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। এই জন্যেই কি এত কষ্ট ক'রে লেখাপড়া শিখিয়েছিলুম? এর চেয়ে ছেলেবেলা থেকে কোন লোহার কারখানায় ঢুকিয়ে দিলে বোধ হয় আমার বেশী উপকার হ'ত। বাপ-মা,

নিজের বোন এদের প্রতি কর্তব্যের চেয়েও কি তোমার ঐ কর্তব্য বড় হ'ল ? বোনগুলোর এখনও বিয়ে হ'ল না—নিজে বিয়ে ক'রে সংসার নিয়ে জড়িয়ে পড়লে এদের ত কোন উপায়ই হবে না। তুমি আমার একমাত্র ছেলে—সে কথাটা মনে রাখা কি উচিত ছিল না ? এখানে ঐ বড়লোকের মেয়েটাকে এত দিন পড়ালে, যদি তার সঙ্গে জড়াতে পারতে ত বুঝতুম একটা হিল্লে হ'ল। কিন্তু তাতে যে বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হ'ত! তুমি এমন আহাম্মক বাঁদর যে তাকে ফেলে ঐ কেল্‌টি ছুঁড়ির ফাঁদে পা দিলে। যাই হোক—পাগল না হয়ে গেলে এমন অসম্ভব প্রস্তাব কেউ করতে পারত না ; বুঝেছি যে, তারা তোমাকে পাগলই ক'রে দিয়েছে। কিন্তু আমার সম্মতি ত পাবেই না—বিনা অনুমতিতে যদি করো ত আমাদের অভিশাপ মাথায় নিয়েই করবে। তা ছাড়া আমি সহজে ছাড়ব না, তুমি যদি হপ্তা-খানেকের মধ্যে চাকরি ছেড়ে বাড়ি ফিরে না এস, তা হ'লে আমি নিজে গিয়ে ওদের যাচ্ছেতাই অপমান ক'রে আসব এবং তোমার ইস্কুলের কর্তৃপক্ষের কাছেও সব জানিয়ে আসব, যাতে ওখানে আর বাস করতে না হয়।'

চিঠিটা হাতে করিয়া ভূপেন বহুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। বাবা কথাটা মিথ্যা বলেন নাই—বাপ-মা-বোনদের প্রতি কর্তব্যটাই তাহার আগে। অবশ্য সেখানে মাথার উপর বাবা এখনও আছেন, তিনি সক্ষমও। কন্যাগুলি তাঁহার, তাহাদের ভবিষ্যতের দায়িত্বও তাঁহার—ভূপেনের নয়। তবু দরিদ্র পিতাকে যে সাহায্য করা উচিত সে কথাই বা সে অস্বীকার করে কেমন করিয়া ? অথচ এখানেও—

বিভিন্ন এবং বিপরীতমুখী চিন্তা ও কর্তব্য-বুদ্ধির দোটানায় পড়িয়া অনেক ভাবিয়াও সে কূল-কিনারা পাইল না। বাবা তাহার উপর কিছুটা অবিচার করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের বিদ্যা-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা-মতই ভাবিয়া লইয়াছেন, এরূপ অবস্থায় পড়িলে সবাই বোধ হয় এমনিই ভাবিত। তাঁহাদের দোষও দেওয়া যায় না—একমাত্র সন্তানের চিন্তায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠা খুবই স্বাভাবিক।

কিন্তু—কল্যাণী ও বিশেষ করিয়া বিজয়বাবুর কথা যখন মনে পড়ে তখন চঞ্চল না হইয়া পারে না। অমন নিরীহ ও ভগবদ্ভক্ত লোকটিকে সে নিশ্চিত মৃত্যুর হাতে ঠেলিয়া দেয় কি করিয়া ? তিনি অবশ্য ভগবানের উপর বরাত দিয়া বসিয়া আছেন, কিন্তু ভগবান ত নিজে হাতে কিছু দিবেন না, কাহারও না কাহারও হাত দিয়াই দেওয়াইবেন। হয়ত বা তিনি তাহাকেই সেই মাধ্যমিক হিসাবে বাছিয়া লইয়াছেন।

এখানে আসিয়া এম. এ. পরীক্ষার খুব বেশী কিছু হয় নাই সত্য কথা। এত দিন তেমন ইচ্ছাও ছিল না—ভিত্তি হইতে মানুষ গড়া ঢের বেশী প্রয়োজন এটা বুঝিয়া সে নিজেকে উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত ছিল—কিন্তু চেষ্টা করিলে পরীক্ষাটা দেওয়াও এমন কিছু কঠিন হইবে না। এম, এ, পাশ করিলে অন্য ইস্কুলে বেশী মাহিনায় কাজ পাওয়া যাইবে, হয়ত বা হেড-মাস্টারীও জুটিবে। তাহাতে লক্ষ্য-ভ্রষ্ট না হইয়াও কিছু আয় বাড়ানো যাইতে পারে। তাছাড়া, সে ভাবিয়া দেখিল যে বিবাহ হইলেও যেমন টাকা সে গত দুই মাস বাড়িতে পাঠাইয়াছে, সে টাকা পাঠানোর কোন অসুবিধা হইবে না। বাবা যদি রাগের মাথায় এখন কিছু দিন টাকা না-ই নেন ত পোস্ট অফিসে টাকাটা মাসে মাসে জমানো যাইতে পারে। সেটা শান্তির বিবাহের সময় প্রয়োজনে আসিবে।

না, মন যখন সে স্থির করিয়াই ফেলিয়াছে তখন নিজের কর্তব্যপথ হইতে আর ভ্রষ্ট হইবে না। অদৃষ্টে যাহা আছে থাক।

২২

ভূপেন জোর করিয়া উঠিয়া পড়িল। রাধাকমলবাবুর ঘরে গিয়া পাঁজি চাহিয়া লইয়া দেখিল বিবাহের দিন আছে তাহার পরের দিনই—আর আছে দিন-পাঁচেক পরে। অত দিন অপেক্ষা করা নানা কারণে যুক্তিযুক্ত নয় বুঝিয়া সে আর জোর করিল না। ইস্কুল হইতে কিছু আগেই ছুটি লইয়া একেবারে সরাসরি বিজয়বাবুর বাড়ি উপস্থিত হইল।

বিজয়বাবু আগেকার মতই অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। এই কয়দিনে তিনি যেন আরও কৃশ হইয়া পড়িয়াছেন—আরও করুণ, আরও পবিত্র দেখাইতেছে তাঁহাকে। যেটুকু দ্বিধা ছিল এখনও, তাহা তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া মুহূর্তে দূর হইয়া গেল। সে একেবারেই কথাটা পাড়িল।

কহিল, দেখুন আপনার কাছে আমার একটি ভিক্ষা আছে,—বলুন দেবেন?

বিজয়বাবু দারুণ বিব্রত ও ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, কী সর্বনাশ! আমার কাছে? কিন্তু—

—বলছি সবই—তার আগে কথা দিন যে আপনার পক্ষে দেওয়া যদি সম্ভব হয় ত নিশ্চয়ই দেবেন?

—নিশ্চয়ই দেব। এ কথা কেন বলছ ভাই। কীই বা দেবার আছে আমার?

—থাকলেই ভাল হ'ত কিন্তু কিছুই যে নেই।

—আমি, আমি কল্যাণীকে ভিক্ষা চাইছি। আমি তাকে বিয়ে করতে চাই।

কথাটা বুঝিতে একটু সময় লাগিল, তাহার পরই বিজয়বাবু আন্দাজে আন্দাজে হাত বাড়াইয়া একেবারে তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন! বলিলেন, এ যে আশাতীত সৌভাগ্য আমার! কল্যাণী তোমার মত দেবতার পায়ে ঠাঁই পাবে, এত তপস্যা কি আছে ওর? আমি ওর মনের কথা বুঝতে পেরেছিলুম ভূপেনবাবু, বুঝে হতভাগীর বরাতের কথা ভেবে দুঃখ পেতাম। ভাবতাম হতভাগী বামন হয়ে চাঁদ ধরতে চায়, ওর দুঃখের শেষ থাকবে না। কিন্তু চাঁদ যে নিজে এসে ধরা দেবেন—

—তা'হলে আপনি কথা দিচ্ছেন?

—দিচ্ছি বৈ কি! কিন্তু এ যে আমার এখনও বিশ্বাসই হচ্ছে না। ইতস্তত করবার যদি কিছু থাকে ত তোমারই আছে, আমার কি থাকতে পারে?

তাহার পর একটু থামিয়া যেন ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, দিদি অথর্ব, ছেলেমেয়েগুলোর ভাত-জল পাওয়াই মুশকিল—এই যা একটু দুর্ভাবনা। কিন্তু তাই ব'লে কি ওর ভবিষ্যৎ সুখ, ওর জীবনটা মাটি করব? যা আছে আমাদের অদৃষ্টে হবে।

ভূপেন আহত কণ্ঠে কহিল, আপনি কি আমাকে এমনই হৃদয়হীন ভাবলেন যে আপনাদের এই অসহায় অবস্থায় ফেলে কল্যাণীকে নিয়ে চলে যাবো?··· আমিই বিবাহের পর এখানে এসে থাকব।

বিস্ময়ে কিছুক্ষণ বিজয়বাবুর মুখে কথা সরিল না। তাহার পর বলিলেন, কিন্তু তোমার বাবা-মা, তাঁরা কি এতে—

—না, তাঁরা এতে মত দেবেন না। আমি তাঁদের অমতেই করব।

বিষম ব্যাকুল হইয়া বিজয়বাবু কহিলেন, কিন্তু তাহ'লে কি ক'রে হবে। না, না—সে সম্ভব নয়। সে কোন মতেই হ'তে পারে না—

ভূপেন দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, আপনি আমাকে কথা দিয়েছেন, মনে আছে ত? আর সে কথা বাদ দিলেও, আমার কাছে আপনাদের কোন ঋণ আছে, এ কথা যদি মনে করেন, তাহ'লে আর আপত্তি করবেন না। মনে রাখবেন আমি ভিক্ষা চেয়েছি—

বিজয়বাবু কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন, তার পর যখন কোনমতে গলা পরিষ্কার করিয়া আবার কথা কহিলেন, তখন তাঁহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে;—তুমি সত্যিই দেবতা, তোমাকে আমরা এখনও কিছুই চিনতে পারি নি; এ ত তোমার ভিক্ষা চাওয়া নয়, এ যে ভিক্ষা দেবারই ছল ভাই! কিন্তু আমার দুর্নামের শেষ থাকবে না। তোমার বাবা-মার অভিশাপ, সকলকার বিদ্রূপ—

—হোক না। আমার জন্যে এটুকু সইতে পারবেন না। তাঁহার হাতটা ধরিয়া ভূপেন বলিল।

—আমার জন্য ভাবি না ভাই, এমন কি মেয়ের জন্যেও নয়। কিন্তু তুমি যদি ব্যথা পাও, তোমাকে যদি মন্দ বলে কেউ?

—তার জন্য আমি প্রস্তুতই আছি।

আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বিজয়বাবু চোখ মুছিয়া কহিলেন,—আরও একটা প্রশ্ন করব। কল্যাণীর প্রতি যদি তোমার সত্যকার স্নেহ না থাকে, এটা যদি শুধুই আমার প্রতি করুণা হয়, তাহ'লে বড় অসুখী হবে ভাই। স্ত্রী যদি বোঝা হয়ে দাঁড়ায় জীবনে তাহ'লে বিড়ম্বনার আর শেষ থাকবে না। কল্যাণী সব দুঃখ সইতে পারবে, সে শুধু তোমার সেবা করার অধিকার পেলেই সুখী থাকবে, কিন্তু তোমার পক্ষে সে জীবন হয়ে উঠবে দুঃসহ। অথচ মনে ক'রে ছ্যাখো, কত ভাল পাত্রী পেতে পারতে তুমি—রূপসী, বিদুষী, ধনবানের মেয়ে, তোমাকে পেলে তারাই ধন্য হ'ত। এখনও সময় আছে, ভাল ক'রে ভেবে ছ্যাখো।···আমার জন্য ভেবো না, না হয়,—না হয় আমি তোমার কাছে ভিক্ষাই নেবো। তোমাকে অসুখী করার থেকে দুর্নামও আমার সইবে!

ভূপেনের যদি বা দ্বিধা থাকিত, তাহা হইলেও এ কথার পর তাহা দূর হইতে দেরি লাগিত না। সে অসহিষ্ণু ভাবেই বলিল, কেন আপনি মিথ্যা আশঙ্কা করছেন, আমি সব দিক ভেবেই মন স্থির করেছি। কল্যাণীকে নিয়ে আমি সুখী হবো ব'লেই আমার বিশ্বাস।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বিজয়বাবু কহিলেন, ভগবানের যা ইচ্ছা তাই হোক ভাই। হয়ত এ ভালই হ'ল। আমরা তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারি নে বলেই আঁক-পাঁক করি।

ভূপেন একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, বিয়ের দিন কিন্তু কালই—

—কালই! বিজয়বাবু চমকিয়া উঠিলেন।

—হ্যাঁ, তা নইলে অসুবিধা আছে। কোন রকম আড়ম্বর করবার মত ত অবস্থা নয়। শুধু শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান হবে—আচ্ছা, আমি তাহ'লে এখন আসি।

ভূপেন বাহির হইয়া গেলেও বিজয়বাবু বহুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। কল্যাণী বাড়ি ছিল না, পানীয় জল আনিতে বাহিরে গিয়াছিল। এখন তাহার ফিরিবার শব্দ পাইয়া বিজয়বাবুর তন্দ্রা ভাঙিল, গাঢ়কণ্ঠে ডাকিলেন,—মা কল্যাণী, একবার কাছে আয় ত মা।

কল্যাণী তাঁহার কণ্ঠস্বরে ভয় পাইয়া কলসী নামাইয়া কাছে আসিল, কী

হয়েছে বাবা ?

—মা, যা আমি আশা করা ত দূরের কথা, সাহস ক'রে ভগবানের কাছেও চাইতে পারি নি, আজ তাই তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন অযাচিত ভাবে। ভূপেনবাবু তোকে বিয়ে করতে চান—তিনি, তিনি বিবাহের দিন পর্যন্ত স্থির ক'রে ফেলেছেন। এ তোরই তপস্যার ফল মা।

কথাগুলার সম্পূর্ণ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে কল্যাণীর বহুক্ষণ সময় লাগিল। সংবাদটা এতই অবিশ্বাস্য, এতই আশাতীত যে, সে বিহ্বল নেত্রে বাপের মুখের দিকে চাহিয়া শুধু দাঁড়াইয়া রহিল। অবশেষে যখন কথাটা কিছু মাথায় গেল, তখন শুধু একবার ব্যাকুল ভাবে বলিতে গেল, কিন্তু বাবা—

বাধা দিয়া বিজয়বাবু বলিলেন, সেইখানেই ত সে অত বড় মা। সে তোকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে না। সে-ই এখানে থাকবে।

তবু কল্যাণী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে বুঝিয়া বিজয়বাবু কিছু উদ্বিগ্ন ভাবে তাহার হাত ধরিয়া মৃদু একটা টান দিতে সে যেন একেবারে ভাঙিয়া পড়িল। সেইখানেই মাটির উপর বসিয়া পড়িয়া বিজয়বাবুর কোলের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া দিল। বিজয়বাবু তাহার মুখটা দেখিতে পাইলেন না বটে, কিন্তু তাহার বহুদিনের নিরুদ্ধ বেদনা ও দুরাশা আজ আনন্দ সংবাদের স্পর্শে যখন অশ্রুর আকারে ঝরিয়া পড়িয়া তাঁহার পরিধেয় বসনের অনেকখানি ভিজাইয়া দিল, তখন তাহার মনটা তিনি পরিষ্কার দেখিতে পাইলেন।

বিজয়বাবু মেয়েকে বাধা দিলেন না, সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিলেন না, শুধু সস্নেহে, নীরবে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

বাহিরে আসিয়া ভূপেনের হাসি পাইতে লাগিল। এমন করিয়া নির্লজ্জের মত তাহাকেই তাহার বিবাহের ঘটকালি হইতে উদ্যোগ-আয়োজন পর্যন্ত করিতে হইবে, তাহা কে ভাবিয়াছিল? আর সকলে থাকিতে এমন করিয়া নির্বান্ধব অবস্থায় প্রবাসে এই উৎসবহীন বিবাহ!

হায় রে! বাস্তব যে তাহারই জীবনে এমন করিয়া কল্পনাকে অতিক্রম করিবে, তাহাই বা কে জানিত!

কিন্তু তখন আর দুঃখ করিবারও সময় নাই—ভাবিবারও না। এ যেন কোথা দিয়া কী হইয়া গেল। এ-রকমটা যে না ঘটিলেই হইত, তাহা মনে মনে সে-ও অনুভব করিতেছে, অথচ এখন আর পিছানো অসম্ভব। যাহা হইবার হইবে—এই মনে করিয়া অগ্রসর হওয়া ছাড়া উপায় নাই।

সে হোস্টেলে ফিরিয়া গিয়া প্রথমেই রাধাকমলবাবুর কাছে গেল। তিনি তখন সন্ধ্যাপূজা শেষ করিয়া কী একটা বই লইয়া পড়িতে বসিয়াছেন। অমন উদ্‌ভ্রান্তের মত তাহাকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া কহিলেন, কী হে, ব্যাপার কি?

ভূপেন একটু যেন অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়া কহিল, আপনার সঙ্গে বিশেষ জরুরী একটা কথা ছিল। একটু মাঠের দিকে আসবেন?

—নিশ্চয়ই! বলিয়া রাধাকমলবাবু তাহার পিছু পিছু বাহির হইয়া আসিলেন, ব্যাপার কি বলো ত ভাই?

—কথাটা কোন্ দিক হইতে আরম্ভ করিবে বুঝিতে না পারিয়া ভূপেন কহিল, বিজয়বাবুদের অবস্থা ত সব শুনেছেন। আমি ওঁদের কিছু কিছু সাহায্য করতুম, তাই চলত। ইতিমধ্যে অপূর্ববাবুদের দল রটনা করেন যে, বিজয়বাবু মেয়েকে দিয়ে আমায় ভুলিয়ে টাকা আদায় করছেন!

রাধাকমলবাবু কহিলেন—হ্যাঁ, আমিও এই রকম একটা কি শুনেছিলাম। কিন্তু সে ত আমরা কেউই বিশ্বাস করি নি ভাই।

—আপনি করেন নি, কিন্তু অনেকে করেছিল। কথাটা বিজয়বাবুর কানে পৌঁছতে তিনি আমার কাছ থেকে সমস্ত রকম সাহায্য নেওয়া বন্ধ করেন। অথচ আয় ত ওঁদের মাসিক দশ টাকা মাত্র তা জানেন। একেবারেই উপবাস চলেছে ওঁদের, তাতে ক'দিন যে আর বাঁচবেন সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

রাধাকমলবাবু বলিয়া উঠিলেন, বেচারী! বড় ভালমানুষ আর বড় ঈশ্বর-বিশ্বাসী লোক! ভগবান এইসব লোককেই দুঃখ দেন।...সবই ত বুঝছি ভাই, কিন্তু কি করবো বলো—আমরাও ত ছাপোষা, এই ক'টা টাকা মাত্র উপার্জন; এতে সংসারই চলে না ভাল ক'রে—

ভূপেন কহিল, আমি অনেক ভেবে-চিন্তে একটি মাত্র পথ ঠিক করেছি, আমি ওঁর মেয়েকে বিয়ে করব; তাহ'লে ত আর দুর্নামের ভয় থাকবে না।

কথাটা এতই অপ্রত্যাশিত যে কিছুক্ষণ রাধাকমলবাবুর মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না, অবাক হইয়া সেই অন্ধকারেই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তারপর কহিলেন, দীর্ঘজীবী হও ভাই। কিন্তু তোমার বাপ-মা? তাঁরা কি রাজী হবেন?

—না। আমি তাঁদের অমতেই করব।

—সেটা কি ভাল হবে ভাই? তাঁরাও অনেক কষ্ট ক'রে তোমাকে মানুষ করেছেন। অবশ্য তোমার উদ্দেশ্য মহৎ—কাজও ভালই করছ, তবু গুরুজনের নিঃশ্বাস মাথায় ক'রে শুভ কাজ করা—

—সবই আমি ভেবে দেখেছি পণ্ডিতমশাই। কিন্তু এখন এতদূর এগিয়েছি যে, ও আলোচনা আর নিরর্থক। ভেবে দেখুন আজকাল ত বহু ছেলেই ভালবাসার জন্য বাপ-মার অমতে বিয়ে করছে। ধরে নিন আমিও কল্যাণীকে ভালবাসি। সে কথা যাক—এখন আপনাকে একটু সাহায্য করতে হবে।

—আমাকে ?—বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন রাধাকমলবাবু।

—হ্যাঁ। আমি আশঙ্কা করছি যে বাবার তরফ থেকে একটা প্রবল বাধা আসবে। তার আগেই আমি এ কাজ সেরে ফেলতে চাই। কালই আমি বিয়ের দিন ঠিক করেছি। কিন্তু এসব কথা বেশী লোককে এখন না জানানোই ভাল। আপনি যদি কাল কাজটি সেরে দেন ত বড় ভাল হয়—! ওঁদের ত কেউ নেই, তা ছাড়া টাকা খরচ করারও সামর্থ্য নেই। সুতরাং আড়ম্বর স্ত্রী-আচার কিছুই হবে না, শুধু শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানটা সেরে দেবেন ?

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রাধাকমলবাবু কহিলেন, এ কাজ ত কখনও করি নি ভাই—গোপন বিয়ে, শেষে একটা লোকনিন্দার ভাগী হবো না ত ?

—ঠিক গোপন বিবাহ যাকে বলে এ ত তা নয়। মেয়ের বাবার মত আছে, সেখানেই হবে। আমার সহকর্মীদেরও আমি বিয়ের আগে জানাবো। মহেশবাবুর কাছে কাল সকালেই যাবো। এতে আপনাকেই বা নিন্দা করবে কেন ?

আরও কিছুক্ষণ বাদানুবাদ ও যুক্তিতর্কের পর রাধাকমলবাবু রাজী হইলেন। সেইখানে বসিয়াই ভূপেন তাঁহার নিকট হইতে একান্ত আবশ্যকীয় জিনিসগুলির ফর্দ করিয়া লইল। পণ্ডিতমশায় নিজেই নারায়ণ সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইবেন এইরূপ কথা রহিল।

রাত্রে আহারাদির পর ভূপেন বাবাকে, মাকে ও সন্ধ্যাকে চিঠি লিখিতে বসিল। বাবা-মাকে বেশী কিছু লিখিবার ছিল না, শুধু এ চিঠি যখন তাঁহারা পাইবেন তখন বিবাহ চুকিয়া যাইবে, এই কথাটাই ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিল। বধূকে তাঁহাদের আদেশ পাইলে দুই-তিনদিনের জন্য লইয়া যাইতে পারে —কিন্তু এখন যে তাহাকে এখানেই রাখিতে হইবে, এবং সে-ও শ্বশুর-গৃহে থাকিবে, এটাও জানাইল। উপায় নাই বলিয়াই এ কাজ তাহাকে করিতে হইল—তাঁহারা যেন অপদার্থ অকৃতী সন্তানকে ক্ষমা করিবার চেষ্টা করেন।

সন্ধ্যার চিঠিটাই একটু দীর্ঘ হইল। পূর্বাপর সমস্ত ইতিহাসটা জানাইয়া শেষে লিখিল—

কাজটা ভাল করলুম কিনা, তা বুঝতে পারছি না। তবে এটুকু বুঝেছি যে, তোমার কাছে বসে বসে ভবিষ্যতের যে উজ্জ্বল ছবি আঁকতুম, তা ছবিই

রয়ে যাবে। জীবনে সে সব আর কোন দিন ঘটবে না। উন্নতি করতে গেলে পুরুষকে একাই চলতে হয় জীবনের পথে—দারিদ্র্য আর সংসার, এ দুই বোঝা নিয়ে ওপরে ওঠা একটু কঠিন। যাক—কী আর করা যাবে! অন্য লোক কে কী বলবে তা নিয়ে আমার একটুও দুশ্চিন্তা নেই সন্ধ্যা, তোমার চোখে হয়ত নেমে যাবো বা গেলুম, সেই কথাটাই ভাবছি। হয়ত এটাও স্পর্ধা, হয়ত অনেকদিন আগেকার দরিদ্র মাস্টার মশাইয়ের জীবনে কি হ'ল তা নিয়ে মাথা ঘামাবার তোমার সময়ও নেই—তবু তোমার শ্রদ্ধা হারাবো, এই আশঙ্কাই আজ আমায় সব চেয়ে বিচলিত করেছে! যদি এখনও আমার কথা মনে করবার সময় থাকে ত এইটুকু ভেবেই আমাকে মাপ ক'রো যে, দাদুর পায়ের তলায় বসে যে শিক্ষা পেয়েছি, মনুষ্যত্বের সেই বড় শিক্ষাটার অমর্যাদা করি নি আমি। আমি অনেক বড়ো হ'লে পৃথিবীর মানুষের কী বৃহত্তর কল্যাণ-চিন্তা করতে পারতুম তা জানি না, কিন্তু যে-মানুষ চোখের সামনে রয়েছে তার প্রয়োজনের জন্য সেই নাম-না-জানা ভবিষ্যৎকে যদি বলি দিতে পেরেই থাকি ত তাতে লজ্জা পাবার বা অনুতপ্ত হবার কিছু আছে ব'লে মনে করি না। শুনেছি ডাক্তারদের এ একটা বড় পরীক্ষা ছিল আগে যে, কোন বিত্তশালী লোকের আহ্বানে হয়ত চলেছে গাড়ি ক'রে সেই ধনীর বাড়ি, এমন সময় দেখলে পথের ধারে গাছতলায় একটি দরিদ্র লোক রোগযন্ত্রণায় ছটফট করছে, তুমি কাকে দেখবে তখন? দুটোই জরুরী অবস্থা। এই প্রশ্নে যারা 'গাছতলার রোগীকে আগে দেখব' বলত, তারাই নাকি সসম্মানে পাস করত। এ গল্পও দাদুর কাছে শোনা।

যাকৃগে—এ কৈফিয়তের কোন প্রয়োজনই হয়ত নেই তোমার—এ কতকটা আমার নিজেকেই বোঝানো!

হয়ত অন্য কোন লোকের দ্বারস্থ হ'লেও সমস্যার সমাধান হ'ত, এতটা করবার দরকারই হ'ত না, কিন্তু কী জানি কেন ঠিক ভিক্ষা চাইতে প্রবৃত্তি হ'ল না, আর তা-ছাড়া···কী বলব···হয়ত কল্যাণী সম্বন্ধেও কোন দুর্বলতা ছিল আমার মনে!

মানুষের লোভের সীমা নেই—আজ কেবলই সমস্ত মন যেন তোমার উপস্থিতি চাইছে! কিন্তু সে সম্ভব নয়, আর তার প্রয়োজনও নেই বলে সময় থাকতে তোমাকে খবর দিই নি।

দাদুকে আমার প্রণাম দিয়ে ব'লো যে তাঁর আশীর্বাদই আমার জীবনে একমাত্র সম্বল রইল। তাঁর কথা মনে ক'রেই আমি আজ যা কিছু ভরসা পাচ্ছি মনে।

চিঠি কিছু দীর্ঘ হ'ল হয়ত—কিন্তু তা বলে উত্তর দেবার কোন দায় রইল না।

তুমি আমার আশীর্বাদ নিও। ইতি—

শেষ করিয়া ভূপেন যখন আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িল, তখন এই কথাটাই বার বার তাহার মনে হইতেছিল যে, সে যেন এইবার সত্য-সত্যই সন্ধ্যার কাছ হইতে দূরে সরিয়া গেল, চিরদিনের মত। যতই মনকে বুঝাইবার চেষ্টা করুক যে ধনী-দুহিতা সন্ধ্যা অনেক আগেই সরিয়া গিয়াছে, তাহার ঔদাসীন্য ও চিঠির সংক্ষিপ্ততাই তাহার প্রমাণ, তবু কোথায় যেন একটা ভরসা ছিল—আজ সমস্তই চলিয়া গেল। সন্ধ্যা সম্বন্ধে তাহার মনোভাব সে আজও বিশ্লেষণ করিয়া দেখিল না—তাহার বিবাহের সঙ্গে সন্ধ্যার কতটুকু সম্পর্ক, তাহাও ভাবিল না, শুধু মনে হইতে লাগিল যে সন্ধ্যার অন্তরে যে শ্রদ্ধার আসনে সে বসিয়া ছিল, সে আসন হইতে চিরতরে নামিয়া যাইতেছে।

তাই সন্ধ্যার নিকট হইতে দূরে চলিয়া আসিবার ব্যথাটা যেন নূতন করিয়া অনুভব করিল। বহু রাত্রি পর্যন্ত তাহার ঘুম আসিল না—অন্ধকারে এপাশ ওপাশ করিতে করিতে আপন মনেই অস্ফুট কণ্ঠে শুধু তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল,—সন্ধ্যা, সন্ধ্যা।

সকাল বেলা উঠিয়া ভূপেন প্রথমেই মহেশবাবুর সহিত দেখা করিতে গেল। অত সকালে তাহাকে দেখিয়া মহেশবাবু বিস্মিত হইয়া কহিলেন, আবার কী? কোথায় আবার কি ফ্যাসাদ বাধালেন?

ভূপেন অপ্রতিভ ভাবে একটু হাসিল, কিন্তু কোন প্রকার ইতস্ততঃ করিল না, বিনা ভূমিকায় একেবারে কাজের কথাটা পাড়িল। আনুপূর্বিক সমস্ত ইতিহাস বিবৃত করিয়া যখন সে থামিল, তখন মহেশবাবু কিছুকাল শুধু অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর কহিলেন, মশাই, আপনার সতীর্থরা আপনার আড়ালে আপনাকে কি বলে জানেন? বলে পাগলা মাস্টার। তা আমি এখন দেখছি যে তারা মিথ্যা বলে না। আপনি একটি বদ্ধ পাগল। যা করবেন তাইতেই কি একটা বাড়াবাড়ি আপনার? আশ্চর্য।

ভূপেন কোন কথা কহিল না, নতমস্তকে দূরের চেয়ারের পায়াটার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

মহেশবাবু একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, পরোপকার ভাল জিনিস, কিন্তু তাই বলে আপনার এত কি দায় মশাই যে, এমন ক'রে সমস্ত ভবিষ্যৎটা মাটি করলেন! উন্নতির আশা রইল না, শ্বশুর-বাড়ি থেকে কোন সাহায্য পাবার

আশা রইল না—এই বয়স থেকে এত বড় একটা সংসার ঘাড়ে চাপল। শুনেছি ইংরেজিতে একটি কথা আছে ভবিষ্যৎ বাঁধা দেওয়া, আপনিও তাই করলেন।... আপনি কি একেবারে স্থির ক'রে ফেলেছেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ভূপেন জবাব দিল।

—আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। যে দুর্নামটা রটেছিল, তার মূলে কি কোন সত্য আছে ? লজ্জা করবেন না—খুলেই বলুন।

—দুর্নামটার মূলে কোন সত্যই নেই, তবে ওঁর মেয়েটির ওপর আমার একটু স্নেহ—বরং ভালবাসাও বলতে পারেন, জন্মেছে বৈ কি !

আর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মহেশবাবু কহিলেন, পরোপকারের জন্যে এত বড় স্বার্থত্যাগ, আত্মত্যাগ করতে যাচ্ছেন, আপনাকে আর কী বলব ! যান —বরং আমি দেখব আসছে মিটিং-এ আপনার কিছু মাইনে বাড়াতে পারি কিনা, অন্ততঃ পাঁচ টাকা আমি বললে কমিটি বাড়াবে বলেই মনে হয়।

ভূপেন তাঁহাকে নমস্কার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে মহেশবাবু সহসা প্রশ্ন করিলেন—ওখানকার উদ্যোগ-আয়োজন কে করছে ?

লজ্জিত মুখে ভূপেন কহিল, কেউ ত নেই, পণ্ডিতমশাই একটা ফর্দ ক'রে দিয়েছেন, দেখি যা পাই বাজার করি। ওখানেও হয়ত ওকেই সব করতে হবে—

—ছি ছি! দেখি দিন আমাকে ফর্দ—আমি সব আনিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে দুপুর বেলা গিয়ে পড়ছি ; যা হয় আমরাই সব ক'রে-কম্মে নেব।...একে ত এই উদ্ভট বিয়ে, তার ওপর কনে করবে তার বিয়ের যোগাড় আর বর করবে বাজার। ছি!...যান আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন গে। তবে আজ আর কিছু খাবেন না—উপোস ক'রে থাকতে হয়।

মহেশবাবু যে এতটা করিবেন, তাহা ভূপেন কখন কল্পনাও করে নাই। কৃতজ্ঞতায় তাহার মন ভরিয়া গেল, সে হেঁট হইয়া এই প্রথম পদধূলি লইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। মহেশবাবুও সস্নেহে তাহাকে উঠাইয়া বুকে চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, বাহাদুর ছেলে ভাই, হ্যাঁ—বুকের পাটা আছে বটে ! এত বড় কাজ করতে আমাদের সাহসে কুলোত না।

সে প্রায় বাহিরে আসিয়াছে, এমন সময় মহেশবাবু পুনরায় ডাকিয়া কহিলেন, কিছু খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন রাখব ? কাউকে বলতে চান ? মাস্টার মশাইদের ?

ক্লান্ত কণ্ঠে ভূপেন জবাব দিল, আজ আর কাউকেই জানাতে চাই না। আজ থাক—

—বরং বৌ-ভাতের দিন হবে—এ্যা? সেই ভাল!

ভূপেন যখন সন্ধ্যার পর ক্লান্ত ও উপবাসক্লিষ্ট দেহটাকে কোনমতে টানিয়া লইয়া বিজয়বাবুদের বাড়ি পৌঁছিল, তখন রাধাকমলবাবু আসিয়া গিয়াছেন।

মহেশবাবু, তাঁহার স্ত্রী ও একটি দাসী আসিয়াছেন, তাঁহারা বিবাহ ও হোমের সমস্ত উপকরণ ইতিমধ্যেই গুছাইয়া ফেলিয়াছেন। মায় বর ও বধূর দুইখানি নববস্ত্রও সংগ্রহ করিতে মহেশবাবু ভোলেন নাই।

তাহাকে দেখিয়া মহেশবাবু বলিয়া উঠিলেন, এস ভাই। স্ত্রী-আচার হ'ল না তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু নান্দীমুখটাও বাদ যাবে বলে আমার মনটা খুঁৎ খুঁৎ করছে। অবিশ্যি বিজয়বাবুকে দিয়ে তাঁদেরটা একরকম সারিয়ে রেখেছি। যাক্ গে, কি আর করা যাবে।

ভূপেন স্নান সারিয়াই আসিয়াছিল, কাপড় ছাড়িয়া একেবারে পিঁড়িতে বসিল। ইতিমধ্যে দুই-একজন প্রতিবেশীও আসিয়া গিয়াছিলেন, মহেশবাবুই অপরাহ্ণে ইঁহাদের সংবাদ দিয়াছেন। কিছু কিছু জলযোগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ডাক্তার-বাবুর স্ত্রী, আর একটি সধবা মহিলা এবং মহেশবাবুর স্ত্রী বিবাহের সব কিছু ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, মায় স্ত্রী-আচারও বাদ গেল না। অর্থাৎ বিবাহের আনুষ্ঠানিক আয়োজন কিছু যাহাতে বাদ না পড়ে সেদিকে মহেশবাবু বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন।

ফলে বিবাহটা যত নিরানন্দময় এবং অদ্ভুত রকমের হইবে বলিয়া ভূপেন মনে করিয়াছিল, ততটা হইল না বটে বরং অনেকখানিই সাধারণ বিবাহের মত দেখাইতে লাগিল, তবু তাহার মনটা ভার-ভার হইয়াই রহিল। কিছুতেই সহজ হইতে পারিল না সে। যে কাজ সে করিতে যাইতেছে তাহা কতটা যুক্তিযুক্ত হইল তাহা আজও জানে না—শুধু এইটা বুঝিতে পারিল যে এ আর কোন মতে ফিরিবে না। যদি হঠকারিতাই হইয়া থাকে ত ইহার ফলাফল তাহাকে আজীবন বহন করিতে হইবে। আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব যাহাদের সহিত জীবনের এতগুলি বছর কাটিয়াছে তাহাদের সকলকে বাদ দিয়া, যে মেয়েটির ও পরিবারের সহিত বলিতে গেলে মাত্র দু'দিনের পরিচয়, তাহাদের সঙ্গে দীর্ঘ বাকী জীবনটা সে কাটাইবে কেমন করিয়া? যদি সুখী না হইতে পারে? যদি সমস্ত বিড়ম্বনা বলিয়া বোধ হয়?...হয়ত বা এখনও পালানো যাইতে পারে। তাহাতে নিন্দা যতই হোক্—বাঁচিতে পারে সে। এমনিই একটা কিছু করিয়া বসিবে নাকি?...এই রকমের নানা উদ্ভট কথা সেই শেষ মুহূর্তেও তাহার মনে আসিতে লাগিল, আর সঙ্গে সঙ্গে

একটা অসহায় ভাব আসিয়া তাহাকে কেমন বিহ্বল করিয়া তুলিল, মনে হইতে লাগিল যেন কে তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া ধরিতেছে, বাহিরে কোথাও এতটুকু বাতাস, কোথাও কোন অবসর নাই—

তবু শেষ পর্যন্ত কিছুই করা হইল না। এক সময়ে বিবাহের মন্ত্রপাঠ, মায় হোম পর্যন্ত শেষ হইয়া গেল, বর-বধূ বাসরঘরে উঠিল। জলযোগ-মিষ্টিমুখের পর অভ্যাগতরাও সকলে চলিয়া গেলেন, শুধু মহেশবাবুর স্ত্রী ও তাঁহাদের দাসী রহিয়া গেল। তাঁহারা কাল সকালের কাজটুকু সারিয়া যাইবেন এই কথা রহিল।

বাসরঘরে জাগিবার কোন ব্যবস্থা ছিল না, বরং শয়নের ব্যবস্থাই হইয়াছিল। ইচ্ছা হইলে বর-বধূ আলাপ করিতে পারিত অনায়াসে কিন্তু সে ইচ্ছা অন্তত ভূপেনের ছিল না। সে অনেক রাত্রি পর্যন্ত ঘুমাইতে পারিল না, শুইয়া শুইয়া এপাশ-ওপাশ করিল, তবু কল্যাণীর সঙ্গে কথা কওয়ার কোন চেষ্টাই করিল না। আর বেচারী কল্যাণী, তাহার নিজের তরফ হইতেই যথেষ্ট ভয় ছিল, এখন ভূপেনের বিষণ্ণ-গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া বেচারার আশঙ্কা ও উদ্বেগের অবধি রহিল না। তাহার অভিজ্ঞতা কম, তবু নিজের সহজ-বুদ্ধিতে এটা অনায়াসেই বুঝিতে পারিয়াছে যে এ ধরনের বিবাহে বর কখনও সুখী হয় না। আত্মীয়-স্বজন সকলকে ত্যাগ করিয়া একমাত্র তাহাকে লইয়া জীবন কাটাইবে এমন সম্পদই বা তাহার কৈ? নিজের জন্য সে একবারও ভাবে না, ভূপেনকে স্বামী বলিবার অধিকার পাইয়াছে ইহাতেই সে সৌভাগ্যবতী মনে করে নিজেকে, কিন্তু দুশ্চিন্তা তাহার ভূপেনের জন্যই। শেষ পর্যন্ত সে জগদ্দল পাথরের মত স্বামীর বুকে চাপিয়া বসিল না ত? পায়ের বেড়ী বলিয়া যদি কোন দিন মনে হয় তাহাকে? সমস্ত রকম সুখ ও সৌভাগ্যের পথে অন্তরায়? তাহা হইলে কল্যাণীর লজ্জা ও অনুতাপের যে শেষ থাকিবে না, এ পোড়া মুখ কোথায় ঢাকিবে?

এমনি করিয়া—যে বিবাহকে অনায়াসে প্রণয়-মূলক বলিয়া আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে—সেই বিবাহের বর ও বধূ বিবাহের প্রথম রাত্রিটা পাশাপাশি বিনিদ্রই কাটাইল, অথচ কেহ কাহারও সহিত একটি কথাও কহিল না।

রাধাকমলবাবু সেই রাত্রেই হোস্টেলে ফিরিয়া কথাটা রাষ্ট্র করিয়া দিতে মাষ্টার মহাশয়দের মধ্যে জল্পনা-কল্পনার অবধি রহিল না! অপূর্ববাবু সগর্বে বলিতে লাগিলেন, কেমন? বার বার বলি নি? বিজয়কে যতটা ভালমানুষ তোমরা ভাবতে, ততটা নয়। কেমন গেঁথে তুললে ছোক্‌রাকে, দেখলে ত? অবিশ্যি রুই গাঁথলে কি পুঁটি গাঁথলে তা বাছাধন টের পাবেন'খন্—তবু 'কাল্‌টি' মেয়েটা ত

আপাতত ঘাড় থেকে নামল। সেই সঙ্গে একমুঠো ভাতের ব্যবস্থাও হ'ল!

অপূর্ববাবু যা-ই বলুন, মাস্টার মহাশয়দের দল অনেকেই সকাল বেলা অভিনন্দন জানাইতে উপস্থিত হইলেন। মায় ললিতবাবুও, মহেশবাবু সব ব্যবস্থা করিতেছেন খবর পাইয়া, আসিয়া পড়িলেন। যতীনবাবু কহিলেন, ও-সব শুনছি না ভাই, আমাদের খাওয়াটা ফাঁকি দিলে চলবে না। কালকের ভোজটা চাই।

অপূর্ববাবু পিঠ চাপড়াইয়া কহিলেন, বেশ করেছ ভায়া, এই ত মানুষের মত কাজ! তোমার দৃষ্টান্ত দেখে যদি আজকালকার ছেলেরা শেখে ত, মেয়ের বাপরা বাঁচে!

ভূপেন স্মিত-মুখে সকলের কথাই মানিয়া লইল। বিবাহের জন্য সে পোস্ট-আফিস হইতে অনেক কষ্টে সঞ্চিত গোটা-কতক টাকা তুলিয়া রাখিয়াছিল, সেইটাই মহেশবাবুর হাতে দিয়া কহিল, আপনি ত অনর্থক অনেকগুলো টাকা খরচ করলেন, কালকের খরচটা এই টাকা থেকে চালান। এই ক'জন লোক—যা হয় একটু আয়োজন করুন, আর ছেলেদের জন্যে যদি কিছু রসগোল্লা পাঠানো যায়—

মহেশবাবু টাকাটা হাতে করিয়া লইয়া কহিলেন, আচ্ছা আচ্ছা, সে যা হয় ব্যবস্থা হবে'খন্। ছেলেদের জন্যেও একটা ব্যবস্থা করতে হবে বৈ কি! এখন ত আজকের কাজটা চুকুক।

বাসি-বিয়ে সারিয়া ভূপেন ক্লান্ত ভাবে বাহিরের মাঠে আসিয়া বসিল। শ্রাবণের শেষে দিগ্‌দিগন্ত জোড়া মাঠ আর আকাশে যেখানে মেশামেশি হইয়াছে, সেখান পর্যন্ত মেঘে ছাইয়া ফেলিয়াছে। বৃষ্টি নাই অথচ ক'দিন ধরিয়াই এমনি মেঘলা করিয়া আছে। কেমন একটা বিষণ্নতা চারিদিকে! আরও যেন এই জন্যই মনটা ভার হইয়া আছে, ভূপেন কিছুতেই কোন উৎসাহ পাইতেছে না।

বসিয়া বসিয়া সে বাড়ির কথা ভাবিতেছিল। মা আঘাত পাইবেন—বাবার কথা অত সে ভাবে না। তবে তিনি ক্ষিপ্ত হইয়া অনেক কিছু করিতে পারেন। হয়ত বা আসিয়া হাজিরই হইবেন, খানিকটা চেঁচামেচি গোলমাল করাও বিচিত্র নয়—সে সম্বন্ধে একটা আশঙ্কা বরাবরই আছে। বোনগুলির কথা সে আগে বিশেষ ভাবিত না—এখন তাহাদের কথাও মনে পড়ে। কী আব্‌হাওয়াতেই না আছে বেচারীরা! না আছে তাহাদের কোন শিক্ষার ব্যবস্থা, আর না আছে অন্য কোন কাজ। মনের বিস্তৃতি লাভ হয়, কূপমণ্ডুকতা দূর হয় এমন কোন ব্যবস্থা নাই তাহাদের জন্য। কলিকাতার সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে অন্ধকার বাড়ির দুইখানি ঘরে তাহাদের দিনরাত্রি কাটিতেছে, চিরকাল ধরিয়া একই ভাবে। তাহাদের কোন সুবন্দোবস্ত না করিয়া বিবাহ করাটা গর্হিতই হইল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যেমন করিয়াই হউক তাহাদের জন্য কিছু করিতে হইবে—নহিলে নিজের বিবেকের কাছে এমন অপরাধী থাকা অত্যন্ত কষ্টকর।…

অনেকক্ষণ এই ভাবে বসিয়া থাকিবার পর রাখু ডাকিতে আসিল, জামাইবাবু, রান্না হয়ে গেছে, ভেতরে চলুন।

জামাইবাবু! ডাকটা নূতন বটে। মাস্টারমশাই এই ডাকেই কান অভ্যস্ত হইয়া গেছে, তাছাড়া নূতন কোন জীবনে যে সে প্রবেশ করিয়াছে এটা এখনও যেন ভাবা যায় না। সে একটুখানি ম্লান হাসিয়া উঠিয়া পড়িল। দেড়টার গাড়ি অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে—বেলা কম হয় নাই।

আহারাদির পর মহেশবাবু চলিয়া গেলেন। কথা রহিল যে পরদিন সকালে আবার তাঁহারা আসিয়া বৌভাত ও ফুলশয্যার উদ্যোগ আয়োজন করিবেন। ব্যাপার যখন সামান্যই তখন আজ হইতে কিছু করার প্রয়োজন নাই। তাঁহারা বিদায় লইলে ভূপেন ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল।—গত দুই রাত্রির জাগরণ ও ক্লান্তিতে তাহার চোখের পাতা যেন বুজিয়া আসিতেছে—আর কোন মতেই যেন জাগিয়া থাকা যায় না।…

ঘুম ভাঙ্গিতে তাহার প্রথমেই মনে পড়িল কল্যাণীর কথা। আগের দিন হইতে সে বেচারীর সঙ্গে একটিও কথা কওয়া হয় নাই, সে যে ভয় এবং দুঃখ দুই-ই পাইয়াছে তাহা ভূপেন বুঝিতে পারিল। বিশেষতঃ এখন বাড়ি একেবারে খালি—নির্জন নিস্তব্ধ বাড়িতে এমন বিষণ্ণ আব্‌হাওয়া লইয়া থাকা যায় না।

সে যখন ঘরের বাহিরে আসিল তখনও তেমনি মেঘলা করিয়া আছে—সন্ধ্যারও বিশেষ দেরি নাই। চাহিয়া দেখিল পিসীমা তখনও ঘুমাইতেছেন, কল্যাণী রান্নাঘরের চৌকাঠে স্তব্ধ হইয়া নতমুখে বসিয়া আছে। তাহার সেই বসিয়া থাকিবার দীন ভঙ্গিটিতে ভূপেনের মন অকস্মাৎ মমতা ও করুণায় ভরিয়া গেল, তাড়াতাড়ি কাছে গিয়া চুপিচুপি মিষ্ট কণ্ঠে ডাকিল—কল্যাণী!

কল্যাণী চমকিয়া উঠিয়া যেন ভয়ার্ত দৃষ্টি মেলিয়া একবার চাহিয়া দেখিল, কোন কথা কহিল না। ভূপেন আবার বলিল, এখানে এমন ক'রে বসে কেন কল্যাণী, আমার ওপর রাগ করেছ?

ঠিক সেই মুহূর্তে, কল্যাণী কোন উত্তর দিবার আগেই, বাহিরে যেন অনেক-গুলি লোকের কথা-বলার আওয়াজ কানে গেল। আরও একটু বাদে অতি পরিচিত একটি কণ্ঠের অপ্রত্যাশিত আহ্বান আসিয়া পৌঁছিল, মাস্টার মশাই!

ভূপেন ও কল্যাণী দুজনেই বিস্ময়ে চকিত হইয়া উঠিল। এ যে সন্ধ্যা!

সত্যই সন্ধ্যা। পিছনে একটি চাকর ও আর একটি মুটের মাথায় বিস্তর জিনিস

চাপাইয়া কৌতুকোজ্জ্বল মুখে সন্ধ্যা আসিয়া ভিতরের উঠানে দাঁড়াইল। ভূপেন কাছে আসিতে প্রণাম করিয়া হাসিমুখে কহিল, চিঠি পেলুম তখন দশটা। তখনই দাদুর অনুমতি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি—কিছু বাজার ক'রে বারোটার গাড়ি ধ'রে চলে এলুম। এখানের কথা যা শুনেছি, হয়ত কিছুই পাওয়া যাবে না মনে ক'রে বৌভাতের বাজার আমি মোটামুটি ক'রেই এনেছি। আরও ঢের মাল পড়ে আছে স্টেশনে, ওরা গিয়ে আনবে। ইস্কুলের ছেলেদের সবাইকে আমি ভাল ক'রে খাওয়াবো, আপনি কিন্তু 'না' বলতে পারবেন না। রান্নার লোকও রাত্রের গাড়িতে আসবে, আর দারোয়ান আসবে কাল ফুলের গহনা নিয়ে।

তারপরই কল্যাণীর দিকে চাহিয়া কহিল, কী কল্যাণীদি, কথা কইছেন না যে? খুব ফাঁকি দেবেন মনে করেছিলেন, না? আমি কিন্তু এ আগেই জানতুম।

সে কল্যাণীকেও একটা প্রণাম করিয়া উঠিয়া বুকের মধ্যে হইতে একটা কাগজের মোড়ক বাহির করিল। তাহার মধ্যে ছিল একজোড়া সোনার বালা এবং একগাছি সরু হার। সস্নেহে ও সযত্নে কল্যাণীকে পরাইয়া দিতে দিতে কহিল, এ যেন আমার স্পর্ধা ভাববেন না ভাই—এ দাদু পাঠিয়েছেন, আশীর্বাদী।

অভিভূত ভূপেন এতক্ষণে কণ্ঠস্বর খুঁজিয়া পাইল। কহিল, এ সব কী করেছ সন্ধ্যা? পাগলের মত কত খরচ করেছ?

অনুনয়ের সুরে অথচ হাসি-হাসি মুখে সন্ধ্যা কহিল, আজকের দিনটা আর বকবেন না মাস্টার মশাই, আজ আমার বড় আনন্দের দিন। আপনার বিয়ের খবর পেয়ে কী আনন্দ যে হ'লো তা আপনাকে বোঝাতে পারব না। আজ পাগল না হ'লে কবে হ'ব বলুন? সত্যি বিশ্বাস করুন, আমার খুব আনন্দ হয়েছে—বড় খুশী হয়েছি—

কিন্তু কথা কহিতে কহিতে ভূপেনের চোখের দিকে চাহিয়া, অকস্মাৎ মুখের হাসি মিলাইবার পূর্বেই, তাহার সেই আশ্চর্য সুন্দর বিস্ফারিত চোখ দুইটির কূল ছাপাইয়া কপোল প্লাবিত করিয়া যেন অনেকক্ষণের জমাট-বাঁধা একরাশ অবোধ অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, কিছুতে কোন মতেই সন্ধ্যা তাহাদের শাসন করিতে পারিল না।

২৩

সেদিন সন্ধ্যার সেই অশ্রুপ্লাবিত চোখ দুইটির মধ্য দিয়া ভূপেন শুধু যে সন্ধ্যারই মনের ছবিটা পরিষ্কার দেখিতে পাইল তাহা নয়, সে-আয়নাতে এতদিন পরে সে নিজেরও মনের চেহারাটা স্পষ্ট করিয়া দেখিল এবং যা ছিল এতদিন মনের

অবচেতনে ঝাপ্‌সা অস্পষ্ট হইয়া, আজ তাহাকেই সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইল। আর আত্মপ্রবঞ্চনা করা সম্ভব নয়। পুরুষ জন্ম হইতে জন্মান্তরে যে একটি মাত্র মেয়ের জন্যই সাধনা করে সে নারী তাহার সন্ধ্যা—কল্যাণী নয়।

কিন্তু সে অভিভূতের মতই দাঁড়াইয়া রহিল। সবটা জড়াইয়া যেন তাহার মানবিক ধারণা-শক্তির চেয়ে অনেক বেশী, মস্তিষ্ক এতখানি বিভিন্ন চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিতে পারে না। এমন কি সন্ধ্যার ওষ্ঠ দুইটি কথা কহিতে গিয়া যে শুধু নীরবে কাঁপিতেই লাগিল, সে দিকে চাহিয়া একটি সান্ত্বনার বাণীও সে উচ্চারণ করিতে পারিল না।

সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল প্রথম কল্যাণীরই। সে একেবারে কাছে আসিয়া সন্ধ্যাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইল। তারপর নিজের আঁচল দিয়া তাহার চোখ মুছিয়া লইয়া কহিল, এস ভাই, ভেতরে এস। আনন্দের দিনে চোখের জল ফেলতে নেই। তোমার মাস্টার মশাই তোমারই রইলেন—একদিন সে কথাটা বুঝতে পারবে। তোমাদের সম্পর্ক যে অনেক বড় বোন!

সে এক-রকম জোর করিয়াই সন্ধ্যাকে ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া গেল।

সন্ধ্যা অবশ্য একটু পরেই অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া উঠিল, কিন্তু কিছুতেই যেন ভূপেনের কাছে সহজ হইতে পারিল না। বরং মনে হইতে লাগিল যে, নিজের ক্ষণিক দুর্বলতার লজ্জায় তাহার দিকে সে মুখ তুলিয়া তাকাইতেও পারিতেছে না।

সে রাত্রিটাও কাটিল একটা থমথমে আব্‌হাওয়ার মধ্যে। পরের দিন কলিকাতা হইতে আরও লোকজন আসিয়া পড়িল; ভোজনের আয়োজন ও বহু লোকের কোলাহলে স্বভাবতই যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়—সে তপ্ত হাওয়ায় ইহারাও একটু তাতিয়া উঠিল। কিন্তু ভূপেনের মনের ক্লান্তি ও জড়তা যেন কিছুতেই কাটিতে চাহিল না। আহারাদির আয়োজন হইয়াছিল দিনের বেলাতেই—কিন্তু শেষ হইতে হইতে বাজিয়া গেল রাত্রি নয়টা। সন্ধ্যা তখনই তাড়া লাগাইয়া ফুল-শয্যার ব্যবস্থা করিল—মহেশবাবুর স্ত্রী ও ডাক্তারবাবুর স্ত্রী এয়োতির কাজ করিবেন, সেজন্যও অবশ্য একটা তাড়া ছিল; কারণ, তাঁহাদের বেশী রাত্রে বাড়ি ফিরিতে অসুবিধা হইবে। কিন্তু সন্ধ্যার তাড়ার কারণটা যে অন্য, সেটা একটু পরেই বোঝা গেল—সে নিজে হাতে কল্যাণীকে ফুলের গহনায় সাজাইয়া দিল বটে, তবে অনুষ্ঠান শেষ হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই অপেক্ষা করিল না, দাদুর অসুখের অজুহাতে এগারোটার ট্রেনেই কলিকাতায় ফিরিয়া গেল। রাত্রিটা এখানেই কোন রকমে কাটাইবার জন্য সকলে অনুরোধ করিলেন, সন্ধ্যা উৎসাহ দিলে মহেশবাবুর স্ত্রীও

রাতটা থাকিয়া তাহার সহিত একসঙ্গে আড়ি পাতিতে পারেন, এমন প্রস্তাবও করিলেন। এমন কি, স্বয়ং ভূপেনও একবার অনুরোধ করিল কিন্তু সন্ধ্যা কিছুতেই রাজী হইল না। এত রাত্রে বর্ধমানে গিয়া রাত্রি আড়াইটা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে—রাত্রির ট্রেন নিরাপদ নয়, এ-সব কোন যুক্তিই তাহাকে বিচলিত করিতে পারিল না।

ফলে সারাদিন ধরিয়া ভূপেনের বুকের মধ্যে পাষাণ-ভার যতটা হালকা হইয়া আসিয়াছিল তাহা যেন দ্বিগুণ ভারী হইয়া চাপিয়া বসিল। কল্যাণীও একটা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল, যেন নিজেকে খানিকটা অপরাধীও মনে হইতে লাগিল তাহার। শুধু তাহাই নয়—মহেশবাবুর স্ত্রী প্রভৃতি যে দুই-একজন মহিলা ছিলেন, তাঁহাদের যেন এই ব্যাপারের পর আর কোন উৎসাহ রহিল না—অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা যে যাহার বাড়ি চলিয়া গেলেন।

ফুলশয্যার রাত!

নিঃশব্দে নব-বিবাহিতা স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি শুইয়া, কেহ কাহারও অপরিচিত নয়, তবু প্রেমালাপ ত দূরের কথা—কথা কহিবার ইচ্ছা যেন নাই। প্রদীপের ক্ষীণ আলোতে জীর্ণ খড়ের চালাটার দিকে চাহিয়া ভূপেন সেই কথাটাই ভাবিতে লাগিল। ইহারই জন্য কি সে এত কাণ্ড করিয়া বাপ-মার অমতে হঠাৎ এই বিবাহ করিয়া বসিল!...এ রাতটি সম্বন্ধে মানুষের কত স্বপ্নই থাকে—ভূপেনেরও কম ছিল না—কিন্তু এ কী হইল? তাহার হঠকারিতায় শুধু তাহার নিজের জীবন এবং ভবিষ্যৎই বিড়ম্বিত হইয়া উঠিল না—আরও দুইটি জীবনও বোধ করি নষ্ট হইয়া গেল। বেচারী কল্যাণী! তাহাকে ত ভূপেনই জোর করিয়া বিবাহ করিয়াছে, সে ত দাবীও করে নাই, আশাও রাখে নাই—শুধু শুধু তাহাকে এ দুর্ভাগ্যের ঘূর্ণাবর্তে টানিয়া না আনিলেই ভাল হইত বোধ হয়। কে জানে হয়ত তাহার একদিন ভাল ঘরেই বিবাহ হইতে পারিত, এমন ত কত অসম্ভবই সম্ভব হয়, সে ক্ষেত্রে সে স্বামী-পুত্র লইয়া সুখেই ঘর-সংসার করিতে পারিত।

কল্যাণীর কথাটা মনে হইতেই সে স্ত্রী সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিল। যে কাজ সে করিয়াছে তাহার দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝিয়াই করিয়াছে, এখন আর পিছাইলে চলিবে না। সন্ধ্যার মান-অভিমান সন্ধ্যারই থাক্—তাহাদের দিবাস্বপ্ন হয়ত বিলাস, সাধারণ জীবনের প্রতিটি দিন-রাত্রির মধ্যে সে বিলাসের স্থান নাই। আজ আর ভূপেনের কিছু অজানা নাই—আজ সমস্তটাই চোখের সামনে স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছে। যেটাকে সে সন্ধ্যার ঔদাসীন্য ও উপেক্ষা বলিয়া মনে করিয়াছে, আসলে সেটা প্রচ্ছন্ন ঈর্ষা ও অভিমান। হ্যাঁ—কল্যাণী সম্বন্ধে সে ঈর্ষাই বহন করিত;

শিক্ষা ও সংস্কারে যত অসাধারণ মেয়েই সে হোক্, ভালবাসার এই স্তরে সব মেয়েই সমান। সেখানে সন্ধ্যার সহিত অন্য যে-কোন মেয়ের কোনও তফাৎ নাই।

অথচ, আশ্চর্য এই যে, এই সহজ কথাটা আজ যেমন সে অনায়াসে বুঝিল, সেদিন একবারও কি কল্পনা করিতে পারে নাই! তাহা হইলে হয়ত—ভূপেন মনে মনে বুঝি একটা অনুশোচনাই অনুভব করে—এতটা তাড়াতাড়ি সে করিত না।··· করিবার প্রয়োজন হইত না।

কিন্তু না—সে জোর করিয়া মনকে কল্যাণীর দিকে ফিরাইয়া আনে। যে কথা সন্ধ্যার দাদু সেদিন বলিয়াছিলেন তাহার পর আর অন্য কোন আশা রাখা সম্ভব ছিল না। কোন আত্মসম্মানবিশিষ্ট লোকের পক্ষে সে আশা রাখা উচিতও নয়। সন্ধ্যা ধনীদুহিতা, তাহার নানা রকম খেয়াল শোভা পায়—ভূপেন দরিদ্র স্কুলমাস্টার, তাহার কল্যাণীই ভাল। যে মেয়েটিকে সে জোর করিয়া সঙ্গিনী করিয়াছে, তাহার মনের অর্ধ-বিকশিত বাসনার সহস্রদলটিকে পূর্ণ প্রস্ফুটিত করিবার দায়িত্ব তাহারই—তা যদি সে পারে তবেই জীবন ধন্য হইবে।

কল্যাণীর দিকে ফিরিয়া দেখিল, সে কাঠ হইয়া শুইয়া আছে। একবার সন্দেহ হইল বুঝি সে নিঃশব্দে কাঁদিতেছে, কিন্তু পরক্ষণেই নিজের ভুল বুঝিতে পারিল; কান্নাও আর তাহার নাই, শুকাইয়া গিয়াছে। ভূপেন আস্তে আস্তে একখানা হাত কল্যাণীর গায়ের উপর রাখিয়া ডাকিল, কল্যাণী!

কল্যাণী শিহরিয়া উঠিল একবার, কিন্তু উত্তর দিল না। তখন ভূপেন তাহাকে জোর করিয়াই কাছে টানিয়া লইল, একেবারে বুকের মধ্যে আনিয়া আবার ডাকিল, কল্যাণী, আমার কি কিছু অপরাধ হয়েছে?

কল্যাণী স্বামীর বুকের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া তাহার অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের অভাবনীয়ত্ব অনুভব করিতে করিতে মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

—তবে? জোর করিয়া কল্যাণীর মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া তাহার নিমীলিত নয়নে নিজের ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিয়া চুপি চুপি কহিল, তবে কি আমার ওপর তোমার বিশ্বাস নেই? তোমার ভাগ্য আমার সঙ্গে জড়িয়ে কি তোমার ভয় করছে?

ইহার উত্তরে অনেক কথাই কল্যাণী বলিতে পারিত, কিন্তু বলিল না। তেমনি মাথা নাড়িয়াই জানাইল, না। ভয় ত তাহার করিবার কথা নয়—ভূপেনকে স্বামী বলিয়া উল্লেখ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াই ত সে ধন্য, কৃতার্থ। তাহার আর ভয় কি—যে কোন দুঃখের মূল্যই সে এই একটি রাত্রির জন্য দিতে প্রস্তুত আছে। তাহার সহিত ভাগ্য জড়াইয়া স্বামী ভয় পাইতেছেন কিনা—এই তাহার আশঙ্কা।

ভূপেন নির্বোধের মত বলিয়া ফেলিল, তবে কথা কইছ না কেন ? অমন চুপ ক'রে আছ কেন ?

এবার কল্যাণী কথা কহিল। চোখ না খুলিয়াই ম্লান একটু হাসিয়া কহিল, কথা কি আগে আমারই কইবার কথা ?

—তা বটে ! ভূপেন অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। কল্যাণীর হাসি-মুখের ঐ অল্প কয়েকটি কথা যেন নিঃশব্দে অনেকগুলি অভিযোগ বহন করিয়া আনিল। সে কল্যাণীকে সজোরে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, তা নয়। তবে তোমার শুয়ে থাকবার ভঙ্গিতে যেন আমার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ প্রকাশ পাচ্ছিল। তাই কি ?

মুহূর্ত-কয়েক চুপ করিয়া থাকিয়া কল্যাণী আস্তে আস্তে কহিল, অভিযোগ কি আমার থাকা সম্ভব ? তবে নিজেকে অপরাধী ভাবছিলাম বলেই—

সে মধ্যপথেই থামিয়া গেল। ভূপেন কহিল, অপরাধ ? তোমার কী অপরাধ থাকতে পরে কল্যাণী ?

কল্যাণী মুখখানা যেন আরও নিবিড় ভাবে ভূপেনের বুকের মধ্যে গুঁজিয়া কহিল, আমাকে দয়া করতে গিয়েই ত নিজের এত বড় সর্বনাশ করলেন !

—ছিঃ ! দয়া কথাটা উচ্চারণ করতে নেই। আমি তোমাকে ভালবেসে নিয়েছি এটা কেন ভাবতে পারছ না।

—হয়ত তাই ! কল্যাণী চরম সাহসে ভর করিয়া বলিল, তবু আমি যে তা বিশ্বাস করতে পারছি না। আমার কোন যোগ্যতাই নেই, সে কথা আমি কী ক'রে ভুলব বলুন।...তা ছাড়া আপনি যেটা ভাবছেন হয়ত সেটাই ভুল—সে ভুল যে দিন ভাঙবে সে দিন এত বড় অনিষ্ট করবার জন্যে আমাকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারবেন না।

তারপর মুহূর্ত-কয়েক চুপ করিয়া থাকিয়া আবার কহিল, আমি নিজেকে দিয়েই সন্ধ্যাদি'র দুঃখের কথাটা বুঝতে পারছি—আর লজ্জায় মরে যাচ্ছি, আমার মত সামান্য মেয়ের জন্যে তার জীবন ব্যর্থ হ'তে দেওয়াটা কোন মতেই উচিত হয় নি।

ভূপেন তাহার ললাটে একটি চুম্বন করিয়া কহিল, তোমার কোন লজ্জা, কোন অপরাধ নেই। সন্ধ্যা বড়লোকের মেয়ে—তার জীবন এত সহজে ব্যর্থ হয় না।

কল্যাণী এবারও মৃদু হাসিয়া কহিল, বড়লোকের মেয়েদের হৃদয় থাকে না এ কথা অন্ততঃ সন্ধ্যাদিকে দেখবার পর আর বিশ্বাস করতে পারি না। আপনি তার যা অনিষ্ট করেছেন—তার ওপর অন্ততঃ এ অপবাদটা আর দেবেন না।

তীক্ষ্ণ ছুরির মত ভূপেনের বুকে কী যেন একটা আঘাত বিঁধিল। সেই প্রায়ান্ধকার প্রদীপের আলোতে কল্যাণী স্বামীর মুখের চেহারাটা দেখিতে পাইল

না—শুধু তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া ব্যাপারটা অনুমান করিতে পারিল।

কল্যাণীর দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দে চমক ভাঙিয়া ভূপেন কথাটাকে চাপা দিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, কেউ যদি অকারণে দুঃখ পায় আমি কী করব বলো, আমার দিক থেকে অন্ততঃ কোন প্রশ্রয় ছিল না। আমি যাকে বেছে নিয়েছি নিজের জীবন-সঙ্গিনী ক'রে, তাকে শুধু দয়া ক'রেই আত্মীয়-স্বজন সকলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে করেছি, এ কথা মনে করবার কোন কারণ নেই। তুমি আমাকে বিশ্বাস ক'রো—আমার ভালবাসায় বিশ্বাস রেখো, এইটুকুই শুধু চাই। তোমার মনে কোন সংশয় থাকলে জীবনের সোজা পথে কী ক'রে চলব বলো?

শেষের কথা সব বুঝিল না, বুঝিবার চেষ্টাও করিল না, শুধু প্রথম দিককার কথাগুলিই অসহ্য একটা সুখের বেদনাতে কল্যাণীর মনের মধ্যে রিণ্ রিণ্ করিতে লাগিল। হায় রে! তবু কথাটা যদি সে সত্য-সত্যই বিশ্বাস করিতে পারিত। সন্ধ্যার চোখের মধ্যে যে বিপুল ইতিহাস লিখিত ছিল তাহা ভূপেন অন্ধ বলিয়াই হয়ত এতদিন দেখিতে পায় নাই—কিন্তু কল্যাণী ঠিকই দেখিয়াছে। যেখানে ভালবাসার প্রশ্ন সেখানে বোধ হয় কোন মেয়েই ভুল দেখে না। তাহাদের সজাগ উদগ্র দৃষ্টিতে অনেক সময় মনের অবচেতন স্তরের কথাও ধরা পড়ে।

কল্যাণী প্রাণপণ চেষ্টায় আর একটা দীর্ঘনিশ্বাস দমন করিয়া ভূপেনের উত্তপ্ত চুম্বনের মধ্যে নিজেকে যেন নিঃশেষে ছাড়িয়া দিল।

২৪

উপেনবাবুর দিক হইতে যে আক্রমণটা আশঙ্কা করিয়াছিল ভূপেন, সেটা আর আসিল না। তাঁহারা কথাটা প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই বলিয়াই বোধ হয় অত চেঁচামেচি করিতে পারিয়াছেন; কিন্তু ঘটনাটা যখন সত্যসত্যই ঘটিল তখন সে আঘাতের তীব্রতায় তাঁহারা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। মায়ের মনে কী ছিল কে জানে—হয়ত বা শেষ পর্যন্ত তিনি ক্ষমা করিয়া পুত্র-পুত্রবধূকে ডাকিতেও পারিতেন, কিন্তু উপেনবাবুর মুখের চেহারা দেখিয়া তিনিও চুপ করিয়া থাকিতে বাধ্য হইলেন। উপেনবাবুর সমস্ত প্রকৃতি যেন, এই একটা আঘাতে, একেবারে বদলাইয়া গেল। তিনি এখন কাহারও সহিত কথা বলেন না—মেয়েদের আগে কারণে-অকারণে বকিতেন, এখন তাহাদের সঙ্গেও কথা কওয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। মাথা নিচু করিয়া অফিস যান, অফিস হইতে আর বাড়ি আসেন না—একেবারে একটা টিউশনী-সারিয়া গভীর রাত্রে বাড়ি ফেরেন এবং কোন মতে দু'টি ভাত মুখে

গু জিয়া শুইয়া পড়েন। শুধু তাই নয়, মানুষটা যেন এই কয় দিনে একেবারে বুড়া হইয়া গিয়াছেন।

এ-সব ভূপেন অবশ্য জানিতে পারে না—তবে তাঁহাদের এই স্তব্ধতায় অনেকখানি অনুমান করিতে পারে। তিরস্কার, অনুযোগ কোনটাই যখন আসিল না তখন তাঁহাদের আঘাতের গুরুত্ব বুঝিতে তাহার দেরি হইল না। মাসের প্রথমে সে নিয়মিত ভাবেই টাকা পাঠাইয়াছিল—সে টাকা যথাসময়ে ফেরত আসিল। এ আশঙ্কাটা ভূপেনের ছিলই, সুতরাং সে বিস্মিত হইল না, টাকাটা আলাদা করিয়া পোস্ট অফিসে জমা রাখিয়া দিল।

বিবাহের কিছুদিন পরে ভূপেন দু'খানা চিঠি লিখিল, একটা সন্ধ্যাকে ও একটা শান্তিকে। শান্তি জবাবই দিল না—সন্ধ্যার কাছ হইতে কয়েকদিন পরেই উত্তর আসিল। সে চিঠি পড়িয়াই ভূপেন বুঝিল যে সন্ধ্যা প্রাণপণ চেষ্টায় মুখোশ পরিয়াছে। চিঠি ছোট নয়—ইচ্ছা করিয়াই সে বড় চিঠি লিখিয়াছে, পাছে মনের কোন দুর্বলতা প্রকাশ পায়। অথচ সে চিঠিতে অন্তরঙ্গ কথা একটিও নাই। এ-কথা সে-কথা—লেখাপড়ার কথাই বেশী। দাদুর অসুখের কথা, ভূপেনের ইস্কুলের কথা এমনি আরও অনেক কথা আছে। সহজ হইবারই চেষ্টা করিয়াছে তবু সে যে সহজ হইতে পারে নাই, সেটা ভূপেনের কাছে চাপা থাকে না।

এমনি করিয়া আত্মীয়-স্বজন এবং সহস্র-আত্মীয়াধিক সন্ধ্যার নিকট হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূপেনকে নূতন জীবন শুরু করিতে হইল। সে কাজের মধ্যেই নিজেকে ডুবাইয়া দিল। ইস্কুলে অনেক বেশী কাজ করে সে ইচ্ছা করিয়াই, তার পর কোচিং আছে! সালেক ও পদনকে এবং আরও গুটিপাঁচছয় ছেলেকে লইয়া আজকাল সে বাড়িতেই পড়াইতে বসে। এখানে বিজয়বাবুও তাহাকে খানিকটা সাহায্য করেন, মুখে মুখে তিনি অনেকটা পড়ান। অন্য ছেলেদের ছাড়িয়া দিবার পরও সে ঘণ্টাখানেক সালেক ও পদনকে লইয়া কাটায়—যেন উহাদের সার্থকতার উপর তাহারই জীবনমরণ নির্ভর করিতেছে। এই সব কাজের ফাঁকে যেটুকু সময় পায়, অভাবের সংসারে জোড়াতালি দিতে দিতেই কাটিয়া যায়। বাজার-হাট সবই তাহাকে দেখিতে হয়—রাখু অবশ্য শারীরিক খানিকটা সাহায্য করে। এ ছাড়া কোথায় ঘরের চাল সারানো, সস্তায় কোথায় খড় পাওয়া যায় সংগ্রহ করা—এজন্যও খানিকটা ছুটাছুটি আছে। বছর-দুই আগেকার কলিকাতার ছাত্র ভূপেনকে এখন যেন সে নিজেই চিনিতে পারে না। এ-সব কাজ হয়ত সব তাহার না করিলেও চলে, কিন্তু খানিকটা সে ইচ্ছা করিয়াই করে। সংসারের সব কিছুর সঙ্গে সে পরিচিত হইতে চায়—অনেক পোড় খাইয়া খাঁটি ইস্পাত হইবার ইচ্ছা তাহার।

এই সমস্ত কাজে ও অকাজে সারাদিন কাটাইয়া গভীর রাত্রে ও ভোরবেলা সে নিজের পড়া পড়িতে বসে। আর অবহেলা করা সম্ভব নয়—এম. এ. পরীক্ষা দিয়া পার্থিব উন্নতির কিছু চেষ্টা করিতেই হইবে। এই সামান্য আয়ে এত বড় একটা সংসার চালাইয়া ভগিনীদের বিবাহের জন্য টাকা জমানো অত্যন্ত কঠিন। বস্তুতঃ তিনটি সংসারের চিন্তা তাহার—একটা নিজের, একটা বিজয়বাবুর এবং আর একটা তাহার বাবার। সুতরাং সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবে দেশের ছেলেদের তৈরী করার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করিবার মত অবস্থা আর তাহার নাই।

কিন্তু—এক-এক সময়ে সে নিজেকে প্রশ্ন করে—এই একটানা কর্মের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া রাখার মূলে কি এই বাহ্যিক কারণগুলিই সব? অত্যন্ত লজ্জার সহিত হইলেও, তাহাকে তখন মনে মনে স্বীকার করিতে হয় যে, নিজের সন্ত সচেতন মনের কাছ হইতে পলায়ন করিবার চেষ্টাও কতকটা আছে ইহার মধ্যে। সন্ধ্যার কাছ হইতে চিরকালের মত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবার আগে পর্যন্ত সে বুঝিতে পারে নাই যে, সন্ধ্যা ঠিক তাহার কতখানি। তাহার সম্বন্ধে সমস্ত আশা চিরকালের মত বিসর্জন দিয়া সে বুঝিতে পারিয়াছে যে, এত কাল সে নিজেকে প্রবঞ্চনাই করিয়াছে। অনেক আশা ছিল তাহার এই মেয়েটিকে কেন্দ্র করিয়া। সহজে সে এই ছাত্রীটিকে ভালবাসিয়াছিল বলিয়া ভালবাসার প্রকৃতিটা বুঝিতে পারে নাই। আজ সে বুঝিয়াছে—শুধু সন্ধ্যাকে দিয়া নয়, এখানকার ছাত্রদের দিয়াও—যে, বাপ-মা যেমন আত্মজদের মধ্যে নিজেদেরই দেখেন, তেমনি দেখেন গুরু তাঁহার মেধা-সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নিজের আত্মাকেই। যা নিজের সৃষ্টি, যাহার মধ্যে নিজের মনন ও কল্পনা প্রতিফলিত হয়, তাহার প্রতি আকর্ষণ উগ্র হওয়াই স্বাভাবিক; কারণ, মানুষ ভালবাসে সবচেয়ে নিজেকেই। ছেলে-মেয়েদের সম্বন্ধে অন্য আকর্ষণ থাকা সম্ভব নয়, তবু যে পরিমাণ ঈর্ষা ও একাগ্রতা সে দেখিয়াছে, তাহাতেই ভালবাসার তীব্রতাটা অনায়াসে অনুমান করিতে পারে। অনেক ভাড়াটেদের সহিত ভূপেন বাস করিয়াছে—জীবন দর্শন করিবার সুযোগ মিলিয়াছে তাহার বিস্তর, পুত্রবধূদের সম্বন্ধে শাশুড়ীদের যে প্রকার বিদ্বেষ সে দেখিয়াছে, তাহাতে অনেক ক্ষেত্রে এমন প্রশ্নও মনে উঁকি মারিয়াছে যে পুত্রের হৃদয়ে ভাগ বসাইবার জন্যই কি এই বিদ্বেষ তাঁহাদের! কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের বেলায়, যেখানে সম্পর্কগত কোন বাধা নাই, যেটুকু আছে শুধুই সংস্কারগত—সেখানে যদি আকর্ষণটা যৌন-সম্পর্কে পরিণত হয় ত ঠেকাইবে কে? অবশ্য এ পরিণতিটা আজও ভূপেন মানিতে প্রস্তুত নয়—আজও শব্দটা মনে হইলে সে শিহরিয়া ওঠে—ঐ ছাত্রীটি যে তাহার জীবনের প্রায় সমস্ত আনন্দদায়ক

অনুভূতির সহিত জড়াইয়া গিয়াছে, এ কথা আজ সে অস্বীকার করিবে কেমন করিয়া?···এ সব কথা এত দিন এমন করিয়া ভাবে নাই, অনভিজ্ঞ ও অন্ধ ছিল বলিয়াই সে মোহিতবাবুর উপর সে-দিন অভিমান করিয়াছিল, কিন্তু আজ তাঁহার সতর্কতার কারণ সম্বন্ধে ভূপেনের মনে কোন সংশয় নাই। বরং মনে হয় আরও আগে সাবধান হইলেই তিনি ভাল করিতেন।

তবু—নিজের মানস-সমস্যার জটিলতায় ভূপেন নিজেই বিস্মিত হয়। কল্যাণী সম্বন্ধেও আকর্ষণ তাহার ত কম নয়। বিশেষ করিয়া যত দিন যাইতেছে সেটা শ্রদ্ধার সহিত মিশিয়া দৈহিক আকর্ষণের স্তর ছাড়াইয়া যেন আরও অনেক উপরে উঠিতেছে। কল্যাণী আশ্চর্য, কল্যাণী অদ্ভুত। শুধু যে সে প্রাণপণে তাহার সাংসারিক দায়িত্বের বোঝা হাল্‌কা করিয়া নিজের কাঁধে তুলিয়া লইতেছে কিংবা প্রতিটি মুহূর্ত অতন্দ্র থাকিয়া ইচ্ছা বুঝিয়া তাহার সেবা করিতেছে তাই নয়—মেয়েদের যেটা সবচেয়ে বড় দুর্বলতা সেই অভিমান পর্যন্ত বিসর্জন দিয়াছে। সে বোঝে যে তাহার স্বামী কেন এমন করিয়া প্রাণপণে নিজেকে কাজের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়াছেন, তবু কোন দিন একটি অনুযোগ করে না, বরং নিজেকে সযত্নে তাঁহার সামনে হইতে সরাইয়া রাখে। তাই বলিয়া সে সরাইয়া রাখার মধ্যে এতটুকু অভিমানের প্রশ্ন নাই—ভূপেন তাহার মানসিক বিপ্লবের মধ্য হইতে স্ত্রী সম্বন্ধে যখনই সচেতন হইয়া ওঠে, যখনই কাছে ডাকে, তখনই সে ভূপেনের আদরের মধ্যে নিজেকে নিঃশব্দে ও নিঃশেষে বিলাইয়া দেয়। প্রয়োজন মত কাছে আসে, প্রয়োজন ফুরাইলেই কোন ক্ষোভ, কোন দাবি না রাখিয়া দূরে সরিয়া যায়—নিজের উপস্থিতি বা অধিকার কোনটা দিয়াই স্বামীর জীবনকে বিড়ম্বিত করে না। যে মেয়েটি নিজের আত্মসম্মান পর্যন্ত বিসর্জন দিয়া তাহাকে ভালবাসিয়াছে তাহার সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ও বিস্ময় বোধ না করিয়া পারে না ভূপেন। হ্যাঁ—কল্যাণীকে পাইয়া তাহার জীবন সার্থক হইয়াছে, কল্যাণী মধুর, কল্যাণী অপরিহার্য—কল্যাণীর জন্য আর সকলকে ছাড়িয়াও কোন ক্ষোভ নাই তাহার—অথচ, তবু যেন কোথায় একটা অভাব, একটা শূন্যতাবোধ পীড়া দিতে থাকে। মনে হয়, কল্যাণী তাহার অর্ধাঙ্গিনী কিন্তু সহধর্মিণী নয়, কল্যাণী প্রিয়া কিন্তু মানসী নয়। কল্যাণী অনেকখানি তবু সবটা নয়। কল্যাণীকে পাইলে জীবন সার্থক হয়—কিন্তু তাহার জন্য তপস্যা করা যায় না। তাহার আত্মা যুগ যুগ ধরিয়া যাহার পদধ্বনি গণিয়াছে সে আর কেহ—কল্যাণী নয়।

তবু দিন কাটে। সাধারণ দরিদ্র গৃহস্থের মত সংসার করিতে হয়। বাংলা দেশের অধিকাংশ ইস্কুল-মাস্টারের মতই প্রায় অর্ধাশনে শিক্ষকতা করে ভূপেন।

মহেশবাবু তাঁহার কথা রাখিয়াছেন—নিজের ব্যক্তিগত প্রভাব খাটাইয়া কমিটির বিরোধিতা সত্ত্বেও ভূপেনের পাঁচ টাকা মাহিনা বাড়াইয়া দিয়াছেন। যেখানে মোট আয় ছিল পঁয়তাল্লিশ টাকা—সেখানে পাঁচ টাকা বৃদ্ধি পাওয়াতে সুবিধা হয় বৈ কি! মহেশবাবুর প্রতি দিনদিনই সে আকৃষ্ট হইতেছে। বেশ মানুষটি! সব চেয়ে যেটা তাঁহার বড় গুণ, তিনি মোটেই কাঁনপাতলা নন্। ইস্কুল হইতে তাহার ঈর্ষাতুর সহযোগীরা অনেক কথাই মহেশবাবুর কানে তোলেন, তাহা সে প্রতিনিয়তই টের পায়, কিন্তু মহেশবাবু সে সব অভিযোগের সত্য-মিথ্যা এক দিনও যাচাই করেন না, নিজের মানুষ চিনিবার ক্ষমতায় অটল হইয়া বসিয়া থাকেন।

আর বিস্মিত হয় সে ললিতবাবুকে দেখিয়া। নিয়মাবলীর বাহিরে তিনি এক পা-ও বাড়াইবেন না, কর্তৃপক্ষের অনুমোদন থাকিলেও না। সেক্রেটারী কোন কথা বলিলেও তিনি বলেন, আপনি লিখিত অর্ডার দিন—নইলে পারব না। তাঁহার মূল কর্তব্য যে ছেলেদের শিক্ষাদান করা এবং শিক্ষালাভের উপায়টাকে অব্যাহত রাখা, এ-কথা তিনি কিছুতেই মানেন না—অফিসের কাজ চালানোকেই তিনি তাঁহার সব চেয়ে বড় কর্তব্য বলিয়া মনে করেন! এ কথা লইয়া প্রায়ই ভূপেনের সহিত তাঁহার ঠোকাঠুকি বাধে। তবে ভদ্রলোকের একটা গুণ আছে যে, তিনি ভূপেন সম্বন্ধে অন্য শিক্ষকদের মতই ঈর্ষিত হইলেও—অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করেন না।

ললিতবাবুর এই অদ্ভুত মনোভাবের যে একটা ইতিহাস আছে ভূপেন তাহা বোঝে—কিন্তু কোন মতেই আসল কারণটা তাঁহার মুখ হইতে বাহির করিতে পারে না। শিক্ষকদের কর্তব্যবোধের কথা উঠিলেই তিনি বিরক্ত হন কেন, এ কৌতূহল তাহার দিন দিন বাড়িয়াই যায়। অবশেষে একদিন কথাটা প্রকাশ হইয়া পড়িল। ভূপেন সে-দিন তাঁহার ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, দেখুন আপনি ত আমার সব কথাকেই বাড়াবাড়ি মনে করেন—কিন্তু ক্লাসে বসে শিক্ষকদের সিগারেট খাওয়া এবং থিয়েটারের গান গাওয়াটাও কি আপনি অনুমোদন করতে বলেন?

একটু বাঁকা হাসিয়া ললিতবাবু প্রশ্ন করিলেন, লোকটি কে?

ভূপেন মুহূর্ত কয়েক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, নামটা তো আমার করা উচিত নয়, এ-সব আপনারই দেখবার কথা। তবু আমিই বলছি—সেকেণ্ড পণ্ডিত মশাই ক্লাসে বসে তামাক খেতেন, আমরা বলাতেই তিনি বন্ধ করেছেন, কিন্তু অধর সিগারেট খাওয়া বন্ধ করতে রাজী নয়। সেটা যদি বা সহ্য করেছিলুম—যে-

সব গানের নমুনা পাচ্ছি ছাত্রদের মারফৎ—তার পরেও যদি চুপ ক'রে থাকি ত অপরাধ হবে।

অধর মহেশবাবুর দূর-সম্পর্কের ভাগিনেয়—আই-এ ফেল করিয়া মাস্টারীতে ঢুকিয়াছে। গান-বাজনায় অত্যন্ত ঝোঁক, অবসর পাইলেই বাড়ি গিয়া তবলা ঠোকে।

ললিতবাবু জবাব দিলেন, ক্লাসে বসে সিগারেট খাওয়ায় দোষটা কি মশাই? আমাদের আইনে ত কোথাও বাধা নেই। ছাত্ররা ত আর গুরুজন নয়।

—গুরুজনদের সামনে খেলে আমি কিছুই বলতাম না, কারণ তাঁদের আর চরিত্র গঠন করবার সময় নেই, তাঁদের যা হবার তা হয়েই গেছে। কিন্তু ওরা ছেলে-মানুষ, শিক্ষকদের ওরা আদর্শ বলে মনে করে, তিনি যদি ওদের সামনে বসেই বিড়ি খান আর প্রেমের গান ভাঁজেন ত সেটা ওরা অন্যায় বলে ভাববার অবসরই যে পাবে না। এর পর মুখে ওদের অন্যায় বললে শুনবে কেন? ভাববে একটা মজার জিনিস থেকে নিতান্ত স্বার্থপরের মত আমরা ওদের বঞ্চিত করতে চাইছি! আমার ত মনে হয় যে প্রত্যেক লোকেরই, যারা ছেলেদের মানুষ করতে চায়, গুরুজনদের সমীহ না ক'রে ছেলে-মেয়েদেরই সমীহ করা উচিত, অন্যায় কাজের জন্য তাদের কাছেই বেশী লজ্জাবোধ করা উচিত।

ললিতবাবু এবারেও বিদ্রূপের সুরে কহিলেন, যাদের জন্য আপনার অত মাথা-ব্যথা তাদের মধ্যে শতকরা সত্তরটা ছেলেই বাড়িতে তামাক ধরেছে কি না সেটা আগে খবর নিন!

ভূপেন শান্তভাবেই জবাব দিল, হয়ত তাই, হয়ত বা আরও বেশী—খুব সম্ভব শতকরা নব্বই জনই খায়। কিন্তু যে দশজন এখনও ধরে নি আমরা কি তাদের বাঁচাবার চেষ্টা করব না? যে দশজনের এখনও কিছু হবার আশা আছে তাদের জন্যই ত আমাদের আরও সতর্ক হওয়া দরকার।

—বিড়ি-সিগারেট ত আজকাল সবাই খাচ্ছে—এমন কি অনিষ্ট হচ্ছে তাদের? কলকাতার সব ছেলেরাই প্রায় খায়। এদেরও বাপ-দাদা ছেলেবেলা থেকে তামাক খেয়ে আসছে, তারা ত আর মরে যায় নি!

—তা যায় নি বটে—তবু সেটা না খেলে যে ওরা আরও সুস্থ থাকত এটা বোধ করি আপনিও মানবেন। তা ছাড়া ওটা একটা **symbol**—ঐ বাধাটা ভাঙলে কোথায় গিয়ে থামবে কে জানে। ঐ বাধাটুকুতেই অনেক কিছু ঠেকিয়ে রাখা হয়!

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ললিতবাবু প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা, আপনি কি সত্যি-

সত্যিই মনে করেন যে ওদের কারুর কিছু হবে ?

ভূপেন বিস্মিত হইয়া কহিল, সে কী ! সে কথা মনে না করলে এ ভূতের বেগার দিচ্ছি কার জন্য বলুন ? ঐ একমাত্র আশাতেই ত সব কিছু সহ্য করছি মাস্টারমশাই !

অকস্মাৎ কথাগুলিতে অতিরিক্ত জোর দিয়া বিষাক্ত কণ্ঠে ললিতবাবু কহিলেন, তাহ'লে সে আশা বিসর্জন দিয়ে পুকুরের জলে ডুবে মরুন গে। বাংলা দেশের লোক ! হুঁ···কিচ্ছু হবে না—কিচ্ছু না—কোন আশা রাখবেন না ! যে ক'টা দিন পরমায়ু আছে দিনগত পাপক্ষয় ক'রে যান ! যাদের জন্য আপনার এত মাথা-ব্যথা তারা সবাই জাতসাপের বাচ্ছা, তা ভুলবেন না—সব ক্ষুদে শয়তান !

—কেন বলুন তো আপনার এত পেসিমিজম ?

পেসিমিজম ! বলেন কি মশাই ? কি-ই বা আপনার বয়স, জানেনই বা কি ? কী জ্বালায় জ্বলেছি তা যদি জানতেন ! আমিও মশাই আপনারই মত আদর্শবাদী ছিলুম, তাই এই লাইনে আজও পচছি ; নইলে হয়ত চেষ্টা-চরিত্র ক'রে সরকারী চাকরি একটা বাগাতে পারতুম। এম-এ পাস করার পর সবাই বলেছিল সেই চেষ্টাই করতে, তখন কারুর কথা শুনি নি—দেশে গিয়ে বসলুম গ্রামের উন্নতি করব বলে।···গ্রামের ইস্কুলটা বহু কালের কিন্তু দলাদলিতে তখন প্রায় উঠে যাবার দাখিল হয়েছিল। হেডমাস্টার নেই, বাইরে থেকে ভাল লোক এনে তার মাইনে দিতে পারে এমন সঙ্গতিও নেই। বৃদ্ধরা বললেন, এত কালের ইস্কুল, তোর বাপ-দাদা এইখানে পড়েছে, উঠে যাবে ? তার চেয়ে তুই ভার নে।···নিলুম ভার, আপনারই মত উৎসাহ তখন, দিনরাত খাটি আর কিসে ছেলেদের ভাল হবে, কিসে ইস্কুলের উন্নতি হবে ভাবি। উন্নতি হয়েও ছিল, ছেলে বাড়ল, আয় বাড়ল—একটা সরকারী সাহায্য পাবারও আশা হ'ল—কিন্তু যাঁরা ইস্কুল নিয়ে দলাদলি করছিলেন তাঁরা গেলেন বিষম চটে, বিশেষতঃ গ্রামের জমিদার,—আমাদের কোন কোন রাজনৈতিক নেতাদের মত তাঁরও ধারণা ছিল যে, গ্রামের উন্নতি যদি তাঁর সাহায্যে ও যথেচ্ছাচারিতায় আসে ত আসুক—নইলে এসে দরকার নেই। নেতাদেরও যেমন ব্যক্তিগত হাততালি পাওনাটা আগে, দেশের স্বাধীনতা পরে, তাঁরও তাই। তাঁর মনে হ'ল ইস্কুলটা বাঁচাবার সমস্ত বাহাদুরিটা ঐ ছোঁড়া পাবে, জেলার হাকিম থেকে শুরু ক'রে সমস্ত কর্তারা জানবেন যে, যা কিছু করেছে ঐ ছোঁড়া—এ ত তাঁরই অপমান। ব্যস ! তিনি আদা-জল খেয়ে লাগলেন আমার পেছনে। প্রথমে ইস্কুলের টাকা তছরুপের দায়ে জড়াতে চেষ্টা করলেন, পারলেন না ; ইস্কুলের ছেলেদের গোপনে রাজদ্রোহ শেখাচ্ছি

এমন সুনামও দিলেন—আর তাতে প্রায় সফলও হয়েছিলেন, কারণ হাকিমরা এইটেই বিশ্বাস করতে চান—তবু শেষ পর্যন্ত সে ধাক্কাও কাটিয়ে উঠলুম ; ইতিমধ্যে মজা হ'ল, যাঁরা ইস্কুল নিয়ে এর আগে দলাদলি করেছিলেন হঠাৎ দেখি সেই দু'পক্ষই আমার বিরুদ্ধে এক হয়ে গেছেন। তাঁদের সকলেরই ধারণা যে তাঁরা থাকতে ইস্কুলটাকে বাঁচিয়ে আমি খুব অন্যায় করছি। ফলে শেষ পর্যন্ত আমার মায়ের বয়সী এক বিধবার ঘরে জোর ক'রে ঢোকা ও অসদুদ্দেশ্যে তাঁর শ্লীলতাহানি করার অভিযোগে ধরা পড়লুম। আমার তখন তেইশ-চব্বিশ বছর বয়স মশাই—মনে কত আদর্শ ও আশা—ও সব কথা তখন ভাবতেও পারতুম না। তখন যে কী করব তাই ভেবে পাই না, এমন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলুম। আরও অবাক হবেন শুনলে, সাক্ষীদের মধ্যে ইস্কুলের দু'টি ছাত্রও ছিল। সব চেয়ে দুঃখের কথা এই, এমনই সাক্ষ্য-প্রমাণ আমার বিরুদ্ধে যে, নিজের মা-সুদ্ধ ছেলের চরিত্রে বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। নেহাৎ বরাত জোর—বামুনের ছেলে, উকীলের পরামর্শ-মত আদালতে পৈতে বার ক'রে সেই মেয়ে-ছেলেটিকে শাসাতে সে ভয় পেয়ে মকদ্দমা কাঁচিয়ে ফেললে !...এর পরেও বলেন এ দেশ সম্বন্ধে আশা রাখতে ?

ভূপেন স্তম্ভিত ভাবে, হতভম্বের মত তাঁহার কথা শুনিতেছিল—এখন একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া নড়িয়া-চড়িয়া বসিল...এক রকম যেন জোর করিয়াই—নিজের হতচেতন মনকে ধাক্কা মারিবার জন্যই বলিল, হ্যাঁ, তবুও আশা রাখতে হবে ! বরং এই জন্যই ত আরও আমাদের চেষ্টা করা উচিত মাস্টারমশাই ! এই কাজ যাঁরা করলেন, কুশিক্ষা ও অশিক্ষাতেই তাঁরা এটা করতে পেরেছেন। ছেলেবেলা থেকে মানুষ করবার চেষ্টা না করলে তারা এর পর ভাল নাগরিক হবে এটাই কি আশা করেন ? আমাদের মতই আমাদের পূর্বাচার্যরা নিজেদের কর্তব্যের অবহেলা করেছেন বলে এটা সম্ভব হয়েছে—আর যাতে এ রকম না হয়, আপনার মত আর কেউ না বিড়ম্বিত হন, সে চেষ্টা করা কি উচিত নয় ?

মুখখানা বিকৃত করিয়া ললিতবাবু বলিলেন, পারেন করুন গে যান। আমার অত উদ্যম বা উৎসাহ নেই। অধর ত শুনেছি মহেশবাবুর আত্মীয়, আর মহেশবাবুও আপনার হাতের লোক, তাঁকেই বলুন গে !

এক মাস দুই মাস করিয়া ভূপেনের বিবাহিত জীবনের পুরা একটি বৎসর কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে ভূপেনের দুর্ভাবনা এবং দায়িত্ব আরও বাড়িয়াছে—কল্যাণী অন্তঃসত্ত্বা। কথাটা মনে পড়িলেই দুশ্চিন্তায় ভূপেনের রক্ত জল হইয়া যায়। অর্থ-বল নাই—লোকবল নাই। বাড়িতে সে দুই-একখানি চিঠি লিখিয়া ছিল কিন্তু

সেখানকার অবস্থা পূর্ববৎ—শান্তির নাকি বিবাহের ভাল সম্বন্ধ আসিয়াছিল, অর্থাভাবে হয় নাই। এসব খবর সে বিশুর মারফৎ পায়। কিছু টাকা ভূপেন দিতে পারে—বিশু এরকম আভাসও দিয়াছিল কিন্তু উপেনবাবু সে কথা কানে তোলেন নাই, বলিয়াছেন—তার আগে মেয়ের গলা টিপে মেরে ফেলব। ভূপেনের মা গোপনে আশীর্বাদ জানাইয়াছেন—বোন শান্তি বৌদিদির জন্য কৌতূহল প্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। এ-সময়ে স্ত্রীকে নিজের বাড়িতে পাঠাইতে পারিলে কিংবা মা-বোন কাহাকেও এখানে আনাইতে পারিলে সে বাঁচিয়া যাইত কিন্তু সে সম্ভাবনা মোটেই নাই। বন্ধুদের সঙ্গে বহু কালই ছাড়াছাড়ি হইয়া গিয়াছে—এক বিশু এখনও চিঠি দেয় বছরে দুই-তিনখানা, তবে সেও বিবাহ করিয়াছে, সামান্য মাহিনার চাকরি করে—নিজের জীবন লইয়া সে-ও বিব্রত। তাহার কাছে কোন আশা রাখাই বিড়ম্বনা।

এক আছে সন্ধ্যা—কিন্তু তাহারও চিঠির সংখ্যা খুব কমিয়া আসিয়াছে। ভূপেনও চিঠি দিয়া আর পুরাতন স্মৃতি ঝালাইতে চায় না। যাহা হইবার নয়—যাহার চিন্তামাত্রও তিনজনের কাছেই বেদনাদায়ক, তাহা ভুলিয়া যাওয়াই ভাল। ভূপেন কল্যাণীর কথাই বেশী করিয়া ভাবে আজকাল—অন্ততঃ তাহার জীবনটা যাহাতে ব্যর্থ না হয়।

চিন্তার শেষ নাই—অথচ যে কাজের মধ্যে সে চিন্তা ভুলিয়া থাকিতে পারিত সেই কাজও কম। এম-এ পরীক্ষার পড়া শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন শুধু পরীক্ষা দেওয়া বাকী। একগাদা টাকা ফী দিতে হইবে—তাহার কোন যোগাড়ই নাই। সংসারের অনটন বাড়িয়াই চলিয়াছে, আয় বাড়ে নাই। বোনের জন্য যে ক'টা টাকা রাখিয়াছে এক ভরসা সে-ই ক'টা টাকাই, কিন্তু তাহাতে হাত দিতে ইচ্ছা করে না। ওটা প্রায়শ্চিত্তের টাকা—তা ছাড়া কল্যাণীর এই অবস্থা, অসুখ-বিসুখ ত যে-কোন সময়েই হইতে পারে, তখন আর দ্বিতীয় উপায় থাকিবে না। প্রভিডেন্ট ফণ্ডে'আর সামান্যই পড়িয়া আছে, সেখান হইতেও ধার করিয়া সে পড়ার বই আনাইয়াছে—কোথাও কিছু নাই। শেষ পর্যন্ত হয়ত মহেশবাবুর কাছেই হাত পাতিতে হইবে।

এধারে পড়ানোর কাজও কমিয়াছে—গ্রামের কয়েকটি লোক মহেশবাবুর কাছে নালিশ করিয়াছে যে ছোকরা মাস্টারটি নাকি বেশী পড়াইয়া ছেলেদের বিগ্‌ড়াইয়া দিতেছেন। ছেলেরা এভাবে পড়িলে ধর্ম-কর্ম-সংসার কিছুই মানিবে না, এখনই বাঁকা বাঁকা কথা বলে। চাষার ছেলে চাষ করিয়া খাইতে হইবে, জমিদারের রাজ্যে বাসও করিতে হইবে যখন—তখন এ-সব বাঁদরামো শিখিলে চলিবে কেন?

—তাহারা নাকি এখনই বলে যে, হাত-পা থাকিলেই মানুষ হয় না—সম্পর্কে গুরুজন হইলেই প্রণাম করিবার উপযুক্ত হয় না। তাহারা বলে, বড় হইয়া চাষের কাজ ভাল করিয়া শিখিয়া নূতন ধরনে চাষ করিবে! এমন করিলে কোন্ ভরসায় ছেলেদের স্কুলে পাঠানো যায়?

অগত্যা কোচিং-ক্লাস বন্ধ করিতে হইয়াছে। অপূর্ববাবুর দল ললিতবাবুকে হাত করিয়া এধারেও পদে পদে তাঁহাকে লাঞ্ছিত করিবার চেষ্টা করেন—সর্বদা সতর্ক হইয়া চলিতে হয়। এসব আর ভাল লাগে না। মাঝে মাঝে মোহিতবাবুর কথা মনে করিবার চেষ্টা করে বটে—তিনি বলিতেন, 'এ দেশের লোকের যদি ভাল করতে চাও ত সব চেয়ে বড় বাধার কথাটা মনে রেখো, অকৃতজ্ঞতা। যাদের ভাল করছ তারাই তোমার সব চেয়ে বেশী অনিষ্ট করবে। কিন্তু তা বলে পেছোলে চলবে না—বাধা না থাকলে ত ভাল কাজ সবাই করতে পারতো।'...এ সবই ভাল ভাল কথা, তবু ভূপেনের সহ্যের সীমা যেন অতিক্রম করিয়াছে। ছাত্রদের মধ্যে এখনও কাছে আসে শুধু পদন ও সালেক—তাহাদের লইয়াও আজকাল খাটিতে হয় না, তাহারা অনেকটা তৈরী হইয়া গিয়াছে। সুতরাং হাতে সময় বেশি—আর সে সময়টা দুশ্চিন্তাতেই ব্যয় হয়। একটা কিছু আর না করিলেই নয়। এ আয়ে ও অবস্থায় আর চলিবে না। তার মন আজকাল শহরের দিকে ঝুঁকিয়াছে। সে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখিয়া দুই-একটি করিয়া দরখাস্ত পাঠায় শহরের ইস্কুলে—অবশ্য, বলাই বাহুল্য যে কোন জবাব আসে না। শহরের ইস্কুলে গেলে কল্যাণীকে এখানেই রাখিয়া যাইতে হইবে তা সে বোঝে—সে একটা দুর্ভাবনা আছেই। তবু না গেলেও চলিবে না। রাখু একটু বড় হইয়াছে, সামনের বছরেই সে পরীক্ষা দিবে—খুব সম্ভব পাসও করিবে। তখন সে-ই দেখাশুনা করিতে পারিবে; রাখু পাস করিলে যাহাতে এখানে সামান্য বেতনে একটা মাস্টারী পায়, সে ব্যবস্থাও সে মহেশবাবুকে বলিয়া করিয়া রাখিয়াছে—এবং সে-ক্ষেত্রে, সেই সুদূর ভবিষ্যতে, যাহাতে ঘরে পড়িয়া অন্য পরীক্ষাগুলি দিতে পারে সেজন্য এখন হইতেই ভূপেন তাহাকে গড়িয়া পিটিয়া রাখিতেছে। রাখু ছেলেটি তেমন ধারালো নয়, মনে হয় তাহার বুদ্ধিবৃত্তি অতিরিক্ত দারিদ্র্যে ও দুর্ভাগ্যে ভোঁতা হইয়া গিয়াছে—তবু উন্নতি করার দিকে একটা ঝোঁক আছে, এইটুকুই যা ভরসা।

সে যা-ই হউক্—শুধু শুধু বসিয়া ভাবিলে কোন উপায় হয় না—ফী জমা দিবার আর মাত্র সাতটি দিন বাকী। অগত্যা তাহাকে মহেশবাবুর বাড়ির উদ্দেশ্যেই যাত্রা করিতে হয়। যিনি বার বার উপকার করিয়াছেন আবার তাঁহার কাছেই হাত পাতিতে লজ্জা করে। তাছাড়া—একমাত্র আশার স্থল পাছে এই-

ভাবে নষ্ট হইয়া যায়—প্রীতিটা পাছে বিরক্তিতে পরিণত হয়, সে ভয় ত আছেই।

তবু যাইতে হয়।

মহেশবাবু তাহাকে দেখিয়াই কেমন যেন কষ্ট করিয়া হাসিলেন। বলিলেন, আসুন, আপনার কথাই ভাবছিলুম।

তাঁহার সে হাসিমুখের দিকে চাহিয়া কে জানে কেন ভূপেনের বুক কাঁপিয়া উঠিল। সে বলিল, কেন বলুন ত? কী ব্যাপার?

—আর ব্যাপার! ম্লান ভাবে হাসিয়া মহেশবাবু কহিলেন, পণ্ডিত মশাই আর যতীনবাবু ছাড়া সমস্ত মাস্টারমশাই সই ক'রে এক দরখাস্ত পাঠিয়েছেন—ললিতবাবু সুদ্ধ যে, আপনি নাকি ছেলেদের মোরেল একেবারে নষ্ট ক'রে দিয়েছেন, তারা আর ওঁদের মানতে চায় না! পদে পদে ওঁদের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে অপ্রিয় প্রশ্ন করে, ওঁদের সঙ্গে সমানে তর্ক করে—এমন কি পড়ানোর পর্যন্ত ভুল ধরতে যায়। এ-রকম অবস্থায় এখানে চাকরি করা পোষাবে না—এই কথাই জানিয়েছেন ওঁরা।

মহেশবাবু এই পর্যন্ত বলিয়া থামিলেন। ভূপেন একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, তার মানে কি এটা আমার উপর নোটিশ হ'ল?

মহেশবাবু উত্তর দিলেন, কী হ'ল তা আমিই বুঝতে পারছি না যে! আমার অবস্থাটা কল্পনা করুন—ক'রে আপনিই উপায় বলে দিন। আমার বাপ-পিতামহ ইস্কুল ক'রে দিয়েছিলেন বটে, তবু এখন ত আমি সর্বময় কর্তা নই। কমিটি আছেন এবং তাঁরা এত ভালমন্দ কিছুতেই বুঝবেন না। একজন শিক্ষকই ঠিক—আর এঁরা সব ভুল, একথা তাঁদের বোঝানো শক্ত হবে না কি? তাছাড়া সেখান থেকে কোন জোর না পেলে এঁরা এত দিন পরে এমন bold step নিতে কিছুতেই সাহস করতেন না।

—তা বটে! ভূপেন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, এ অবস্থায় আমারই এখন কাজে ইস্তফা দেওয়া উচিত—কিন্তু বড়ই নিরুপায়। ওঁদের কাছ থেকে যদি আরও ক'টা দিন সময় নিতে পারেন ত ভাল হয়। এম-এ পরীক্ষা দিতে কলকাতায় যাবো—সেই সময় উঠে পড়ে চেষ্টা করব ওখানে যদি একটা মাস্টারী পাই। এখন আর অন্য চাকরি নিতে পারব না—যা হয় ক'রে এই লাইনেই থাকতে হবে। একটু সময় অন্ততঃ দিন।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়। আমি কি আপনাকে এখনই চাকরি ছাড়তে বলছি! আপনি গেলে কি ক্ষতি হবে এবং আপনার দ্বারা কি উপকার হয়েছে তা আমি ভাল ক'রেই জানি ভূপেনবাবু। আমার দুঃখ আপনি বুঝে আমার ওপর

অভিমান ত্যাগ করবেন, এই প্রার্থনা। তবু একটা সান্ত্বনা এই যে—আপনার দ্বারা যদি গ্রামের দু'টো ছেলেও মানুষ হয়ে থাকে, তাহ'লেও অনেকটা কাজ হয়েছে।

ভূপেন কহিল, শুধু তাই নয়—আপনি একটু নজর রাখবেন, যাতে একেবারে পুরানো প্রথায় না ফিরে যায় সব।

—সে আমার মনেই আছে। আমার চোখ আপনি খুলে দিয়েছেন—আর সহজে তা বুজবে না। আমি যত দিন আছি একেবারে জিনিসটা নষ্ট হ'তে দেবো না। আপনার পরীক্ষা কবে?

—আসছে মাসে। সেই জন্যই আমি আপনার কাছে এসেছি।

ভূপেন টাকাটার কথা পাড়িতেই মহেশবাবু চিন্তিত মুখে কহিলেন, তাই ত, এই সময়টা হাত একেবারে খালি। তার ওপর আশ্বিন-কিস্তি এসে পড়েছে—বড়ই দুর্ভাবনায় আছি। আপনি আমাকে দু'টো দিন সময় দিন, দেখি তার মধ্যে যদি কিছু সংগ্রহ করতে পারি। যদি নিতান্ত না হয়—ইস্কুল থেকেই special loan ঠিক ক'রে দেবো।

ভূপেন মহেশবাবুর বাড়ি হইতে প্রায় টলিতে টলিতেই বাড়ি ফিরিল। এ চাকরিও গেল। অনেক আশা, অনেক স্বপ্ন রচিত হইয়াছিল তাহার মনে—যখন প্রথম এখানে আসে। এখন আর সে সব নাই, তবু এমন ভাবে যে এখান হইতে বিতাড়িত হইতে হইবে তা কে ভাবিয়াছিল। সে যখন মানুষের বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিতেছে তখন একদিন তাহারই জয় হইবে—এমনি একটা ধারণা ছিল, পৃথিবীতে যাহা সত্য একদিন তাহারই জয় হয়—এইটাই সে জানিত, আজ সেই মূল বিশ্বাসটাতেই যেন একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়াছে।...

বাড়িতে ফিরিয়া দেখিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ মারা একটা প্রকাণ্ড লেফাফা আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহার নামে। এ কী ব্যাপার? এ কি ফীজের তাগাদা? দরখাস্ত করা ছিল, বোধ হয় সেই প্রসঙ্গেই তাঁহারা তাগাদা পাঠাইয়াছেন। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এতখানি কর্তব্য-বোধ যে একেবারে নূতন। সে সব-কিছু ভুলিয়া তাড়াতাড়ি কৌতুহলী চিত্তে খামখানা খুলিল, দেখিল ব্যাপার মোটেই তাহা নয়। সে নাকি মণি অর্ডার যোগে ফীয়ের টাকা পাঠাইয়াছে, কিন্তু অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় কিছুই জানায় নাই। পত্রপাঠ তাহা না জানাইলে টাকাটার ঠিকমত ব্যবস্থা ও পরীক্ষার্থীর তালিকায় নাম ওঠা সম্ভব হইবে না।

তাহার টাকা জমা পড়িয়া গিয়াছে! সে মণিঅর্ডার করিয়া টাকা পাঠাইয়াছে! কিন্তু কে এ কাজ করিল?

উত্তরটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়িয়া গেল। সন্ধ্যা ছাড়া তাহার সমস্ত গতিবিধি এমন করিয়া কেহ লক্ষ্য করে না, এমন ভাবে তাহার অবস্থার কথা জানিয়া পূর্বাহ্নেই ব্যবস্থা করাও আর কাহারো পক্ষে সম্ভব নয়।

সন্ধ্যা যখন তাহাকে প্রায় ভুলিয়া আসিয়াছে মনে করিয়া ভূপেন মনে মনে একটা স্বস্তি অনুভব করিতে শুরু করিয়াছিল, ঠিক সেই সময়েই ভুলটা এমন প্রচণ্ড ভাবে ভাঙিয়া গেল। ভোলে নাই—তাহার সন্ধ্যা কিছুই ভোলে নাই। দূরে থাকিয়া নিঃশব্দে এখনও তাহার মঙ্গল কামনা করিতেছে, এখনও তাহার উন্নতিই সন্ধ্যার একমাত্র লক্ষ্য, এমন কি বোধ হয় তপস্যা!

হয়ত এ দান না লওয়াই উচিত, হয়ত, এখনই এটা ফেরত দেওয়া কর্তব্য, কিন্তু, ভূপেন শেষ পর্যন্ত সে দান স্বীকার করিয়াই লইল। শুধু যে সাহায্যটা বড় অসময়ে আসিয়া পড়িয়াছে তাই নয়—ভূপেনের মনে হইল সন্ধ্যার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রীতি দারুণ গরমে এক ঝলক দক্ষিণা বাতাসের মতই তাহার ক্লান্ত মনে স্নিগ্ধ একটা প্রলেপ লাগাইয়া দিয়া গেল। আছে, এখনও তাহার কথা লইয়া চিন্তা করে—দূরে বসিয়া উদ্বেগ ও আশার আরতি-প্রদীপ জালাইয়া অপেক্ষা করে—স্ত্রী ছাড়া এমন লোক একটি এখনও আছে। সব মানুষই সমান নয়—সব মানুষ অকৃতজ্ঞ নয়। বাঁচিবার জন্য সাধনা করা যায়, জীবনের সে মূল্য এখনও তাহা হইলে নিঃশেষ হইয়া যায় নাই।

খোলা চিঠিখানা হাতে লইয়া ভূপেন স্থির হইয়া বসিয়াই রহিল।

। ২৫ ॥

কল্যাণীর কাছে কথাটা পাড়া একটু কঠিন বৈকি। তবু শেষ পর্যন্ত তাহাকে সব জানাইতেই হয়। বেচারী কল্যাণী—চোখের জল কিছুতেই সামলাইতে পারে না সে, বহু চেষ্টা করিয়াও। নিজের যে সৌভাগ্য একদিন প্রত্যক্ষ করিয়াও বিশ্বাস করিতে পারে নাই—এই দীর্ঘদিন পরে সবে সেটা সে অনুভব করিতে শুরু করিয়াছিল। এখানকার চাকরি যাওয়া মানে অন্যত্র চাকরি লওয়া—অর্থাৎ বিচ্ছেদ। অন্ধ বাবা, বৃদ্ধা পিসীমা ও ছোট ছোট ভাইদের ফেলিয়া যাওয়া সম্ভব নয় কিছুতে। তাছাড়া নূতন বাসা করিয়া তাহাকে লইয়া যাইতে পারে সে সঙ্গতিই বা কই ভূপেনের! স্বামীকে কতদিনের জন্য ছাড়িয়া থাকিতে হইবে তাহার কোন ঠিক নাই, হয়ত বা দীর্ঘকালের জন্যই! তাহার শরীর ভাল নয়, স্বামীর ভালবাসার প্রত্যক্ষ যে নিদর্শন তাহার দেহের মধ্যে হইতে দেহ গঠন করিয়া আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় আছে, তাহারই বা কি হইবে কে জানে! এ

অভিজ্ঞতা নূতন—কোন ধারণাই নাই তাহার এসব ব্যাপারে—কত কি বিপদ ঘটিতে পারে, অনেক রকম বিপদ অনেকের ঘটিয়াছে, এমনিই একটা ভাসা ভাসা কথা সে শুনিয়াছে। যদি সেরকম কিছু হয়, সে সময়ে তাহার একমাত্র অবলম্বন স্বামী কাছে থাকিবেন না—একথা মনে হইলেও শিহরিয়া ওঠে।...তার চেয়েও বড় ভয় বোধ হয় একটা মনে আছে, সে কথা সে ভাবিতে পারে না, ভাবিতে সাহস্ করে না, তবু মনে উঁকিঝুঁকি মারে—ভূপেন যদি কলিকাতাতেই থাকে, সন্ধ্যাও থাকিবে,—সন্ধ্যার রূপ আছে, সন্ধ্যার গুণ আছে, সন্ধ্যা ভূপেনের হৃদয়ে যে স্তরে অবস্থিত সেখানে কল্যাণী কোনদিনই পৌছিতে পারিবে না। যদি অভাগী কল্যাণীর কথা তিনি ভুলিয়াই যান!

তবু কল্যাণী বাধা দিতে পারে না, বাধা দিবার উপায়ই বা কি! সে শুধু স্বামীর বোঝা, তাহার দিক হইতে, তাহার আত্মীয়দের দিক হইতে যখন কোন সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা নাই, তখন কোন্ অধিকারে সে কথা কহিবে? স্বামীর দুর্দিনে বোঝা লাঘব করিতে না পারিলেও আরও বাড়াইবে না সে, এটা ঠিকই। কল্যাণী চিরকালই চুপ করিয়া থাকিয়াছে, আজও রহিল।

ভূপেন তাহার ব্যথা ও আশঙ্কা দুই-ই বোধ হয় বোঝে—তাই যাত্রার আগের দিনগুলি কল্যাণীর মন পরিপূর্ণ সুধায় ভরাইয়া দিতে চায়। কল্যাণীর এ যেন নূতন অভিজ্ঞতা—এত আদর, এত মাধুর্যে সে বিহ্বল হইয়া পড়ে, নিজেকে যেন হারাইয়া ফেলে। ভূপেন যে কলিকাতায় গেলেই মাস্টারী পাইবে তাহার ঠিক নাই তবু ভূপেন বোঝে যে, এবারের বিচ্ছেদ দীর্ঘকালেরই হইবে। অন্তত সে তিন-চারটা টুইশন্ করিয়াও যদি নিজের খরচ চালাইতে পারে, তাহা হইলে আর মহেশবাবুকে বিব্রত করিবে না। সেই চেষ্টাই সে করিবে—প্রাণপণে...

ভূপেন কলিকাতায় গিয়া কোথায় উঠিবে সে প্রশ্ন একটা ছিল। আপাতত বিশুর বাড়িতে গিয়াই ওঠা চলিবে, কিন্তু প্রায় কুড়ি দিন জুড়িয়া পরীক্ষা, এতদিন তাহার কাছে থাকা সঙ্গত হইবে না হয়ত। তখন মেস খুঁজিতে হইবে, সেজন্যও কিছু টাকা চাই। তাছাড়া যদি চাকরির চেষ্টা করিতে হয়—। নানা রকম চিন্তায় সে হাঁপাইয়া ওঠে—কোথাও কোন দিশা খুঁজিয়া পায় না।

কিন্তু ইহারই মধ্যে একদিন পরীক্ষার তারিখ ঘনাইয়া আসে। পোস্ট-অফিস হইতেই কয়েকটি টাকা লইয়া তাহাকে যাত্রা করিতে হয়। কল্যাণীদের কিছুদিনের মত ব্যবস্থা সে করিয়া দিয়াছে; ছুটি পাইয়াছে মাহিনা সুদ্ধই, সুতরাং আগামী মাসেও ভাবনা নাই। অন্য ব্যবস্থা কিছু করা হইল না—তবে প্রসবের এখনও দেরি আছে, যদি ইতিমধ্যেই কিছু হয়, রাখুকে সে মহেশবাবুরই শরণাপন্ন

হইতে বলিয়াছে।

দীর্ঘকাল পরে কলিকাতা। সেখানে তাহার বাপ-মা আছেন, সেখানে তাহার সন্ধ্যা আছে। তবু কোথাও যেন তাহার কোন আশ্রয় নাই। সে যেন বিদেশী, তাহার জন্মভূমিতে আজ যেন সে অপরিচিত, সর্বপ্রকার সম্পর্কহীন। সব চেয়ে এত কাছে আসিয়াও মাকে দেখিতে পাইবে না—সন্ধ্যাকে দেখিতে পাইবে না, সেই দুঃখই যেন বেশী পীড়া দিতেছে। সন্ধ্যার সহিত দেখা করার অন্য কোন বাধা নাই কিন্তু তাহার মনে একটা বাধা আছে। প্রলোভন হইতে দূরে থাকাই ভাল। সে ওখান হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়াই আসিয়াছে, কিছুতে এ কাজ করিবে না।

কিন্তু প্রতিজ্ঞা করে মানুষই, তাহার শক্তির উপরে আর একটা অদৃশ্য শক্তি আছে, যাহার কাছে মানুষের সব কিছু দম্ভ একদিন চুরমার হইয়া ভাঙিয়া যায়—প্রতিজ্ঞা রাখা সম্ভব হয় না। বিশুর বাড়িতে পৌঁছিয়াই সে একখানা চিঠি পাইল, সন্ধ্যার হাতের লেখা। সে যে বিশুর বাড়িতে উঠিবে একথা সন্ধ্যার জানিবার কথা নয়, শুধুই অনুমান। আশ্চর্য, ভূপেনের সম্বন্ধে তাহার অনুমানেও কখনও ভুল হয় না।

অদ্ভুত একটা আবেশ-মিশ্রিত মন লইয়া সে চিঠিখানা খুলিল। ছোট চিঠি। সন্ধ্যা লিখিয়াছে—

শ্রীচরণেষু

পরীক্ষার আর দেরি নেই, বুঝতে পারছি না আপনি কোথায় এখন আছেন। তাই ওখানেও একটা চিঠি দিয়েছি, এখানেও দিলুম। দাদুর অসুখ, খুব বাড়াবাড়ি, চিঠি পেয়েই যদি সময় থাকে ত একবার চলে আসবেন। আর কিছু লিখতে পারছি না, ভাবতেও পারছি না। প্রণাম। ইতি—

এ চিঠির পর আর অপেক্ষা করা চলে না। কোনমতে স্নান ও সামান্য কিছু জলযোগ সারিয়া সে বাহির হইয়া পড়িল। বিশুর মাকে সংক্ষেপে ব্যাপারটা জানাইয়া গেল—যদি ফিরিতে রাত হয় ত তাঁহারা যেন অপেক্ষা না করেন।

সন্ধ্যাদের বাড়ি যখন ভূপেন পৌঁছিল তখন সারাবাড়িটা থম্‌থম্ করিতেছে। দাসী-চাকরদের মুখ ভার, চক্ষু আরক্ত। সকলেই পুরানো লোক—মোহিতবাবুর সহিত বহুকালের স্নেহের সম্পর্ক তাহাদের। অর্থাৎ এবারে বিপদ খুব আসন্ন, হয়ত আর তাঁহাকে রক্ষা করা যাইবে না।

বুড়া দারোয়ান তাহাকে দেখিয়াই অভ্যাসমত উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেলাম করিল,

কিন্তু কোন কুশল প্রশ্ন করিতে পারিল না। বরং চোখোচোখি হইতে তাহার চোখের কোল বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। ভূপেনও প্রশ্ন করিল না, সোজা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

সিঁড়ির মুখেই প্রায় অন্ধকারের সহিত মিশিয়া সন্ধ্যা দাঁড়াইয়া ছিল, ভূপেন উপরে উঠিতে কাছে আসিয়া প্রণাম করিল, কোন কথা কহিতে পারিল না। তাহার রোদনারক্ত চক্ষু ও অপরিসীম শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া ভূপেনের মুখেও সহসা কোন কথা যোগাইল না, মিনিটখানেক চুপ করিয়া থাকিয়া কোনমতে প্রশ্ন করিল, এখন কী অবস্থা ?

সন্ধ্যা শান্ত-কণ্ঠেই উত্তর দিল। কহিল, কাল যতটা খারাপ গিয়েছিল আজ ততটা নয়, তবু আশা আর নেই। সর্বাঙ্গই প্রায় পড়ে গিয়েছে, কাল সারাদিন অজ্ঞান হয়ে ছিলেন, আজ মাঝে মাঝে জ্ঞান হচ্ছে দু-চার মিনিটের জন্য। এখনও আচ্ছন্ন ভাবেই পড়ে আছেন, হার্টের অবস্থা খুব খারাপ। চলুন না।

ঘরের মধ্যে একজন ডাক্তার বসিয়াই ছিলেন। ঔষধ ও চিকিৎসার নানা আয়োজন ঘরের চারিদিকে ছাড়ানো। তাহারই মধ্যে মোহিতবাবুর শীর্ণ দেহ বিছানার উপর নিথর নিস্পন্দ অবস্থায় পড়িয়া আছে। সেদিকে চাহিলে এই কথাটাই সর্বাগ্রে মনে আসে যে, আশা আর নাই, এখন শুধু আর কতক্ষণ—এই অপেক্ষা।

ভূপেনও বসিয়া রহিল নিঃশব্দে। সন্ধ্যাকে কোন সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করাও বৃথা, সে প্রয়োজনও নাই। সাধারণ মেয়ের মত সে মানুষ হয় নাই, মামুলী সান্ত্বনার ঊর্ধ্বে সে। করিবারও কিছু নাই, শুধু যদি ইতিমধ্যে আর একবার সম্বিৎ ফিরিয়া আসে—শেষ দেখাটা যদি হয় !

অনেকক্ষণ পর রোগীর দেহে আর একবার প্রাণ-স্পন্দন দেখা গেল, ওষ্ঠ দুইটি বারকতক কাঁপিবার পর এক সময়ে তিনি চোখও খুলিলেন। শূন্য দৃষ্টি কয়েক মুহূর্ত ছাদের কড়িকাঠে ঘুরিয়া অবশেষে এক সময়ে সন্ধ্যার অবনত মুখের উপর পড়িয়া অকস্মাৎ পরিচয়ের জ্যোতি খুঁজিয়া পাইল।

কাছে যাওয়া উচিত কিনা বুঝিতে না পারিয়া ভূপেন ইতস্তত করিতেছিল। ডাক্তারবাবু ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিলেন যে তাহাতে আর এমন কিছু বেশী বিপদের সম্ভাবনা নাই। তখন সে-ও কাছে আসিয়া ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল। মোহিতবাবু কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া থাকিবার পর বোধ করি তাহাকে চিনিতে পারিলেন, তাঁহার দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

কী একটা বলিবার চেষ্টা করিতেছেন বুঝিয়া ভূপেন তাহার মাথাটা মোহিত-

বাবুর মুখের আরও কাছে লইয়া আসিল। বহুক্ষণ চেষ্টা করিয়া শুনিল, তিনি বলিতেছেন, সত্য পথে অবিচল থেকো—এই আশীর্বাদ করি। কিন্তু সত্যটা বিচার ক'রে নিও, আমার মত একটা সংস্কারকে সত্য বলে আঁকড়ে থেকো না। পুঁথির সত্য আর জীবনের সত্য এক নয়—চলার পথে সত্য তাঁর নিজের মহিমায় আপনি প্রকট হন। তাঁকে চিনতে পারার মত শক্তি আর সাহস যেন থাকে।

বলিতে বলিতেই তিনি সহসা থামিয়া গেলেন। আবার দৃষ্টি আচ্ছন্ন হইয়া আসিল—তেমনি নিঝঝুম হইয়া পড়িলেন।

আর তাঁহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল না। শেষ রাত্রে, উষার আভাস জাগার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মারা গেলেন।

পরীক্ষার একটি দিন মাত্র বাকী, অথচ এধারে এই বিপদ। মোহিতবাবুর উইল অনুসারে ভূপেনই এখন সন্ধ্যা এবং তাহার বিপুল সম্পত্তির অভিভাবক। আইনের নানারকম গোলমাল আছে, হিসাব-নিকাশের ব্যাপার আছে, শ্রাদ্ধের আয়োজন আছে, আবার তাহার মধ্যে পরীক্ষা। সকালবেলাই এখানে আসিতে হয়, তারপর কোনমতে স্নানাহার সারিয়া পরীক্ষা দিতে ছোটে। আবার সন্ধ্যাবেলা এখানে আসিয়া গভীর রাত্রি পর্যন্ত থাকিতে হয়। সন্ধ্যা একবার অত্যন্ত সসঙ্কোচে এই বাড়িতেই তাহাকে থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিল কিন্তু ভূপেন রাজী হয় নাই। তাহার এই অনিয়মিত যাওয়া-আসায় বিশুদের অসুবিধা হইতেছে বুঝিয়াও না। যতদিন সন্ধ্যা সম্বন্ধে তাহার এবং তাহার সম্বন্ধে সন্ধ্যার মনোভাব বুঝিতে পারে নাই ততদিন এক রকম ছিল—এখন আর এত কাছাকাছি থাকিতে সাহস হয় না। শুধু দেহে নয়, মনেও সে কল্যাণীর প্রতি অবিচার করিতে পারিবে না।

মোটামুটি পরীক্ষাগুলা শেষ হইয়া গেল পনের-ষোল দিনের মধ্যেই। ইতিমধ্যে ভূপেন নিজের ব্যাপারটার দিকে মনোযোগ দিবার অবসর মাত্র পায় নাই। শ্রাদ্ধের বেশি দেরি নাই, মোহিতবাবুর মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া কে এক ভ্রাতুষ্পুত্র শোকার্ত ভাবে আসিয়া হাজির হইল, সে-ই শ্রাদ্ধ করিতে চায়—তাহার বিশ্বাস ছিল শ্রাদ্ধ-কর্তারা বিষয়ের ভাগ পায়। তাহাকে যখন বুঝাইয়া দেওয়া হইল যে, মৃত ব্যক্তির উইলের নির্দেশ অনুসারে সন্ধ্যাই শ্রাদ্ধ করিবে এবং সমস্ত বিষয় পাইবে, শ্রাদ্ধাধিকারীর অজুহাত টিকিবে না—তখন ভাইপোটি যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া ফিরিয়া গেল। শ্রাদ্ধ সম্পর্কে আর কোন কথাই উল্লেখ করিল না। এই শ্রেণীর আত্মীয় ও অভিভাবক আরও অনেকে আসিতে শুরু করিলেন। ভূপেনকে ছেলেমানুষ দেখিয়া অনেকেই তাহাকে উড়াইয়া দেওয়া সহজ হইবে ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু এত রকমের

অসুবিধার মধ্যেও ভূপেন ধীরভাবে সব দিক সামলাইয়া উঠিল। অবশ্য মোহিতবাবুর সরকার এবং তাঁহার অংশীদার ভদ্রলোকটি তাহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছিলেন। এ ছাড়া তাঁহার দুই-একজন বন্ধুও তাহার বিপদে বুক দিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন।

এই সবই করে ভূপেন কিন্তু মনে মনে যেন ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া পড়ে। বিরাট একটা সংসারের দায়িত্ব তাহার মাথার উপর, অথচ এক পয়সায় সংস্থান নাই। একটা পঞ্চাশ টাকা মাহিনার চাকরি ছিল, তাহাও গিয়াছে। বলিতে গেলে সে শূন্যেই ভাসিতেছে, কোথাও এমন একটা আশ্রয় নাই, যেখানে সে দাঁড়াইতে পারে। কাজ পাওয়া সহজ নয়, বিশেষতঃ মাস্টারী। অথচ খোঁজাখুঁজি করিবে সেরকম একটু সময়ও সে করিতে পারিতেছে না। বিশুর বাড়ি এমন করিয়া থাকা অন্যায়—যদিচ বিশুর মা যথেষ্ট আগ্রহের সহিতই তাহাকে ধরিয়া রাখিয়াছেন। তবু হয়ত এতদিনে মেস একটা খুঁজিয়া লওয়া উচিত ছিল কিন্তু মনের অবচেতনে তহবিলের দিক চাহিয়াই বোধ হয় সেটায় সে এতটা গড়িমসি করিতেছে। এখানে আসিয়াই সে কল্যাণীকে মোহিতবাবুর খবর দিয়া চিঠি দিয়াছিল, তাহার পর আর তাহাকে চিঠি দিতে পারে নাই। কী লিখিবে তাহাকে? সে বেচারীর যে কি উদ্বেগে দিন কাটিতেছে তাহা ত সে বোঝে, কল্যাণী তাহাকে একটি প্রশ্নও করে নাই বটে বরং যথেষ্ট উৎসাহ দিয়া সেখানে যে কোন অসুবিধা নাই বোঝাইবার চেষ্টা করিয়া দুই-তিনখানা চিঠি দিয়াছে, তাহাকে মিছামিছি বেশী ভাবিতে নিষেধ করিয়াছে বার বার, কোথাও কোন আশঙ্কা প্রকাশ করে নাই, এমন কি সন্ধ্যাকেও সান্ত্বনা দিয়া খুব মিষ্ট দুই-তিনখানা চিঠি দিয়াছে, তবু ভূপেন কল্যাণীর কাছে নিজেকে অপরাধী বলিয়া মনে করে। এক-একবার মনে হয়, তাহার যেটা বৃহত্তর কর্তব্য সেটা অবহেলা করিয়া সন্ধ্যার প্রতি কর্তব্যটা মধুরতর বলিয়াই সে বাছিয়া লইয়াছে।

এমনি ভাবে মনে মনে নিদারুণ ক্লান্তি ও অশান্তি ভোগ করিতে করিতে এক দিন কথাটা সে সন্ধ্যার কাছে বলিয়াই ফেলিল। তাহার যে ওখানকার চাকরি গিয়াছে এ সংবাদটা এতদিন সন্ধ্যা শোনে নাই, কল্পনাও করিতে পারে নাই। ভূপেন যে কতখানি ত্যাগস্বীকার করিয়া তাহার ব্যাপারে এমনভাবে দিনরাত নিজেকে জড়াইয়া রাখিয়াছে তাহা উপলব্ধি করিয়া সন্ধ্যার বেদনা ও অনুতাপের সীমা রহিল না। বহুক্ষণ স্তব্ধভাবে বিবর্ণমুখে বসিয়া থাকিবার পর সে কহিল, তবে কি কলকাতাতেই মাস্টারি করার ইচ্ছা আপনার?

ভূপেন জবাব দিল, ইচ্ছা যে কি ছিল আর কি নেই তা ভুলেই গেছি। এখন পৃথিবীর কোথাও একটা কোন জীবিকার সন্ধান পেলে বাঁচি।

নিজের বিপুল বিত্ত যাহাকে নিবেদন করিতে পারিলে সার্থক হইত তাহারই

অসহায় কথাগুলি সন্ধ্যার বুকে কাঁটার মত বিঁধিল। অথচ কিছুই করিবার নাই। দাদু বাঁচিয়া থাকিলে যদি বা কিছু সম্ভব হইত, এখন এ অর্থের এক কপর্দকও যে ভূপেন স্পর্শ করিবে না, তাহা সন্ধ্যার চেয়ে বেশী কে জানে!

অনেকক্ষণ চেষ্টা করিয়া সে প্রাণপণে উদ্গত অশ্রু দমন করিল। প্রায় মিনিট পাঁচেক পরে স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কহিল, দাদুর বন্ধু ঐ যে পূর্ণেন্দুবাবু ডাক্তার আসেন, উনি শুনেছি কোন্ এক বড় ইস্কুলের প্রেসিডেন্ট, ওঁকে একবার বললে কি অন্যায় হবে?

—অন্যায় কেন হবে সন্ধ্যা, আমি ত বরং বেঁচে যাই। যদি তোমার সম্মান ক্ষুণ্ণ না হয়, তুমি অনায়াসে বলতে পারো। উনি ত কিছু মনে করবেন না?

—না, না। আমাকে ছোটবেলা থেকেই উনি দেখছেন, তা ছাড়া আপনার কথাও দাদুর মুখ থেকে অনেকবার শুনেছেন। উনি অন্তত ভুল বুঝবেন না।

ভূপেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তা কি আর হবে! ভাবতেও সাহসে কুলোয় না আমার।

সেই দিনই অপরাহ্নে সন্ধ্যা ডাক্তারবাবুর কাছে কথাটা পাড়িল। তিনি খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া চিন্তিত মুখে কহিলেন, তাই ত দিদি, বড় অসময়ে কথাটা বললে, লোক আমাদের একজন চাই কিন্তু সেক্রেটারীর একটি মামাতো শালা বেকার আছে অনেক দিন, তার জন্যে তিনি খুব ঘোরাঘুরি করছেন মেম্বারদের কাছে, এমন কি আমিও একরকম কথা দিয়েছি—এখন আবার নতুন লোকের জন্যে চেষ্টা করা কি—। তবে একটা কথা, সে ছোক্‌রা একবার ফেল ক'রে গত বছর কোনমতে বি. এ. পাস করেছে, আর ভূপেন ত অনার্স পাওয়া ছেলে। তা ছাড়া তোমার দাদুর মুখে যা শুনেছি, ওর পড়াশুনোও খুব। দেখি একজন মেম্বার আছেন বটে, তাঁর সঙ্গে সেক্রেটারীর অহি-নকুল সম্পর্ক, তাঁকে দিয়ে যদি কথাটা তোলাতে পারি! ওকে কালই একটা একটা দরখাস্ত দিয়ে দিতে ব'লো। পরশু মিটিং—সেই দিনই যাকে হোক বহাল করা হবে—

পূর্ণেন্দুবাবু থাকিতে থাকিতেই ভূপেন আসিয়া পড়িল। তিনি তাহাকে সংক্ষেপে কথা কয়টা বুঝাইয়া দিয়া কহিলেন, তুমি ভাই কালই ইস্কুলে গিয়ে হেডমাস্টারের হাতে দরখাস্তটা দিয়ে এসো। মাইনে খুবই কম, ষাট টাকায় শুরু, তবে আমাদের ইস্কুলে বড়লোকের ছেলে বিস্তর, টিউশনী জোটে মোটা মোটা, কোচিং-এর ব্যবস্থাও আছে।

ষাট টাকা! আশা করিতেও ভয় হয় ভূপেনের। অবশ্য কলিকাতার মেসে থাকিতে হইলে ঐ বাড়তি দশ টাকার উপর আরো কিছু লাগিবে তাহার, কিন্তু তা

হক, তবু ত সকলকে উপবাস করিতে হইবে না।

ইহার পরের দুইটা দিন ভূপেন একরকম কণ্টক-শয্যাতেই কাটাইল। আশা করিতেও পারে না—অথচ নিরাশ হইতেও সাহসে কুলায় না, এমনি একটা অবস্থা। অবশেষে রবিবার অপরাহ্ণেই খবর পাওয়া গেল যে, পূর্ণেন্দুবাবু অসম্ভবই সম্ভব করিয়াছেন। মামাতো শালাটির শুধু একবার নয়—ইহার পূর্বেও ইণ্টারমিডিয়েট এবং ম্যাট্রিকুলেশনের সময় কয়েকবার ফেল হওয়ার ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া এমন ভাবেই তিনি কথাটা মেম্বারদের মধ্যে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন যে সেক্রেটারীর কোন চেষ্টাই ধোপে টিকে নাই। শালাটি নাকি লক্ষ্ণৌ হইতে গান শিখিয়াছে, তা ছাড়া সে কোন্ ঔপন্যাসিকের ভাইপো, এমনি সব প্রশংসা-পত্রও শেষ পর্যন্ত দিতে শুরু করিয়াছিলেন, তবুও জুৎ করিতে পারেন নাই। শেষের দিকে সেক্রেটারী প্রায় ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিলেন—অতি কষ্টে তাঁহাকে শান্ত করিয়া মেম্বাররা একরকম প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, পরের ভেকান্সিটি নিশ্চয়ই তাঁহার ঐ বিখ্যাত শালাকে দেওয়া যাইবে।

সব কথাই গল্প করিয়া পূর্ণেন্দুবাবু হাসিয়া বলিলেন, দেখো হে সাবধান! সেক্রেটারী কিন্তু তোমার শত্রু হয়ে রইলেন, কমিটি মিটিংয়ের এত কথা বললুম শুধু এইজন্যই যে তুমি মানুষটিকে খানিকটা চিনে রাখতে পারবে। পরন্তু তোমার ইণ্টারভিউ, তাও সেক্রেটারীই নেবেন, তবে সেদিকে তত ভয় নেই, কারণ, আমিও সময় ক'রে সেই সময়টা উপস্থিত থাকব'খন। উনি অবিশ্যি জানেন না যে, তুমি আমার ক্যাণ্ডিডেট, তবু আমি আর হেডমাস্টার উপস্থিত থাকলে উনি অতটা শয়তানী করতে পারবেন না। আর একটা কথা বলে রাখি, য়্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাস্টার হলেন সেক্রেটারীর চর—খুব সাবধান হয়ে কথাবার্তা বলবে ওঁর সামনে—ইস্কুলে যা কিছু হয় উনি রোজ গিয়ে লাগিয়ে আসেন সন্ধ্যের সময়। আচ্ছা··· আসি তাহ'লে।

ইহার পরেও দুইটা দিন ভূপেনের কম অশান্তিতে কাটিল না। সেক্রেটারীই ইণ্টারভিউ লইবেন—অথচ তিনিই রহিলেন বিরূপ হইয়া। এ চাকরি যে হইবে সে ভরসা কিছুতেই যেন হয় না। এই দুঃসময়ে এত সহজে এবং এত অল্প সময়ে অত বড় ইস্কুলে মাস্টারীটা জুটিয়া যাইবে, তাহা বিশ্বাস করা সত্যই কঠিন। যাহা হউক শেষ পর্যন্ত ইণ্টারভিউটাও ভালয় ভালয় কাটিয়া গেল। সেক্রেটারী সাধারণ গ্র্যাজুয়েট জানিয়াই তাহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, সে সব প্রশ্নে ভূপেনের হাসি পায়। তাহার মনে হইতে লাগিল যে সালেক কি পদনকে এসব প্রশ্ন করিলে তাহারাও উত্তর দিতে পারিত। পূর্ণেন্দুবাবু ভূপেনের লেখাপড়ার খ্যাতি ইতিপূর্বে

শুনিয়াছিলেন, তবু তিনিও বিস্মিত না হইয়া পারিলেন না। সেক্রেটারীকেও স্বীকার করিতে হইল যে প্রার্থীর বিপক্ষে কিছুই বলিবার নাই। শুধু বয়সটা কম এই যা, তা কী আর করা যাইবে!

অর্থাৎ ভূপেন আরও একটা আশ্রয় পাইল।

পরের মাসের পয়লা হইতে নূতন ইস্কুলে কাজ শুরু করার কথা। তখনও মাসকাবার হইতে চার-পাঁচ দিন বাকী, অর্থাৎ ইতিমধ্যে অনায়াসে কল্যাণীর কাছ হইতে ঘুরিয়া আসা চলিত কিন্তু খরচের কথা ভাবিয়া সে ইচ্ছা মনেই চাপিয়া রাখিতে হইল। চিঠি লিখিয়াই সে তাহাকে সুসংবাদটা দিল, আর মহেশবাবুর কাছেও পদত্যাগ-পত্রের সহিত একখানা দীর্ঘ চিঠি লিখিয়া সব কথা জানাইল এবং অনুরোধ করিল যে প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের যে ক'টা টাকা পাওনা হয় তার মধ্য হইতে নিজের ঋণশোধ করিয়া তিনি যেন বাকী টাকাটা তাঁহার কাছেই রাখিয়া দেন এবং কল্যাণীর আসন্ন বিপদে একটু তত্ত্বাবধান করেন। সে যতীন এবং রামকমলবাবুর কাছেও উহাদের দেখাশোনা করার অনুরোধ জানাইয়া দুইখানি চিঠি দিল।

এমনি করিয়া অতি সহজেই ওখানকার সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হইয়া গেল। সম্পর্কটা কত ক্ষণস্থায়ী, তাহার অবস্থানই বা ক'টা দিনের তবু তাহারই মধ্যে আর একটা বৃহত্তর সম্পর্ক শুধু শুধু তাহার ঘাড়ে চাপিল চিরকালের মত। ফলাফল যাহাই হউক না কেন, স্বাধীনতা বলিতে আর তাহার কিছু রহিল না, কোনদিন ফিরিয়া পাওয়াও সম্ভব হইবে না জীবনে। বোঝা ও বন্ধন এখন বাড়িতেই থাকিবে দিন দিন—এই বয়সেই সে যেন পঙ্গু হইয়া পড়িল।

২৬

অনেক আশা করিয়াই এবার ভূপেন কলিকাতা আসিয়াছিল। কলিকাতা শহর জায়গা, সেখানকার লোক পৃথিবীর অগ্রগতির খবর রাখে, সেখানে তাহার চেষ্টা ও উদ্যমের মর্ম বুঝিবার লোক মিলিবে—অন্তত সে যদি সংস্কৃত বা উন্নত প্রণালীতে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করে ত কেহ তাহাকে বাধা দিবে না—এই ছিল তাহার ভরসা। কিন্তু সপ্তাহ-দুই নূতন ইস্কুলে কাজ করিয়াই তাহার সে ভুল নির্মমভাবে ভাঙিয়া গেল। ইস্কুলে যে ছেলেমেয়েরা শিক্ষার জন্যই আসে, এ ধারণা মফঃস্বলে যদি বা খানিকটা আব্ছাভাবে ছিল, এখানে একেবারেই নাই। বিরাট ইস্কুল, প্রত্যেক ক্লাসে তিন-চারিটি করিয়া সেকশন্—টাকা বা শিক্ষক কিছুরই অভাব নাই। ভাল ভাল শিক্ষকও দু'চারজন আছেন, তবে তাঁহারা সকলেই ব্যস্ত, ক্লাসে মন দিয়া পড়াইবার অবসর

তাঁহাদের মেলে না একেবারেই। ইস্কুলটির নামডাক আছে খুবই। প্রতি বৎসরই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাল ফল হয় কিন্তু সে অন্য কারণে। বড়লোকের ছেলেরা প্রচুর বেতন দিয়া এই শিক্ষকদেরই মধ্য হইতে দুই বা ততোধিক প্রাইভেট টিউটার রাখে। মধ্যবিত্তের মধ্যে যাহারা ভাল ছেলে, তাহাদের জন্য একটা কোচিং ক্লাস আছে, সেখানে মেধাবী ছাত্র লওয়া হয়, মাসিক নামমাত্র পনেরো টাকা বেতনে তাহারা সেখানে পড়াশুনা করে। এইসব ছেলেদের মধ্য হইতেই কেহ কেহ স্কলারশিপ পায়, কেহ বা লেটার পায়—ফলে স্কুলের খ্যাতি বাড়ে। বাকী যারা তাহারা নিজের বাড়িতে পড়িয়া যতটা পারে করে—কেহ বা পাস করে কেহ বা ফেল করে, সে তাহাদের ভাগ্য।

হেড্‌মাস্টার ত বিষম ব্যস্ত। তাঁহার পাঠ্যপুস্তক আছে অনেকগুলি, সে ব্যবসা তিনিই চালান। নিজের নামে ছাড়াও, অপরের নামে যেসব পাঠ্যপুস্তক বাহির হইবে (অর্থাৎ যাঁহাদের অধ্যাপক হিসাবে নাম আছে অথচ লিখিতে পারেন না) এমন বই লিখিবার জন্য প্রকাশকদের নিকট হইতে মোটা টাকা লইয়া অল্প টাকায় অন্য শিক্ষকদের দ্বারা সেই বই লিখাইয়া লইতে হয়। সে সব বন্দোবস্ত করা তো আছেই, আবার তাঁহাকেই কৌশলে সকল দিক বজায় রাখিয়া কাজটা করাইতে হয়। এ ছাড়া কিছু তেজারতি, কিছু শেয়ার কেনা-বেচা এসবও আছে। ভাইপোর নামে একটা চালের আড়ৎ এবং ভাগ্নের নামে বেনেমশলার দোকান আছে—আসলে মালিক তিনিই, সেগুলিও দেখিতে হয়। সম্প্রতি আবার জুতার একটা কারখানা খুলিয়াছেন, দোকানে দোকানে পাইকারী বিক্রীর জন্য—সুতরাং স্নানাহারেরই সময় মেলে না। ইস্কুলে যে কয় ঘণ্টা থাকেন, তাহারও অধিকাংশ এইসব কাজে চলিয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে ক্লাসে গিয়াই বিশ্রামের অবকাশ মেলে।

অন্য মাস্টার মহাশয়দেরও অর্থ উপার্জনের পথ একটা নয়। পাঠ্যপুস্তক আছে প্রায় সকলেরই, এ ছাড়া টিউশ্যনী—সকাল বিকাল তিনটা-চারটার কম নাই কাহারও। হেড্‌মাস্টারের মহৎ দৃষ্টান্তে অন্য ব্যবসাও অনেকে ঠোক্‌রাইতে শুরু করিয়াছেন। ফলে ক্লাসে আসেন সকলেই ক্লান্ত ও বিরক্ত হইয়া; পড়ানোর ইচ্ছা, ধৈর্য বা চেষ্টা থাকা আর তখন সম্ভব নয়। অবশ্য ভাল শিক্ষক যে দুই-একজন নাই তাহা নয়—বিবেক-বুদ্ধিযুক্ত এবং যথার্থ শিক্ষাব্রতী এই ইস্কুলের মধ্যেই তিন-চারজন আছেন, কিন্তু তাঁহারা এই অশিক্ষা অমনোযোগ ও কর্তব্যবুদ্ধির অভাবের সমুদ্রে দিশাহারা। কতটুকুই বা করিতে পারেন তাঁহারা! তবু ভূপেন লক্ষ্য করিয়া দেখিল, এই কয়জনকেই ছাত্ররা ভালবাসে এবং শ্রদ্ধা করে। তাহারা হয়ত সবটা তলাইয়া বোঝে না, তবু কাহার কতটুকু মূল্য, তাহা আপনিই তাহাদের কাছে

নির্ধারিত হইয়া যায়।

শিক্ষক মহাশয়দের ত ঐ অবস্থা। পড়াশুনাতেও যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তাহাও তথৈবচ। একটি ক্লাস এইট-এর ছেলেকে সিরাজউদ্দৌলার কথা জিজ্ঞাসা করাতে সে 'হাঁ' করিয়া তাকাইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, অতদূর পর্যন্ত আমাদের পড়া হয় নি স্যার। ভূপেন যখন বুঝাইয়া দিল যে এ ক্লাসে না হইলেও অন্য ক্লাসে ইহার আগে পড়া হইয়াছে নিশ্চয়, সুতরাং কিছুই না বলিতে পারার কোন কারণ নাই, তখন সে সবিস্ময়ে উত্তর দিল, বা রে, তা কেমন ক'রে হবে! সব ক্লাসেই ঐ মোগল আমল পর্যন্ত এসেই থেমে গিয়েছি যে। ওটা বোধ হয় ক্লাস নাইনে পড়ব একেবারে।

এমনি সব বিষয়েই। বই অনেক আছে কিন্তু পড়া হয় কতটুকু! যেটুকু হয় সেটুকুও খাপছাড়া—আগের এবং পিছনের পাঠ্য বা শিক্ষণীয় অংশের সহিত পারম্পর্য রক্ষিত হইল কিনা কে দেখে! অনেক বিষয়েরই প্রথম অংশ বাদ দিয়া পরের অংশ পড়ানো হয়, ফলে বার বার যখন প্রথম অংশের উল্লেখ পাওয়া যায়, তখন ছেলেরা কিছুই বোঝে না। সুতরাং যাহারা পাস করিতে চায় তাহাদের মুখস্থ করা ছাড়া উপায় থাকে না। যেমন ভূগোল—ম্যাট্রিক ক্লাসের বিপুলায়তন বইগুলি (উপরের ক্লাসের জন্য লেখা বলিয়া ভাষাও শক্ত) সময়াভাবের অছিলায় ক্লাস সেভেন হইতে ধরা হয়। ভূগোলের প্রথম অংশ কঠিন বলিয়া সেটা ক্লাস্ টেন-এর জন্য মুলতুবী রাখিয়া পরের অংশ শুরু করা হয় ক্লাস সেভেন-এ। মুখস্থ করিবার পক্ষে কোন বাধা হয় না বটে তবে যাহারা বুঝিয়া পড়িতে চায় তাহারা জলবায়ু প্রভৃতি পড়িবার সময় আগেকার নাম ও অবস্থার বিশেষ উল্লেখগুলি কিছুই বুঝিতে পারে না। এমনি গণ্ডগোল প্রায় সব বিষয়েই। এমন কি অঙ্কও যেটা আগে পড়ানো উচিত সেটা তোলা থাকে উপরের ক্লাসের জন্য।

প্রথম কয়েকদিন চুপ করিয়া থাকিয়া ভূপেন একদিন হেড্‌মাস্টার মহাশয়ের কাছে কথাটা পাড়িতে গেল। হেড্‌মাস্টার অতুলবাবু বিস্মিত হইয়া কহিলেন, তবেই হয়েছে ভূপেনবাবু! আপনি বুঝি ঐসব নিয়ে মাথা ঘামাতে চান? হায় হায়! পড়াবেন কাকে, পড়বেই বা কে? হয়ত সারা ক্লাসে একটা কি দুটো ছেলে আছে যারা পড়তে চায়, তাদের জন্যে অত মাথা ঘামাবার দরকার নেই। নোট আছে, অঙ্কের সলিউশান আছে, কোশ্চেন-অ্যানসার আছে, মেড-ইজি সিরিজ আছে, ওআন-ডে প্রিপেয়ারেশন সিরিজ আছে—হেল্‌প্ বইয়ের অভাব কি! সব ছেলের বাড়িই দেখুন গাদা গাদা। যাদের নেই তারাও বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে চেয়ে চালায়। আমাদের কাজ হচ্ছে যে কোন্‌গুলো ইম্পর্ট্যান্ট অর্থাৎ পরীক্ষায়

আসতে পারে, সেইগুলো দাগ দিয়ে দেওয়া। এইটি যে যত ভাল পারবে সে তত ভাল মাস্টার। আপনি ওদের পড়াবেন ভাল ক'রে? ছোঃ!

ভূপেন কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু ওদের যে ঐ অত হেল্প্‌-বুকের সাহায্য নিতে হয় তার জন্যে কি আমরাই দায়ী নই? আমরা ভাল ক'রে পড়ালে ওদের ওসব হয়তো দরকারই হ'ত না।

অতুলবাবু হাসিয়া কহিলেন, ওগুলো দরকার হওয়াটাই বাঞ্ছনীয় ভূপেনবাবু, যেহেতু ওগুলো আমরাই লিখে থাকি। তাছাড়া দায়ী ঠিক আমরা নই। দায়ী ওদের গার্জিয়ানরা যাঁরা ওদের সিনেমা-থিয়েটার দেখা বন্ধ করতে পারেন না, বরং অনেক সময় নিজেরা সঙ্গে ক'রেই নিয়ে যান। আমাদের ইস্কুলের মাইনে যদি এক টাকা বাড়াতে যাই ত সবাই হাঁ হাঁ ক'রে উঠবেন, কিন্তু ছাত্রদের পরকাল খাবার জন্য তাদের বিলাস ও প্রমোদে অর্থব্যয় করতে তাঁরা কাতর নন। আমরা মাইনে কত পাই,—তাতে আমাদের সংসার চলে? ওসব ত করতেই হবে আমাদের। চিরকাল না খেয়ে আমরা দেশবাসীর সন্তানদের শিক্ষা বিতরণ ক'রে যাবো, এতটা মহৎ ভাববেন না আমাদের। অভিভাবক এবং কর্তৃপক্ষ সকলকার এ কথাটা ভাবা উচিত। আপনি মফঃস্বল থেকে এসেছেন—সেখানে তবু কিছু পড়াশুনো চলে, এখানে ওসব চলবে না। নতুন এসেছেন—আর কিছু দিন দেখুন।

সত্যই ভূপেন দেখিল।

প্রথমটা সে মনে করিয়াছিল যে ওখানকার মত এখানেও সে একাই নিজের দায়িত্ব পালন করিয়া যাইবে। আর কেহ ছেলেদের পড়াইতে না চান সে অন্তত নিজের কর্তব্যপালনে অবহেলা করিবে না—কিন্তু কাজে লাগিয়া দেখিল যে অব্যবস্থা এবং মূঢ়তার এই সমুদ্র দুস্তর! এমনই রীতিতে এখানকার কাজ দীর্ঘদিন ধরিয়া চলিয়াছে যে, একার পক্ষে নূতন করিয়া কিছু শুরু করা অসম্ভব। সে সময়ই বা কৈ! ওখানে সকাল-বিকাল সব সময়েই ছাত্রদের সে কাছে পাইত, এখানে ইস্কুলের কয়েক ঘণ্টাও ঠিক-মত পাওয়া যায় না। কোলাহল ও স্বার্থসংঘাতে কোনপ্রকার অন্তরঙ্গতা থাকা সম্ভব নয়। তাছাড়া সব চেয়ে বড় বাধা ছাত্ররাই। ওখানকার ছাত্রে আর এখানকার ছাত্রে অনেক তফাৎ। শিক্ষকদের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নাই কাহারও—শিক্ষা সম্বন্ধেও আগ্রহের অত্যন্ত অভাব। ভূপেন নিজেও একদিন এই কলিকাতাতেই স্কুলের ছাত্র ছিল, আর সেও এমন কিছু বেশী দিনের কথা নয়, কিন্তু এবার আসিয়া দেখিল যে গত দশ বছরেই অনেকটা বদলাইয়া গিয়াছে। হয়ত তখন এমন করিয়া নিজের পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সচেতন থাকা সম্ভব ছিল না, তবু যতটা মনে পড়ে—এত বাচাল, এত উদ্ধত এবং এতখানি যৌন-

সচেতন তাহারা ছিল না। বাংলা চলচ্চিত্র এই অল্প সময়ের মধ্যে দেশের হাওয়া কতটা বদলাইয়া দিয়াছে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। সিনেমা ও ফিল্ম সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য তাহাদের মুখস্থ। ক্লাসে বসিয়াও তাহারা সেই আলোচনাই করে, এমন কি পড়ার ফাঁকে শিক্ষকদের সঙ্গেও অনায়াসে সে প্রসঙ্গ শুরু করিয়া দেয়। এ সম্বন্ধে ভূপেনের অজ্ঞতায় তাহারা করুণার হাসি হাসে, প্রকাশ্যভাবেই বিদ্রূপ করে। এ ত গেল ক্লাসের কথা—ক্লাসের বাহিরে আনা-গোনার পথে রাস্তায় চলিবার সময় যে সব কথা ও গল্পের টুকরা তাহার কানে আসে তাহাতে কানে হাত চাপা দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। ক্লাস নাইন ও টেনের ছেলেরা অনেকেই বিশেষজ্ঞর মত অভিনেত্রীদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লইয়া আলোচনা করে। যাহারা অতটা করে না, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এমন কথা বলে যা তাহাদের বয়স এবং শিক্ষার তুলনায় অত্যন্ত বিস্ময়কর। যৌনতত্ত্ব-ঘেঁষা আলাপ-আলোচনা ক্লাস এইট-এও একেবারে বিরল নয়। ইহাদের কাছে লেখাপড়ার কথা বলিতে যাওয়া অরণ্যে রোদন ছাড়া আর কি! যে দুই-তিনটি ভাল ছেলে থাকে ক্লাসে, তাহারাও শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখিতে পারে না, ইস্কুলের পড়ার উপর নির্ভরও করিতে পারে না—যতটা পারে বাড়িতেই পড়ে কিংবা কোচিং ক্লাসে।

ভূপেনের অত্যন্ত ইচ্ছা হইল কোচিং ক্লাসের কিছু একটা ভার নেয়, কিন্তু সেখানে ইতিপূর্বে যে সব প্রবীণ শিক্ষক মহাশয়রা বসিয়া আছেন তাঁহাদের প্রাচীর নিরন্ধ্র—নবাগতের সেখানে প্রবেশের কোন আশা নাই। ভূপেন কোনমতেই সুবিধা করতে না পারিয়া শেষে তাঁহাদের কাছে প্রস্তাব পাঠাইল যে, তাঁহাদের পারিশ্রমিকের অংশে ভাগ না বসাইয়াও পরিশ্রমের ভার লাঘব করিতে রাজী আছে। তাহাতে ফল হইল আরও খারাপ। এ প্রস্তাবটাকে একদিকে অপমান-কর, অপরদিকে অত্যন্ত দুরভিসন্ধিমূলক মনে করিয়া তাঁহারা সকলে বিষম চটিয়া গেলেন, এমন কি সেক্রেটারীর কাছে নালিশও গেল।

অগত্যা ভূপেনকে কর্তব্য-পালনের ইচ্ছাটা মনের মধ্যেই চাপিয়া রাখিতে হয়। পূর্ণেন্দুবাবু ইতিমধ্যেই একটা টিউশ্যনী তাহাকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। বড়লোকের ছেলে, মাহিনা বেশী, পরিশ্রম কম। ছেলেটি বুদ্ধিমান কিন্তু অত্যন্ত অমনোযোগী, দিনরাত সিনেমা ও সিনেমার কাগজ লইয়া আছে। তবু ভূপেন হাল ছাড়িল না। স্থির করিল যেমন করিয়াই হউক, এই ছেলেটিকে সে মানুষ করিয়া তুলিবে। দিনকতক পড়াইবার পরই সে একদিন সহসা তাহার ছাত্র প্রশান্তর বাবার কাছে গিয়া কথাটা পাড়িল। কহিল, দেখুন প্রশান্তকে নিয়ে

আসতে ও পৌঁছে দিতে যে গাড়ি যায় সেটা কি বন্ধ করা সম্ভব নয় ?

প্রশান্তর বাবা মোটা বেতনের সরকারী কর্মচারী, মেজাজটা সেই রকমই কড়া। বিরক্তিতে তাঁহার মুখ অন্ধকার হইয়া আসিয়াছিল কিন্তু পূর্ণেন্দুবাবু এই ছেলেটির বিদ্যানুরাগ এবং নিষ্ঠার যে ফিরিস্তি দিয়াছিলেন সেটা স্মরণ হওয়ায় বিরক্তি চাপিয়া প্রশ্ন করিলেন, কেন বলুন ত ? আপনি কি কম্যুনিস্ট ?

ভূপেন ধীরভাবেই জবাব দিল, তার জন্যে নয়। আমি দরিদ্র, কোন ইজম্ নিয়ে মাতামাতি করার সময় আমার নেই। আমি ছেলেটির ভবিষ্যৎই ভাবছি। এখানে কোনরকম ব্যায়ামের ব্যবস্থা নেই, স্কুলে যা সামান্য খেলাধূলোর ব্যবস্থা আছে সেখানে যেতে দেন না। একটু হেঁটে অন্তত বাড়ি ফেরে যদি ত স্বাস্থ্যটা ভাল থাকে। এখনই যা মোটা হয়ে গেছে, এর পর বড় কষ্ট পাবে। তাছাড়া বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মিলে-মিশে বাড়ি ফিরতে পারলে মনের স্বাস্থ্যটাও ভাল থাকে।

—ভাল থাকে ! বলেন কি ? বন্ধু-বান্ধব মানে ত যত রাজ্যের বকা ছেলে।

ভূপেন হাসিয়া জবাব দিল, ঐ সব বকা ছেলেদের সঙ্গেই ত দিনের মধ্যে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা কাটাতে হয়। ক্লাসে ত আপনি পাহারা দিতে যান না। আর পনেরো মিনিট বেশিতে কি আসে যায় ?

—কিন্তু ক্লাসে ধরুন টিচাররা থাকেন ত !

—তাঁদের সাধ্য আছে অতগুলো ছেলের দিকে নজর দেন ? ক্লাসে টিচারদের সামনেই যা সব কাণ্ড হয় তা উল্লেখ না করাই ভালো। তাছাড়া এমনিও যথেষ্ট ফাঁক পায় ওরা। আর ধরুন এই যে গাড়ি যায়—দু-তিনজন বন্ধু হয়ত কাঁধ ধরাধরি ক'রে ইস্কুল থেকে বেরোল, প্রশান্ত এসে চড়ল গাড়িতে, তারা একবার সতৃষ্ণ চোখে চেয়ে পাশের ফুটপাথ ধরল, এতে মনে মনে—একই দেশের একই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে যে ব্যবধান রচিত হতে থাকে ঐ শিশুকাল থেকে, ওটা ভাল নয়। আপনি বকা ছেলেদের সঙ্গে মেশার আশঙ্কা করছেন ! তা থেকে বাঁচিয়ে ওকে দিচ্ছেন কি ? সারা বিকেলটা চুপ ক'রে বাড়িতে বসে থাকতে হয় বলে যত বাজে কাগজ আর ডিটেক্‌টিভ গল্পের বই পড়ে এবং সপ্তাহে দু-তিন দিন সিনেমায় যায়। এই ত ? তাতেই কি ওর মানসিক স্বাস্থ্য বজায় থাকে ? তার চেয়ে ওর সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গ ঢের ভাল জানবেন। আর কিছু না হোক্, অন্তত এই বয়সে বুড়োটে হতে পারে না।

প্রশান্তর বাবা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, তাই ত, আপনি ভাবিয়ে দিলেন দেখছি। আমার যদি বা আপত্তি না থাকে ওর মাকে রাজী করানো খুব কঠিন হবে। তাঁর বিশ্বাস তাঁর ছেলের জন্যে যত রাজ্যের য়্যাক্‌সিডেণ্ট ওৎ পেতে

আছে। আর সত্যি কথা বলতে কি, তাঁর একটু বড়মানুষি—মানে প্রেস্টিজেও আঘাত লাগবে। আচ্ছা দেখি একবার কথা কয়ে।

প্রশান্ত এই কয়দিনেই ভূপেনের অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ভূপেন তাহাকেও উস্‌কাইয়া দিল। দরিদ্র বন্ধু-বান্ধবদের সামনে গাড়ি চড়ায় যে কোন সংকোচের কারণ থাকিতে পারে—সে শিক্ষা সে পায় নাই। তবে এমনিই তাহাদের সঙ্গ ছাড়িয়া বাড়ির খাঁচায় আসিয়া ঢোকাতে আপত্তি তাহার বরাবরই ছিল। সে মাকে পীড়াপীড়ি করায় অবশেষে তিনি একটা আপস রফা করিলেন। যাইবার সময় গাড়ি করিয়াই যাইবে—কিন্তু ফিরিবার সময় সে হাঁটিয়া ফিরিবে।

এমনি করিয়া ধীরে ধীরে সে প্রশান্তকে বশ করিয়া ফেলিল। নানা ভাল ভাল বইয়ের গল্প বলিয়া, পাঠ্যকে নানাভাবে লোভনীয় করিয়া তুলিয়া লেখাপড়া ও ভাল বই-এর দিকে তাহার মনকে আকৃষ্ট করিল। কিন্তু একটা জিনিস কিছুতেই বন্ধ করিতে পারিল না, সেটা সিনেমা যাওয়া। নেশাটা এমনই বদ্ধমূল হইয়া গেছে যে তাহাকে আয়ত্তের মধ্যে আনা কঠিন। তবু ভূপেন হাল ছাড়িল না। সময় লাগিবে—কিন্তু অসম্ভব হইবে না, এটুকু বিশ্বাস তাহার নিজের উপর ছিল।

প্রশান্তদের বাড়ি আর একটি ছাত্রী তাহার জুটিল—ফাউ স্বরূপ। সেটি প্রশান্তর বোন লিলি। সে কোন্ এক মেয়ে-ইস্কুলে পড়ে। একজন শিক্ষয়িত্রী তাহাকে বাড়িতেও পড়াইয়া যান, কিন্তু একদিন এমনিই তাহার বিদ্যা নাড়াচাড়া করিতে গিয়া ভূপেন দেখিল যে সে প্রায় কিছুই জানে না। সে যে ক্লাসে পড়ে, সে ক্লাসের যে কোন খারাপ ছেলেও তাহার চেয়ে ভাল লেখাপড়া জানে। অথচ লিলি ভালভাবেই পাস করে। প্রোগ্রেস রিপোর্ট চাহিয়া লইয়া দেখিল যে কোন বিষয়েই ষাটের নীচে নম্বর থাকে না। মেয়ে-ইস্কুলের নমুনা সে যে ইতিপূর্বে না পাইয়াছিল তা নয়, তবে সেগুলি ছোট এবং ভুঁইফোড় ইস্কুল, কোন-কোনটা সকালে অল্প সময়ের জন্য বসে, কোন-কোনটা বা ছয় বৎসরে দশ বৎসরের কোর্স শেষ করে। সুতরাং ভাল করিয়া পড়ানো সেখানে সম্ভব নয়, এই ছিল তাহার সান্ত্বনা—কিন্তু এ কি, বড় ইস্কুল, নামডাকও কম নয়—অথচ এত অবহেলা! পড়াশুনার পদ্ধতি ত ভাল নয়ই, তা ছাড়া যাঁহারা পড়ান তাঁহাদের বিদ্যাবত্তার যে সব নমুনা ছাত্রী মারফৎ পাইল তাহাও নৈরাশ্যজনক। পাঠ্যপুস্তকের বাহিরের জগৎ সম্বন্ধে তাঁহারা ত একটি কথাও বলেন না, পাঠ্যপুস্তকগুলাও ভাল করিয়া পড়াইবার অবসর নাই তাঁহাদের। অথচ এমনি চাকচিক্যের অবধি নাই। জুলুমও ঢের। একবার হেড্‌মিস্ট্রেসের খেয়াল হইয়াছিল যে, এক এক ক্লাসের মেয়েদের সকলকে একরকম পোশাক পরিয়া আসিতে হইবে। যাহারা ধনীদুহিতা তাহাদের

অসুবিধা হয় নাই, কিন্তু মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র ঘরের যে-সব মেয়েরা পড়িত, তাহাদের দুর্দশার অন্ত রহিল না। সেজন্য অনেক অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটিয়া গেল। জরিমানা প্রভৃতি কত কি! বহু লেখালেখির পর এখন সেটা বন্ধ আছে। বর্তমানে লিলিদের যিনি ক্লাস-টিচার তাঁহার হুকুম হইয়াছে যে, কোন মেয়ে চুল এলাইয়া ক্লাসে আসিবে না। প্রত্যেককে মাথা বাঁধিয়া আসিতে হইবে। সকালে স্নান করিয়া ঐ সময়ের মধ্যে চুল শুকানো অসম্ভব; তবু প্রত্যেক মেয়েকেই ভিজা চুল জড়াইয়া খোঁপা বাঁধিতে হয়। উপায় কি! এমন অস্বাস্থ্যকর প্রস্তাব যে স্কুল-কর্তৃপক্ষের কাছ হইতে আসিতে পারে তাহা প্রত্যক্ষ না দেখিলে ভূপেন হয়ত বিশ্বাসই করিতে পারিত না।

সুতরাং লিলির ভারও ভূপেনের হাতে আসিয়া পড়ে। এ ভার লয় সে অবশ্য স্বেচ্ছাতেই। তাহার পড়ানোর পদ্ধতিতে আকৃষ্ট হইয়া লিলি রোজই আসিয়া বসিয়া থাকিত, ক্রমশঃ ভূপেন তাহাকেও পড়াইতে শুরু করিল। প্রশান্তের বাবা কথাটা শুনিয়া একদিন আসিয়া মৃদু ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং পরের মাস হইতে কিছু বেশী মাহিনা দিবারও ইঙ্গিত দিলেন, কিন্তু ভূপেন বিনীতভাবে অস্বীকার করিয়া কহিল, ঐটি মাপ করবেন। ওকে আমি ত নিয়মিত পড়াতে পারি না, যেটুকু পড়াই সেটুকু ভাল লাগে বলেই পড়াই। তার জন্যে কোন পারিশ্রমিক নিতে পারব না। তবে আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ এই যে, আপনারা এমনভাবে ছেলেমেয়েদের জন্যে ইস্কুল আর মাস্টার ঠিক করে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকবেন না। একটু একটু দেখবেন যে সেখানে কি হয় না হয়।

তিনি বিস্মিত হইয়া কহিলেন, কেন, প্রোগ্রেস রিপোর্ট ত দেখি!

—প্রোগ্রেস রিপোর্ট! ভূপেন হাসিয়া বলিল, অন্তত মেয়ে ইস্কুলের প্রোগ্রেস রিপোর্টের ওপর আমার আর আস্থা রইল না।

প্রশান্তর বাবা কহিলেন, আমাদের ব্যাকওয়ার্ড দেশ, বুঝলেন না! মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে একটু লিনিয়েন্ট না হ'লে চলে না।

ভূপেন মাথা হেঁট করিয়া কহিল, তা বটে। কিন্তু সে প্রয়োজন কি এখনও আছে?

তিনি আর কোন জবাব দিলেন না।

পরীক্ষা দিয়া ভূপেন নিশ্চিন্তই ছিল, সহসা বিশু একদিন তাহাকে প্রশ্ন করিল, কি হে, রেজাল্টের কি করছ? তদ্বির-তদারক করো!

—তদ্বির?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তদ্বির! নাইন্‌থ পেপার কথাটা শোন নি? এই ক'বছর

পাড়াগাঁয়ে থেকে দেখছি শহরের সব হাল-চাল ভুলে গেলে! এখানে এম. এ. পরীক্ষার ফলাফল তদ্বিরের ওপরই নির্ভর করে। দেখো গে, ফার্স্ট ক্লাস পাবার জন্যে ছেলেমেয়েরা একজামিনারদের বাড়ির মাটি রাখছে না। তোমার ত আরও বেশী ক'রে তদ্বির করা উচিত, কেন-না প্রোফেসাররা প্রাইভেট ক্যাণ্ডিডেটদের কিছুতেই ফার্স্ট ক্লাস দিতে চান না, এমনও একটা দুর্নাম আছে। যাও যাও একজামিনারদের লিস্ট্ নিয়ে কাল থেকেই ঘোরাঘুরি শুরু ক'রে দাও!

ঠিক তদ্বির করার ইচ্ছা ভূপেনের না থাকিলেও কতকটা ফলাফল জানার জন্যও বটে এবং কতকটা বিশুর কথার সত্যতা পরীক্ষা করিবার জন্যও, সে পরীক্ষকদের লিস্ট সংগ্রহ করিতে একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে গেল। যাওয়াটাই হয়ত মূর্খতা—কারণ সেখানে পরিচিত লোকদের সুপারিশ ধরিলে সব রকম বে-আইনী ব্যাপারই চলে কিন্তু অপরিচিত লোকের কোন সুবিধা নাই। শুধু শুধু হয়য়ান হইয়া ফিরিয়া আসিল, তবে একটা অভিজ্ঞতা তাহার হইল—বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার ব্যর্থতার সব চেয়ে বড় প্রমাণ সেখানকার অফিসেই আছে—দূরে খুঁজিতে যাইবার প্রয়োজন নাই। এত বিশৃঙ্খলা এবং অব্যবস্থা কল্পনা করাও কঠিন।

অবশ্য পরীক্ষকদের তালিকা পাওয়া গেল অনায়াসেই, হেডমাস্টার অতুলবাবু একবার টেলিফোন করিয়াই জানিয়া দিলেন। কিন্তু নাম পাইলেও অন্য অসুবিধা ঢের ছিল, পরিচিত কোন লোকের সুপারিশ না থাকিলে আমল পাওয়া শক্ত। পরীক্ষকদেরও কোন দোষ নাই, তদ্বিরকারীদের যা ভিড় তাহাতে মাথা ঠিক রাখা শক্ত। বিশেষ করিয়া ছাত্রীদের ভিড় বেশী, যাহারা পাস করিবে নিশ্চিত জানে তাহারাও কোন্ ক্লাস সেটা জানিতে চায় এবং ফার্স্ট ক্লাস পাইতে চায়। এতকাল কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে পড়িলেও সর্বোচ্চ ধাপে যে এমন নির্লজ্জ ধরাধরি চলে তাহা ভূপেনেরও জানা ছিল না। এতটা নীচে নামাও তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। হয়ত পূর্ণেন্দুবাবুকে ধরিলে সুপারিশের অভাব হইত না কিন্তু সে প্রবৃত্তিও তাহার হইল না। নিজেকে পরীক্ষকদের স্থলে কল্পনা করিয়া তাঁহাদের বিব্রত অবস্থা চিন্তা করিতেই সে লজ্জিত বোধ করিল।

অগত্যা ফলাফলটা সরকারী ভাবে ঘোষিত হওয়া পর্যন্ত তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইল। যথাসময়ে দেখা গেল যে সে ফার্স্ট ক্লাসই পাইয়াছে বটে তবে তাহার নামটা সে তালিকায় আছে সবশেষে। তাহার ধারণা ছিল যে সে উত্তর-পত্র খুবই ভাল লিখিয়াছে, সুতরাং মনে মনে একটু ক্ষুণ্ন হইল। অবশ্য বিস্মিত হইল না একেবারেই, সেকেণ্ড ক্লাস পাইলেও হয়ত বিস্মিত হইত না। দুঃখ সন্ধ্যা বেচারীর জন্য—অনেক আশা ছিল তাহার—কিন্তু কী আর করা যাইবে!

ইউনিভারসিটি পোস্ট অফিসে দাঁড়াইয়াই সে মহেশবাবু ও কল্যাণীকে দুইখানা চিঠি লিখিয়া দিল, তারপর অনেকদিন পরে ক্লান্ত পা দুইটাকে টানিয়া লইয়া চলিল সন্ধ্যাদের বাড়ির উদ্দেশে।

২৭

মোহিতবাবু ভূপেনকে যতগুলি মন্ত্র দিয়াছিলেন জীবনের তপস্যায় সিদ্ধিলাভের জন্য—তাহার মধ্যে সব চেয়ে কাজে লাগিল আশাবাদের মন্ত্রটাই। তিনি বারবারই বলিতেন, 'বাবা, হার মেনো না কখনও জীবনে। যখন মনে হবে এইবার ভেঙে পড়ছি তখনই মনে মনে এই কথাটা জপ করবে যে,—সমস্ত দুস্তর রাত্রিই একদিন কেটে যায়, আমার এ রাত্রিও কাটবে। আমি হার মানব না, হার মানব না!'

এ প্রসঙ্গে কথা উঠিলে ভূপেন বলিত, বাইরের দুঃখ মানুষকে কঠিন করে, দুঃখ সইবার, আঘাত সইবার ক্ষমতা তার আরও বাড়ে কিন্তু মনের দুঃখটাই যে বড়—অন্তর যখন দুর্বল হয়ে পড়ে, ভেঙে পড়তে চায় তখন যে কোন আশাবাদই কাজ করে না। না খেতে পেয়ে আত্মহত্যা করে কটা লোক, তার চেয়ে ঢের বেশী লোক করে মানসিক দ্বন্দ্বে ক্লান্ত, পরাজিত হয়ে। তার কি মন্ত্র বলুন?

মোহিতবাবু কণ্ঠস্বরে জোর দিয়া বলিতেন, 'তার মন্ত্র হ'ল পৌরুষের মন্ত্র! মনে সেই জোর রাখতে হবে যে, আমি অপরাজেয়, আমি হার মানব না। আমি ক্লান্ত হব না। আর ঐ যে বললুম, আশাটাই হ'ল বড় কথা, সে-ই মনে জোর আনে, পৌরুষকে উদ্বুদ্ধ করে।'

কথাগুলি তখন শুনিয়াই গিয়াছিল, কিন্তু চরম দুঃখের দিনে এমন ভাবে কাজে লাগিবে তাহা কে জানিত?

বাস্তবিক কলিকাতায় আসিবার পর দুই-তিনটি বৎসর কাটিল তাহার যেন একটা একটানা দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়াই। পথ কোথাও নাই—সর্বত্র বাধা, সর্বত্র পরাজয়। আশা রহিল না, আদর্শ চূর্ণ হইয়া গেল, তবু বাঁচিতে হইবে, তবু পথ চলিতে হইবে। এক এক সময় একটা মানসিক অবসাদ আসে, মনে হয় যে এমন করিয়া বাঁচিয়া লাভ নাই, এ জীবনের যবনিকা এইখানেই টানিয়া দেওয়া ভাল, এমন ভাবে আর পারা যায় না—তখন সে প্রাণপণে ঐ মন্ত্রই জপ করে—'আমি অপরাজেয়, আমি হার মানব না কিছুতেই।'

ইতিমধ্যে অনেক ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে সব চেয়ে যেটা বড় ঘটনা, সেটা হইতেছে তাহার পুত্রসন্তান লাভ। তাহার ছেলে হইয়াছে—ছেলে! বংশধর, উত্তরাধিকারী, তাহার আশা ও আদর্শের উত্তর-সাধক! কথাটা সে বিশ্বাসই

করিতে পারে নাই বহুদিন,—এখনও মনে হইলে, ভাল করিয়া ধারণা করিবার চেষ্টা করিলে কেমন একটা রোমাঞ্চ হয়। সব চেয়ে বিস্ময় বোধ হয় তাহার এত কম, এই বয়সে সে ছেলের বাবা হইয়া বসিবে এমন কথা কে ভাবিয়াছিল! ছেলেবেলায় সে বিবাহ করিবার কথা ভাবিতেই পারিত না। সেটা একটা সুদূর ব্যাপার, যখন হোক হইবে'খন। জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার পর, আর্থিক অস্বচ্ছলতা দূর হইবার পর অনেক বেশী বয়সে কথাটা চিন্তা করা যাইবে—এই ছিল তখনকার মনের ভাব। তারপর সন্ধ্যার সংস্পর্শে আসিবার ফলে জীবনের আদর্শ যখন গেল বদলাইয়া, তখন শুধু ভাবিত এই উৎসর্গীকৃত জীবনের কর্মপথে যদি কখনও তেমন সঙ্গিনী, সহকর্মিণী পাই তবেই দেখা যাইবে। আর, হয়ত এমন একজন সঙ্গিনীর কথা মনের অবচেতনে ভাবিত যাহার সহিত সন্ধ্যার কতকটা মিল আছে।

কিন্তু এ যেন কোথা দিয়া কি হইয়া গেল! একটা বিপুল ওলট-পালটের মধ্যে সহসা সে আবিষ্কার করিল যে সে পুত্রের পিতা। বিশেষ একটা গুরুদায়িত্ব তাহার মাথার উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

ছেলে হওয়ার সংবাদ পাওয়ার পরেও কিছুদিন সে ওখানে যাইতে পারে নাই —নূতন কাজ, ছুটি পাওয়া কঠিন। তাহার উপর খরচের টানাটানি—প্রথম সন্তানের মুখ দেখিবে, সোনা না দিয়া দেখার কথা ভাবিতেও পারা যায় না। তবে সংবাদ পাইয়া, তাহাকে না জানাইয়া সন্ধ্যা চলিয়া গিয়াছিল দাসী-চাকর সঙ্গে লইয়া—সোনার হার দিয়া ছেলের মুখ দেখিয়া আসিয়াছে, প্রসূতির জন্য ফল ও অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য-ঔষধও দিয়া আসিয়াছে বিস্তর।

অবশেষে কী একটা ছুটিতে ভূপেনও গেল, বিশুর কাছ হইতেই কিছু টাকা ধার করিয়া পাত্‌লা সোনার পাতের একজোড়া বালা গড়াইয়া লইয়া।

ছেলেটি নাকি তাহার মতই দেখিতে হইয়াছে। অন্তত কল্যাণীর তাই অভিমত! কে জানে! ভূপেন বুঝিতে পারে না। এখন ত একটা মাংসপিণ্ড মাত্র। তবে রংটা হইয়াছে কল্যাণীর চেয়ে দুই-এক পোঁছ উজ্জল, কতকটা ভূপেনেরই মত। মাংসের ডেলাটাকে ধরিতে ভয় করে, মনে হয় বুঝি ভাঙিয়া যাইবে। তবু কেমন এক প্রকারের স্নেহ উদ্বেল হইয়া ওঠে সেদিকে চাহিয়াই— কৌতুক ও কৌতূহলের অবধি থাকে না। এ যেন এক বিস্ময়কর ঘটনা—এক পরমাশ্চর্য আবির্ভাব।

কিন্তু দুইদিন পরেই ফিরিয়া আসিতে হয়। ছুটি নাই—ইস্কুলের যদি-বা আছে—নূতন টিউশ্যনী, কামাই করিতে ভয় করে। তবে তাহার মনটা উদ্বিগ্ন

হইয়াই রহিল ; কল্যাণীর শরীর খারাপ, তাহার উপর এখনই সংসারের কাজ শুরু করিতে হইয়াছে। একটা দাসী রাখিয়া দিল ভূপেন একরকম জোর করিয়া। মহেশবাবুরা সেই কয়দিন যথেষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারাই বা আর কত দেখেন ?

এখানে ফিরিয়া আসিয়া ভূপেন যত বিলাতী মাতৃমঙ্গল বই খুলিয়া পড়িতে বসে। যে সব উপদেশ তাহাদের মধ্যে আছে অধিকাংশই ব্যয়বহুল, তাহারই ভিতর হইতে বাছিয়া বাছিয়া কতকগুলি নির্দেশ—যাহাতে পয়সা খরচ নাই, শুধুই সতর্ক হইয়া চলিবার ব্যবস্থা—তর্জমা করিয়া লিখিয়া পাঠায় কল্যাণীকে। এ বিষয়ে আমাদের দেশের মেয়েদের একটা সহজাত উপেক্ষা আছে, সেটা অশিক্ষারই ফল। গর্ভবতী বা প্রসূতির আহারের উপর, তাহাদের জীবনযাত্রার উপর যে সন্তানের স্বাস্থ্য নির্ভর করে তাহা এখনও অনেকেই জানে না, বলিলেও বিশ্বাস করে না। অথচ তাহারাই কষ্ট পায় সেজন্য। যদি কোন উপযুক্ত গৃহিণী থাকিতেন, তাহা হইলে ভূপেনকে এসব চিন্তা করিতে হইত না, কিন্তু এক্ষেত্রে উপায় কি ? তাহার অত্যন্ত দুর্ভাবনা—সন্তান না চিরকাল রুগ্ন অকর্মণ্য হইয়া থাকে !

ছেলে যদি তাহার চোখের সামনে থাকিত তাহা হইলে সে অত ভাবিত না। তাহা ত নাই-ই, মধ্যে মধ্যে গিয়া দেখিয়া আসিবে এমন সম্ভাবনাও নাই। ব্যয় বাড়িয়াছে—আয় ত সমানই আছে। ষাট টাকা মাহিনা আর চল্লিশ টাকার টিউশ্নী, এই ত ভরসা। এখানে মেসের খরচা দিয়া নিজের কাপড়-জামা ধোপা-নাপিত ট্রাম-বাস প্রভৃতি চালাইতে খুব কম করিয়াও চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা পড়ে, বাকি টাকা হইতে কল্যাণীদের চল্লিশ টাকা পাঠাইতে হয়—ইস্কুলের দশ টাকা পেন্‌সন্ এই ত ভরসা সেখানে, এ টাকার কম কুলায় না। কল্যাণীর জন্য এক পোয়া দুধেরও বরাদ্দ করিতে হইয়াছে—নহিলে ছেলেটা বাঁচে না। এটুকুও যথেষ্ট নয় তাহা সে জানে—চিকিৎসকরা অন্তত এক সের দুধের উপদেশ দিতেছেন, কিন্তু কোথা হইতে কি হয় ? তা-ই ঐ কটা টাকায় যে কী ভাবে চলিতেছে তাহা একমাত্র কল্যাণীই জানে। রাখু পাস করিয়াছে বটে, সে ইস্কুলে ঢুকিবে এমনিই কথা ছিল, কিন্তু মহেশবাবু তাহার জন্য কোন্ মফঃস্বলের কলেজে বিনা বেতনে পড়া ও একটি ভদ্রলোকের বাড়ি গৃহশিক্ষকরূপে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া যখন তাহার মত জানিতে চাহিলেন, তখন আর সে 'না' বলিতে পারিল না। এখন উপার্জন করিতে শুরু করিলে তাহার সামান্যই উপকার হইত কিন্তু রাখুর নিজের ভবিষ্যৎটা নষ্ট হইয়া যাইত একেবারেই। তার চেয়ে সে-ই না হয় আর কিছুদিন কষ্ট করিবে। তা-ও তাহার দুই-একখানা বই কিনিয়া দিতে হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে হাতখরচের জন্য

দু-একটা টাকাও পাঠাইতে হয়।

ইহার মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল শান্তির বিবাহ।

এ পাত্রটিকে ভূপেনই ঠিক করিয়া দিয়াছে। ছেলেটি তাহার মেসেই থাকে, প্রিয়দর্শন মিষ্ট-স্বভাবের ছেলে, আই-এস-সি পাস করিয়া চাকরিতে ঢুকিয়াছিল—কোন এক কেমিক্যাল কোম্পানীর ঔষধ ও প্রসাধন-সামগ্রী লইয়া দুই-তিন বৎসর উত্তর-বিহারে প্রচার ও বিক্রয় করিয়াছে, সম্প্রতি আর এক বিলাতী কোম্পানীতে কাজ লইয়া এখানে আসিয়া বসিয়াছে। এখন আর ঘোরাঘুরি করিতে হইবে না, মাহিনাও মন্দ নয়, আশি টাকা। দেশে সামান্য কিছু জমি-জায়গা আছে, মাথার উপর বাপ-মাও আছেন। বাবা গ্রামের ইস্কুলের শিক্ষক। বড় ভাই বোম্বেতে কী চাকরি করেন—ইত্যাদি। অর্থাৎ এক কথায় সৎপাত্র। ছেলেটিকে প্রথম হইতেই তাহার ভাল লাগে, আর তখনই শান্তির কথা মনে হয় সজাতি বলিয়া। আশ্চর্য, সে যে এমন মনের মধ্যে অভিসন্ধি পোষণ করিয়া কাহারও সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিতে এবং শেষ পর্যন্ত তাহার পিছনে লাগিয়া তাহার উদ্দেশ্য সফল করিয়া লইতে পারিবে—তাহা কে জানিত! কিন্তু শেষ অবধি তাহাই করিল সে, বন্ধুত্বের সুযোগ লইয়া তাহার কাছে কথার ছলে নিজের ভগ্নীর অপরিসীম গুণ ও কর্মদক্ষতার বর্ণনা করিতে করিতে এক সময়ে শঙ্করকে সে অভিভূত করিয়া ফেলিল। তাহার পর বিশুর সাহায্যে বাড়িতে পাঠাইয়া পাত্রী দেখানো ও পাত্রের বাপের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে বেশী সময় লাগিল না। ঘটকালির কাজটা সে নিখুঁত-ভাবেই সম্পন্ন করিল।

এই উপলক্ষে আর একটি ঘটনা ঘটিয়া গেল অকস্মাৎ।

বিবাহের দিন অবধি ধার্য হইয়া গেলেও ভূপেন একবারও বাড়িতে যায় নাই। উপেনবাবুর প্রতিজ্ঞা তখনও পর্যন্ত অটল আছে—তিনি ছেলের মুখ দেখিবেন না বা তাহার নিকট হইতে অর্থসাহায্য লইবেন না। তাহাদের মনোমালিন্যের ইতিহাস সে শঙ্করের কাছে ইহার আগেই খুলিয়া বলিয়াছিল—সুতরাং সে অনুরোধ করাতে বরাভরণের দাবিটা শঙ্কর বাবাকে দিয়া নাকচ করাইয়া দিয়াছিল। তাহার বদলে ভূপেনই নিজের অতি-কষ্টে সঞ্চিত টাকা হইতে ভগ্নিপতির আংটি বোতাম ও ঘড়ি কিনিয়া দিল। এ ছলনাটুকু যে উপেনবাবুর কানে ওঠে নাই তাহা নয় কিন্তু তিনিও আর বেশী বাড়াবাড়ি না করিয়া কথাটা চাপিয়া গেলেন।

এইভাবে ভূপেনকে বাদ দিয়াই বিবাহের আয়োজন যখন সম্পূর্ণ, তখন সন্ধ্যা একদিন আইবুড়ো-ভাত দিবার নাম করিয়া শান্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল এবং নিজে গাড়ি পাঠাইয়া আরও দুটি বোন-সুদ্ধ শান্তিকে নিজের বাড়িতে আনিয়া

লইল। উপেনবাবু সন্ধ্যাকে শাসাইয়া দিয়াছিলেন যে সে যেন এই উপলক্ষে ভ্রাতা ভগ্নীর মিলনের চেষ্টা না করে। সন্ধ্যা তাহা করেও নাই, কিন্তু ভূপেন আজও সন্দেহ করে যে ব্যাপারটার মধ্যে সন্ধ্যারই কিছু হাত আছে। কারণ বিবাহের যখন ঠিক দুইদিন বাকি, তখন শান্তি বলিয়া বসিল যে দাদা-বৌদি যদি তাহার বিবাহে না আসে তাহা হইলে সে কিছুতেই বিবাহ করিবে না এবং মুখে অন্নজলও দিবে না। প্রথমটা উপেনবাবু তাহার কথা বিশেষ গ্রাহ্য করেন নাই কিন্তু সারা দিন এবং রাত দশটা পর্যন্ত যখন সে একেবারে নিরম্বু কাটাইয়া দিল এবং মেয়েরা একযোগে এই ব্যাপার লইয়া চেঁচামেচি ও কান্নাকাটি শুরু করিল, তখন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। প্রথমটা খুব তর্জন-গর্জন করিলেন—মেয়েদের, ছেলেকে ও ছেলের মাকে যা মুখে আসিল তাই বলিয়া গালি দিলেন, একবার সিঁড়ির রেলিং-এ মাথাও খুঁড়িলেন কিন্তু এ-পক্ষ যখন তাহাতেও অবিচলিত রহিল, তখন রাত বারোটার সময় বিশুকে ডাকিতে পাঠাইলেন। শান্তির এই সত্যাগ্রহের পিছনে যে একটা চক্রান্ত আছে তাহা উপেনবাবু ধরিতে পারিয়াছিলেন ঠিকই—তিনি ম্যাটর্নীর নাতনীর উদ্দেশ্যেও কতকগুলি কটূক্তি করিলেন। কিন্তু সে নিজে হইতে যাচিয়া সব চেয়ে ভারী অলঙ্কারখানি পূর্বাহ্নেই পৌঁছাইয়া দিয়াছিল বলিয়া মনের মধ্যে একটু স্নেহবোধও ছিল—বেশী কিছু বলিলেন না।

প্রথমটা ভূপেন রাজী হয় নাই কিন্তু শান্তি সারাদিন অনাহারে আছে শুনিয়া বিচলিত হইয়া উঠিল। তা-ছাড়া বিবাহটার মধ্য হইতে এমন ভাবে বঞ্চিত থাকিতে তাহারও ভাল লাগিতেছিল না। সে তখনই বিশুর সহিত বাহির হইয়া পড়িল। কি করিয়া যে বাবা-মা'র সামনে দাঁড়াইবে তাহা জানে না—কী করিবেন তাঁহারা, কি বলিবেন, তাহার ঠিক কি! সে যে অপরাধী তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শেষ পর্যন্ত একসময়ে যখন সেই অতিপরিচিত গলির মধ্যে পড়িল এবং তাহাদের পুরাতন জরাজীর্ণ সদরও পার হইল তখন অদ্ভুত একটা দুর্বলতা অনুভব করিতে লাগিল মনে মনে। বিশু তাহাকে একপ্রকার টানিয়াই লইয়া গেল উপেনবাবুর সামনে—তা-ও সে কোনমতে প্রণামটা সারিয়া মাথা হেঁট করিয়াই দাঁড়াইয়া রহিল। বাবার মুখের দিকে চাহিতে পারিল না।

উপেনবাবুও অপাঙ্গে একবার ছেলের মুখের দিকে চাহিলেন মাত্র। তিনি নাটকটা এড়াইবার জন্য বোধ হয় প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন—একেবারে একটা দশ টাকার নোট ছেলের হাতে দিয়া বলিলেন, কালই ভোরের ট্রেনে রওনা হয়ে বিকেলের মধ্যে বৌমাকে নিয়ে এস। আর (গলাটা একবার কাশিয়া পরিষ্কার করিয়া লইলেন) বেয়াই মশাইকে, ছেলেমেয়েদের সব আমার নাম ক'রেই নিমন্ত্রণ

জানিও, যদি আসতে চান ত নিয়ে এস।

তাহার পর, উপেনবাবুর পালা শেষ করিয়া রান্নাঘরে মা'র সামনে গিয়া দাঁড়াইতেই সে এক বিপর্যয় কাণ্ড শুরু হইয়া গেল। মা তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া পাগলের মত একবার হাসিতে ও একবার কাঁদিতে লাগিলেন। বোনেরা অভিমান করিয়া থাকিবে ভাবিয়াছিল কিন্তু উল্লাসের স্রোতে তাহাদেরও অভিমান ধুইয়া মুছিয়া ভাসিয়া গেল। সকলে মিলিয়া চেঁচাইয়া, কাঁদিয়া কাটিয়া হাট বাধাইয়া তুলিল। সে-রাত্রে কেহ ঘুমাইল না—ভূপেনকেও ঘুমাইতে দিল না।

পরের দিন ভোরের ট্রেনেই ভূপেন রওনা হইয়া গেল। কল্যাণী অপ্রত্যাশিত ভাবে তাহাকে দেখিয়া খুশিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু আগমনের কারণটা শুনিয়া বিবর্ণ হইয়া গেল। শ্বশুরবাড়ি হইতে বঞ্চিত থাকিবার অগৌরবটা তাহাকে প্রতিনিয়ত বিঁধিত এটা ঠিক—কিন্তু এখন অন্য নানা রকমের দুশ্চিন্তা তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। প্রথমত তাহার ন্যায় রূপহীনা ও বিত্তহীনা বধূ দেখিয়া তাঁহারা কি বলিবেন ঠিক কি, তারপর এইভাবে তাঁহাদের ছেলেকে সর্ব প্রকার সম্ভাবনা হইতে বঞ্চিত করিবার অপরাধ কি ক্ষমা করিতে পারিবেন? ছেলেকে পর করিয়া দেওয়ার জন্য যে বিদ্বেষ তাহা কি আর এত সহজে মুছিবে? আর যদি বা তাঁহারা ক্ষমা করেন, সে ত আর এক দুর্ভাবনা। এতদিন পরে বধূ ও পৌত্রের সহিত মিলিত হইয়া যদি আর না ছাড়িতে চান? কীই বা বলিবার আছে তাহার, যাহা স্বাভাবিক, যাহা তাহার পক্ষে সুখের ও গৌরবের, তাহাতে 'না' বলিবে কেমন করিয়া? অথচ এখানে অন্ধ বাবা ও মৃতকল্প পিসীমা—তাঁহাদের কি গতি হইবে?

তাহার মুখের এই অপরিসীম পাণ্ডুরতা দেখিয়াই ভূপেন অবশ্য কারণটা বুঝিল। সে সস্নেহে তাহাকে কাছে টানিয়া আনিয়া কহিল, তুমি কি তাঁদের কাছে লাঞ্ছনার ভয় করছ? না হয় কিছু সইতে হ'লই, আমার জন্যে পারবে না সইতে?

লজ্জিত হইয়া কল্যাণী তাড়াতাড়ি জবাব দিল, না না, তা মোটেই ভাবছি না। যদি আর তাঁরা আসতে না দেন—এঁদের কি হবে তাই ভাবছি।

—ছি! ভূপেন অনুযোগের সুরে বলিল, আমি কি এতই অবিবেচক? আমি সে ব্যবস্থা ক'রে দেব। যতদিন না রাখুর বিয়ে হয়, ততদিন তোমাকে বাবার কাছ থেকে সরিয়ে নিতে দেব না।

সে যে মুহূর্তের জন্যও তাহার এমন স্বামীকে অবিশ্বাস করিতে পারিয়াছে তাহারই লজ্জায় কল্যাণী আর মাথা তুলিতে পারিল না, ভূপেনের কোলের মধ্যে মুখটা গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল।

বিজয়বাবু অবশ্য যাত্রাকালে আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, আশীর্বাদ করি মা—মনের সুখে চিরকাল সেই ঘরই করো। আমাদের জন্যে ভেবো না, তাঁরা যদি পায়ে ঠাঁই দেন ত ফিরে আসবার দরকার নেই। আমাদের যেমন ক'রেই হোক দিন কাটবে। ভেবে ছাখ্ যদি অপর কোন জায়গায় বিয়ে হ'ত—আর বিয়ে ত দিতেই হ'ত যেমন ক'রে হোক—তা'হলে কি আর আমাদের মুখ চেয়ে তারা ফেলে রাখত?

তারপর একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া ভূপেনকে কহিলেন, বাবা ভূপেন, তুমি ত শুধু আমার জামাই নও—আমার বড় ছেলের কাজই করছ। সবই যখন তোমার কাছ থেকে হাত পেতে নিতে হচ্ছে তখন তোমাকে জানাতে বাধ্য হচ্ছি। বলতে গেলে মেয়ে আমার এই প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে, অনেক কিছুই আমার দেওয়া উচিত ছিল—কিছুই ত দিতে পারলুম না, আমার জন্যে তোমাকে কত অপ্রতিভ হ'তে হবে, কিন্তু তোমার বোনের বিয়েতে অন্ততঃ একখানা কাপড়ও যদি না দিতে পারি—

কথা শেষ করিতে পারিলেন না। ছোট একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া অস্ফুট কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, নারায়ণ! নারায়ণ!

তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া ভূপেন কহিল, সেজন্য আপনি ভাববেন না। কাপড় একটা কিনে রাখতে বলে এসেছি বিশুকে। মিষ্টিটা এখান থেকেই নিয়ে যাবো।...

গাড়ি যতই কলিকাতার কাছাকাছি পৌঁছিতে লাগিল, প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও কল্যাণীর মুখ ততই বিবর্ণ হইতে বিবর্ণতর হইয়া উঠিতে লাগিল। উপেনবাবু ও ভূপেনের মায়ের চিঠি সে দেখিয়াছে, কী পরিমাণ বিদ্বেষ তাঁহাদের মনে আরও এতদিনে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। একেই ত শ্বশুরবাড়িতে নির্যাতনের কত কাহিনী সে শুনিয়াছে সকলের মুখে।

কিন্তু ভয় যতই থাক্—প্রথম পর্বটা কাটিয়া গেল নির্বিবাদেই।

উপরে উঠিয়া প্রথমেই তাহারা পড়িল উপেনবাবুর সামনে। কল্যাণী কি এক প্রকার অবোধ ভয়ে দিশাহারা হইয়া কোনমতে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ছেলেটাকে একেবারে শ্বশুরের পায়ের কাছে সেই চলনের উপরই শোয়াইয়া দিল।

উপেনবাবু 'হাঁ-হাঁ—কর কি, কর কি' বলিতে বলিতে অস্ফুটকণ্ঠে কল্যাণীকে কী একটু আশীর্বাদ করিয়াই রোরুদ্যমান পৌত্রকে কোলে তুলিয়া লইতে বাধ্য হইলেন। ব্যস্‌! তাহাতেই কাজ হইল, তাঁহার এতদিনের সমস্ত অভিমান, সমস্ত বেদনা গলিয়া জল হইয়া অশ্রুর আকারে বাহির হইয়া আসিল। তিনি পৌত্রকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে আদর করিতে করিতে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে নানারূপ মিষ্ট গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পৌত্রও অদন্তমুখে হাসিয়া তাহার জবাব দিল।

ভূপেনের মা বধূকে বরণ করিয়া লইয়া গেলেন। শান্তি ও উৎপলা জড়াইয়া ধরিল। ছোট বোনটি নাচিতে লাগিল। এক কথায় প্রথম ফাঁড়াটা নির্বিঘ্নেই কাটিয়া গেল।

অবশ্য তাই বলিয়া কল্যাণীর আশঙ্কা একেবারেই অমূলক রহিল না। শ্বশুর ও শাশুড়ী তাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া অনেক বাঁকা বাঁকা কথাই বলিলেন কুটুম্ব এবং আত্মীয়দের উপলক্ষ করিয়া। এমন কি কল্যাণীর বাবা ও স্বর্গতা মাও সে আক্রমণ হইতে রেহাই পাইলেন না। প্রথম প্রথম এসব কথায় কল্যাণীর চোখে জল আসিত কিন্তু ভূপেন তাহাকে বুঝাইয়া দিল ইহাই স্বাভাবিক। কল্যাণী নিজেকে একবার শাশুড়ীর স্থলে কল্পনা করুক না! তাহারও ত সন্তান হইয়াছে। বিশেষত প্রথম সন্তান যে কি জিনিস সে-ও ত বুঝিতে পারিতেছে। তা ছাড়া এই এদেশের অধিকাংশ বধূর প্রাপ্য—এটা পুরুষানুক্রমেই চলিয়া আসিতেছে। তাহার মা, ঠাকুমা সকলেই এ লাঞ্ছনা অল্পবিস্তর সহিয়াছেন। বরং অনেককেই ইহার চেয়ে অনেক বেশী সহিতে হয়। সেদিক দিয়া ত কল্যাণীর ভাগ্য অনেকটা ভাল।

বিবাহের রাত্রে সন্ধ্যা আসিয়াছিল। সেও ইহাদের কথার আঁচে ব্যাপারটা অনুমান করিয়া লইয়া কল্যাণীকে আড়ালে অনেক বুঝাইয়া গেল। যদিও তাহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নাই এসব ব্যাপারে, তবু সে অনেক পড়িয়াছে এবং শুনিয়াছে। এসব আক্রমণ যেন কল্যাণী না গায়ে মাখে—বরং ইহার চেয়ে বেশী আক্রমণের জন্যই প্রস্তুত হয়—এই কথাই বার বার বলিয়া গেল সে।

সেদিন অত ব্যস্ততার মধ্যেও একটা ব্যাপার কিন্তু ভূপেনের দৃষ্টি এড়ায় নাই। সেটা ভূপেনের সন্তান সম্বন্ধে সন্ধ্যার ঔদাসীন্য। একবার মাত্র উহাকে কোলে করিয়াই সে উৎপলার কোলে ফিরাইয়া দিল এবং আর কোলে করিবার চেষ্টাও করিল না। শুধু গভীর রাত্রে বাড়ি ফিরিবার সময়, বিদায় লইতে গিয়াও, কি মনে করিয়া ফিরিয়া আসিয়া ঘুমন্ত খোকাকে একটা চুম্বন করিয়া গেল। সে বিছানার উপর হেঁট হইয়া চুমা খাইতেছিল, মুখ তুলিয়া পিছন ফিরিয়াই বাহির

হইয়া গেল কিন্তু উৎসব-বাড়ির জোর আলোতে তাহারই মধ্যে ভূপেনের চোখে পড়িল, খোকার গালের উপর এক ফোঁটা জল। ভূপেন কাহাকেও কিছু বলিল না, বরং সকলের অলক্ষ্যে সে জলটা মুছিয়া লইল। সন্ধ্যার মনের ভাবটা বুঝিতে পারিয়া তাহার চোখের শিরা-দুটাও তখন টন্‌টন্ করিতেছে।

একটা বড় রকমের গোলমাল বাধিল শান্তির বিবাহ মিটিয়া গেলে কল্যাণীর পিত্রালয়ে ফিরিবার সময়ে। ভূপেনের বাবা ও মা পৌত্রের স্বাদ পাইয়াছেন, তাঁহারা আর ছাড়িতে প্রস্তুত নন। কল্যাণী ঠিক এই আশঙ্কাই করিয়াছিল, সে কিছু বলিতে পারিল না। তবে ভূপেন তাহার পূর্ব প্রতিজ্ঞায় অটল রহিল। সে প্রথমটা উপেনবাবুকে সব কথা বুঝাইয়া রাজী করাইতে চেষ্টা করিল কিন্তু তিনি কোন যুক্তিই শুনিলেন না। বলিলেন, মেয়ে মরে গেলে ওদের চলবে কি ক'রে? মনে করুক মেয়ে মরেই গেছে।

ভূপেন বলিল, বেঁচে থাকতে সেটা মনে করা যায় কি ক'রে বলুন? আপনারাই মনে করুন না যে বৌ মারা গেছে!

কিন্তু উপেনবাবু তাহাতেও দমিলেন না। বলিলেন, তা হ'লে ত বাঁচি—ছেলের আর একটা ভাল দেখে বিয়ে দিই।

অগত্যা ভূপেনকে বুঝাইয়া দিতে হইল যে, সে কথা দিয়া আসিয়াছে। এখন অন্তত কল্যাণীকে পাঠাইতে হইবে। উপেনবাবু এতদিনে ছেলেকে চিনিয়াছিলেন, তিনি আর কিছু বলিলেন না। শুধু বধূ ও বধূর পিতাকে নানারূপ গালি দিয়া মনের জ্বালা মিটাইলেন।

মা বলিলেন, সেখানে একটা রাঁধুনী রেখে দে না।

—প্রথমত সেখানে তা পাওয়া শক্ত, তা ছাড়া গরিবের সংসার কি রাঁধুনীর হাতে চলে?

—তোমাদের সব তাইতে বাড়াবাড়ি। রাক্কুসি! রাক্কুসি আমাদের সব দিক দিয়ে বঞ্চিত করলে। আমার সোনার চাঁদ ছেলেকে ভুলিয়ে কি আঁস্তাকুড়ে নিয়ে গিয়েই ফেললে! ঐ ত রূপ, বাপ একটা কানা-কড়িও দেয় নি, উল্‌টে আমার ছেলের যথা-সর্বস্ব শুষে নিচ্ছে—তার ওপর আবার নাতিটা থেকেও বঞ্চিত করলে হতভাগী। এমন শত্তুর কোথায় বসে আমার জন্যে তপস্যা কচ্ছিল রে! ওরে আমার সাতজন্মের শত্তুর রে!...ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভূপেন ধীরভাবে এ সবই সহ্য করিল, কল্যাণীর ত সহ্য না করিয়া উপায় নাই। এ সবই সত্য, এ সবই তাহার প্রাপ্য। তাহার অবনত মস্তক আরও নত হইয়া পড়িল শুধু।

বোনদেরও মুখ ভার। তাহাদের উপলক্ষ করিয়া বাপ-মাকে শোনাইয়া ভূপেন সান্ত্বনা দিয়া গেল, ভয় নেই, মাঝে মাঝে সুবিধে পেলেই নিয়ে আসব। আর, খোকা একটু বড় হ'লে এখানেই রাখব।

ওখান হইতে ফিরিয়া ভূপেন মেস ছাড়িয়া সেই পুরাতন টালির ঘরে আসিয়া উঠিল। ইহাতে খরচটা ওদিক দিয়া বাঁচিল বটে কিন্তু বাড়িতে আরও বেশী খরচ না করিয়া উপায় রহিল না। আয় ও ব্যয়ের এই অসামঞ্জস্যকে মিলাইতে তাহার প্রাণান্ত হইতে লাগিল।

২৮

এদিকে এই কয় বৎসর বাহিরের পৃথিবীতেও নানা বিপর্যয় ঘটিয়া গিয়াছে। সারা পৃথিবী জুড়িয়া বিরাট যুদ্ধ বাধিয়া উঠিয়াছে, সে যুদ্ধের ঢেউ এখানে, এত দূরেও আসিয়া পৌছিয়াছে।

প্রথম গেল বোমার হিড়িক। জাপান পার্ল হারবার ধ্বংস করিল। তারপর সিঙ্গাপুর মালয়, শেষে বর্মা পর্যন্ত পৌছিল। আর রক্ষা নাই, পালা, পালা। যাহাদের পয়সা ছিল তাহারা পলাইল। যাহাদের কোন সঙ্গতি নাই তাহারা যায় কোথায়? ভূপেন একবার ভাবিয়াছিল মা ও বোনেদের বিজয়বাবুর ওখানেই পাঠায় কিন্তু খরচের অঙ্কটা অনুমান করিয়া চুপ করিয়া গেল। অবশ্য তাহাদের মত অবস্থার লোকও অনেকে যথাসর্বস্ব, মায় ঘটি-বাটি বাঁধা দিয়া যে যায় নাই তাহা নয়, তাই দেখিয়া উপেনবাবুও একবার নাচিয়া উঠিয়াছিলেন—কিন্তু ভূপেন অনেক বুঝাইয়া শান্ত করিল। ইতিমধ্যেই স্কুল ছাত্রশূন্য হইয়া গিয়াছে। স্কুলের চাকরি আর কতদিন থাকে তাহার ঠিক কি? ভরসার মধ্যে ছিল প্রশান্তরা, তাহারা সর্বাগ্রে চলিয়া গেল। প্রশান্ত অবশ্য তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য খুব জিদ্ করিয়াছিল কিন্তু বাপ-মা-বোনের কথাটা মনে করাইয়া দিতে চুপ করিয়া গেল।

যাই হোক্ ক্রমে ক্রমে সে হিড়িক কাটিল। কিন্তু এই ক-মাসেই তাহার আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ইস্কুল মাহিনা দিয়াছে নামমাত্র, ফলে চারিদিকেই দেনা—ছোট বড় মাঝারি। শহরে আবার জনসমাগম হইতে ভূপেনকে দুইটা টিউশনি লইতে হইল। তাহাতেও দেনা শোধ হয় না—খরচ কিছু কিছু বাড়িয়াই চলিয়াছে। শান্তি সন্তান-সম্ভবা, তাহার নানারকম তত্ত্বতাবাস আছে, উৎপলারও বিবাহ আর না দিলে নয়। উপেনবাবু এখন একেবারেই গা এলাইয়া দিয়াছেন। মাহিনা যা পান সব তাহার হাতে দিয়া খালাস।

এমনি করিয়া ঘরে বাহিরে নিজের সমস্যা লইয়াই সে বিব্রত, তাহার উপর

আর একটা সমস্যাও পাষাণ-ভারের মত ঘাড়ে চাপিয়া রহিয়াছে। সে সমস্যা সন্ধ্যার। মোহিতবাবুর অনেকগুলি বন্ধু আছেন—বিষয়-কর্মের ব্যাপারে তাঁহারা যথেষ্ট সাহায্য করেন কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে সে-ই অভিভাবক। সন্ধ্যার একুশ বৎসর পূর্ণ হইতে দেরি নাই, তাহার পর সে স্বাধীন, ভূপেনেরও দায়িত্ব শেষ হওয়ার কথা—কিন্তু সে দায়িত্ব শুধু আইনের। আইনের চেয়ে ঢের বড় দায়িত্ব যে একটা আছে সে কথা অস্বীকার করে কি করিয়া? কোথাও একটা ভাল পাত্র দেখিয়া সন্ধ্যার বিবাহ দিতে পারিলে সে সত্যকার নিশ্চিন্ত হয়—কিন্তু কথাটা তুলিতেই তাহার ভরসা হয় না, কোথায় যেন সঙ্কোচে বাধে। অথচ চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়াও তাহার যে দিন কাটে না, তাও সে লক্ষ্য করে। ভূপেন আসিবার বিশেষ সময় পায় না—যদি বা পায়, ভয়ে ভয়ে এড়াইয়া চলে। এ ভয় তাহার নিজের জন্য। এ আশঙ্কা—সে অস্বীকার করুক না করুক—তাহার নিজের অন্তরকে। সন্ধ্যা তাহার দারিদ্র্যে কষ্ট পায় কিন্তু প্রতিকার করিতে পারে না —তার সে যন্ত্রণা ভূপেন বোঝে তবু কোথায় একটা সূক্ষ্ম আত্ম-সম্মানবোধ কিছুতেই তাহাকে একটি পয়সাও গ্রহণ করিতে দেয় না। শুধু আত্ম-সম্মানবোধও নয়— পাছে সন্ধ্যার মনে ভূপেনের যে স্থানটি অত্যন্ত শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত, তাহা কোনদিন এই প্রকার সাহায্য গ্রহণের ফলে এতটুকু নামিয়া আসে—বোধ করি এমন আশঙ্কাও একটা ছিল, তাই সে সন্ধ্যার কাছে ঋণগ্রহণেও কুণ্ঠিত।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যা একটা পাগলামি করিতে গিয়াছিল। কোন্ এক মফঃস্বল কলেজে চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়াছিল যে, সে যদি খুব মোটা একটা টাকার অঙ্ক দিয়া সাহায্য করে তাহা হইলে তাঁহারা সন্ধ্যার নির্বাচিত কোন লোককে অধ্যাপকের চাকরি দিতে রাজী আছেন কিনা? অবশ্য যোগ্যতার অভাব হইবে না। বলা বাহুল্য তাঁহারা রাজীই ছিলেন কিন্তু গোলমাল বাধিল টাকাটা তুলিবার সময়, এখনও ভূপেনের সই না থাকিলে টাকা তোলা যায় না। মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস সন্ধ্যার বিশেষ নাই, সে ধরা পড়িয়া গেল সহজেই—এক-একটি করিয়া ভূপেন সব কথা জানিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যাকে দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইল আর কখনও এমন কাজ সে করিতে চেষ্টা করিবে না।

সে বলিল, ছি ছি—কী করতে যাচ্ছিলে বল দিকি! এ টাকাগুলো ত যেতই, অথচ আমি জানতে পারলে কখনই ও কাজ নিতুম না। অবশ্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে তুমি সাহায্য করতে চাও এমনি করো, কিন্তু ঐ উদ্দেশ্য নিয়ে ক'রো না কখনও। এখনও যা ক'রে খাচ্ছি এ ত তোমারই দয়ায় সন্ধ্যা, আর ঋণ তুমি বাড়াবার চেষ্টা ক'রো না। বলো, আমাকে কথা দাও যে এমন চেষ্টা আর কখনও করবে না?

নইলে আমি একেবারে এ বাড়ি আসা বন্ধ করব তা বলে দিচ্ছি।

অগত্যা সন্ধ্যাকে কথা দিতে হইল। তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল অভিমানে ও অক্ষমতায়, কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টায় সেটা দমন করিয়া কঠিন হইয়া বসিয়া রহিল।

ইহার শোধ সে তুলিল দিনকতক পরে—ভূপেন অনেক দিন ধরিয়া বলি-বলি করিতে করিতে একসময় যখন কথাটা বলিয়াই ফেলিল, তখন সন্ধ্যা মাথা নাড়িয়া জবাব দিল, না মাস্টার মশাই, আমি আপনার সব কথাই সব সময়ে শুনেছি, আপনি আমার এই কথাটি শুনুন, ঐ চেষ্টাটা করবেন না। বিয়ে আমি করব না এমন কথা বলতে চাই না, যদি কখনও আমার সময় আসে, ভাল বুঝি ত নিজেই করব।

ভূপেন বুঝাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু আমার একটা দায়িত্ব আছে—সেটা যে আমায় বড় পীড়ন করছে সন্ধ্যা!

—সে দায়িত্ব ত আর মাত্র দু-মাসের।

—আমি যে দায়িত্বের কথা বলছি সে ত দু'মাস পরে ফুরোবে না—যতক্ষণ না তোমাকে কোন সত্যিকার অভিভাবকের হাতে তুলে দিতে পারছি ততক্ষণ আমার একটা দায়িত্ব থাকবেই।

অকস্মাৎ সন্ধ্যা যেন জ্বলিয়া উঠিল। সে একটু তীক্ষ্ণ কণ্ঠেই কহিল, সে রকমের দায়িত্ব কি শুধু আপনারই আছে মাস্টার মশাই, আমার নেই? বেশ, আপনি যখন যার সঙ্গে বলবেন আমি বিয়ে করতে রাজি আছি, কিন্তু আপনি কথা দিন যে আমার কাছ থেকে আপনার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে আমি যত টাকা দেব, নেবেন! বলুন!

—সে সম্ভব নয়।

—তা'হলে স্মরণ রাখবেন, আমারও কতকগুলো সম্ভব-অসম্ভব আছে। চির-কাল আপনার সমস্ত জুলুম যে আমাকে মানতে হবে তার কি মানে?

সে আর কোনপ্রকার বাদানুবাদের অবসর না দিয়াই উঠিয়া চলিয়া গেল। সন্ধ্যা চিরকালই শান্ত, ভদ্র। এ ধরনের কথাবার্তাও আর কোনদিন ভূপেন শোনে নাই—এমন নাটকীয়পনাও দেখে নাই। কতখানি বেদনায় এটা সম্ভবপর হইয়াছে অনুমান করিয়া ভূপেন চুপ করিয়া গেল। মনে মনে দুঃখিত হইল সে মোহিত-বাবুর জন্য, ভদ্রলোক সন্ধ্যাকে স্নেহ করিতেন সমস্ত অন্তর দিয়া, তেমনি ভূপেনেরও তিনি হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, অথচ দুজনেরই শুভ কামনায় এমন একটা কাণ্ড করিয়া বসিলেন যাহা না করিলে হয়ত উভয় পক্ষেরই মঙ্গল হইত। সন্ধ্যা ত

সুখী হইতই, আর, আর—হয়ত ভূপেনের জীবনও পরিণতির পথ খুঁজিয়া পাইত।

এক-একবার তাহার মনে হয় ভুল সে-ও করিতেছে না ত? মোহিতবাবুর কথাগুলি বিক্ষিপ্তভাবে মনে আসে—'মিথ্যা মোহকে, সম্মানবোধকে আঁকড়ে ধরে না থাকলেই হ'ত! প্রতিজ্ঞা বা শপথ প্রাণপণে রক্ষা করাই শুধু বীরত্ব নয়—অনেক সময় তাকে লঙ্ঘন করা আরও সৎসাহসের কাজ।' কিংবা মৃত্যুশয্যার কথাগুলো—'সত্যটা বিচার ক'রে নিও, আমার মত একটা সংস্কারকে সত্য বলে আঁকড়ে থেকো না। পুঁথির সত্য আর জীবনের সত্য এক নয়—চলার পথে সত্য তাঁর নিজের মহিমায় আপনি প্রকট হন।'...কী ক্ষতি হয় সন্ধ্যার কাছ হইতে কিছু টাকা লইলে? তাহার জীবনের যা আদর্শ তাহা সে অনায়াসে অনুসরণ করিতে পারে। একটি সত্যকার বিদ্যায়তন গড়িয়া তোলা তাহার পক্ষে এমন কিছু অসম্ভব হয় না—যদি হাতে টাকা থাকে!...হয়ত তাহাতে সন্ধ্যাও শেষ পর্যন্ত সুখী হয়—নিশ্চিন্ত হয়। তাহার কথামত চাই কি এই শর্তে বিবাহও দেওয়া যায় ভাল একটি পাত্র দেখিয়া।

ভাল একটি পাত্র?

ভাবিতে ভাবিতেই ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া আসে ভূপেনের। এমন পাত্র কোথায় আছে, যাহার হাতে সন্ধ্যার মত মেয়েকে তুলিয়া দেওয়া যায়?

নিজের স্বার্থপরতায় এ কথাটা তাহার একবারও মনে আসিল না, সে-ও এমন কিছু অসাধারণ নয়, অথচ সন্ধ্যা তাহাকেই পূজা করে মনে মনে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া যায় সে। না, সন্ধ্যার টাকা লইতে তাহার সাহসে কুলাইবে না—সাধারণ মানুষের অপেক্ষা বেশী সৎসাহস তাহার নাই, লোকনিন্দা ও লোকলজ্জাকে সে এখনও ভয় করে। মোহিতবাবু তাঁহার অত ধনী বন্ধু থাকা সত্ত্বেও নিঃস্ব ভূপেনকে এত বড় ঐশ্বর্যের ভার দিয়া যে বিশ্বাস ও সম্মান দেখাইয়াছেন—সেটা সে খোয়াইতে রাজী নয়।

অথচ এধারে তাহার শিক্ষকের জীবনও ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে বৈ কি!

পদন ও সালেক দুজনেই ভালভাবে পাস করিয়াছে (ওখানকার স্কুলের ইতিহাসে এই প্রথম), স্কলারশিপও পাইয়াছে দুজনেই। পদন নাকি বর্ধমান রাজ কলেজে পড়িতে গিয়াছে, সালেক কলিকাতাতেই আসিবে এমন কথা ছিল। এখানে আসিলে দেখা করিত নিশ্চয়ই, তাহার বর্তমান স্কুলের কথা ওখানে অনেকেই জানে—কল্যাণীদের বাড়ি আসিয়া সে নিজেও জানিয়াছে। পাস করিবার পর সেলাম জানাইয়া একটা চিঠিও দিয়াছিল। সুতরাং মনে হয়—হয়ত পড়াশুনা আর করিতে পারিল না বেচারী।

তবু ঐ ছেলে দুইটি তাহার জীবনের সান্ত্বনা। তেমন একটা ছেলেও ত এখানে পাইল না। ভাল ছেলে আছে দু-একজন। তাহাদের যতটা পারে সে যাচিয়া সাহায্য করে, কিন্তু শিক্ষার সম্যক মূল্য বুঝিয়া তাহাকে পরিপূর্ণ মর্যাদায় গ্রহণ করিবে এমন ছেলে কই? অবশ্য এখানে সেরকম ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগও নাই। গ্রামের অবসর শহরে দুর্লভ। এক ভরসা ছিল প্রশান্ত, জ্ঞান-লাভের ইচ্ছাটা সে ইদানীং তাহার মধ্যে জাগাইতেও পারিয়াছে, কিন্তু সে অত্যন্ত আরামপ্রিয়—যথেষ্ট বড় হইবার মত নিষ্ঠা বা অধ্যবসায় তাহার নাই, যদিচ সে সুযোগ আছে। সে ধনীর সন্তান, পদন ও সালেকের পক্ষে যেটা অসম্ভব হইল, তাহার পক্ষে তা না-ও হইতে পারে।

আর একটি ছাত্র তাহার জুটিয়াছে—সম্প্রতি—সে-ও ভাল ছেলে, আর্থিক অবস্থা তাহারও ভাল। লেখাপড়াতে তাহার একটা সহজাত অনুরাগ আছে। বাহিরের বই পড়ে সে প্রচুর কিন্তু সমস্ত ঝোঁকটা তাহার রাজনীতিতে, বিশেষ করিয়া কম্যুনিজ্‌মের দিকে। সে সম্বন্ধে ভূপেনের কিছু বক্তব্য থাকিলে মন দিয়া শোনে, অন্য প্রসঙ্গ উঠিলে অসহিষ্ণু হইয়া পড়ে। কম্যুনিজ্‌ম্ সম্বন্ধে ভূপেনের শ্রদ্ধা আছে কিন্তু ঠিক একই ছাঁচ যে এদেশের মাটিতেও সার্থক হইয়া উঠিবে তাহা সে বিশ্বাস করে না। তাহার বিশ্বাস এখনও ও মতবাদ সম্বন্ধে ভাবিবার বা বিচার করিবার অনেক কিছু আছে। ইহারা অন্ধভাবে রাশিয়ার অনুসৃত সমস্তটাই এখানে প্রয়োগ ও অনুসরণ করিতে চায়, তাহা এদেশের মাটিতে শেষ পর্যন্ত কল্যাণকর হইবে কিনা সন্দেহ। এমন কি রাশিয়াতেও কতটা থাকে ও কতটা যায়, শেষ অবধি ব্যাপারটা কী রূপ নেয় সে বিষয়েও একটা সংশয় আছে তাহার মনে। সব চেয়ে ভয় করে সে ইহাদের পরমতসহিষ্ণুতার অভাবকে—এ বিষয়ে ফ্যাসিস্টদের সহিত ইহাদের অল্পই পার্থক্য। এ কী ব্যক্তি-স্বাধীনতা তাহা সে বোঝে না—যদি সাহিত্য পর্যন্ত রাষ্ট্রের নির্দেশ অনুসারে লিখিত হয়। এসব কথা আলোচনা করিয়া দেখিবার লোকও নাই—কারণ এখানে যাহারা এই মতাবলম্বী আছেন তাঁহাদের এটা এখনও নূতন নেশা—এখনও জিনিসটা নিজেদের নির্মল বিচার-বুদ্ধিতে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার অবসর পান নাই।

অর্থাৎ এখন শিক্ষকতা তাহার কাছেও হইয়া পড়িয়াছে আর পাঁচজনের মতই জীবিকা মাত্র। অনন্যোপায় হইয়া এদেশে যে জীবিকা লোক গ্রহণ করে। একটা মাস্টারী ও দুইটা টিউশ্যনি—শুধু অর্থ-পুস্তক কিংবা পাঠ্যপুস্তক লেখাটা বাকী আছে। দুই একটা কলেজেও সে ইতিমধ্যে প্রোফেসরীর জন্য দরখাস্ত করিয়াছে কিন্তু সফল হয় নাই। সে লেখাপড়া বেশী জানে কিনা সেটা ঘনিষ্ঠতা

না হইলে কাহাকেও জানানো সম্ভব নয়—বাজার দর হিসাবে সাধারণ ফার্স্ট ক্লাস এম. এ.। কীই বা তাহার মূল্য। তার পরিচিত এবং সহকর্মীদের মধ্যে এম. এ. পাস অনেকে আছেন। এক ভদ্রলোক ইকনমিকস্-এ এম এ পাস, তিনি অশোক ও আকবরের বাবার নাম বলিতে পারেন নাই একদিন। আর একটি ভদ্রলোক ইতিহাসে এম এ, তিনি একমাত্র ইংলণ্ড ছাড়া কোন দেশেরই রাজধানীর নামটা ঠিক অবগত নন। ফ্রান্সেরটা অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, আমেরিকারটা ভুল বলিলেন—আর সে ভুলটা অনেকেরই আছে, 'নিউইয়র্ক'। এছাড়া বাংলার এম এ একজন তাহাদের ইস্কুলে আছেন যিনি এখনও পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি পড়েন নাই। এই নমুনাই ত সর্বত্র ছড়ানো। দুই একটি কলেজ হইতে আহ্বান আসিয়াছিল—মফঃস্বলের কলেজ—কিন্তু বেতন এত কম যে বর্তমানে সে বেতনে তাহার সংসার চালানো সম্ভব নয়। এতদিন তাহার ধারণা ছিল যে অন্তত কলিকাতার কলেজে অধ্যাপকের আয় অনেক শিক্ষকদের চেয়ে ভাল কিন্তু সেদিকেও সে হতাশ হইল—দেখিল এমন কলেজ কলিকাতায় এখনও আছে—বেশ নামকরা কলেজ—যেখানে পুরাতন প্রফেসারও আশি টাকা বেতন পান।

না—কলেজের প্রতি এমন মোহ তাহার নাই যে না খাইয়া পড়াইতে যাইবে। বিশেষতঃ মফঃস্বলের কলেজ—সেখানে টিউশনিও জুটিবে না। ইস্কুলের ছেলেদের বিদ্যানুরাগের যা নমুনা, কলেজে ইহার চেয়ে বেশী কিছু সে আশা করে না। সেদিক দিয়াও কোন লাভ আর নাই, বিশেষত নিজের কলেজ জীবনের অভিজ্ঞতা ত আছেই।

•

হঠাৎ পূজার সময় একটা বিপুল ঝড় বাংলাদেশ বিশেষ করিয়া মেদিনীপুরকে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। আগস্ট আন্দোলন উপলক্ষে একেই পুলিসের অত্যাচারে জেলাটি লণ্ডভণ্ড হইয়া গিয়াছিল তাহার উপর প্রকৃতির এই অত্যাচার। সমুদ্রের লোনা জল ঢুকিয়া ঘর-বাড়ি ত ভাসাইয়া দিলই—ক্ষেতখামার কতক চিরকালের মত নষ্ট করিয়া দিয়া গেল।

কলিকাতায় সাহায্য দানের কিছু কিছু উদ্যোগ-আয়োজন চলিল। কলেজের ছেলেরাও শোভাযাত্রা, ভিক্ষা-সংগ্রহ প্রভৃতি শুরু করিয়া দিল। এ সমস্ত মনোভাবই প্রশংসনীয় কিন্তু ভূপেনের মন-খুঁতখুঁতানি কিছুতেই যায় না। মনে হয় এ সবই ইহাদের হৃদয়-বিলাস, ফ্যাশন মাত্র। বুভুক্ষু লোকের দুঃখ-দুর্দশায় হৃদয়-বিগলিতকারী বক্তৃতা দিয়াই ইহারা নিশ্চিন্ত মনে সিনেমায় চলিয়া যায়, রেস্তোরাঁতে ঢুকিয়া ধূমায়িত পেয়ালা ও সিগারেট হাতে করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা

আড্ডা দেয়, মুখে স্নো ও পাউডারের এতটুকু ত্রুটি ঘটে না কোথাও। বিশেষতঃ এই ত আগস্ট আন্দোলন হইয়া গেল, সর্বজনপূজ্য নেতারা কারাগারে পচিতেছেন। ভারতের ন্যূনতম দাবীও মেটে নাই—সে কথা এই সব ছাত্রদের, যাহারা রাজনীতি সচেতন বলিয়া গর্ব করে, তাহাদের দেখিলে বুঝিবার উপায় নাই একটুও। দিনকতক ট্রাম পুড়াইয়া ও ঢিল ছুঁড়িয়া শহরের ছেলেরা সব ব্যাপারটা ভুলিয়া গিয়াছে। এখন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। এ যুদ্ধ আমরা চাই নাই—এ যুদ্ধ আমাদের নয়। তবু যদি ইহাতে অংশগ্রহণ করিতে হয় ত স্বাধীনভাবেই করিব—এই ছিল নেতাদের দাবী। মহাত্মাজী বার বার বলিয়াছিলেন, কেহ যেন এ যুদ্ধে সাহায্য করিতে না যায়। সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধে দাসজাতির করণীয় কিছুই নাই। অন্তত কয়েকটা দিনও যদি সমরোপকরণ প্রস্তুত বন্ধ থাকিত, যদি সামান্য মাহিনার লোভে ব্রণগন্ধলোভী মক্ষিকার মত নির্লজ্জ দেশবাসী ঐ সব কারখানায় ঝাঁপাইয়া না পড়িত, তাহা হইলে ইংরেজ সরকার একটা রফা করিতে, এমন কি ভারতকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হইতেন। কিন্তু কিছুই হইল না—যে দুই একজনের চক্ষু-লজ্জা বোধ হইতে পারিত তাহাদের বিবেককে জনযুদ্ধের ধুয়া তুলিয়া চুনকাম করিয়া দেওয়া হইল। দেশে যে দুর্দিন ঘনাইয়া আসিতেছে তাহা দেখে আর ভূপেন শিহরিয়া ওঠে—সমস্ত জাতিটা দুর্নীতি ও অনাচারের যে গভীর পঙ্কে নামিয়া যাইবে, সে দুর্দশা হইতে কোনদিন কি আর ওঠা সম্ভব হইবে, কে জানে!

ইতিমধ্যে একদিন সন্ধ্যা তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইল। পূর্ণেন্দুবাবুর ছোট ছেলে ও অপর কয়েকটি ছাত্র একটি ছোট রিলিফ ইউনিট গঠন করিয়াছে, সন্ধ্যা তাহাদের সঙ্গে মেদিনীপুরে সেবা-কার্যে যাইতে চায়—ভূপেনের কি মত?

এই ছেলেটিকে ভূপেনের ভাল লাগে না—দিনকতক ধরিয়া সে এ বাড়িতে আনাগোনাও খুব বাড়াইয়া দিয়াছে। ভূপেন আপত্তি করিতে পারে না—প্রশ্ন ওঠে, তাহার কী অধিকার আছে আপত্তি করার। বিশেষত কিছুই যখন ছেলেটির বিরুদ্ধে স্পষ্ট করিয়া বলার নাই। তাছাড়া পূর্ণেন্দুবাবুর কাছে তাহার নিজের ঋণও কম নয়।

ভূপেন চুপ করিয়া সব শুনিল। কহিল, আমার মতামতের ওপর তোমার আর জোর দেবার আবশ্যক নেই—আইনসঙ্গত ভাবে। তবু যদি জানতে চাও ত বলছি। প্রথম কথা—ঠিক এভাবে আমাদের মেয়েরা যে ভাল কাজ করতে পারে সে বিশ্বাস আমার নেই। কারণ ওর শিক্ষা-দীক্ষা আলাদা। তাছাড়া যেতে হ'লে কোন মহিলা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যাওয়াই তোমার উচিত। কারণ

ঠিক সেভাবে ত তুমি মানুষ হও নি—ইস্কুল-কলেজেও যাও নি—ব্যবহারের স্বাচ্ছন্দ্য ও নির্ভীকতা তোমার চরিত্রে পুরোপুরি গড়ে ওঠে নি। এই পর্যন্ত গেল তোমার কথা, তারপর একটা স্বতন্ত্র রিলিফ ইউনিট নিয়ে যাওয়ার কোন সার্থকতা আছে কি? কারণ পুলিস সমস্ত মেদিনীপুর এখনও বেড়া দিয়ে রেখেছে, রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ—এঁদের মত নামকরা সেবা-প্রতিষ্ঠানই সেখানে স্বচ্ছন্দে কাজ করতে পারছেন না, চাল কাপড় নিয়ে যথাস্থানে পৌঁছতে পারছেন না, তোমাদের মত অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা ত সে অনুমতি পাবেই না। কারণ এই সব ছেলেদের ওপরই পুলিসের সন্দেহ বেশী।

সন্ধ্যাও স্থির হইয়া সব শুনিল। তারপর কহিল, আপনি ও খোঁচাটা না দিলেও পারতেন মাস্টার মশাই, আমি ত আপনার মত না নিয়ে এখনও কিছু করি নি।

ভূপেন অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। সত্যই প্রথম কথাটার কোন সার্থকতা ছিল না। মনের যে তিক্ততা হইতে কথাটার উদ্ভব, যেটা সহসা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, সেটার চেহারা তার নিজের কাছেও স্পষ্ট হইয়া উঠিল—সেজন্য লজ্জাটা আরও বেশী। পূর্ণেন্দুবাবুর এই ছোট ছেলেটি মোটের উপর মন্দ নয়, একবার ইংরাজীতে এম. এ. দিয়া সেকেণ্ড ক্লাস পাইয়াছিল—বছর দুই বসিয়া থাকিবার পর আবার ইউনিভার্সিটিতে ঢুকিয়াছে, এবার বাংলায় এম, এ, দিবে। অর্থাৎ ফার্স্ট ক্লাস তাহার চাই-ই। ছেলেটি বকে খুব বেশী, পান খায় আরও বেশী। সিনেমা বোধ হয় প্রতিদিনই দেখে। এক কথায় বড়লোকের ছেলের ছোটখাটো বদভ্যাস সবগুলিই তাহার আছে। তবু—সন্ধ্যা যদি তাহার সাহচর্য পছন্দই করে ত কি বলিবার আছে? বিশেষত এমনি ছেলেটিকে সচ্চরিত্র বলিয়াই সে জানে—তা ছাড়া পূর্ণেন্দুবাবুর আশ্রয় সন্ধ্যার পক্ষে ভালই। এই বন্ধুত্ব যদি একদিন অন্য কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কেই পরিণত হয় ত—আপত্তি করিবার কিছুই নাই, বরং তাহার নিশ্চিন্ত হইবারই কথা। অথচ আজ সে আবিষ্কার করিল যে এই ছেলেটি এখানে আসা-যাওয়াতে সে মনে মনে একটু বিরক্তই হইয়াছিল। কোথায় যেন সে একটু বিদ্বেষও পোষণ করে ছেলেটি সম্বন্ধে।

এই সমস্ত ঈর্ষা-বিদ্বেষের ব্যাপারটা মনের মধ্যে অবচেতন অবস্থাতেই এতদূর অগ্রসর হইয়াছিল, সে বুঝিতেও পারে নাই। আজ এই মুহূর্তে কার্যকারণটা বুঝিয়া নিজেই বিস্মিত হইল। মানুষের আদর্শবাদ যত বড়ই হউক না কেন, লেখাপড়ার মধ্যে নিজেকে সে যতই ডুবাইয়া রাখুক না কেন—যেখানে সাধারণ হৃদয়বৃত্তির কথা আসে সেখানে সাধারণ মানুষের স্তর হইতে ঊর্ধ্বে উঠিতে বহু বিলম্ব হয়। এখানে

তাহার যে একাধিপত্য, যে প্রতিষ্ঠা ছিল তাহারই বিন্দুমাত্র বিচ্যুতির সম্ভাবনায় সে সহসা এতটা তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। কথাটা বুঝিয়া লজ্জা তাহার আরও বাড়িয়া গেল। একটু বেশী অপ্রতিভভাবেই বলিয়া ফেলিল, আমাকে মাপ করো সন্ধ্যা, কথাটা বলা ঠিক হয় নি আমার।

তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিশালিনী সন্ধ্যা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল, এখন সহসা অকারণে রাঙা হইয়া উঠিল। বোধ হয় ভূপেনের এই লজ্জার ইতিহাসটা তাহার কাছেও অজানা রহিল না। সে তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়িল—একটা কথা আপনাকে অনেকদিন থেকেই বলব মনে করছি মাস্টার মশাই, আপনি মাথা ঠাণ্ডা ক'রে শুনুন।

এমন ভূমিকা করিয়া কথা সে কদাচিৎ বলে, সুতরাং ভূপেন বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল, যেন একটু শঙ্কিতও হইল মনে মনে।

সন্ধ্যা কহিল, আমি আমার ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে অনেক ভেবে দেখেছি—একটা কিছু কাজ ছাড়া আমি এভাবে থাকতে পারব না। বিয়ে করার ইচ্ছা এখন আমার নেই—কখনও হবে কিনা তাও জানি না। সুতরাং কাজ চাই—ভাল আর বড় কাজ। অবশ্য এ সম্বন্ধে আমি যা-ই ভাবি না কেন, সে আপনারই ভাবা হবে বলতে গেলে, কারণ আমার শিক্ষা-দীক্ষা যা কিছু আপনার কাছ থেকেই ত পাওয়া। যে পথ বেছে নেব আমি, সে আপনারই পথ। কাজেই বড় কাজের কথা ভাবতে গেলে দেশের অশিক্ষা দূর করার কথাটাই আগে মনে আসে। তাই ভাবছিলাম যে কোথাও যদি একটা এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যেত—যেখানে মনের মত ক'রে কতকগুলি ছেলেমেয়েকে শেখান সম্ভব, যেখানে আমরা কোন বাঁধা সিলেবাস মানব না, যাতে সত্যকার শিক্ষা হয়, জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা বাড়ে সেই চেষ্টাই যেখানে থাকবে মূল উদ্দেশ্য—তাহ'লে কেমন হয়? আমরা মাইনে নেব না, অন্য কোন খরচাও না—তাতে আমরা মনের মত ছেলেমেয়ে বেছে নিতে পারব। কি বলেন?

ভূপেনের দৃষ্টিও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, এই স্বপ্নই ত সে কতদিন দেখিয়াছে, বরং বলা যায়, ভাল করিয়া দেখিতে সাহস করে নাই। তবু সে বলিল, ওখানে তুমি ত সিলেবাসের বাইরে ওদের মনের মত ক'রে পড়াবে, তারপর? ভবিষ্যতে ওরা করবে কি?

সন্ধ্যা উত্তর দিল, আমরা ওদের চৌদ্দ-পনের বছর বয়স অবধি আটকে রাখব—ধরুন, ক্লাস এইটের স্ট্যাণ্ডার্ড পর্যন্ত। তারপর ওরা অনায়াসে কোন হাই-স্কুলে ভর্তি হয়ে ম্যাট্রিক পাস করতে পারবে। বনেদ যদি ওদের পাকা হয়ে যায়

ত ভাবি না—যেখানেই যাক মানুষের মত মানুষ হয়ে দাঁড়াতে পারবে—চাই কি যথার্থ বিদ্বান বলেও একদিন পরিচয় দিতে পারবে। আর যাদের মধ্যে সে প্রতিভা দেখব তাদের আমরা চেষ্টা করব বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতার বাইরে রেখে যতদূর সম্ভব মানুষ ক'রে তোলবার—যথার্থ পণ্ডিত করবার। কি বলুন?

জবাব দিতে গিয়া ভূপেনের গলা আবেগে কাঁপিয়া উঠিল, কহিল, তা যদি পারো সন্ধ্যা, তাহলে বুঝব এ দেশের, এ জাতির এখনও কিছু আশা আছে। অর্থের এর চেয়ে সদ্ব্যয়ের কথা আমি ভাবতেই পারি না।

—আমারও তাই বিশ্বাস। দাদুর টাকার এর চেয়ে ভাল সদ্গতি আর কি হ'তে পারে? তাই মনে হয় ঈশ্বর এমন ভাবে আমাকে এতগুলো টাকার মালিক ক'রে দিয়েছেন এইজন্যেই। আসুন মাস্টার মশাই, আমরা এখন থেকেই এটা শুরু ক'রে দিই। আমি একা কতটুকু পারব বলুন, আপনাকে এতে লাগতে হবে। দুমকার কাছে আমাদের সাতাত্তর বিঘে জমি আছে, স্বাস্থ্যকর জায়গা, সঙ্গে সঙ্গে এগ্রিকালচারও কিছু শেখানো চলবে—সেইখানেই আমরা এই নতুন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করব। সব বিষয়ের ভাল ভাল শিক্ষক বেশী মাইনে দিয়ে খুঁজে নিয়ে আসতে হবে। আমরা সেখানে স্বাবলম্বী, পরিশ্রমী, অনুসন্ধিৎসু, পরিচ্ছন্ন, মর্যাদা-জ্ঞানসম্পন্ন, জ্ঞানানুরাগী ভবিষ্যৎ নাগরিক গড়ে তুলব। এই হবে আমাদের জীবনের সার্থকতা।

আবেগে, আনন্দে, আশায়, কল্পনায় সন্ধ্যার কণ্ঠস্বরও কাঁপিতেছে, সমস্ত মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। আর তাহার সেই চোখ দুটি, আশ্চর্য সুন্দর দুটি চোখের দৃষ্টিতে মিনতি ও স্বপ্ন ঝরিয়া পড়িতেছে। সে দৃষ্টিতে সুদূর কল্পনার অতীত এক বিপুল সম্ভাবনার ইঙ্গিত।

লোভ হয় বৈকি!

জীবনের পরিপূর্ণতা, সার্থকতা, এমন ভাবে এত দুঃখের পর যদি যাচিয়া সামনে উপস্থিত হয়, যদি অমৃতের পাত্র এমন করিয়া ওষ্ঠের কাছে আগাইয়া আসে ত কার না বুক প্রলোভনে দুলিয়া ওঠে, কার না শিরায় রক্ত নাচিতে থাকে। তাহার আদর্শ শুধু সফল হইবে না, স্বপ্নও—সন্ধ্যাকে সহকর্মিণীরূপে কাছে পাইবে। তাহার আত্মার আনন্দ, মানসলোকের সৃষ্টি, স্বপ্ন-কল্পনা!

যেন কোন্ দূর হইতে সন্ধ্যা বলিতেছে,—কি বলুন মাস্টার মশাই, তাহ'লে কথা পাকা রইল ত?

একটা উত্তাল উদ্দাম আনন্দের বিপুল ঘূর্ণি যেন কী একটা ব্যবধান রচনা করিয়াছে তাহার চারিপাশে, সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন তার ফলে অসাড়, অবশ হইয়া

পড়িয়াছে, বুদ্ধিও তাহার কাজ করিতে পারিতেছে না। এ কি সন্ধ্যার কণ্ঠস্বর? এ কি তাহারই কথা? সে কি সামনে বসিয়া?

না, না, এ কী করিতেছে সে!

ওরে অবোধ, ওরে মূঢ়—এ পরিণতি, এ সার্থকতা তোর জন্য নয়। এ শুধুই অদৃষ্টের নিষ্ঠুরতম পরিহাস। ভূপেন জোর করিয়া তাহার আচ্ছন্ন চৈতন্যকে নাড়া দিল। আর সময় নাই, এ স্বপ্ন এখনই ভাঙিতে হইবে। ম্লান হাসিয়া বলিল, এর মধ্যে আর আমাকে টেনো না সন্ধ্যা—আমাকে মাপ করো।

—আপনি আসবেন না? খুব শান্ত কণ্ঠেই প্রশ্ন করিল সন্ধ্যা, খুব চুপি চুপি। তবু ভূপেনের মনে হইল, প্রশ্নের সঙ্গে যেন একটা আর্তনাদ জড়ানো আছে।

সে জোর করিয়া সোজা হইয়া বসিল। কহিল,—না, আমার আসা সম্ভব নয়। এ যে আমার স্বপ্ন, তা তুমিই ত সব চেয়ে ভাল জানো। যদি এতে আমার সাহায্য করা সম্ভব হ'ত, যদি এতে আমার সারাজীবন সঁপে দিতে পারতুম—তাহ'লে আমার জন্ম সার্থক হ'ত। কিন্তু আমার ভাগ্যে এত সুখ, এত গৌরব নেই। আমার অন্য দায়িত্ব আছে—তাও ত তুমি জানো। আমি গরিব, আমার এসব স্বপ্ন দেখতে নেই।

সন্ধ্যাও হয়ত কথাটা বোঝে। তবু আজ তাহার ভাঙিয়া পড়িলে চলিবে না; সে প্রাণপণে গলায় স্বর টানিয়া আনে,—আপনি ওখান থেকেও আপনার মাইনে নিতে পারতেন, বৌদিকেও নিয়ে গিয়ে রাখতেন না হয়।

—তা হয় না সন্ধ্যা। মানুষ বড় দুর্বল। এত ভরসা আমার নিজের ওপর নেই। তুমি দুঃখ ক'রো না, এ আমারই ললাট-লিপি, তুমি কি করবে? তা নইলে যা আমার কাছে ভগবানের আশীর্বাদ বলে মনে হবার কথা, আজ তা নিষ্ঠুর পরিহাস হয়ে উঠবে কেন?

দুজনেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল বহুক্ষণ। অপরাহ্ণ চলিয়া গিয়া ক্রমে সন্ধ্যা নামিল, ঘরের ভিতরে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, তবু উঠিয়া আলোর সুইচটা নামাইয়া দিবার কথা কাহারও মনে আসিল না। অবশেষে অনেকক্ষণ পরে সন্ধ্যাই কথা কহিল। সে এতক্ষণ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাসও তাহার বক্ষ ভেদ করিয়া বাহির হইতে দেয় নাই, প্রাণপণ শক্তিতে বুকেই চাপিয়া রাখিয়াছিল। এতটুকু দুর্বলতা সে প্রকাশ পাইতে দিবে না—সেটা ভিক্ষা চাওয়ার মতই দেখাইবে। এখনও নির্মমভাবে কণ্ঠস্বর হইতে কান্নার সুর দূর করিয়া দিল—হয়ত একটু বিকৃত শোনাইল তবু তাহাতে জড়তা কোথাও নাই—তাহ'লে আমায় অনুমতি দিন, আমি একাই এ কাজ আরম্ভ করি।

—পারবে ?

—চেষ্টা করব। ছেলেদের সেক্‌শান এখন থাক। মেয়েদের মধ্যেই ত অশিক্ষা ও কুশিক্ষা বেশী ক'রে বাসা বেঁধেছে, তাদের নিয়েই শুরু করি।

—কিন্তু এর ভেতরে টেক্‌নিক্যাল খুঁটিনাটি অনেক আছে। নানা রকমের রূঢ় বাস্তবের সামনে দাঁড়াতে হবে—নানা রকমের জবাবদিহি চাইবে সবাই। তাছাড়া এতগুলি মেয়েকে চরানো—সেও কঠিন ব্যাপার বৈকি। তুমি নিজে কখনও ইস্কুলে পড় নি—সে অভিজ্ঞতাও ত নেই। তাই ভাবছি—

—এটুকু সাহায্যও কি আপনার কাছ থেকে পাবো না ? নির্দেশ দেওয়া, নিয়ম-কানুনগুলো তৈরী ক'রে দেওয়া—এটা ত আপনি দূর থেকেও করতে পারেন ?

সন্ধ্যার কণ্ঠস্বরে এবার আর হতাশা বুঝি চাপা থাকে না।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ভূপেন অপ্রতিভ হইয়া পড়িল, নিজেকে যেন একটু অপরাধীও মনে হইতেছে,—তবে তুমি পূর্ণেন্দুবাবুকেও কথাটা ব'লো—উনি অনেক বড় বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত আছেন—এটা ওঁর ভাল লাগে বলেই। কাজেই ওঁর কাছ থেকেও অনেকটা সাহায্য পাবে।

সে একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইল; দরজার দিকে পা বাড়াইয়া কহিল—ওঁর সঙ্গে ভাল করে পরামর্শ ক'রো—এ সম্বন্ধে যখন যা দরকার হবে ব'লে পাঠালে আমিও যতটা পারি জানাব নিশ্চয়ই! তোমার মনটা তৈরী হোক—আর একদিন এসে ভাল ক'রে প্ল্যান করা যাবে।

তাহার পর সে আর সন্ধ্যার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই দ্রুত সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া আসিল। আরও কয়েকবার এখান হইতে এমনি করিয়াই পলায়ন করিতে হইয়াছে। কী বলিবে, কী করিবে—নিজের বুদ্ধি-বিবেচনার উপর যেন এই মুহূর্তে আর তাহার আস্থা নাই। তাহার নিজের দুঃখের চেয়েও সন্ধ্যা যে আঘাত পাইয়াছে এই কথাটাই বড়, তাহার এই আশা-ভঙ্গের বেদনা যে কতখানি তা ভূপেন ছাড়া আর কে জানে? অথচ উপায় নাই—যাহাকে এতটুকু আঘাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য বহু ত্যাগ স্বীকার করাও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়, তাহাকে এত বড় দুঃখ হইতে বাঁচাইবার কোন উপায় আজ কোথাও নাই।

লোভ বড় দুর্জয়, মন বড় দুর্বল।

সে কল্যাণীকে মনে করিবার চেষ্টা করে। বেচারী কল্যাণী! সে ত নিঃশব্দেই থাকে, তাহার কোন অপরাধ নাই, অথচ সকলের কাছেই সে থাকে অত্যন্ত সঙ্কোচে—অপরাধিনীর মতই মাথা হেঁট করিয়া।

ভূপেনও কি তাহাকে মধ্যে মধ্যে অপরাধিনী মনে করে না ?

হয়ত করে। হয়ত তাকে জীবনের বিড়ম্বনা, একটা বোঝা বলিয়া মনে করে। মাঝে মাঝে মনে হয় বৈকি যে, যদি এমন ভাবে বিজয়বাবুদের সহিত নিজেকে না জড়াইত, কিংবা সন্ধ্যা যদি আগে হইতেই একটা অকারণ ঈর্ষায় অমন অভিমান করিয়া বসিয়া না থাকিত—তাহাদের অসংখ্য দানের মধ্যে ইহাদের জন্যও কিছু একটা নির্দিষ্ট করিয়া দিত, এমন কি সেও যদি বৃথা আত্মমর্যাদার অহঙ্কারে স্ফীত না হইয়া সোজাসুজি তাহার কাছে চাহিয়াই লইত, তাহা হইলে আজ এমন করিয়া সমস্ত দিক দিয়া ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যকে বরণ করিতে হইত না। আজও তাহার সামনে বিপুল সম্ভাবনা, চরম সার্থকতা পড়িয়া থাকিত। এই ত, এইমাত্র তাহাকে নিজ হাতে যে সে-সমস্ত আশাকে চূর্ণ করিয়া দিয়া চলিয়া আসিতে হইল, তাহার জন্য কি মনের অবচেতনে কল্যাণীর বিরুদ্ধে একটা বিদ্বেষ দেখা দেয় নাই!

না, না, ছিঃ! বেচারী কল্যাণী, বিনাদোষে সে-ই সকলের বিদ্বেষের, উপেক্ষার ও লাঞ্ছনার পাত্রী হয়। অথচ এ ঘটনায় সকলেই সমান দোষী ছিল।

সন্ধ্যাকে সে চেনে নাই। তাহার সূক্ষ্ম ও চাপা অভিমানের সঙ্গে পরিচয় ছিল না বলিয়াই সে তাহার তখনকার নীরবতাকে ভুল বুঝিয়াছিল। দোষী সে-ই—আর তার শাস্তি তাহাকেই চিরকাল বহন করিতে হইবে। সন্ধ্যা বরাবরই শান্ত, বরাবরই মনের ভাব সে সংযত করিয়া রাখে—অভিমান বা বেদনা প্রকাশ করিতে দেয় না। এই ত এখনই, কত বড় আশা তাহার ভাঙিয়া গেল, তবু সে এতটুকু বিচলিত হইল না। ভূপেনই বরং হৃদয়াবেগ সম্বরণের চেষ্টায় কী সব খাপছাড়া কথা বলিয়া আসিল।

এমনি এলোমেলো পরস্পরবিরোধী নানা চিন্তার ঘূর্ণাবর্তে বহু রাত্রি পর্যন্ত সেদিন ভূপেন পথে পথে ঘুরিল। অবশেষে স্থির করিল কল্যাণীর কাছে একবার যাওয়া দরকার, বহুদিন যায় নাই। তাহার স্নিগ্ধ সেবা, নিরভিমান প্রেমই বর্তমান মনোভাবের একমাত্র ঔষধ।

পরের দিনই ছুটি লইয়া সে কল্যাণীর কাছে চলিয়া গেল।

॥ ২৯ ॥

দিন পাঁচ-ছয় পরে সন্ধ্যা নিজেই তাহাদের বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। এলাহাবাদে পূর্ণেন্দুবাবুর কে এক আত্মীয় থাকেন, ওখানকার এক স্কুলের হেড-মাস্টার, তিনি নাকি একটি এম-ই স্কুলের হেডমাস্টাররূপে প্রথম এলাহাবাদে গিয়াছিলেন, পরে তাহাকে হাইস্কুলে পরিণত করিয়াছেন। শীঘ্রই সেখানে কলেজ

হইবে। সে ভদ্রলোকও শিক্ষা-পাগল, তিনি অনেক রকম নূতন ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিসে স্কুলের উন্নতি হইবে এবং ছেলেদের কল্যাণ হইবে—এ ছাড়া অন্য কোন চিন্তা তাঁহার নাই। পূর্ণেন্দুবাবু পরামর্শ দিয়াছেন যে তাহারা দুইজনেই অর্থাৎ সন্ধ্যা ও ভূপেন যদি একবার এলাহাবাদ ঘুরিয়া আসে ত তাঁহার নিকট হইতে অনেক মূল্যবান উপদেশ ত পাইবেই—এ সম্বন্ধে নূতন করিয়া ভাবিয়া দেখিবারও প্রেরণা পাইবে। ভূপেন যাইতে পারিবে কি ?

প্রস্তাবটা এতই নির্দোষ অথচ লোভনীয় যে সে না বলিতে পারিল না। কিন্তু পূজার ছুটির পর সবে ইস্কুল খুলিয়াছে—সামনেই পরীক্ষা। এ অবস্থায় ইস্কুল কামাই করা—কিংবা তার চেয়ে যেটা বড় প্রশ্ন—টিউশ্যনি কামাই করা সম্ভব কিনা ? এই কয়দিন কাটাইয়া পরীক্ষার পর গেলে কেমন হয় ?

সন্ধ্যা বলিল, কিন্তু ইস্কুল চলতে চলতে না গেলে ঠিক কি ভাবে কাজ হয় সেটা ত দেখা যাবে না—

—ও, তা যাওয়া যাবে অনায়াসে। আমাদের ষোলই-সতেরোই প্রমোশন হয়, সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ব। ওদের ত আর এটা বছরের শেষ নয়, ওদের সিজ্‌ন্ আরম্ভ হয় জুলাইতে, গরমের ছুটির আগে বাৎসরিক পরীক্ষা হয়। তুমি পূর্ণেন্দু-বাবুকে বলে দাও সেই-মত চিঠি লিখে দিতে, বুঝলে !

এত সহজে ভূপেন রাজী হইবে সন্ধ্যা তাহা ভাবে নাই। সে খুশী হইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু ভূপেন একটু চিন্তিত হইয়া পড়িল। এমন ভাবে সন্ধ্যার সহিত বিদেশ যাত্রার আরও যে নানারূপ কদর্থ হইতে পারে সে-কথাটা সে লজ্জায় সন্ধ্যাকে বলিতে পারিল না। অথচ তাহার নিজের মনের মধ্যে একটা সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। কল্যাণী কি মনে করিবে সেটা বড় কথা নয়—সব চেয়ে বড় বিপদ অন্য লোককে লইয়া। সে লক্ষ্য করিয়াছে যে সন্ধ্যার সহিত ঘনিষ্ঠতায় তাহার বাবা ও মায়ের উৎসাহ এখনও কমে নাই—বরং এই শ্রেণীর আসা-যাওয়াতে তাঁহারা অহেতুক একপ্রকার আশান্বিত হইয়া ওঠেন। এই আশা ও উৎসাহের পিছনে যে একটা কদর্য ইঙ্গিত আছে সেইটাতেই সে বিব্রত বোধ করে সবচেয়ে বেশী, অথচ এ ধরনের কথা লইয়া আলোচনা করিতেও তার ভদ্রতায় বাধে।

তবু শেষ পর্যন্ত যাইতেই হয়।

তবে এলাহাবাদে পৌছিয়া দেখিল যে সে ঠকে নাই। এখনও যে এ ধরনের শিক্ষাব্রতী আমাদের দেশে সত্যই কোথাও আছে তাহা চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করা কঠিন। চৌধুরী মশাইয়ের মাস্টারীটা পেশা নয়—নেশা ! বৃত্তির খাতিরে লন নাই—মাস্টারী না করিয়া থাকিতে পারেন না বলিয়াই লইয়াছেন। দিনরাতই

তাঁহার ইস্কুলের কথা—যখন যে প্রসঙ্গই পাড়া হউক না কেন, তিনি ঠিক আলোচনার ধারাটিকে নিজের বিশেষ প্রসঙ্গে টানিয়া লইয়া যাইবেন। তেমনি স্কুলের বাহিরের আর কোন কথা তিনি জানেন না—নিজের জামা-কাপড় এমন কি ক্ষুধাতৃষ্ণার সংবাদও রাখেন স্ত্রী। সে ভদ্রমহিলা এক এক সময় বিরক্ত হইয়া ওঠেন—জানো ভাই, ঐ ইস্কুলটাই হ'ল আমার সতীন। মহাপাপ না থাকলে কেউ ইস্কুল-মাস্টারের বউ হয় না। ছি, ছি, মানুষ না যন্তর, এক এক সময়ে তাই ভাবি।

আবার একটা সস্নেহ গর্ববোধও আছে স্বামী সম্বন্ধে—ঐ ত মানুষ, নিজের নাকে চশমা থাকলে খুঁজে পান না, একপাটি ব্রাউন রঙের জুতোর সঙ্গে আর এক পাটি কালো পরে চলে যান, ফরসা পোশাক বার ক'রে রাখলেও ময়লা পোশাক পরে বেরিয়ে পড়েন। কিংবা ময়লা পায়জামার সঙ্গে অনায়াসে ধোপদস্ত কোট পরে বসে থাকেন—কিন্তু ইস্কুলের অত খুঁটিনাটি নাড়ীনক্ষত্রের হিসেব কী ক'রে মনে রাখেন তাই ভাবি! চারদিকে চোখ—একা মানুষ অতগুলো সব দেখেন ত! তাই ভাবি এক এক সময়, দিনরাত ঐসব চিন্তা মাথায় ঘোরে বলেই ঘর-সংসারের কথা মনে রাখতে পারেন না। ওঁর ওপর রাগ করা বৃথা!

চৌধুরী মশাই ঘরে অতি নিরীহ, স্ত্রীর শাসন ও ধমক বেমালুম হজম করেন ভালমানুষের মত, অথচ স্কুলে আর এক চেহারা। কাহারও বিন্দুমাত্র ত্রুটি সহ্য করেন না। প্রত্যেক শিক্ষকের উপর নজর রাখেন, প্রত্যেক ক্লাসে মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হন কিংবা আড়াল হইতে শোনেন। সব ক্লাসেরই সাপ্তাহিক পরীক্ষার খাতা হঠাৎ চাহিয়া লইয়া দু-চারখানা করিয়া দেখেন। তাহাতে কেমন পড়াশুনা হইয়াছে এবং শিক্ষক কেমন পরীক্ষা করিয়াছেন, দুইটাই দেখা হয়। চেষ্টা করিয়া নিজে সব বিষয়ই আয়ত্ত করিয়াছেন, কোন শিক্ষক অনুপস্থিত থাকিলে নিজে তাঁহার ক্লাস লন। ফলে ছাত্ররা যেমন ভয় করে তেমনি ভালবাসে তাঁহাকে।

প্রতি সপ্তাহে তিনি শিক্ষকদের এক সভা আহ্বান করিয়া পড়াশুনার পদ্ধতি, তাহার দোষগুণ বিচার করেন, শিক্ষকতা সম্বন্ধে নূতন কোন তথ্য, নূতন কোন আলোচনা কোন বইতে বা কাগজে বাহির হইলে দাগ দিয়া রাখিয়া দেন, তাহাও ঐ সভাতে পড়িয়া শোনান। কোন ছাত্র সম্বন্ধে কোন বক্তব্য থাকিলে তাহার অভিভাবককে ডাকিয়া পাঠাইয়া খোলাখুলি আলোচনা করেন। যাহারা একটু মাথা-মোটা তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা, অভিভাবকদেরও সেইরূপ নির্দেশ দিয়া দেন। শিক্ষকদের নির্দেশ দেওয়া আছে, আমার ইস্কুলের ছাত্ররা অধিকাংশ গরিব, বাড়িতে তাদের প্রাইভেট টিউটর আছে এটা ধরে নেবেন না—বরং কারুরই নেই এইটে মনে করবেন। সেইভাবে তাদের পড়াটা যাতে ক্লাসেই তৈরী হয়ে যায় এমন

ভাবে পড়াবেন। নইলে পড়া দেওয়া আর তার পরের দিন পড়াটা হ'ল কিনা দেখার জন্যে ইস্কুলে আসার দরকার কি! সেটাও ত প্রাইভেট টিউটার করতে পারেন!

চৌধুরী মশাই তাঁহার স্কুলে নিচের ক্লাসে কোন ইতিহাস ভূগোল কিংবা ব্যাকরণ অনুবাদের বই রাখিতে দেন নাই, সমস্তই শিক্ষকদের মুখে মুখে পড়াইতে হয়। সাহিত্যের বইয়ের সঙ্গেই ব্যাকরণ বা অনুবাদ শেখানো চলে। মুখস্থ-করা ও দাগ-দেওয়া যাহাতে খানিকটা বন্ধ হয় সেইজন্যই এত আয়োজন। তারপর উপরের ক্লাসে তালিকাভুক্ত পড়াশুনা ছাড়া গানের ক্লাস, ছবি আঁকার ক্লাস, হাতের কাজ শিখিবার ক্লাস (তাহার মধ্যে কাগজের বাক্স ও টিনের কৌটা তৈয়ারী, কাঠের কাজ, দর্জির কাজ আর চামড়ার কাজ প্রধান) আছে। একখানা মাসিক-পত্র আছে সেটা ছেলেরাই চালায়, একটি খাতা পেনসিল প্রভৃতির স্টোর আছে সে ভারও ছেলেদের উপর, তাহার লভ্যাংশ হইতে দরিদ্র ছেলেদের বেতন ও বইখাতা সরবরাহ হয়। তাছাড়া আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হইতেছে, খুব ছোট আয়তনের একটি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক চালাইতে হয় ছেলেদেরই। তাহার আয়-ব্যয় হাস্যকর রকমের কম ছিল প্রথম প্রথম কিন্তু এখন বেশ সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে। ছেলেদের শেয়ার আছে চার আনা হিসাবে। ইস্কুল ছাড়িবার আগে ঐ শেয়ার ব্যাঙ্ককেই জমা দিতে হয়, আবার নূতন ছাত্রদের মধ্যে এই শেয়ার বিক্রী হয়। এছাড়া টাইপ-রাইটিং ও শর্টহ্যাণ্ড শিখিবার একটা ব্যবস্থাও ইস্কুলের সহিত রাখা হইবে কিনা সে বিষয়েও চিন্তা করা হইতেছে।

এসব কিছুই আবশ্যিক নয়—ইচ্ছানুযায়ী, যাহার যেদিকে ঝোঁক, অতিরিক্ত পাঠ্য-হিসাবে এই সব ক্লাসে যোগ দেওয়া যায়। কাহাকেও দুইটির বেশি এই ধরনের অতিরিক্ত ক্লাস করিতে দেওয়া হয় না। তাও মাস্টার মশাই নিজে মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করেন যে সে ভার তাহার মস্তিক ও স্বাস্থ্যের পক্ষে বেশি বোঝা হইয়া পড়িতেছে কিনা। সেরূপ বুঝিলে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ডিবেটিং ক্লাবের সঙ্গে সাহিত্য আলোচনার ব্যবস্থা রাখিয়াছেন। দুইজন শিক্ষক ও তিনটি ছাত্রের বিচারে যাহার রচনা (গল্প প্রবন্ধ বা কবিতা) শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইবে, তাহাকে বৎসরের শেষে একটি পুরস্কার দেওয়া হয়। ইংরাজী, বাংলা, হিন্দী ও উর্দু সংবাদপত্র লওয়ার ব্যবস্থা আছে—সেগুলি ছাত্রদের জন্য একটি নির্দিষ্ট ঘরে রাখা থাকে। সেখানে বসিয়া পড়িবার ব্যবস্থা আছে। সপ্তাহে এক ঘণ্টা করিয়া উপরের চারটি ক্লাসে চল্‌তি খবর আলোচনা হয় এবং কে কতটা খবর রাখে তাহারও একটা মোটামুটি পরীক্ষা লওয়া হয়। সাধারণ জ্ঞানের ক্লাস আছে, তাহার নিয়মিত পরীক্ষা

লওয়া হয়। শরীরচর্চা, খেলাধুলা ও সাঁতারের বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। এইগুলি আবশ্যিক। খানিকটা ব্যায়াম যাহাতে প্রত্যেকেই করে সেদিকে হেডমাস্টার মহাশয় কড়া নজর রাখেন। টিফিন স্কুল হইতে দেওয়া হয়। কেহ অসুস্থ হইয়া পড়িলে ছেলেদের একটি সেবাদল আছে তাহারা দেখাশুনা করে, গরিব ছাত্র হইলে স্টোর ও ব্যাঙ্ক হইতে তাহার চিকিৎসার খরচ চালানো হয়।

কিন্তু শুধু ছাত্রদের দিকেই নয়, শিক্ষকদের দিকেও চৌধুরী মহাশয়ের কড়া নজর আছে। তিনি যেমন তাঁহাদের নিকট হইতে ষোল আনা কাজ চান, তেমনি তাঁহাদেরও প্রাপ্য ষোল আনা মিটাইয়া দেন। সেটা সম্ভব হয় অবশ্য এখানে বাংলাদেশের চেয়ে সরকারী সাহায্যের অঙ্ক অনেক বেশী মোটা বলিয়া। বাংলাদেশের অনেক বড় ইস্কুলেও বার্ষিক তিন-চারশ টাকা মাত্র ভাতা আছে অথচ এখানে এই সাধারণ ইস্কুলেও মাসিক হাজার টাকা পাওয়া যায়। সুতরাং বেতন এখানে অনেক বেশী। এখানকার শিক্ষকরা চৌধুরী মহাশয়ের অনুমতি ছাড়া টিউশনি লইতে পারেন না কিংবা পাঠ্যপুস্তক লেখা প্রভৃতি বাড়তি কাজ করিতে পারেন না। তাঁহাদের প্রত্যেকের জীবনবীমা আছে কিনা তাহা হেডমাস্টারকে জানাইতে হয়। শিক্ষকদের জন্যও একটি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক আছে—সেখান হইতে বাড়ি করার জন্য, কিংবা কন্যার বিবাহ প্রভৃতিতে টাকা ধার দেওয়া হয়। এ ছাড়া ইস্কুল হইতেও টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এক কথায় তাঁহাদের প্রত্যেক অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে তিনি খবর রাখেন ও প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন।

ভূপেন এসব দেখিয়া অভিভূত হইয়া পড়ে। এ তাহাদের কল্পনারও অতীত। শিক্ষকদের জীবনও যে স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্মানের সঙ্গে কাটে তাহা চোখে না দেখিলে সে বিশ্বাস করিত না। চৌধুরী মহাশয় সন্ধ্যার প্রস্তাব শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন। কতকগুলি ব্যবহারিক সদুপদেশও দিলেন। বলিলেন—ওখানের ব্যাপার যে কত খারাপ তা এদেশ থেকেও কিছু কিছু টের পাই বৈকি মা। এ কলঙ্কের যদি কিছুও মোচন করতে পারো ত বুঝবে যে সত্যিকার একটা বড় কাজ ক'রে গেলে। কিন্তু এ বিষম বোঝা, ইংরেজিতে যাকে বলে হারক্যুলিয়ান টাশ্‌ক্‌। তুমি ছেলেমানুষ তায় মেয়েছেলে। কত দিন তোমার এ শখ আর ধৈর্য থাকবে তাও জানি না। হয়ত সংসারের ডাক আসবে, সব ফেলে চলে যেতে হবে। যদি তেমন কোন সঙ্গী পাও জীবনে, যে তোমার এ কাজে তোমার পাশে এসে দাঁড়াতে পারে তাহ'লে ভাল, নইলে সব যাবে মা। তোমার অল্প বয়স, সে সম্ভাবনা ত এখনও যায় নি।

সন্ধ্যার মুখ একেবারে আরক্ত হইয়া উঠিল। বোধ হইল সে একটি ছোট

দীর্ঘনিশ্বাসও চাপিয়া গেল। তারপর শান্ত এবং বিনত কণ্ঠেই কহিল—দেখা যাক না কাকাবাবু, চেষ্টা করতে দোষ কি?

—কিছু না, কিছু না। তোমার যখন নষ্ট করবার মতও যথেষ্ট টাকা আছে তখন চেষ্টা ক'রে দেখ। চাই কি, খানিকটা এগোলে উত্তর-সাধকও কাউকে পাবে। কাজ করবার লোক এগিয়ে আসতে পারে বলা যায় না। তবে একটা কাজ ক'রো। একটি প্রবীণা শিক্ষয়িত্রী বেছে নাও। যিনি তোমার নির্দেশে কাজ করবেন, কিন্তু হাতে কলমে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকায় কল্পনাটাকে শেষ পর্য্যন্ত রূপ দিতে পারবেন। তবে এটাও দেখো যে কলুর বলদের মত বাঁধা রাস্তাতেই না তিনি চলতে চান। তোমার ত সুযোগ অনেক, সিলেবাস মানতে হবে না যখন, কর্তাদের কাছে জবাবদিহি করতে হবে না—তখন আর অসুবিধে কি? যারা কিছু বোঝে না, এ বিষয়ে ভাবে না, তাদের কাছেই কৈফিয়ৎ দিতে হয়, এই ত আমাদের সবচেয়ে দুর্ভাগ্য।

সন্ধ্যা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—কিন্তু আপনার সাহায্যও একটু আধটু পাবো ত?

—পাবে বৈকি মা, নিশ্চয়ই পাবে। আমি তোমাকে স্ট্যাণ্ডিং রুল্‌স কতকগুলো তৈরি ক'রে দেবো—আর প্ল্যানিং-এর খসড়া, সেগুলো তোমরা বিবেচনা ক'রে দেখতে পারবে। কাঠামো একটা তৈরী থাকলে মনের মত ক'রে প্রতিমা গড়তে কতক্ষণ লাগে? তাছাড়া যখনই ডাকবে তখনই আমি গিয়ে দেখে আসবো। এ ত আমাদেরই কর্তব্য। জাতের এ লজ্জা কি আমাদের গায়ে লাগে না মনে করো?

তাহার পর একটু থামিয়া কহিলেন, আমার এক বন্ধু আছেন দিল্লীতে, মোটা মাইনের চাকরি করেন। তিনি মধ্যে মধ্যে এখানে আসেন, তাঁর কাছে যা শুনি তা আর লোককে বলবার মত নয়। বাঙ্গালীরা এককালে সকলের আগে ছিল··· অন্তত চাকরির ক্ষেত্রে ত বটেই। আজ সেখানেও তারা পিছিয়ে আসছে ক্রমাগত। কোন একটা ইণ্টারভিউতে তারা দাঁড়াতে পারে না। কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় মাদ্রাজীরা ত এগিয়ে গেছেই, আজ সমস্ত জাতই বাঙ্গালীকে পেছনে ফেলে চলে যাচ্ছে। দুনিয়ার খবর রাখে না, লেখাপড়াতেও কাঁচা—খবরের কাগজটা পর্যন্ত অনেকে ভাল ক'রে পড়ে না। অফিসারদের সামনে মাথা চুলকোয়, ভাল ক'রে কথা কইতেও যেন ভুলে গেছে। অফিসের মধ্যে এসো, দেখবে অকর্মণ্যতা ও ফাঁকির পাহাড় জমে উঠেছে এক-একটা টেবিলে। সব জায়গায় তারা পেছিয়ে আসছে অথচ এখনও সেই কবেকার খাওয়া-ঘিয়ের গন্ধটুকু আছে তাদের হাতে, এখনও

অহঙ্কারের অভাব নেই।

চৌধুরীর মহাশয় দুই দিনের মধ্যেই একটা প্ল্যান ও নিয়ম-কানুনের খসড়া তৈয়ারী করিয়া দিলেন সন্ধ্যাকে। সেটা তাহাকে পড়িয়া বুঝাইয়া দিবার পরে সস্নেহে সন্ধ্যার পিঠে হাত রাখিয়া কহিলেন, যতই যা হোক মা, এ হ'ল পুরুষের কাজ। তোমাদের বাধা অনেক। তুমি সুশ্রী অল্পবয়সী মেয়ে—এইটিই হয়ত অনেক ক্ষেত্রে অপরাধ ব'লে গণ্য হবে। বিনা অপরাধে দুর্নামের ভাগী হওয়াও বিচিত্র নয়। তার চেয়ে যদি তোমারই উপযুক্ত কোন জীবনের সঙ্গী বেছে নিতে পারতে ত ভাল হ'ত। নিদেন এমন কোন পুরুষ কর্মচারী যার এদিকে আন্তরিক অনুরাগ আছে। ভূপেন বাবাজীকে ত রীতিমত শিক্ষিত আর শিক্ষানুরাগী বলে মনে হ'ল—ওঁকেই টেনে নাও না কেন মা! কতই বা আর বেতন পাচ্ছেন ও-ইস্কুলে, তার চেয়ে তুমি কিছু বেশী দিয়েও যদি ওঁকে তোমার কাজে লাগাতে পারো, সে-ই বোধ হয় সব চেয়ে ভাল হয়। কি বলো? এ বিষয়ে কি কথা কয়েছ কখনও?

সন্ধ্যা মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া তাঁহার কথা শুনিতেছিল, তেমনি ভাবেই স্থির হইয়া বসিয়া রহিল, শুধু চৌধুরী মহাশয়ের প্রশ্নের পর অনেকক্ষণ চলিয়া গেলে আস্তে আস্তে বলিল—সে হবার নয় কাকাবাবু, তাতে ওঁর বাধা আছে।

চৌধুরী মহাশয় সাধারণত স্কুল-সংক্রান্ত ব্যাপারের বাহিরের কোন জিনিসই লক্ষ্য করেন না, কিন্তু আজ কি জানি কেন তিনি বিস্মিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন কথাগুলি বলিবার সময় নতমুখী সন্ধ্যার চক্ষু হইতে দুটি ফোঁটা জল গড়াইয়া তাহার হাতের কাগজগুলার উপর ঝরিয়া পড়িল।

অকস্মাৎ শোনা গেল কলিকাতায় বোমা পড়িয়াছে, পর পর দুইদিন।

ভূপেন ব্যস্ত হইয়া পড়িল। চৌধুরী মশাই কহিলেন—কদিন থেকেই যাও বাবাজী, এখন যাওয়াও সম্ভব নয়।

ভূপেন উত্তর দিল—কিন্তু সেখানে আমার বাবা-মা-বোনেরা রয়েছে, ভুলে যাচ্ছেন কেন, কী অসহায় অবস্থা তাদের বলুন দেখি। হয়ত আমি গিয়ে কিছুই করতে পারব না। তবু তারা কতকটা ভরসা পাবে এটা ত ঠিক। বরং সন্ধ্যা থাক, গোলমাল থামলে ওকে এখান থেকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করব।

চৌধুরী মশাই কহিলেন—সেই ভাল। সন্ধ্যা-মা এখন আমার এখানেই থাকুন।

কিন্তু সন্ধ্যা বাঁকিয়া বসিল। সে কলিকাতা যাইবেই—এখানে থাকিয়া দুশ্চিন্তা ভোগ করিতে পারিবে না। যা হয় তাহার সামনেই হউক।

ভূপেন বুঝাইবার চেষ্টা করিল, এতে ক'রে তুমি আমাকে আরও বিব্রত ক'রে তুলবে সন্ধ্যা, বুঝতে পারছ না। মিছিমিছি এ বিপদের মধ্যে যাবার দরকার কি!

—আপনার বোনেরাও ত রয়েছে—

—তাদের উপায় নেই বলেই আছে। কিন্তু তুমি যখন এখানে এসে পড়েছ, বুঝতে হবে এটা ভগবানেরই নির্দেশ।

সন্ধ্যা কহিল, আপনিও ত এসে পড়েছেন, আপনিও তাহ'লে সেই নির্দেশ মেনে এখানে থেকে যান।

—আমার যে উপায় নেই। কিন্তু তুমি নিরাপদে আছ জানলে আমি কতটা নির্ভয়ে থাকতে পারি বলো দেখি। তুমি সুদ্ধ সেখানে গেলে আমার দুশ্চিন্তার শেষ থাকবে না।

সন্ধ্যা ঈষৎ তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে কহিল, দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তা সব আপনার একচেটে আর আপনাকে নির্ভাবনায় রাখবার জন্যে সবাইকে আপনার খুশিমত চলতে হবে, এটাই বা মনে করেন কেন! আপনি যদি যান ত আমি যাবই।

ভূপেন আর কথা কহিল না। চৌধুরী মহাশয়ও নিঃশব্দে তাহাদের কথা শুনিতেছিলেন, কী বুঝিলেন কে জানে, তাঁহার প্রশান্ত মুখ বেদনায় ম্লান হইয়া উঠিল। ছলোছলো চোখে নীরবে মাথা নাড়িতে লাগিলেন।

কলিকাতাগামী ট্রেনে একেবারেই ভিড় নাই। একটা ইণ্টার ক্লাস কামরায় তাহারা মাত্র দুজন। ভয় করে যাইতে। অথচ হাওড়ার দিক হইতে যে ট্রেন-গুলি আসিতেছে তাহাদের দুর্দশা অবর্ণনীয়। প্রতি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে লোক যেন স্তূপীকৃত হইয়া আছে—পথের কুকুর-বিড়ালের চেয়েও খারাপ অবস্থা তাহাদের। কলিকাতার কাছাকাছি আসিতে দেখা গেল লাইনের দুধারেই পায়ে-চলা পথ ধরিয়া অসংখ্য লোক মোটঘাট গরু বাছুর লইয়া হাঁটিয়া চলিয়াছে। বর্ধমান ও ব্যাণ্ডেল স্টেশনে বহু লোক তাহাদের কামরার সামনে আসিয়া সাবধান করিয়া দিয়া গেল, নেমে পড়ুন, নেমে পড়ুন, করছেন কি! কাল রাত্রেও বোমা পড়েছে। হাওড়া স্টেশন যেখানে ছিল সেখানটায় প্রকাণ্ড গর্ত হয়ে গিয়েছে একটা, ডালহাউসি স্কোয়ারের চিহ্ন নেই। যাবেন না। মরতে যাচ্ছেন নাকি?

সন্ধ্যা ভীতকণ্ঠে কহিল, কী হবে বলুন ত! ব্যাণ্ডেলে নেমে নৈহাটি হয়ে শিয়ালদায় গিয়ে পড়লে হ'ত না? সত্যিই যদি হাওড়া স্টেশন না থাকে?

ভূপেনও তেমন ভরসা পাইল না সত্য কথা, তবু কহিল—কিন্তু তাহলে রেল-কোম্পানীই ত এখানে গাড়ি থামিয়ে দিত, কিংবা অন্য কোনও ব্যবস্থা করত। দেখা যাক না গাড়ি কতদূর চলে!

. . .

ব্যাণ্ডেলে খবর পাওয়া গেল, শহরের যে কোন স্থান হইতে হাওড়া অবধি ট্যাক্সি ভাড়া লইতেছে একশত টাকা হইতে দুইশত টাকা পর্যন্ত, কুলিরা মোট পিছু সাত আট টাকা পাইতেছে। ঘোড়ার গাড়ি একশ'র কম নাই।

কিন্তু হাওড়াতে নামিয়া দেখা গেল স্টেশন ঠিকই আছে। ডালহাউসি স্কোয়ারের একটা বাড়িতে বোমা পড়িয়াছে, তাহারও সবটা উড়িয়া যায় নাই। আগের দিন হাতীবাগান বাজারে বোমা পড়িয়া নাকি দুই-একজন লোক মারা গিয়াছে।

যেহেতু তাহারা হাওড়া হইতে শহরে যাইতেছে, তাহারা খুব কম মূল্যেই ট্যাক্সি পাইল। কলিকাতা যেন এই কয় রাত্রিতেই শ্মশান হইয়া গিয়াছে। আর পলায়নের যে দৃশ্য তাহাদের চারিদিকে দেখা গেল, তাহাতে যেমন দুঃখ হয় তেমনি লজ্জাতেও মাথা কাটা যায়।

ভূপেন ব্যথিত কণ্ঠে কহিল, এত বড় শহরে ক'টা লোকই বা মরেছে, তাতেই এই! মৃত্যু যেন আর কখনও কেউ দেখে নি! সেবার ভূমিকম্পে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে বিহারের কত লোক গেল—এক-একটা মহামারীতে কী অসংখ্য লোক মরে! এমনি পালাতে গিয়ে অ্যাক্সিডেণ্টে আর রোগে যা মরছে তার সিকিও বোমায় মরে নি এখনও। তবু কি ভয়—একটা অবোধ অহেতুক ভয়। আর কী ভাবে এই ভয়ের সুযোগ নিচ্ছে ট্যাক্সিওলা, গাড়োয়ান আর কুলীরা, অথচ দেখ সেদিনই কাগজে পড়ছিলুম—লণ্ডনে এক এক রাত্রে কত টন ক'রে বোমা পড়েছে, তবু শহর এখনও তার কাজ-কর্ম নিয়ে অটল আছে। সেদিন একটা সুন্দর কাফিখানায় বোমা পড়ে কত লোক মারা গেল, আবার সেই জঞ্জালগুলো একটু সরিয়ে তার ওপর কোনমতে একটা তাঁবু খাড়া করে সেইখানেই কাফিখানা খোলা হয়েছে।

সন্ধ্যাকে তাহাদের বাড়ি পৌঁছাইয়া দিয়া আসিয়া দেখিল, তাহাদের বাসারও নিচের তলা হইতে বহু ভাড়াটে সাময়িক ভাবে সরিয়া পড়িতেছেন। তবে আগের বারের চেয়ে অনেক কম। অবিনাশবাবু সেবার মেয়ে-ছেলেদের দেশে পাঠাইয়া বহু টাকা খরচ করিয়াছিলেন, তারপর ডাক্তারে ও চিকিৎসাতেও ঢের টাকা ব্যয় হইয়াছে। সুতরাং এবার আর কোথাও পাঠাইবার চেষ্টা করেন নাই, ভয়ে কাঠ হইয়াও কোনমতে টিকিয়া আছেন। উপেনবাবুও যথেষ্ট ভয় পাইয়াছেন—কিন্তু ভয় যতই হোক, টাকাকড়ির অবস্থা আরও শোচনীয় বলিয়া সেকথা আর তুলিলেন না।

এবার আগের বৎসরের মত কলিকাতা খালি হয় নাই সত্য কথা তবু ভূপেনের

বুক শুকাইয়া উঠিল। সেবার সব চেয়ে কষ্ট গিয়াছে তাহাদেরই। ছেলেরা সকলে চলিয়া গেল, যে ইস্কুলে মোট ছাত্রসংখ্যা বারোশ', সে ইস্কুলে রোজ হাজিরা পড়িতে লাগিল চল্লিশ-পঞ্চাশটি ছেলের। মাহিনা আদায় হয় না, মাস্টার মহাশয়দের মাহিনায় টান পড়িল। প্রথম মাসে সেক্রেটারী আদেশ দিলেন শতকরা পঞ্চাশ টাকা, পরের মাসে চল্লিশ, তারপর আরও কমিয়া শতকরা কুড়ি টাকায় দাঁড়াইল। অর্থাৎ ভূপেনের মাহিনা ছিল সত্তর, সে পাইতে লাগিল চৌদ্দটি টাকা। যদিও ইস্কুলের বিল্ডিং-ফণ্ডে সাতাত্তর হাজার টাকা জমা ছিল—ঐ পাড়াতে কোথাও জমি বা বাড়ি পাওয়া যায় নাই বলিয়া বাড়ি করাও হয় নাই—সে টাকাটা হইতে স্বচ্ছন্দে এই সব দুঃস্থ শিক্ষককে বাঁচানো যাইত। কিন্তু যেহেতু সে রকম কোন আইন ইতিপূর্বে প্রণয়ন করা হয় নাই, এইজন্য ইহার একটি পয়সাতেও সেক্রেটারী হাত দিতে দিলেন না। এধারে প্রশান্তরা ছিল না, টিউশ্যনির টাকাও বন্ধ। প্রশান্তর বাবা প্রথম মাসে টাকাটা বাড়িতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, পরের মাসে তিনিও আর পাঠান নাই, ভূপেনও লজ্জায় চাহিতে পারে নাই। হয়ত তিনি পাঠাইলেও তাহাকে ফেরত দিতে হইত। কিন্তু চলে কিসে? বহু মাস্টার মহাশয়কে সে সময় স্ত্রীর সামান্য গহনাপত্র হইতে শুরু করিয়া ঘটিবাটি পর্যন্ত বেচিতে হইয়াছে। ভূপেনকেও উপবাস করিতে হইত, তার চেয়েও বড় কথা—ওধারে কল্যাণীরাও বোধ হয় উপবাস করিত, যদি না উপেনবাবু অফিস হইতে কিছু টাকা পাইতেন। সমস্ত লাজলজ্জার মাথা খাইয়া শেষ পর্যন্ত সেই টাকা হইতেই কল্যাণীদের খরচ চাহিয়া লইতে হইয়াছে, সেজন্য উপেনবাবু অবশ্য কম কথা শোনান নাই, কিন্তু উপায় কি? এই সম্মানটুকু বিসর্জন না দিলে শেষ অবধি হয়ত আরও সম্মান ত্যাগ করিতে হইত—সন্ধ্যার কাছে ধার চাহিতে হইত। মানুষের আদর্শবাদ, তাহার সম্মানবোধ, তাহার নীতিজ্ঞান সমস্তই ততক্ষণ বজায় থাকে যতক্ষণ না স্ত্রী-পুত্র উপবাস করে। সেটা, সন্তান হইবার পর, ভূপেন ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে—বুঝিয়াছে মানুষ কী দুঃখে চুরি ডাকাতি করে!

সুতরাং দিনে পেভ্‌মেণ্টের দুধার ধরিয়া পলায়নপর জনতা এবং রাত্রের শ্মশানবৎ নিস্তব্ধ কলিকাতা শহরের দৃশ্য দেখে আর ভূপেনের বুকের রক্ত দুর্ভাবনায় জল হইয়া যায়! আবার যদি তেমন হয়? এবার উপেনবাবুর অফিসেও ধার পাইবার সম্ভাবনা নাই। সকলকে না খাইয়া মরিতে হইবে হয়ত, বিশেষ করিয়া সেই সুদূর পল্লীতে যে প্রাণীগুলি উহারই মুখ চাহিয়া আছে, তাহাদের অবস্থা কল্পনাও করা যায় না। তাহারা আগেই মরিবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এবারের পালা অল্পেই শেষ হইল ; মধ্যবিত্তরা সেবার অহেতুক ভয়ে পলাইতে গিয়া অনেকে ধনেপ্রাণে মরিয়াছিলেন—এবার তাই বোমা খাইয়াও অনেকে রহিয়া গেলেন। ছাত্রসংখ্যা কমিয়া গেল বটে, তবে সেবারের মত নয়।

ইতিমধ্যে কিন্তু আর একটি দুঃসংবাদ তাহার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। রাখুর পরের ভাইটি টেস্টে ফেল করিয়াছিল, সহসা সে গ্রামের আর একটি ছেলের সঙ্গে কোথায় পলাইয়া গেল। রাখুর এবারই ইণ্টারমিডিয়েট দিবার কথা—সংবাদটাতে তাহারও পরীক্ষার ক্ষতি হইতে পারে ; তাছাড়া কল্যাণীকে কাছে আনিবার সম্ভাবনাটা যেন কেবলই পিছাইয়া যাইতেছে। রাখু যদি আই. এ.-টাও ভালভাবে পাস করে, তাহা হইলে আবার বি. এ-পড়াইবার প্রশ্ন উঠিবে। স্বভাবতই মনে হইবে—এত কাণ্ড করিয়া সামান্য দুইটা বৎসরের জন্য সব মাটি হইবে? মেজো শালা আশুর যে বেশী লেখাপড়া হইবে না তাহা সে আগেই বুঝিয়াছিল—তাই ইচ্ছা ছিল কোনমতে ম্যাট্রিক পাস করিলে মহেশবাবুর প্রতিশ্রুত চাকরিটা আশুকেই পাওয়াইয়া দিবে। তাহাতে খরচের দায় যেমন কতকটা কমিত, প্রয়োজন হইলে রাখুর বিবাহটাও সেই ভরসায় দেওয়া চলিতে পারিত। সব যেন ওলট-পালট হইয়া গেল।

যে চিঠিতে এই খবরটা কল্যাণী দিয়াছিল, সেই চিঠিরই শেষে কয়েকটি লাইন ভূপেন বার-দুই মনোযোগ দিয়া পড়িল। কল্যাণী লিখিয়াছে—

কলকাতায় বোমা পড়বার কথা শুনে ক'দিন যে কীভাবে কেটেছে তা একমাত্র অন্তর্যামীই জানেন। চিঠি লিখে দিয়েছিলুম সঙ্গে সঙ্গেই—কিন্তু তা যে কোনদিন পৌঁছে উত্তর আসবে এমন আশা করি নি। খবর নেবার লোক নেই, কলকাতার দিকেই কেউ যেতে চায় না। ভেবে ভেবে পাগলের মত হ'তে বসেছিলুম। তাও যদি ভাবনাটা ভাগ ক'রে নেওয়ার উপায় থাকত। বাবা ত ঐ নির্বিকার, সব কিছু ভগবানের উপর বরাত দিয়ে বসে আছেন। শেষে তিনদিন পরে মেজঠাকুরঝির চিঠি এসে পৌঁছল তবে বাঁচলুম। চিঠিখানা অবশ্য বোমা পড়বার প্রথম দিনই লেখা, তাতে ওসব খবর কিছুই ছিল না, তবু তুমি ওখানে নেই—সন্ধ্যাদির সঙ্গে কোথায় বেড়াতে গিয়েছ শুনে আর অতটা ভাবনা রইল না। জানি যে এ খবর পেলে সন্ধ্যাদি তোমাকে একা ফিরতে দেবেন না, তুমিও তাঁকে এ বিপদের মধ্যে টেনে আনতে পারবে না, কাজেই অন্ততঃ তোমাদের জন্যে আর ভয় নাই। সত্যি সন্ধ্যাদির কাছে আমার ঋণ বেড়েই যাচ্ছে। আমি অভাগী, তোমার কোন কাজে লাগলুম না, বরং শক্ত লোহার বেড়ী দিয়ে চিরকালের মত অন্ধকূপে বেঁধে

রাখলুম। তোমার উন্নতির আশা রইল না, তোমার উপযুক্ত কাউকে বিয়ে করবে সে আশাও নেই। তোমার সাধনা কত বড়, কত উঁচুতে ওঠার কথা তোমার —এসব যত ভাবি ততই যেন লজ্জায় মাথা মাটির সঙ্গে মিশে যায়। দেশ-বিদেশ বেড়াতে যাওয়ার কত শখ তোমার তা-ও জানি। শুধু শখই বা কেন, প্রয়োজনও ত বটে। এই বয়সে এত বড় বোঝা ঘাড়ে ক'রে খেটে খেটে তোমার শরীর আর মনের যা অবস্থা হয়েছে তা খানিকটা বুঝতে পারি। তাই সন্ধ্যাদি তোমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে পেরেছেন শুনে শুধু যে নিশ্চিন্ত হলুম তাই নয়, বড় আনন্দও হ'ল। এই ক'টা দিন বিশ্রাম আর মনের শান্তি—এর মূল্য কি কম? খোকাটা বড্ড অবুঝ, বাবা ওকে কেবল আদর করবার সময় বলতেন কিনা "এই তোর বাবা এল বলে। ছুটি হ'লেই আসবে।" সে কেবলই তাই জিজ্ঞাসা করে "মা, বাবা এলো না? মা বাবা?" যাই হোক—কলকাতায় আর হাঙ্গামা নেই ত? সন্ধ্যাদির শরীর বেশ ভাল আছে ত? তাঁকে আমার কথা ব'লো। ব'লো যে আমি তাঁর কাছ থেকে হাত পেতে চিরকাল নিয়েই গেলাম—কিন্তু তাঁকে শোধ দেবার ক্ষমতা নেই। হয়ত দেবার উপায় আছে এখনও। এক এক সময় মনেও হয়, কিন্তু আমি বড়ই স্বার্থপর, শেষ পর্যন্ত সে ইচ্ছেও করে না।

কী জানি কি লিখলুম আবোল-তাবোল—বড় ভয়, পাছে তুমি রাগ করো। তুমি রাগ ক'রো না, লক্ষ্মীটি।

ভূপেন চিঠিখানা নামাইয়া রাখিয়া আপন মনেই একটু হাসিল।

বেচারী কল্যাণী! ঈর্ষা ও অভিমান, স্ত্রীলোকের যা সহজাত, তাহাকে চাপিয়া রাখিবার কী প্রাণপণ চেষ্টাই করিয়াছে সে। যেটা সত্য তাহাকে বিশ্বাস করিবার চেষ্টাও কম করে নাই। তবু মানুষের মন—মানুষেরই মন, সে তাহার কাজ করিয়া যাইবেই।

প্যাড ও কলমটা টানিয়া লইয়া ভূপেন কল্যাণীকে খুব মিষ্ট একখানা চিঠি লিখিতে বসিল। উৎপলা ইচ্ছা করিয়াই যে অনিষ্টটি করিয়াছে, বৌদির কাছে যে বিষটি প্রেরণ করিয়াছে, তাহার জ্বালা সম্পূর্ণ না হোক, কতকটা দূর করিতে পারিবে, সে বিশ্বাস তাহার আছে।

৩০

পাইকারী পলায়নের ধাক্কাটা একটু সামলাইতে না সামলাইতে চালের দর যেভাবে বাড়িতে লাগিল তাহাতে আবার ভূপেনের বুক শুকাইয়া উঠিল। তাহার এই বয়সের মধ্যে দুর্ভিক্ষ সে দেখে নাই—মন্বন্তর কাহাকে বলে সে সম্বন্ধেও কোন

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না। আর সত্য-সত্যই যে এত বড় মন্বন্তর আসিতেছে তাহা অনেকেই বুঝিতে পারে নাই। সেজন্য নেতারাও কতকটা দায়ী—সব চেয়ে দায়ী তখনকার তথাকথিত মন্ত্রীমণ্ডলী, তাঁহারা শেষ পর্যন্তও সম্ভাবনাটাকে অস্বীকার করিয়াছেন।

কিন্তু চালের দাম বাড়িতে বাড়িতে যখন চব্বিশ-পঁচিশ টাকায় দাঁড়াইল তখন ভূপেন বিচলিত না হইয়া পারিল না। ওধারে কল্যাণী চিঠি লিখিয়াছে যে তাহাদের দেশ হইতে চাল প্রায় অদৃশ্য হইতে বসিয়াছে—এখনও কিছু কিনিয়া রাখিলে হয়ত কিছুদিন উপবাসটা বন্ধ থাকিতে পারে। ছেলেকে কি ভাবে বাঁচাইবে তাও সে জানে না—কারণ অর্থের অভাবে সবাই গরু-বাছুর বেচিতে শুরু করিয়াছে, কিছুদিন পরে দুধও মিলিবে না।

অথচ কীই বা করা যায়? তাহার মাহিনা ও দুইটা টিউশ্যনি মিলিয়াও পুরা দেড়শো টাকা আয় হয় না। জিনিসপত্রের দাম যেভাবে বাড়িতেছে তাহাতে এই আয়ে দুটা সংসার চালানো অসম্ভব। উপেনবাবুর মাহিনার সবটাই প্রায় অফিসের দেনাতে চলিয়া যায়, তিনি নিজের হাত-খরচ বাদে কুড়ি-পঁচিশ টাকার বেশী ছেলেকে দিতে পারেন না। এই টাকা হইতে চল্লিশটি টাকা পাঠাইতে হয় কল্যাণীদের। তাহাতেও সংসার চলিবার কথা নয়, কারণ ছেলের খরচ অনেক-খানি। তবু নুন-ভাত খাইয়াও তাহারা কোনরকমে চালায়। মায়ের গায়ে গহনা কোনদিনই ছিল না, যা সামান্য দুই-এক কুঁচি সোনা ছিল তাও শান্তির বিবাহে চলিয়া গিয়াছে। তাহার ইস্কুলেও কিছু দেনা হইয়াছিল—সেটা এখনও সম্পূর্ণ শোধ হয় নাই। সুতরাং সত্তর টাকার মধ্যে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ও ঋণের টাকা কাটিয়া সেও যা পায় তাহা ভদ্রসমাজে বলিবার মত নহে।

শেষ পর্যন্ত সে উপেনবাবুরই শরণাপন্ন হইল। অফিসের কতকটা ঋণ ত শোধ হইয়াছে—এখন আবার নতুন ঋণ খানিকটা লওয়া যায় না কি?

উপেনবাবু তখনও মন্বন্তরের চেহারাটা বুঝিতে পারেন নাই—তাঁহার তখনও আশা ছিল যে, এতটা দাম থাকিবে না, শীঘ্রই কমিবে। সুতরাং প্রথমে তিনি কথাটা গায়ে মাখেন নাই। পরে অনেক পীড়াপীড়িতে খবর লইয়া আসিয়া বলিলেন যে, অন্তত আরও দুই শত টাকা শোধ দিলে শ'পাঁচেক টাকা পাইতে পারেন।...আরও দুই শত টাকা! কোথায় পাইবে অত টাকা? সম্ভব অসম্ভব বহু জায়গার কথাই সে মনে করিল কিন্তু এতগুলি টাকা এখন ধার দিতে পারে এমন লোক কেহ নাই। অথচ তিনশ' টাকা হাতে পাইলে তবু শ-খানেক টাকা ওখানে পাঠাইয়া এখানেও মণ আষ্টেক চাল কিনিয়া রাখিতে পারে॥

কিন্তু এত টাকা কে দিবে? বিশুর আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। তাহার সহকর্মী মাস্টার মহাশয়দের অবস্থা তো আরও খারাপ। তাহার মাথার উপরে বাবা আছেন—কিছুটা সাহায্য নিশ্চয়ই হয় কিন্তু সে সুযোগ তাহাদের অনেকেরই নাই। দুশ্চিন্তায় সকলেরই মুখ কালি, সকলেই গম্ভীর। সন্ধ্যাও এখানে নাই—সে ইতিমধ্যেই ডুমকাতে তাহার নূতন পরিকল্পিত বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য বাড়ি করিতে শুরু করিয়াছে—সরকার মশাই, দারোয়ান প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া সে নিজে গিয়াছে কনট্রাক্টরদের কাজ তদারক করিতে। থাকিলেও, তাহার কাছে চাহিতে কি জানি কেন আজও মন সরে না।

অবশেষে দু-তিন রাত্রি পর পর বিনিদ্র কাটাইয়া শেষে সে প্রশান্তরই শরণাপন্ন হইল। প্রশান্ত ছেলেটি ভাল—পদন বা সালেকদের মত শিক্ষা সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ আগ্রহ নাই সত্য কথা—এবং তাহার সিনেমাপ্রীতি, বিলাসপ্রিয়তাও সম্পূর্ণ তাড়াইতে পারা যায় নাই এ-ও ঠিক, তবু ছাত্র হিসাবে অনেকের চেয়েই ভাল। ভূপেনের প্রাণপণ চেষ্টায় সে অনেকটা মানুষ হইয়া উঠিয়াছে, সত্যকার লেখাপড়াও শিখিয়াছে কিছু। প্রশান্তর বাবা প্রকাশ্যেই ভূপেনের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন বহুবার—আমার অফিসের অনেক গ্র্যাজুয়েট কেরানীর চেয়েও বেশী শিখে ফেলেছে দেখছি শান্ত—এ আপনারই বাহাদুরি মাস্টার মশাই। বাস্তবিক, এত কখন শেখালেন? লিলিটাও যেমন পড়াশুনা করছে, তাতে মনে হয় ওরও স্কলারশিপ পাবার চান্স আছে। নাঃ, আপনি অসম্ভবকে সম্ভব করলেন—আপনার কাছে আমার ঋণ ভোলবার নয়।

প্রশান্ত ম্যাট্রিক দিয়াছে—স্কলারশিপ পাইয়াই পাস করিবে আশা করা যায়। সুতরাং এ বাড়ির টিউশনি যাওয়ারই কথা ছিল, কিন্তু কর্তা ছাড়েন নাই। বলিয়াছেন—আপনি লিলিকে এতকাল বিনামূল্যে পড়ালেন, এবার থেকে ওর জন্যেই আসতে হবে আপনাকে। তা ছাড়া শান্ত সায়ান্স নিলেও ওর ইংরেজী বাংলা এগুলো আপনি দেখিয়ে দেবেন। তার জন্য আপনাকে একটু বেশী টাকাও নিতে হবে—এখন থেকে বলে রাখছি। ভূপেনও অবস্থা বুঝিয়া প্রতিবাদ করে নাই। অর্থের অভাবে সে যে আগের চেয়ে কত ছোট হইয়া গিয়াছে—এইটাই তার অন্যতম প্রমাণ।

কিন্তু প্রশান্ত পদনের মত ভক্তিমান না হইলেও তাহার সহিত এমন একটা অন্তরঙ্গতা গড়িয়া উঠিয়াছে যাহাতে তাহাকে বন্ধুর পর্যায়েও ফেলা যায় অনায়াসে। ভয় ও ভক্তির ভাবটা কম বলিয়াই বোধ হয় প্রীতিটা এত বেশী হইয়া উঠিতে পারিয়াছে। সুতরাং অন্য কাহাকেও বলার চেয়ে প্রশান্তর কাছে কথাটা বলাই

সহজ বলিয়া মনে হইল। সে সমস্ত কথাই খুলিয়া বলিল প্রশান্তর কাছে। প্রশান্ত যদি কথাটা বাবাকে বলিয়া দিন-পনেরোর জন্য এই দু-শ'টি টাকা দিতে পারে, তাহা হইলে এতগুলি প্রাণীর জীবনরক্ষা হয়।

প্রশান্ত সব শুনিয়া কহিল, আপনাদের মাসে ক'মণ চাল লাগে মাস্টারমশাই?

একটু হিসাব করিয়া ভূপেন কহিল, অন্তত মণ-দেড়েক।

—তাহ'লে আট মণে কি হবে? আপনি এক কাজ করুন বরং—এ দু-শ' টাকা ফেরত দেবার চেষ্টা করবেন না এখন, কেননা এর জন্য বাবাকে বলতে হবে না, এটা আমিই দিয়ে দেব। তিনি জানতেও পারবেন না। আমার নামে একটা ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউন্ট আছে, আমার হাত-খরচার টাকা বাবা একেবারে সেইখানেই পাঠিয়ে দেন। সত্যিই, নগদ টাকা হাতে পেলে বোধ হয় সবটাই খরচ করতুম—এতে ক'রে কিন্তু প্রায় হাজার টাকা জমেছে আমার। হ্যাঁ যা বলছিলুম, আপনি এই টাকাটা আপনার বাবাকে দিয়ে পাঁচশ' টাকাই বার ক'রে নিন, তারপর সব টাকাটা দিয়ে চাল কিনে ফেলুন। যেমন ভাবে ওটা শোধ হবে, তেমনি ভাবে এটাও হবে'খন পরে।

কথাটা খারাপ লাগিল না ভূপেনের। কল্যাণীদের কিছু বেশী টাকা তাহা হইলে পাঠানো যায়। ছাত্রের কাছে টাকা ধার করা খুবই লজ্জার কথা কিন্তু প্রশান্তর মধ্যে একটি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল মন আছে তাহা জানে বলিয়াই সে আদৌ কথাটা পাড়িতে পারিয়াছে। দিতে দেরি হইলে সে সত্যই কিছু মনে করিবে না—তাহার কোন ক্ষতিবৃদ্ধিও হইবে না। বরং কাহাকেও এমন কি বাবাকেও জানাইবে না সে। তাহা হইলে তিনি আবার ঐ টাকা হইতে কিছু বাজে খরচ করিয়া ফেলিবেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এত টাকার প্রয়োজন হইল না। টাকাটা লইয়া বাড়ি ফিরিয়াই সে কল্যাণীর একখানা চিঠি পাইল। তাহাতে বিচিত্র একটি সংবাদ দিয়াছে সে। লিখিয়াছে—

তোমাকে চমকে দেবার মত একটা খবর আছে। হঠাৎ কাল কোথা থেকে সন্ধ্যাদি এসে হাজির। শুনলাম দুমকার কাছে কোথায় নাকি সে কী ইস্কুল করেছে, সেইখানে এসেছিল। এই পথেই যেতে হয় বলে এখানে নেমেছে। কিন্তু শুধু তাই নয়—তার সঙ্গে চার বস্তা ধান, এক বস্তা কলাই। বললে যে তার নাকি এখানে অনেকটা জমি ছিল, এতদিন প্রজারা কেউ কিছু দেয় নি। এবার এই বাড়ি করতে গিয়ে জোর করে ধান আর ডালের কলাই আদায় করেছে—তাই পথে আমাকে চারটি উপহার দিয়ে গেল। বললে—এ আমার ক্ষেতের জিনিস, এতে ত আর

কোন অর্থব্যয় নেই, সুতরাং নিতে সঙ্কোচ বোধ করছেন কেন? এতে মাস্টার মশাই কিছু রাগ করবেন না। সে জোর ক'রেই দিয়ে গেল একরকম। আমার যে কী করা উচিত ছিল তা বুঝতে পারছি না। অথচ যার কাছে আমাদের ঋণের শেষ নেই, তাকেই বা মুখের উপর 'না' বলি কি ক'রে? কিন্তু আমার বড্ড লজ্জা করছে—মনে হচ্ছে এ অঞ্চলে চালের যে রকম অবস্থা হয়েছে, সব শুনে সে হয়ত কিনেই দিয়ে গেল এইভাবে। যাই হোক্, এখন ত আর কোন উপায় নেই, যা করা উচিত তুমি লিখে জানাও পত্রপাঠ।

এবারও সেই সন্ধ্যা। তাহার এই চরম সঙ্কট-মুহূর্তে শেষ পর্যন্ত সেই সন্ধ্যাই নিঃশব্দে তাহাকে সব চেয়ে বড় দুশ্চিন্তা হইতে মুক্তি দিয়া গেল। আজও সে এতটুকু বদলায় নাই—আজও তেমনি সে অতন্দ্র মনোযোগে তাহারই কল্যাণ চিন্তা করিয়া চলিয়াছে।

বহুদিন পরে স্নেহে, কৃতজ্ঞতায়, আনন্দে তাহার চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল। মনে মনে বলিল, সন্ধ্যা তুমি সুখী হও, আমি আশীর্বাদ করছি—আমার কথা তুমি যেন ভুলে যেতে পারো।

ভূপেন একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইল বটে, কিন্তু সারা বাংলাদেশ জুড়িয়া যমদূতের যে নৃত্য শুরু হইল তাহা ভুলিবার নয়। দলে দলে লোক কলিকাতার দিকে আসিতে লাগিল—পথঘাট মৃতদেহ ও মুমূর্ষুতে বোঝাই হইয়া উঠিল। এক এক সময় তাহার মনে হয় এ দুর্ভিক্ষ স্বেচ্ছাকৃত—যুদ্ধের চাকরিতে খাদ্য আছে ও অর্থ আছে—মনস্তত্ত্বের এই বিশেষ মুহূর্তে সেই কথাটা স্মরণ করাইয়া যথেষ্ট লোক টানা যাইতে পারে। স্বেচ্ছাকৃত যদি না হয়, কর্তৃপক্ষের অক্ষমতার যে চূড়ান্ত নিদর্শন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই! সব চেয়ে অবাক হইয়া গেল সে, এ দেশের লোকের সহনশীলতা দেখিয়া। লক্ষ লক্ষ লোক ফ্যান চাহিয়া, ডাঁটার ছিব্‌ড়া চিবাইয়া ক্ষীণকণ্ঠে চীৎকার করিতে করিতে মরিয়া গেল, তবু একটা ধনীর গৃহ লুঠ হইল না —সমস্ত শস্যভাণ্ডার অক্ষত রহিল। খাবারের দোকানে মাত্র একটি কাচের ব্যবধানে রসনা-তৃপ্তিকর অজস্র মিষ্টান্ন সাজানো, ঠিক তাহারই সামনে কত মুমূর্ষু খাদ্যাভাবে অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ করিল, তবু সে কাচের ব্যবধান ভাঙিল না—ধনী ও অবস্থাপন্ন লোক, যাহাদের এক সম্প্রদায়ের উগ্র অর্থ-লোলুপতার ফলেই এতগুলি লোকের অকালমৃত্যু ঘটিল তাহারা ব্যাপারটা টেরও পাইল না। কে বলিবে এ দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। বরং যেসব লোক একসময়ে কালোবাজারে চাল ধরিয়া লক্ষপতি হইয়াছেন, তাঁহাদের কাছে যৎসামান্য করুণাভিক্ষা করিয়া বহুস্থানে ক্ষুদ ও ডালের (বাজরা মিশ্রিত) খিচুড়ি-ভোগের 'ক্যানটিন' বা খাদ্যশালা খোলা হইল, আর

সেই সামান্য অনুগ্রহের জন্যই কৃতজ্ঞতার ঢক্কানিনাদ করিয়া বেড়াইলেন নেতারা।

আরও অবাক হইয়া গেল ভূপেন ছাত্রদের ব্যাপার দেখিয়া। এই সময়ে ছাত্রদের একটা কিছু করণীয় আছে নিশ্চয়ই। তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইলে দেশের এ পাপ, এ কলঙ্ক অবশ্যই কিছুটা দূর হয়। চাল একেবারে দেশ হইতে অদৃশ্য হইয়া যায় নাই, তেমন হইলে পঞ্চাশ টাকা ষাট টাকা দর দিলে পাওয়া যায় কি করিয়া? সাত-আট টাকায় কিনিয়া যাহারা কুড়ি-পঁচিশ টাকায় বেচিয়াছে, তাহারাই আবার ফাটকার লোভে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশে কিনিয়া পঞ্চাশ-ষাটে দাম চড়াইয়া দিয়াছে। ইহাদের জব্দ করার জন্য সরকারের মুখ চাহিয়া থাকা বৃথা, কারণ এই সরকার বড়লোকেরই বশে। ওধারে বহু সরকারী শস্যের গুদামে লক্ষ লক্ষ মণ চাউল ধরা আছে—আর দুদিন পরেই পচিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে। এ অনাচারের বিরুদ্ধে একটা সঙ্ঘবদ্ধ অভিযান নিশ্চয়ই চালানো যাইত। আর এ রকম অভিযান অন্য সব দেশে শুরু করিয়াছে ছাত্ররাই—তাহারাই চিরকাল এই সব ব্যাপারে পথ দেখাইয়াছে।

অথচ এখানে সে দেখিয়া অবাক হইল, যে-পথের দুপাশের পেভ্‌মেণ্ট কঙ্কালাবশিষ্ট মৃতদেহে ছাইয়া আছে, তাহারই উপর দিয়া দলে দলে কলেজের ছাত্র মুখে বিদেশী স্নো এবং পাউডারের প্রলেপ মাখিয়া সিগারেট হাতে নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বিগ্ন মনে রেস্তোরাঁ যাইতেছে কিংবা সিনেমার টিকিট কিনিবার জন্য ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সমাজের এমন এক চরম দুঃসময়ে তাহাদের যে কিছু কর্তব্য আছে সেকথা বোধ করি একজনেরও মনে আসে নাই।

এই সব দেখে আর ভূপেনের মন হতাশায় ভরিয়া ওঠে। এখানে সে শিক্ষকতা করিতে চায়, এই দেশের ছেলেদের মানুষ করিতে চায়? ছিঃ! এ শুধুই সময় নষ্ট করা। এই সময়টা কেরানীগিরি করিলে সে অন্তত আর্থিক ব্যাপারে ইহার চেয়ে বেশী উন্নতি করিতে পারিত। তাহার মনে পড়ে ডাঃ দাসগুপ্তের কথা। অনেকদিন আগে, ছাত্রাবস্থায় একবার সে সংস্কৃত কলেজে গিয়াছিল বক্তৃতা শুনিতে। বিখ্যাত দার্শনিক সুরেন্দ্র দাসগুপ্ত তখন সেখানকার অধ্যক্ষ। আরও কে কে ছিলেন—অনেক ভাল ভাল কথা শুনিয়াছিল সেদিন—সব মনে নাই। শুধু একটি কথা সেদিন বড় খারাপ লাগিয়াছিল বলিয়াই আজও মনে আছে, ডাঃ দাসগুপ্ত ছাত্রদের সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমরা কি মানুষ? তোমাদের দেহে সব মাছের রক্ত! উপনিষদের ছাত্ররা প্রার্থনা করেছিল, 'সহ বীর্য্যং করবাবহৈ'—'তেজস্বিনা বধীতমস্তু' তোমাদের সে বীর্য কোথায়, সে তেজ কোথায়? বিদ্যা দুর্বলের নয়,—বীর্যবান, তেজস্বীদের জন্য বিদ্যা। প্রাচীনকালে ছাত্রদের বিদ্যানুরাগ কিছুই কি

তোমাদের অবশিষ্ট নেই? ছাত্ররা তখন শিক্ষার জন্য কষ্টস্বীকার করত, সহিষ্ণুতার পরিচয় দিত। গুরুগৃহে দাসত্ব ক'রেও শ্রদ্ধার সঙ্গে বিদ্যা গ্রহণ করত। জ্ঞান বা শিক্ষা তোমাদের মত সর্বপ্রকার ক্লেশ-স্বীকারে পরাঙ্মুখ ছাত্রদের জন্য নয়। তোমাদের ছাত্র কল্পনা করলে শিক্ষকতার এ আচার্যপদে ধিক্কার আসে!"

কথাগুলি সেদিন খুবই খারাপ লাগিয়াছিল—আজ ভাবে, তিনি অন্যায় কিছুই বলেন নাই। এ তিরস্কার তাহাদের প্রাপ্য ছিল।

এক-একবার ভাবে, ইহাদেরই বা দোষ কি? যে অশিক্ষা ও কুশিক্ষায় এই অধঃপতন সম্ভব হইয়াছে, শিক্ষা-বিতরণের নাম করিয়া সেই অপূর্ব বস্তুটি যাঁহারা পরিবেশন করিতেছেন—দোষ তাঁহাদেরই। আবার মনে হয়—তাই বা কেমন করিয়া হয়! সে শিক্ষার বিরুদ্ধেও ত ইহারা বিদ্রোহ করিতে পারে। দেশ, সমাজ ও জাতি কোথায় নামিয়া আসিয়াছে—তা এই ছাত্রদের একজনও কি উপলব্ধি করে না, চাহিয়া দেখে না?

কিন্তু কৈ, কোথাও সে সচেতনতা চোখে পড়ে না তো! যদিও থাকে সে কল্কি-অবতার ইহাদের মধ্যে, সে প্রচ্ছন্ন আছে, ভূপেন মনে মনে তাহারই আবির্ভাব প্রার্থনা করে।

বাহিরে দেখে যাহারা কয়দিন আগেই জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার জন্য বিদেশী রাজশক্তির কাছে লাঞ্ছিত হইয়াছিল তাহারাই সেই রাজশক্তির সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য যুদ্ধে চাকুরি লইয়া প্রাণপণ চেষ্টায় কেমন সাহেব হইয়া উঠিতেছে। কিছুদিন আগেও বিলাতী জিনিস কিনিতে সঙ্কোচ বোধ করিত, অথচ এখন আর যেন বিলাতী জিনিস না হইলে চলে না। যত কালোবাজারে মুনাফা বাড়াইয়া বিলাতী জিনিস দুষ্প্রাপ্য হইতেছে, তত এই ক্ষুদে সাহেবদের সেই জিনিসেই আসক্তি বাড়িতেছে। শুধু ইহাদের কেন—যুদ্ধের দৌলতে জনসাধারণও যেন এত দিনের এত কৃচ্ছ্রসাধন, এত ত্যাগস্বীকার সব ভুলিয়া গেল। বিলাতী জিনিস ব্যবহারই আবার একটা আভিজাত্যের লক্ষণ হইয়া উঠিয়াছে। সামান্য মাহিনার কেরানীও সাহেবী পোশাক পরিয়া অফিসে যাইতে শুরু করিয়াছে। দেশীয় সামরিক কর্মচারীরা দাঁড়ানোর ভঙ্গি হইতে শুরু করিয়া টুপি পরা ও চলনে পর্যন্ত প্রাণপণে নকল করিবার চেষ্টা করিতেছে টমিদের—ওদের দেশে যাহারা নিম্নস্তরের অশিক্ষিত লোক বলিয়া অবজ্ঞাত; আর অসামরিক কেরানীরা সিগারেট খাওয়ায় ও মাথা নাড়িয়া কথা বলিবার ধরনে সাহেবী আমেজ আনিতে পারিলে নিজেদের ধন্য মনে করিতেছে।

এ সব যত ভাবে ততই ভূপেনের মন দমিয়া যায়, নিজের পথ ও আদর্শবাদ

সম্বন্ধে দ্বিধা জাগে মনে।

তাহাদের বাসার অবিনাশবাবু ইতিমধ্যেই নিজের বাড়ি কিনিয়া চলিয়া গিয়াছেন। যুদ্ধের দৌলতে হঠাৎ ভদ্রলোকের কাঁচা পয়সা হইয়াছে। সিভিল সাপ্লাই বিভাগের সঙ্গে তাঁহার কী একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে, মিলিটারী ঠিকাদারীতেও ঠোকর মারেন ভদ্রলোক। একটা মোটর কিনিয়াছেন, আর একটা শীঘ্রই কিনিবেন। হঠাৎ কোথা দিয়া যে কি হইয়া গেল, ভূপেন যেন ভাবিয়াও পায় না। অবিনাশবাবু অবশ্য বরাবরই তাহার হিতাকাঙ্ক্ষী, তাহাকে যাইবার সময় বার বার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, বাবাজী নেমে পড়ো, নেমে পড়ো এইবেলা, পয়সা বাতাসে উড়ছে। নইলে পস্তাবে—এর পর খেতে পাবে না। দিনকাল যা আসছে, ওসব ইস্কুল-মাস্টারি-ফাস্টারী আর চলবে না। তার চেয়ে এইতেই লেগে পড়ো। মজার কল রে বাবা—ঘুষ আর চুরি, চুরি আর ঘুষ—এইতেই সমস্ত ব্যাপারটা চলছে। সেই ওপরের অফিসার থেকে নিচের দারোয়ানটি পর্যন্ত দু-হাতে লুটছে—আমরাই বা চুপ ক'রে থাকি কেন বলো? এতগুলো লোক যদি নরকে যায়, আমরাও না হয় সে সঙ্গে গেলুম! তোফা থাকা যাবে'খন সবাই মিলে। বুদ্ধি যদি থাকে বাবাজী, লাখ লাখ টাকা কামাবে মাসে। লাখ টাকা আজকাল কিছু নয়—এই বলে দিলুম।

সত্যই যেন এই হাওয়া আসিয়াছে চারিদিকে। চুরি করা, ঘুষ খাওয়া, কালোবাজার করায় যে কোথাও লজ্জা আছে, অপমানের কথা আছে তাহা যেন এ জাতটা ভুলিতেই বসিয়াছে ক্রমশ। তাহাদের বাড়ির অপর ভাড়াটিয়ারাও প্রায় সকলেই সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠিল। একটি ছেলে, সে কোন্ ঔষধের কারখানায় কাজ করে, সেদিন সগর্বে গল্প করিতেছিল কে এক মেজর সাহেবকে সামান্য কয়েক বোতল মদ খাওয়াইয়া ও মাত্র তিন হাজার টাকা নগদ দিয়া সে জল-মিশ্রিত টিঞ্চার আইডিন ও ভেজাল ঔষধ চালাইয়াছে। এই ঔষধগুলিই নাকি একবার বাতিল হইয়াছিল ব্যবহারের অযোগ্য বলিয়া। শুধুমাত্র তাহারই বুদ্ধিমত্তায় এতগুলি টাকা বাহির হইয়া আসিল। সেজন্য মালিক তাহাকে পাঁচ হাজার টাকা বকশিশ দিয়াছেন। তাহার বুদ্ধিমত্তার অহঙ্কারে বাড়িসুদ্ধ লোক যখন চমৎকৃত হয়, তখন ভূপেন মনে মনে শিহরিয়া ওঠে, না-জানি কতগুলি লোকের মৃত্যুর ইতিহাস ঐ পাঁচ হাজার টাকার নোটে অদৃশ্য কালিতে লেখা রহিল!

এই বাড়িরই আর একটি ছেলে, সে ঔষধ এবং প্রয়োজনীয় বিলাতী পথ্যের কালোবাজারী ব্যবসায় করে, সম্প্রতি অনেক টাকা দিয়া জমি কিনিয়াছে। সেও গল্প করে, কেমন করিয়া তাহারই দরিদ্র দেশবাসী যখন মৃত্যুর আশঙ্কায় ঔষধের জন্য পাগলের মত ছুটাছুটি করে, তখন অনায়াসে দেড় টাকা দামের য়্যাম্পিউল্

আঠারো টাকায় বিক্রী করে তাহারা !

আর একজন কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য-বিভাগে কাজ করে। তাহার কাছে আরও বিচিত্র ইতিহাস—প্রত্যেকটি খাদ্যবস্তুতে ভেজাল বাড়িয়া যাইতেছে, অধিকাংশই ঠিক বিষাক্ত না হইলেও ক্ষয়কারী ও জটিল রোগ-সৃষ্টিকারী উপাদান। তাহারা সবই জানে, সব খবরই রাখে, অথচ ঘুষের জটিল ঘূর্ণাবর্তে তাহাদের সমস্ত বিবেক কোথায় তলাইয়া গিয়াছে। ঘুষ নাকি আজকাল সকলে প্রকাশ্যেই খায়। সোজাপথে কোন কাজই হয় না—এক বাতুল ও বালক ছাড়া সে চেষ্টাও কেহ করে না। আর কথাটা যে সত্য, পথেঘাটে অহরহ ভূপেন নিজেই ত তার প্রমাণ পায়।

অথচ ইহাদের সকলেই ভদ্রসন্তান—তথাকথিত শিক্ষা অন্তত কিছু-কিছুও ইহারা পাইয়াছে। শিক্ষার সহিত পায় নাই আত্মসম্মানবোধ, পায় নাই দেশপ্রীতি—এমন কি দূরদৃষ্টিও কিছুমাত্র মিলে নাই। যে ডালে বসিয়া আছে, কালিদাসের মত সেই ডালই যে কাটিতেছে সে বোধ নাই কাহারও। যে পয়সা সে এমন অন্যায়ভাবে লইতেছে সে যে দেশেরই পয়সা, তাহাদেরই পয়সা—একদিন এই ঋণ যে কড়ায়গণ্ডায় সুদসুদ্ধ শোধ করিতে হইবে, সে জ্ঞানও তাহাদের নাই। যে বিষ তাহারা ছড়াইতেছে সে বিষে তাহাদেরও আত্মীয়স্বজন মরিতে পারে, এমন কি বোধ হয় তাহারাও, এ কথাও কেহ ভাবিয়া দেখে না।

এই দেশকে শিক্ষিত করিয়া তোলা? সে বোধ হয় হার্কু্যলিসেরও অসাধ্য কাজ।

ভূপেন ভাবে মাঝে মাঝে—অত্যন্ত অসহায় যখন লাগে নিজেকে, যখন চরম দুঃসময়ে দেহ-মন দু-ই ভাঙিয়া পড়ে—শেষ পর্যন্ত সিভিল সাপ্লাইতেই চাকরি লইবে নাকি?

আবার মনে পড়ে মোহিতবাবুর মন্ত্র—পাগলের মত আপন মনেই আওড়ায়, আমি হার মানব না! আমি হার মানব না!

৩১

সন্ধ্যার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ পুরাদমে চলিয়াছে। শিক্ষাভবন, হোস্টেল বা আবাসভবন নূতন প্রণালীতে প্ল্যান অনুযায়ী তৈরী করানো হইয়াছে। প্রত্যেকটি ছাত্রীর আলাদা ঘর, এমনি কয়েকটি ছোট ছোট ঘর লইয়া এক-একটি বাড়ি, তাহার সহিত একজন করিয়া শিক্ষয়িত্রী রাখিবার ব্যবস্থা। স্থির হইয়াছে এখন শুধু ছাত্রীই সংগৃহীত হইবে, মেয়েদেরই শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে প্রধানত। খুব ছোট ছেলেদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে, সেটার সমস্ত ভার লইবে সন্ধ্যা নিজে।

এই বিদ্যায়তনটির বিজ্ঞাপন ইতিমধ্যেই কাগজে কাগজে শুরু হইয়া গিয়াছে—তাহা লইয়া দেশে রীতিমত একটা আলোড়নও দেখা দিয়াছে। বাংলার বাহিরে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড লইয়া এই শিক্ষালয়টি গড়িয়া উঠিয়াছে, এখানে শুধু বুদ্ধিমতী মেয়েদেরই লওয়া হইবে—ক্লাস ওয়ান হইতে ক্লাস এইট পর্যন্ত তাহাদের পড়ানো হইবে। যাহাদের ভর্তি করা হইবে তাহাদের কাছে নামমাত্র খরচ লওয়া হইবে, বাকী সমস্ত ব্যয়ভার কোন একটি ধনীদুহিতা নিজে বহন করিবেন। মোট একশটি ছাত্রীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে কিন্তু এখন মাত্র পঞ্চাশটি লওয়া হইবে, পরে প্রতি বৎসর দশটি করিয়া একেবারে নিচের ক্লাসে ছাত্রী ভর্তি হইতে থাকিবে। এখানকার সিলেবাস আলাদা, পড়াশুনার পদ্ধতি ভিন্ন—সময়ও একসঙ্গে সবটা নয়, সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় ভাগ করা। ইহার সহিত গৃহস্থালী, রন্ধন ও বাগান-করা সবই শেখানো হইবে। ব্যায়াম আবশ্যিক। এছাড়া হাতের কাজ, গান, ছবি আঁকা—নিজেদের ইচ্ছা বা শক্তিমত। সব চেয়ে ব্যয়বহুল ইহার লাইব্রেরী। আধুনিক ধরনের স্টিল র‍্যাকে রাশি রাশি বই সাজানো হইতেছে, মেয়েরা পাঠ্য-পুস্তকের চেয়ে যাহাতে অপাঠ্য অর্থাৎ গল্পের বই বেশী পড়ার অভ্যাস করে, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইবে। শিক্ষাবিষয়ক বিলাতী ডিগ্রীধারী একটি মহিলাকে পাওয়া গিয়াছে—তিনিই লেডী প্রিন্সিপ্যালরূপে কাজ করিবেন এবং তত্ত্বাবধানের জন্য থাকিবেন একজন প্রবীণ অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক।

এসব লোক চৌধুরী মহাশয়ই ঠিক করিয়া দিয়াছেন, আর বিজ্ঞাপনাদি প্রচার-ব্যাপারে সহায়তা করিতেছেন পূর্ণেন্দুবাবু নিজে। সন্ধ্যা যাহাতে ভাল বিবাহ করিয়া সংসারীই হয়—সেজন্য প্রথমটা বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন ভদ্রলোক কিন্তু শেষে যখন দেখিলেন সন্ধ্যা নিজের সংকল্পে অটল তখন হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন—বরং এখন যতটা সম্ভব তাহার এই খেয়ালেই সাহায্য করিতেছেন। এমন আশাও দিয়াছেন যে, আরও কিছু টাকা তাঁহার ধনী মক্কেল রোগীদের কাছ হইতে সংগ্রহ রিয়া দেওয়া অসম্ভব হইবে না।

শুধু কিছু করিতে পারে নাই ভূপেন। তাহার মন পড়িয়া থাকে সন্ধ্যার কাজের কাছে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে চিঠি লিখিয়া সন্ধ্যা কোন প্রশ্ন করিয়া পাঠাইলে চিঠিতে নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা মত উপদেশ দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করিতে পারে না সে। মন্বন্তর কাটিলেও জিনিসপত্রের দাম কমে নাই, বরং ক্রমশ চড়িতেছে। এ বাজারে যাহাদের আয় সীমাবদ্ধ নয়—বরং রণদেবতার আশীর্বাদে ও বেশী নোট ছাপার কল্যাণে দিন দিন বাড়িয়াই যাইতেছে—তাহাদের এ ব্যাপারে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই ; ফলে চাষী ও ব্যবসাদারদেরও শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, শুধু মরিতেছে তাহাদের মত

বাঁধা-বেতনের নিম্নমধ্যবিত্তরা। মাস্টারীর আয় বাড়ে নাই, কিন্তু মাগ্‌গীভাতার কথা আলোচনা চলিতেছে মাত্র। অন্য শিক্ষকরা টিউশ্যনির সংখ্যা বাড়াইয়া দিয়াছেন, কিন্তু ভূপেনের দুইটা টিউশ্যনি রাখিতেই প্রাণান্ত হয়। যেভাবে পড়াইলে একবেলায় একাধিক টিউশ্যনি করা যায়, সেভাবে পড়ানো তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। ইতিমধ্যে মনস্তত্ত্বের এই শোচনীয় মুহূর্তে একটি প্রকাশকের নিকট হইতে অর্থপুস্তক লেখার প্রস্তাবও আসিয়াছিল—পারিশ্রমিকের প্রলোভন ছিল মোটা কিন্তু ভূপেন ঠিক অতটা নিচে নামিতে পারে নাই। তাহার এতদিনের শিক্ষাদীক্ষা, এতদিনের আদর্শ সবই ইহার বিরুদ্ধে। এই দীর্ঘদিনের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতায় এই কথাটা সে অনায়াসে বলিতে পারে যে—সিনেমা ও অর্থপুস্তক, ছাত্রছাত্রীদের সর্বনাশের জন্য এই দুইটিই সব চেয়ে দায়ী। প্রথমটি জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গীকে বিকৃত করিয়া দেয়, দ্বিতীয়টি পড়াশুনার পথ বন্ধ করিয়া ফাঁকি দিয়া পাশ করিতে শেখায়। অবিনাশবাবুর মতে এই বাজারে যে আদর্শ আঁকড়াইয়া বসিয়া থাকে, তাহার মতিচ্ছন্ন হইয়াছে ধরিতে হইবে—ভূপেনেরও সেই মতিচ্ছন্ন হইয়াছে বলা যায়। তাহার সংসার চলা কঠিন বৈকি!

অবশ্য তাহাকে একটা দিকে তাহার শ্যালকরা কতকটা রক্ষা করিয়াছে। আশু বোম্বেতে গিয়া কোন্ এক যুদ্ধসংক্রান্ত কারখানায় কাজ লইয়াছে। কারিগরের কাজ—তবে বেতনটা মোটা, সে প্রথম মাসের মাহিনা পাইয়াই দিদির নামে ত্রিশটা টাকা পাঠাইয়াছিল, তাহার পর হইতে মাসে মাসে চল্লিশ টাকা করিয়া পাঠাইতেছে। রাখু যদিচ ভালভাবেই আই-এ পাস করিয়াছিল—বিনা বেতনেই বি-এ পড়িতে পারিত, তবু ভাইয়ের অবস্থা দেখিয়া সে-ও চাকরির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। মিলিটারী য়্যাকাউণ্টস-এ সে নিজেই একটা কাজ যোগাড় করিয়া লইয়াছে, ভাল মাহিনা। রাখু মেসে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল কিন্তু উপেনবাবুর অনুমতি লইয়া ভূপেন তাহাকে কাছেই রাখিয়াছে। রাখু উপেনবাবুকে নিজের খরচবাবদ কুড়িটি টাকা দেয়—বাড়িতেও চল্লিশ টাকা পাঠায়। সুতরাং ভূপেনের আর টাকা পাঠাইবার প্রয়োজন হয় না। দুই ভাই যা পায়, আর ইস্কুল হইতে যা পাওয়া যায় তাহাতেই কল্যাণী চালাইয়া লয়।

এখন সমস্যা কল্যাণীকে এখানে লইয়া আসা। রাখুর একটা বিবাহ না দিলে সেটা সম্ভব নয়। অথচ ভূপেনও আর পারে না। দেহেমনে সে অত্যন্ত ক্লান্ত। একটু সেবা, একটু স্নিগ্ধ সান্ত্বনা—এ না হইলে আর এই ভার বহন সম্ভব নয়। কল্যাণীকে তাহার কাছে চাই-ই। উপেনবাবু এবং তাহার মা-ও ব্যস্ত হইতেছেন। এমন করিয়া কতকাল তাঁহারা বধূ ও পৌত্রকে ফেলিয়া রাখিবেন?

ভূপেন একদিন রাখুকে কথাটা বলিয়াই ফেলিল, তোমার জন্যে এইবার মেয়ে দেখছি রাখু, তোমার বিয়ে দেব। কি বলো?

রাখু মিনিট-কতক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—আমাদের দু ভায়েরই তো টেম্পোরারী চাকরি, এর ওপর আবার একটা রিস্‌ক্‌ নেওয়া—ভয় করে!

ভূপেন একটু তীক্ষ্নকণ্ঠেই উত্তর দিল, কিন্তু আমি কি অবস্থায় রিস্‌ক্‌ নিয়েছিলুম বলো দেখি? পুরুষমানুষ, বড় হয়েছ—যেমন ক'রে হোক্ সংসার প্রতিপালন করবে, এ ভরসা নেই? তা ছাড়া দায় তো তোমাদেরই। তোমার দিদিকে কত-কাল ফেলে রাখব ওখানে—আমিও তো মানুষ? অথচ ওকে যদি নিয়ে আসি, একটা বালক আর দুটো অন্ধ, এদের কে দেখবে?

রাখু নিজের স্বার্থপরতার ইঙ্গিতে লজ্জিত হইল। ভূপেনের দিকটা তাহার আগেই ভাবা উচিত ছিল, ঋণ তাহাদের ঢের, সে ঋণ শোধ করা যদি সম্ভব না-ও হয়, অন্তত নিজেদের সমস্ত দায় নিজেদের হাতে লইয়া অনতিবিলম্বে তাহাকে মুক্তি দেওয়া উচিত। সে মাথা হেঁট করিয়া তাড়াতাড়ি কহিল, আপনি যা বোঝেন করুন জামাইবাবু, আমার আর কি বলার আছে?

উপেনবাবু রাখুকে হাতের কাছে পাইয়া তাহার নম্র স্বভাবে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন—সঙ্গে সঙ্গে একটা মতলবও স্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন মনে মনে। উৎপলা আর রাখু বোধ হয় একবয়সীই হইবে কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা জয়ন্তীর সহিত রাখুর বিবাহ দেওয়া যায়। কোনমতে উৎপলার একটি পাত্র ঠিক করিতে পারিলে একসঙ্গে দুটিকেই পাত্রস্থ করিতে পারেন। কিন্তু ভূপেনের কাছে একদিন কথাটা পাড়িতে সে রাজী হইল না। বাবাকে বুঝাইয়া দিল যে, কোথাও কিছু নাই—সাময়িক চাকরি ভরসা, সেখানে মেয়ে দেওয়া উচিত হইবে না। তা-ছাড়া ঐ দুটো অন্ধের ভার ছেলেমানুষ কি সামলাইতে পারে? কিন্তু তাহার আপত্তি ছিল অন্য—জয়ন্তী যতই হউক কলিকাতার মানুষ, শহরের স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা কিছুটা উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছেই। সেই বিজন দেশে, মাঠের মধ্যে ভাঙা কুঁড়েঘর, একটি বৃদ্ধা ও একটি অন্ধ বৃদ্ধের ভার বহন করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। কাজে ত লাগিবেই না, বরং অশান্তির সৃষ্টি হইবে। সে মহেশ-বাবুকে ওখানকারই কোন দরিদ্র অথচ ভদ্রঘরের মেয়ে খুঁজিতে বলিয়া দিল।...

মহেশবাবু উত্তর দিলেন দিন-কতক পরেই। তাঁহারই এক দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়ের কন্যা আছে—মেয়েটি অল্পবয়সী হইলেও খুব কাজের, তিনি সে সম্বন্ধে নিজে খবর লইয়াছেন। এই মেয়েটির বড় ভাই কোন্ এক কয়লাখনিতে কাজ করে, মাহিনা ও কমিশন প্রভৃতি লইয়া শ'খানেক টাকা উপার্জন করে, দেশেও সামান্য

কিছু জমিজায়গা আছে, পাত্রীর বাবা সে সব দেখেন। ভদ্রলোক ছেলেটিরও বিবাহ দিতে চান। এখন ভূপেনের যদি অমত না থাকে—তিনি চাপিয়া ধরিলে রাখুর সহিত মেয়েটির ও তার পরিবর্তেই ছেলেটির সহিত উৎপলার বিবাহ একসঙ্গেই হইয়া যাইতে পারে। তাহাতে আর কোন পক্ষেই পণ প্রভৃতির কথা উঠিবে না।

বলা বাহুল্য ভূপেন এ প্রস্তাবে যেন হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইল। উৎপলার সমস্যা খুবই গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে—কী করিয়া এই বোনটিকে পার করিবে ভাবিয়াই পায় না। পাত্রপক্ষ এক পয়সা নগদ না লইলেও আজকাল দুই হাজার আড়াই হাজারের কম একটা বিবাহ হয় না। বাজারে টাকার দর কমিলেও তাহাদের কাছে আজও বস্তুটি তেমনি দুষ্প্রাপ্য। ধার পাওয়ার সম্ভাবনা পর্যন্ত বিশেষ কোথাও নাই। সে সেই শনিবারেই রওনা হইয়া গেল এবং মহেশবাবুর সহিত দেখা করিল। মহেশবাবুর ঋণ বোধ করি তাহার জীবনে শোধ হইবার নয়। বাস্তবিক, এই লোকটি না থাকিলে সে যে কী করিত তাহা বলা কঠিন। ভদ্রলোক সেদিন কিছু অসুস্থ ছিলেন তবু ভূপেনকে লইয়া সেই আত্মীয়ের বাড়ি নিজে গেলেন এবং কথাবার্তা একপ্রকার পাকা করিয়া ফেলিলেন। সৌভাগ্যক্রমে ছেলেটি সেদিন বাড়িতে ছিল। অল্প বয়স, স্বভাবচরিত্র মন্দ নয় বলিয়াই বোধ হইল। ভূপেনও উৎপলার একটা ছবি লইয়া গিয়াছিল, সেটা দেখিয়া মোটামুটি তাঁহারা এক প্রকার পছন্দ করিলেন—কথা রহিল পরের সপ্তাহে পাত্রের পিতা গিয়া কন্যা দেখিয়া আসিবেন। তাঁহার মেয়েটিকেও ভূপেনের পছন্দ হইল—উজ্জ্বল-শ্যামাঙ্গী, শান্ত স্বভাবের মেয়ে, কুরূপ নয়—বরং সুশ্রীই বলা চলে। স্থির হইল কোন পক্ষই নগদ পণ দিবেন না—তত্ত্ব বা গহনা নিজেদের ইচ্ছামত।

কাজটা যে এত সহজে মিটিয়া যাইবে ভূপেন ভাবে নাই। সে মহেশবাবুকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া প্রণাম করিয়া বিদায় লইল। তাহার জীবনে অল্প যে কয়েকটি লোকের সাহচর্য স্মরণীয় হইয়া থাকিবে, মহেশবাবু তাঁহাদের অন্যতম। এখানে আসিয়া এই একটি অমূল্য লাভ হইয়াছে তাহার।

অপরাহ্ণের দিকে সে ইস্কুলটা ঘুরিয়া দেখিয়া আসিল। ললিতবাবু আছেন, পণ্ডিত মহাশয়ও আছেন। খালি অপূর্ববাবু ইস্কুল ছাড়িয়া মিলিটারী কনট্রাক্টরের কাজ করিতেছেন। পদন বি-এ পাস করিয়াছে, সালেকের খবর উঁহারা কেহ জানেন না।

রবিবার শেষরাত্রের ট্রেনেই ভূপেন ফিরিল। এতদিনে দৈহিক ক্লান্তি দেখা দিয়াছে তাহার, এইবার কোথাও কয়টা দিন একটু বিশ্রাম করিবার জন্য সমস্ত মন আকুল হইয়া উঠিয়াছে। রাখুদের বিবাহ শেষ করিয়া কল্যাণীকে ও খোকাকে

লইয়া সে যদি কোথাও একটু চলিয়া যাইতে পারিত, অন্তত পাঁচটা-ছ'টা দিনের জন্যও !

কথাটা মনে করার সঙ্গে সঙ্গেই ম্লান একটু বিদ্রূপ মিশানো হাসি তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল। তাই বটে! অন্তত হাজার টাকা ধার করিবার জন্য এখন ছুটাছুটি করিতে হইবে তাহাকে—তারপর বিবাহ চুকিয়া গেলে আবার দেখা দিবে সেটা শোধ করিবার সমস্যা।

বিশ্রাম? হায় রে!

৩২

কলিকাতায় পৌঁছিয়াই ভূপেন একটা জরুরী তার পাইল সন্ধ্যার নিকট হইতে। বিশেষ প্রয়োজন—ভূপেন যেন আগামী বুধবারের মধ্যে অবশ্যই এখানে পৌঁছায়। মঙ্গলবার রাত্রে এক্সপ্রেসের সময় রামপুরহাট স্টেশনে তাহার জন্য লোক থাকিবে।

কি বিপদ!

এধারে শনিবার কুটুম্বরা আসিবেন ছেলে ও মেয়ে দেখিতে—পছন্দ হইলে এই মাসেই হয়ত দিনস্থির হইবে। টাকা কোথায় তাহার ঠিক নাই—এত বড় দায়িত্ব মাথার উপর, এমন সময়ে আবার দুই-তিনটা দিন নষ্ট করা! অথচ বিনা প্রয়োজনে সন্ধ্যা অকস্মাৎ এমন তার পাঠায় নাই এটাও সত্য। তাহার আবার কি হইল কে জানে—কিম্বা হয়ত ওধারের কাজ মিটিয়া গিয়াছে, এখন উদ্বোধন সম্বন্ধে দিন স্থির করিতে এবং আসল কাজ আরম্ভ করার উদ্যোগ আয়োজন শেষ করিতে হইবে। যাই হোক—এ আহ্বান উপেক্ষা করার শক্তি তাহার নাই, সব কাজ ফেলিয়াও যাইতে হইবে। সে সেইদিনই হেড মাস্টার মহাশয়ের কাছে কথাটা পাড়িয়া রাখিল, বুধবার, হয়ত বৃহস্পতিবারও সে আসিতে পারিবে না।

মঙ্গলবার শেষরাত্রে ভূপেন 'মোহিতমোহন বিদ্যাশ্রমে' আসিয়া পৌঁছিল। তখনও ভাল করিয়া ফরসা হয় নাই, তবু তাহারই মধ্যে সে চারিদিকে মোটামুটি তাকাইয়া দেখিল—বিরাট কাণ্ডকারখানা করিয়াছে সন্ধ্যা। বাগান পুকুর গোশালা —কত কি! বাড়িও অনেকগুলি—সব কয়টি খড়ের চালা, কিন্তু পরিষ্কার ঝকঝকে। বড় বড় জানালা, চারিদিকে ফাঁকার মধ্যে, স্বাস্থ্য ও মনের বিস্তারলাভের উপযোগী করিয়া নির্মিত।

সন্ধ্যার নিজের বাড়িটি একেবারে এক প্রান্তে—নির্জনে শাল মহুয়া ও সেগুন গাছের ছায়ায়। ছোট দুটি ঘর—একটিতে লাইব্রেরী, অপরটিতে শয়নের ব্যবস্থা।

সারারাত্রি জাগরণের ফলে ক্লান্তি যথেষ্ট থাকিলেও আসিবার পথে মুক্ত বাতাসে

ও প্রাকৃতিক দৃশ্যে তাহার মন প্রফুল্ল ছিল—এখানের ব্যবস্থা দেখিয়া আরও খুশী হইয়াছে। সে গাড়ি হইতে নামিয়াই সন্ধ্যাকে দেখিতে পাইয়া রসিকতা করিয়া কহিল, কী গো, আশ্রমকর্ত্রী—তোমার আশ্রম-বালিকারা কৈ?

সন্ধ্যাও বোধ করি সারারাত জাগিয়াই তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহার মুখ অপরিসীম শুষ্ক, চক্ষুও আরক্ত, তবু সে হাসিয়া ফেলিয়া ভূপেনকে প্রণাম করিতে করিতে বলিল—তারা আচার্যের অবসরের অপেক্ষা করছে। আদেশ পেলেই এসে হাজির হবে।

তাহার পিছু পিছু বারান্দায় উঠিয়া আসিতে আসিতে ভূপেন কহিল, তারপর, জরুরী তলব কেন? কী হুকুম বলো?

কৃত্রিম কোপের সহিত সন্ধ্যা বলিল, বাপ্‌রে বাপ্‌, কৈফিয়ৎটা বুঝি রাস্তা থেকেই না নিলে আর চলছে না? আর কৈফিয়ৎই বা কিসের—এ বুঝি আমার একার দায় যে ডেকে পাঠালেই জবাবদিহি করতে হবে? আপনার কর্তব্য বুঝি কিছুই নেই?

অপ্রতিভ ভাবে ভূপেন জবাব দিল, কর্তব্য ত আছে—কিন্তু তা পালনের ক্ষমতা কৈ সন্ধ্যা? তুমি ত জানোই, তোমার মাস্টার মশাই কত অক্ষম!

সন্ধ্যা তাহাকে জোর করিয়া একটা নূতন আরাম-কেদারায় বসাইয়া দিয়া কহিল, আচ্ছা, এখন একটু ঠাণ্ডা হয়ে বসুন ত, তারপর সব কথা হবে।

তারপর ভূপেন ব্যাপারটা কি বুঝিবার আগেই, সে তাহার জুতাটা খুলিয়া লইল এবং একটা ভিজা তোয়ালে আনিয়া সযত্নে তাহার মাথা মুখ মুছাইয়া দিয়া কহিল, এখন একটু বিশ্রাম করুন, আপনার জন্যে একটু চা নিয়ে আসি। যদি ঘুমোতে চান ত চোখটা একটু বুজিয়ে নিতেও পারেন।

সে ঘরের ভিতর চলিয়া গেল কিন্তু ভূপেনের চোখে ঘুম আসিল না। পূব দিকটা বেশ ফরসা হইয়া গিয়াছে—তাহার সামনেই দিগন্তজোড়া মাঠের মধ্য হইতে সেই জ্যোতির্ময় মহা আবির্ভাব হইতেছে। রাত্রিটা একটু গরম ছিল—এখন হাওয়াটাও খুব মিষ্ট, সেইখানে বসিয়া পূর্বাকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে ভূপেনের সহসা যেন মনে হইল আজ তাহার একটা সুপ্রভাত হইতেছে, জীবন যেন এখনই তাহার নূতন কোন অর্থ খুঁজিয়া পাইবে। এমন সময় ঘুমাইয়া নষ্ট করা যায় না—জীবনে এমন মুহূর্ত কদাচিৎ আসে। কলিকাতার সঙ্কীর্ণতা, সেখানকার দৈন্য, জীবন-সংগ্রামের ক্লান্তি আজ সে অনেক পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে—সেখানকার কোন গ্লানি, কোন অকিঞ্চিৎকরতাই আজ আর তাহাকে যেন স্পর্শ করা সম্ভব নয়। কথাটা হয়ত অর্থহীন—শুধু এতদিন পরে বাহিরে

আসার আনন্দেই, খোলা বাতাসে এমন স্বাস্থ্যকর স্থানে বেড়ানোর আনন্দেই, হয়ত আজ তাহার এ রকমটা মনে হইতেছে,—তবু সেই অপূর্ব সূর্যোদয়ের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার বিগত বিনিদ্র রাত্রির সমস্ত শ্রান্তি, সমস্ত জড়তা নিমেষে মুছিয়া গেল, সে বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে মাঠের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

একটু পরেই ধূমায়িত চায়ের পেয়ালা হাতে সন্ধ্যা আবার দেখা দিয়া কহিল, এখন এই অসময়ে আর কিছু খাবার দিলুম না, শুধু একটু চা খান—কেমন? ঘুম না হবার গ্লানিটা চলে যাবে। তারপর ভাল ক'রে সকাল হোক—মুখ হাত ধুয়ে একেবারে খাবেন।

সন্ধ্যার চোখে-মুখেও কেমন একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি, যেন তাহার সহিত অপূর্ব একটা স্নেহ ঝরিয়া পড়িতেছে সে দৃষ্টি হইতে। পেয়ালাটায় একটা চুমুক দিয়া ভূপেন কহিল—বাঃ সন্ধ্যা—খাসা তোমার এই আশ্রমটি! এখানে থাকলে পরমায়ু আপনিই বাড়ে। আমার আর এখান ছেড়ে যেতেই ইচ্ছে করছে না, সত্যি।

সন্ধ্যার মুখ কয়েক মুহূর্তের জন্য বেদনায় ম্লান হইয়া উঠিল। সেদিকে না চাহিয়াই ভূপেন আরও কয়েক চুমুক চা পান করিয়া কহিল, এই সব জায়গায় যদি বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারতুম—তা'হলে আমার আর কিছুতেই লোভ থাকত না সন্ধ্যা, তুমি বিশ্বাস করো।

মাথাটা একটু নিচু করিয়া সন্ধ্যা ধীরে ধীরে জবাব দিল, ইচ্ছে করলেই ত কাটাতে পারেন মাস্টার মশাই, আমি ত তাহ'লে বেঁচে যাই।

নিঃশব্দে বাকী চা-টা পান করিয়া লইয়া ভূপেন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে পেয়ালাটা ফিরাইয়া দিয়া কহিল, না, তা আর সম্ভব নয় সন্ধ্যা। এ জীবনেই বোধ হয় আর সম্ভব হবে না! তবু ত তোমার দয়ায় একটা দিনও এমন স্থানে এমন জ্যোতির্ময় প্রভাত দেখতে পেলাম—এই আমার ঢের!

তাহার পরই কথাটা ঘুরাইয়া দিয়া কহিল, কিন্তু এমন স্বাস্থ্যকর জায়গায় তুমি এমন রোগা হয়ে গেলে কেন? খুব খাটতে হচ্ছে ব'লে কি? বড্ড ময়লা হয়ে গিয়েছ!

সন্ধ্যা হেঁট হইয়া চায়ের পেয়ালাটা এক কোণে রাখিয়া দিতে দিতে কী যেন একটা সামলাইয়া লইল। তাহার পর স্বাভাবিক কণ্ঠেই কহিল, এখানকার রোদ্দুরে একটু কালোই হয় সবাই। ওটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ। চলুন এবার আশ্রমটা একটু দেখিয়ে আনি—

—চলো।

সবটা ঘুরিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া আসিতে অনেকক্ষণ সময় লাগিল। সব

দিকেই নজর আছে সন্ধ্যার, আয়োজন নিখুঁত হইয়াছে। এসব ভূপেনেরই প্ল্যান—তাহাদের বহুদিনের বহু আলোচনার ফল। তাহার এতদিনের স্বপ্ন, এতদিনের আশা সফল হইতে চলিয়াছে দেখিয়া আনন্দে বার বার ভূপেনের চোখে জল আসিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে সব চেয়ে বড় ব্যথাটা, তাহারই সফল স্বপ্নের মধ্যে তাহার স্থান না থাকার বেদনা, যেন আরও বেশী করিয়া বাজিল। তবু সে সমস্ত কথা সন্ধ্যার কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া লইল, দু-একটি নূতন প্রস্তাবও করিল। আগামী মাসেই উদ্বোধনের আয়োজন হইয়াছে, চৌধুরী মশাই আসিবেন, পূর্ণেন্দু-বাবুও। দেশের কোন বড় নেতাকে দিয়া উদ্বোধন করানো হইবে কিম্বা কোন বড় শিক্ষাব্রতীকে দিয়া। ভূপেন একজন বড় শিল্পীর নাম উল্লেখ করিল—তাঁহাকেও আনা যাইতে পারে। আসল লোক শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী, তাঁহারা এখনই আসিয়া গিয়াছেন, সন্ধ্যা এখন নিজে তাঁহাদের পাঠ দিতেছে প্রত্যহ। কী ধরনের শিক্ষা সে চায়, কেমন করিয়া ছেলে-মেয়েদের সেই নূতন পদ্ধতিতে শিখাইতে হইবে—সযত্নে ও সবিনয়ে তাঁহাদের সে বুঝাইয়া দিতেছে। দেশের আদর্শ নাগরিক সে গড়িতে চায়। আত্মসম্মানবিশিষ্ট, নিরলস, নির্ভীক, নিয়মানুবর্তী, দেশপ্রেমিক ও সমাজ-সেবক—এমন মানুষ। যে কাজ করিবে কিন্তু বাহবা চাহিবে না। যে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য অপরের—দেশের ও দশের সর্বনাশ করিবে না। এমন কি প্রয়োজন হইলে নিজের কোন কোন স্বার্থ ত্যাগ করিতেও পারিবে।

সব ঘুরিয়া দেখিয়া তাহারা আবার যখন বাংলোয় ফিরিল তখন অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে। মুখ হাত ধুইয়া জলযোগ শেষ করিয়া ভূপেন আবার প্রশ্ন করিল—কৈ, এত জরুরী তলবটা কি জন্যে তা বললে না ত?

সন্ধ্যা মৃদু হাসিয়া কহিল, সে ও-বেলা ধীরেসুস্থে শুনবেন'খন। আমি আজ আপনার জন্যে নিজের হাতে রান্না করব। এখন সময় হবে না সে-সব কথার। আর আপনি যখন আজ থাকছেনই—কালকের আগে যখন যাওয়াই হবে না, তখন আর তাড়াতাড়ি কি?

—ও, আমি আজ থাকছি বুঝি? ভূপেন হাসিয়া প্রশ্ন করিল, সেটা ঠিক হয়ে গেছে!

—ঠিক হয়েই আছে। এখন আপনি একটু বিশ্রাম করুন। কেমন?

সন্ধ্যা অনেক রকম রান্না করিয়াছিল। সে যে এত ভাল রাঁধিতেও জানে সে পরিচয় এতদিন পায় নাই ভূপেন। গল্প করিয়া করিয়া খাইতে বহু সময় চলিয়া গেল। তাহার খাওয়া যখন শেষ হইল তখন দুটা বাজিয়া গিয়াছে। ভূপেন

আহারের পর ঘড়িটা দেখিয়া অনুতপ্ত স্বরে কহিল, ইস্, অনেক বেলা হয়ে গেল। তুমিও এই সঙ্গে খেয়ে নিলে পারতে!

—আমি তো আজ খাবো না।

—খাবে না? কেন?

—এ বেলা আমার একটা উপবাস আছে।

সে ভূপেনের ভুক্তাবশিষ্টগুলি সযত্নে একটা পাত্রে গুছাইয়া তুলিতেছিল। ভূপেন দেখিয়া প্রশ্ন করিল—ও কি হচ্ছে?

—আপনার প্রসাদ ত জোটে না অদৃষ্টে, তাই রাখছি। ওবেলাই খাবো।

সন্ধ্যার এই যত্ন, সেবা—এই বসিয়া বসিয়া নানা ব্যঞ্জন রাঁধিয়া খাওয়ানো—সমস্তটাতেই কী জানি কেন একটা অপূর্ব অনুভূতি বোধ হইতেছিল তাহার। সে কি পুলকের কিংবা বেদনার, তাহা বলা শক্ত—তবে এটা সে বুঝিয়াছিল যে ইহার একটা ভয়ঙ্কর মোহ আছে, তাহার বন্ধন হইতে মুক্তি পাওয়া শক্ত।

নিজের এই অনুভূতিতে সে নিজের এবং কিছুটা সন্ধ্যার উপরও যেন বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। এখন এই প্রসাদের উল্লেখে আবারও সেই অনুভূতিটা তীব্র হইয়া উঠিল। এ অন্যায়, তবু শুনিতে ভাল লাগে—আঘাতটা বেদনাদায়ক, তবু নেশার মত আরও পাইতে ইচ্ছা করে। সে ইচ্ছা করিয়াই আর কোন কথা কহিল না, নীরবে খাটে গিয়া শুইয়া পড়িল।

দিবানিদ্রার পর ভূপেন উঠিয়া আবার বেড়াইতে বাহির হইল। একটা দিন ত মোটে ছুটি, যতটা সম্ভব এই মুক্ত বায়ু, এই অবারিত মাঠের স্পর্শ সে লইতে চায়। এ বেলা সন্ধ্যা আর সঙ্গে গেল না। কহিল, আমার একটু কাজ আছে। আপনি একাই ঘুরে আসুন—মোদ্দা সন্ধ্যের মধ্যে ফিরে আসবেন।

তবুও ঘুরিতে ঘুরিতে দেরি হইয়া গেল ভূপেনের—যখন ফিরিল তখন রীতিমত অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। সে বাংলোর সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতেই সন্ধ্যাকে সম্বোধন করিয়া কী একটা কৈফিয়তের কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সহসা ঘর-হইতে-আসিয়া-পড়া ক্ষীণ আলোতেই যে দৃশ্য তাহার চোখে পড়িল তাহাতে সে স্তম্ভিত হইয়া গেল,—বোধ করি মুগ্ধও হইল।

সন্ধ্যা সিঁড়ির সামনেই বধূ-বেশে সজ্জিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। চন্দন-চর্চিত ললাট, লাল বেনারসী পরনে, গলায় ফুলের মালা। সেই মুহূর্তে কী অপূর্ব যে তাহাকে দেখাইতেছিল! সেদিকে চাহিলে যেন চোখ ফিরানো যায় না। এই প্রথম ভূপেন অনুভব করিল সন্ধ্যা সুন্দরী, তাহাকে পাইবার, তাহাকে কামনা

করিবার এ-ও একটা কারণ ছিল।

কিছুক্ষণ সেদিকে অপলক নেত্রে চাহিয়া থাকিবার পর অতিকষ্টে সে প্রশ্ন করিল, এ কী ব্যাপার সন্ধ্যা ?

শান্ত মৃদু কণ্ঠে সন্ধ্যা কহিল—আজ আমার বিয়ে।

—বিয়ে! সে কি? কার সঙ্গে? রুদ্ধনিঃশ্বাসে প্রশ্ন করে ভূপেন।

—আমার পক্ষে যে আর কাউকে বিয়ে করা সম্ভব নয় মাস্টার মশাই, তা ত আপনি জানেন।

লজ্জায়, কুণ্ঠায়, সঙ্কোচে তাহার গলা বুজিয়া আসে—চোখের দৃষ্টি বুঝি আর কোনমতে তুলিয়া রাখা যায় না, তবু এই অদ্ভুত অভিসারের পালা সন্ধ্যাকেই শেষ করিতে হয়। কোনমতে গলাটা পরিষ্কার করিয়া বলে, সেই জন্যেই ত আপনাকে আনাতে হ'ল!

তবু যেন ভূপেন কথাটা বুঝিতে পারে না। কথাটা যেমন অবিশ্বাস্য, তেমনি আশাতীত। কল্পনা করিতে, অনুমান করিতেও ভয় হয়। ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিল, লাইব্রেরী-ঘরের মেঝেতে পূজার আয়োজন সম্পূর্ণ, একটি সধবা মহিলা, বোধ হয় এখানকারই কোন শিক্ষয়িত্রী হইবেন, তিনি সব গুছাইয়া রাখিতেছেন, একটি বৃদ্ধ পুরোহিত বসিয়া নির্দেশ দিতেছেন।

—এ-সব কি সন্ধ্যা, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না!

সন্ধ্যা নামিয়া আসিয়া সিঁড়ির উপরেই তাহার পায়ে হাত দিয়া বসিয়া পড়িল, এইটুকু ভিক্ষা আমায় দিয়ে যান—আমি যে আর পারছি না! কী ক'রে সারা জীবন চলব বলুন ত?

—কিন্তু, কিন্তু আমার যে কোন উপায় নেই সন্ধ্যা! ভূপেন ব্যাকুলভাবে বলিয়া ওঠে—কল্যাণীর প্রতি এত বড় অবিচার আমি করতে পরব না কিছুতেই। সে বেচারীর ত কোন অপরাধ নেই। মিছিমিছি আমায় লোভ দেখিও না—মানুষ বড় দুর্বল, এ যে কত বড় প্রলোভন আমার কাছে, অথচ কত মর্মান্তিক, তা জানো না।

—আমি আজকের এই রাতটি শুধু কল্যাণীদির কাছে ভিক্ষা চেয়ে নিচ্ছি, তার ত সবই রইল—সারা জীবন। যা আমার—যা যুগ-যুগান্তর ধরে, জন্ম-জন্মান্তর ধরে আমার,—আমার সমস্ত সত্তা, সমস্ত অস্তিত্ব যে অধিকার-বোধকে সত্য বলে জানে —তা ত আমি সমস্তই তাকে ধরে দিয়েছি। আমার দুর্ভাগ্য আমারই থাকবে—আমি তার ভাগ নিতে আর কাউকে ডাকব না। শুধু আজকের দিনটি দয়া করুন, পায়ে পড়ি আপনার। উঃ—কি নির্মম আপনি হ'তে পারেন! এতটুকু

মায়া কি নেই আপনার দেহে?

ভূপেনের সমস্ত চিন্তাশক্তি, সমস্ত ধারণাশক্তি কী যেন প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্তে ঘুলাইয়া গিয়াছে। সে শুধু অসহায় ভাবে কহিল, কিন্তু এ পদস্খলন কি তোমার চোখেই আমাকে নামিয়ে দেবে না সন্ধ্যা? যা কর্তব্য-পথ তা থেকে অন্তত তুমি আমাকে টেনে নামাবার চেষ্টা ক'রো না!

—না, তা করি নি, প্রবল বেগে ঘাড় নাড়ে সন্ধ্যা, শুধু আপনার কাছে আমার সারা জীবনের পাথেয়—পাথেয়ও নয়, একটা রক্ষা-কবচ মাত্র চাইছি। আপনি জানেন না, এদেশে অল্পবয়সী কুমারী মেয়ে—তার ওপর যদি একটু সুশ্রী হয় ত তার কত জ্বালা,—কত সন্দেহ, কত কামনার সঙ্গে তাকে অহরহ যুঝতে হয়! এখনই কত কানাকানি, কত সংশয়ের সামনে দাঁড়াতে হয়েছে তা আপনি কল্পনা করতে পারবেন না। এর মধ্যে দিয়ে কি ক'রে কাজ করব বলুন! তাই আজ বিপদে পড়েই আপনাকে ডেকে এনেছি। আমি জানি আপনি কল্যাণীদির, তাঁরই থাকবেন চিরকাল, শত সন্ধ্যার সাধ্য নেই তাঁর কাছ থেকে আপনাকে কেড়ে আনতে পারে। শুধু আপনি নিজে হাতে আমার কপালে একটু সিঁদুর দিয়ে যান—স্বীকার ক'রে যান যে আমি আপনার স্ত্রী। তারপর আর আপনাকে কোনদিন ডাকব না, কোনদিন বিরক্ত করব না। নইলে আপনারই কাজ যে পণ্ড হয়! একরাত্রে আপনার এমন কিছু অপরাধ হবে না কল্যাণীদির কাছে।

মূঢ়ের মত, অভিভূতের মত ভূপেন উঠিয়া গিয়া ঘরে দাঁড়াইল। এ যেন কী স্বপ্ন দেখিতেছে সে! এক দুঃসাহসিক স্বপ্ন! সচেতন অবস্থায় যে স্বপ্ন দেখিতে সাহস করে নাই—চাঁদের চেয়েও যা ছিল দুষ্প্রাপ্য, যাহার কল্পনাতেও লজ্জিত হইত একদিন, সমস্ত দুরাশার যা ছিল শেষ কথা!

অভিভূতের মতই সে কাপড়-জামা ছাড়িয়া গরদ পরিয়া একসময় পিঁড়িতে গিয়া বসিল। তাহার প্রতিনিধি-রূপে পুরোহিতই নাকি আভ্যুদয়িক সারিয়াছেন আজ। তিনিই সম্প্রদান করিলেন সন্ধ্যাকে। স্ত্রী-আচার হইল না—কোন বাহুল্য আড়ম্বর নয়। শুধু নারায়ণ ও অগ্নি সাক্ষী রাখিয়া শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানটিই মাত্র হইল। এসব আয়োজন সন্ধ্যা আগেই সারিয়া রাখিয়াছিল—পুরোহিত আসিয়াছেন কলিকাতা হইতে—তাহাদেরই কুল-পুরোহিত। তিনিই এক সময়ে ভূপেনের স্খলিত অবশ হাতের মধ্যে সন্ধ্যার স্বেদসিক্ত কম্পিত সেই দুর্লভ হাতখানি সঁপিয়া দিলেন; তারপর কখন সে সেই অর্ধচৈতন্যের মধ্যেই সন্ধ্যার সিঁথিতে সিঁদুর লেপিয়া দিল আর অবাক হইয়া চাহিয়া দেখিল, তাহার সেই আশ্চর্য সুন্দর চোখ দুটি লজ্জায়, সৌভাগ্যে, আবেশে কেমন করিয়া নিমীলিত হইয়া যাইতেছে বার বার।

সহসা তাহার চমক ভাঙিল অনুষ্ঠানের শেষে পুরোহিতকে প্রণাম করিয়া উঠিতে তিনি শান্তিজল দিয়া যখন আশীর্বাদ করিতেছেন। এ কী হইল তাহার? তাহার জীবনেই কি যত অঘটন ঘটে! এই বয়সে এক স্ত্রী বর্তমানেও আর এক বিবাহ করিতে হইল, আর দুটি বিবাহই কি এমনি অদ্ভুত—এমনি বিস্ময়ের মধ্য দিয়া ঘটিয়া গেল! দুটি বিবাহ—কোনটাই সাধারণ ভাবে সহজে হইল না।

দেবতারও কামনার বস্তু, দেব-দুর্লভ এই যে ঐশ্বর্য আবু হোসেনের বাদশাহীর মত এক রাত্রির জন্য তাহার অদৃষ্টে মিলিল—এ কি অদৃষ্টের নিষ্ঠুরতম পরিহাস নয়! ইহার চেয়ে সারা জীবন না-পাওয়ার বেদনা সহিত, সে-ও ভাল ছিল।

কল্যাণীর অশ্রুভারাক্রান্ত ছলো-ছলো চোখ দুইটিও তাহার মনে পড়িল, সে মনে মনে বলিল, তুমি আমাকে ক্ষমা ক'রো কল্যাণী। সন্ধ্যার জন্যে এটুকু করতে আমি বাধ্য।

পুরোহিত বিদায় লইতে মহিলাটি তাহাদের হাত ধরিয়া বাসর-ঘরে অর্থাৎ সন্ধ্যারই শয়নঘরে লইয়া আসিলেন। সামান্য যা আচার-অনুষ্ঠান বাকী ছিল সারিয়া, দুজনের মত জলখাবার সাজাইয়া রাখিয়া তিনিও এক সময়ে চলিয়া গেলেন।

ভূপেন যেন তখনও বুঝিতে পারিতেছে না ব্যাপারটা—বিহ্বল নেত্রে চাহিয়া রহিল সে। সকলে চলিয়া গেলে সন্ধ্যা যখন দরজা বন্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিল তখন থাপছাড়া ভাবে সে শুধু প্রশ্ন করিল—তোমার ঝি চাকর কোথায়?

—তাদের আগেই সরিয়ে দিয়েছি। ওদের সামনে এ বড় লজ্জার—মৃদু কণ্ঠে উত্তর দেয় সন্ধ্যা। হৃদয়াবেগে তাহার কণ্ঠস্বরও বুজিয়া আসিতেছিল।

ভূপেন অবাক হইয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল—খাটটি পরিপাটি করিয়া ফুল দিয়া কে সাজাইয়াছে—আবার বিছানার পাশে টুলে আর এক জোড়া টাটকা মালা। তাহার মনে পড়িল, এটা শুধু তাহাদের বাসর-শয্যা নয়, ফুলশয্যাও বটে।

সন্ধ্যা আর একবার গলায় আঁচল দিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া তাহাকে প্রণাম করিল—একেবারে তাহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া। বোধ করি তাহার এতদিনের সমস্ত বেদনা সমস্ত অন্তর্দ্বন্দ্বের রক্তাপ্লুত ইতিহাস সে দয়িতের চরণে চিরকালের মত নিবেদন করিয়া নিশ্চিন্ত হইল—সেই সঙ্গে নিজের ভবিষ্যৎও। তারপর যখন মাথা তুলিয়া কম্পিত হস্তে একটি মালা লইয়া ভূপেনের গলায় পরাইতে গেল তখন প্রথম ভূপেন চাহিয়া দেখিল সন্ধ্যার দুটি কপোল চোখের জলে ভাসিয়া গিয়াছে। নিজের পায়ের দিকে চাহিয়া দেখিল পা-দুটিও ভিজা। হঠাৎ যেন মনে হইল মোহিতবাবু তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন; তাঁহার স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে আশীর্বাদ ঝরিয়া পড়িতেছে, প্রসন্ন হাসিতে মুখটি রঞ্জিত। তাহার

কানের মধ্যে বাজিতে লাগিল তাঁহার অন্তিম-শয্যার শেষ বাণী—'পুঁথির সত্য আর জীবনের সত্য এক নয়—চলার পথে সত্য তাঁর নিজের মহিমায় আপনি প্রকট হন।...আমার মত একটা সংস্কারকে সত্য ব'লে আঁকড়ে থেকো না।'

ভূপেন সন্ধ্যার মুখের দিকে চাহিয়া সেই মুহূর্তে নিজের অন্তরের সত্য পরিষ্কার দেখিতে পাইল। আত্মপ্রবঞ্চনা করিয়া লাভ নাই—এই মুহূর্তটির জন্যই তাহার এতদিনের জীবন নিরন্তর হাহাকার করিয়াছে। হউক অবিশ্বাস্য এ সৌভাগ্য, হয়ত বা আর একটু পরেই তাহার স্বপ্ন ভাঙিয়া যাইবে বাস্তবের রূঢ় আঘাতে, তবু এ মুহূর্তটিকে সে অবহেলায় নষ্ট হইতে দিবে না। আর একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, মাথা হেঁট করিয়া ম্লান-মুখে সন্ধ্যা দাঁড়াইয়া আছে। সে-ও মালাগাছি লইয়া নতমুখী, লজ্জিতা, অপরাধিনী সন্ধ্যার গলায় পরাইয়া দিয়া তাহাকে একেবারে বুকের মধ্যে টানিয়া লইল।

তারপর কোথা দিয়া কি হইয়া গেল সে সব তথ্য তাহাদের কাহারও মনে নাই। ভূপেনেরও চোখের জল বাধা মানিল না। দীর্ঘদিনের ইতিহাস জমা আছে তাহার বুকেও—দীর্ঘ নৈরাশ্যের ইতিহাস। যেদিন মোহিতবাবু তাহাকে নিষ্ঠুর ও রূঢ় সত্য শুনাইয়া বিদায় দিয়াছিলেন, সেদিনের সে অপরিসীম বেদনা কি আজ মুছিয়া গেল? এতদিন যেন এক নিরন্ধ্র অন্ধকারে কাটিয়াছে—আবার এই রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে যে অন্ধকার শুরু হইবে তাহারও দিক দিশা নাই, তবু এই মুহূর্তটুকুই কি তাহাদের জীবনের সব চেয়ে বড় সত্য নয়? সারা জীবনব্যাপী দুর্ভোগ ও বিচ্ছেদের মূল্য কি এই একটি রাত্রেই শোধ হইবে না?

পাগলের মত সন্ধ্যার ললাটে, কণ্ঠে, ওষ্ঠে চুম্বন করিতে করিতে ভূপেন বলিল—সন্ধ্যা, তাহ'লে কি সত্যিই তোমাকে পেলাম?

সন্ধ্যা তাহার গালের উপর নিজের গাল সজোরে চাপিয়া ধরিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে চুপি চুপি কহিল, পাবে বৈকি। এ যে আমার জন্মজন্মান্তরের তপস্যা। কল্যাণী-দির সাধ্য কি আমাকে একেবারে বঞ্চিত করে।...আমি হিন্দুর মেয়ে, জন্মান্তরে বিশ্বাস করি—আর না করতে পারলে পাগল হয়ে যেতুম—গত জন্মে কি মহাপাপ করেছিলুম কল্যাণীদির কাছে, তাই সে এমন ক'রে তোমাকে ছিনিয়ে নিতে পারলে, তবু তোমার দেওয়া সিঁদুরই আমার এই জন্মের তপস্যার সাক্ষ্য দেবে—আমার গত জন্মের পাপ ধুইয়ে দেবে।

তাহার পর কেমন একটু অশ্রু-বিকৃত হাসি হাসিয়া কহিল, কথাগুলো নাটকের মত শোনাচ্ছে, না? কিন্তু আজ আর কিছু ব'লো না—বাধাও দিও না—আমাকে বলতে দাও। এতকাল ধরে এসব কথা বুকে জমে ছিল, বুক ফেটে যেত

তবু বলতে পারি নি।

ভূপেন কহিল—কিন্তু আমাকে কেন এত ভালবাসলে সন্ধ্যা, আমার কী আছে?

—তা জানি না। সে বিচার ত কোনদিন ক'রে দেখিনি, শুধু জানি তুমি ছাড়া আমার জীবনে আর কোন কিছুর অর্থ নেই। এই যে কাজের ভার নিয়েছি—জানি এ তোমার কাজ, তাই এ সফল করব, এর মধ্যেই সারা জীবন কাটাতে পারব। আমার আর কোন ভয় নেই।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ভূপেন কহিল, কিন্তু সন্ধ্যা কাজটা ভাল করলে না। আমাদের এ মিলন না হওয়াই বোধ হয় ভাল ছিল। একবার এমন ক'রে পেয়ে কি আর থাকতে পারব? এরপর সইতে পারব কি আবার বিচ্ছেদ? যদি বা আমি পারি—তুমি কি পারবে?

—নিশ্চয়ই পারব, কণ্ঠস্বরে জোর দিয়া বলে সন্ধ্যা, আমি জানি তুমি যেখানেই যাও আমার সমস্ত সত্তা, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত আত্মা তোমাকে ঘিরে থাকবে। সেখানে যে আমাদের নিত্যমিলন, তা থেকে কে আমাদের বঞ্চিত করতে পারে? সেজন্যে আমি একটুও ভাবি না গো!

তারপর আস্তে আস্তে নিজেকে স্বামীর বাহুবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া কহিল, অনেক রাত হ'ল—তোমাকে খেতে দিই—এখন আর বেশী খেতে পারবে না ব'লে সামান্য একটু জলখাবার রেখেছি।

সে ভূপেনের পায়ের কাছে বসিয়া খাবারের রেকাবিটা হাতে লইয়া তাহাকে একটু একটু করিয়া খাওয়াইয়া দিতে লাগিল।

তাহার খাওয়া শেষ হইলে নিজের মুখেও একটুকরা মিষ্টান্ন ফেলিয়া কহিল, আমি কিন্তু তোমার পাতের ভাত এখন দুটি খাবো—তুমি কিছু ব'লো না।

—ছি ছি সন্ধ্যা—ভূপেন তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া কহিল, এ কী ছেলে-মানুষি করছ? ওসব যে এতক্ষণে খারাপ হয়ে গেছে। অসুখ করবে খেলে।

—তোমার পায়ে পড়ি গো—তুমি বাধা দিও না, লক্ষীটি! আচ্ছা, খুব দুটিখানি খাবো? এত কটি? আর ত এ সুযোগ জীবনে পাবো না।

ভূপেন আর বাধা দিল না। কিন্তু সামান্য একটু ভাত মুখে তুলিবার পরই পাত্রটি জোর করিয়া সরাইয়া দিয়া সেও নিজের হাতে কয়েকটি মিষ্টান্ন সন্ধ্যার মুখে তুলিয়া দিল।...

তারপর আবার তাহার হাত ধরিয়া নিজের বুকের মধ্যে টানিয়া লইল।

স্বামীর বাহুবন্ধনের মধ্যে নিজেকে নিবিড়ভাবে মিশাইয়া দিয়া সন্ধ্যা চুপি চুপি প্রশ্ন করিল, আচ্ছা কোন রকমেই কি আজকের রাতটাকে চিরস্থায়ী করা যায় না? কিছুতেই না?

ভূপেন তাহার বিপুল রুক্ষ কেশপাশের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া উত্তর দিল, তা হয় না সন্ধ্যা—আর সেইজন্যই ত এ রাত্রির এত মূল্য! এসো আমরাই একে

অমর করে তুলি। এ রাতটি আমাদের অনুভূতিতে অন্তত চিরন্তন হয়ে থাক।

তবু একসময়ে সেই পরমাশ্চর্য রাত্রিটির অবসান ঘটে। আবার পূর্বাকাশ রক্তিমায় ভরিয়া যায়। প্রভাত দেখা দেয় জীবনের সমস্ত রূঢ় সত্য ও দায়িত্ব লইয়া।

ভূপেন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলে, তা'হলে এইবার আমাকে বিদায় দাও, সন্ধ্যা!

সন্ধ্যা যেন অকস্মাৎ চমকিয়া ওঠে। এক নিমেষে তাহার মুখ হইতে সমস্ত রক্ত চলিয়া যায়। কে যেন একটা প্রচণ্ড আঘাত করিয়াছে তাহাকে—বিদ্যুতের কষার মতই তাহার তীব্রতা। সে ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে, তুমি এখনই চলে যাবে? খেয়েও যাবে না?

—না। আমাকে আর লোভ দেখিও না, লক্ষীটি। যখনই যাই না কেন, সমানই ব্যথা বাজবে—তার চেয়ে এখনই বিদায় দাও।

সন্ধ্যা আর কথা কহিল না। কোনমতে শিথিল দেহটাকে টানিয়া তুলিয়া সহজ কণ্ঠেই প্রশ্ন করিল, একটু চা-ও কি খাবে না?

—হ্যাঁ, তা খাবো। কিন্তু তার আগে স্নান করবো।

সন্ধ্যা তাহাকে নিজেই মুখ হাত ধুইবার জল আনিয়া দিল। ইচ্ছা করিয়াই সে কাল দাসী চাকরকে বিদায় দিয়াছে। পুরাণের তপস্বিনীদের মত এই একটি দিন স্বামীর সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে সে—ইহার ভাগ অপর কাহাকেও দিতে রাজী নয়। স্নানের জলও নিজেই তুলিয়া—নিজের হাতে ভূপেনের মাথায় তেল মাখাইয়া—স্নান করিতে পাঠাইল। তাহার পর চা তৈয়ারি করিয়া আনিল অত্যন্ত সহজেই। প্রথম আঘাতের তীব্রতা ততক্ষণে চলিয়া গিয়াছে, এখন সে সহজ, শান্ত। এ সময়ের জন্য ত সে প্রস্তুতই ছিল।

একেবারে সিঁড়ির মুখে আসিয়া ভূপেন থমকিয়া দাঁড়াইল। সন্ধ্যা আজও বহুক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিল তাহাকে। তারপর শুধু একবার প্রশ্ন করিল, আর কি কোন দিন কোন কারণেই তোমার দেখা পাবো না?

—পাবে বৈকি, সন্ধ্যা। যখনই ডেকে পাঠাবে আসবো।···আমি জানি যে, অকারণে তুমি আমাকে কখনও ডাকবে না।

সে আর দাঁড়াইল না। দ্রুতপদে সিঁড়ি কয়টা পার হইয়া গাড়িতে গিয়া উঠিল। তাহার সমস্ত আশা, জীবনের সমস্ত আলো সে আজ চিরদিনের মত পিছনে ফেলিয়া চলিয়াছে, সামনে পড়িয়া আছে শুধু অনন্ত অন্ধকার রাত্রি। তবু দেরি করিলে চলিবে না, ইতস্তত করা সম্ভব নয়। তাহার স্থান সেইখানেই—যেখানে তাহার কর্তব্য আছে, তাহার কল্যাণী আছে।

গাড়িখানা একসময়ে ধুলা উড়াইয়া দূর মাঠের পথে অদৃশ্য হইয়া গেল।

—শেষ—

কলকাতার কাছেই

প্রথম পরিচ্ছেদ

এক

কলকাতার কাছে—খুবই কাছে। শহরের এত কাছে যে এমন দেশ আছে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। অথচ হাওড়া থেকে বি. এন. আর-এর গাড়িতে চাপলে আট ন মাইলের বেশী নয়। বার-তুই বদল করতে যদি রাজী থাকেন ত বাসেও যেতে পারেন—অবশ্য বর্ষাকাল বাদ দিয়ে, কারণ সে রাস্তা বর্ষায় অগম্য হয়ে ওঠে।

স্টেশন থেকে নেমে সোজা যে রাস্তা চলে গেছে, সেই রাস্তা ধরে মিনিট তিন-চার হাঁটলেই আপনার মনে হবে যে আপনি কোন গহন অরণ্যে প্রবেশ করছেন। রাস্তা এবড়োখেবড়ো—খানা-খন্দে লুপ্তপ্রায়। এ নাকি পাকা রাস্তাই কিন্তু আজ আর তার কোন চিহ্ন কোথাও খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। বর্ষায় কাদা হয় হাঁটু সমান, তারই মধ্যে গোরুর গাড়ি ও ভারী ভারী লরি গিয়ে তুধারে যে গর্ত হয়, বর্ষার শেষে সেটা শক্ত পাহাড়ের পাশে খাদের মত হয়ে থাকে, আর চৈত্র-বৈশাখ নাগাদ সবটা ভেঙে গুঁড়িয়ে ময়দার মত মিহি নরম ধুলোর দীঘিতে পরিণত হয়, পায়ের গোছ পর্যন্ত ডুবে যায় তার ভিতর। রাস্তার আশেপাশে অসংখ্য পানা-ভর্তি ডোবা আপনার নজরে পড়বে—এক-আধটা পুকুর চোখে পড়াও বিচিত্র নয়। বাড়ি-ঘর আছে, তার অস্তিত্ব টের পাবেন কিন্তু চোখে দেখবেন কদাচিৎ, কারণ আপনার দৃষ্টি এবং সে সব বাড়ির মধ্যে নুয়ে-পড়া নিবিড় বাঁশবন ও তেঁতুল-জামরুল প্রভৃতি গাছের জড়াজড়ি,তাতে কত কি অসংখ্য বুনো লতা উঠেছে। সেই সব বাঁশের তু-একটা রাস্তার ওপরও নুয়ে এসে পড়েছে ; পথিকরা নিত্য যাওয়া-আসার সময় মাথা হেঁট ক'রে যায়, তবু সেগুলো কাটবার বা কাটাবার কথা কারও মনে পড়ে না।

রাস্তার ধারে ধারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পগার বর্ষার জলে এবং তারপর বহুদিন পর্যন্ত পাঁক ও কাদায় ভর্তি থাকে। অনেকের বাড়ি থেকেই ময়লা পড়বার এ-ই পথ, কিন্তু বেরোবার নয়। ফলে একটা চাপা ভ্যাপ্‌সা তুর্গন্ধ বাড়ির বাতাসকে সর্বদা ভারী ক'রে রাখে। এই সব পগার গোসাপ ভাম ও ভোঁদড়ের আড্ডা। কুৎসিত ভয়ঙ্কর গোসাপগুলো একেবেঁকে প্রকাশ্য দিবালোকেই চলাফেরা করে। মশা এখানে দিনের বেলাতেও আত্মগোপন করা আবশ্যক মনে করে না, দিবা-রাত্রির প্রতিটি মুহূর্তই ম্যালেরিয়ার সর্বনাশা বিষ ছড়িয়ে বেড়ায়।

ফলে যে মানুষগুলো সদা-সর্বদা এখানে বাস করে তারা সবাই অর্ধমৃত ; ম্যালেরিয়া ও পেটের অসুখ ওদের জীবনীশক্তিকে যেন নিঙড়ে বার ক'রে নিয়েছে। জীবনকে ওরা যেন প্রতিমুহূর্ত ব্যঙ্গ ক'রে চলেছে। যারা অফিস করে তারাও যে খুব সুস্থ তা নয়—তবে জ্বর হ'লেও কাঁপতে কাঁপতে তাদের অফিস যেতে হয়—বিকেলে আসবার সময় যথারীতি বাজারের থলিও সঙ্গে থাকে—সুতরাং ঐটুকু প্রাণের লক্ষণ তাদের আজও যায় নি। তারই মধ্যে যারা একটু ভাল চাকরি করে, অর্থাৎ যাদের ডি. গুপ্ত কিংবা এডওয়ার্ডস্ টনিক কিনে খাবার সঙ্গতি আছে, তাদের অবস্থা একটু ভাল ; আরও ভাল চাকরি করে যারা, তারা এখানে থাকে না—বেকার আত্মীয়দের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় গিয়ে বাসা নিয়েছে।

অথচ এখানে রাজা আছেন, রাজার চেয়েও ধনী জমিদার আছেন। তাঁরা নাকি প্রজাদের কষ্ট হবে বলেই মিউনিসিপ্যালিটি হ'তে দেন না। রাজারা এখানে থাকেন না—জমিদারদেরও অনেকেই বালিগঞ্জে বাড়ি নিয়েছেন। অবশ্য গ্রাম-বাসীরা চেষ্টা করলে তাঁরা বাধা দিতে পারতেন না এটা ঠিকই কিন্তু সে চেষ্টা করবে কে ? বছরে ন মাসই তারা অসুস্থ থাকে। এখন সম্প্রতি যুদ্ধের দৌলতে কিছু লোক এসেছে, বাস্তুহারাও কিছু কিছু দেখা দিয়েছে বটে—রাস্তাঘাটে লোক দেখা যায়, জোর হাসির আওয়াজ শোনা যায় মাঝে মাঝে, তাই বলে যদি মনে ক'রে থাকেন যে রাস্তাঘাটের কিছু উন্নতি হয়েছে কিংবা বনজঙ্গল কিছু কমেছে ত সে আপনার ভুল। সে ভুল, এখনও যদি আপনি চার আনা দিয়ে টিকিট কিনে ওখানে একবার যেতে রাজী থাকেন ত ভাঙতে বেশী দেরি হবে না।

তবে পথে যেতে যেতে দু-চারখানা বাড়ি বেশি নজরে পড়বে এটা ঠিক। কিন্তু বনজঙ্গল তাতে এমন কিছু কমে নি। খানিকটা এগিয়ে খালের পুল পার হয়ে রাজার বাড়ি ডাইনে রেখে বাজারের পাশ কাটিয়ে আরও যদি চলতে থাকেন ত একসময় আপনার মনে হবে দুপুরেই বুঝি সূর্য অস্ত গেছে—ভ্যাপ্‌সা গন্ধ আপনার নিঃশ্বাস রোধ ক'রে আনবে। বুঝবেন—আপনি এইবার শ্যামাঠাকরুনের বাড়ির কাছাকাছি এসেছেন।

অনেকখানি জমি নিয়ে ওঁর বাড়ি। ওঁরই নিজস্ব বাড়ি, স্বামীর নয় কিংবা ছেলে-মেয়েদেরও নয় এখনও পর্যন্ত। পুকুর আছে, তেইশটা নারকেল গাছ, প্রায় শতখানেক ঝাড় কলা, আম-জাম-জামরুল আমড়া সুপুরি আরও কত যে গাছ তার ইয়ত্তা নেই। বাঁশঝাড়ও আছে ওর মধ্যে। শ্যামাঠাকরুন তাঁর জমির এক বিঘত স্থানও বৃথা ফেলে রাখতে প্রস্তুত নন, ফলে গাছগুলি এত ঘনসন্নিবিষ্ট যে কোন গাছেই আজ আর ভাল ফলন হয় না। শ্যামাঠাকরুন প্রতিবেশীদের গাছে গাছে

ফল দেখেন, লাউ-মাচায় লাউ, মাটিতে কুমড়ো দেখেন আর নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দেন, 'মরণ আমার, মরণ! পোড়া কপাল হ'লে কি গাছপালাও পেছনে লাগে রে! কেন, কেন, আমি কি করেছি তোদের? ঐ সব চোখখাকী, শতেক-খোয়ারীদের বাড়ি মরতে যেতে পারো আর আমার কাছে আসতে পারো না?'

রাগে দাঁত কিড়মিড় ক'রে ওঠেন তিনি। দাঁত তাঁর এখনও অনেকগুলো আছে, সামনের প্রায় সবগুলোই আছে, যদিও উনআশি বছর বয়স হ'ল তাঁর। কিন্তু কোমরটা ভেঙে গেছে, রাস্তায় চলেন একেবারে যেন রাস্তার ওপর উপুড় হয়ে হয়ে। যখন খুব কষ্ট হয়, মধ্যে মধ্যে একবার কোমরে হাত দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করেন কিন্তু সবটা সোজা হয় না, কেমন একটা অদ্ভুত ত্রিভঙ্গ আকার ধারণ করেন।

তাই ব'লে তিনি চলাফেরাও বড় কম করেন না। এখান থেকে হেঁটে পোদ্‌ড়ো শালিমার শিবপুর পর্যন্ত সুদ আদায় করতে যান মাসে তিন-চার দিন। যেতে-আসতে দিন কেটে যায়, কারও বাড়ি কিছু জুটলে আহার করেন, নইলে উপবাসী থেকেই ফেরেন। সবাইয়ের বাড়ি খেতেও পারেন না, কারণ এখনও ওঁর জাতের সংস্কার যায় নি—খুব ছোট জাত ব'লে যাদের মনে করেন তাদের বাড়ি জলও খান না।...এ ছাড়া বাড়িতে থাকলেও তিনি এক মিনিট বসে থাকেন না—শুক্‌নো লতাপাতা, কলার বাস্‌না, নারকেল-সুপুরির বেল্‌দো—এই সব সংগ্রহ ক'রে বেড়ান সারাদিন, অবিশ্রান্ত। জমেছে বিস্তর, বাড়ির একখানা ঘর, রক দালান বোঝাই, তবু সংগ্রহের বিরাম নেই। বলেন, 'কেউ কি আমাকে এক মণ কাঠ কি কয়লা কিনে দিয়ে সাহায্য করবে, এ আমার সম্বচ্ছরের জ্বালানি হয়ে থাকবে। বর্ষার সময় কি তোদের মত ছ আনা শ দিয়ে ঘুটে কিনব নাকি?'

যদি কেউ প্রশ্ন করত, 'ও বামুন মা, তোমার গত বছরের পাতাই যে রয়েছে—,' তিনি বেশ একটু ঝেঁজেই জবাব দিতেন, 'থাক্ না বাছা, পাতায় নজর দাও কেন? এক বছর যদি বর্ষা বেশিই হয়, তখন কার কাছে ধার করতে ছুটব বলো?'

শুকনো পাতা আর টাকার সুদ, এ ছাড়া অন্য কোনও চিন্তা ওঁর ছিল না। সুদের লোভে আসল তাঁর অনেক বারই ডুবেছে। এমন সব জামিনে টাকা ধার দিয়েছেন যা আদায় হওয়া বা আদায় করা সম্ভব নয়। ঘটি বাটি বাসন রেখে বিস্তর টাকা ধার দিয়েছেন, সে সব স্তূপাকার হয়ে রয়েছে খাটের নিচে। কোন্‌টা কার এবং কত টাকা বা কত আনায় বাঁধা আছে সে হিসাবও আর করতে পারেন না—ফলে যে হয়ত এক টাকা ধার নিয়েছিল সে আট আনার ওপর সুদ হিসেব

ক'রে সুদ-আসল দিয়ে বাসনটা ছাড়িয়ে নিয়ে যায়।

অবশ্য তাতে যে ওঁর বিশেষ কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি আছে তা নয়। তিন ছেলে তাঁর, তিন মেয়ে; অসংখ্য নাতি নাতনী। নাতনীদেরও ছেলে-মেয়ে হয়ে গেছে। চাঁদের হাট বসবার কথা বাড়িতে। তবু আজ কেউ নেই তাঁর। এত বড় বাড়িটায় তিনি একা। সম্পূর্ণ একা। ঘরের জানলার পাশে অসংখ্য লতা, উঠানে এত গাছপালা যে একবিন্দু বাতাস কি একটুকরো আলো কোথাও দিয়ে ঢোকে না। চৈত্র-বৈশাখে যখন দম্‌কা দক্ষিণ-বাতাসে নারকেল গাছের মাথাগুলো মাতামাতি করে, বাঁশঝাড়ে বড় পাকা বাঁশের ডগাগুলো নুয়ে নুয়ে পড়ে, তখন এ-বাড়ির ঘরে বা রকে একটুও হাওয়ার আভাস টের পাওয়া যায় না। বেলা চারটে বাজলেই এ-বাড়িতে আলো জ্বালবার প্রয়োজন হয়, মশার গর্জন শুরু হয়ে যায় ঘরের কোণে কোণে—এই অন্ধকার ঝুপ্‌সি ভয়াবহ বাড়িতে শ্যামাঠাকরুন একা ঘুরে বেড়ান। সারাদিন পাতা কুড়িয়ে একরকম ক'রে কাটে কিংবা সুদের হিসাব করে। কিন্তু রাত্রিটা বড় দুঃসহ। ঘুম হয় না তাঁর আদৌ। তেল খরচের ভয়ে আলোও জ্বালেন না। দিনের বেলার আহার সারতেই বেলা তিনটে বাজে—কাজেই রাত্রে কিছু খাবার প্রয়োজন হয় না। হ'লেও অন্ধকারেই উঠে হাতড়ে হাতড়ে টিনের কৌটোর ঢাকনি খুলে চালভাজা বার করেন, অন্ধকারেই একটু তেল-হাত বুলিয়ে নেন—তারপর দীর্ঘ রাত পর্যন্ত কুড়কুড় ক'রে বসে বসে খান। সেই গাঢ় অন্ধকারে, —নক্ষত্রের আলো আসার উপায়ও সেখানে নেই—সেই চাপা দুঃসহ অন্ধকারে, প্রেতিনীর মত জেগে বসে থাকেন শ্যামা।...মনকে বোঝান, 'চোখে যখন ভাল দেখতে পাই নে, তখন আলো জ্বাললেই বা কি, না জ্বাললেই বা কি।' দিনের বেলাতেই ত ভাল দেখতে পান না—কেউ এসে 'বামুন মা' বলে ডাক দিলে কপালের অসংখ্য বলিরেখাগুলোকে একত্র কুঁচকে প্রাণপণে চাইবার ভান ক'রে মনে মনে কণ্ঠস্বরটাকে চেনবার চেষ্টা করেন, 'কে? অ...মহাদেবের মা। এস এস। আমি বলি আর কে!'

যে এসেছে সে হয়ত প্রতিবাদ ক'রে বলে, 'অ বামুন মা, আমি যে তোমার সীতা-বৌ গো।'

'ও মা, সীতা-বৌ! আমি বলি মহাদেবের মা।...আর মা, চোখে আজকাল মোটেই দেখতে পাই নে। এই যে তুমি এসে দাঁড়িয়েছ, আমি একটা ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা মানুষের মত দেখছি। মুখ চোখ নাক কি ঠাওর পাচ্ছি?' বামুন মা স্বীকার করেন শেষ পর্যন্ত।

যে এসেছে সে হয়ত বলে, 'চোখের ছানি কাটাও না কেন বামুন মা, আজ-

কাল ত অনেকেই কাটাচ্ছে।'

'আর মা, ক-টা দিনই বা আছি, তার জন্যে আবার কাটাছেঁড়া টানাটানি কেন? কী হবে বা চোখে দেখে? বই পড়তে ত আর যাবো না? এমনিই ত বেশ চলে যাচ্ছে।'

তারপর একটু থেমে বলেন, 'শুধু শুধু একগাদা টাকা খরচ।'

'তা হাসপাতালে ত যেতে পারো। এখানকার সব ত হাসপাতালে গিয়েই কাটিয়ে আসে।'

'কে নিয়ে যাচ্ছে আর কে বা কি করছে, তুমিও যেমন! আমার আর কে আছে বলো! না, ওসব আশা ছেড়ে দাও, এখন কোনমতে তোমাদের রেখে চলে যেতে পারলেই হ'ল।'

যে এসেছে সে হয়ত একটা বাটি রেখে চার আনা পয়সা নিয়ে চলে যায়। শ্যামা আবার সেই আব্‌ছায়া অন্ধকারে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। একা। শুকনো পাতা কুড়িয়ে, এখানের একটা গাছে একটু ঠেকো দিয়ে, ওখানে একটু মাটিটা কুপিয়ে দিয়ে—এমনি বাগানের তদ্বির ক'রে। ফসল হ'লেই বা কি, কে আর বাজারে গিয়ে বেচে আসবে? নাতি বলাইটা তবু ছিল, সে-ও শ্বশুর-বাড়িতে গিয়ে উঠল। 'বেইমান বেইমান। বেইমানের ঝাড় সব।' আপন মনেই গজগজ করেন শ্যামা, 'ঐ যে বলে না, ভাতারকে নিয়ে যে সুখী হতে পারলে না তার সুখ জন্মে হবে না! আমার সুখ! মুয়ে আগুন, যম ভুলে আছে তাই! এসব যে কার জন্যে করছি তার ঠিক নেই। সব ত মরে-হেজে গেছে, যমের দোরে গেছে সব!'

তবু তিনি ক'রেই চলেন। বাগান গাছপালার যত্নের ত্রুটি নেই। কৈফিয়ত-স্বরূপ নিজেকেই বলেন, 'ওরা কি আমার পর? বলে, কোলের বাছা আর বাড়ির গাছা!'

দুই

আজ আপনারা শ্যামাসুন্দরীকে যা দেখছেন তা থেকে কল্পনা করা শক্ত হ'লেও শ্যামা কিন্তু একদিন সত্যিই সুন্দরী ছিলেন। সাধারণ সুশ্রী মেয়ে নয়—বেশ একটু অসাধারণ রকমের সুন্দরী। ঐ ধনুকের মত বাঁকা দেহ একদিন কলাগাছের চারার মতই সতেজ সরল ও পুষ্ট ছিল, মাথাজোড়া টাকের জায়গায় ছিল মাথাভর্তি মেঘের মত নিবিড় কালো চুল; সারা পিঠ আচ্ছন্ন ক'রে কোমর ছেয়ে উরু পর্যন্ত ঢেকে দিত সে চুল। ঐ ছানি-পড়া স্তিমিত-দৃষ্টি চোখে একদিন বিদ্যুৎ খেলত,

সে কটাক্ষে পুরুষের চিত্তে অকস্মাৎ দাহ সৃষ্টি করার কথা। তবে চোখের তারা খুব কালো নয়, ঈষৎ পিঙ্গল বলা যায় কিন্তু তাতে বিশেষ ক্ষতি হ'ত না। উজ্জ্বল গৌরবর্ণের সঙ্গে সেটা মানিয়ে যেত। পাতলা পাতলা চাপা ঠোঁটে যখন হাসির ঝিলিক খেলে যেত তখন তার আড়াল থেকে দেখা যেত মুক্তোর মত সাজানো সুন্দর দাঁত—তার কিছু চিহ্ন বরং এখনও আছে। সে রূপের কথা বিশ্বাস না করেন আমার সঙ্গে কল্পনায় আজ থেকে উনসত্তর বছর আগে শ্যামার বিবাহ-সভায় চলুন, আমি দেখিয়ে দেব।

ঠিক দশ বছর বয়সে শ্যামার বিয়ে হয়। তখন ঐরকমই হ'ত। বরং ওর বড়দির বিয়ে হয়েছিল একটু বেশি বয়সে; বারো বছরের মেয়ে তখন তিনি, তাইতেই লোকে বলত ধাড়ী মেয়ে। শ্যামার দিদি ছিলেন শ্যামবর্ণের, তাই পাত্র পেতে কিছু দেরি হয়েছিল। শ্যামা তার নাম মিথ্যা ক'রে গোলাপের মত গাত্র-বর্ণ নিয়ে অসাধারণ সুন্দরী হয়ে উঠেছিল—সুতরাং ঘটকী জোরগলায় সম্বন্ধ করেছিল, 'যদি এক কথায় সবাইকার পছন্দ না হয় তো ঘটকীর কাজ ছেড়ে দেব মা-ঠাকরুন, ডাকের সুন্দরী মেয়ে—এ মেয়ে পছন্দ হবে না, বলেন কি?'

তা ঘটকী পাত্রটিও বেশ যোগাড় করেছিল। চোখ জুড়িয়ে গিয়েছিল শ্যামার মায়ের। আঠার-উনিশ বছরের কিশোর ছেলে, বেশ চেহারা—বলিষ্ঠ গড়ন, উজ্জ্বল-শ্যাম বর্ণ, টানা টানা বড় চোখে ঘন কালো পাতা, কাজল-পরার মত মনে হয়; যেমন স্বাস্থ্য, তেমনি শ্রী, বলবার কিছু নেই। তাছাড়া খিদিরপুরে নিজেদের বাড়ি আছে। ছেলের বাবা অবশ্য যজমানী করতেন, কিছু কিছু শিষ্যও ছিল। বড় ভাই কোথায় চাকরি করে, ছোটও একটা যা হয় জুটিয়ে নিতে পারবে। বাংলা লেখাপড়া কিছু জানে, এ ছাড়া টাকা-পয়সা জিনিসপত্র বেশ কিছু আছে। বিধবা শাশুড়ী আছেন—বড় ভাশুর, জা, তার একটি ছেলে,—সংসারও ছোট।

এক কথায় সব দিক দিয়েই সুপাত্র।

শ্যামার মা আর ইতস্তত করেন নি। খোঁজ-খবর যেটুকু করার করেছিলেন, তবে বেশি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ তিনিও বিধবা, তিনটি মেয়ে নিয়ে অল্পবয়সে বিধবা হয়েছিলেন, বিষয়সম্পত্তি কিছুই পান নি—ঘটনাচক্রে শুধু সামান্য কিছু নগদ টাকা আর গহনাপত্র নিয়ে ভদ্রমহিলাকে পালিয়ে আসতে হয়েছিল কলকাতায়। ফলে দেশে যাবার আর তাঁর মুখ নেই। জ্ঞাতিরাও খবর নেয় না, দুর্নাম তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে। এখানে তাঁর এক দাদা দেখাশুনো করতেন, তিনিও মারা গিয়েছেন। বড় জামাই অবশ্য খুবই ভাল, আর্থিক সাহায্য যথেষ্ট করে কিন্তু তার সময় কম—এসব কাজ তার দ্বারা হয়ে ওঠে না। পরকে ধরে

আর কতটুকু করা যায় ?

তাছাড়া, খবর নেবার আছেই বা কি ? এই ঘট্‌কীই তাঁর বড় মেয়ের সম্বন্ধ করে দিয়েছিল। সুতরাং তাকে অবিশ্বাস করবেন কি করে ?

শ্যামারও সেদিন ব্যাপারটা মন্দ লাগে নি। এক-গা গয়না, বেনারসী কাপড় পরে মল বাজিয়ে শ্বশুরবাড়ি যাওয়া—অমন সুন্দর বর (অবশ্য সবাই বলছে তাই, শ্যামাসুন্দরীর সেদিন অত বোঝবার কথা নয়)—সবটা জড়িয়ে ওর মনে যেন একটা নেশা লেগেছিল। আলো বাজনা লোকজন—শাশুড়ীর সদয় মিষ্টি ব্যবহার সবটাই ছিল মানসিক সেই অবস্থার অনুকূলে।

প্রথম একটা রূঢ় আঘাত পেলে শ্যামা ফুলশয্যার রাত্রে।

সবাই বর-কনেকে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে, শ্যামা অপেক্ষা করছে দুরু-দুরু বুকে। কিসের যেন একটা আশা। ফুলশয্যার রাত্রে স্বামীরা অনেক রকম আদর করে, অনেক রকম মিষ্টি কথা বলে—এ তার শোনা আছে আব্‌ছা আব্‌ছা ; বিবাহিতা বন্ধুদের এবং বড়দির কথার আড়ালে সেই রকমই ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। যদিও সঠিক কোন বর্ণনা পায় নি কারুর কাছেই। তখনকার দিনে বড় বোনরা সন্তানাদি হবার আগে ছোট বোনদের সঙ্গে এসব কথা আলোচনা করত না। আর পনেরো ষোল বছরের দিদি দশ বছরের বোনকে কীই বা বলবে ?

যাই হোক, আশা যেমন আছে, লজ্জাও বড় কম নেই। কোথা থেকে যেন রাজ্যের লজ্জা এসে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, সে বসে বসে ঘামছে। কিন্তু নরেন বেশ সপ্রতিভ, সবাই চলে যেতেই সে এক লাফে উঠে দরজাটা বন্ধ করে আবার খাটে এসে বসল। তারপর মিনিটখানেক একটু ইতস্তত ক'রে চাপা গলায় ডাকল, 'এই, শোন।'

শ্যামা হয়ত এই আহ্বানেরই অপেক্ষা করছিল, তবু স্বরটা যেন ঠিক বাজল না। ডাকলেই কি সাড়া দেওয়া যায় ?

'এই, শোন না। কী ইয়ারকি হচ্ছে !'

নরেন ওর একখানা হাত ধরে হ্যাঁচ্‌কা টানে কাছে নিয়ে এল। সে টানের জন্য প্রস্তুত ছিল না শ্যামা—একেবারে নরেনের গায়ের ওপর এসে পড়ল। অস্ফুট কি একটা বিস্ময়ের স্বরও ওর গলা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

'আহা, ঢং দেখ না। লজ্জা দেখে মরে যাই একেবারে! দেখি, সোজা হয়ে বসো। মুখখানা দেখি একবার ভাল ক'রে। সবাই বলছে সুন্দর সুন্দর—আমার ছাই ভাল ক'রে দেখাই হ'ল না একবার।'

সে জোর ক'রে শ্যামার মুখখানা 'শেজ'-এর ক্ষীণ আলোয় যত তুলে ধরতে

যায় ততই ওর মুখ লজ্জায় গুঁজে পড়ে। সুগোর সুডৌল চন্দন-চর্চিত একটি ললাট ও আবীর-ছড়ানো দুটি গালের আভাস পায় নরেন অথচ ভাল ক'রে দেখতে পায় না কিছুতেই, এমনি মিনিটখানেক চেষ্টা করবার পর নরেন ওর মাথায় সজোরে এক গাঁট্টা মেরে বলল, 'ও আবার কি ছেনালি হচ্ছে—সোজা হয়ে বসো বলছি নইলে মেরে একেবারে পস্তা উড়িয়ে দেব। তেমন বর আমাকে পাও নি। হুঁ-হুঁ, আমি বাবা পুরুষ-বাচ্চা। মাগের ভেড়ো হবার বান্দা নয়। সোজাসুজি চলো বেশ আছি, ন্যাকামি করেছ কি আমি বাপের কুপুত্তুর।'

শ্যামা আড়ষ্ট হয়ে গেছে ততক্ষণে। এই কি ফুলশয্যা তার? এই তার স্বামীর প্রথম প্রণয়-সম্ভাষণ!

তাছাড়া তখনকার হিসাবে শ্যামার মা বেশ ভাল রকমই শিক্ষিতা ছিলেন, অনেক বাংলা সাহিত্যের বই আছে তাঁর তোরঙ্গে—শ্যামারাও দুই যমজ বোনে ছাত্রবৃত্তি অবধি পড়েছিল; এ শ্রেণীর ভাষা তারা শুনতে অভ্যস্ত নয়—ভদ্রসমাজে এমন কথাবার্তা অচল বলেই জানে। কাজেই দৈহিক বেদনায় যত না হোক অজ্ঞাত একটা আশঙ্কায় ও আশাভঙ্গের ব্যথায় ওর দুটি প্রশস্ত সুন্দর চক্ষু ছাপিয়ে কপোল বেয়ে হু-হু করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

'উঁ! অমনি পান্‌সে চোখে পানি এসে গেল! আল্‌গোছলতা!...দ্যাখো এসব চালাকি আমার সঙ্গে চলবে না ব'লে দিলুম। আমি যা ধরেছি তা করবই, তুমি চেনো না আমাকে। ভাল চাও ত ভালয় ভালয় মুখখানা তোল। হ্যাঁ, এমনি ক'রে, আলোর দিকে—'

শ্যামা ভয়ে ভয়ে মুখ তুলতে বাধ্য হয়।

কিন্তু শুধু মুখ তুললেই চলবে না।

'চোখ চাও। দেখি কেমন ডাগর চোখ।'

চোখ চাওয়াটাই সবচেয়ে কঠিন কাজ, বিশেষত এই অবস্থায়। চেষ্টা ক'রেও চোখ চাইতে পারে না শ্যামা।

'আবার চ্যাঁটামি করে! চোখ চাইতে পারছ না ভাল ক'রে?'

ওর বাহুমূলে সজোরে একটা চিমটি কাটে নরেন। দশ বছরের মেয়ের নরম শুভ্র চামড়ায় নীল দাগ পড়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। তার ফলে চোখে আরও বেশি জল এসে যায়—এবার যন্ত্রণায়। চোখ আর চাওয়া হয় না কিছুতেই।

'ধ্যেৎ—বদমাইশ অবাধ্য কোথাকার!'

ওকে এক ঠেলা দিয়ে খাট থেকে নামিয়ে দিয়ে নরেন নিজে শুয়ে পড়ল বেশ আরামে পা ছড়িয়ে। একটু পরেই তার নিয়মিত নিঃশ্বাস পড়ার শব্দে বোঝা গেল

যে ঘুম বেশ গাঢ় হয়ে এসেছে।

শ্যামা সেই অবস্থায় সারারাত মেঝের ওপর বসে রইল আড়ষ্ট স্তব্ধ হয়ে। চোখের জল ফেলতেও তখন যেন ভয় করছিল ওর।

পরের দিন ওর শাশুড়ী বোধ করি ওর রাত্রি জাগরণে ক্লিষ্ট মুখ ও আরক্ত চক্ষু দেখে কিছু অনুমান করলেন। ওকে কোলে বসিয়ে অনেক আদর ক'রে একসময় চুপি চুপি প্রশ্ন করলেন, 'হ্যাঁ বৌমা, ছেলেটা আমার একটু গোঁয়ার-গোবিন্দ, কাঠখোট্টা গোছের। কাল তোমাকে কিছু ধমক-ধামক করে নি ত?'

শ্যামা কি উত্তর দেবে ভেবে না পেয়ে চুপ ক'রে রইল। তার ফলে তিনি আরও শঙ্কিত হয়ে উঠলেন, পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে আবারও প্রশ্ন করলেন, 'বলো না বৌমা, লজ্জা কি? আমিও যে তোমার মা হই মা!'

এই ব'লে তিনি ওর মুখখানা জোর ক'রে তুলে ধরে সস্নেহে একটি চুমো খেলেন।

এবার আর শ্যামা স্থির থাকতে পারলে না, ওর চোখের জল স্বাভাবিক সমস্ত লজ্জা ও সঙ্কোচ ভেঙে বেরিয়ে এল। ততক্ষণে ক্ষমাসুন্দরীরও চোখ পড়েছে ওর আরক্তিম বাহুমূলের দিকে। তিনি প্রায় আর্তকণ্ঠেই বলে উঠলেন, 'বৌমা!'

শ্যামা এবার একটি একটি করে সব কথাই বললে। লজ্জায় ঘৃণায় ক্ষমাসুন্দরী যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে চাইলেন। শ্যামার হাত দুটি ধরে বললেন, 'বৌমা, ও যে বামুনের ঘরের গোরু—ভদ্রলোকের ঘরে একটুও লেখাপড়া না শিখলে এই রকমই হয়।...তা হ'লেও ও যে এত অমানুষ হ'তে পারবে তা আমি ভাবি নি মা। তা হ'লে অন্তত তোমার মত মুক্তোর মালা ওর গলায় ঝুলিয়ে দিতুম না। তুমি কিছু মনে ক'রো না মা।'

সত্যিই তাঁর মনে বড় লেগেছিল। সারাদিন ইতস্তত ক'রে শেষ পর্যন্ত বিকেলের দিকে বড় ছেলে দেবেনকে গিয়ে কথাটা তিনি বলেই ফেললেন। দেবেনও কম রগচটা নয়—সে পরিচয় শ্যামা উত্তর-জীবনে ভাল ক'রেই পেয়েছিল—সে তখনই বেরিয়ে এসে ছোট ভাইয়ের ঘরের সামনে গিয়ে ডাকলে, 'নরো!'

নরেন তখনও ঘুমোচ্ছিল; সে একটু বিস্মিত, কিছু বা রুষ্টভাবেই বেরিয়ে এল।

'কেন?'

'কেন! হারামজাদা, সব তাইতে তোমার গোঁয়ারতুমি!'

'ছাখো দাদা—খামোকা গালাগাল দিও না বলে দিচ্ছি। কি—হয়েছে কি?'

'বৌমাকে অমন করে মেরেছিস কেন?'

'কে বললে মেরেছি!'

'কে আবার বলবে। এখনও কালশিটে পড়ে আছে।'

'বেশ করেছি মেরেছি,' মুখ গোঁজ করে উত্তর দেয় নরেন, 'আমার পরিবারকে আমি মেরেছি। তোমার বৌকে ত মারতে যাই নি!'

দেবেন ধাঁ করে এক চড় কষিয়ে দিলে ওর গালে, 'ফের আবার মুখে মুখে চোপা! হারামজাদা, শুয়োর কম্‌নেকার!'

সে চড়ের ধাক্কা সামলাতে নরেনের কিছুক্ষণ সময় লাগল। দেবেনের রোগা রোগা শক্ত কেঠো হাত। পাঁচ আঙুলের দাগ বসে গিয়েছিল নরেনের গালে।

কিন্তু নরেনও ক্ষেপে গেল যেন একেবারে। ওর চোখে জল এসে গিয়েছিল তবু সে গালে হাত বুলোতে বুলোতে ওকে ভেংচি কেটে খিঁচিয়ে জবাব দিলে, 'ফের মুখে মুখে চোপা! কেন চোপা করব না তাই শুনি? তুমি আমাকে খাওয়াচ্ছ পরাচ্ছ? তোমার খাই, না তোমার বাবার খাই?'

'ফের্—ফের্ শালা, আবার কথা কইছিস! আমার বাবার খাস না তো কার বাবার খাস? তোর বাবা আমার বাবা কি আলাদা—মুখ্যুখুর ডিম কোথাকার!'

'তুমি আমাকে মারবার কে? আমাকে গালাগাল দেবার কে? আমার যা খুশি আমি তাই করব।'

নরেন রাগে গজরায় আর এক-একটা বাক্য শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দেবেনের সামনে পা ঠোকে।

'দেখবি? দেখবি একবার?' তেড়ে এগিয়ে যায় দেবেন।

শুরু হয়ে গেল গজ-কচ্ছপের লড়াই। দেবেন ওর চুলের মুঠি ধরে মাথাটা হেঁট ক'রে পিঠে গুমগুম ক'রে কিল মারতে লাগল, নরেন ওর যে হাতটা সামনে পড়ল সেইটা ধরলে সজোরে কামড়ে। এমনই জোরে কামড়ে ধরেছিল যে কষ বেয়ে কয়েক ফোঁটা রক্তও গড়িয়ে পড়ল।

ফলে দেবেনের স্ত্রী মড়াকান্না জুড়ে দিল। শ্যামা প্রথমটা ব্যাপার দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল, এখন রাধারাণী কেঁদে উঠতে সেও চিৎকার করে কেঁদে উঠল। আর ক্ষমাসুন্দরী ওদের কাছে এসে মেঝেতে মাথা খুঁড়তে শুরু করলেন, 'ওরে তোদের জ্বালায় কি আমি মাথামুড় খুঁড়ে মরব! ওরে, কেউ আমাকে আপিং এনে দে, খেয়ে মরি। আমার আর সহ্য হয় না।'

বিয়েবাড়ির সব কুটুম্ব তখনও বিদায় নেয় নি। তাদেরই দু'চারজন ছুটে এসে অতিকষ্টে দুই ভাইকে আলাদা ক'রে দিলে। নরেনকে ঘরে পুরে বাইরে থেকে শেকল তুলে দেওয়া হ'ল। সে ভেতরেই দাপাদাপি ক'রে গজরাতে লাগল।

আর দেবেন কামড়ানো জায়গাটা ফটকিরির জলে ধুয়ে কাপড়ের ফালি দিয়ে বাঁধতে বাঁধতে অবিশ্রান্ত গালাগালি দিতে লাগল। বলা বাহুল্য যে তার মধ্যে নিজের মা-বাবাও বাদ গেলেন না।

সেদিন সন্ধ্যার পর কিছুক্ষণ বিপন্নমুখে ইতস্তত করবার পর শ্যামা লাজলজ্জার মাথা খেয়ে একসময়ে ব'লেই ফেললে, 'মা, আজ আমি আপনার কাছে শোব।'

ক্ষমার মুখটা চকিতে রাঙা হয়ে উঠলেও সস্নেহে ওর গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন, 'তাই শুয়ো মা। দরকার নেই আজ আর ও বাঁদরটার কাছে গিয়ে।'

কিন্তু সে বন্দোবস্তের কথা নরেন জানত না। সে শুয়ে শুয়ে খানিকটা অপেক্ষা করার পর কান পেতে যখন বুঝতে পারলে, সব বাড়ি নিস্তব্ধ হয়ে গেছে, অর্থাৎ সবাই শুয়ে পড়েছে, তখন আর স্থির থাকতে পারলে না। মার ঘরের বাইরে এসে শেকলটা নেড়ে প্রশ্ন করলে, 'মা, বৌ কোথায়?'

শ্যামার বুক ভয়ে গুরগুর ক'রে উঠল। সে সজোরে শাশুড়ীকে আঁকড়ে ধরল। ক্ষমা একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'বৌমা ঘুমিয়ে পড়েছে এখানে, তুই শুতে যা।'

'ওকে ডেকে দাও না। ঘুমিয়ে পড়েছে ত কি হয়েছে? নবাব-নন্দিনী!'

'আজ থাক্ গে। ওর শরীরটা খারাপ।'

'বা রে, বৌ যদি তোমার কাছেই থাকবে ত আমার বিয়ে দিলে কেন?'

'আ খেলে যা! ঐখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে চোপা করতে লজ্জা করছে না? যা শুগে যা, এক রাত্তির বৌ আমার কাছে রইল ত মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল একেবারে!'

ওধারে দেবেন ততক্ষণে তার ঘরের জানলায় মুখ বাড়িয়েছে, 'ফের্ যদি কারুর গলার শব্দ পাই একবার ত কেটে দুখানা ক'রে ফেলব বলে দিচ্ছি।'

সে বেরিয়েই আসত যদি না রাধারাণী পেছন থেকে ওকে জড়িয়ে ধরে ঝুলে পড়ত একেবারে।

কিন্তু কে জানে কেন, নরেনও আর বিশেষ গোলমাল করলে না, শুধু এ বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে তার আপত্তি এবং রাগ জানাবার জন্য দুমদুম করে পা ফেলে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকে ঝনাৎ করে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলে।

তিন

তবুও বিয়ের আটদিন পরে শ্যামা যখন এক বছরের মত বাপের বাড়ি ফিরে এল তখন ওর কিশোর স্বামীর জন্য বেশ একটু মন-কেমনই করেছিল। স্বামীর যে

পরিচয় এ-কদিন সে পেয়েছে তা আশারও নয়, আনন্দেরও নয়। তবু কিসের একটা যেন আকর্ষণ ওকে উন্মনা করে তোলে। সে অবসর পেলে জানলায় বসে বসে নরেনের কথা ভাবে।

আসবার সময় অবশ্য নরেন ব'লে দিয়েছিল, 'গিয়ে চিঠি লিখিস।'

'ওমা—সে আবার কি! চিঠি লিখব কি?'

'কেন? তুই ত লেখাপড়া জানিস। আমিই কি আর একেবারে জানি না? আজকাল ত অনেকে চিঠি লেখে শুনেছি—।'

সবেগে ঘাড় নেড়ে শ্যামা জবাব দিয়েছিল, 'না না—সে আমি পারব না। হয়ত বট্‌-ঠাকুরের হাতে পড়বে, নয়ত দিদির হাতে—কি ধরো মার হাতেই পড়ল, সে ভারি ঘেন্নার কথা! তারপর তুমি যদি জবাব দাও, আর মা যদি দেখতে পান? মা গো!'

নরেন খাটে বসে পা দোলাতে দোলাতে এক হাতের একটা নখ কাটছিল দাঁত দিয়ে, সে জবাব দিতে পারে নি ভালরকম। শুধু প্রশ্ন করেছিল, 'তবে?'

'এই ত এইখান থেকে এইখানে। তুমি যাবে রোজ রোজ।'

'হঁ্যা—তোর মা যদি নেমন্তন্ন না করে?'

তখন বিনা নিমন্ত্রণে শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার কথা কেউ ভাবতেও পারত না।

'ফের্ তোর মা? বলে দিয়েছি না তিনি তোমারও মা, শুধু মা বলবে।'

'ধ্যোস্—লজ্জা করে।'

প্রসঙ্গটা সেইখানেই চাপা পড়লেও শ্যামা ভোলে নি। ওর যমজ বোন উমাকে দিয়ে মার কাছে কথাটা পাড়িয়েছিল। মা-ও অবিবেচক নন। তিনি প্রথম একটু ঘনঘনই নিমন্ত্রণ করতে লাগলেন।

কিন্তু তার ফলে জামাইয়ের স্বভাব আর চাপা রইল না। প্রেম-সম্ভাষণের উষ্ণতা ও উগ্রতা শুধু পাশের ঘরে কেন, মধ্যে মধ্যে গোটা বাড়িটাই কাঁপিয়ে তোলে। বিশেষ ক'রে যেদিন গালে পাঁচ আঙুলের দাগসুদ্ধ মেয়ে ভোরবেলা বেরিয়ে এল সেদিন আর ওর মা রাসমণি স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি খুব রাশভারী মানুষ ছিলেন, একা মেয়েছেলে তিনটি বালিকা নিয়ে বাস করলেও কেউ একটা কথা বলতে সাহস পেত না কোনদিন। তিনি ঘরে ঢুকে সোজা তর্জনী দিয়ে সদর দরজা দেখিয়ে জামাইকে বললেন, 'যাও, আভি নেকাল যাও। আর কোনদিন এ দরজায় ঢুকো না। মেয়েও আর আমি পাঠাবো না। বুঝবো মেয়ে আমার বিধবা হয়েছে—যাও বলছি!'

ওঁর রণরঙ্গিণী মূর্তি দেখে জামাই নরেন ভয় পেয়ে গেল। সে আমতা আমতা

ক'রে বললে, 'মাইরি মা, এই আপনার দিব্যি, হঠাৎ রাগের মাথায়—মানে মেয়েও আপনার বড় ঢ্যাঁটা। এই আপনার পায়ে ধরছি, আর কখনো—'

সে হেঁট হয়ে পায়ে ধরতে যেতেই রাসমণি দু পা পেছিয়ে গিয়ে আরও কঠোর স্বরে বললেন, 'যাও—। কোন কথা শুনতে চাই না—আভি নেকাল যাও—'

অগত্যা এক পা এক পা ক'রে সেদিন নরেনকে বেরিয়ে যেতেই হয়েছিল।

শ্যামা কিন্তু এ ঘটনায় অত্যন্ত মনমরা হয়ে পড়ল। বিশেষ ক'রে কথাটা চাপা রইল না। এ নিয়ে যেমন আলোচনা চলতে লাগল পাড়া-ঘরে, তেমনি দলে দলে দুঃখ ও সমবেদনা জানাবার লোকের অভাব রইল না। স্বামী ঠিক কী বস্তু বা ভবিষ্যৎ জীবনে তার কী হতে পারে এ সম্বন্ধে স্বচ্ছ কোন ধারণা না থাকলেও শ্যামা বুঝতে পারলে তার মস্তবড় একটা সর্বনাশ হ'তে চলেছে। সে রীতিমত কান্নাকাটি জুড়ে দিল এবং এই সমস্ত দুঃখের মূল ব'লে আকারে ইঙ্গিতে মাকেই দায়ী করতে লাগল।

রাসমণি মাস পাঁচ-ছয়ের মধ্যেই অস্থির হয়ে উঠলেন। শেষ পর্যন্ত লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে নিজেই জামাইকে নেমন্তন্ন করে আনাবেন কিনা ভাবছেন, এমন সময় শ্রীমান স্বয়ং একদিন এসে হাজির। মুখটা একটু শুকনো, এক হাঁটু ধুলো, কোথা থেকে বিরাট এক মানকচু ঘাড়ে করে বাড়ি ঢুকল। শাশুড়ীকে দেখেই মানকচুটা পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে একেবারে গড় হয়ে এক প্রণাম, তারপর একটু কাঁচুমাচু ভাবেই বললে, 'এই এদিকে এসেছিলুম, মানে একটু কাজ ছিল কি না, তা মা বললে, যাচ্ছিস যখন কচুটা বেয়ানঠাকরুনকে দিয়ে আয়। মানে, বললে বিশ্বাস করবেন না—কচুটা আমাদের বাগানের।'

অতিকষ্টে হাসি সামলে রাসমণি বললেন, 'আচ্ছা হয়েছে, তোমাকে বাবা আর একঝুড়ি মিছে কথা বানিয়ে বলতে হবে না। হাত মুখ ধোও। খাওয়া-দাওয়া করো।'

নরেন যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। জলখাওয়া শেষ ক'রে শাশুড়ীর রান্নাঘরের চৌকাঠে বসে তাঁর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলে। কত কি গল্প! সে অনর্গল বকুনিতে রাসমণি যেন হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। দু-একবার ধমকও দেবার চেষ্টা করলেন কিন্তু সে ধমক গায়ে মাখবার পাত্র নরেন নয়।

তবে রাসমণি তাঁর মত বদলাবার মেয়ে নন। পরের দিন সকালে উঠতেই জামাইকে তিনি বললেন, 'আজকে ভাল দিন আছে, শ্যামাকে নিয়ে তুমি বাড়ি চলে যাও।'

নরেন তখনও বুঝতে পারে নি। সে বললে, 'কিন্তু এখনও ত এক বছর হয়

নি। তাছাড়া সেই দ্বিরাগমনের কি সব আছে-টাছে।'

'তা থাক্।' নিস্পৃহ কঠিন কণ্ঠে বলেন রাসমণি 'মেয়ে থাকতে পারে এখানে, কিন্তু তোমার তা হ'লে আসা হবে না। যা ভাল বোঝ করো। তবে মেয়ে যেতে চায়, সে ব্যস্ত হয়েছে—নিয়ে যেতে পারো। আমি গাড়ি ভাড়া ক'রে দিচ্ছি, ভাড়াও দিয়ে দিচ্ছি। ঘর-বসতের যা জিনিস সঙ্গে দেবার আনিয়ে দিচ্ছি। স্বামী সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলে দোষ নেই শুনেছি। আজই নিয়ে যাও।'

কিছুতেই কোনমতেই তাঁকে টলানো গেল না। শ্যামা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। রাসমণি খুঁটিয়ে সব বাজার ক'রে গাড়িতে তুলে ওদের বিদায় ক'রে দিয়ে কাঁদতে বসলেন। তার আগে ওঁর মুখের একটি শিরাও কেউ কাঁপতে দেখে নি।

যদিও শেষ পর্যন্ত ওঁর প্রতিজ্ঞা রাখা সম্ভব হয় নি। ক্ষমাসুন্দরী নিজে এসে ছেলের হয়ে হাতে-পায়ে ধরে ক্ষমা-চেয়ে গেলেন। বললেন, 'ভাই, এ হিন্দুর বিয়ে। ও সিঁদুরের দাগ ত মোছবার নয়। তাই ব'লে পেটের মেয়েটাকে সুদ্ধ ত্যাগ করবে? আমার মুখ চেয়ে তুমি ওকে মাপ করো।'

রাসমণিও মনে মনে বোধ হয় দুর্বল হয়ে এসেছিলেন। তিনি মেয়ে জামাইকে আবার নিমন্ত্রণ ক'রে ডেকে আনলেন। আবার আসা যাওয়া শুরু হ'ল।

দিন কাটতে লাগল।

কিন্তু দিন-মাস-বছর একটু একটু ক'রে বালিকা শ্যামার তনু-দেহই শুধু কৈশোরের লাবণ্যে ভরে দিয়ে গেল, ওর অদৃষ্টের কোন পরিবর্তন আনতে পারল না। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি আসক্তি বাড়তে লাগল এটা ঠিক, তবে তাই ব'লে লাঞ্ছনা বা প্রহারের মাত্রা শ্যামার একটুও কমল না। সে যেন নরেনের নিজস্ব সম্পত্তি আর শুধু যদৃচ্ছ অত্যাচার করার জন্যই যেন ভগবান এই সম্পত্তি ওকে মিলিয়ে দিয়েছেন। দেবেন নিজে রগচটা ও রাগী হ'লেও এতটা ইতরতা সহ্য করতে পারত না, মধ্যে মধ্যে শাসন করতেও যেত, তার ফলে অধিকাংশ সময়ই একটা বীভৎস বিবাদ এমন কি হাতাহাতিও বেধে যেত। দুই ভাই-ই অপরকে নির্বিচারে এমন মা-বাপ তুলে গালাগালি করত যে, শ্যামা ও রাধারাণীর দু হাতে কান ঢেকে পালানো ছাড়া উপায় থাকত না এবং ক্ষমা ঘরের মধ্যে ঢুকে ঢিপ্ ঢিপ্ ক'রে মাথা খুঁড়তেন।

আবার সে পালা শেষ হলে ঘরে ঢুকে নরেন আর একবার শ্যামাকে নিয়ে পড়ত, 'বল্ শালী, বল্, ওর এত মাথাব্যথা কেন? আমি তোকে মারি তাতে ওর টনক নড়ে কেন? বল্ শীগগির!' তার সঙ্গে দুড়দাড় কিল চড় লাথি চলতে থাকত।

সে সব ক্ষেত্রে প্রহারের চেয়ে ঐ ইঙ্গিতটার মধ্যে যে ইতরতা প্রকাশ পেত তাইতেই যেন শ্যামা মরমে মরে যেত !…

সব কথাই রাসমণির কানে আসত। তিনি কোনদিনই কোন ব্যাপারে অধীরতা প্রকাশ করতেন না—ঘরের কথা পরকে বলাও তাঁর অভ্যাস ছিল না। শুধু পূজার আসনে বসে মনে মনে যখন সব বেদনা ইষ্টের পায়ে সমর্পণ করতেন সেই সময় মনে হ'ত তাঁর বুকটা যেন ভেঙে পিষে যাচ্ছে।

কিন্তু কি করবেন, উপায় কি ? জামাইকে এ বাড়িতে আসতে বারণ করলে মেয়ের একটু খবর পর্যন্ত পাবেন না।

এক একদিন সে খবর নরেন নিজেই বহন ক'রে আনত। মেয়ে যে তাঁর কি পরিমাণ অবাধ্য এবং বদমাইশ, তার সবিশেষ বর্ণনা দিয়ে, সেই বদমাইশকে জব্দ করারও যে কি ওষুধ তার কাছে আছে এবং কেমন করে জব্দ করেছে সেই গল্প করত।

একদিন দুপুরবেলা এসে হাজির হ'ল ডান হাতখানায় ভিজে ন্যাকড়া জড়িয়ে। দেখা গেল হাতটা ফুলেও উঠেছে।

বাড়িতে পা দিয়েই, বিন্দুমাত্র ভণিতা না ক'রে বললে, 'দিন মা, চাট্টি ভাত দিন—আজ আর বাড়ি ফেরা হ'ল না।'

ভাত তখন রাসমণি নিজে খেতে যাচ্ছিলেন, সেই ভাতই ধরে দিলেন।

'উঁহু—আমি হাতে করে খেতে পারব না। আমাকে খাইয়ে দিতে হবে। দেখছেন না হাতের অবস্থা !'

'হাতে কি হল বাবা ?'

'আর কি হবে ! আপনার কন্যাকে (নরেনের সাধু ভাষা বলাই অভ্যাস ছিল !) শাসন করতে গিয়ে এই কাণ্ড। মারতে গিয়ে এমন বেকায়দায় হাতটা লেগে গেল—দেখুন না ফুলে ঢোল হয়েছে একেবারে। কখনও ত দাঁড়িয়ে মার খাবে না, এমন বদমাইশ।'

তারপরই থালার দিকে চেয়ে,—'এ যে সব নিরিমিষ দেখছি। ইয়ে কিছু নেই ? দিন না একটু পিঁয়াজ কুঁচিয়ে বেগুন-পোড়ার সঙ্গে, বেশ লাগবে'খন।'

যে মেরেছে তারই যদি এই অবস্থা হয় ত মার যে খেয়েছে তার কি অবস্থা কল্পনা ক'রে চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসছিল তখন রাসমণির। কিন্তু এ পশুর সামনে চোখের জল ফেলতেও যেন লজ্জা হয়। অতিকষ্টে উদ্গত অশ্রু দমন করে তিনি একটা চামচ এনে ওর পাতে ফেলে দিয়ে বললেন, 'এইটে দিয়ে বাঁ হাতে খাও বাবা—আমি আর এখন খাওয়াতে পারব না।'

'তা মন্দ নয়—তবে পিঁয়াজটা ? দিন না, না হয় আমি নিজেই কেটে নিচ্ছি। আপনি আবার এখন হাতে গন্ধ করবেন।'

'না, উমা দিচ্ছে।'

তিনি অস্ফুট কণ্ঠে একটা 'উঃ' উচ্চারণ ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এক

কিছুদিন পরে সংবাদ এল নরেনদের বাড়িটা সরকার বাহাদুর কিনে নিচ্ছেন। খিদিরপুর ডকে পড়বে—শুধু ও বাড়িটা নয়, ও অঞ্চলের আরও অনেক বাড়ি।

এ খবর নাকি বহুদিন আগেই পাওয়া গেছে, কিন্তু না বড় ভাই, না ছোট ভাই কেউ কোন ব্যবস্থা করে নি। যখন আর সাত আট দিন মাত্র বাকি আছে দখল করার, তখন চৈতন্য হ'ল। কোথায় যাওয়া যায় এ এক সমস্যা! জিনিসপত্র বিস্তর। বাসনকোসন খাট-বিছানা সিন্দুক-বাক্স—গুরুগিরির প্রাপ্য বহু জিনিস জমেছে বংশ পরম্পরায়।

ক্ষমা এলেন দেখা করতে রাসমণির কাছে।

'তুমি যদি ভাই কিছু রাখো—'

রাসমণি অল্প কথার মানুষ। তিনি কথা শেষ করতে না দিয়েই বললেন, 'সে হয় না দিদি, একে আমি ভাড়াটে বাড়িতে বাস করি, স্থান কম—তার ওপর কুটুমের জিনিস আমি রাখতে পারব না। এ নিয়ে ভবিষ্যতে অনেক কথা হতে পারে। আমাকে মাপ করুন।'

অগত্যা ক্ষমাকে চেপে যেতে হ'ল।

চলে আসার সময় রাসমণি পরামর্শ দিলেন, 'দিদি একটা কথা বলি, মনে কিছু করবেন না। ছেলেগুলি আপনার কেউ ভাল নয়—অনেক দুঃখ পেতে হবে ওদের নিয়ে। অত জিনিস আপনি কি করবেন ? যত বড় সংসার হোক্ অত জিনিস লাগবে না কখনই। মিছিমিছি এখান ওখান করায় বিস্তর লোকসান হবে দেখবেন। বরং এক কাজ করুন, কিছু কিছু নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বেচে দিন, টাকাটা নিজের কোন বিশ্বাসী লোকের কাছে রেখে যান। এর পর ঢের কাজে দেখবে।'

কথাটা ক্ষমার পছন্দ হ'ল না। যেমন বহু সৎপরামর্শই বহু লোকের হয় না।

স্থির হ'ল যে কিছু জিনিসপত্র এবং এক সিন্দুক বাসন বৌবাজারে এক শিষ্য-বাড়ি রাখা হবে এবং বাকি জিনিসপত্র দুটি নৌকোয় বোঝাই দিয়ে ওঁরা চলে যাবেন গুপ্তিপাড়ায়। সেখানে ওঁদের এক যজমানের বাড়ি পড়ে আছে, থাকার কোন

অসুবিধাই হবে না। শুধু পুরুষ দুজন কলকাতায় থাকবে একটা ঘর ভাড়া ক'রে, সরকারী টাকাটা হাতে পেলেই জমি কিনে অন্যত্র বাড়ি আরম্ভ করবে। মেয়েরা একেবারে ফিরবে নতুন বাড়িতে। ক্ষমা যাবার সময় বার বার দুই ছেলের হাতে ধরে বলে গেলেন, 'দেখিস্ বাবা, তোরা যেন নিশ্চিন্দি হয়ে থাকিস্ নি আমাদের সেই জঙ্গলে পাঠিয়ে। তাছাড়া নগদ টাকা হাতে বেশী দিন থাকে না, খরচ হয়ে গেলে আর বাড়ি করাই হবে না। আর দেখিস্—দুই ভাই রইলি, সদ্ভাবে থাকিস দোহাই তোদের।'

নরেনই ওদের পৌঁছে দিতে গিয়েছিল, আসবার সময় বিশেষ ক'রে তাকে বলে দিলেন, 'দাদাকে মান্য করবি, অমন ক'রে যখন-তখন ঝগড়াঝাঁটি করিস্ নি। বুঝলি? আর যত শিগ্‌গির পারিস আমাদের নিয়ে যাস্। এই নিবান্দা-পুরীতে তিনটি মেয়ে-ছেলে রইলুম।'

'নিশ্চয়ই মা! সে কথা বলতে। ছাখো না—তিন মাসের মধ্যেই বাড়ি শেষ ক'রে নিয়ে যাচ্ছি তোমাদের।'

সরবে আশ্বাস দেয় নরেন।

এর পরের ইতিহাস অত্যন্ত অস্পষ্ট।

বাড়ির টাকাটা পাওয়া গিয়েছিল মাস-কতকের মধ্যেই, ক্ষমা তা জানেন। এর ভেতর দু ভাই-ই নিয়মিত আসত। কিন্তু টাকা পাওয়ার পরই ওদের দেখা পাওয়া দায় হয়ে উঠল।

টাকাটা পাওয়ার দিন পনেরো পরে প্রথম একদিন নরেন এল অত্যন্ত সেজে গুজে। দামী সিল্কের পাঞ্জাবি, পকেটে সোনার ঘড়ি, ভাল পাম্পশু জুতো। ক্ষমা ছেলের রকম-সকম দেখে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেন। বললেন, 'হ্যাঁরে টাকা পয়সা ওড়াচ্ছিস্ না ত দু'হাতে? এত সাজগোজ কেন? এ সব এল্ল কোথা থেকে?'

নরেন রাগ ক'রে বললে, 'তোমার এক কথা! আমি বুঝি রোজগার করতে পারি না?'

'হ্যাঁ, তুই আবার রোজগার করবি! মুখ্খুর ডিম!'

'কী বলব অবোধ মেয়েমানুষ, তায় মা, নইলে এ কথা অন্য কেউ বললে এক চড়ে মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিতুম!'

অপমানের ভয়ে ক্ষমা চুপ ক'রে গেলেন। শ্যামা কিন্তু ছাড়লে না, রাত্রে জিজ্ঞাসা করলে, 'হ্যাগা, মাকে ত খুব বড় বড় কথা বলে ধমকে দিলে, মোদ্দা টাকাটা কিসে রোজগার করলে তা ত বললে না?'

'তুই থাম! তুই কি বুঝবি?'

'তবু শুনিই না। বুঝি না বুঝি কানে শুনেই জীবন সার্থক করি।'

খানিকটা চুপ ক'রে থেকে নরেন বললে, 'ফাট্‌কা খেলে জিতেছি।'

'খেলায় আবার টাকা জিতবে কিগো?'

'হুঁ।'

'তাকেই বুঝি জুয়ো বলে?' কতকটা ভীত-কণ্ঠেই প্রশ্ন করে শ্যামা।

'সব তাতেই বড্ড ফ্যাচ্‌ ফ্যাচ্‌ করিস্‌ ছোট বৌ। চুপ কর।'

এর পর চুপ না করলে কী হবে শ্যামা তা জানত, সে চুপ ক'রেই গেল।

নরেন তার পরের দিনই কলকাতা ফিরে গেল। বহু অনুরোধেও থাকতে রাজী হ'ল না। বললে, 'দিন রাত জমি খুঁজতে হচ্ছে। তোমাদের এই অবস্থায় ফেলে রেখেছি—আমার একটা আক্কেল আছে ত! দাদার আর কি, না করবে খোঁজ না করবে দেখাশুনো। যা করব সব আমি।'

ক্ষমা ভয়ে ভয়ে তবু বললেন, 'হ্যাঁরে, তা এত জমি কলকাতায়—খুঁজতে হচ্ছে কেন তবে?'

'তবে আর মেয়েমানুষের বুদ্ধি বলেছে কেন? জমি অমনি কিনলেই হ'ল? পাড়া ভাল হবে, জমি সস্তা হবে—নির্দায় নির্দোষ, তবে ত দেখেশুনে কিনব! যা তা একটা জমি কিনি, আর টাকা-কড়ি খরচা হওয়ার পর তার ফ্যাঁকড়া বেরুক! ওসব কাজ আমার দ্বারা হবে না।'

এর পর কিন্তু মাসখানেক আর কোন ভাইয়ের পাত্তা রইল না। ক্ষমা খুব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। খরচপত্র তাঁর কাছে ছিল সামান্যই, সে সব ফুরিয়ে এসেছে—তার চেয়েও বড় কষ্ট বাজার-হাট করে কে? দুটি অল্পবয়সী বধূ নিয়ে তিনি একা স্ত্রীলোক। প্রকাণ্ড বাগানের মধ্যে বাড়ি, কাউকে ডাকলে সহসা সাড়া পাবার উপায় নেই। একটি মেয়ে বাইরের তোলা কাজ করে দিয়ে যায়, তাকে দিয়ে হাট করানো যায় না। সে যদি দয়া ক'রে কোন ছেলে-পুলেকে ডেকে দেয় এবং তারা কেউ দয়া ক'রে হাট ক'রে দেয় ত হয়, নইলে হয় না। ইতিমধ্যেই দিন-দু'তিন ক'রে চার-পাঁচবার উপোস করতে হয়েছে সবাইকে। বিরাট বিরাট কুমড়ো হয় বাগানে, শুধু কুমড়োর ডালনা রেঁধে খেয়ে কাটিয়েছে। অবশ্য ফলমূল বিস্তর, শাক-ডাঁটারও অভাব নেই—কিন্তু ভাত ছাড়া এসব খাওয়ার অর্থ কি ওদের কাছে!

শেষে পুরো এক মাস হয়েযেতে শ্যামাকেদিয়ে চিঠি লেখানো হ'ল। রাধারাণীও নিজের জবানীতে দেবেনের নামে একখানা চিঠি লিখিয়ে নিলে।

দিন কতক পরে উত্তর এল দেবেনেরই; সে লিখেছে মার নামে চিঠি। প্রণামাদি সম্ভাষণের পর লিখেছে—

'পরে বিস্তারিত লিখি এই যে শ্রীমান নরেন সরকার বাহাদুরের নিকট হইতে অর্থপ্রাপ্তির পরই জোর করিয়া তাহার অর্ধাংশ লইয়া নিজের হেপাজতে রাখে। আমি পাছে তাহার তঙ্কাও খরচ করিয়া ফেলি বা পরে অস্বীকার হই, শ্রীমানের সেই আশঙ্কা। তাহার পর হইতে অর্থাৎ তঙ্কা হস্তগত হওয়ার পর শ্রীমানের সাক্ষাৎ মেলাও দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছে। কোথায় থাকে, কি করে তাহা আমরা কেহই অবগত নহি। বাসায় আসে কদাচিৎ, আসিলেও ব্যস্তভাবে আসে এবং ব্যস্তভাবেই চলিয়া যায়। জিজ্ঞাসা করিলে বলে জমির সন্ধানে দিবারাত্র ঘুরিতে হইতেছে। সে সব জমি কোথায় এবং তাহার বিশদ বৃত্তান্তই বা কি—জিজ্ঞাসা করিলেও ভাল রকম জবাবদিহি করিতে পারে না। ইতোমধ্যে আমি কয়েকটি জমি দেখিয়াছিলাম, তাহাদের মূল্যও সুলভ বলিয়া বোধ হয় কিন্তু অদ্যাপি শ্রীমানকে সে সব দেখাইতে পারি নাই। অথচ তাহার সম্মতি-ব্যতিরেকে কিনাও আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। কারণ বাটি-বিক্রয়ের মূল্য আমার হাতে যে অর্ধাংশ আছে তাহা যথেষ্ট নহে। এমতাবস্থায় কী যে করি ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছি না। এধারে আমি যে মোকামে চাকুরি করিতাম তাহাদের অবস্থা খারাপ হইয়া পড়ায় আমার চাকুরিও গিয়াছে। এক্ষণে চাকুরি খুঁজিব, না বাড়ি খুঁজিব, না শ্রীমানেরই খোঁজ করিয়া বেড়াইব—কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এক্ষণে সেবকের প্রতি আপনার আজ্ঞা কি জানিতে পারিলে সুখী হইতাম। প্রণামান্তে নিবেদনমিতি—'

চিঠি শুনে ক্ষমা কাঠ হয়ে উঠলেন। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে শুধু বললেন, 'ছোট বৌমা, সে সব ঘড়ি আংটি জামা কোথা থেকে করলে নরেন আমাকে ত বললে না, তোমাকে কি কিছু বলেছিল?

শ্যামা নত মুখে উত্তর দিলে, 'বলেছিলেন কী এক জুয়া খেলায় জিতেছেন কিন্তু সে আমার ঠিক বিশ্বাস হয় না মা।'

ক্ষমার বুক ফেটে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে। তিনি একটা উত্তরও আর দিতে পারেন না।

এর পর দুটো দিন সেই তিনটি প্রাণীর কাটল অবর্ণনীয় দুশ্চিন্তার মধ্যে। দেবেনকে কী লিখবেন ক্ষমা তাও ভেবে পান না। কিন্তু তৃতীয় দিনের দিন অকস্মাৎ নরেনের এক চিঠি এসে গেল।

সে চিঠিও মায়ের নামে। কারণ গুরুজনরা থাকতে স্ত্রীকে চিঠি লেখা তখন নির্লজ্জতা বলে গণ্য হ'ত। আঁকা-বাঁকা হরপে বিশ্রী লেখা, অসংখ্য বানান ভুলে ভর্তি।

'দাদাকে জমীর সন্দান দিয়া দিয়া হয়রান হইয়া গেলাম। না হয় দাদার পসন্দ,

না হয় মতীর স্থির। এমতাবস্থায় কী করীব লিখিবেন। এধারে তঙ্কা সব জলের মত খরচ হঙ্গিয়া যাইতেছে। তাহা ছাড়া আপনার নিকট লিকিতে লয্যা হয়, দাদার শভাব চরিত্তও বোধ হয় খারাপ হইয়া যাইতেছে। দাদা হামেশাই রাত্তে বাসায় ফেরেন না।' ইত্যাদি—

শ্যামা চিঠি পড়া শেষ করতেই রাধারাণী ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল। ক্ষমা ব্যাকুল হয়ে ওকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন কিন্তু শ্যামা জোর ক'রে বলে উঠল, 'কেন দিদি মিথ্যে মন খারাপ করছ, এ সমস্ত মিছে কথা—বুঝতে পারছ না!'

তবু বহুক্ষণ পর্যন্ত রাধারাণীর চোখের জল থামল না। তার নিজের স্বামীর ওপরও বিশেষ আস্থা ছিল না।

ক্ষমা সারারাত ভেবে পরের দিন ভোরবেলা উঠে শ্যামাকে বললেন, 'ছোট বৌমা, তুমি আমার জবানীতে ও দুই বাঁদরকেই চিঠি লিখে দাও, এখানে পত্রপাঠ চলে আসতে। লিখে দাও যে আমার খুব অসুখ—বাঁচবার আশা নেই। এসে পড়লে যেমন ক'রেই হোক আটকাতে হবে আর আমার কলকাতায় বাড়িঘরে দরকার নেই, এখানে কিছু ধান-জমি ক'রে একটা চালা তুলে নিক। শেষে কিছুই আর থাকবে না।'

শ্যামা একটু ইতস্তত ক'রে শেষ পর্যন্ত (ভাশুরকে পরের জবানীতে চিঠি লেখাও বড় লজ্জার কথা) সেই মর্মে চিঠি লিখে দিলে। পাশের বাড়ি তাঁতি ছেলেটিকে দিয়ে অনেক কষ্টে সে চিঠি ফেলানোও হ'ল। তারপর তিনজনে সেই নির্জন বিরাট বাড়িতে সংশয়-কণ্টকিত চিত্তে প্রতীক্ষা করতে লাগল—মানুষের বা অন্তত একটা উত্তরের। কিন্তু একটির পর একটি ক'রে দীর্ঘ দিন দীর্ঘতর রাত্রির সঙ্গে গ্রথিত হতে লাগল শুধু, না এল মানুষ আর না এল উত্তর।

মাসখানেক দেখে পাড়ার লোকদের ধরে একজনকে ক্ষমা কলকাতা পাঠালেন। সে ফিরে এসে বললে, 'ও বাসায় কেউ থাকে না। কোথায় থাকে তাও কেউ বলতে পারলে না।'

এর পর স্ত্রীলোক তিনটির যে ভাবে দিন কাটতে লাগল তা সহজেই অনুমেয়।

ক্ষমার সম্ভ্রম-বোধ ছিল অসাধারণ। এখানে আশ-পাশে প্রতিবেশী বলতে ব্রাহ্মণেতর জাতিই বেশি; ক্ষমা এসে পর্যন্ত এদের সঙ্গে একটা ব্যবধান রেখে

চলতেন, তারাও সম্ভ্রমের সঙ্গে সে দূরত্বকে মেনে নিত।

এখন কিন্তু আর ব্যবধান রাখা গেল না। এমন হ'ল যে পর পর তিনদিন কুমড়ো সিদ্ধ খেয়ে তিনজনে দিন কাটালেন। তাও না হয় সম্ভব, কিন্তু রাধারাণীর শিশু পুত্রটিকে বাঁচানো যায় কি ক'রে এই হ'ল তাঁদের সমস্যা। শেষে প্রতিবেশী-দের দ্বারস্থ হ'তে হ'ল। ব্রাহ্মণ কায়স্থ ছাড়া আর কারুর কাছে তাঁরা প্রতিগ্রহ করেন নি কখনও, একথা ক্ষমা প্রায়ই গর্ব ক'রে বলতেন—কিন্তু সে গর্ব আর বজায় রাখা গেল না। চালের জন্যই পরের বাড়ি যেতে হ'ল। প্রথমটা বাসন-কোসন বেচে চালাবার চেষ্টা করলেন কিন্তু ব্রাহ্মণের বাসন কেউই কিনতে রাজী হ'ল না। ধান চাল প্রায় সকলের বাড়িতেই যথেষ্ট, একটা সিধা দেওয়া ঢের সোজা। ক্ষমার কাছে সব কথা শুনে অনেকেই সিধা পাঠালেন। ছেলের জন্য দুধও একজনরা নিয়মিত এক ঘটি ক'রে পাঠাতে লাগলেন।

তাতে উপবাসটা কিছুদিনের জন্য বন্ধ হ'ল বটে, তবে তাও একেবারে নয়। কারণ দানের জন্য তাগাদা করতে পারতেন না ক্ষমা। সিধা যারা পাঠাত তারাও অত নির্ভুল হিসেব করে পাঠাতে পারত না। ফলে যখন ভাঁড়ার খালি হয়ে আসত তখন শিশুর জন্য কিছু রেখে তিন শাশুড়ী-বৌয়ে উপবাস করতেন। তাল পাকার সময় তাল খেয়ে অনেকদিন কেটে যেত। সজনে ডাঁটা বা অযত্ন-বর্ধিত পুঁই-ডাঁটা সেদ্ধ ক'রে নুন দিয়ে খাওয়া চলত কোন কোন দিন। তরুণী বধূদের সবই সইত অবশ্য, কিন্তু ক্ষমারই শরীর ভেঙে আসতে লাগল। নানা রকম পেটের গোলমাল হতে লাগল। তবু ক্ষমা ভিক্ষায় বার হ'তে পারলেন না। শুধু যখন খুব অসহ্য হ'ত, এক এক সময় ওপরের দিকে চোখতুলে দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন, 'ওরে কী ছেলেই পেটে ধরেছিলুম রে, তিলে তিলে মাতৃহত্যা করছে।'

বৌয়েদের মুখের দিকে তিনি তাকাতে পারতেন না, লজ্জায় মাথা কাটা যেত তাঁর। মাঝে মাঝে কেঁদে ফেলে বলতেন, 'এমন জানলে কিছুতে ওদের বিয়ে দিতুম না মা, তোমাদের মুখের দিকে যে চাইতে পারি না। আমাকে তোমরা মাপ করো।'

মাস দুই এমনি কাটবার পর ক্ষমা প্রস্তাব করলেন, 'আমার অদৃষ্টে যা আছে হবে মা, তোমরা বাপের বাড়ি চলে যাও। আর কতদিন এভাবে কাটাবে?'

সে প্রস্তাবে ওরা কেউ রাজী হল না। রাধারাণীর বাপের বাড়ির অবস্থা বিশেষ ভাল নয়—তার ওপর দেবেন ইতিপূর্বে এমন ঝগড়াঝাঁটি করেছে যে তাদের সঙ্গে মুখ দেখাদেখি বন্ধ। যদি বা দেবেন কোনদিন এখানে আসে ত বাপের বাড়ি থেকে যে স্ত্রীকে সে আনতে যাবে না, এটা রাধারাণী নিশ্চিত জানে।

আর শ্যামা! তারও ওই অবস্থা। তার মা তাকে আশ্রয় দিতে পারতেন হয়ত, কিন্তু সে যে একরকম জোর ক'রেই শ্বশুর-ঘর করতে এসেছে। এখন আবার কোন্ মুখে সেখানে ফিরে যাবে?

মুখে বললে, 'সে হয় না মা, আপনাকে এই অবস্থায় ফেলে কোথায় যাবো?'

আনন্দে স্নেহে বিগলিত হয়ে ক্ষমা ওকে বুকে চেপে ধরলেন!

ওদের এই জীবনে আনন্দ ও আশার দিন হয়ে উঠেছিল পাড়ার নিমন্ত্রণের দিনগুলি। আগে ক্ষমা এখানে কোন নিমন্ত্রণ নেন নি কিন্তু এখন আর বৌদের আটকান না। উপবাস ত লেগেই আছে, বেচারারা এক-আধদিনও যদি পেট ভরে খেতে পায় ত সেই ভাল। বিয়ে বা অন্নপ্রাশন উপলক্ষে হ'লেই বিপদ হয়, যৌতুক করার প্রশ্ন ওঠে। ক্ষমা অতি কষ্টে লক্ষ্মীর কৌটো ঝেড়ে-ঝুড়ে সিঁদুর-মাখা আধুলি বা সিকি বার করেন। শ্যামা প্রথম প্রথম একটু অপ্রস্তুত হ'ত কারণ তার শহরের জীবনের অভিজ্ঞতায় এক টাকার কম যৌতুক করার কথা জানে না সে। তবে এখন এখানে দেখে যে সিকি আধুলি কেন, দুআনিও যৌতুক করে অনেকে। পাড়ার গরীব দুঃখী বা নিম্নশ্রেণীর যারা খেতে আসে তাদের অনেক সময় দয়া ক'রেই খেতে বলা হয় কিন্তু সে দয়া তারা গ্রহণ করতে চায় না, সামাজিক মর্যাদা না পেলে খেতে প্রস্তুত নয়। সেই জন্যই দুআনি পর্যন্ত যৌতুক নিতে হয়।

অবশ্য বিয়ে বা অন্নপ্রাশন (উপনয়নও বটে—তবে সে কদাচিৎ, কারণ নিকটে ব্রাহ্মণ-বসতি কম) ছাড়া অন্য নিমন্ত্রণগুলিই লোভনীয়। অসংখ্য ব্রত ও পার্বণ লেগেই আছে। ব্রাহ্মণের সধবা চাই-ই সে সব কাজে। এ উপলক্ষে শুধু খাওয়াই নয়, সিঁদুর আলতা দক্ষিণা মিষ্টি পান সুপারি এ ত আছেই, সময়ে সময়ে গামছা ও কাপড়ও মেলে। রীতিমত রোজগার। উপার্জন করার যে কি আনন্দ, সে স্বাদ শ্যামা প্রথম পায় ঐ ভাবেই।

বেশ মনে আছে ওর প্রথম দিনকার কথা। তাঁতিগিন্নী এসে হাতজোড় ক'রে ক্ষমার কাছে বললেন, 'বামুন মা, বলতে সাহস হয় না, কাল আমার বড় বৌয়ের নিত্‌সিঁদুরের ব্রত উদ্‌যাপন; দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ সধবা অন্তত খাওয়াতে হবে। বৌমারা যদি দয়া করে যান—। আরও অনেকে ত আসবে!'

ক্ষমা অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। বোধ করি নিজের মনের সঙ্গেই একটা প্রবল দ্বন্দ্ব চলছিল। কালই এই তাঁতিগিন্নী এক ধামা চাল পাঠিয়ে দিয়েছেন তবে চার দিনের পর পেটে ভাত গেছে। দান যখন নিয়েইছেন তখন আর

মানুষটাকে মনঃক্ষুণ্ণ ক'রে লাভ কি ?

প্রায় মিনিট-দুই পরে শুধু প্রশ্ন করলেন, 'আয়োজন সেই ভাবেই ত হচ্ছে ?'

প্রবলভাবে মাথা হেলিয়ে জিভ্ কেটে তাঁতিগিন্নী বললেন, 'নিশ্চয়ই, আমার প্রাণে ভয় নেই মা ? বাপ্রে ! বামুনের মেয়ে নিয়ে যাবো—এ যে গোখ্রো সাপ নিয়ে খেলা !'

আয়োজনটা কিভাবে হওয়া দরকার, অনেক ভেবেও শ্যামা বুঝতে পারলে না। রাধারাণীকে প্রশ্ন ক'রেও সদুত্তর পাওয়া গেল না। অথচ শাশুড়ীকে জিজ্ঞাসা করতেও লজ্জা হয়। মনে হয় বামুনের মেয়ে নিয়ে গেলে কি করা দরকার তা বামুনের মেয়ের অন্তত জানা উচিত। 'জানি না' শুনলে তিনি কি ভাববেন ?

অবশ্য বোঝা গেল তার পরের দিনই।

তাঁতিগিন্নী বেলা দুটো নাগাদ নিজে এসে ওদের ডেকে নিয়ে গেলেন। আয়োজন বেশ বড় রকমেরই। বিরাট আটচালা বাঁধা হয়েছে। বামুন বৈষ্ণব অনেক বসেছে, সধবাও জন-বারো, তার সঙ্গে ছেলেমেয়ে যে কত তার হিসেব নেই। তাঁতিগিন্নীর বড় বৌ নিজে হাতে ওদের পিঁড়িতে দাঁড় করিয়ে পা ধুইয়ে সেই পাদোদক জল একটা বাটিতে সংগ্রহ করলে, তারপর নতুন গামছা দিয়ে পা মুছিয়ে আলতা পরিয়ে দিলে। এরপর প্রত্যেককে এক এক কাঠের কৌটো বোঝাই নতুন সিঁদুর দিয়ে অনুমতি নিয়ে সিঁথিতে ও লোহার ধারে একটু ক'রে সিঁদুর পরিয়ে দিলে। বামুনের মেয়ের মাথায় হাত দেবে এই জন্যে অনুমতি। তারপর একখানা ক'রে কোরা কাপড় পরিয়ে ওদের হাত ধরে নিয়ে গিয়ে আসনে বসালে।

তবু তখনও বিশেষ আয়োজনটা যে কি বুঝতে পারে নি শ্যামা। খেতে বসে বুঝলে। পাতে পড়েছে খান আষ্টেক ক'রে লুচি, বেগুন ভাজা, পটোল ভাজা আর কুমড়োর ডালনা। আর একরাশ করে নুন। কুমড়োর ডালনার চেহারাটা যেন কেমন সাদা-সাদা—মুখে দিয়ে দেখলে নুন নেই। অর্থাৎ ব্রাহ্মণেতর জাতের বাড়িতে ব্রাহ্মণরা নুন-হলুদ দেওয়া তরকারি খাবে না। আলাদা ক'রে নুন দিলে এবং সে নুন নিজে মেখে খেলে দোষ নেই। যাক্—লুচির স্বাদ যে কি তা শ্যামা প্রায় ভুলে যেতেই বসেছিল। এতদিন পরে সে বেশ তৃপ্তি ক'রেই খেল। এরপর পাতে পড়ল ক্ষীর ও উৎকৃষ্ট কাঁচাগোল্লা। খেয়ে যখন ফিরছে ওরা শুনলে বামুনরা বলাবলি করতে করতে যাচ্ছে, এমন পাকা ফলার এ অঞ্চলে অনেকদিন হয় নি। কলকাতার সে সব আয়োজন—মতিচুর দরবেশ অমৃতি—খেলে এরা না জানি কি বলত। আর মাছের কালিয়া ! হলুদ দেওয়া তরকারিই খায় না ত মাছ ! নিজের অজ্ঞাতসারেই শ্যামার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল—মাছের কথা প্রায় ভুলে যেতেই

বসেছে। হাতে সদ্য দক্ষিণা পাওয়া দুআনিটা ছিল, শ্যামা স্থির করলে পরের দিন কাউকে খোশামুদি ক'রে নদীর ধারে পাঠাবে মাছের জন্য।

এর দিন কতক পরেই এক কায়স্থ বাড়ি ওদের নিমন্ত্রণ হ'ল। সে আর এক বিস্ময়! কারণ এইবার আলুনি কুমড়োর ডালনা ঠিক থাকলেও লুচি পড়ল পাতে তেলেভাজা। মানুষকে নিমন্ত্রণ ক'রে এনে তেলেভাজা লুচি খাওয়ায় কেউ, তা কলকাতার মেয়ে শ্যামা এতদিন ভাবতেও পারত না। খেতে কিন্তু ভালই লাগল। ঘরে ভাঙা টাট্‌কা তেলে ভাজা লুচি—যেমন সুগন্ধ, তেমনি স্বাদ। ভয় ছিল একটু যে খেয়ে হয়তো অসুখ করবে কিন্তু কিছুই হ'ল না। ওরা আবার ষোলটা মোণ্ডা সন্দেশ ছাঁদা দিলে দুই জা-কে। ক্ষমার কথা মনে ক'রে খুশী মনেই নিয়ে এল শ্যামারা। তাঁর ত আর অন্য উপায় নেই।

গোটা বৈশাখ মাসটাই চলল ওদের নিমন্ত্রণ। ওরা যে 'ভিন্ন জাতে'র বাড়ি খেতে যাচ্ছে এই কথাটা একবার ছড়িয়ে পড়াতে অনেকেই সাহস ক'রে বলতে এল। ফলে কতরকম যে অভিজ্ঞতা হ'ল শ্যামার! কলু-বাড়ি খেতে গিয়ে দেখে রান্না বান্নার কোন বালাই-ই নেই। একটা ক'রে বড় পাথরের খোরাতে দই ঢেলে দিলে এক এক কাতান, তাতে মর্তমান কলা চার-পাঁচটা ক'রে, পাঁচ-সাত জোড়া মোণ্ডা আর আলগোছে খই ঢেলে দিতে লাগল। অর্থাৎ ফলার মেখে খাও। শেষে এক বাটি ক'রে ক্ষীর। তবে পাওনা ওদের ওখানেই সবচেয়ে বেশী হয়েছিল। নতুন গামছা, একটা ক'রে নতুন পেতলের সরায় এক-সরা মোণ্ডা, আবার দুআনি দক্ষিণা।

বৈশাখ মাসের পর নিমন্ত্রণ কমে এলেও জ্যৈষ্ঠ মাসটা আম খেয়ে এবং দু'চার দিন নিমন্ত্রণ খেয়ে এক রকম কাটল। কিন্তু শ্রাবণে আবার দুর্গতি। ওদের বাড়ির বিরাট আম-কাঁঠালের বাগানখানা আচ্ছন্ন ক'রে অন্ধকার ঘনিয়ে আসত যখন, বাইরে অবিশ্রাম বর্ষণ, কাদা জল থৈ থৈ করত এবং ভেতরে স্যাঁতসেঁতে ভিজে আব্‌হাওয়া—তখন শ্যামার প্রাণ যেন হাঁপিয়ে উঠত। ইচ্ছা করত এক একদিন আত্মহত্যা করতে কিন্তু গর্ভের সন্তানের কথা স্মরণ হ'তে আর সাহসে কুলোত না। দেহ ভারী হয়ে আসছে ক্রমশ, কেমন যেন দুর্বল বোধ হয়। হাতে প্রায়ই খিল লাগে। এই সময় ভাল ক'রে খাওয়ার কথা, সে জায়গায় অর্ধেকেরও ওপর দিন কিছুই খাওয়া হয় না। এই ঘোর বর্ষায় কে কার খবর রাখে, কে-ই বা চাল পাঠায়। তাল এবং কুমড়ো ও ডুমুর সেদ্ধ খেয়ে খেয়ে ওদের অরুচি হয়ে গেছে। তার ওপর এই অন্ধকার। প্রদীপ জ্বালবারও তেল নেই। কোনমতে সন্ধ্যা দেখিয়ে প্রদীপ নিভিয়ে দেওয়া হয়। এখানে আসবার আগে ডাকাতির

ভয়ে কলকাতাতেই এক যজমানবাড়ি সব গহনা খুলে রেখে আসা হয়েছে। যা আছে তা নাম-মাত্র। তবু তারই মধ্যে একটা আংটি ও এক জোড়া মাকড়ী বিক্রি করতে হয়েছে। একটি অনুগত চাষী ছেলেকে দিয়ে অনেক কষ্টে বিক্রি করানো হয়েছে—কিন্তু তাতেই বা ক'দিন চলে?

সব চেয়ে মজা হচ্ছে এই—এত দুঃখের মূল যে, সেই স্বামীর ওপর শ্যামার রাগ যত হয় তার চেয়ে ঢের বেশী মন-কেমন করে। এক একটা দুর্যোগের রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে ওর যেন রাত আর কাটে না। ওর সেই বলিষ্ঠ সুন্দর স্বামী। কোথায় আছে কী করছে কে জানে! যদি অসুখই ক'রে থাকে? হয়তো ওরা যা ভাবছে তা নয়। হয়ত রোজগার করতেই সে কোন্ দূর দেশে গিয়ে পড়েছে—যেখান থেকে চিঠি আসে না। ওর মন স্নেহশীলা জননীর মতই একান্ত স্নেহে স্বামীর সব দোষ ঢেকে দিতে চাইত—অনুপস্থিত কোন প্রতি-পক্ষের সঙ্গে তর্ক ক'রে ক'রে ক্লান্ত হয়ে পড়ত। কাকে যে সে বোঝাচ্ছে, কার কাছে নরেনের দোষ-স্খালনের চেষ্টা করছে তা সে নিজেই জানে না তবু ওর মনের দ্বন্দ্বের ও যুক্তি-সৃষ্টির বিরাম থাকত না।

মাঝে মাঝে প্রাণ যখন খুব আকুলি-বিকুলি ক'রে উঠত—তখন বেদনার অসহ্য তীব্রতায় শ্যামা জোরে আঁকড়ে ধরত শাশুড়ীকেই। ক্ষমা হয়ত ঘুম ভেঙে প্রশ্ন করতেন, 'কী হয়েছে ছোট বৌমা, ভয় পেয়েছ মা? এই যে আমি আছি মা—ভয় কি? আহা ঘুমের ঘোরে বুঝি কি স্বপন দেখেছে বাছা আমার। ষাট্ ষাট্!'

অপ্রস্তুত হয়ে শ্যামা বলত, 'না না।' পাশ ফিরে শান্ত, সংযত হয়ে শুত। ঘুম আসত না ওর তবুও।

বাইরে অন্ধ তামসী নিশি মাতামাতি ক'রে চলত অবিশ্রান্ত। তাল ও নারকেল গাছের মাথাগুলোয় প্রতিহত হয়ে বাতাস গোঁ গো শব্দ করত। বন্ধ খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে চোখে বিদ্যুৎ-চমকের আভাস লাগত ক্ষণে ক্ষণে, মেঘের গর্জন চমকে দিত সেই অন্যমনস্কতার মধ্যেই। শুয়ে শুয়ে ভাবত স্বামীর কথা। সে সময় ওর নিজের দুঃখের একটি কথাও মনে পড়ত না। অন্তরের সমস্ত বর্ষণ চলত একটি মাত্র লোককে কেন্দ্র ক'রেই।

হয়ত অনেকক্ষণ পরে চোখের জল ধারায় ধারায় নিঃশব্দে ঝ'রে পড়তে শুরু হ'ত। অবশেষে শ্রান্ত হয়ে শ্যামা ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়ত।

তিন

ভাদ্রের প্রথমেই অপ্রত্যাশিতভাবে পনেরোটা টাকা মনিঅর্ডারে এল দেবেনের কাছ থেকে। তাতে দু'ছত্র চিঠি লেখা শুধু—'বিশেষ ব্যস্ত থাকায় সংবাদ লইতে পারি নাই। শীঘ্রই যাইতেছি।'

তার মধ্যে নরেনের কোন কথা নেই। তা না থাক—নতুন ক'রে যেন একটা আশার জোয়ার এল মনে। রাধারাণী, ওদের দুজনের স্বামীই সমান স্তরে নেমে এসেছে এই চিন্তাতেই, যেন বেশী রকম মুষড়ে ছিল, এইবার হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। ওর সমস্ত কথাবার্তায় নতুন-ক'রে ফিরে-পাওয়া স্বামী-সৌভাগ্যের অহংকার যেন নতুন পালিশ করা চুড়ির ঝিলিকের মত অনবরত ঠিকরে বেরোতে লাগল। ছোট জায়ের প্রতি সহানুভূতির শেষ রইল না ওর। সে সহানুভূতির সরল অর্থ হ'ল ছোট জাকে জানিয়ে দেওয়া যে, এই কমাসে যা ধারণা করেছিলে তা ঠিক নয়—আমার স্বামী হাজার হোক তোমার স্বামীর চেয়ে ঢের ভাল।

তা হোক—শ্যামা তাতে তত দুঃখিত নয়। সে-ও একান্ত মনে ভাশুরের আগমনের জন্যে দিন নয়—প্রহর গুনতে লাগল। ওর আশা যে ভাশুর এলেস্বামীর খবর ও একটা পাবেই। শুধু সেই আশায় ও সমস্ত অপমান সইতে পারে অনায়াসেই।

কিন্তু তার আগেই একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটে গেল।

ভাদ্রের মাঝামাঝি শ্যামা একদিন শাশুড়ীকে ডেকে বললে, 'মা, পেটটা কেমন করছে। একটু উঠুন না।'

তখনও ক্ষমা বুঝতে পারেন নি। তিনি তাড়াতাড়ি উঠে আলো জ্বাললেন।

কিন্তু বাইরে থেকে ঘুরে এসে শ্যামা যন্ত্রণায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। কী তীব্র অসহ্য যন্ত্রণা পেটে—মনে হ'ল যেন সাঁড়াশি দিয়ে কে ওর পেটের মাংস টেনে টেনে ছিঁড়ছে।

'ওকি বৌমা! ওমা কি হবে! এর মধ্যে তোমার ছেলেপুলে হবে নাকি? সাধ হ'ল না যে এখনও! দাইকেই বা কে খবর দেয়? ও বড় বৌমা, কি হবে মা, ওঠো না একবার!'

উঃ বাপ রে! শ্যামার মুখ বিবর্ণ, চোখ ঠেলে বেরোচ্ছে। যন্ত্রণায় সমস্ত দেহ কুঁচ্‌কে কুঁচ্‌কে উঠছে। তবু সম্ভাবনাটা মাথায় আসার পর থেকে যেন কী একটা আনন্দও হচ্ছে ওর, ঐ যন্ত্রণার মধ্যেই।

ক্ষমা তাড়াতাড়ি ছুটলেন পাশের বাড়িতে। অন্ধকারে, জঙ্গলের মধ্য দিয়ে জ্ঞানশূন্য হয়ে। পাশের বাড়ির গিন্নীটি অবশ্য খুব ভাল বলতে হবে। তিনি তখনই নিজের বড় ছেলেকে দাইয়ের সন্ধানে পাঠিয়ে ক্ষমার সঙ্গে চলে এলেন।

কিন্তু ততক্ষণে শ্যামায় ছেলে হয়ে গেছে, টুকটুকে কোল-আলো-করা পুত্র-সন্তান। শ্রান্তিতে শ্যামা চোখ বুজেছে।

ক্ষমা তাড়াতাড়ি ছুটে এসে খোকাকে কোলে তুলে নিলেন।

হতভাগাটা কোথায় আছে, কী করছে কে জানে। পুত্র-সন্তানের মুখ প্রথম তারই দেখার কথা। তা সে ভাগ্যি কি আছে! ক্ষমার মনে মনে পরিতাপের শেষ রইল না।

আশ্বিন মাসের গোড়ার দিকে সত্যই দেবেন এসে হাজির হল একদা।

তাকে দেখে ক্ষমার চোখের জল আর বাঁধ মানে না; তাঁর অমন সুন্দর ছেলের কী হাল হয়েছে! নরেন তবু একটু ময়লা, দেবেনের রং ছিল কাঁচা সোনার মত। সে রং পুড়ে কালো হয়ে গেছে। চোখ কোটরগত, দৃষ্টি নিষ্প্রভ। গাল চড়িয়ে, রোগা হয়ে—একেবারে যেন বুড়ো হয়ে গেছে। হাতে পায়ে কি ঘা হয়েছিল, এখনও সব সারে নি।

রাধারাণীও বার বার চোখ মুছতে লাগল।

দেবেন বললে, 'কী করব? ছোটবাবুর তো ঐ অবস্থা। কোন পাত্তাই নেই। এধারে আমার চাকরিটি গেল—'

'সে কি রে, তোর যে পাকা চাকরি শুনেছিলুম।' ক্ষমা বাধা দিয়ে বলেন।

'তুমি ক্ষেপেছ মা! চাকরি আবার পাকা! বিশেষ আজকালকার বাজারে। সে থাক। এখন ঐ ত অবস্থা, বাড়ি কেনা হয় না, অথচ হাতে যা টাকা আছে, বসে বসে খেলে আর কদিন বলো? কী করব ভাবছি, এক বন্ধু পরামর্শ দিলে উড়িষ্যায় গিয়ে হরতুকির ব্যবসা করতে। নৌকো আর হাঁটাপথে সেখানে যেতে হয় কিন্তু খুব নাকি পয়সা কারবারটায়। তার ভোচ্‌কানিতে ভুলে সেই কারবার করতে গিয়ে হাড়ির হাল একেবারে। দেখ না, পথে ডাকাতি হয়ে যথাসর্বস্ব গেল, তারপর পড়লুম রোগে, তিন মাস হাসপাতালে পড়ে। একটু ভাল হয়ে উঠতেই সেখানে থেকে ছাড়া পেলুম বটে কিন্তু কোন্ মুখে তোমাদের কাছে এসে দাঁড়াব শুধু-হাতে? তাই ওখান থেকে চলে গেলুম আরায়—'

'সে আবার কোথায় রে?'

'সে আছে, বহু দূরে, পশ্চিমে। সেই কাশীর কাছাকাছি। ওখানে গিয়ে আর এক বন্ধুর পরামর্শ শুনে লাগিয়ে দিলুম ডাক্তারি। তা বলতে নেই, এখন একরকম জমিয়ে বসেছি।'

'ডাক্তারি? তুই কি ডাক্তারি করবি রে? শুনেছি পড়তে হয়, পাস করতে হয়!'

'সে তুমি জানো না। ওসব বন-দেশ, ওখানে কে পাস-করা ডাক্তার যাবে? পাঁচ সাত রকম মোটামুটি ওষুধ নিয়ে গিয়ে ওখানে বসেছি, তাইতেই চলে যায়। ওরা তাতেই খুশী।'

'তার পর? মানুষ-টানুষ মারবি না ত রে? শেষে কি হাতে দড়ি পড়বে?'

'কৈ এই ত ছ মাস কাটিয়ে এলুম। এখন সবাই আসছে আমার কাছে।'

মুখে মুখে এমনি উপন্যাস রচিত হয়ে গেল। আসলে দেবেনের এই শেষের ডাক্তারী করার গল্পটাই ঠিক। আগেরটা সর্বৈব মিথ্যা। মূর্খের হাতে টাকা পড়লে যা হয় তাই হয়েছিল ওরও। কয়েকটি হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু জুটেছিল। তারপর দিনকতক একটু ফুর্তি না করতে করতেই টাকা কটা যেন পাখায় ভর করে উড়ে গেল। রেখে গেল শুধু নানাপ্রকারের কুৎসিত রোগ।

হাসপাতালে যাওয়ার কথাও অবশ্য ঠিক। নইলে উপায় ছিল না। সেখান থেকে বেরিয়ে পাঁচ-সাত টাকা ধার ক'রে ও আরায় চলে যায়। ওষুধ ছিল না একটাও, কেনবার টাকা কোথায়? ছিল এক বোতল সিরাপ আর রঙীন কাঁচের শিশিতে জল। আর শুধু ছিল একটু সোডা, সেও ঐ বন্ধুর পরামর্শ। 'ডালরুটি আর ছাতু খায় ব্যাটারা—সোডা একটু ক'রে দিস জলের সঙ্গে মিশিয়ে, তাতে উপকারই হবে। রোগ যা ভাল হবার তা আপনিই হয়, যা হবে না তা কি আর ডাক্তারই ভাল করতে পারবে? ডাক্তারের হাতেই কি সব রুগী বাঁচে? তবে আর ভাবনা ছিল কি?'

এই বন্ধুটি সৎ-পরামর্শই দিয়েছিল। শহরে চার আনা ক'রে ফি নেয় দেবেন, গ্রামে গেলে আট আনা থেকে এক টাকা পর্যন্ত। গম্ভীরভাবে নাড়ী দেখে, চোঙ্গা বসায়—ফিরে এসে ওষুধ পাঠিয়ে দেয়। এক শিশি ওষুধ দু আনা। রোগ সেরে গেলে লাউটা কুমড়োটা কপিটা—ডাল কড়াই গম, এসব ত আছেই। ফলে এই দু'তিন মাসেই দেবেন একটা খচ্চর কিনেছে, এখন তাইতে চেপে দেহাতে ডাক্তারী করতে যায়।

দিন-তিনেক পরে মার কাছে বসে মাথাটাথা চুলকে দেবেন বললে, 'মা, আমাকে ত ফিরতে হয় এবার।'

'সে কি রে? এরি মধ্যে?'

'নইলে রুগীপত্তর যা হাতে এসেছে অন্য ঘরে চলে যাবে যে। এই কি আমার আসা উচিত হয়েছে! নেহাত তোমাদের জন্যে প্রাণটা ছট্‌ফট করছিল তাই।'

'তা তবে যা। কিন্তু আমাদের কি গতি হবে?'

আর একটু ইতস্তত ক'রে দেবেন বললে, 'ওখানে একটা ঘর নিয়েছি বটে—কিন্তু খাওয়াদাওয়ার অসুবিধে হচ্ছে। খেটেখুটে এসে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাওয়া—সে আর পোষায় না।'

'কেন ওখানে ঠাকুর-টাকুর—'

'তুমি ক্ষেপেছ মা! এতকাল পরে ঐ খোট্টা বামুনের হাতে খাব আমি? ওদের কি জাতের ঠিক আছে! মাঠ থেকে ফিরে এসে কাপড় ছাড়ে না!'

ক্ষমা কল্পনাও করতে পারবেন না কোনদিন যে পতিতালয়ের ভাত ও মাংস দুইই দেবেনের চলে গিয়েছে ইতিমধ্যে। সেটা জেনেই দেবেন নিশ্চিন্ত হয়ে কথাটা বলতে পারলে।

ক্ষমা একটুখানি চুপ করে থেকে চিন্তিতভাবেই বললেন, 'তা হ'লে তুই কি আমাদের নিয়ে যেতে চাস? কিন্তু নরো ত কোন খবরই রাখছে না, কোনদিন যদি ফিরে আসে আমাদের খোঁজটা পর্যন্ত পাবে না!'

দেবেন চীৎকার ক'রে উঠল, 'ও হারামজাদার নাম করবে না আমার সামনে এই বলে দিলুম, বাস্। নইলে খুনোখুনি হয়ে যাবে। চিরদিন তোমার এক ভাবেই গেল। তোমার যেন একটা অযথা স্নেহ ওর ওপরে, তোমার প্রশ্রয়েই ত ও এতটা উচ্ছন্ন যেতে পারলে! নচ্ছার, বোম্বেটে, বদমাইশ, বেজন্মা কোথাকার!'

শ্যামা আড়াল থেকে শিউরে উঠল। ওর চোখে জল এসে গিয়েছিল—ভাশুরের কথার মধ্যে যে সংশয়টা প্রচ্ছন্ন ছিল সেটা অনুমান ক'রে।

ক্ষমাও ছেলের রাগ দেখে তাড়াতাড়ি কথাটা চেপে গিয়ে বললেন, 'তা সে তার যা খুশি হোক গে, এখানে না পায় বৌমার মার কাছে ত একবার খবর নেবে। কী আর করা যাবে।'

দেবেন মুখখানা গোঁজ করে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, 'সব সুদ্দ্ যাবার কথাই বা কে বলেছে? আমার নতুন ডাক্তারী, এতগুলো লোককে ঘাড়ে নিয়ে গিয়ে চালাবো কি ক'রে? থাকি তো একখানা ঘরে।'

অবাক হয়ে ক্ষমা প্রশ্ন করেন, 'তবে?'

'এখনকার মত তোমার জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূকেই শুধু নিয়ে যাব।'

দেবেন উদাসীনভাবে অন্য দিকে তাকিয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পর্যন্ত বিস্ময়ে ক্ষমার মুখ দিয়ে কথাই বেরোল না। তারপর শুধু আস্তে আস্তে প্রশ্ন করলেন, 'তা হ'লে আমাদের কি হবে? এই নির্জন নিবান্দাপুরীতে দুটো মেয়েছেলে পড়ে থাকব? আমি ত এই বুড়ো হয়েছি, যদি ভালমন্দ কিছু হয়? ও ত দুধের মেয়ে—তার সঙ্গে একটা বাচ্চা, কি ক'রে

সামলাবে? আমরা খাবোই বা কি তাও ত জানি না। সব ত উড়িয়ে পুড়িয়ে দিলি!'

দেবেন বললে, 'তা ব'লে কি সবাই চলে যাওয়াই ঠিক হবে? এই ত নিজেই বলছিলে যদি নরো ফিরে আসে? সে কাউকে খুঁজে না পেয়ে কী করবে সেটা ভেবে দেখেছ? তাকে কি একেবারে ভাসিয়ে দেওয়া ঠিক? তুমি ত তারও মা।'

ক্ষমার আর বেশি বিস্মিত হবার অবস্থা ছিল না। তিনি শুধু ওর দিকে চেয়েই রইলেন। দেবেন একটু থেমে বললে, 'না হয় বৌমাকে কলকাতাতে ওর মায়ের কাছে পাঠিয়ে দাও। তুমি থাকো এখানে—একটা ঝি-টি দেখে নাও। আমি না হয় চার-পাঁচ টাকা ক'রে পাঠাবো'খন্। না হয়···চার-পাচ মাস দ্যাখো অন্তত, তখনও নরো না ফেরে আমি তোমাকে এসে নিয়ে যাবো এখন।'

'তোমাকে' শব্দটার ওপর অতিরিক্ত জোর দিলে দেবেন।

ক্ষমা একটুখানি চুপ করে থেকে উঠে অন্যত্র চলে গেলেন। যাবার সময় শুধু শান্ত ভাবেই বলে গেলেন, 'সে আমরা যা হয় করব এখন—তোমার যাওয়ার দরকার, ভাল দিন দেখে চলে যাও। আমাদের জন্য ভাবতে হবে না তোমাকে।'

'ঐ ত—সে ত জানি চিরদিন। নরোর সাত খুন মাপ। আমি যদি ভাল করতে যাই ত সেও খারাপ। বেশ তাই করব। কালই নিয়ে যাব। তার মা নয়? আমার একার মা? আমিই বা বইব কেন? আমি উড়িয়ে দিয়েছি পয়সা, সে ওড়ায় নি? বেশ করেছি উড়িয়েছি, আমার পৈতৃক সম্পত্তি আমি উড়িয়েছি!'

চীৎকার ক'রে দেবেন গজরাতে লাগল বহুক্ষণ পর্যন্ত।

রাধারাণী অভিশাপের ভয়ে শাশুড়ীর পায়ে হাত দিয়ে ছলোছলো চোখে বললে, 'আমাকে মাপ করুন মা—উনি যে এমন কথা বলবেন তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। না বলবারও যো নেই, জানেন ত মানুষকে। আমার যেন মাথা কাটা যাচ্ছে মা লজ্জায়।'

সস্নেহে ওকে বুকে টেনে নিয়ে চুমু খেয়ে ক্ষমা বললেন, 'তোমার লজ্জা কি মা, তোমার দোষই বা কি? ওকে কি আর চিনি না। অমানুষ ছেলে পেটে ধরেছি, তার ফল ভোগ ত আমাকেই করতে হবে। তোমাদেরও এই শাস্তির মধ্যে ফেললুম—সেই আমার সব চেয়ে বড় লজ্জা। বিয়ে যখন হয়েছে মা, স্বামী যেখানে নিয়ে যাবে তোমাকে ত যেতেই হবে।'

রাধা জায়ের হাত ধরে কেঁদেই ফেললে। এতদিন একান্ত সাহচর্যে সে তাকে ভালই বেসেছিল একটু। বললে, 'ভাই, এ আমার সুখের যাওয়া নয় বিশ্বাস কর।'

তারপর একটু থেমে মাথা নীচু ক'রে বললে, 'আমার সন্দেহ হচ্ছে ভাই, ও-

খারাপ রোগ-টোগ কিছু নিয়ে এসেছে। বড্ড ভয় করছে।'

শ্যামা অবাক হয়ে বললে, 'খারাপ রোগ কি দিদি? সে কেমন ক'রে হয়?'

'তা ঠিক জানি নে ভাই, তবে শুনেছি লোকের মুখে, খারাপ মেয়েমানুষের কাছে গেলে নাকি কী সব হয়! তোমাকে যেন কোনদিন জানতেও না হয়। কিন্তু আমার যেন কেমন লাগছে।'

দেবেন পরের দিনই রাধারাণীকে নিয়ে চলে, গেল যাবার সময় মাকে প্রণাম ক'রে পায়ের কাছে তিনটি টাকা রেখে গেল। ওপাশের দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, 'এখন আর নেই হাতে, এতটা পথ যেতে হবে, খালি হাতে ত যাওয়া যায় না। গিয়ে বরং দু-একদিনের মধ্যে কিছু পাঠাব এখন—'

ক্ষমা সারাদিন রান্নাঘরে বন্ধ হয়ে ছিলেন কিন্তু যাত্রার সময় পুত্রবধূ বিশেষত, পৌত্রের কল্যাণের কথা স্মরণ ক'রেই না বেরিয়ে থাকতে পারলেন না। তেমনি আর একটি পুত্রবধূর কথা স্মরণ ক'রেই টাকাটা ছুঁড়ে ফেলে দেবার লোভ সংবরণ করলেন। শুধু বললেন, 'ওকে বলো বড় বৌমা, পথেঘাটে যদি দরকার হয় ত ওটাও নিয়ে যাক্। যখন ভাল বুঝবে পাঠাবে। আমাদের এতকাল যেভাবে কেটেছে সেই ভাবেই কাটবে।'

দেবেন ততক্ষণে গরুর গাড়িতে গিয়ে উঠেছে—সে আর উত্তর দিলে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এক

বিরাট খালি বাড়িটা হা হা করে। সব ঘরগুলোই বন্ধ ক'রে রাখা হয়েছে একটা ছাড়া। তবু যেন শ্যামার গা ছমছম করে। সেটাই যেন একটা বিভীষিকা। দেবেনরা চলে যাওয়ার পর থেকে ক্ষমাও কথাবার্তা বিশেষ বলেন না, শুধু নিঃশব্দে চোখের জল মোছেন আর মধ্যে মধ্যে প্রচণ্ড শব্দ ক'রে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। শ্যামাই বা নিজে থেকে তাঁর সঙ্গে কী কথা কইবে, কী ব'লে সান্ত্বনা দেবে ভেবে পায় না। সে-ও চুপ ক'রে থাকে। সেই প্রচণ্ড এবং দুঃসহ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হয় একমাত্র যখন ওর খোকা কেঁদে ওঠে তখনই। কিন্তু তার কান্নার শব্দ খালি বাড়িতে প্রতিধ্বনিত হয়ে এমন একটা বিচিত্র ধ্বনির সৃষ্টি করে যে শ্যামা কতকটা ভয় পেয়েই তাড়াতাড়ি ছেলেটাকে চুপ করাতে চেষ্টা করে।

ক্ষমা অবশ্য একাধিক দিন বলেছেন শ্যামাকে, ছেলেই যখন মায়ের মুখ চাইলে না তখন তুমি পরের মেয়ে কেন মিছে কষ্ট করছ মা, তোমার কিসের দায়িত্ব,

তুমি কলকাতা চলে যাও, আমার দিন একরকম ক'রে কাটবেই।'

শ্যামা কিছুতেই রাজী হয় নি, সেও উল্টো প্রস্তাব করেছে, 'তা হ'লে আপনিও চলুন কলকাতায়। আমার মা আপনাকে মাথায় ক'রে রাখবেন।'

ক্ষমা জিভ কেটে বলতেন, 'সে আমি জানি মা। কিন্তু বুড়ো বয়সে ছেলের শ্বশুরবাড়ি গিয়ে উঠব এক মুঠো ভাতের জন্যে, সে বড় লজ্জার কথা। সে পারব না।'

পাড়ার সবাই ছি ছি করে। তাদের সেই সরব সহানুভূতি যেন তীরের মত বেঁধে শ্যামাকে, অথচ কী বা তার বলবার আছে? তার স্বামী বা ভাশুর যা—তাই তারা বলে মাত্র। তারা ওদের প্রাণ-ধারণের উপায় ক'রে দিয়ে ধিক্কার দিচ্ছে তাদের, যাদের সে উপায় করবার কথা। রাগ করার কথা নয়, বিবাদ করার কথাও নয়—কৃতজ্ঞ থাকারই কথা। শ্যামাও তাই থাকতে চেষ্টা করে। কিন্তু তখনও যেটুকু আত্মসম্মান-জ্ঞান তার ছিল তা যেন নিঃশব্দ দহনে তাকে দগ্ধ করে।

স্বামীর কথা ওর মনে হয় যেন ছবির মত। এরই মধ্যে যেন তার চেহারাটা মনের মধ্যে অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। যারা বহুদিন পর্যন্ত স্বামীর চেহারা ধ্যানের মধ্যে উজ্জ্বল ক'রে রাখে তাদের কথা শ্যামা জানে না—তবে তার এখনই স্পষ্ট ক'রে মনে করতে যেন অসুবিধা হয়। শুধু মনে আছে স্বামী তার সুন্দর; তার সঙ্গের, তার সাহচর্যের আনন্দানুভূতিটা শুধু আজও ভোলে নি।

মাঝে মাঝে প্রচণ্ড ভাবে, উন্মত্ত ভাবেই সেটা মনে পড়ে। সমস্ত মন আকুলি-বিকুলি ক'রে ওঠে তাকে পাবার জন্য, তাকে জড়িয়ে ধরার জন্য। ক্ষোভে দুঃখে সে সময় ওর মাথা খুঁড়তে ইচ্ছে করে, মনে হয় নিজের কোন দৈহিক যন্ত্রণার কারণ ঘটলে যেন সে কতকটা সুস্থ হ'তে পারত। এই সময়গুলোতে স্বামীর কোন অপরাধের কথাই মনে থাকে না, শুধু মনে হয় সে ফিরে আসুক। কিছু বলব না তাকে।

এমনি ক'রে আরও কয়েক মাস কাটবার পর হঠাৎ কলকাতা থেকে চিঠি এল, উমার বিয়ে। শ্যামাকে কি পাঠানো সম্ভব হবে? তাহ'লে রাসমণি লোক পাঠাতে পারেন তাকে নিয়ে যাবার জন্য।

ক্ষমা চিঠি পড়া শেষ ক'রে বধূর মুখের দিকে চাইলেন।

'কি করবে বৌমা?'

উমা তার যমজ বোন। শৈশব ও বাল্যের ক্রীড়াসঙ্গিনী। একই বোঁটায় দুটি ফুল একসঙ্গে ফুটে উঠেছিল।

উমা, এক মুহূর্তও যাকে দেখতে না পেলে শ্যামা ঠিক থাকতে পারত না।

রাত্রে মায়ের দু'পাশে দুজন শুয়ে মায়ের বুকের ওপর দিয়ে পরস্পরের হাত ধরে থাকত। উমা যেন তার নিজের অস্তিত্বেরই একটা স্বতন্ত্র প্রকাশ ছিল।

সেই উমার বিয়ে! ওর সমস্ত মন দেহ, ওর সমস্ত সত্তা সেই মুহূর্তে চাইল পাখা মেলে উড়ে যেতে ওদের কলকাতার সেই ছোট্ট দোতলা বাড়িটাতে। যার ছাত ও চিলেকোঠায় ওদের দুই বোনের বাল্যের শত সহস্র স্মৃতি জড়িত আছে।

কিন্তু সেই উমার বিয়ে ব'লেই যাওয়া সম্ভব নয়।

বধূকে নিরুত্তর দেখে ক্ষমা সম্মতির লক্ষণ ধরে নিলেন। ম্লান হেসে বললেন, 'ভাবছি, কী যৌতুক করবে তোমার বোনকে। একটা কিছু না দিলে ত মান থাকে না। অন্তত আইবুড়ো ভাতের একটা শাড়িও ত নিয়ে যেতে হবে।'

'আমি যাবো না মা।'

'যাবে না বৌমা? কেন মা?' প্রশ্ন করলেন বটে কিন্তু ক্ষমার কণ্ঠে যে উদ্বেগ প্রকাশ পেল সে যেন, যদি বৌমা মত বদল করে এই আশঙ্কার।

শ্যামা নতমুখেই জবাব দিল, 'কী প'রে গিয়ে দাঁড়াব মা? গহনা ত সবই সেখানে রইল। আছে কিনা তাও জানি না। বেনারসী শাড়িটা পর্যন্ত এখানে নেই। ভাল কাপড়ও ত নেই একখানা। এ অবস্থায় সেখানে গেলে নানা লোকে নানা কথা বলবে মা—কটার উত্তর আমি দেব? আপনার ছেলের কথাই বা কি বলব। আর যৌতুকের কথা ত আছেই। তাছাড়া একেবারে একা আপনাকেই বা কার কাছে রেখে যাব?'

'সে না হয় দুলে-বৌকে দুদিন রাত্তিরে থাকতে বললুম। কিন্তু বাকী কথা গুলোই—'এই পর্যন্ত ব'লে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'তোমার কপাল মা! নইলে নিজের বোনের বিয়ে আর এই তোমার মায়ের শেষ কাজ, যেতে পারলে না। আমারও কপাল যে জোর ক'রে তোমাকে যাও বলতে পারলুম না। সত্যিই ত, কীই বা প'রে যাবে, দেওয়ার কথা বাদই দাও। তোমার মাকেই বা কী বলবে, তিনি ত আর কিছু কম দেন নি!'

তারপর একটু থেমে ওর পিঠে হাত দিয়ে সস্নেহে বললেন, 'তবে একটা কথা ব'লে রাখি, স্বামীর সম্বন্ধে উল্লেখ করতে গেলে কারুর ছেলে কি কারুর বাবা এমন ব'লে উল্লেখ করতে নেই মা—ওতে নিন্দে হয়।'

কটা দিন যেন ভূতে পাওয়ার মত কী এক ঘোরে ঘুরে বেড়াল শ্যামা। ওর দেহটা আছে এখানে কিন্তু সমস্ত আত্মা যেন সেখানকার সেই বাড়িতে। কখন কি হচ্ছে সেখানে—এ ওকে ব'লে দেবার দরকার নেই। অবসর বা কাজকর্মের

মধ্যেও সবটা যেন ওর চোখের সামনে ঘটছে। চোখ বোজবারও দরকার নেই, এমন কি চোখ অপর কোন বস্তুর বা ব্যক্তির দিকে মেলা থাকলেও দৃষ্টিতে ফুটে উঠছে অন্য জিনিস। দিদি এসেছে। দাদাবাবু। খোকা। বড় মাসিমা তাঁর বিখ্যাত হেঁসেলের ঘটি নিয়ে রান্নাঘরের চৌকাঠে এসে বসেছেন। তিনি বাল্যবিধবা, হুতাশনের মত প্রচণ্ড জ্বালা বুকে নিয়ে আজ এর বাড়ি কাল ওর বাড়ি ক'রে বেড়ান। ইহজগতের সম্বল বলতে তাঁর আছে মাত্র ঐ ঘটিটি। কোথাও কোন আশ্রয় নেই, আর কোন সম্পত্তি নেই। থান-দুই-তিন থান কাপড় ও ঐ ঘটি—তাঁর সংসার। যখন যেখানে থাকেন গৃহস্থের কোন কাজে আসেন না, তাদের খান অথচ অহরহ গালাগালি দেন। কুলীনের ঘর—বাপ-মা দেখেশুনে এক অথর্ব বৃদ্ধের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। বিধবা হবার পর বলতেন, 'ভবিতব্য, নইলে কত বুড়ো ত বেঁচে আছে!' সেইজন্য বাপ-মাকেও গালাগালি না দিয়ে বড় মাসিমা জলগ্রহণ করেন না। তাঁদের উল্লেখ করতে গেলেই বলতেন—'উঁ, বলে কিনা ভবিতব্যি! দিলি জেনে-শুনে ঘাটের মড়াকে, তার আবার ভবিতব্যি কি? তোরাই ত ভবিতব্যি। ইনি ভবি আর উনি তব্যি। দুজনে মিলে আমার কপালটাকে কড়মড় করে চিবিয়ে খেয়েছেন!'

তবু বড় মাসিমাকে বাদ দেবেন না মা নিশ্চয়ই। তিনি রান্নাঘরের চৌকাঠ জুড়ে বসে পাহারা দিচ্ছেন তাঁর নিরামিষ রান্না কেউ আঁশ ক'রে না ফেলে কিংবা অপর কেউ না ছোঁয়। আর এসেছেন মেজমামা। মেজমামা আর মেজমামার ছেলে, এঁরা কখনও মাকে ত্যাগ করেন নি। কাকারা কেউ আসবেন না এটা ঠিক, তবে এক খুড়তুতো দাদা কলকাতাতেই থাকে মেসে, সে মাঝে মাঝে এসে মার কাছে খেয়ে যায়—সে আসবে। আরও এদিক ওদিক থেকে—পাড়ার সব কাকীমা মাসিমা বৌদির দল।

কোথায় বাজারগুলো এনে ঢালা আছে তা শ্যামা জানে। পান সাজার সরঞ্জাম সিন্দুকের নিচেই রয়েছে নিশ্চয়। দিদি উমার বেনারসী কাপড়খানা দেখাচ্ছে সবাইকে। দাদাবাবু রসিকতা করছেন আর ভিয়েনের আয়োজনে ব্যস্ত। ঐ কাজটা তিনি জানেন ভাল।

উমার বর কেমন দেখতে হ'ল কে জানে! উমা শ্যামারই যমজ, ঐ রকমই সুন্দর দেখতে, তবে রঙটা ওর মত অত গোলাপী নয়—একটু হলদেটে। মা বলেন, হরতেলের মত রং। তা হোক, তাতেই যেন আরও সুন্দর দেখায়—উমা, নামেও উমা দেখতেও তাই, সাক্ষাৎ দুর্গা যেন। নিশ্চয় ওর বরও দেখতে ভাল হয়েছে। মা জামাই না দেখে করেন না। দিদিকে দোজবরেয় দিয়েছেন বটে—কিন্তু

দাদাবাবুর কী চেহারা, যেন মহাদেব। তারও ত—

থাক্, তার স্বামীর কথা নির্জনে মনে হ'লেও চোখে জল ভরে আসে।

আহা উমা যেন সুখী হয় তার স্বামীকে নিয়ে। যেমনই দেখতে হোক সে সুন্দরে আর কাজ নেই!

বিয়ের তারিখ যত এগিয়ে আসে শ্যামার মন তত হু-হু করে। ক্ষমা বধূর দিকে চেয়ে দেখেন আর নিজেও চোখের জল মোছেন আড়ালে। বিয়ের তারিখ যেটা, সেদিন ভোরে আর শ্যামা কিছুতেই স্থির থাকতে পারলে না। ভোরবেলা ওর কান্নার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে উঠে ক্ষমা দেখেন ঘর থেকে বেরিয়ে দালানে মেঝেতে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে শ্যামা। আজ আর তার কোনও বাঁধ নেই, আজ আর ধৈর্যের অভিনয় করা সম্ভব নয়।

ক্ষমা একটি সান্ত্বনার কথাও মুখে উচ্চারণ করতে পারলেন না। শুধু পাশে গিয়ে বসে ওর মাথাটা জোর ক'রে নিজের কোলে তুলে নিলেন।

সারারাত ঘুমোয় নি শ্যামা। ওদের রাত জেগে কুটনো কোটার সময় সে অদৃশ্য থেকেই সারারাত যেন সেখানে ছিল। শুধু জল সইতে যাবার সময়টা মনে পড়ে আর কিছুতেই নিজেকে বেঁধে রাখতে পারে নি।

সত্যিই সে উমার বিয়েতে রইল না!

দুই

কিন্তু তার পরের দিনের পরের দিন, আইনত যেদিন উমার ফুলশয্যা হবার কথা, সেদিন সন্ধ্যার কিছু আগে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবেই এসে হাজির হ'ল নরেন।

শ্যামা যেন চোখকে বিশ্বাসই করতে পারে না, সে বিহ্বল হয়ে চেয়ে রইল শুধু। নরেন রসিকতা করার চেষ্টা ক'রে বললে, 'কি গো, ভূত দেখলে নাকি? মাইরি, এত রকম ন্যাকামোও জানো!'

শ্যামা আরও অবাক হয়ে গিয়েছিল ওর চেহারা দেখে। শেষ ওকে দেখেছিল, সিল্কের পাঞ্জাবি দেশী ধুতি পরনে; সোনার ঘড়ি চেন। আজ সেখানে ছেঁড়া আধ-ময়লা কাপড়, একটা সুতো-সরা ছিটের কোট। কাপড় হাঁটু অবধি তোলা, এক পা ধুলো, খালি পা। একটা পুঁটুলি হাতে। আর তেমনি চেহারা, চুল গুলো রুক্ষ, সর্বাঙ্গে কে কালি মেড়ে দিয়েছে যেন—এত কালো ওর স্বামী কখনই নয়! রোগা, ঘাড়টা সরু হয়ে গিয়েছে। অমন পুরন্ত গাল কে যেন চড়িয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছে ভেতরে। অত বড় বড় চোখ তাও কোটরগত। সবচেয়ে ওর সন্দেহ হ'ল—বোধ হয় চুলেও কিছু কিছু পাক ধরেছে এই বয়সেই। হাতের কব্জিতে

ও পায়ের গোছে পাঁচড়ার মত ঘা। সর্বাঙ্গে খড়ি উঠেছে—মনে হয় যেন কত মাস স্নান করে নি।

সে অবাক হয়ে দেখেই চলেছে, এমন সময় ক্ষমাও 'কে এল গা বৌমা' ব'লে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে যেন পাথর হয়ে গেলেন ছেলেকে দেখে। কী যেন বলবার চেষ্টা করলেন, কিছুক্ষণ পরে ঠোঁট দুটো নড়লও বার কয়েক, কিন্তু কোন স্বরই বেরোল না তা থেকে—এবং নরেন যখন এগিয়ে এল ওঁর দিকে, বোধ হয় প্রণাম করবারই ইচ্ছে ছিল,—তিনি একটি কথাও না বলে রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকে সশব্দে দোর বন্ধ ক'রে দিলেন।

'বা রে! বেশ ত! মজা মন্দ নয়! মাও ঢং শিখেছে কত!'

অপ্রতিভ না হবার চেষ্টা করতে করতে নরেন আবার পিছিয়ে এল। তারপর পুঁটুলিটা শ্যামার কাছাকাছি মেঝেতে নামিয়ে রেখে বলল, 'উম্নির যে বিয়ে হয়ে গেল। কৈ, তোমরা যাও নি ত কেউ?'

এ প্রশ্ন নরেনের পক্ষেই করা সম্ভব, শ্যামা এতদিনে স্বামীকে এটুকু বুঝেছিল। তাই সে কোন অনুযোগের চেষ্টাই করলে না। কিন্তু বিস্মিত সে হ'ল রীতিমতই। সব ভুলে গিয়ে প্রশ্ন করলে, 'তুমি কি ক'রে জানলে?'

'আরে, আমি কি জানি যে তুমি এখনও এখানে আছ। আমি ভেবেছি তোমাকে শাশুড়ী ঠাকরুন নিশ্চয় কলকাতাতে নিয়ে গিয়ে রেখেছেন—যা আদুরে মেয়ে তুমি!'

'অনুযোগ করব না' মনে করলেও এক এক সময় অসহ্য হয় বৈকি। শ্যামা ব'লে ফেললে, 'আর বুড়ো মা তোমার, তাঁকে কোথায় রেখে যাবো?'

'আমি ত ভেবেছিলুম মা-টা এতদিনে মরেই গেছে। নইলে দাদা হয়ত এসে নিয়ে-টিয়ে গেছে কোথাও। তাই আগেই খোঁজ করতে গিয়েছিলুম কলকাতাতে।'

'তুমি, তুমি এই ভাবে সেখানে গিয়েছিলে নাকি?' শিউরে ওঠে শ্যামা; প্রায় আর্তনাদ ক'রে ওঠে সে।

এবার নরেনও একটু অপ্রতিভ হয়, 'আরে, আমি কি আর বিয়েবাড়ি জেনে গিয়েছিলুম! তারপর শাশুড়ী ছাড়লেন না, তা কি করি বলো। তিনি এত কথা জানতেনও না দেখলুম। আমার মুখেই সব শুনলেন। তুমি ত আচ্ছা চাপা মেয়ে! ধড়িবাজ বটে বাবা!'

তারপর নিজের রসিকতায় নিজেই খানিক হেসে নিয়ে বললে, 'তাই ব'লে বলতে পারবে না যে একা একা খেয়ে এসেছি সাথক্‌পরের মত। তোমার জন্যে দিব্যি ক'রে চেয়ে-চিনতে ছাঁদা বেঁধে এনেছি। লুচি মিষ্টি সব রকম। মাছটা

খারাপ হয়ে যাবে তাই—'

আর শ্যামার পক্ষে স্থির থাকা সম্ভব হ'ল না।

'তোমার গলায় দড়ি জুটল না, তাই আবার তুমি ঐ খাবার বয়ে নিয়ে এলে! গলায় পৈতেগাছটা ত ছিল। না, তাও বেচে খেয়েছ? ছি ছি, আমারই যে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে ইচ্ছে করছে।'

শ্যামাও তার শয়নঘরে ঢুকে সশব্দে কপাটটা বন্ধ ক'রে দিলে।

'ইস্, ভারি যে লম্বা লম্বা কথা শেখা হয়েছে! ছাখো সবাই মিলে অমন ক'রে আমাকে ঘাঁটিও না বলে দিচ্ছি। গলায় দড়ি! দড়ি দেওয়া বার ক'রে দেব একেবারে। বজ্জাতের ঝাড় কম্‌নেকার!'

পূর্ব-অভ্যাসমত খানিকটা দাপাদাপি করলেও আগের মত জোর আর পাওয়া গেল না নরেনের কণ্ঠস্বরে। বরং কিছুক্ষণ পরে ক্ষমার দোরের কাছে গিয়ে অনভ্যস্ত কণ্ঠে একটু মাপ চাইবারও চেষ্টা করলে।

ক্ষমাকেও বেরিয়ে আসতে হ'ল। যে অমানুষ তাকে ক্ষমতা থাকলে শাসন করা যায় কিন্তু তার ওপর অভিমান করার মত নির্বুদ্ধিতা আর কিছু নেই। তিরস্কারও করলেন খানিকটা—বৃথা জেনেও।

নরেন কিন্তু বেশ সপ্রতিভ ভাবেই আত্মসমর্থন করলে। বললে, 'বা রে, সব দোষ বুঝি আমার? একে কলকাতা শহর, তায় আমি ছেলেমানুষ, হাতে অতগুলো কাঁচা পয়সা—মাথার ঠিক থাকে কখনও? আর আমি না হয় ঠিক রাখলুম,পাঁচজনে রাখতে দেবে কেন? দেখতে দেখতে চারিদিক থেকে ইয়ারবগ্‌গ এসে জুটল—ব্যস্, মদ মেয়েমানুষ, ও কটা পয়সা আর কদিন?'

'য়্যাঁ।' প্রায় আর্তনাদ ক'রে ওঠেন ক্ষমা, 'তুই বাড়ি করার টাকা এমনি ক'রে মদে-মেয়েমানুষে উড়িয়ে দিয়ে এলি? আর তাই আবার বড় গলা ক'রে আমার সামনে বলছিস্? হ্যাঁ রে, ঘেন্না পিত্তি কি তোদের কিছু নেই কোথাও? সেও একজন কি পেঁসের কারবার করার নাম ক'রে সব উড়িয়ে দিলেন আর ইনি—'

বিশ্রী একটা ভঙ্গি ক'রে নরেন বলে, 'ইল্ লো! কে কারবার ক'রে পয়সা উড়িয়েছে তাই শুনি? দাদা?'

ক্ষমার মনে প্রথম একটা সংশয় দেখা দেয়। তিনি থতিয়ে গিয়ে বলেন, 'হ্যাঁ, তাই ত বললে সে।'

হো হো ক'রে অনেকক্ষণ ধরে হাসে নরেন, 'মাইরি, দাদা বেশ বানিয়ে বানিয়ে বলতে পারে ত! নবেল লিখলে ওর দু পয়সা হ'ত। ঐ আমিও যে পথে গিয়েছি, দাদাও সেই পথের যাত্রী। এক পাড়াতেই যে দুজনে গিয়ে পড়েছিলুম। দাদা কার

ঘরে যেত তা আর আমি জানি নি! দুজনেরই খারাপ রোগ ধরল, আমি সামলে নিলুম, দাদা এখনও ভুগ্‌ছে।...কারবার! কারবারই বটে!'

সম্পূর্ণ নির্লজ্জ ভাবে কথাগুলো ব'লে সগর্বে চেয়ে রইল নরেন। দাদার জুচ্চুরিটা ধরে দিতে পেরে সে এইবার সত্যি-সত্যই খুশি হয়েছে।

ক্ষমা স্তম্ভিত ভাবে বসে রইলেন। নরেন অমানুষ এ তিনি চিরকালই জানেন, কিন্তু দেবেন? সেও এতগুলো মিছে কথা ব'লে গেল?

নরেন বললে, 'দাদা আর কি বানিয়ে ব'লে গেছে তাই শুনি।'

'সে বানিয়ে বানিয়ে বলেছে না তুই বলছিস্ কেমন ক'রে বুঝব? নিজে ল্যাজ-কাটা শিয়াল, অপরের ল্যাজও কাটতে চাইছিস্ কিনা কে জানে!'

'মাইরি মা, তোমার দিব্যি বলছি—'

নরেন মায়ের গায়ে হাত দিতে যাচ্ছিল, ক্ষমা যেন সভয়ে গিয়ে বললেন,—'ছুঁস নি ছুঁস নি—তোদের পেটে ধরেছি এই পাপেই আমাকে নরকে যেতে হবে—আর ছুঁয়ে এখন পাপ বাড়াব না। কত জন্মের পাপ ছিল তাই এ জন্মে এমন ছেলে পেটে ধরেছি!'

নরেন ঠিক এতটা আশা করে নি। কারণ তার নিজের অপরাধ সম্বন্ধে সে নিজে মোটেই সচেতন নয়। মাকে সে ধরতে যাচ্ছিল, হঠাৎ তিনি সরে যাওয়ায় পড়ে যাবার উপক্রম হ'ল। সেটা সামলে নিতে বেশ একটু বেগ পেলে। একটু অপ্রতিভও হ'ল—ও নিজে বুঝতে পারলে না কেন—তারপর সেটা সামলাবার জন্যে আপন মনেই সেই শূন্য দালানে দাঁড়িয়ে খানিক আস্ফালন করতে লাগল, 'ও, না ছুঁলে ত বড় বয়েই গেল। ভারি ত! আমার ত বড় ক্ষেতি! দাদা এসে মিছে ক'রে বানিয়ে ব'লে বেশ সতী হয়ে গেল। আমার বেলা যত বাচ-বিচার। বেশ, আমি আসব না না-হয়, অত কি!'

রাত্রে আহারাদির পর শ্যামা অন্য দিনের মত যখন ক্ষমার বিছানাতে এসেই বসল তখন তিনি একটু বিস্মিত হলেন। বোধ হয় একটু উদ্বিগ্নও। বললেন, 'আর এত রাত্রে এখানে কেন মা, একেবারে ও ঘরে শুয়ে পড়োগে। খোকা বরং থাক্ এখানে—যদি রাত্রে খুব কান্নাকাটি করে ত ডেকে দিয়ে আসব এখন!'

শ্যামা অভ্যাসমত শাশুড়ীর পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে খানিক পরে বললে, 'আমি এখানেই থাকি না মা। আমার আর ভাল লাগছে না।'

ক্ষমা উঠে বসলেন। বধূকে প্রায় কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে বললেন, 'তা জানি মা। আমিও ত মেয়েছেলে, ও সব কথা শোনবার পর স্বামীর কাছে যেতে যে কী

ঘেন্না হয় মা তা আমি বুঝতে পারি। আমরা বরং সতীন সয়েছি অনায়াসে। তাতে অত ঘেন্না হয় না—এর ভেতরে যে নীচতা আছে তাতে তা নেই, কিন্তু কী করবে মা। এ হিন্দুর বিয়ে, মুছে ফেলবার নয়, তালাক দেবারও নিয়ম নেই। যখন ঐ ঘরই করতে হবে তখন সহ্য করা ছাড়া উপায় কি বলো! শুধু শুধু, ওকে তো জানো মা—একটা চেঁচামেচি গণ্ডগোল, মারপিট করাও বিচিত্র নয়। এই নিষুতি রাত, একটু চেঁচালেই শোনা যায়। পাড়াসুদ্ধ টিটিক্কার পড়ে যাবে মা!'

শ্যামা ওর শাশুড়ীর কোলের মধ্যেই মুখ গুঁজে পড়ে ছিল এইবার উঠে বসল। আঁচলে চোখ মুছে মাথার কাপড়টা টেনে দিয়ে নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে এল।

'আপনি দোর দিয়ে শুয়ে পড়ুন মা।'

বাইরে থেকে সহজ অথচ শুষ্ক স্বরে কথাগুলো বললে সে, কতকটা যন্ত্র-চালিতের মত।

ঘর থেকে বেরিয়ে সে যেখানে পড়ল সেটা ঘেরা দরদালান। ক্ষমার ঘরের পাশেই সিঁড়ি, তার পাশের ঘরে আজ নরেনের বিছানা করা হয়েছে। তাদের বিছানা।

কলের পুতুলের মতই শ্যামা সেদিকে দু পা এগিয়ে গেল কিন্তু সিঁড়ির কাছাকাছি যেতেই যেন ওর চমক ভাঙল। আছে, এখনও উপায় আছে। পালিয়েই যাবে নাকি শেষ পর্যন্ত!

ঐ সিঁড়ি, সিঁড়ি দিয়ে নামলেই নিচের দালান—দোর খুলে বেরিয়ে পড়লে কেউ জানতেও পারবে না।

তারপর?

পাশেই কুণ্ডুদের পুকুর। আর একটু এগিয়ে গেলেই গঙ্গা।

চিরদিনের মত শান্তি। এ যন্ত্রণা আর সইতে হবে না।

শ্যামা স্থির হয়ে দাঁড়াল। লোভ! হয়ত লোভই হবে। মৃত্যুর ওপর যে লোভ হয় তা কে জানত! এই ত ওর মোটে পনরো-ষোল বছর বয়স, ভরা যৌবন! এতদিন কি প্রচণ্ড ভাবেই না কামনা করেছিল ও স্বামীকে। নিষ্ঠুর নির্বোধ, পশু—তবু ও তাকে চেয়েছিল, ওর প্রথম যৌবনের সমস্ত উগ্র কামনা দিয়ে স্বামীর কথাই চিন্তা করেছিল শুধু। আজ সেই স্বামীই উপস্থিত, প্রায় এক বৎসরের অনুপস্থিতির পর।

তবে?

কিন্তু এ বুঝি পশুরও বেশি। ঘরে যার নববিকশিত পদ্মের মত রূপসী বধূ সমস্ত অন্তরের বাসনার দীপটি জ্বালিয়ে অপেক্ষা করছে, স্বপ্নের মত প্রণয়রজনীগুলি আবেগ-থরথর বাসনায় যেখানে উন্মুখ হয়ে রয়েছে—সেখানে না এসে, সে বধূর দিকে

না চেয়ে যে গেল একটা ঘৃণ্যা রূপোপজীবিনীর ঘরে, কুৎসিত ব্যাধিতে নিজের স্বাস্থ্য ও যৌবনলাবণ্য বোধ হয় চিরকালের মতই নষ্ট ক'রে এল, সে পশুর চেয়েও অধম। পশু চায় দেহের প্রয়োজন মেটাতে, সেখানে সে পাত্রাপাত্র বিচার করে না—কিন্তু যেখানে সে প্রয়োজন ছিল না ? যেখানে শুধু জঘন্য জীবন, শুধু পাঁক, শুধু মালিন্য, শুধু ক্লেদের প্রতি আকর্ষণ, মোহ—সেখানে কোন্ স্তরে ফেলবে সে মানুষকে ?

সেই পুরুষের আলিঙ্গনের মধ্যে নিজের দেহকে এলিয়ে দিতে হবে ?

ভাবতেও যেন শিউরে ওঠে সে। অথচ—

খোকা ? শিউলি ফুলের মত নরম, পদ্মের মত পবিত্র যে ফুলটি তার এই দেহ-লতায় মঞ্জরিত হয়ে উঠেছে, যা তার ঈশ্বরের দেওয়া দান, তাকে ছেড়ে যেতে হবে ?

মা, দিদি, উমি। জননীর মত স্নেহশীলা তার শাশুড়ী।

শ্যামা সিঁড়ির কাছ থেকে সরে এল। দক্ষিণের একটা জানালার ধারে এসে ঠাণ্ডা গরাদেতে ওর উত্তপ্ত ললাট চেপে দাঁড়াল। আঃ ! কী ঠাণ্ডা ! কী শান্তি !

বাইরে রাত্রি যেমন অন্ধকার তেমনি নিস্তব্ধ। দূরে কোথায় একটা সরীসৃপ চলে গেল বোধ হয় শুকনো পাতার ওপর দিয়ে। তার শব্দ এখানে এসে যেন ওর আচ্ছন্ন চৈতন্যে আঘাত করল। ঐ সরীসৃপের স্পর্শও বোধ হয় এতটা ক্লেদাক্ত নয়।...

এবার সঙ্গে ক'রে হুঁকো-কলকে এনেছিল নরেন। তামাকের অভ্যাস হয়েছে এই ক'দিনে। এখনও বসে বসে তামাক টানছে সে। সে শব্দ এবং গন্ধ এখান থেকে স্পষ্ট পাওয়া যাচ্ছে। তার মানে এখনও জেগে আছে। মনে মনে একটা অত্যন্ত দুরাশা পোষণ করছিল শ্যামা যে, হয়ত ঘুমিয়েই পড়বে নরেন শীগ্‌গির।

হঠাৎ একসময় সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। অন্ধকার দালানে শ্যামাকে অমন নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে যেন একটু ভয় পেয়েই থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর ওকে চিনতে পেরে কাছে এসে তিক্ত চাপা গলায় বললে, 'এই যে, এত রাত্তিরে আবার ন্যাকামি ক'রে এখানে দাঁড়িয়ে থাকা হয়েছে কেন ? আমি কি সারারাত জেগে শুয়ে থাকব নাকি ?'

সেই ক্রূর ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর ! এর পরে প্রহার—তা শ্যামা জানে।

তবু, কোথা থেকে যেন একটা অসম সাহস ওর এসে গেল।

সে শান্ত সহজকণ্ঠে বললে, 'তুমি যাও শোও গে—আমি একটু পরে যাচ্ছি।'

নরেন ওর একটা হাত ধরে টানবার চেষ্টা ক'রে বললে, 'ওসব ন্যাকামি ছেড়ে দাও দিকি চাঁদু, ভাল চাও ত শোবে চলো ভালমানুষের মত। নইলে—'

'নইলে কি ?' শ্যামার কঠিন ও মৃদু কণ্ঠস্বর যেন চম্‌কে দেয় নরেনকে, 'নইলে অদৃষ্টে দুঃখ আছে, এই ত ? কী করবে তুমি, মারবে ? বেশী ক'রে মারতে পারবে ? বঁটি এনে দিলে গলায় বসিয়ে দিতে পারবে ? ছাখো, একটা কথাও বলব না আমি, কাঁদব না পর্যন্ত, কেউ টের পাবে না।'

ওর এ চেহারার সঙ্গে নরেন মোটেই পরিচিত নয়। সে বেশ একটু ঘাবড়ে গেল।

'ও সব কি ইয়ার্কি হচ্ছে ? 'চলো শোবে চলো—'থতিয়ে থতিয়ে বললে নরেন। কিন্তু বেশ বোঝা গেল, আগের জোর আর ওর গলায় নেই।

শ্যামা এবার সহজেই হাতখানা নরেনের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, 'তুমি শোও গে, আমি ঠিক শুতে যাবো। আমার খুশিমত যাবো। কিন্তু যদি জুলুম করো ত এখনই ওপরের ছাদ থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ব। এ কথার আর নড়চড় হবে না।'

নরেন রীতিমত ভীত কণ্ঠেই বললে, 'তুমি, তুমি আমার ঘর করবে না নাকি ?'

'করতে ত হবেই! কিন্তু আজ রাতটা আমায় অব্যাহতি দাও, দোহাই তোমার!'

নরেন আস্তে আস্তে, যেন পিছিয়ে পিছিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। সেখানে পৌঁছে কিন্তু ওর পূর্ব অভ্যাস ফিরে পেলে সে। আস্ফালন করতে লাগল, 'উঃ, বেশ্যাবাড়ি যেন কেউ যায় না। কত তাবড় তাবড় লোক যাচ্ছে, দেখগে যা। বেশ করেছি গেছি, পুরুষমানুষ গিয়েই থাকে। এসে পর্যন্ত শাশুড়ী-বৌয়ে করছে দেখ না! সতীর বেটি সতী! ও সব সতীপনা ঢের দেখেছি। ও নাটুকেপনা টিট্ করতে আমার বেশি সময় লাগবে না ব'লে দিলুম।...আচ্ছা, আজ থাক, রাত্তিরে আর বেশী হাঙ্গামা করলুম না। কাল সকালে তোমার একদিন কি আমার একদিন!'

আস্ফালনও ক্রমে ক্রমে থেমে আসে। তারপর এক সময় নিয়মিত নাক ডাকার শব্দ কানে যায় অর্থাৎ নরেন ঘুমিয়ে পড়ছে।

শ্যামা সেইখানেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তেমনি একহাতে জানালার গরাদেটা ধরে, স্তব্ধ হয়ে। বসল না পর্যন্ত। এমনি ভাবেই কেটে গেল, ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

আজ উমার ফুলশয্যা। তার আবার কি ফুলশয্যা হ'ল তা কে জানে!।

ভগবান তাকে বাঁচাও!...তাকে যেন এ অপমান কোনদিন না সইতে হয়।

এতক্ষণ যেন পাথর হয়ে দাঁড়িয়েছিল শ্যামা। উমার কথা মনে হয়ে মার কথা মনে পড়ল—মার কত স্নেহের মেয়ে ছিল সে। তার সেই ছেলেবেলাকার মধু-

মাখা দিনগুলি—। সে ছেলেবেলা খুব সুদূরও নয়।

এবার যেন সহসা পাষাণ বিদীর্ণ হয়ে নির্ঝরিণী নামল। শ্যামা কান্নায় ভেঙে পড়ল।

তিন

রাসমণি গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ—ভারি রাশভারি। সেজন্য বাইরে থেকে তাঁর অন্তরের কোন আঘাতেরই পরিমাণ বোঝা যেত না। কিন্তু শ্যামার ব্যাপারে সত্যিই তিনি অত্যন্ত আঘাত পেয়েছিলেন। তাঁর অমন রূপসী মেয়ে, বুদ্ধিমতী কর্মনিপুণা মেয়ে, যে সংসারে যাবে সে সংসারকে সুখী করতে পারবে, ভবিষ্যতে একদিন তার হাল ধরতে পারবে—একথা তিনি প্রায়ই গর্ব ক'রে বলতেন। সেই শ্যামার এমন বিয়ে হবে কে জানত!

রাসমণি অনেক আঘাত পেয়েছেন জীবনে। সতীনের ওপর বৃদ্ধ স্বামীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। নৌকা ক'রে যেতে যেতে আটান্ন বছরের বৃদ্ধ তেরো বছরের মেয়েকে গঙ্গাস্নান করতে দেখে চঞ্চল হয়ে ওঠেন। ঘটক পাঠান বিয়ের প্রস্তাব ক'রে, জমিদার তিনি—পয়সা দেখে বাপ-মাও দিয়েছিলেন। অবশ্য স্বামীকে নিয়ে যে খুব অসুখী হয়েছিলেন রাসমণি, তা বলা যায় না। কিন্তু প্রথম যৌবনেই তিনটি শিশুকন্যা নিয়ে বিধবা হন। শেষ সময়ে স্বামীর কাছে তিনি থাকতে পর্যন্ত পারেন নি। দেবররা সতীন-পুত্রের সঙ্গে ব্যবস্থা ক'রে এক সুচতুর চক্রান্তে তাঁকে সরিয়ে দেয়, মরবার সময় অচৈতন্য নিরক্ষর স্বামীর টিপসই নিয়ে এক মিথ্যা উইল খাড়া করে। তার ফলে তিনি সমস্ত বিষয়ে বঞ্চিত, তাঁর মিথ্যা দুর্নামে শ্বশুরবাড়ির দেশের আকাশ-বাতাস কলুষিত। এই অবস্থায় নিজের গহনা বিক্রি ক'রে এবং সামান্য যা কিছু টাকা হাতে ছিল তাই দিয়ে মেয়েদের মানুষ করতে হচ্ছে তাঁর। মোকদ্দমা করলে হয়ত জ্ঞাতিদের জব্দ করা যেত, কিন্তু সে চেষ্টা করবে কে? তা ছাড়া তখন ঐ ক'টা টাকাই শেষ অবলম্বন—সেটাও উকীল-মোক্তারের হাতে তুলে দিতে ভরসা হয় নি।

এত দুঃখের মধ্যে মেয়ের বিয়ে দেওয়া—তারও এই অবস্থা! রাসমণি পাথর হয়ে গিয়েছিলেন। মেয়ে চাপা, সে প্রায় কিছুই বলে না কিন্তু নরেনের মুখে যেটুকু প্রকাশ পায় তাই যথেষ্ট। বাকীটা অনুমান ক'রে নিতে পারেন অনায়াসেই। তার ফলে ইদানীং তিনি রাত্রে ঘুমোতে পারতেন না। বহু রাত্রি পর্যন্ত একা জেগে বসে থাকতেন। কত কী আকাশ পাতাল ভাবতেন। এক এক সময় মনে হ'ত তিনি পাগল হয়ে যাবেন। আবার এক এক সময় যেন ভাবতে ভাবতে

বুকটা ভেঙে যেতে চাইত, 'বাপ রে!' ব'লে প্রচণ্ড একটা নিশ্বাস ফেলতেন। সে নিশ্বাসের শব্দে উমার ঘুম ভেঙে যেত।

এমনি বসে থাকতে থাকতে এক একদিন রাত ভোর হয়ে আসত, চারটে বাজলেই উঠে বাড়িতে তালা লাগিয়ে গঙ্গাস্নান করতে যেতেন।

অবশ্য এ লক্ষণগুলোর সঙ্গে বাইরের লোকের পরিচয় ছিল না।

একটি মাত্র লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল, উমার বিয়ে দিতে তাঁর অনিচ্ছা।

মেয়ে ক্রমশ গাছের মত হয়ে যাচ্ছে—আর কবে বিয়ে দেবে উমার মা? মুখে অন্নজল যাচ্ছে কি ক'রে? তে'রো পেরিয়ে গেল—মেয়ে অবিবাহিত অবস্থায় যৌবনপ্রাপ্তা হ'লে পূর্বপুরুষ যে নরকগামী হবেন! এমনি নানা অনুযোগ, যুক্তি ও শাস্ত্রের কথা বর্ষিত হ'ত তাঁর ওপর। কিন্তু তবু রাসমণি অটল থাকতেন।

'মেয়ে আমার কাছে যে ক'টা দিন হেসে কাটাতে পারে কাটাক। ওর বিয়ে আমি কিছুতেই তাড়াতাড়ি দেব না।'

শুধু তাঁকে সমর্থন করতেন তাঁর বড়দি, 'দিস্ নি দিস্ নি। কি হবে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে? কথায় কথায় ত ভবিতব্যি দেখানো হয় সব—এর বেলা ভবিতব্যি নেই? কেউ বললে বলবি যে ভবিতব্যি থাকে ত বিয়ে হবে। আমি কি জানি?'

বাঁ হাত দিয়ে ঘটিটা ধরে রান্নাঘরের চৌকাঠে বসে বেশ একটু উত্তেজিত ভাবেই বলতেন কথাগুলো।

উমা কিন্তু ক্রমে যখন চোদ্দও পার হ'ল তখন আর রাসমণি স্থির থাকতে পারলেন না। চতুর্দিকে খোঁজ খবর করতে শুরু করলেন। আরও মাস কতক পরে এই সম্বন্ধটা হাতে এল।

কুলীনের ছেলে, পরম রূপবান—এমন রূপ বাঙালীর ঘরে দুর্লভ। দুধে-আলতায় রং, কোঁকড়ানো চুল চেরা-সিঁথির দু দিকে স্তবকে স্তবকে সাজানো, পাত্‌লা গোঁফ—যেন প্রতিমার কার্তিক। বয়সও কম—বাইশ-তেইশের বেশি হবে না। তবে অবস্থা খুব ভাল নয়, ঘর-বাড়ি জমি জায়গা নেই। ছেলে এক প্রেসে কাজ করে—মাইনে ভালই, এরই মধ্যে কুড়ি টাকা পায়, এ ছাড়া 'ওপর টাইম' খাটলে আলাদা পাওনা। মা আর এক ভাই, সে ভাইও কোন জমিদারী সেরেস্তায় য্যাপ্রেন্টিস ঢুকেছে—শীগ্‌গিরই মাইনে হবে।

ঘট্‌কীর মুখে সব কথা শুনে রাসমণি বললেন, 'ঘর-বাড়ি নেই, কোথায় দেব মেয়ে?'

'তা দিদিমণি, সে কথাও ছেলের মা বলেছে। বলেছে ওদের সেই মানিক-তলায় কোথায় জমি নেওয়া আছে খাজনা-করা—সেইখানে দুখানা খোলার ঘর

তুলে দিক—পাইখানাটানা সবসুদ্ধ ছ'শ টাকা হলেই হয়ে যাবে। তিনি আর নগদ টাকা এক পয়সাও নেবে না বলেছে। ভালই তো হবে দিদি, মেয়ে নিজের বাড়িতে গিয়ে উঠবে।'

রাসমণি বললেন, 'ছ'শ টাকা নগদ! ঐ ছেলেকে ছ'শ টাকা নগদ দেব—গহনা আছে, সেও কোন্ না পঁচিশ-ত্রিশ ভরি যাবে, ধরো ছ'শ টাকা আরও, দানসামিগ্রী—অন্য খরচা—ঘর খরচা আছে—কোথায় পাবো বাছা! এ সম্বন্ধ আমার চলবে না। গরীব বিধবা-বেওয়া মানুষ।'

ঘট্‌কী জেদ করতে লাগল, 'বাড়ি ত তোমার মেয়েরই রইল দিদি। তোমারই মেয়ে থাকবে। মেয়ে আর জামাই। ও মাগী আর কদ্দিন? বরং গহনা না হয় কিছু কম দিও।'

রাসমণি বললেন, 'জমি তা'হলে মেয়ের নামে ক'রে দিক। বাড়ি আমি ক'রে দেব—ছোট ভাইও ত থাকবে! তাছাড়া মায়ের নামে জমি—যদি শাশুড়ী-বোয়ে বনিবনাও না হয়?'

'তা দিদি হবার জো নেই। খাজনা-করা জমি হস্তান্তরের হুকুম নেই। এক ও জমি ছেড়ে দিতে হয়—আবার মেয়ের নামে পাট্টা করাতে হয় কিন্তু তাতে ত নতুন ক'রে সেলামী লাগবে!'

রাসমণি বললেন, 'তা'হলে তুমি ও সম্বন্ধ ছেড়ে দাও, অন্য পাত্তর ছ্যাখো।'

ঘট্‌কী পাকা লোক। বড় মেজ মেয়ের সম্বন্ধ যে করেছিল তাকে আর রাসমণি ডাকেন নি শ্যামার এই ব্যাপারের পর। নতুন লোক—কিন্তু এরই মধ্যে হাড়হদ্দ সব জেনে নিয়েছে। সে একটু চোখ টিপে বললে, 'অত তাড়াতাড়ি ঝেড়ে জবাব দিও না দিদি, ভেবে ছ্যাখো।···নতুন সম্বন্ধ করব কি, ভাল সম্বন্ধ ত করবারই কথা, অমন সোন্দর মেয়ে তোমার। কিন্তু জানো ত—এমন দেশ, যেখানে যাই তোমার শ্বশুরবাড়ির খবরটি আগে গিয়ে বসে থাকে—ভাল ভাল জায়গায় কেউ এ কথা শুনতেই চায় না। তার ওপর গাছের মত মেয়ে ক'রে রেখেছ সে আবার আর এক বদনাম। বলে, এতকাল বিয়ে হয় নি কেন?'

রাসমণির মুখ অপমানে রাঙা হয়ে উঠল। দৃষ্টি হয়ে উঠল কঠোর। তিনি বললেন, 'না হয় মেয়ের বিয়ে দেব না। তুমি যাও—পারো অন্য সম্বন্ধ ছ্যাখো।'

কিন্তু ঘট্‌কীর তাতে চলবে না। ও পক্ষে মোটা টাকার লোভ ছিল। সে ওঁর বড় মেয়ে কমলাকে ধরলে। কমলা নিজে সৎপাত্রে পড়েছে—পৃথিবীতে যে অসৎপাত্র এত আছে সে কথাটা যেন তার বিশ্বাসই হয় না। শ্যামার বিয়েটা দৈব-দুর্ঘটনা, তা কি আর বার বার ঘটে? কমলা এসে মাকে ধরলে, 'অমন

কার্তিকের মত ছেলে মা, হাতছাড়া করো না। আমি ওঁকে বলেছি—উনি বলেছেন যে মা যদি অপরাধ না নেন আমি কিছু টাকা দিতে পারি।'

ম্লান হাসলেন রাসমণি, 'অপরাধ নেওয়ার কথাই আর ওঠে না। বহু দিন থেকেই জামাইয়ের সাহায্য নিতে হচ্ছে। নগদ টাকা হাত পেতে তিনি কখনও নেন নি বটে কিন্তু জামাই অবস্থাপন্ন লোক—তার দেশে জমি, শহরতলীতে বাগান-বাগিচা আছে। চাষের চাল ডাল, বাগানের ফসল ইদানীং প্রায়ই পাঠায়—সব গুলো ঠিক বাগানের কিনা সন্দেহ থাকলেও রাসমণি বেশী জেরা করেন না। কারণ সে অবস্থা আর তাঁর নেই; মুদীর দোকানের ফর্দ কমেছে, বাজারের খরচ বিশেষ লাগছে না—এটা তাঁর কাছে যে কত তা অন্তর্যামীই জানেন। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা বলে গহনা তিনি জমিদার স্বামীর কাছ থেকে কিছু বেশিই পেয়েছিলেন কিন্তু সে তো আর কুবেরের ঐশ্বর্য নয়। কলকাতায় বাড়িভাড়া ক'রে থাকা—পাঁচটা ভাড়াটের সঙ্গে এক বাড়িতে থাকার মেজাজ তাঁর নয়, জমিদারী অভ্যাসের ঐটুকু এখনও ছাড়তে পারেন নি—তাতেই কত টাকা বেরিয়ে যায়! একটা লোকও রাখতে হয়েছে, নইলে দেখাশুনো বাজার-হাট করে কে! কলসীর জল ক্রমাগত ঢাললে একদিন ফুরোবেই।

রাসমণি একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'তার জন্যে নয় রে। জামাইয়ের কাছ থেকে তা নিচ্ছিই, একদিন হয়ত জামাই বাড়ি গিয়েই দাঁড়াতে হবে একটু আশ্রয়ের জন্যে। কিন্তু ছেলেও ত এমন কিছু নয়। ছাপাখানার চাকরি—'

'ঘটকী বলছিল যে ও নিজেই ছাপাখানা করবে শীগ্‌গির। ওর এক বন্ধুর সঙ্গে ভাগে।'

'ঘটকীরা কত কথা বলে মা, সব বিশ্বাস করতে নেই। এখন যেটা দেখছি তা ত ঐ। মেয়েকে গিয়ে বাসন মাজতে হবে, রাস্তার কল থেকে জল তুলতে হবে।'

'ঘাড়ে সংসার পড়লে সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু অমন সুন্দর ছেলে—উর্মির সঙ্গে কেমন মানাবে বলো দেখি।'

'আবার রাঙামুলো দেখে ভুলছিস! একবারে তোদের চৈতন্য হ'ল না?'

'বারবারই কি আর অমন হয়! তাছাড়া ভকে ওদের বাড়ি পড়ল তাই—নইলে কি আর এমন থানছাড়া মানছাড়া হয়ে পড়ত!…উনি বলছিলেন ছেলেটির সঙ্গে কথাবার্তা বলে ওঁর খুব ভাল লেগেছে, মুখ্যু ছাপাখানার লোক যেমন হয় তেমন নাকি নয়—। সেরকম যদি বোঝেন উনিই কি ওকে একটা ভাল চাকরি ক'রে দিতে পারবেন না?'

রাসমণি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'ছাখো যা ভাল বোঝ। আমি আর

যেন ভাল ক'রে কিছু ভাবতেও পারি না।...জামাই যদি ভাল বোঝেন ত ঠিক করো ওখানেই—। জামাই ত একটা ভাল পাত্তরও দেখে দিতে পারলেন না।'

কমলা নতমুখে বসে মেঝের একটা গর্তে আঙুল ঢুকিয়ে বিলিতি মাটির চাপড়া তুলতে তুলতে বললে, 'জানই ত মা। উনি এসব জানতেন না—মাথার ওপর আর কোন অভিভাবক ছিল না তাই খোঁজখবর করেন নি। যেখানে সম্বন্ধ করতে যাবেন তারাই ত খোঁজখবর করবে। তখন? ওঁর সুদ্ধ যে মাথা হেঁট হবে। সবাই বলবে উনিও ত এইখানে বিয়ে করেছেন।'

নিজের মেয়ের মুখে পর্যন্ত এই সব ইঙ্গিত শুনলে বুকটা যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে যায় রাসমণির। অথচ ঈশ্বর জানেন—ওঁর অপরাধ কি!

সে দুর্যোগের দিনগুলো আজও চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে আছে। বৃদ্ধ স্বামী চিকিৎসার জন্য কলকাতায় এলেন। দিন-সাতেক পরে ছেলে গিয়ে বললে, 'ছোট মা, বাবার বোধ করি শেষ অবস্থা—আপনাকে আর মেয়েদের দেখতে চান।' তখনই এক কাপড়ে রাসমণি আসছিলেন বেরিয়ে, পুরোনো বুড়ী ঝি বললে, 'ছোট মা, জমিদার বাড়ির ব্যাপার, গহনার বাক্স আর টাকাকড়ি যা আছে ফেলে যেও না। ফিরে এসে আর পাবে কিনা সন্দেহ! তবু রাসমণি নিতে চান নি, সেই বুড়ীই জোর ক'রে একটা কাঁঠাল কাঠের সিন্দুকে সব পুরে নৌকোয় তুলে দিয়েছিল। কলকাতা এসে শুনলেন স্বামী দেশে ফিরে গেছেন। ছেলে বললে, 'তাই ত, কি রকম হ'ল—আপনারা ততক্ষণ একটু বসুন—দেখি একটু খবর নিয়ে।'

সে সরে পড়ল।

এক মাসের জন্য বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। বিরাট বাড়ি। তখনও সামান্য কিছু বাসন-কোসন ছড়ানো পড়ে রয়েছে। ওষুধের শিশি, ময়লা কাপড়-চোপড় —দ্রুত স্থানত্যাগের চিহ্ন সর্বত্র। তারই মধ্যে সারাদিন উপবাসী রাসমণি বসে বৃথা অপেক্ষা করলেন, তারপর পাশের বাড়ির একটি মহিলার জিম্মায় মেয়েদের রেখে একাই যাত্রা করলেন আবার দেশে। সঙ্গে পুরোনো চাকর ঝি ছিল, ঝিকে রেখে গেলেন মেয়েদের কাছে, চাকরকে সঙ্গে নিলেন। দেশে পৌঁছে শুনলেন যে স্বামীকে হাওয়া বদলের নাম ক'রে দেশে নিয়ে গিয়ে দেখানো হয়েছে তিনি নেই, তিনি নাকি (সে ঘেন্নার কথা শুনলে আজও তাঁর গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা হয়) চাকরের সঙ্গে কুলত্যাগ করেছেন। গহনাপত্র টাকা-কড়ি সব নিয়েই গেছেন—অকাট্য প্রমাণ। সেই আঘাতেই বৃদ্ধ একেবারে অচৈতন্য হয়ে পড়লেন, কোন্ উইলে সই করেছেন তা তিনি জানেনও না। অজ্ঞান অবস্থায় টিপ নিয়ে মজুত-রাখা সাক্ষীদের দিয়ে সই করিয়ে নেওয়া হয়েছে। বৃদ্ধ

জানতেন যে তিনি আরো ঢের দিন বাঁচবেন, কলকাতায় গিয়ে একটু সুস্থও হয়েছিলেন। পশ্চিমে চেঞ্জে নিয়ে যেতে চাইলে তিনি নাকি বলেছিলেন, 'তার আগে দেশে চল্, ছোট বৌকে সঙ্গে নোব, সে না হলে সেবা করতে পারে না কেউ।' যার ওপর এতটা আশা-ভরসা ক'রে এসেছিলেন তার সম্বন্ধে এই সব শুনে ভেঙে পড়বেন না ত কি!

রাসমণি বাড়িতে ঢোকবারও অনুমতি পান নি। শুনলেন তিনি নাকি কুলত্যাগিনী। সেইজন্য স্বামী তাঁর বা কন্যাদের ভরণ-পোষণেরও কোন ব্যবস্থা করে যান নি, উইলে সে কথার উল্লেখ ক'রে অধিকাংশ বিষয় ছেলেকে এবং ভাইদের কিছু কিছু দিয়ে গেছেন। ওদের আশঙ্কা ছিল যে অন্তিম সময় আসন্ন জানলে রাসমণি নিজের নামেই সব বিষয় লিখিয়ে নেবেন। তাই এত আয়োজন।...আরো শুনলেন যে তিনি নাকি স্বামীর বিবাহিতা স্ত্রী নন—রক্ষিতা, এমন প্রমাণ করবার ব্যবস্থাও দেবরদের হাতে আছে। সেই চলে এসেছিলেন শ্বশুরবাড়ি থেকে, আর সেখানে ফিরে যেতে পারেন নি।

রাসমণি আবারও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'যা ভাল বোঝ তোমরা করো মা, জামাইয়ের মত নাও, আমি আর ভাবতে পারব না কিছু।'

কমলা ছেলেকে দেখে নি, শুধু তার রূপের বর্ণনা শুনেই আর কোন দিকে তাকালে না, একরকম জোর করেই এখানে সম্বন্ধ ঠিক করলে।

চার

উমার বিয়ে চুকে গেল নির্বিঘ্নে। বাড়ি আগেই তৈরী ক'রে দেওয়া হ'ল—যাতে নববধূ নতুন বাড়িতেই গিয়ে উঠতে পারে। মাটির গাঁথুনি, ইটের দেওয়াল, চুনের পেটা মেঝে আর খোলার চাল। ছ'শ টাকাতে কুলোল না, কিছু বেশিই পড়ল। কত তা রাসমণি জানেন না, শেষ অবধি তিনি বেঁকে দাঁড়িয়েছিলেন ব'লে কমলা নিজের টাকা থেকে গোপনে দিয়েছে বাকিটা।

বিবাহসভায় বর দেখে সবাই একবাক্যে উমার ভাগ্যের প্রশংসা করলে। শুভদৃষ্টির সময় ভাল ক'রে দেখা যায় নি কিন্তু পরে উমাও ভাল ক'রে দেখে নিলে। শ্যামার অনুপস্থিতি তাকে আঘাত করেছিল খুব, প্রথমটা সে খুবই অস্থির হয়ে পড়েছিল কিন্তু বর দেখে সে দুঃখও তার রইল না। বরং নরেন্দ্রনাথের সহসা আবির্ভাবে চারিদিকে যখন একটা চাপা ধিক্কারের স্রোত বয়ে গেল, ওর মা শিউরে উঠে ওর হাতটা চেপে ধরে বলেছিলেন, 'জানি নে মা, তোর আবার কী বিয়ে দিলুম!' তখন কিন্তু উমার মনে মনে ছোড়দির ওপর করুণাই হয়েছিল, আর

সেই সঙ্গে মনে হয়েছিল 'আমার এমন হবে না কখনও। এত যার রূপ তার গুণও আছে নিশ্চয়!' সে একটু গর্বই অনুভব করেছিল তার স্বামী-সৌভাগ্যে।

প্রথমে সে সম্বন্ধে ওর মনে সংশয় দেখা দিল শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে। নিচু একতলা খোলার বাড়ি, জন্মে পর্যন্ত কখনও এমন বাড়িতে থাকার কল্পনা করে নি। কুয়া হয় নি, পাশের বাড়ির কুয়া থেকে জল আনতে হয়। বাড়িতে লোকজনও তেমন নেই, আত্মীয়-স্বজনদের দয়াময়ী বিশেষ জানান নি, বলেছিলেন, 'নগদ পয়সা ত একটা পেলুম না। খরচ করব কোথা থেকে, ধার করব নাকি ছেলের বিয়েতে?'

দয়াময়ী নাম কে রেখেছিল কে জানে, উমা তাঁর মূর্তির মধ্যে দয়ার লেশ কোথাও খুঁজে পেলে না। ঢ্যাঙা মদ্দাটে গঠন, চওড়া চওড়া হাড়—বেশ জোয়ান পুরুষের মত। গলার আওয়াজও মোটা আর ভাঙা ভাঙা। বৌ তখনও পাল্‌কি থেকে নামে নি—তিনি মন্তব্য করলেন, 'এই বউ এত সুন্দরী, ত্যাত সুন্দরী! ঘট্‌কী বেটি গেল কোথায়, আসুক না।...আমার ছেলের কাছে কি!'

তারপরই ওর হাতে একটা হ্যাঁচ্‌কা টান মেরে বলেছিলেন, 'নামো গো বাছা ভালমানুষের মেয়ে। বুড়ো হাতী বৌ, কোলে করতে পারব না।'

কোনমতে বরণ ক'রে বউ ঘরে তোলা হ'ল। তিনটি না চারটি এয়ো। ভাল ক'রে শাঁখও বাজল না বোধ হয়। কড়ি খেলা প্রভৃতি আচার-অনুষ্ঠান—তাও নামমাত্র। ভাগ্যে কুশণ্ডিকা ওখান থেকে সেরে আসা হয়েছিল, উমা মনে মনে ভাবলে, নইলে তাও হ'ত না বোধ হয়। তারপরই শাশুড়ী একখানা বিলিতি কোরা শাড়ি ওর গায়ের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'নাও, বেনারসীখানা ছেড়ে ফ্যালো চট্‌পট। ঐ ওদিকে জল আছে, মুখ হাত ধুয়ে এসো গে। দেখো, সাবধানে খরচ করো, তোমার বাপের বাড়ির মত আময়দা জল নয়, অনেক কষ্ট ক'রে তুলে আনতে হয়েছে নিজেকে—পঞ্চাশটা দাসী চাকর ত নেই।'

উমা ত কাঠ। ওর বর শরৎ আড়ে একবার ওর মুখের দিকে চেয়ে নিয়ে উঠে পড়ল, আড়ালে গিয়ে উমার বাপের বাড়ি থেকে যে ঝি এসেছিল তাকে ডেকে বললে, 'তুমি ওকে কাপড় ছাড়িয়ে নিয়ে যাও না কলতলায়।'

ঝি ফিসফিস ক'রে বললে, 'আমি ত আগেই যেতুম জামাইবাবু, আপনার মাকে দেখে আমার ভয় লাগছে—'

'না না যাও। মার অমনি ধরন, ওঁর কথা ধরো না।'

শরৎ ত সরে পড়ল। ঝি কাছে গিয়ে ওকে কাপড় ছাড়াতে ছাড়াতে চুপি চুপি বললে, 'তোমার বর বেশ লোক দিদিমণি, এরই মধ্যে কত টান, তোমার অসুবিধে হচ্ছে দেখে নিজে গিয়ে আমায় পাঠিয়ে দিলে। কিন্তুক্ তোমার শাশুড়ী যেন

কেমনতরো—'

ইতিমধ্যে দয়াময়ীর প্রবেশ।

'তুমি বাছা না বলা-কওয়া এ ঘরে ঢুকেছ কেন? আমাদের দাসীচাকরের পাট নেই। ঝি ছাড়া যদি নবাব-নন্দিনীর চলবে না ত মা-মাগী খোলার ঘরে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে কেন? এখানে জল তুলতে হবে, বাসন মাজতে হবে— সব কাজ করতে হবে। অত ঝিয়ের র‍্যালা এখানে চলবে না।'

'সে ত দুদিন পরে হবেই মা। আজ বিয়ের কনে—আর সেই জন্যেই ত— আমার সঙ্গে আসা—'

'চোপরাও হারামজাদী! মুখের ওপর কথা! আস্পদ্দা! এ আমার বাড়ি, আমি যা বলব তাই হবে।'

ঝি কিছুক্ষণ অবাক হয়ে দয়াময়ীর মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর উমার যে বেনারসী কাপড়খানা পাট করছিল, সেখানা ওর পায়ের কাছে আছড়ে ফেলে বললে, 'ঘর তুমি করো দিদিমণি সোয়ামীর। আমি চলনু। আমরা গতর খাটিয়ে খাই, যেখানে খাটব সেখানে পয়সা। গাল খেতে যাব কিসের জন্যে? হাত্তোর বামুন-ভদ্দর লোকের ঘর রে!'

দয়াময়ী আগুন হয়ে বললেন, 'নেকালো হারামজাদী, আবি নেকালো। আবার লম্বা লম্বা বাত!'

'কেন বলব না বাছা। আমি কি তোমার ব্যাটার বউ? বিনি দোষে তোমার গাল শুনব কিসের জন্যে?'

ঝি বেরিয়ে চলে গেল। উমার তখন স্তম্ভিত অবস্থা, চোখের বাঁধ ভেঙে কখন জল নেমেছে তা সে টেরও পায় নি। দয়াময়ী ধমক দিয়ে উঠলেন, 'নাও নাও, আর প্যান-প্যানাতে হবে না। চটপট কাজ সেরে নাও। এই ত বৌ, রূপের ধুচুনী—কত নশো পঞ্চাশ টাকা তোমার মা দিয়েছে তাই শুনি যে আবার ঢং ক'রে ঝি দিয়েছে সঙ্গে? আর দিয়েছে দিয়েছে এমন ছোটলোক ঝি দেয়! সহবৎ শেখে নি। ভদ্দর লোকের ঘরে কখনও কাজ করে নি তা কি হবে! কুটুম যা হ'ল তা ঝি দেখেই টের পাচ্ছি। যেমন ছোটলোকের ঘর, তেমনি তার ঝি।...তাও বলে দিচ্ছি বাছা, চোখ রাঙিয়ে বেরিয়ে গেল ঐ ঝি, সে অপমানের শোধ আমি তোমার উপর দিয়ে তুলব। মাকে বলে দিও। এ ক-টা দিন যাক্ না।'

আশা ও আশ্বাসের কথাই বটে। ভয়ে উমা এ কথাটাও বলতে পারলে না যে ও-ঝি তাদের বারোমেসে ঝি নয়। নিজের সংসারের ঝি কেউ কনের সঙ্গে

পাঠায় না। কে জানে, কথা কইতে গেলে যদি আরও গালাগাল শুনতে হয়!...
চোখের জলের ওপরই নামে মাত্র মুখে হাতে জল দিয়ে ফিরে এসে বসল। দেরি করতে আর সাহস হ'ল না।

কে যেন একজন বললে, 'বৌকে জলখাবার দিলে না নতুন-বৌ?'

উত্তর এল, 'এই ত বাপের বাড়ি থেকে গিলে এসেছে। কোন্ পেটে খাবে? মিছিমিছি লোক-দেখানো নৌকতা আমি করতে পারি নে।'

সেদিন এবং তার পরের সারাটা দিন উমার চোখের জল শুকোল না। তাও প্রকাশ্যে ফেলবার উপায় নেই—দেখতে পেলে আর রক্ষা থাকবে না। এর ভেতরে শুধ্ একটিমাত্র অভয়বাণীকে সে মন্ত্রের মত জপ করেছে—সে ওর ঝিয়ের কথা, 'তোমার বর বেশ লোক দিদিমণি!' ঐ একমাত্র ওর আশ্বাস। ঐ একটি আশার শিখাকে চারিদিকের নিষ্ঠুর ঝড়ের মধ্যে ও বাঁচিয়ে রাখল অন্তরের সমস্ত তাগিদ দিয়ে, কামনা দিয়ে ঘিরে।

বৌভাতের আয়োজনও সামান্য। মোট জন পঞ্চাশেক লোক খেলে। দয়াময়ী ও অন্য দুটি স্ত্রীলোক নিজেরাই রান্না করলেন। ভিয়ান হ'ল না, হালুই-কর এল না—এ যেন খেলাঘরের বিয়ে! উমা দুই বোনের বিয়ের গল্প শুনেছে, পাড়ায় আরও দেখেছে কিন্তু এমন বিয়ে যে হয় তা সে কখনও শোনে নি।

তবুও সে ভেবেছে, স্বামী যদি ভাল হয়, মনের মতন হয়—এ সব বাইরের তুচ্ছ ব্যাপার নাই বা হ'ল ঠিক ঠিক! সে দিকে ত ঈশ্বর তার প্রতি কার্পণ্য করেন নি! স্বামীর ভালবাসার অমৃত-প্রলেপে ওর এই সব আঘাতের ক্ষত শুকিয়ে উঠবে।

তখনও সে জানে না যে ভাগ্যদেবতা তাঁর সবচেয়ে বড় পরিহাসটাই ওর জন্য তুলে রেখেছেন।

ফুলশয্যার আচার-অনুষ্ঠান শেষ হয়ে সকলে চলে গেলে দুরু দুরু বক্ষে উমা যখন প্রতীক্ষা করছে সেই পরম শুভক্ষণের—স্বামীর কাছ থেকে প্রেমের প্রথম নিদর্শন যখন আসবে ওর দিকে এগিয়ে, স্বামী হয়ত কাছে ডাকবেন কি হাত ধরে টানবেন বুকের মধ্যে কিংবা আরও অচিন্তিতপূর্ব কিছু, যা সে এখনও শোনে নি কারও মুখে,—চাপা গলায় শোনা গেল, 'শোন, এদিকে এসে বোস।'

হৃৎপিণ্ডটা ধ্বক্ ক'রে উঠে থেমে যাওয়ার উপক্রম হ'ল। কেমন যেন শুষ্ক শোনাচ্ছে কণ্ঠস্বর। এ কি!

উমা বসে বসে ঘামছে। শরৎ আবারও ডাকলে, 'খুব জরুরী কথা আছে, এদিকে কান দাও। আমি প্রেমালাপ করার জন্যে ডাকি নি। এসো এসো—

সরে এসো।'

শেজের মৃদু আলোয় ভাল ক'রে কিছু দেখতে পায় না উমা, চুপ ক'রে বসেই থাকে। চোখের দৃষ্টিটা শুধু আরও ঝাপ্‌সা হয়ে ওঠে। সারা বাড়িটা নিস্তব্ধ—কেউ আড়ি পাতবে না তা উমাও জানে। সে রকম লোকই নেই এ বাড়িতে।

শরৎ অস্ফুট একটা বিরক্তিসূচক শব্দ ক'রে নিজেই এগিয়ে আসে, ওর মুখের অনেকটা কাছে মুখ এনে বলে, 'ছাখো একটা কথা আজ থেকেই পরিষ্কার ক'রে রাখতে চাই। তুমি আমাকে ভুল বুঝো না ; আমার কাছে কিছু প্রত্যাশাও ক'রো না। মানে স্বামীর কাছে স্ত্রী যা আশা করে সে ভালবাসা তোমাকে আমি দিতে পারব না। বিয়ে করেছি মার জুলুমে, তা ব'লে তোমার সঙ্গে ঘর করা হবে না আমার দ্বারা।'

উমার মাথা কি খারাপ হয়ে গেল ? সে কি ভুল শুনছে ? না ভুল বুঝছে ? ওর বুকের রক্ত-চলাচল বোধ হয় বন্ধ হয়ে যাবে—

ঠিক কি ভাবছিল, কি শুনছিল কিছুই জানে না উমা ভাল ক'রে। সে রাত্রের কথাগুলো অনেকদিন সে ভাববার চেষ্টা করেছে, মানে করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু—

লক্ষ যোজন দূর থেকে কে যেন কথা কইছে না ?

শরৎ বলছে, 'তুমি রক্ষিতা কাকে বলে জানো ? জানো না ? তাই ত ! মানে আমি আর একটি মেয়েকে ভালোবাসি, তার সঙ্গেই ঘর করি। তাকে ছাড়া আর কারুর সঙ্গে আমি ঘর করতে পারব না। আজ তিন বছরের পুরোনো অভ্যেস, সে আর বদল হবে না। ছেলের চরিত্র খারাপ হচ্ছে ব'লে মা বিয়ে দিতে চাইলে, বড় জ্বালাতন করে—তাই বিয়ে করতে হ'ল। নইলে আমার ইচ্ছা ছিল না। কী করব, মা সেখানে পর্যন্ত গিয়ে চেঁচামেচি করে। তাই গোলাপীও বললে, কাজ কি বাপু অত হাঙ্গামে, একটা বিয়ে ক'রে ফেলে রেখে দাও। তাও আমি ভেবেছিলুম যে, যে মেয়ে দেবে সে ত খোঁজখবর করবে, আমার মা-টি যে কি চীজ্‌ তা জানলে আর বিয়ে দিতে চাইবে না কেউ। তা তোমার মা যে এমন ফট ক'রে রাজী হয়ে যাবেন তা কে জানত ! তুমি ত বেশ সুন্দর, মা পয়সা খরচও করলেন—এমন পাত্রে দিলেন কেন ?'

উমার মুখ দিয়ে একটিমাত্র প্রশ্ন বের হ'ল, 'আপনি তাকে বিয়ে করেন নি কেন ?'

প্রশান্ত মুখে বললে শরৎ, 'হরি হরি ! সে যে বেশ্যা, কিন্তু সেও বেশ সুন্দরী।

ছোট জাতের মেয়ে—তাহলেও চেহারায় বেশ লাজ্জত আছে। তাছাড়া সে খুব ভালবাসে। আমি ত বেশি পয়সা-কড়ি দিই না, মাইনের টাকা মা মাইনের তারিখে ছাপাখানায় গিয়ে দাঁড়িয়ে আদায় ক'রে নেয়।...শুধু ওপর-টাইমের টাকাটা, তা সে আর কত। ও-ই আমাকে খাওয়ায়। ওর মায়ের কিছু ছিল, তাছাড়া এদিক ওদিক কিছু কামায়, তাইতেই চলে। নইলে দুটো প্রাণীর চলে কিসে বলো,—এই দিনকাল।'

উমা আজকালকার মেয়ে নয়। সেদিন এ প্রশ্ন তার মাথাতেও আসে নি যে, এক্ষেত্রে কোন্ অধিকারে বিয়ে করেছে শরৎ? ওর নারী-জীবনকে ব্যর্থ ক'রে দেবার কি অধিকার ছিল ওর? তখনকার দিনে স্বামী না নিলে মেয়েরা নিজেদের অদৃষ্টকেই ধিক্কার দিত। উমাও তাই দেবে নিশ্চয়। তখন সেই মুহূর্তে কিন্তু কোন কথাই মনে ছিল না ওর—স্তম্ভিত, জড় হয়ে বসে রইল।

আর শরৎও—স্বচ্ছ মাত্র মার জ্বালাতনে উত্ত্যক্ত হয়ে একটি মেয়ের সারা জীবন নষ্ট ক'রে দিতে বসেছে—এটা অম্লান বদনে বলতে পারল, একটুও বাধল না কোথাও।

তবে আশ্বাসও দিলে বৈকি সে, বললে, 'তা ব'লে আমি কোন জুলুমও করব না। তোমার ওপর কোন আক্রোশ নেই ত। তুমি সংসার নিয়ে থেকো, আমি আমার কাজ নিয়ে থাকব। মার সঙ্গে ঐ শর্তই হয়েছিল, বৌ এনে দেব ওর সংসারের কাজের জন্যে। তারপর আমাকে কোন কথা বলতে পারবে না। বোধ হয় ভেবেছিল সুন্দরী বৌ এলে আমি নিজেই সেদিকে ঢলব, আর কিছু বলতে হবে না। ছেলেকে ত চেনে নি এখনও।'

একটু হেসে ওঠে শরৎ। বোধ হয় রসিকতাটা অনুভব করতেই থামে একটু, তারপর বলে, 'এই পাঁচ-ছ'টা দিন। তারপর কি আর বাড়ি আসব ভেবেছ? এই কটা দিন মাঝে-বালিশ রেখে শোও। কী আর করবে। ছাখো সব পরিষ্কার ক'রে দিলুম—এর পর যেন কোনরকম ভুবো না।'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এক

দিন তিনেক ওখানে কাটিয়ে নরেন যখন কলকাতায় ফেরবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে, তখন স্বাভাবিক ভাবে শাশুড়ী এবং বধূ দুজনেরই মুখে এক প্রশ্ন ফুটে উঠল, 'তার পর?'

নরেন বোকার মত হাসতে হাসতে মাথা চুলকোতে লাগল, উত্তর দিতে পারলে না।

ক্ষমা একটু কঠিন কণ্ঠেই বললেন, 'দয়া ক'রে তোমার মাগ-ছেলে তুমি নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করো বাবা, তাহ'লেই আমি বাঁচি। মা গঙ্গায় গা ঢেলে নিশ্চিন্তি হই।'

নরেন হি-হি ক'রে হেসে বললে, 'এ মজা মন্দ নয়। ও কাল রাত্তিরে ঠিক এই কথাই বলছিল যে তোমার মার একটা যা হোক ব্যবস্থা করো—তাহ'লে মরে রেহাই পাই। হি হি! দুজনে পরামর্শ ক'রে বলছো বুঝি?'

'এ ত পরামর্শ করবার দরকার নেই বাবা, তোমার মত মানুষের সঙ্গে যাদের ঘর করতে হয়,—এ ছাড়া আর তাদের গতি কি বলো।'

'বা-রে, সব দোষ বুঝি আমার! সাত-তাড়াতাড়ি একটা বিয়ে দিয়ে ল্যাঙারি ক'রে দিলে, এখন আমাকে সব সামলাতে হবে!'

'বিয়ে যখন দিয়েছিলুম তখন সম্পত্তিও ছিল। যা ছিল চিরকাল বসে খেলেও খেতে পারতিস্। সব খোয়ালি, তার জন্যে দায়ী কি আমি?'

'বা! তা ব'লে পুরুষমানুষ—আমোদ-আহ্লাদ করব না!'

এ লোকের সঙ্গে কথা কইতে যাওয়া বৃথা জেনেই ক্ষমা চুপ ক'রে গেলেন। খানিকটা ভেবে নিয়ে নরেন বললে, 'দেখা যাক্—দিন-কতক ত ঘুরে আসি।'

'তার পর? আমাদের এই দিন-কতক চলবে কিসে?'

'রাজা বিনে কি আর রাজ্য আটকায়? এতদিন চলল কি ক'রে? হেঁ হেঁ—তাছাড়া তোমার হাতেও কিছু ছিল নিশ্চয়ই। কম চাপা মেয়েমানুষ তুমি!'

ঘৃণায় এত বড় কথাটারও জবাব দিলেন না ক্ষমা। শুধু ছেলে চলে যাবার পরে তুলসীতলায় এসে ঢিপ্ ঢিপ্ ক'রে মাথা খুঁড়তে লাগলেন, 'ঠাকুর, আমাকে নাও! আজও প্রায়শ্চিত্ত হ'ল না, এত কি পাপ করেছিলুম ঠাকুর?'

এর পর আবার সেই সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা। দিন এবং রাত যেন প্রতিদিন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হ'তে থাকে। প্রতিটি দিন কিসে কাটাবে সেই এক সমস্যা। তার ওপর শ্যামার আরও বিপদ তার শাশুড়ীকে নিয়ে। এবার নরেন যাবার পর থেকে তিনি যেন খাওয়া-দাওয়াও ছেড়ে দিয়েছেন। যা সামান্য ধানচালের যোগাড় হয় তাও তিনি সঞ্চয় ক'রে রাখেন পৌত্র আর পুত্রবধূর জন্য। একেবারে না বসলে শ্যামাও খাবে না ব'লে মাত্র একবার বসেন। শুধুমাত্র মুখে দেওয়া—একটা ছোট পাখীর চেয়েও কম খান তিনি।

প্রথম প্রথম অনুযোগ করার চেষ্টা করেছে শ্যামা, 'মা, এমন খেলে বাঁচবেন কী

ক'রে ?'

'বাঁচবার কি আর দরকার আছে আমার ? আরও আমাকে বাঁচতে বলো ? আত্মহত্যা মহাপাপ ব'লেই করি না। নইলে মরবার ভয় আর আমার এক তিল নেই মা—'

'কিন্তু আমরা কোথায় দাঁড়াবো মা ? আমাদের কি উপায় হবে ?' শ্যামা হয়ত বলে।

'উপায় আমি ত কিছু করতে পারছি না মা, সেইটেই ত দুঃখ। এখন যে ভাবে দিন কাটছে তোমার, তার চেয়ে খারাপ আর কি কাটবে মা ? এখনও তোমার মা বেঁচে আছেন—এক মুঠো ভাত তোমার মিলবেই সে আমি জানি।'

বধূ আর দেবার মত উত্তর খুঁজে পায় না।

নরেনের কোন খবরই পাওয়া যায় না। দেবেনেরও তথৈবচ। রাধারাণী সামান্য কিছু লেখাপড়া জানে কিন্তু চিঠি লেখার অভ্যাস নেই। একখানা মাত্র চিঠি দেবেন দিয়েছিল, তাতে শুধু নরেনের উদ্দেশ্যে অশ্রাব্য গালিগালি—কিন্তু এই দুটি আশ্রয়হীনা মেয়েছেলের এখানে দিন কি ক'রে কাটবে—সে কথার উল্লেখ-মাত্র নেই।

মধ্যে খুব অসহ্য হওয়ায় মা একখানি চিঠি লিখিয়েছিলেন শ্যামাকে দিয়ে পুত্রবধূর নামে। ছেলেটা কি না খেতে পেয়ে মরে যাবে ? অন্তত দেবেন যদি পাঁচটা টাকা পাঠায় ! দেবেন পাঠিয়েছিল দুটি টাকা। সেই কুপনে লিখেছিল যে, 'এখানে এক বেটা ইংরেজী-জানা লোক আসিয়া বসিয়াছে—যদিও সে আমার চেয়ে বেশী ডাক্তারী জানে না, তথাপি ইংরেজীর ভুচুং দিয়া আমার পসার মাটি করিতে বসিয়াছে। এক্ষণে আমার সংসার চলাই দায়। নচেৎ শ্রীমানকে দেখা ত আমার কর্তব্যের মধ্যেই।' ইত্যাদি—

লেখা চলত তার মাকে, সে ইঙ্গিতও যে ক্ষমা দেন নি তা নয় কিন্তু সেখানে শ্যামা অটল। কোন কারণেই সে মার কাছে এই অবস্থায় হাত পাতবে না। মাকে অন্তত সে জানতে দেবে না তার অবস্থাটা। শাশুড়ীও বধূর মন বুঝে স্পষ্ট ক'রে বলতে সাহস করেন নি কথাটা।

কিন্তু মাস ছয়েকের মধ্যেই ক্ষমার শরীর অসম্ভব ভেঙে পড়ল। রক্তাল্পতার সমস্ত লক্ষণ দেখা দিল, হাত পা ফুলতে শুরু হ'ল। এইবার যথার্থ প্রমাদ গুনলে শ্যামা। এই বিদেশ-বিভুঁয়ে একা এই অবস্থায় কি করবে সে ? বিশেষ তার অল্প বয়স এবং সে সুশ্রী দেখতে—এটার যে কী বিপদ তা পদে পদেই বুঝতে পারে আজকাল। পাশের তাঁতিগিন্নী খুব দেখাশুনো করেন, তেলিপাড়ার দুটি-তিনটি

পরিবারও নিয়মিত সাহায্য করে, সেজন্য বিপদ খুব কাছে আসে না—কিন্তু আশেপাশেই যে ঘোরে, সে আভাস শ্যামা পায়।

অল্পবয়সী ছেলেদের অভাব নেই পাড়ায়—তারা দুপুর ও অন্ধকার সন্ধ্যায় পাঁচিলের পাশে পাশে শিস্ দিয়ে ঘোরে, গাছের ডালে উঠে দ্বিতলের বাতায়ন-বর্তিনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করে—এবং অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন যারা, তারা নাপতিনীকে দিয়ে অলঙ্কারের প্রলোভন দেখায়। শুধু তাঁতিগিন্নীর পাঁচটি জোয়ান ছেলে আছে ঘরে এবং তিনি প্রায়ই বেশ চেঁচিয়ে বলে যান—'কেউ যদি একটু ওপর-নজরে চায় বৌমা, কি কিছু ইশেরা-ইঙ্গিত করে, তক্‌খুনি আমাকে বলে দেবে মা—দিনে-দুপুরে তার মুণ্ডুটা ধড় থেকে ছিঁড়ে নিয়ে তোমার পায়ের কাছে ফেলে দেবে আমার ব্যাটারা। হ্যাঁ,—ওরা পাঁচ ভাইয়ে লাঠি ধরলে কোম্পানীর ফৌজে কিছু করতে পারবে না!'—সেইজন্য বাড়াবাড়ি করতে কেউ সাহস করে না।

মাসখানেক ধরে চিন্তা ক'রে শ্যামা ওর মাকেই একখানা চিঠি লিখলে। সব খুলেই লিখতে হ'ল। মিছিমিছি আর গোপন ক'রে লাভ নেই।

কিন্তু সেই চিঠির যা জবাব এল তা শ্যামাকে আবারও পাথর ক'রে দিলে। স্বামীর কোন ব্যবহারেই আর ও বিস্মিত বোধ করবে না এমন একটা ধারণা ওর হয়েছিল কিন্তু মার চিঠি পেয়ে বুঝলে যে এখনও ওর সেই লোকটিকে চিনতে বহু বিলম্ব আছে।

মা যা লিখেছিলেন তার তারিখ মিলিয়ে শ্যামা দেখলে যে এখান থেকে ফিরে দিনকতক পরেই নরেন রাসমণির সঙ্গে দেখা করে এবং শ্যামা ও খোকার এক কল্পিত রোগের বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে কিছু অর্থসাহায্য চায়। নরেনকে চিনলেও সে বিবরণ শুনে তিনি স্থির থাকতে পারেন নি—ঋণ ক'রেও কিছু টাকা দিয়েছিলেন। তারপর আরও বার-দুই কিছু কিছু দেবার পর তাঁর সন্দেহ হয়, তিনি সোজা বলেন যে মেয়ের নিজের হাতের লেখা চিঠি না পেলে তিনি আর এক পয়সাও দেবেন না। নরেন সেখান থেকে ফিরে বড় শালী কমলার কাছে যায়, সেখান থেকেও চোখের জল ফেলে দু-দফায় মোটা টাকা আদায় করে। দৈবাৎ কমলা বাপের বাড়ি আসায় কথায় কথায় কথাটা বেরিয়ে পড়ে—এবং কমলাও সতর্ক হয়। শেষ কমলার কাছে প্রত্যাখ্যাত হবার পর নরেন আর আসে নি।

এ ছাড়াও চিঠিতে দুঃসংবাদ ছিল। উমার স্বামী রাত্রে কোনদিনই বাড়ি আসে না। বিবাহের আগে থেকেই সে বেশ্যাসক্ত—সে কথা নাকি ফুলশয্যার রাত্রে উমার কাছে অকপটে স্বীকার করেছে। তার ওপর তার শাশুড়ীর যে অমানুষিক নির্যাতনের সংবাদ লোকমুখে রাসমণির কাছে আসছে তা চিঠিতে লেখা যায় না।

উমা কিছুই বলে না কিন্তু বহু লোকের মুখে একই কথা শুনছেন তিনি, কাজেই অবিশ্বাসের কোন কারণ নেই। রাসমণির বহুদিন ধরেই ঘুম হ'ত না রাত্রে—এখন ফিটের অসুখ দেখা দিয়েছে। একা থাকতে হয়—কোন্ দিন মরে পড়ে থাকবেন এই ভয়ে বড়মাসিমাকে আনিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি দিনকতক থেকে ঝগড়া ক'রে চলে গেছেন। এ অবস্থায় যদি শ্যামা তার শাশুড়ীকে বুঝিয়ে কোনমতে ওঁর কাছে নিয়ে যেতে পারে ত প্রকারান্তরে রাসমণির উপকার করাই হবে।

চিঠি পড়তে পড়তে দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে চোখ দিয়ে ঝরঝর ক'রে জল পড়তে থাকে শ্যামার। ক্ষমা তা লক্ষ্য ক'রে ব্যাকুল হয়ে বলেন, 'কী লিখেছেন বেয়ান, বৌমা? খারাপ খবর কি কিছু?—আমাকে পড়ে শোনাও না মা—'

চোখ মুছে চিঠি পড়বার চেষ্টা করে শ্যামা কিন্তু প্রথম প্রথম কিছুক্ষণ ঠোঁট দুটোই নড়ে শুধু—তা দিয়ে স্বর বেরোয় না। অনেকক্ষণ পরে অতিকষ্টে সে একটু একটু ক'রে পড়ল। ক্ষমা প্রথম অংশটা শুনে আর্ত চিৎকার ক'রে উঠেছিলেন একবার, 'ঠাকুর, আর কত শোনাবে ছেলের কীর্তি? এবার নাও—দয়া করো।' কিন্তু শেষাংশ শুনে কে জানে কেন যেন কতকটা শান্ত হয়ে উঠলেন। উমার সুখ-সৌভাগ্যের সংবাদ এলে যেন তাঁর আরও লজ্জার কারণ হ'ত—সেজন্য অপরের দুর্ভাগ্যের বিবরণ তাঁর কাছে মনের অজ্ঞাতেই সান্ত্বনার কারণ হয়ে উঠল।

তিনি বললেন, 'তোমার মার উঁচু মন বৌমা, তাই অমন ক'রে লিখেছেন। ভিক্ষে কি ক'রে দিতে হয় তা তিনি জানেন। তোমার মা দেবী।'

শ্যামা নিমেষে আশ্বস্ত হয়ে উঠে বললে, 'তাহ'লে মাকে লিখে দিই যে আমরা যাচ্ছি?'

ক্ষমা একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'বৌমা, দীর্ঘ জীবনটা কেটে গেল আর কটা দিন বাঁচব, বেশ বুঝতে পারছি যে ভেতরে ভেতরে শেষ হয়ে এসেছে। আর কেন মা—পারো ত অন্তত এ অপমানটা থেকে বাঁচাও আমাকে।'

এরপর আর অনুরোধ করতে পারে না শ্যামা কিন্তু ভয়ে ওর ঘুম হয় না রাত্রে। দিন দিন ক্ষমা শয্যাগত হয়ে পড়ছেন, এর পর আর নিয়ে যাওয়াও যাবে না।

কিন্তু দিন-দুই পরে ক্ষমাই কথাটা পাড়লেন। শ্যামাকে ডেকে বললেন, 'বৌমা, এখানে আর থাকা উচিত নয়। বেশ বুঝতে পারছি—এই যে শয্যা পেতেছি এই শেষ। এঁরা অবশ্য আছেন, দেখাশুনোও করবেন জানি, তবু যতটা সম্ভব তোমার মার কাছেই থাকা উচিত এখন। এক কাজ করো মা, ঐ পাড়ায় আমার শ্বশুরের এক শিষ্য আছেন উকিল—তাঁকে চিঠি দাও, যেন কোনমতে একটা ঘর

দেখে দেন তাঁর বাড়ির কাছে। বাসন-কোসনগুলো ত আছে, তাঁতি-বৌয়ের ছেলে-দের দিয়ে কতক কতক যদি বিক্রি করাতে পারি—ওরা ত নবদ্বীপে যায়, সেখানেও বেচে দিতে পারে—তাহ'লে দুটো-একটা মাসের খরচ চলে যাবে। তারপর ওখানে তোমার মা রইলেন তিনি তোমাকে দেখতে পারবেন।'

শ্যামা এ ব্যবস্থার সহস্র অসুবিধার কথা ব'লে আর একবার বোঝাতে চেষ্টা করলে, কিন্তু তিনি কেঁদে ওর হাত দুটো চেপে ধরলেন, 'মা, তার চেয়ে গঙ্গায় গা ঢালাও আমার কাছে ঢের সহজ।'

অগত্যা কলকাতার সেই শিষ্যবাড়ি চিঠি লেখা হ'ল। উকিলবাবুটি পত্রপাঠ উত্তর দিয়ে জানালেন যে তাঁরই একখানা ঘর খালি পড়ে আছে—একেবারে পৃথক মত; স্বচ্ছন্দে তাঁরা গিয়ে থাকতে পারেন। তারপর, যদি সেখানে ওঁদের সুবিধা না হয়, নিজেরা আশেপাশে ঘর দেখে নিতে পারবেন।

ক্ষমা চিঠিটা শুনে বললেন, 'যদিও ছেলেদের বিত্তের বহর দেখে ওরা গুরু-বংশ ত্যাগ করেছে, তাহ'লেও আমি জানতুম যে আমাকে একেবারে ত্যাগ করতে পারবে না। ওঁর ছেলেকে দীক্ষা দেওয়াবার আগে আমার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তবে অন্য গুরু করেন উনি।...তাই চল মা, স্বামী-শ্বশুরের শিষ্য বংশ সেখানে তবু জোর আছে কিছু!'

তাঁতিগিন্নীকে বলতে ওঁর ছেলেরা নবদ্বীপ থেকে কাঁসারি ডেকে আনলে—তবু ব্রাহ্মণের বাসন কোন গৃহস্থ ওখানে কিনতে রাজী হ'ল না। যা টাকা পাওয়া গেল তাতে খুচরো দেনা শোধ ক'রে হাতে ত্রিশ-চল্লিশ টাকার বেশি রইল না। সেই ক'টি টাকা ভরসা ক'রেই দুটি স্ত্রীলোক বহুদিনের আশ্রয় গুপ্তিপাড়া একদিন ত্যাগ করলেন।

দুই

কলকাতায় এসেই ক্ষমার শরীর একেবারে ভেঙে পড়ল। রাসমণি অনেক দেখেছেন—তিনি দিন সাতেক দেখেই মেয়েকে বললেন, 'ভাল বুঝছি না মা—তোর ভাশুর-কে লেখা দরকার!'

নরেনের ঠিকানা কারও জানা নেই। এ অবস্থায় দেবেনকে লেখা ছাড়া উপায় কি?

শ্যামা বড় জাকে বিস্তৃত চিঠি লিখে দিলে, তবু দেবেনের আসতে দিন চারেক দেরি হ'ল। শেষ পর্যন্ত যখন এসে পৌছল তখন ক্ষমার প্রায় কথা বন্ধ হয়ে এসেছে। দেবেন পাশে গিয়ে বসে কাঁদতে লাগল। ক্ষমা অতি কষ্টে কম্পিত হাত-

খানি তুলে ওর চোখ মুছিয়ে দিয়ে মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন।

'মা, কিছু খেতে ইচ্ছে হয় তোমার ?'

দেবেন প্রশ্ন করে।

ক্ষমা হাসলেন একটু। তারপর অতিকষ্টে বললেন, 'নরেন—'

'তার কথা আবার মুখে আনছ মা তুমি ? তোমার লজ্জা করে না ? সে নাম আমার কাছে ব'লো না—সাফ ব'লে দিলুম !'

রাসমণি ঘোমটা দিয়ে একপাশে বসেছিলেন, বাধ্য হয়ে এবার মুখ খুললেন। বললেন, 'বাবা, যতই যা হোক--তাকে উনি পেটে ধরেছেন। নাড়ীর টান কোথায় যাবে বাবা ?...তুমিও ত কম অপরাধ করো নি, তবু তোমাকেও উনি আশীর্বাদ করছেন !'

দেবেন জ্বলে উঠে বললে, 'সে হারামজাদা শুয়োরের বাচ্ছা দেখুনগে যান খান্‌কী বাড়ি পড়ে আছে, আমি সেইখানে যাবো নাকি—তাকে ডাকতে ?'

রাসমণি আর কথা কইলেন না। কিন্তু দেবেন নিজেই খানিকটা ইতস্তত ক'রে সন্ধ্যার পর বেরিয়ে পড়ল। সন্ধ্যা থেকে রাত্রি গভীর হয়ে এল—ক্ষমার শ্বাসকষ্ট শুরু হ'ল--তবু কারও দেখা নেই। না দেবেনের না নরেনের। রাসমণি প্রমাদ গুনলেন। শেষে শেষরাত্রে বললেন, 'তোমরাই একটু একটু গঙ্গাজল দাও আর নাম শোনাও—পাষণ্ড ছেলেদের হাতে জল নেওয়ার অপমানটা বোধ হয় অদৃষ্টে নেই।' তিনি নিজেও বেয়ানের বুকে হাত বুলিয়ে নাম শোনাতে লাগলেন।

দেবেন এল একেবারে সকাল বেলা। তখন ক্ষমার শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেছে। খানিকটা থম্‌কে দাঁড়িয়ে থেকে বললে, 'তা আমি কী করব ! মা মাগীর জন্যেই ত এইটি হ'ল—ও শালাকে খুঁজতে গিয়ে খুঁজে ত পেলুমই না—লাভে হ'তে পুরোনো জায়গায় গিয়েছি, সেই সব পাল্লায় পড়ে কি আর বেরিয়ে আসা যায় ! মাঝখান থেকে মার শেষ সময়টায় মুখে একটু জল পড়ল না ! ছো !'

তিন

নরেন যে সংবাদটা পায় নি তা নয়—কিন্তু শ্রাদ্ধের খরচের প্রশ্নটা উঠবে বলেই বোধ হয় এল ঘাটের আগের দিন। যেন সংবাদটা এইমাত্র পেলে—এই ভাবে ছুটতে ছুটতে এসে ঢুকে, 'য়্যাঁ—মা নেই ! মা, মাগো !' ব'লে ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল।

দেবেন খানিকটা চুপ ক'রে ছিল কিন্তু তারপরই দিলে এক ধমক, 'মেলা ন্যাক্টো করিস্‌ নি নরো—চুপ ক'রে থাক্‌—তোকে চিনতে কারুর বাকী নেই। খবর কি তুই আজ পেলি ?'

'মাইরি দাদা, তোমার দিব্যি বলছি।'—এই বলে নরেন ওর দিক দু পা এগিয়ে এল—হয়ত বা গায়ে হাতে দিয়ে দিব্যি গালতেই।

'খবরদার ছুঁস নি। মিথ্যেবাদী কম্‌নেকার—জানিস না যদি ত মুখে এক-গাল দাড়িগোঁফ কেন? খালি পায়ে এলি কেন?'

নরেনের মাথায় অত কথা যায় নি। খানিকটা থতমত খেয়ে চুপ ক'রে থেকে নাকীসুরে বিনিয়ে বিনিয়ে বলতে শুরু করলে, 'বঁলে আমি মঁরতে বঁসেছিলুম, আজ এক মাস রোগে ভুগছি।'

'হ্যাঁ—এক মাস ভোগারই চেহারা বটে। তোর মিছে কথা শুনলে ঘেন্না করে।'

'ছাখো দাদা, বেশি সতীপনা করো না। তুমি সে রাত্তিরে কোথায় কাটিয়েছিলে তা জানি নে?'

'দেখলে দেখলে—নচ্ছার হারামজাদার মিছে কথা ধরা পড়ে গেল। দেখলে!'

প্রায় চুলোচুলি বেধে ওঠে দেখে রাসমণি এগিয়ে এলেন। তিনি শ্রাদ্ধের যোগাড় ইত্যাদির ব্যাপারে কদিন এখানেই থাকছেন সারাদিন। খরচও তাঁরই—দেবেন খবর পেয়ে এক কাপড়ে চলে এসেছে এই অজুহাত দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে। রাসমণি ডাকলেন, 'দেবেন!...এই কটা দিনও যদি ভাল থেকে মার কাজটা করতে না পারো বাবা, তাহ'লে আর এ সবে কাজ নেই—জিনিসগুলো গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হও!'

সে কণ্ঠস্বরে শুধু দেবেন নয়, নরেনও নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু কোনমতে শ্রাদ্ধটা কাটিয়েই নরেন আবার ডুব মারলে। নিয়মভঙ্গের দিনও রইল না। তিন চার দিন পরে মাথা চুলকে দেবেন বললে, 'সেখানে বিস্তর ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে—আমি ত আর অপেক্ষা করতে পারি না মা।'

'আর কেন অপেক্ষা করবে বাবা, তুমি যাও। আমি যখন ওকে পেটে জায়গা দিয়েছি—হাঁড়িতেও জায়গা দিতে পারব।'

রাধারাণী অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল শ্যামাকে জড়িয়ে ধরে। তার চেহারা হয়ে গেছে কঙ্কালসার। সর্বাঙ্গে ঘা—চোখ দিয়ে নাকি আজকাল পুঁজ পড়ে। বললে 'আমি আর বেশী দিন বাঁচব না ভাই, এই হয়ত শেষ দেখা—'

'ছি! কী যে বলো দিদি!'

'না ভাই, খারাপ ব্যামো ধরিয়েছিল বস্তিতে গিয়ে—সেই রোগ আমাতেও ছড়িয়ে গেছে। আর বাঁচবার সাধও নেই। ভয় শুধু ছেলেটার জন্যেই—দেখছিস ত ওরও কি অবস্থা। ছেলেটাও বেশী দিন বাঁচবে না—তাও বুঝছি। তবে আমি আগে যেতে পারি যাতে, সেই কথা বল্ তোরা।'

শ্যামা শোনে আর শিউরে ওঠে।

খারাপ ব্যামো সম্বন্ধে পরিষ্কার কোন ধারণা নেই তার—কিন্তু ওর সন্দেহ হয় নরেনেরও তেমনি একটা কিছু আছে। এর আগের বারে সে তাকে সোজাসুজি প্রশ্নও করেছিল। নরেন সদম্ভে উত্তর দিয়েছিল, 'হবে না কেন, হয়েছে। ও সব ডাকসাইটে পাড়ায় গেলেই হবে—তাই ব'লে আমি কি দাদার মত? আমি দস্তুরমত চিকিচ্ছে করিয়েছি। কবিরাজী চিকিচ্ছে!'

কিন্তু সে কথায় শ্যামার আস্থা কম। অথচ তার দেহের মধ্যে আর একটি সন্তানের আগমন-সম্ভাবনা প্রায় আসন্ন হয়ে এসেছে। কী হবে তাই ভেবে এখন থেকেই ওর ঘুম হয় না।

মা বললেন, 'তাহ'লে তুই নে তৈরী হয়ে।'

শ্যামা ঘাড় নেড়ে বললে, 'আমি যাবো না মা।'

'সে কি রে, এখানে কে তোকে দেখবে? আমিই বা রোজ আসি কি ক'রে?'

'কিন্তু মা—ওখানে গেলে ও আর কোন দিনই আমাকে নিয়ে যাবে না, দিব্যি তোমার ঘাড়ে সব চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তি হবে, নিজেও দিব্যি হয়ত চেপে বসবে।'

'সে ওষুধ আমার জানা আছে মা। তুমি ভেবো না। তোমাকে রাখব ব'লে ওকে বাড়ি ঢুকতে দেব তা ভেব না।'

শ্যামা কী করবে ভেবে পায় না। অথচ এখানে একা থাকা, আসন্ন সন্তান-সম্ভাবনা—সে যে অসম্ভব। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চোখের জল মুছতে মুছতে উঠে পড়ে। বহুদিন পরে বাপের বাড়ি যাবে, মার কাছে যাবে কিন্তু কিছুমাত্র আনন্দ হচ্ছে না তার। এমন নিরানন্দে বাপের বাড়ি যাওয়ার কথা কোন মেয়ে কখনও বোধ হয় কল্পনা করতে পারবে না।

স্বামীকে মা বাড়ি ঢুকতে দেবেন না। সে যদি কোনদিন বাড়িতে না-ই ঢোকে? চিরকাল বাপের বাড়ি থাকা? মার কাছে? মা-ই বা কদিন? দুশ্চিন্তায় হাত-পা যেন পাথরের মত হয়ে ওঠে—তাড়াতাড়ি নাড়তেও পারে না।

চার

শ্যামাকে বেশীদিন একা থাকতে হ'ল না। উমা এসে জুটল মাস-খানেকের মধ্যেই। একদিন সন্ধ্যায় বসে শ্যামা মাকে মহাভারত পড়ে শোনাচ্ছে—দরজায় কড়া নড়ে উঠল কট্ কট্ কট্ কট্ ক'রে।

'এমন ভাবে কে কড়া নাড়ে রে!' রাসমণি বিস্মিত হয়ে ঝিয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিচে নেমে এলেন।

দরজা খুলে দেখা গেল একটি মোটাসোটা বর্ষীয়সী মহিলা—একগা গহনা, চওড়া-পেড়ে দামী শাড়ী পরনে—তার পিছনে উমা। উমা মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে কাঁদছে ও কাঁপছে—থরথর ক'রে।

'এ—এ কী ব্যাপার!' রাসমণি অতি কষ্টে বলেন।

'বলি বাছা, তুমি এর মা?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'মাগী, পেটে ঠাঁই দিয়েছিস্—হাঁড়িতে দিতে পারিস্ নি? মেয়েকে কি করতে রেখে দিয়েছিস্ সেখানে? এর চেয়ে দাসীবৃত্তি করলে যে খোরপোশ ছাড়া মাইনে পেত কিছু। সে তাড়কা রাক্কুসীর কাছে ফেলে না রেখে একগাছা দড়ি আর একটা কলসী কিনে দিলেও ত হ'ত—'

রাসমণি ততক্ষণে একটু সামলে নিয়েছেন। বললেন, 'আপনি কে জানি না—একথা কেন বলছেন তাও জানি না, কিন্তু মা—মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি এনে রাখাটা কি খুব সম্মানের কথা? শ্বশুরবাড়িতে দাসীবৃত্তি করাও ভাল—এই শিক্ষাই পেয়েছি আমরা!'

'তা কি আমরা জানি নে বাছা' একটু নরম হয়ে তখন তিনি বললেন, 'আমরাও হিঁদুর ঘরের মেয়ে। শ'বাজার রাজবাড়ির মেয়ে আমি—উচিত-অনুচিত সবই বুঝি। কিন্তু মা…সম্ভব-অসম্ভব আছে ত।…আমার বাড়ি বাছা ঐ পাড়া-তেই, তোমার বেয়ানবাড়ির উঠোন আমার জানালা থেকে দেখা যায়—সবই দেখি। আজ তিন দিন এই মেয়েটাকে খেতে দেয় নি তার ওপর সমানে খাটাচ্ছে। আজ ঘড়া ক'রে রাস্তার কল থেকে জল আনতে গিয়ে উঠোনে আছাড় খেলে, শাশুড়ী মাগী ছুটে এসে আগে ঘড়া দেখছে, আমি আর অসৈরণ সইতে না পেরে বলনু যে আগে ঐ কচি মেয়েটাকে ছাখো বাছা। তা বললে কি বউ গেলে আবার বউ হবে—ঘড়া গেলে কিনতে হবে নগদ টাকা দিয়ে। তাও গেল—আজও সারা-দিন ঐ ছুতো ক'রে খেতে দেয় নি। কি ভাগ্যি সন্ধ্যেবেলা মাগী বেরিয়েছে ছেলের অফিসে না কোথায়—সেই ফাঁকে আমি ওকে বার ক'রে নিয়ে এসেছি। এখন পুষতে পারো পোষো—নয়ত একটা কলসী কিনে গঙ্গায় দিয়ে এসো নিজে হাতে—'

এক নিঃশ্বাসে এতগুলো কথা বলে তিনি যেন হাঁপাতে লাগলেন। রাসমণি হেঁট হয়ে প্রণাম করতে গেলে, 'এতখানি জিভ্ কেটে বললেন, 'হাঁ হাঁ বাছা করো কি! তোমরা ব্রাহ্মণ। পাপে ডুবিও না।'

'মা, পৈতে থাকলেই ব্রাহ্মণ হয় না—আপনি অনেক ব্রাহ্মণের চেয়ে উঁচু।'

'তা হোক বাছা। বাপ্ রে—হাজার হোক তোমরা বামুনের মেয়ে—গোখরো সাপ!'

তিনি আর বসলেন না—ওখান থেকেই বিদায় নিলেন। গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, সেই গাড়িতেই ফিরে যাবেন—এই অজুহাতে থাকতে রাজী হলেন না।

সে রাত এই তিনটি প্রাণীর যে ভাবে কাটল তা অবর্ণনীয়। দুই বোনের চোখের জল একবারও শুকোল না—শুধু রাসমণি স্তম্ভিত স্থির ভাবে বসে রইলেন। ভোরের দিকে বার-দুই পর পর ফিট্ হবার পর প্রথম তাঁর চোখে জল এল।...

পরের দিন সকালেই দয়াময়ী এসে হাজির হলেন। ভেতরে ঢুকে উঠোনে দাঁড়িয়ে হাঁক দিলেন, 'কৈ, কে কোথায় সব! আমার আর দাঁড়াবার সময় নেই!'

উমা সে কণ্ঠস্বর শুনেই সভয়ে জড়িয়ে ধরল শ্যামাকে। রাসমণি বেরিয়ে এলেন।

'শোন বাপু। যে শিক্ষা দিয়েছ তোমার মেয়েকে, তার উপযুক্ত কাজই সে করেছে—কাল কুলত্যাগ ক'রে বেরিয়ে গেছে সে। কর্তব্য বুঝে জানালুম, এর পর আমার কোন দায়-দোষ নেই।'

'শ্বশুরবাড়ির শিক্ষা বেশী দিন পেলে হয়ত তাই করত বেয়ান', রাসমণি কঠিন কণ্ঠে বলেন, 'কিন্তু আমার শিক্ষা এখনও ভোলে নি বলেই তা করে নি। তাকে আমি এখানে এনে রেখেছি।'

'অ! তাই ত বলি—মা-মাগীর যোগসাজস! গ্যাখো, ভাল চাও ত আমার বৌ এখনি বার করো, নইলে আমি থানা-পুলিস করব!'

'ক্ষমতা থাকে তাই করো। আমার মেয়ে ও বাড়ির চৌকাঠ আর মাড়াবে না! কণ্ঠস্বর শান্ত কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে আগুন জ্বলে ওঠে ওঁর।

'তাই বা কেন! আমি থানা-পুলিসের তোয়াক্কা রাখি না, আমি নিজেই নিয়ে যাবো। দেখি কে আট্‌কায়!' দয়াময়ী দু পা এগিয়ে এলেন।

দয়াময়ী ছিলেন উঠোনে, রাসমণি রকের ওপরে। অকস্মাৎ তাঁর শরীরের সমস্ত রক্ত যেন ফুটে টগবগ ক'রে উঠল—তিনি পাশ থেকে বড় বঁটিখানা তুলে নিলেন।

'নরহত্যা মহাপাপ কিন্তু জানি মা জগজ্জননী এতে অপরাধ নেবেন না। তুমি যা করেছ তারপর তোমার সামনে দাঁড়িয়ে পাগল না হওয়া অসম্ভব। আর যদি এক মিনিট এখানে থাকো ত বঁটি দিয়ে দুখানা ক'রে কেটে ফেলব। এই গুরুর দিব্যি বলছি।'

সে সময় রাসমণির যে রুদ্র মূর্তি ফুটে উঠেছিল তা দেখে দয়াময়ীও ভয় পেয়ে গেলেন—কোনোমতে পা পা ক'রে পিছিয়ে এসে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। আর একটি কথাও বলতে সাহসে কুলোলো না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এক

একটা গোটা দোতলা বাড়ির মধ্যে মাত্র তিনটি প্রাণী ওরা—মা আর দুই মেয়ে। শ্যামার খোকা ত শিশু। আর অবশ্য একটি ঝি আছে। পাড়ার বেকার ছোক্‌রাদের ভয় থাকা সত্ত্বেও চাকর রাখতে আর ভরসা হয় না রাসমণির—প্রথমত রূপসী ও তরুণী মেয়েরা রয়েছে বাড়িতে, দ্বিতীয়ত অসহায় তিনটি মেয়েছেলে, চাকর যে কেমন হবে তা কে জানে? খুন ক'রে সর্বস্ব নিয়ে যাওয়ার ইতিহাসও ত বিরল নয়!

কিন্তু সে যাই হোক্—এদের যেন দিন আর কাটে না। কাজ সামান্য, রাসমণিই সেটুকু করেন। তাছাড়া তাঁর নিত্য গঙ্গাস্নান আছে, পূজা-আহ্নিক আছে। ভগবানের কাছে দুঃখ জানিয়ে কেঁদেও অনেকটা সান্ত্বনা পান। কিশোরী দুটি মেয়েকে সে পরামর্শও কেউ কেউ দেন বৈকি—পাড়া-পড়শী যাঁরা আসেন, কিন্তু রাসমণি সে চেষ্টা করেন না। তিনি জানেন যে তা নিরর্থক। দেহ যে বয়সে পৌঁছলে মন ঈশ্বরাভিমুখী হয়, সে বয়সের এখনও বহু বিলম্ব ওদের। তিনি বলেন, 'ওটা ভগবানকে নিয়ে ছেলেখেলা করা। ওতে পাপ আরও বাড়ে। ইষ্টের ছবি সামনে রেখে যদি মানুষকে ভাবে, তার মত পাপ আর কি আছে! তার চেয়ে কাঁদুক ওরা। ভগবান ওদের কাঁদতেই পাঠিয়েছেন পৃথিবীতে, নইলে এমন হবে কেন?'

উমার এই সময় একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়। কারুর মর্মন্তুদ দুঃখের কাহিনী যে ঈর্ষার বিষয় হ'তে পারে, এ নিজে না অনুভব করলে হয়ত বিশ্বাসই করত না। শ্যামা যখন একের পর এক তার দুর্বিষহ বেদনার কাহিনী বিবৃত করতে থাকে তখন সহানুভূতিতে উমার চোখ ছলছল করতে থাকলেও মনে মনে কেমন যেন একটা অকারণ ঈর্ষাই অনুভব করে ও। মনে হয়, তবু শ্যামা এত দুঃখের মধ্যেও জীবনের স্বাদ কিছু পেয়েছে। আঘাত পেয়েছে—কিন্তু তাইতেই কি এটা প্রমাণ হয় না যে কিছু পেয়েছে সে স্বামীর কাছ থেকে? আঘাত পাওয়াও পাওয়া। তার স্বামীর মত ত উদাসীন নয় শ্যামার বর! জোর ক'রে দখল প্রমাণ করে, সম্ভোগ করে সে পশুর মত বলপ্রয়োগ ক'রে—তবু, তবু তা থেকে আসক্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়। আর ওর স্বামী? রূপবান, মিষ্টভাষী—যে কোন মেয়েরই কামনা করার মত—তার কাছে ওর পরিপূর্ণ কৈশোরের সমস্ত কামনা ও অনুরাগের

ডালি নিয়ে গিয়ে ফিরে এল, সে কঠোর ঔদাসীন্য ও অনাসক্তির কপাট এতটুকু টলাতে পারলে না।...এক এক সময় মনে হয় তার স্বামী অমনি নিষ্ঠুর, অমনি পশু হ'লেও সে নিজের জীবন সার্থক মনে করত। যে সুখের স্বাদ সে কোনদিনই পেলে না, শুধু তার ইঙ্গিত মাত্র পেলে—সে সুখের সঙ্গে মিশে যত আঘাতই আসুক না, সানন্দে সহ্য করত সে। আর হয়ত তাই স্বাভাবিক। নইলে শ্যামাও তার ঐ দানব স্বামীর জন্য প্রতিটি মুহূর্ত গুনত না!

উমা শোনে আর মধ্যে মধ্যে তার বুক চিরে এক একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে। শ্যামা মনে করে সেটা তার দুঃখের সমবেদনায়—কিন্তু উমা অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে তা নয়—যেটা পেয়ে শ্যামার দুঃখ, সেটা না পেয়েই উমার এই দীর্ঘশ্বাস!

এমনিই হয় জীবনে। আমার কাছে যা দৈন্য তা হয়ত তোমার কাছে ঐশ্বর্য। পৃথিবীর সব অভাবই তাই আপেক্ষিক। যে মানুষ বৃহত্তর বেদনার ছবি দেখে সামনে, সে নিজের বেদনায় সান্ত্বনা পায় সহজে।

সে কথা থাক্—

শ্যামার প্রসবের সময় এগিয়ে আসে। রাসমণি বিপন্ন বোধ করেন। বড় জামাই ধনী ব্যক্তি,—অর্থসাহায্য করা তার পক্ষে সামান্য কথা। কিন্তু এসব ব্যাপারে অর্থের চেয়ে লোকবলটা বেশী প্রয়োজন। প্রয়োজন একটি পুরুষমানুষের। রাসমণি এক এক সময় আর সহ্য করতে পারেন না—অনুপস্থিত জামাইকে লক্ষ্য ক'রে কটূক্তি করেন, 'ভাত দেবার ভাতার নয়—নাক কাটবার গোসাঁই!...এদিক নেই ওদিক আছে। আর তুইও তেমনি বেহায়া মেয়ে।'...ইত্যাদি।

কিন্তু তাতে শ্যামার অশ্রুর পরিমাণই শুধু বেড়ে যায়। এক-একদিন সে রাগ ক'রে খায় না। স্বামীর বিরহ যত দীর্ঘতর হয় ততই যেন এক অদ্ভুত নিয়মে তার দোষগুলো মুছে যায় ওর মানস-চিত্র থেকে। এমনও ওর মনে হয় এক এক সময়ে যে, সে এখন এসে পড়লে যেন সব সমস্যার সমাধান হ'ত। যদিও নিজের মনেই সে জানে এ-কথা কল্পনা করাও হাস্যকর।

রাসমণি অবশেষে অদ্ভুত ভাবে এক আশ্রয় পেয়ে যান।

সেটা এক বর্ষার রাত—ওঁরা তিনজনে শুয়েছেন একই ঘরে—বাকী গোটা বাড়িটা খালি। এমন সময় শোনা গেল গলির দিকের বারান্দায় কার পায়ের শব্দ!

ভয়ে চেঁচিয়ে ওঠবারই কথা কিন্তু রাসমণি ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। তিনি উঠে জানলার ফাঁক দিয়ে দেখতে গেলেন। তবে যে ছেলেটিকে নজরে পড়ল তাকে

দেখে রাসমণিরও মুখ গেল শুকিয়ে। পাড়ার এক বিখ্যাত জমিদারবাড়ির বেকার ছেলে—নিজে গুণ্ডা এবং একটি দুর্ধর্ষ গুণ্ডার দলের প্রতিপালক। ইতিমধ্যেই তার কুকীর্তির ইতিহাসে আকাশবাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছে। তবে এতদিন তার স্ত্রীলোক-ঘটিত কুকীর্তিগুলো শহরের দুটি কুখ্যাত বেশ্যাপল্লীতেই আবদ্ধ ছিল। কতকটা সেজন্যও বটে—কতকটা পয়সার জোরেও বটে, পুলিশ থাকত উদাসীন। সম্প্রতি কি একটা ব্যাপারে জেল বাঁচানো যায় নি, বছরখানেক জেল খেটে সবে ফিরেছে। এরই মধ্যে যে আবার সে এমন সাহস করবে তা রাসমণির স্বপ্নেরও অগোচর। গ্যাসপোস্ট বেয়ে বারান্দায় উঠেছে। লক্ষ্য সম্বন্ধেও কোন সংশয় থাকবার কারণ নেই।

রাসমণি পাথর হয়ে গেলেন। সে লোকটি—রজত তার নাম—সেও ওঁকে দেখেছে। সে বেশ সহজ কণ্ঠেই বললে, 'ভাল চাও ত দোরটি খুলে দিয়ে সরে পড়ো—কাকে-বকেও টের পাবে না। নইলে মিছিমিছি হাঙ্গামা হবে—পাড়ায় আর কাল মুখ দেখাতে পারবে না। আমাকে ত চেনো, যা ধরেছি তা করবই।'

রাসমণি এই প্রথম ভয় পেলেন। ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগল তাঁর হাত-পা। কী জবাব দেবেন ভেবেই পেলেন না। অসহিষ্ণু রজতেরও তখন অপেক্ষা করার মত মনের অবস্থা নয়। সে সজোরে মারলে একটা লাথি দোরের ওপর। পুরোনো বাড়ির জরাজীর্ণ দোর ঝন্ ঝন্ ক'রে উঠল সে পদাঘাতে।

মেয়েরাও উঠে প'ড়েছিল। তারা এবার ভয়ে চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল। সবাই মিলে দোরটা প্রাণপণে চেপে ধরে চেঁচাতে লাগল! ওদিকে রজতেরও মুখ থেকে কটূক্তি এবং পা থেকে লাথি যেন বন্যার মত বেরিয়ে আসছিল।

সে গোলমালে পাড়ার যে কারুর ঘুম ভাঙে নি তা নয়। জানলাও খুলে গিয়েছিল কয়েকটা আশেপাশে। রাসমণিকে পাড়ায় সবাই শ্রদ্ধা করে। কিন্তু রজতকে এই নাটকের নায়ক দেখে সবাই নিরস্ত রইল। সবাইকার জানলা আবার নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল, সকলেই যেন ঘুমে অচেতন।

শুধু বেরিয়ে এলেন শেষ পর্যন্ত একটি মুসলমান পরিবার। সাদিক মিয়া নাম, রাধারাজার অঞ্চলে কিসের কারবার আছে। সাতটি জোয়ান ছেলে তাঁর—তাঁরাই রজতকে ভয় করতেন কম। হৈ-হৈ ক'রে সাতটি ছেলে এবং চাকর-বাকর শুদ্ধ সবাই এসে পড়তে রজত ওপরের বারান্দা থেকেই একটা লাফ মেরে নিচে পড়ল এবং 'আচ্ছা, পরে দেখে নেব!' বলে শাসিয়ে গলির অপর দিকে নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তখন অবশ্য অনেকেই বেরিয়ে এলেন। হুম্‌কি হাম্‌কিও বিস্তর বর্ষিত হ'তে

লাগল অদৃশ্য রজতের ওপর। কিন্তু বুদ্ধিমতী রাসমণির এঁদের অবস্থা বুঝে নিতে দেরি হয় নি। তিনি মাথায় কাপড়টা টেনে দোর খুলে বেরিয়ে এসে হাত জোড় ক'রে সাদিককে বললেন, 'বাবা, আপনার দয়াতেই আমার মেয়েদের ইজ্জৎ প্রাণ রক্ষা পেয়েছে। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন—কী আর বলব! এ ঋণ শোধ দেবার ত আমার কোন ক্ষমতা নেই।'

সাদিকের চোখ ছলছলিয়ে এল, তিনি বললেন, 'খোদা সাক্ষী রইলেন মা, আমাকে বাবা বলেছ—আজ থেকে তুমিও আমার মেয়ে। আমার আর আমার সাত ছেলের গায়ে এক ফোঁটা রক্ত থাকতে কেউ তোমার কোন অনিষ্ট করতে পারবে না কোনদিন। তুমি নির্ভয়ে থাকো।'

সাদিক সত্যি-সত্যিই যেন ওঁকে মেয়ের মত দেখলেন। পরের দিনই সকালে বৃদ্ধ নিজে মিস্ত্রী সঙ্গে ক'রে এনে দরজায় ভারি লোহার ছিটকিনি লাগিয়ে দিয়ে গেলেন, কাঁটা-তার দিয়ে বারান্দা ঘিরে দিলেন। তারপর থেকে প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় মেয়ে কি পুত্রবধূ একজনকে পাঠিয়ে দিতেন—এঁদের খবর নিয়ে যেতে। তারা সন্তর্পণে এসে ভেতরের রকে বসত—এবং যথেষ্ট সতর্ক থাকত, এঁদের শুচিতা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে। রাসমণিই পরে জোর ক'রে তাদের আপন ক'রে নিলেন। এক সেট পেতলের বাসনও করলেন ওদের খাওয়ানোর জন্য। বাসন-গুলো একটু আগুন ঠেকিয়ে মেজে নেওয়া হ'ত এবং পৃথক থাকত কিন্তু অতিথিরা কোন স্বতন্ত্র ব্যবস্থা টের পেতেন না। শ্যামা উমাকে সঙ্গে ক'রে রাসমণিও যেতেন মধ্যে মধ্যে—ফিরে এসে কাপড় ছাড়তেন। এইটুকু সংস্কারও যে থাকা উচিত নয় তা তিনি স্বীকার করতেন, তবে বলতেন, 'কী করব বল্, জন্মাবধি যা সংস্কার হয়ে গেছে সেটা ছাড়া কি সহজ? মানুষ মানুষই—তা জানি, তবু—'

ক্রমে এ দুটি পরিবারের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে গেল। শ্যামা উমা সাদিকের নাতনী রাবেয়া আর নসিবনের সঙ্গে সই পাতিয়ে ফেলল।

দুই

শ্যামার এবার মেয়ে হ'ল। ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে। সাদিক মিয়াদের দৌলতে দাই ডাকা, বাজার-হাট করা—কোনটাই আটকায় নি। কিন্তু ওদিকটায় নিশ্চিন্ত হ'লেও, রাসমণির ব্যাপারটা ভাল লাগে না। এ কি দুর্দৈব তাঁর। দুটি বিবাহিতা মেয়ে গলায় পড়ল—একটি আবার ছেলেমেয়েসুদ্ধ। এদের কি হবে—কি ব্যবস্থা করবেন কিছুই যেন ভেবে পান না। তাঁর ইষ্ট এবং পরকাল—এ অভিশপ্ত জীবনের সর্বশেষ সান্ত্বনা, তাও যেন ক্রমে সুদূর হয়ে পড়ে।

মেয়ের নাম রাখা হয় মহাশ্বেতা। মাসী কমলা নাম রাখে। সে নভেল পড়েছে বিস্তর। ছেলের নামও সে-ই রেখেছিল, চিঠিতে লিখে পাঠিয়েছিল—হেমচন্দ্র। মহাশ্বেতা নাম শ্যামার খুব পছন্দ হয় নি কিন্তু রাসমণির ভাল লাগল।

কোথায় মনের কোণে শ্যামার যেন আশা ছিল যে অন্তত প্রসবের সময় নরেন এসে পড়বে। এমন ত হঠাৎই আসে সে—

এ আশার যে কি কারণ তা সে জানে না। তবু আশা ছিল ঠিকই।

কিন্তু দিন সপ্তাহ মাস—ক্রমে দু'তিন মাস হয়ে গেল, নরেনের কোন খবরই নেই। নির্জনে চোখের জল ফেলে শ্যামা। একদিন ব'লে ফেলেছিল, 'হয় ত ওখানে এসে ফিরে গেল মা—আর ক-টা দিন দেখে এলে হ'ত।' মা তাতে গম্ভীর মুখে জবাব দিয়েছিলেন, 'বেশ ত, ঘরভাড়া ক'রে দিচ্ছি, সেখানে গিয়েই থাকো। সে ত এ বাড়ি চেনে না, খবর নেয় ত ওখানেই নেবে।'

তারপর আর সাহস হয় নি কোন দিন শ্যামার সে প্রসঙ্গ তুলতে।

শেষ পর্যন্ত বুঝি ভগবান ওর ডাক শোনেন।

একদিন দুপুরবেলা কমলা এল পাল্কী ভাড়া ক'রে—প্রায় ছুটতে ছুটতে। নরেন এসেছে তার ওখানে, এদের দেখতে চায়। শ্বশুরবাড়ি সোজাসুজি আসতে সাহসে কুলোয় নি তাই বড় শালীর কাছে গেছে সুপারিশ ধরতে।

শ্যামা উৎসুক নেত্রে চায় মার দিকে। রাসমণি শুধু সংক্ষেপে ঘাড় নেড়ে বলেন, 'না।'

সকলে স্তম্ভিত। শ্যামার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে, সে মাটির দিকে চোখ নামিয়ে বসল। কমলা কিছুক্ষণ হতবাক্ হয়ে চেয়ে থেকে অতিকষ্টে যেন উচ্চারণ করে 'না ?'

এবার কিছু কঠোর ও দৃঢ়কণ্ঠেই বলেন রাসমণি, 'না! থাকবার আশ্রয় ঠিক ক'রে, এদের ভরণ-পোষণের ভার নিয়ে যেদিন নিয়ে যেতে পারবে সেদিন যেন গাড়ি নিয়ে এসে বাইরে দাঁড়ায়, আমি মেয়েকে পাঠিয়ে দেব। জামাইয়ের আর স্থান নেই এ-বাড়িতে।'

কিছুক্ষণ সকলেই স্তব্ধ। শেষে কমলা বেশ একটু ক্ষুণ্ণভাবেই বলে, 'এ আপনার কিন্তু অন্যায় মা!'

রাসমণি শান্ত স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে উত্তর দেন, 'আমি তোমার পেটে হই নি মা, তুমি আমার পেটে হয়েছ। ন্যায়-অন্যায় বিচার যদি এতদিনে না জন্মে থাকে ত তোমার কথায় আর তা জন্মাবে না। আমি জানি দুই বিধবা মেয়ে পুষছি বাড়িতে।'

শ্যামা রাগ ক'রে উঠে চলে গেল। কমলারও চোখে জল ভরে এসেছিল কিন্তু

রাসমণির মুখের চেহারা দেখে আর কথা কইতে সাহস হ'ল না। শ্যামাকে সান্ত্বনা দেবার মত কোন কথা খুঁজে না পেয়ে সেই পাল্কীতেই আবার কমলা ফিরে গেল।

নরেন অবশ্য তখন কমলার দোতলার ঘরে টানাপাখার নিচে আরামে ঘুমোচ্ছে। তার পরনে শত-ছিন্ন কাপড়, খালি পা। সর্বাঙ্গ রুক্ষ। কমলা ওকে দেখামাত্র আনন্দের আতিশয্যে কোনমতে বামুন ঠাকরুণকে ওর খাওয়ার ব্যবস্থা করতে বলেই চলে গিয়েছিল। স্নানের কথা কেউ বলেও নি, সেও আবশ্যক মনে করে নি। মেঝেতে যে ঢালা বিছানার চাদরটা সদ্য পাল্‌টানো হয়েছে সেটা ইতিমধ্যেই মলিন ও ধূলি-ধূসর হয়ে উঠেছে।

এই পশুকে আত্মীয় বলে স্বীকার করতে লজ্জাই করে। কিন্তু কমলার মন বড় কোমল, তার ওপর শ্যামার কথা ভেবে সত্যিই ওর রাত্রে ঘুম হয় না। কঠিন কথা মুখে এলেও যত্নে দমন করলে। আস্তে আস্তে ওর ঘুম ভাঙিয়ে সরাসরি রাসমণির আদেশ বা নির্দেশ জানালে।

নরেন বললে, 'তাই ত! মাগীর জেদ ত কম নয়। মেয়েটাকে দেখি নি তাই —নইলে বোয়ের জন্যে ত ঘুম হচ্ছে না!...যাক্ গে—দিদি, এবেলা একটু পাটা লুচি খাওয়ান দিকি—অনেক দিন ভাল-মন্দ খাই নি।'

এই বলে সে বিরাট একটা শব্দ ক'রে হাই তুলে আলস্য ত্যাগ করলে—আরামে ও অতি নিশ্চিন্ত ভাবে।

অতিকষ্টে মনোভাব গোপন ক'রে কমলা বললে, 'আচ্ছা সে ব্যবস্থা হবে, তুমি ভাই চান করো দিকি ভাল ক'রে তেল মেখে—'

'চান? এই অবেলায়?'

'তা হোক।'

'মুশকিল। কাপড়-চোপড়—'

'আচ্ছা সে ব্যবস্থা হবে। তুমি উঠে কলঘরে যাও দিকি। বিছানাটার কি হাল করেছ?'

'ইস—তাই ত! ময়লা হয়ে গেছে, না? আচ্ছা চানই করছি—এক বাটি তেল দিতে বলুন তাহলে আপনার ঝিকে। আর অমনি এক ছিলিম তামাক—'

কমলা স্বামীর একখানা ধোয়া কাপড় বার ক'রে দিলে। একটা জামাও। নরেন অনেকদিন পরে ভাল ক'রে স্নান ক'রে টেরি কেটে গুন্‌গুন্ ক'রে আদি-রস-ঘেঁষা একটা গান গাইতে গাইতে বেরিয়ে এল কলঘর থেকে। তারপর জামাকাপড় পরে আর একটি ঘুম। আহারাদি ক'রে কিন্তু আর রাত্রে থাকতে রাজী হ'ল না কিছুতেই, বললে, 'দিদি, অনেকদিন পরে আজ বড্ড আরাম হয়েছে। ওটা পুরো

ক'রে ফেলি। এখানে শুলে ঘুম হবে না কিছুতেই—একটা টাকা দিন দিকি। নিদেন আট আনা। আমি ফিরিয়ে দেব ঠিক । সেজন্যে ভাববেন না!'

কমলা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে টাকাটা বার ক'রে দিলে!

ভালই হ'ল, স্বামী সেদিন তখনও ফেরেন নি, বরানগরে বাগানবাড়ি দেখতে গেছেন কাজকর্ম সেরে। এই আত্মীয় তাঁর সামনে দেখাতে যেন লজ্জায় মাথা কাটা যায়!

এরও দিন-পনরো পরে, ঝিয়ের অসতর্কতার অবসরে দোর খোলা পেয়ে নরেন সটান্ এ-বাড়ির দোতলায় এসে হাজির।

রাসমণি তখন দ্বিপ্রহরের বিশ্রামের পর উঠে সুপুরি কাটছেন। ওকে দেখে শুধু যে বিস্মিতই হলেন তাই নয়—এমন একটা অপরিসীম ঘৃণা ওঁর কণ্ঠ পর্যন্ত ঠেলে উঠল যে কিছুতেই কোন শব্দ উচ্চারণ করতে পারলেন না, নীরবে শুধু তাকিয়েই রইলেন।

কথা কইলে নরেনই। নাটকীয় ভাবে হাত-পা নেড়ে বললে, 'ব্যবস্থা ক'রেই এসেছি। বার করুন দিকি চট্‌পট আমার ছেলেমেয়েদের আর পরিবার।' এই বলে রাসমণির উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই বেশ গলা ছেড়ে হাঁক দিলে, 'কৈ গো কোথায়! তৈরী হয়ে নাও তাড়াতড়ি।'

রাসমণি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'তার আগে কি ব্যবস্থা করেছ শুনি?'

'কেন? সে খবরে আপনার দরকার কি? আমার পরিবার আমি যেখানে খুশি নিয়ে গিয়ে তুলব।'

রাসমণি কী একটা কঠিন জবাব দিতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তার আগেই শ্যামা বলে উঠল, 'কোথায় নিয়ে যাবে না জেনে আমি নড়ব না এক পা-ও। তোমাকে বিশ্বাস নেই, যদি খারাপ পাড়ায় নিয়ে গিয়ে তোলো!'.

যদিও সে এতদিন একান্ত মনে স্বামীকেই কামনা করছিল তবু আজ এই মুহূর্তে তার আশঙ্কাই প্রবল হয়ে উঠল আবার। আর দেখা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা উদ্ধত অভিমানও।

নরেন ধমক দিয়ে উঠল, 'থাম্ থাম্। মেলা ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করতে হবে না। ছোট মুখে বড় কথা!…হাজার হোক আমরা গুরুবংশ, কানে ফুঁ দিলে আমাদের পয়সা খায় কে?…পদ্মগ্রামের সরকারবাড়ি নিয়ম-সেবার কাজ নিয়েছি। একটা ঘর ছেড়ে দেবে, সেইখানেই নিয়ে গিয়ে তুলব। নাও নাও, চট্‌পট তৈরি হয়ে নাও। এখন হাঁটা দিতে শুরু করলে তবে যদি রাত্তিরে গিয়ে পৌঁছতে পারি।'

'হেঁটে যাবেন ? এতটা পথ ? সে কি ?' উমা প্রশ্ন করে।

'হুঁ। নইলে কি নবাব-নন্দিনীর জন্যে গাড়ি পাল্কী করতে হবে নাকি ? অত ক্ষ্যামতা আমার নেই !'

রাসমণি ততক্ষণে সামলে নিয়েছেন কতকটা। ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে উমাকে ডেকে বললেন, 'বেহায়াটাকে বল উমি, রাত্তিরে আমি নাতি-নাতনী পাঠাবো না। অত বাহাদুরিতে কাজ নেই, আজ থাক্। কাল সকালে যেন যায়। গাড়ি ক'রেই যায় যেন, গাড়িভাড়া আমি দেব।'

মুহূর্তে সব আস্ফালন থেমে গেল। একেবারে নিস্পৃহ নিরাসক্ত কণ্ঠে নরেন বললে, 'দেখুন আপনাদের যা সুবিধে। মোদ্দা, আমি সেধে থাকতে যাই নি, এর-পর যেন আমাকে দুষবেন না।'

তারপর বিনা নিমন্ত্রণেই জাঁকিয়ে বসে বললে, 'উমা আমার ভাই আবার তামাক খাবার অভ্যেস—ঝিটাকে বাজারে পাঠাও দিকি, একটা থেলো হুঁকো আর টিকে-তামাক কিনে আনুক।'

রাত্রে শ্যামা প্রশ্ন ক'রে সব জেনে নিল। ঠাকুরঘরের সঙ্গে লাগাও একখনি পাকা ঘর তারা ছেড়ে দেবে। আর মিলবে আধসের আতপ চালের একখানা ক'রে নৈবেদ্য, রাত্রে শেতলের একপো দুধ আর ক-খানা বাতাসা। এই ভরসাতে নরেন স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে সেই নিবান্দাপুরীতে নিয়ে যাচ্ছে। জায়গাটা কোথায় সে সম্বন্ধে শ্যামার কোন ধারণাই নেই, শুধু শুনলে যে শিবপুর কোম্পানীর বাগান থেকেও প্রায় দু ক্রোশ দূরে, অজ পাড়াগাঁ।

শ্যামা কিছুক্ষণ স্তম্ভিত আড়ষ্ট হয়ে থেকে বললে, 'তারপর ? চলবে কিসে ?'

'শাঁকে ফু ! পুরুতগিরি করব। ঢের যজমান জুটে যাবে। বাপ-ঠাকুদ্দা ঐ ক'রে অত পয়সা ক'রে রেখে গেছে—আমি শুধু সংসারটা চালাতে পারব না ?

'তাদের পেটে বিদ্যে ছিল। তুমি তো পুজোর মন্তরও জানো না।' রাগ ক'রে বলে শ্যামা।

'আরে—শাঁখ ঘণ্টা ত নাড়তে পারব ! তাতেই হবে। তাতেই হবে। মন্তর আবার কি, আমি ঠাকুর হাব্‌লা গোব্‌লা, ভোগ খাও ঠাকুর খাবলা খাবলা। এই ত !'

নিজের রসিকতায় নিজেই হা-হা ক'রে হেসে ওঠে। পাশের ঘরেই মা শুয়ে আছেন মনে পড়ায় শ্যামা তাড়াতাড়ি ওর মুখের ওপর হাতটা চেপে ধরে।

হাসির ধমকটা সামলে নিয়ে হঠাৎ নরেন বলে, 'তোমার মা মোদ্দা রাঁধে ভাল। খাওয়াটা বড্ড চাপ হয়েছে।'

তারপর কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে একসময়ে বলে, 'উমিটা ত দিব্যি দেখতে হয়েছে। ভায়রাভাইটা নিরেট বোকা, মাইরি!'

শ্যামা অন্ধকারেই শিউরে উঠল। ভয়ে না ঘৃণায়—তা নিজেই বুঝল না।

সকালে উঠে জলযোগাদি সেরে নরেন শাশুড়ীর উদ্দেশে বলে, 'তাহলে কিছু বাসন-কোসন বিছানা-টিছানা অমনি গুছিয়ে দেবেন মা। নতুন ক'রে সংসার পাতা, বুঝতেই ত পারছেন। গাড়ি ক'রেই যখন যাওয়া হবে তখন দিব্যি গাড়ির চালে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে'খন।'

উত্তর দেবেন না মনে ক'রেও কথা কয়ে ফেলেন রাসমণি, 'অত যে বাসন ছিল সিন্ধুক ভরা—তার কিছু নেই?'

'যা পেয়েছি তা কি আর আছে। কবে বেচে মেরে দিয়েছি। আর বাকী সব লোকের বাড়ি জমা ছিল—দিলে না শালারা—মেরে দিলে!'

বেশ নিশ্চিন্ত ভাবেই জবাব দেয়।

রাসমণি নতুন ক'রে ঘর-বসতের জিনিস সাজিয়ে দেন চোখের জল মুছতে মুছতে। যাবার সময় গাড়িভাড়া ছাড়া পাঁচটা নগদ টাকাও চেয়ে নেয় নরেন, 'গিয়ে ত বাজার-হাট আছে, বুঝলেন না! আমি ত শূন্যিরেন্ত। আপনি আবার নাতি-নাতনীকে দুধ খাইয়ে খাইয়ে যা নবাব ক'রে তুলেছেন!'

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এক

খালি বাড়িটা আরও ফাঁকা লাগে। হা-হা করে বিরাট শূন্যতা। শুধু ত শ্যামা যায় নি, তার সঙ্গে হেমও গেছে; দু'বছরের শিশু তার হাসির কলরবে বাড়িতে যে প্রাণস্পন্দন জাগিয়ে রেখেছিল, তা নিঃশেষে মরে গিয়েছে যেন।

রাসমণি আরও বেশী সময় দেন পূজোতে। কিন্তু উমার কিছুই করবার নেই। এক এক সময় ভয়াবহ শূন্যতা ও নিষ্ক্রিয়তায় মনে হয় যেন সে পাগল হয়ে যাবে। নির্জন একান্তে ঢিব্ ঢিব্ ক'রে মাথা খোঁড়ে সে মধ্যে মধ্যে।

সাদিক মিয়া বা সাদিক মুসলমান (এই নামেই তিনি পাড়ায় বিখ্যাত ছিলেন) উপদেশ দেন, 'নিচের তলাটা ভাড়া দাও মেয়ে—তাতে বাড়িতে লোকজনও থাকবে, তোমার ভাঁড়ারও অনেকটা সুসার হবে।'

কিন্তু রাসমণি রাজি হন না। ভাড়াটের সঙ্গে একত্র থাকা যে কী, সে সম্বন্ধে তাঁর কিছু অভিজ্ঞতা আছে বৈকি। আশপাশের বাড়িতে নিত্য কলহ শুনে শুনে

তিনি ক্লান্ত। কে কার সিঁড়ি ধোয়ার পালায় ফাঁকি দিয়েছে, কোন্ ভাড়াটে পাইখানা পরিষ্কার করানোর শর্ত মানছে না, কে কতটা জল বেশী খরচ করছে—এমনি হাজারো ঝঞ্ঝাট। তাছাড়া গুচ্ছের ছেলেমেয়ে হয়ত থাকবে—চ্যাঁ-ভ্যাঁ—নোংরামি। না, সে তিনি পারবেন না।

'বরং বুড়ো গোছের একটা দারোয়ান যদি পাওয়া যায়—দোকানে কি অফিসে কাজ করে, এখানে রাত্রে থাকবে, সামান্য ফাই-ফরমাশ খাটবে—সেই চেষ্টা বরং দেখুন বাবা।'

মাস দুই পরে সাদিক তার চেয়ে ভাল প্রস্তাব আনেন, 'এক ভদ্রলোক ছোটখাটো একটা ছাপাখানা চালাবে—নিচের তলাটা ভাড়া দেবে? নটায় প্রেস খোলে, বড়জোর সন্ধ্যে পর্যন্ত থাকবে। তারপর চাবি দিয়ে বাড়ি চলে যাবে। ভাড়াও দিতে চাইছে কুড়ি টাকা। এটা পেলে তোমার আর বিশেষ ভাড়াই লাগবে না। ত্রিশ টাকার মধ্যে কুড়ি টাকাই ত আদায় হয়ে যাচ্ছে।'

প্রস্তাবটা রাসমণির মন্দ লাগে না। মেয়েছেলে থাকলেই ছেলেমেয়ে থাকবে। গণ্ডগোল চেঁচামেচি—হাজার রকমের ঝঞ্ঝাট। অথচ বাসাড়ে বেটাছেলে থাকার যে অসুবিধা ও বিপদ, এক্ষেত্রে সে সব সম্ভাবনাও নেই। সারাদিন কাজ করবে—সন্ধ্যাবেলা চলে যাবে। সে সময়টা নিচে যাবার দরকার কি?

তবু একটু চিন্তিত মুখে বলেন, 'কিন্তু কল-পাইখানা? সে ত নিচের তলায়!'

সাদিক বললেন, 'সেটা একটা পার্টিশানের মত দিয়ে দিলেই হবে। ওদের ব'লে দেব যে—কল-পাইখানা সরতে পারবে না। বাইরে ত সরকারী কল আছে। এধারের সিঁড়ির সঙ্গে কলতলাসুদ্ধ ঘিরে আমি করগেটের বেড়া দিয়ে দিচ্ছি। ওদের সঙ্গে সম্পর্কই থাকবে না—কেমন?'

রাসমণি রাজী হলেন। টাকার কথাটাও একেবারে উড়িয়ে দেবার মত নয়। কলসীর জল গড়াতে গড়াতে একেবারে তলায় এসে ঠেকেছে—আর কতদিন চলবে তা ভাবতে গেলেও ভয় হয় তাঁর।

সাদিক মিয়া লোক পাঠিয়ে করগেট দিয়ে বেশ ক'রে উঠোনের মধ্যে বেড়া টেনে দিলেন। তার একটা দোরও হ'ল। সেটা খুললে তবে বাইরের দিকে পড়ে বাড়ি থেকে বার হওয়া যায়। ভেতরের দিকের ছোট একটা ঘরও তাঁদের রইল, শুধু ওদিকের দুখানা ঘর ছেড়ে দেওয়া হ'ল ভাড়াটেদের। কথা হ'ল ভেতরের দিকের দোরও তারা বন্ধ রাখবে। রাস্তার দিকেই তাদের যখন কাজকারবার, অন্তঃপুরে আসবার দরকার কি?

মাসের পয়লা থেকে ভাড়াটে এল। দুদিন আগে থেকেই তাদের লটবহর আসতে শুরু হয়েছে। টাইপ রাখার খোপ-ওলা কাঠের কেস্, গ্যালি রাখার র‍্যাক্, টুল, চেয়ার, টেবিল। জন-দুই মিস্ত্রী এসে একটা ছোট ট্রেড্‌ল্ প্রেসও লাগিয়ে চালিয়ে দিয়ে গেল। এ ছাড়া আরও এল কিছু রবার স্ট্যাম্প করার সাজ-সরঞ্জাম।

উমার কাছে এসব জাদুঘরের সাজিয়ে রাখা জিনিসের মতই দ্রষ্টব্য। সে ইতিমধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখারও একটা ব্যবস্থা ক'রে ফেলেছে। সিঁড়ির একটা বাঁকে বসলে রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে ওদের বড় ঘরটার জানলার মধ্য দিয়ে দৃষ্টি পাঠানো যায় বহুদূর। উমা সেইখানে বসে দেখে অবাক্ হয়ে। ওর ডাগর দুটি চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়েই থাকে, রেলিংএ চেপে রাখার ফলে শুভ্র গৌর ললাটে ছাপ ফুটে ওঠে—তবুও সেখান থেকে না পারে নড়তে আর না পারে চোখ ফেরাতে।

বিস্ময়!

ওর আগাগোড়াই বিস্ময় লাগে। টুলে বসে কেমন দ্রুত হস্তে কম্পোজিটাররা বিভিন্ন খোপ থেকে টাইপগুলো পর পর সাজায়। কী নিচ্ছে সেদিকে নজর নেই, নজর ওদের লেখা কাগজখানার দিকে শুধু। সকলেরই খাটো কাপড় পরনে—গায়ে ছেঁড়া জামা আর খালি পা। টুলে বসে বসে ওদের ঘাড় ব্যথা করে না? নটায় এসে বসে, ওঠে কেউ সন্ধ্যা ছটায়—কেউ আরও পরে। দুপুরে শুধু একবার উঠে মুড়ি খায়। আধ পয়সার মুড়ি আর আধ পয়সার বেগুনি কি ফুলুরি।

আবার কল চালিয়ে ছাপা—সেও কম বিস্ময় নয়! পা দিয়ে কি একটা ঠেলে আর চাকা ঘোরে। কেমন লুচি বেলা বেলুনের মত দুটো বেলুন একটা লোহার চাকি থেকে কালি নিয়ে সীসের অক্ষরের ওপর বুলিয়ে দিয়ে যায়—তারপর তাতে পিনে আটকানো কাগজখানা গিয়ে পড়ে আর আপনি ছাপা হয়ে যায়। কোন্‌টা দেখবে উমা যেন ভেবেই পায় না।

ওদের মনিবটিও দেখবার মত বৈকি। বেঁটে খাটো কালো-পানা মানুষটি, দোহারা বলিষ্ঠ গড়ন। ছোট ছোট দুটি চোখে কেমন এক প্রকারের ধূর্ত দৃষ্টি। ধুতির ওপর মেরজাই পরে ঘুরে বেড়ায়, একটা জামা আছে, সেটা পেরেকে টাঙানোই থাকে। প্রেসের চাবি থাকে তার ট্যাঁকে গোঁজা—ফলে খাটো কাপড়খানা হাঁটুর ওপরে উঠে পড়ে। লোকটি এক দণ্ড স্থির হয়ে থাকে না। যখন খদ্দের আসে তখন চেয়ারে এসে বসে, পাশে টুলের ওপর ক্যাশ-বাক্সটিতে একটা হাত দিয়ে—নইলে হয় কর্মচারীদের খিঁচোয়, নয়ত রবার স্ট্যাম্প তৈরী করতে বসে। কর্মচারী অবশ্য খুবই কম, দুটি কম্পোজিটার আর একটি মেসিন চালাবার লোক, সে-ই

অবসর সময়ে ফাই-ফরমাশ খাটে। মনিব নিজেই রবার স্ট্যাম্প তৈরি করেন—খদ্দেরের কাছে খালি বলেন, (কেউ কিছু পাল্টে দিতে বললে) 'এখন ত আবার আমার কর্মচারী নেই কিনা, ওটা থাক—কাল সে এসে সেরে রাখবে'খন।' অর্থাৎ জানতে দেন না কাউকে যে কাজটা তিনি নিজেই ক'রে থাকেন।

লোকটির ভাবভঙ্গী দেখলে উমা কিছুতেই হাসি চাপতে পারে না। বয়স কত সে সম্বন্ধে ওর কোন ধারণা নেই—ত্রিশও হতে পারে, চল্লিশ হওয়াও বিচিত্র নয়। কিন্তু শুধুই হাসি পায় না, কেমন যেন ভয়-ভয়ও করে। কী একটা আছে লোকটার মধ্যে—আতঙ্ককর কিছু, যাতে তার দিকে বেশিক্ষণ চেয়ে থাকলে গায়ের মধ্যে একটা ভয় শিরশির্ ক'রে ওঠে—অথচ যত মনে করে সে ওদিকে চাইবে না, চোখ ফিরিয়ে নেয়, ততই দৃষ্টি যেন ঘুরেফিরে ওর উপর নিবদ্ধ হয়। চোখ ফেরাতে পারে না।

গোপনচারিণীর এই চুরি ক'রে দেখাটুকু বলা বাহুল্য প্রেসের মালিক ফটিকেরও চোখ এড়ায় নি। সে নিজে জানতে দেয় নি যে সে জানে—বাইরে এমনি নিস্পৃহ উদাসীন ভাব বজায় রেখেছিল—কিন্তু তার চোরা চাহনি সদাজাগ্রত দৃষ্টি মেলে থাকত এই রূপসী ও কিশোরী মেয়েটির দিকে। তার কাছে কিছুই চাপা ছিল না।

একদিন অপরাহ্ণে অবসর-মত উমা এসে বসেছে তার খাঁজটিতে, হঠাৎ ফটিক মুখ তুলে তাকালে। সেদিন কী কারণে সকাল ক'রে কর্মচারীদের ছুটি হয়ে গিয়েছিল। ফটিক একাই বসে বোধ হয় হিসেব-নিকেশ দেখছিল। পেছন ফিরে বসে থাকা সত্ত্বেও উমার নিঃশব্দ প্রবেশ কেমন ক'রে টের পেয়ে আকস্মিক ভাবে মুখ তুলে তাকিয়ে বলে উঠল, 'খুকী শোন—মা আছেন ওপরে ?'

উমা একেবারে অবাক্। এক্ষেত্রে কি করা উচিত—ছুটে পালানোই উচিত কি না—কিছুই ভেবে পেলে না সে। অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে কথা বলা নিশ্চয়ই ঠিক নয়—এ কথা সে জানে ভাল ক'রেই—কিন্তু ওর চুরি ক'রে দেখাটা ধরা পড়ে গেছে, এবং সামনাসামনি লোকটি যখন প্রশ্ন ক'রে বসেছে তখন উত্তর না দেওয়াটাও বোধ হয় অভদ্রতা হবে। এখন কি করলে সব দিক বজায় থাকে——প্রাণপণে ভাবে সে।

ঠিক কি করবে এখন—কিছুই ভেবে না পেয়ে উমা তাকিয়েই আছে ওর দিকে বিমূঢ় নির্বাক ভাবে, এমন সময়ে ফটিকই আবার কথা কইলে। সে এক নজরেই উমার লজ্জারক্ত মুখ ও বিব্রত দৃষ্টি দেখে ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছিল, 'মা ঠাকুরুণকে বলো ত, আমি একবার প্রণাম করতে যাব।'

এবার উমা অব্যাহতি পেল। সে ছুটে ওপরে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'মা ঐ ছাপাখানার লোকটা আপনার সঙ্গে কথা কইতে চায়। বলে প্রণাম করতে যাবো—'

রাসমণি মেয়ের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'ও তোকে পেলে কোথায় যে তোকে ডেকে বললে?'

আবারও উমার সুগৌর মুখখানা রক্তরাঙা হয়ে উঠল। সে ঘাড় হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে রইল অপরাধীর মত।

'সিঁড়ি দিয়ে ওদের ঘরের দিকে উঁকি মারছিলি বুঝি? আর কখনও অমন ক'রো না। বুঝলে? ওতে নিন্দে হয়। ভেতরে যাও এখন।'

তারপর তিনি নিজেই বাইরে বেরিয়ে এসে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে ডাকলেন 'কী বলছিলে বাবা, ওপরে এসো।'

সেই দিন মাসকাবার, সংক্রান্তি। তবু ফটিক ট্যাক্ থেকে ভাড়ার কুড়িটা টাকা বার ক'রে ওঁর পায়ের কাছে রেখে প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ও জিভে ঠেকালে।

রাসমণি যেন একটু অপ্রতিভ হলেন, 'এত তাড়া কি ছিল বাবা, এখনও তো মাস শেষই হয় নি বলতে গেলে!'

'তা হোক্ মা। যা দিতে হবে তা দিয়ে ফেলতে না পারলে আমার রাত্রে ঘুম হয় না। কিন্তু ঠিক সেই জন্যেই আপনাকে ডাকি নি মা—একটা কথা বলব, ক'দিন থেকেই মনে করেছি, আজ সাহস ক'রে তাই—'

থেমে গেল সে মাঝপথেই, রাসমণি উৎসুক হয়ে চেয়ে থাকেন, আশা করেন বাকী কথাটার।

'মা, আমি আপনার সন্তানের মত', বিনয়পূর্বক শুরু করে ফটিক, 'যদি অপরাধ না নেন ত বলি।'

'বল না বাবা। অপরাধ কিসের।'

'মা, আপনার এই মেয়েটির কথা সব শুনেছি। শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার পথ ত বন্ধ, আপনিই বা কদিন থাকবেন। তারপর কি হবে ওর?'

ধৃষ্টতা সন্দেহ নেই। তবু লোকটার বলার ভঙ্গীতে এমন একটা আন্তরিকতা ছিল যে রাসমণির দৃষ্টি প্রখর হয়ে উঠলেও কণ্ঠস্বর কঠিন হয় না, কতকটা কোমল কণ্ঠেই বলেন, 'সে ওর অদৃষ্টে যা আছে হবে বাবা। তবে এ সব কথা বাইরের লোকের সঙ্গে আলোচনা না করাই ভাল।'

'ঐ জন্যেই ত অভয় চেয়ে নিয়েছি মা আগে থাকতে। একটা প্রস্তাব আছে

বলেই কথাটা পেড়েছি। ওকে হাতের কাজ শেখাবেন কিছু? যাতে ও রোজগার ক'রে খেতে পারে?'

'কি কাজ?' সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠেন যেন রাসমণি।

'ধরুন—রবার স্ট্যাম্প করার কাজ। নতুন কাজটা উঠেছে, এখনও বেশী লোক জানে না তৈরী করতে। অর্ডার আসে খুব।...ও যদি ঘরে বসে তৈরী ক'রে দিতে পারে আমি দাম আর কাজ বুঝে নিতে পারি। ওতে বেশ আয় হবে।'

'সে এখন ওকে কে শেখাবে বাবা বলো!'

'যদি অনুমতি করেন ত আমি শেখাতে পারি—'

'সে কি হয় বাবা!' দৃঢ়কণ্ঠে বাধা দিয়ে ওঠেন রাসমণি, 'বাজে কথা ব'লে লাভ কি!'

'কেন হয় না মা। আপনি বসে থাকবেন, আপনার সামনে বসে আমি শিখিয়ে দেব। তারপর মাল-মশলা সব ওর ঘরেই থাকবে—আমি শুধু কাজটা আপনার হাতে এনে দেবো, আপনার কাছ থেকে বুঝে নেবো ...ও ভেতরে বসে কাজ করবে। বেশ আয় হবে আপনি দেখবেন।'

'সে ত আজ তুমি আছ বাবা—পরে কে ওকে কাজ দেবে, কেই বা বুঝে নেবে? এ হ'ল কারবারের কথা! মেয়েছেলে কি কারবার করতে পারে? তুমি আজ আছ কাল নেই।'

স্পষ্ট কথাই বলেন রাসমণি। ওর এই অপ্রাসঙ্গিক কথায় একটু বিরক্তও হন।

ফটিক কিন্তু নাছোড়বান্দা। বলে, 'আমি না-ই বা রইলুম মা, সন্ধানসুলুক দিয়ে যাবো—এরপর ত চাকর দিয়েও করাতে পারবেন। তাতেও কিছু থাকবে! তাছাড়া কাজটা শিখে রাখতে দোষ কি?

তবু সংশয় কাটে কৈ? রাসমণি বলেন, 'এসব কাজ মেয়েছেলে শিখছে শুনলে লোকে কি বলবে?'

'লোকে শুনবে কেন মা? আপনি আর আপনার এই ছেলে—এ ছাড়া কারুর শোনবার দরকার কি?'

'আচ্ছা ভেবে দেখি।' অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলতে হয় রাসমণিকে, কতকটা ওকে এড়াবার জন্যই।

কিন্তু উমা আড়াল থেকে সবই শুনেছিল। সে জেদ করতে লাগল, 'শিখতে দিন না মা, আপত্তি কি? আপনার সামনেই ত শিখব—লোকে কে জানতেই বা পারছে! এরপর যা হয় হোক্—এখনও ত দু'পয়সা আয় হতে পারে।' ইত্যাদি।

ক'দিন ধরে অনবরত একই কথা শুনে শুনে বিরক্ত হয়ে রাসমণি বলেন, 'না। ভেবে দেখলুম ওসব ঝামেলায় কাজ নেই।'

দুই

উমার পিপাসার্তা অন্তরবাসিনী ফটিকের এই প্রস্তাবটিকে যেন প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছিল, এখন মার নিষেধাজ্ঞায় সে অবলম্বন একেবারে ভেঙে পড়ল। এটা ওর কাছে রীতিমত অবিচার ব'লেই বোধ হ'ল। কি করবে ও? এখন ত মা আছেন—তারপর? ভিক্ষা ক'রে খেতে হবে, নয়ত দিদির বাড়ি বিনা মাইনের দাসীবৃত্তি করতে হবে। কেন? কেন? কেন ও স্বাধীন একটা বৃত্তি অবলম্বন করবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে?

প্রবল একটা ক্ষোভ আর বিদ্রোহ ওর মনের মধ্যে দুর্বার হয়ে ওঠে। কিন্তু রাসমণির মুখের চেহারা দেখে সে বিদ্রোহ প্রকাশ সম্ভব হয় না। মাকে ভয় করাটা ওদের অভ্যাস হ'তে হ'তে স্বভাবে পরিণত হয়ে গেছে—এখন আর তাকে বদলাতে পারে না।

দিন দুই ও ভাল করে খেলে না, মার সঙ্গে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কথা বললে না। তাতে অবশ্য রাসমণির বিশেষ কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। তিনি নিশ্চিন্ত মনেই নিজের কাজ ক'রে যেতে লাগলেন। তিনি যে ওর এই পরিবর্তন লক্ষ্য করেন নি তা নয়, প্রশ্রয় দিতে চান নি। তিনি জানতেন এ নিয়ে কচকচি করলে ব্যাপারটা তেতো হয়ে উঠবে। তিনি উমার অজ্ঞাতসারেই একটু কড়া নজর রাখলেন শুধু।

উমাও ভয়ে ভয়ে কিছুদিন সিঁড়ির ধার দিয়েই গেল না। কিন্তু কর্ম ও মানুষের সঙ্গের অভাব ওর কৌতূহলকে ক্রমশঃ অসহ ক'রে তুলতে লাগল। ফটিক আজকাল রাত অবধি একা অফিস ঘরে থাকে। কি কাজ করে তা ওপর থেকে বোঝা যায় না—শুধু দেখা যায় ঘরে ডবল ফিতের টেবিল ল্যাম্পটার জোর আলো জ্বলে এবং মধ্যে মধ্যে খুট্ খুট্ ক'রে কি আওয়াজ হয়। সেটা রাসমণিও লক্ষ্য করেন। একদিন সাদিক মিয়াকে ডেকে বললেন, 'বাবা, আপনি বলেছিলেন যে সন্ধ্যের আগেই ওরা চলে যাবে, এখন ত দেখি রাত নটা-দশটা পর্যন্ত কি করে ঘরের মধ্যে।'

সাদিক বিস্মিত হলেন। বললেন, 'তাই নাকি?...আচ্ছা দেখছি আমি।'

খবর নিয়ে এসে বললেন, 'সবাই চলে যায় শুধু ফটিকবাবু থাকেন। ওঁর ঐ রবার স্ট্যাম্পের কাজ খুব বেড়েছে তাই রাত অবধি নিজে বসে কাজ করেন। তাছাড়া প্রেসের অবস্থা খুব ভাল যাচ্ছে না ত—তাই নিজেই কিছু কিছু কম্পোজ ক'রে রাখেন, আর একটা লোক বাড়াতে চান না।'

'পেসের অবস্থা ভাল নয়? কিন্তু কাজ ত আসছে! যে লোক ছিল তাদের ত আর তাড়ায় নি, আবার নিজেও এত করছে—অবস্থা ত ভাল হবার কথা।'

তিনি চুপ ক'রে গেলেন। ভাড়াটে বসিয়ে আর এত তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে বাদানুবাদ করা যায় না। সাদিক মিয়ারই বা এমন কি গরজ—তিনি ভাড়াটের সন্ধান দিয়ে ত আর অপকার করেন নি—মিছিমিছি তাঁকে উত্ত্যক্ত করা ঠিক নয়।

কিন্তু ক্রমশঃ ফটিকের অবস্থানকাল দীর্ঘতর হয়। দশটাও বেজে যায় এক এক দিন।

রাসমণির সন্ধ্যাবেলাই জপ-আহ্নিক সেরে শুয়ে পড়া অভ্যাস। রাত নটার পর উঠে মেয়েকে খেতে দেন, নিজেও কোন কোন দিন একটু কিছু মুখে দেন, তারপর পাকাপাকি ভাবে বিছানা পেতে শুতে যান। এই সময় আর ঘুম হয় না তাঁর—তা উমা জানে, সারারাত ছট্‌ফট করেন আর মধ্যে মধ্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, কখনও বিছানায় উঠে বসে জপ করতে থাকেন। কিন্তু—বোধ হয় সেই জন্যই—সন্ধ্যার ঘুমটা গাঢ় হয়। উমার পক্ষে এমন সুযোগ-সুবিধার লোভ সম্বরণ করা কঠিন হয়ে ওঠে। আজকাল সন্ধ্যার সময় ঝিও থাকে না। কাজ কম হয়ে গেছে বলে রাসমণি নূতন বন্দোবস্ত করেছেন, এখানে শুধু পেটভাতে থাকে সে, সকাল সন্ধ্যায় অন্য বাড়ি ঠিকে-কাজ করে। এখানকার কাজ সেরে চলে যায় পাঁচটায়, ফেরে কোনদিন রাত নটায়, কোনদিন সাড়ে নটায়। মার পুরোনো বইগুলো এক-একখানা পঞ্চাশ-ষাটবার ক'রে পড়া হয়ে গেছে। সেগুলোও আর ভাল লাগে না। নিজে মধ্যে মধ্যে কবিতা লেখার চেষ্টা করে—বাকী সময়টা শুধু ঘুরে বেড়ায়, খালি বাড়িতে একা একা।

সুতরাং—

প্রকৃতির দুর্লঙ্ঘ্য নিয়মে একদিন উমাকে সিঁড়ির খুপরিতে আবার এসে বসতে হ'ল।

জানলার সেই বিশেষ খাঁজ দিয়ে দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে যা দেখে তাতে ও রীতিমত বিস্মিতই হয়। ফটিক তার টুলটির ওপর অভ্যস্ত ভঙ্গীতে ক্যাশবাক্সে হাত দিয়ে চুপ ক'রে বসে আছে। এত রাত অবধি কাজ করা ছাড়া থাকার কোন কারণ নেই—কিন্তু কাজ ত কিছুই করছে না, চুপ ক'রে বসে আছে—যেন কার জন্য অপেক্ষা করছে। ওধারে দোরও বন্ধ, ঘরেও দ্বিতীয় প্রাণী নেই, তবে এ কিসের প্রতীক্ষা?

অনেকক্ষণ, বোধ হয় কুড়ি-পঁচিশ মিনিট এই ভাবে কাটল। অবশেষে কৌতূহল

অপূর্ণ রেখেই উমা উঠবে মনে করছে এমন সময় সাপের মত হিসহিসিয়ে কে বলে উঠল, 'খুকী শোন !'

শিউরে চমকে উঠল উমা।

কে, কে বললে এ কথা ? ফটিক ত তেমনি ওদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে, একবারও ফেরে নি। তবে ও জানবে কি ক'রে উমার অস্তিত্ব ? কিন্তু ওরই গলা যেন—

এ কি ভৌতিক ব্যাপার নাকি !

নিমেষে ঘেমে উঠল সে। জিভটা শুকনো ঠোঁটের ওপর একবার বুলিয়ে নিয়ে ওঠবার চেষ্টা করলে কিন্তু পা যেন অসাড়, নাড়বারও শক্তি নেই ; কি একটা আতঙ্কে ওর সব স্নায়ু যেন অবশ হয়ে গেছে—

এবার ফটিক মুখ ফেরাল, টুল থেকে উঠেও দাঁড়াল।

'ভয় কি, শোন না।'

উমার এতক্ষণে যেন হাত-পায়ে সাড় ফিরে এল। সে প্রাণপণ চেষ্টায় উঠে দ্রুত ছুটে পালাল দোতলায়। একেবারে সর্বশেষ ধাপে পা দিয়ে প্রথম থামল সে দম ফেলবার জন্য, নিজেকে একটু নিরাপদ মনে ক'রে। কিন্তু দেখা গেল যে ফটিকের পূর্ণ পরিচয় সে পায় নি—সেই কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সরীসৃপের মত নিঃশব্দ দ্রুত গতিতে সে একেবারে উমার সামনে পৌঁছে গেল এবং সেই রকম হিসহিস ক'রে বললে, 'ভয় কি ? আমি তোমার জন্যেই বসেছিলুম। শিখবে তুমি রবার স্ট্যাম্পের কাজ ?'

'মা বারণ করেছেন যে !' থতিয়ে থতিয়ে অনেক কষ্টে উত্তর দেয় উমা। ওর গলা শুকিয়ে কাঠ, সর্বাঙ্গ কাঁপছে ভয়ে।

'ওঁরা সেকেলে লোক, সব তাতেই খারাপ দেখেন। তুমি ত আর সত্যিই কিছু অন্যায় করতে যাচ্ছ না, ভয় কিসের ! উনি ত এই সময়টা রোজ ঘুমোন—এই সময় তুমি একটু ক'রে শিখে রাখলে পারো। এটা একটা বিদ্যে—বিদ্যে শিখে রাখতে দোষ কি ?'

তবু উমা ইতস্তত করে।

'তোমার অবস্থা দেখে মনে দুঃখ হয়েছে তাই। নইলে আমার আর এত মাথা-ব্যথা কি ? রোজ এই এত রাত অবধি বসে অপেক্ষা করি—জানি দু-চার দিন গেলেই আবার তুমি সিঁড়িতে এসে বসবে—'

'তু···আপনি টের পান কি ক'রে ?'

কৌতূহলটাই বড় হয়ে ওঠে।

ফটিক হাসে একটু। অন্ধকারেও ওর দাঁতগুলো দেখা যায়। শক্ত, মজবুত দাঁত। 'এসো, এসো—আচ্ছা, ব্যাপারটা একটু দেখেই যাও না। ক-মিনিট বা—মা টের পাবেন না।'

নিজের অনিচ্ছাতেই নেমে আসে। কোন অন্যায় সে করে নি এটা ঠিক, অন্যায় বা পাপের ধারণাও ওর ছিল না, তবু পা-দুটো যেন কাঁপে থরথর ক'রে, সর্বাঙ্গ ঘেমে ওঠে।

ফটিক কিন্তু খুব সহজ। সে নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই কথাবার্তা কয়। ওকে দেখায় রবার স্ট্যাম্প তৈরী করার কৌশল ও কলকব্জা। একটা লাইন তৈরী ক'রেও দেখায়।

ক্রমে ক্রমে উমার আতঙ্কও কমে। যদিচ কান পাতা থাকে ওপরের দিকে।

খানিকটা পরে ফটিকই বলে, 'এইবার ওপরে যাও খুকী—মা উঠে পড়বেন হয়ত, তোমাদের ঝি আসারও সময় হ'ল।' উমাও যেন পালিয়ে বাঁচে। তাড়াতাড়ি যতটা সম্ভব নিঃশব্দে ওপরে উঠে আসে।

পরের দিন উমা আর সিঁড়ির ধারে গেল না। যদিও ওপরের বারান্দা থেকে ফটিকের ঘরের আলো লক্ষ্য ক'রে সে বোঝে যে ফটিক সেদিনও ওর জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু আর নয়—মনকে শাসন করে সে, মা যখন নিষেধ করেছেন তখন দরকার নেই ওসব ঝামেলায় গিয়ে।

কিন্তু তার পরের দিন আবার কে যেন ওকে আকর্ষণ করে—মা ঘুমোবার পরেই এসে বসে সিঁড়িতে, ফটিকও যেন প্রস্তুত—ডেকে ঘরে নিয়ে যায়। বলে, 'আজ একটা অর্ডার আছে। ছাখো যদি তৈরী করতে পারো ত এর লাভটা তোমাকেই দেবো।' আগের দিন কেন আসে নি উমা, সে প্রশ্ন ত দূরের কথা—তার ইঙ্গিত মাত্রও করে না।

ব্যাপারটা কঠিন নয়, অল্প আয়াসেই উমা আয়ত্ত ক'রে নেয়। অর্ডারী স্ট্যাম্পটাও তৈরী ক'রে ফেলে সে এক সময়, কাগজের ওপর ছাপ উঠিয়ে সগর্বে তাকিয়ে থাকে নিজের কীর্তির দিকে।

ফটিক বাহবা দেয়, 'তোমার খুব মাথা কিন্তু। আমিও এত তাড়াতাড়ি শিখতে পারি নি।'

পরের দিন তিন আনা পয়সা ওর হাতে গুঁজে দেয় ফটিক—একরকম জোর ক'রেই, 'বা রে! তোমার জিনিস বেচে এই লাভ হয়েছে, এটা না নিলে চলবে কেন?'

লজ্জায় সঙ্কোচে যেন মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে উমা বললে, 'আমি—আমি এ

পয়সা নিয়ে কি করব। মা বকবেন—'

'জমিয়ে রাখো। মাকে এখন বলবার দরকার কি? এরপর খানিকটা জমিয়ে হাতে দিও—একেবারে চমকে উঠবেন।'

সেদিনও একটা স্ট্যাম্প নিজে হাতে তৈরী করে উমা! টেবিল ল্যাম্পের আলোতে ঝুঁকে পড়ে সে তৈরী করে, ফটিক পাশে দাঁড়িয়ে থেকে উপদেশ নির্দেশ দেয়। ওর নিঃশ্বাস উমার গালে এসে লাগে, উমার ললাটের স্বেদ-বিন্দুগুলি আলোতে চিকচিক করে, ফটিক তাকিয়ে দেখে।

সেদিন সাজ-সরঞ্জাম গুছিয়ে রেখে উমা 'তবে আসি' বলে উঠে দাঁড়িয়েছে ফটিক ওর একটা হাত চেপে ধরল হঠাৎ। উমা ভয় পেয়ে চমকে উঠল—কেমন একটা ভীত ত্রস্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কিন্তু ফটিকের চোখের দিকে চোখ পড়ে যেন আর জোর করতে পারলে না। বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়েই রইল।

সাপের মত স্থির দৃষ্টি ফটিকের, জাদুকরের মত অমোঘ আকর্ষণ।

উমার হাতে টান দিয়ে আরও কাছে আনে ফটিক, 'শোন! আর একটু থেকে যাও—' হিসহিস ক'রে ওঠে যেন কোন ক্লেদাক্ত সরীসৃপ।

তিন

অকস্মাৎ ওপর থেকে রাসমণির তীক্ষ্ণ আহ্বান কানে এসে বাজল, 'উমি!'

সাপের ফণা নেমে গেল নিমেষে, উমাও যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। প্রাণপণে বিহ্বলতা কাটিয়ে ছড়িয়ে-পড়া চেতনাকে কুড়িয়ে নিয়ে সে দৌড়ে ওপরে চলে গেল!

রাসমণি কিছুক্ষণ নিঃশব্দে ওর দিকে চেয়ে থেকে প্রশ্ন করলেন, 'কী করছিলি নিচে?'

সর্বাঙ্গ কাঁপছে উমার, গলা দিয়েও স্বর বার হ'তে চায় না। সে শুধু নিরুপায়ের মত দীন ভঙ্গীতে চেয়ে রইল মার দিকে।

'তুই ঐ ওদের ছাপাখানায় গিয়েছিলি? একা; এত রাত্রে?' চাপা গলায় গর্জন ক'রে ওঠেন রাসমণি।

'ও—ও ডাকলে যে। কাজ শিখিয়ে দেবে ব'লে—' থতিয়ে থতিয়ে ঢোঁক গিলে গিলে বলে উমা।

'আর তুমি তাই যাবে! কচি খুকী! আমি না বলে দিয়েছি ওসব চলবে না! এত বড় সোমখ মেয়ে এই গভীর রাতে একটা বণ্ডামার্ক পুরুষের সঙ্গে নির্জন ঘরে কথা কইছে—পাড়ার কেউ যদি জানতে পারে? আমি কাল সকালে মানুষের সামনে মুখ দেখাব কি ক'রে?'

তারপর একটু দম নিয়ে বললেন, 'যার বরাত মন্দ হয় তার বুদ্ধিও কি তেমনি বিপরীত! তুমি এত খুকী নও যে কিসে কি হয় তা জানো না—। আমার চেয়ে ঐ একটা মুখ্‌খু ছাপাখানা-ওলা—ঐ হ'ল তোমার বেশী আপন, না? তাই আমি বারণ করবার পরও ওর কাছে যেতে হ'ল তোমায়! বিয়ের পর স্বামী নিলে না—লজ্জায় তার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে থাকবার কথা। তুই তাই লোকের কাছে মুখ দেখাস, অন্য মেয়ে হলে গলায় দড়ি দিত! নির্লজ্জ বেহায়া কমনেকার?'

রাগ যেন কমে না রাসমণির। উন্মাদের মত বলে যান, শুধু এই জ্ঞানটা আছে যে গলার স্বর বাড়ানো চলবে না, পাড়ার কারও কানে না যায়। কিন্তু সেই চাপা গলায় তর্জনের মধ্যে যে ভাষা বেরোতে থাকে তা যেন তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের মত কেটে কেটে বসতে থাকে ওর গায়ে। কাটার ওপরও নুন ছিটিয়ে দেয় সেই সব কথা।

উমারও কিছু বলবার ছিল বৈকি। এই রকম ঘরে যে তাকে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল সে দোষ তার নয়—নিজে সে ইচ্ছে ক'রে বা জেনে এ বিয়ে করে নি কিংবা তার কোন দোষে সে বিতাড়িত হয় নি, তবে তাকে সে কথা নিয়ে গঞ্জনা দেওয়ার কি যুক্তি থাকতে পারে? কিন্তু মার সেই রুদ্র মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে কোন কথাই বলতে পারে না, মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে ঘামে শুধু।

আরও খানিকক্ষণ ধরে ওকে তিরস্কার করার পর রাসমণি সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন তর্‌তর্‌ ক'রে—উমার সেই বসে থাকবার খাঁজটিতে এসে দাঁড়িয়ে ডাক দিলেন 'ফটিক?'

ফটিক বহু পূর্বেই চলে যেতে পারত, কিন্তু ওপরের ব্যাপারটা কতদূর কি হয় তা জানবার কৌতূহল দমন করতে পারে নি ব'লে জানলার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল—শুধু তাই নয়, ঘরের আলোটাও নেভানো হয় নি, সুতরাং উপস্থিতিটা অস্বীকার করতে পারলে না, ওপাশের দরজা দিয়ে ঘুরে বেরিয়ে এসে নিরীহ ভাল মানুষের মতই দাঁড়াল, 'মা, ডাকছেন!'

মুখে তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভঙ্গী। অর্থাৎ তাকে তিরস্কার করতে গেলে সেও সহজে ছাড়বে না, সর্বপ্রকার যুদ্ধের জন্যই সে প্রস্তুত।

কিন্তু রাসমণি সে ধার দিয়েও গেলেন না। শুধু বললেন, 'আমি আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় দিলুম, এর ভিতর তুমি ছাপাখানা উঠিয়ে নিয়ে যাবে। ভাড়াটে রাখার আর সুবিধে হবে না আমার।'

ফটিক হয়ত এতটার জন্য প্রস্তুত ছিল না। মিনিট খানেক সময় লাগল তার উত্তর দিতে, এবং যখন কথা কইলে তখন তার গলাতেও সে দৃঢ়তা যেন আর ফুটল না। বললে, 'আজ্ঞে, ভাড়াটে তোলার ত একটা আইন আছে—উভয় পক্ষেই

পনরো দিনের নোটিশ দিতে হয়।'

রাসমণি তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'আইন আদালত আমি বুঝিও না, করবও না। আটচল্লিশ ঘণ্টা দেখব, তারপর আমি নিজে হাতে তোমার ছাপাখানার জিনিসপত্র তুলে রাস্তায় ফেলে দেব। ক্ষমতা থাকে তুমি আটকিও। আর থানা-পুলিস করতে হয়, আইন আদালত করতে হয় তুমি ক'রো বাবা!'

এই বলে বাদানুবাদের বিন্দুমাত্র অবসর না দিয়ে তিনি ওপরে উঠে গেলেন।

উমা সে রাত্রে কিছু খেলে না, ঘুমোতেও পারলে না। তার নিজের যে কোথায় কি অপরাধ ঘটল তা সে অনেক চেষ্টা ক'রেও বুঝতে পারলে না। ফটিকের কাছে কাজ শিখতে নিষেধ করাটাও যেমন সে অবিচার ভেবেছিল, আজকের এ ভৎ র্সনাও তার তেমনি অবিচার বলে বোধ হ'লো। অবশ্য হ্যাঁ—মনের অবচেতনে ফটিকের এই কিছু-পূর্বের আচরণটা মিলিয়ে কোথায় যেন সে মার নিষেধাজ্ঞার এবং আশঙ্কার একটা যাথার্থ্যও স্বীকার করতে বাধ্য হ'ল। তবু আঘাতের ব্যথাও ত কম নয়। কথা যে তীক্ষ্ণ তীরের মত বাজতে পারে, তা আজ প্রথম বুঝল উমা। শাশুড়ীর তিরস্কারের কারণগুলো সবই মিথ্যে বলে দুঃখিত হ'লেও সে আহত হয় নি বোধ হয় এতখানি। আজ অনুভব করল বাক্যবাণ শব্দটির অর্থ।

মর্মান্তিক দুঃখের প্রথম তীব্রতায় বিহ্বলা উমা বার বার সঙ্কল্প করলে যে সে মায়ের কথাই শুনবে—গলায় দড়ি দেবে। মা তাতে কত সুখী হন দেখে নেবে সে। অকারণে তাকে এতটা আঘাত করার শোধ তুলবে সে মার ওপর। কেন, কিসের জন্যে এত ক'রে বলবেন তিনি! তিনি কি এটা কখনও ভেবে দেখেন যে উমার মত মেয়ের এই একক নিঃসঙ্গ জীবন কি ক'রে কাটবে? সে যদি প্রলুব্ধ হয়েই থাকে ফটিকের ঐ অর্থ উপার্জনের প্রস্তাবে—ত এমন কিছু অন্যায় করে নি। অবশ্য ফটিক লোক ভাল নয় এটা উমাও বুঝতে পেরেছে, কিন্তু তবু—তার দিকটাও কি ভেবে দেখা উচিত ছিল না ওঁর। উমা ত নিজেই অনুতপ্ত।

তাই বলে—

রাসমণির একটা কথা ওকে সব চেয়ে আঘাত করেছে, 'এখন বুঝতে পারছি তোকে শ্বশুরবাড়িতেই পাঠানো উচিত ছিল। ঐ দজ্জাল শাশুড়ীর হাতে মার খেয়ে গতর চূর্ণ হওয়াই দরকার ছিল তোর। তবে ঢিট্ থাকতিস। লাথির ঢেঁকি কি চড়ে ওঠে!'...

সে কি এমনই মন্দ, এমনই অসৎ যে তার জন্য ঐ শাস্তি ঈশ্বর-নির্দিষ্ট! ঐ তার যথার্থ স্থান!...তার চেয়ে তার মরাই ভাল!

জ্বালা থেমে এক সময় চোখে বর্ষা নামে। ভাগ্যের এই উপায়হীন প্রতিকারহীন অবিচারের বিরুদ্ধে মনটা মাথা কুটে কুটে এক সময় যেন শ্রান্তিতেই ভেঙে পড়ে। মনের সব বেদনা অশ্রুর আকারে ধারায় ধারায় ঝ'রে প'ড়ে উপাধান সিক্ত করে। তবু উমার মরা হয় না। জীবনকে সে ত্যাগ করতে পারে না।

তার হেমের কথা মনে পড়ে যায়। শ্যামা যদি খোকাটাকেও রেখে যেত!

কি নিয়ে সে বাঁচবে? কি নিয়ে?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

এক

বড় বাড়িটার একেবারে এক প্রান্তে ঠাকুরঘর, কতকটা বাইরেই—অর্থাৎ মূল বাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন। তারই পিছনে একটি মাত্র কুঠুরী, সেইখানেই নরেন শ্যামাকে নিয়ে গিয়ে তুললে, 'দিব্যি ঘর, না? আগাগোড়া পাকা।'

ঘর পাকা বটে কিন্তু এ কী ঘর?

দক্ষিণে মন্দির বা ঠাকুরঘর—সুতরাং দক্ষিণটা চাপা। পূবেও কোন জানলা নেই—আছে পশ্চিমে একটি জানলা আর উত্তরে দরজা ও আর একটা জানলা। মোটা মোটা নিরেট ইঁটের গাঁথুনি, ভেতরটা দীর্ঘদিনের অবহেলায় আগাগোড়া নোনা-ধরা—অন্ধকার, স্যাঁৎসেঁতে আর তেমনি গরম। কিছুকাল দাঁড়াবার পরই মনে হ'ল দম আটকে আসছে। শ্যামা কোনমতে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টা করলে। আর্তনাদের মত তার গলা দিয়ে স্বর বেরোলো, 'এখানে আমার ছেলেমেয়ে থাকবে কি ক'রে গো?'

'তা থাকবে কেন? নবাব-নন্দিনীর পুত্তুর-কন্যের জন্যে রাজপ্রাসাদ অট্টালিকে চাই। অতশত লম্বা লম্বা কথা যেন না শুনি আর—এই সাফ্ বলে দিলুম।'

হেমও ঘরের মধ্যে এসে কেমন একরকম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, নরেনের দৃষ্টি পড়ল তার ওপর, গালে প্রচণ্ড এক চড় মেরে বললে, 'দেখছিস কি হারামজাদা! এইখানে এনেছি, এইখানেই থাকতে হবে। বাপের যেমন অবস্থা তেমনি থাকবি। অত নওয়াবি চলবে না।'

দু বছরের ছেলে এসব কথার একটিও বুঝলে না, ডুকরে কেঁদে উঠল শুধু যন্ত্রণায়। ওর গালে পাঁচ আঙুলের দাগ বসে গিয়েছিল। শ্যামা তাড়াতাড়ি গিয়ে ওকে কোলের মধ্যে টেনে নিলে।

'নাও—ঢের হয়েছে। পোঁটলাপুঁটলি খোল দেখি। ছাখো ঐ ওদিকে কোথায় রান্নাঘর—উনুন-ফুনুন আছে কি না ছাখো, না হয় কাঠ-কুটো দিয়ে চাটটি চালে-

ডালে চাপিয়ে দাও। সন্ধ্যের আর বেশি দেরি নেই—কোথায় আলো কি বিত্তেন্ত, আমি এখানে সে সব খুঁজে বেড়াতে পারব না।'

অর্থাৎ এই বিজন বনে রাত্রিবেলা অন্ধকারে থাকতে,হবে।

প্রকাণ্ড বাগান এই মন্দিরের চারদিকে। ওদিকে কোথায় একটা পুকুর আছে—কিন্তু এখানটায় বড় বড় গাছপালার ঠাস্-বুনুনি। কাঁঠাল আম জামরুল চালতা সজনেয় সূর্যকে এই অপরাহ্নেই আড়াল ক'রে এনেছে,—সন্ধ্যাবেলা কি হবে?

শ্যামার মনে হ'ল ছুটে পালিয়ে যায় কোথাও ছেলেমেয়েদের হাত ধরে, এই রাক্ষসের হাত থেকে অন্য যে কোনও জায়গায় হোক্। কিন্তু কোথায় যাবে? অদৃষ্টের হাত থেকে ত পালাতে পারবে না!

সে কাঠ হয়েই দাঁড়িয়ে আছে দেখে নরেন বোধ করি আরও একটা প্রচণ্ড ধমক দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় ওধারের বাগানের মধ্যে দিয়ে একটি মোটা গোছের মহিলা এসে পড়ায় ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর বাধা পেয়ে থেমে গেল।

'আমাদের নতুন বামুন মা কেমন এল দেখি একবার! ও মা, এ যে একেবারে ছেলেমানুষ, আমার পিটকীর চেয়েও ছোট। তবে বাছা আর পেন্নাম করব না—অকল্যেণ হবে। এই এইখানে থেকেই হাত তুলে অমনি—'

তিনি বেশ হেঁট হয়েই নমস্কার করলেন।

শ্যামা যেন আঁধারে কূল পেলে। সে বরাবরই একটু মুখচোরা কিন্তু হঠাৎ একেবারে এমন অকূলে পড়ে তারও মুখ খুলে গেল। সে-ও কাছে এসে হেঁট হয়ে নমস্কার ক'রে বললে, 'মা, আমিও আপনার এক মেয়ে।'

'বাঃ, বেশ বেশ। বেশ মিষ্টি কথা ত তোমার। হবে না কেন, হাজার হোক্ শহরের মেয়ে—আর এই পাড়াগাঁয়ের সব কথা, ঝ্যাঁটা মারো! আমিও কলকাতার মেয়ে বাছা—যদিও এই ছাব্বিশ বছর হ'তে চলল বে হয়েছে তবু এখনও এখানকার কথাবার্তা অব্যেস হ'ল না। যেন খটাশ ক'রে গায়ে বাজে।'

এইবার তিনি প্রায় শ্যামাকে ঠেলেই ভেতরে এসে দাঁড়ালেন, 'ও মা, এখনও যে পোঁটলাপুঁটলি কিছুই খোলা হয় নি। চলো বাছা, তুমিও একটু হাত দাও, আমি তোমার ঘরকন্না গুছিয়ে দিয়ে যাই—'

শ্যামাকে অবশ্য আর হাত দিতে হ'ল না—সরকার-গিন্নী নিজেই সব গুছিয়ে দিলেন। জিনিসপত্র তাকে-কুলুঙ্গিতে সাজাতে সাজাতে বললেন, 'তোমার মা ত সংসার গুছিয়েই দিয়েছে দেখছি। তা বেশ আক্কেল আছে বাপু—মানতেই হবে। ...তবে একটা কথা বলছি বাছা, কিছু মনে ক'রো না, আর মনে করলেই বা কি—আমার কাঁচা মাথাটা ত কচ্ ক'রে কেটে নিতে পারবে না—তোমার মা-মাগীর

এমন অবস্থা, তোমরা ত শুনেছি বিবিদের মত লেখাপড়াও শিখেছ—এত বুদ্ধি তার ত জেনেশুনে এমন জানোয়ারের হাতে দিলে কেন ?'

এক কোণে হুঁকো-কল্কের পুঁটুলি খুলে নরেন তামাক সাজছিল, তার হাত থেমে গেল, দাঁত কড়মড়ও করলে একবার কিন্তু মনিবপত্নীকে কিছু বলতে সাহসে কুলোল না। শুধু কানটা খাড়া ক'রে রইল শ্যামা কি উত্তর দেয় তা শোনবার জন্য।

শ্যামার পক্ষে সে কথার উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়, সে বরং কথাটা চাপা দিয়েই বললে, 'মা, আলোর ত কোন ব্যবস্থাই নেই সঙ্গে—কী হবে ?'

'তার আর কি হয়েছে বাছা, আজকের মত একটা পিদিম তেলসলতে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। কাল বাজার থেকে খানিকটা রেড়ির তেল আনিয়ে নিও।...এখন চলো রান্নাঘরে—উনুন-টুনুন কাটিয়ে রেখেছি, কাঠকুটোও তৈরী। কাপড় কেচে এসে চাট্টি চাপিয়ে দাও। আমাদের এই বাগানের মধ্যেই পুকুর—খাসা জল, ঐ জলই আমরা সকলে খাই।'

ওদের ঘরের কাছেই বেশ একটা বড় চালাঘর, মাটির দেওয়াল মাটিরই মেঝে, তার দাওয়ায় একটা উনুন কাটা, ঘরেও আর একটা উনুন। সত্যিই ভদ্রমহিলা সব তৈরী ক'রে রেখেছেন। ঘরের মধ্যে একটা মাচাও তৈরী আছে, ভাঁড়ারের জিনিসপত্র রাখবার জন্য।

সরকার-গিন্নী নিজে সঙ্গে ক'রে পুকুরে নিয়ে গেলেন। বেশ বড় পুকুর কিন্তু চারপাশে বড় বড় গাছ থাকায় বড় নির্জন আর জলটা বড় কালো দেখায়। বাঁধা ঘাট আছে, তবে ইটের সিঁড়িতে শ্যাওলা জমে বড় বেশী, পিছলও।

'ভয় করছে নামতে ? এই নাও, আমার হাত ধরো। সাঁতার জানো না বুঝি ? ...আমার পিটকী আসুক, তোমাকে একদিনে সাঁতার শিখিয়ে দেবে।'

'তিনি কোথাও গেছেন বুঝি ?'

'হ্যাঁ—ছেলেমেয়েরা আমার কেউ ত নেই। সব মামার বাড়ি গেছে। আমার ভাইপোর বে। মায় আমার দেওরের ছেলেমেয়েরা সুদ্ধু।'

'তা আপনি যান নি ?'

'বেশ বলছ ত বাছা তুমি!' ওর নির্বুদ্ধিতায় যেন একটু বিরক্তই হন তিনি, 'আমার ঘরকন্না দেখবে কে! এই দিন-কাল, আমাদের এতবড় বনেদী সংসার, পাঁচটা জিনিস-পত্তর নিয়ে ঘর করি—যথাসর্বস্ব যাক্ আর কি! এই তাই কর্তা থাকেন তবু রাত্তিরে ঘুম হয় না, খুট্ ক'রে শব্দ হলেই জেগে উঠি।...দায়িত্ব কি কম ?'

তারপর নিজেই অন্য প্রসঙ্গে আসেন, 'ছেলেমেয়েগুলি তোমার দিব্যি বাপু,

বেশ ফুটফুটে। তা কোন্‌টার কি নাম রেখেছো বাছা?'

শ্যামা ওঁর উষ্ণ স্বরে ভয় পেয়ে গিয়েছিল, এখন হাঁপ ছেড়ে বললে, 'খোকার নাম হেমচন্দ্র, আর মেয়ের নাম মহাশ্বেতা।'

'ও বাবা, ও যে বড্ড বড় বড় নাম! ডাকো কি ব'লে?'

'ওকে হেম বলে ডাকি আর একে ডাকি মহা ব'লে।'

'তবু ওসব পোশাকী নামই হয়ে রইল। আমার আবার ছেলেমেয়েদের একটা আটপৌরে নাম না হলে ডেকে সুখ হয় না। ছাখো না, ছেলের নাম রেখেছি গুয়ে, হেগো, বাব্‌লা—মেয়েদের নাম পুঁটি, বুঁচি। উনি আবার তারে বাড়া। আমি নাম রাখলুম পুঁটি, উনি তাকে করলেন পিঁটকী! আবার আদরের বাহার শুনবে? রোজ আপিস থেকে এসে জামাকাপড় না ছেড়েই ত বাবুর সব আগে মেয়েকে আদর করা চাই, তা আদরের বুলি কি, না—পিঁটকিরাণী ঘটঘটানি, মরবে তুমি দেখব আমি! আমি আগে আগে গালমন্দ করতুম, আমাকে একদিন বুঝিয়ে দিলে যে বাপ-মা মর বললে পরমায়ু বাড়ে, সেই থেকে আর কিছু বলি না—'

পানদোক্তা-খাওয়া কালো এবং বড় বড় দাঁতগুলি মেলে সরকার-গিন্নী নিজেই হা হা ক'রে হেসে উঠলেন।

ততক্ষণে শ্যামার কাপড়চোপড় কাচা হয়ে গেছে। ঘরের দিকে রওনা হয়ে যেতে যেতে গিন্নী প্রশ্ন করলেন, 'তোমার নামটা ত শোনা হ'ল না বামুন মেয়ে।'

'আমার নাম শ্যামা।'

'ও ত আবার ঐ পোশাকী নামই হ'ল। আটপৌরে কিছু নেই?'

'সে মা ত রাখেন নি। এ মার যা খুশি রেখে নেবেন।'

'বা, বা! বেশ! বেশ কথাবার্তা তোমার বাপু, তা মানতেই হবে। হবে না কেন, নেকাপড়া-জানা মেয়ে যে। আমিও দত্তদের বাড়ির মেয়ে—তবে তখন একেবারেই মেয়েদের লেখাপড়ার চল ছিল না ত। এখন শুনছি ভূদেব মাস্টারের দল খুব উঠেপড়ে লেগেছে মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবে বলে—। কালে কালে কতই হ'ল।...আমার নাম মঙ্গলা তা বলে রাখি। আমাদের সব সেকেলে নাম, ঐ রকমই রাখা হ'ত তখন।—ছাখো না, দত্তদের বাড়ির মেয়ে পড়লুম সরকারদের ঘরে।...এরা হ'ল গে আমাদের চাকর বংশ, তা কী হবে বলো, পয়সারই জয়-জয়কার। এদের ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা—যেখানে পয়সা সেখানেই ইজ্জত। এর এক ঠাকুদ্দা আমাদের বাপের বাড়ি পাঁচ টাকা মাইনের চাকরি করত। আমাদের দৌলতেই পয়সার মুখ দেখলে। তা কি হবে বলো!'

হত-শ্রী বংশগৌরবের কথা স্মরণ ক'রেই বোধ হয় সরকার-গিন্নী একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেললেন।

দুই

রাসমণি যা চালডাল সঙ্গে দিয়েছিলেন তাতে দিনকতক চলল। কিন্তু তবু শ্যামা ওর স্বামীর নিশ্চিন্ত ভাবভঙ্গী দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। আধ সের মাত্র চাল পাওয়া যায় নিত্য-সেবার নৈবেদ্য থেকে—বাঁধা মাপ-করা ব্যবস্থা। তাতে ওদের দুবেলা কোনমতেই চলে না। নরেন বরাবরই ভাত খায় বেশী, ঠিক মেপে দেখে নি যদিও কোনদিন, তবু শ্যামার বিশ্বাস এক-একবারে সে-ই এক পোয়ার ঢের বেশী চাল খায়। এক্ষেত্রে এমন নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকার পরিণাম যে নিশ্চিত উপবাস।

শ্যামা ছেলেমেয়েদের মুখ চেয়েই বুকে সাহস আনে, স্বামীকে বলে, 'হ্যাঁগা, এদিকের কী করছ? মা যা দিয়েছিলেন তা ত ফুরিয়ে এল—তারপর?'

খিঁচিয়ে ওঠে নরেন, 'আরে রেখে দে তোর মার দেওয়া! সে মাগীর ভিক্ষের ভরসাতে আমি এখানে পরিবার নিয়ে এসেছি?'

'তা ত আনো নি—কিন্তু চলবে কিসে?'

'কেন, এই কদিনে নৈবিদ্যির চাল জমছে না?'

'তা জমলেও, সে আর কদিন! আর তা-ই বা জমছে কৈ? ভিজে আতপ চাল বলে রোজই ত রাত্তিরে সেই চাল রান্না হয়, খেয়ে টের পাও না?'

'কেন, কেন তা রান্না হয় শুনি? শুকিয়ে রেখে দিতে পারো না?'

'সে ত একই কথা হ'ল। ওগুলো শুকিয়ে তুলে রাখলে এগুলো ফুরিয়ে যেত তাড়াতাড়ি। তাছাড়া অব্যেস নেই, দুবেলা আলোচাল খেলে আমাশা ধরত যে!'

'হুঁ।' খানিকটা গুম খেয়ে থেকে বলে নরেন, 'তা নৈবিদ্যির সব চালই শোর পেটে গিলে বসে থাকছ!'

শ্যামার চোখে জল এসে যায় এই দুর্নামে। তবু এই লোকটার সামনে চোখের জল ফেলতে লজ্জা করে বলেই প্রাণপণে চেপে থেকে বলে, 'আমিই খাই, না? যা ভাত রান্না হয় তার চার ভাগের তিন ভাগেরও বেশি ত তুমি খাও। ছেলের আর আমার জন্যে কত কটা পড়ে থাকে! আমি না খেয়েও থাকতে পারি কিন্তু দুধ কমে যাবে তাহ'লে একেবারে, মেয়েটা খাবে কি! দুধ কিনে খাওয়াতে পারবে?'

'হ্যাঁ,—দুধ কিনে খাওয়াবে! হারামজাদী আমার স্বগ'গে বাতি দেবে কিনা!'

তারপর খানিকটা নিঃশব্দে বসে তামাক টানবার পর গলাটা একটু নামিয়ে বলে, 'এই ব্যাটারা কি কম! আমিও নরেন ভট্চাজ, আমার কাছে যে কথা

লুকুবে সে এখনও মায়ের গব্‌ভে। সব আমি টেনে বার ক'রে নিয়েছি—এই যে সম্পত্তিটা দেখছ এর সবটাই দেবোত্তর। ঠাকুরের ঐ আধ সের চাল আর আটখানা বাতাসা ঠেকিয়ে দিয়ে নিজেরা দিব্যি নবাবী মারছেন! সম্পত্তিটার আয় একটুখানি? কেন, পারে না আর আধ সের চাল বাড়িয়ে দিতে? দেবো একদিন হাটে হাঁড়ি ভেঙে—সব ওস্তাদি বেরিয়ে যাবে।'

তার এই নিবুর্দ্ধিতা শ্যামার সহ্য হয় না। সে বলে ফেলে, 'তাতে তোমার কি সুবিধে হবে? পারবে মামলা-মকদ্দমা করতে? না, করতে পারলেও তোমার চাকরি থাকবে? তুমি কি খাবে তাই ভাবো।'

'তুই থাম্‌ মাগী। মেলা ফ্যাচ্‌ ফ্যাচ্‌ করিস নে। আমার মাগ ছেলে কি খাবে না খাবে সে আমি বুঝব। খেতে দিই খাবি, না হয় শুকিয়ে থাকবি। যা করব —চুপ ক'রে থাকবি। একটা কথা কইবি নি, তোর কথার ধার ধারি না আমি।'

অগত্যা চুপ ক'রেই থাকতে হয়। যদিচ ওদের ঘর এক প্রান্তে তবু বাবুদের ছেলেমেয়েরা সর্বদা আসছে যাচ্ছে, তাদের সামনে মারধোর—সে বড় অপমান।

তবু রাসমণির দেওয়া চাল যেদিন নিঃশেষে ফুরিয়ে গেল, সেদিন কথাটা আর একবার পাড়তেই হ'ল। সব শুনে মুখটা বিকৃত ক'রে নরেন আর একবার তামাক সাজতে বসল। এটাও আগে আগে শ্যামাকে ফরমাশ করত কিন্তু পছন্দ হয় না বলে আজকাল নিজেই সেজে নেয়। নিঃশব্দে কিছুক্ষণ তামাক খেয়ে উঠে আলনা থেকে গামছা আর উড়ুনিটা কাঁধে ফেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

এখানে আসার পর এই প্রথম নড়ল নরেন। শ্যামা ভাবলে নিশ্চিত উপবাসের সামনে দাঁড়িয়ে বোধ হয় খানিকটা চৈতন্য হয়েছে ওর—সে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল!

কিন্তু প্রভাত ক্রমশঃ দ্বিপ্রহরে, দ্বিপ্রহর অপরাহ্নে,—অপরাহ্ন সন্ধ্যায় শেষ হ'ল তবু নরেনের দেখা নেই। রাত্রিতে শীতল দেওয়ার সময় হয়ে এল। শীতলের দুধ জ্বাল দিয়ে দিতে হয় ব'লে ওর কাছেই আসে—শ্যামা বহু রাত্রি পর্যন্ত দেখে নিজেই দুধ বাতাসা নিয়ে গিয়ে ঠাকুরঘরে নিবেদন ক'রে দিয়ে এল। মন্ত্র জানে না—চোখের জলে সে ত্রুটি পূরণ ক'রে নিয়ে মনে মনে জানালে, 'অপরাধ নিও না ঠাকুর, সবই ত বুঝছ—নিজগুণে এই গ্রহণ করো।'

তখন আর উপায়ও ছিল না। মনিবদের কথাটা জানাতে ভরসা হ'ল না—এত রাত্রে কোথায় কাকে পাবেন তাঁরা—শেষ পর্যন্ত ঠাকুর হয়ত উপবাসী থাকবেন, আর সেই অপরাধে এই আশ্রয়টুকুও হয়ত যাবে। বাধ্য হয়েই ঠাকুর দেবতাকে

নিয়ে এই মিথ্যাচরণ করতে হ'ল—সেজন্য বার বার শিউরে উঠতে লাগল ওর অন্তরাত্মা।

কিন্তু রাত যখন আরও গভীর হয়ে এল—(কত রাত তা জানবার পায় নেই, ঘড়ি এখানে নেই, কারুর ঘড়ির শব্দ কানেও যায় না। দূরে কোন্ একটা কলে ভোঁ বাজে একবার রাত চারটেয়, একবার সকাল আটটায় আর একবার বেলা চারটেয়। এই ওর একমাত্র সময় জানবার উপায়) তখন আর থাকতে পারলে না। সমস্ত বাগানটা অন্ধকারে ভয়াবহ হয়ে ওঠে প্রতি রাত্রেই, সেই নীরন্ধ্র নিঃসীম অন্ধকারে যখন জোনাকি জ্বলে আর ঝিঁঝি পোকা ডাকে তখন প্রত্যহই ওর বুকের মধ্যে ভয়ে গুর্‌গুর্ করে। গুপ্তিপাড়ায় থাকতে জোনাকি আর ঝিঁঝি পোকা অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল কিন্তু এখানের ঝিঁঝি পোকা যেন বড় বেশি ডাকে, তেমনি ব্যাঙ্‌গুলো ঘ্যাঙর ঘেঁা করে সারারাত। তবু অন্য দিন নরেন থাকে—আজ একা এই ঘরে, বিজন বনের মধ্যে শুধু এই দুটি শিশু পুত্রকন্যা নিয়ে থাকতে যেন কিছুতেই সাহসে কুলোল না। সে মরীয়া হয়ে ঘরে তালা লাগিয়ে ভেতরে গিয়ে মঙ্গলার শরণাপন্ন হ'ল। মিছে কথাই বললে, 'মা, উনি শেতল দিয়েই যে কোথায় বেরোলেন——এখনও ত ফিরলেন না, একা কি ক'রে থাকব ?'

'তাই ত ! বেরোল আবার কোথায়, এত রাত্রে ! ছোঁড়ার আক্কেল ব'লে যদি কিছু আছে ! ভর-যুবতী বৌ ঘরে—এই এত রাত্রে, বাগানের একটেরে— তাই ত ! দেখি যদি হরির মা তোমার ঘরে শুতে রাজী হয়। তোমাদের যা বিছানা বাপু, আমার ছেলে-মেয়েরা শুতে রাজী হবে না।'

চকিতে ওদের কলকাতার বাড়ির শিমুলতুলোর পুরু গদি আর ধপ্‌ধপে চাদরের কথাটা মনে পড়ে যায়। রাসমণি দরিদ্র হ'লেও জমিদারীর অভ্যাস কতকগুলি ছাড়তে পারেন নি এখনও, তার মধ্যে বিছানার বিলাস একটি।...ওর শ্বশুর-বাড়িতেও খাট-পালঙ্কের ছড়াছড়ি ছিল—নিজের চোখেই দেখেছে শ্যামা।

সে একটা উদ্গত নিঃশ্বাস দমন ক'রে বললে, 'না মা, শুতে কাউকে হবে না। একটু কান রাখবেন। একা রইলুম যদি ভয়-টয় পাই—একটু সাড়া দেবেন।'

'অ !' অপ্রসন্ন কণ্ঠে মঙ্গলা বলেন, 'হরির মা ঝি বলে বুঝি তাকে বিছানায় নিয়ে শুতে মানে বাধল। তা ঝি হোক—ওর গায়ে জল আছে বাপু তা মানতেই হবে। আর কৈবত্তর মেয়ে, সৎ জাত, এমন কিছু ময়লা কাপড়ও পরে থাকে না... সে দ্যাখো, যা তোমার খুশি। তা ব'লে আমি ছেলেমেয়ে ও ঘরে পাঠাতে পারব না।'

অপরাধিনীর মত মাথা হেঁট ক'রে বেরিয়ে এল শ্যামা। ফল কিছুই হ'ল না—

মাঝখান থেকে কথাটাই জানাজানি হয়ে গেল।

সেদিন রাত্রে খাওয়া হ'ল না কিছু। সকালেও ভাত খায় নি, নরেনের জন্য অপেক্ষা ক'রে বসে ছিল—সেই জল দেওয়া ভাতই হেমকে এক গাল খাইয়ে, মেয়েকে দুধ খাইয়ে নিজে শুধু বাতাসা মুখে দিয়ে এক ঘটি জল খেয়ে শুয়ে পড়ল।

পরের দিন সকালেও নরেনের দেখা নেই। বেলা আটটা নাগাদ পুঁটুরাণী দেখা দিলেন, 'কি গো বামুন-দি, ভট্‌চাজ মশাই ফিরেছে?'

পুঁটু বা পিঁটুকী সত্যিই শ্যামার চেয়ে বয়সে বড় কিন্তু তার বিশ্বাস অন্য রকম। তাই সে দিদি বলেই ডাকে, শ্যামাও প্রতিবাদ করে না। ওর বিয়ে হয়েছে, ছেলেমেয়েও হয়েছে। কিন্তু—কথাবার্তায় মঙ্গলার মুখেই শুনেছে শ্যামা—তাদের অবস্থা খুব ভাল নয় ব'লে বছরের দশ মাসই সে এখানে থাকে; মঙ্গলা আদরের মেয়েকে পাঠান না।

'মাগো, শুনলে অবাক্ হয়ে যাবে, বাসনমাজার একটা ঝি পর্যন্ত নেই। কায়েত-বাড়ির এমন দন্যিদশা হয় শুনি নি কখনও।...সে বাড়িতে মেয়ে পাঠাই কি ক'রে বলো? আমার আদরের বড় মেয়ে, সে কি বাসন মাজতে যাবে সে বাড়ি! ঘট্‌কী মাগীই সব্বনাশ করলে—মিথ্যে ভুচুং দিয়ে বিয়ে দেওয়ালে। কী বলব এদিক আর মাড়ায় না ভয়ে, নইলে আমি সত্য আঁশবঁটি দিয়ে নাকটা কেটে নিতুম, তবে অন্য কথা! না হয় জেল হ'ত আমার—এর বেশি ত নয়? তবে তাও বলি, দত্তবাড়ির মেয়েকে জেল দেয়, এমন জজ ম্যাজেস্টার এখনও জন্মায় নি।'

আপন মনেই এমনি বকে যান উনি—হয়ত বাসন মাজতে মাজতেই শোনে শ্যামা। আদরের মেয়ে সেও ছিল, এখনও তার বাপের বাড়িতে দিনরাতের ঝি আছে। কিন্তু সে কথা তোলা এখানে নিরর্থক...

পুঁটির প্রশ্নের উত্তরে ভয়ে ভয়ে ঘাড় হেঁট ক'রে শ্যামা জানায় যে নরেন ফেরে নি এখনও।

'তবেই ত চিত্তির! পুজোর কি হবে?' পুঁটি যেন একটা উল্লাসই বোধ করে শ্যামার এই বিপদে। কোথায় যে একটা কি কারণ ঘটেছে তা শ্যামা জানে না—পুঁটির একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষ সে অনুভব করতে পেরেছে এই ক-দিনেই।

'দাঁড়িয়ে আতান্তর বলো!' পুঁটি আরও খানিকটা অপেক্ষা ক'রে (বোধ হয় শ্যামার কাছ থেকে উত্তর পাবার আশা ক'রে) মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল, 'তখনই বলেছিলুম মাকে যে ঐ নেশাখোর মিনসেকে ঢুকিও না—ঠাকুরের সাত হাল হবে।'

আরও খানিক পরে এলেন মঙ্গলা নিজেই, 'হ্যাগা তা হ'লে কি হবে বলো,

ঠাকুর ত চচ্চড়ি হচ্ছেন এত বেলা অব্‌দি—সারাদিন ত আর টাঙিয়ে রাখতে পারি না।'

শ্যামা নিঃশব্দে মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে পায়ের নখ দিয়ে উঠোনের মাটি খোঁড়ে। কি জবাব দেবে সে? কি জবাব দেবার আছে? পৃথিবী যেন টলতে থাকে ওর পায়ের নিচে।

মঙ্গলা মুহূর্ত-কয়েক চুপ ক'রে থেকে বলেন, 'আছে এখানে আর একজন পুরুত বামুন, সে-ই পুজো করত, গাঁজাখোর ব'লে তাড়িয়ে দিয়েছি। বলো ত তাকেই ডাকি, যে-ক'দিন নরেন না আসে ঐ করুক। তবে তাকে নৈবিদ্যির চালটা পুরো ধরে দিতে হবে বাপু, তা আগেই ব'লে রাখছি। নইলে সে ব্যাগার দিতে আসবে কেন?...আমার বরাতই এমনি। ছোঁড়াকে কত ক'রে ঝুঝিয়ে বললুম যে, এখানে ত আরও ক-ঘর বামুন কায়েত আছে, ষষ্ঠী মাকাল পুজোও লেগে আছে সব ঘরেই —বলে বারো মাসে তেরো পাব্বন। ঘুরে ঘুরে যদি সব ক-ঘর না হোক্, আদ্দেকও ধরতে পারিস্ ত ভাবনা কি!...ঐ গাঁজা-খোর ভরসা, ওকে কেউই রাখতে চায় না। তা শুনলে আমার কথা?'

কাল থেকে খাওয়া হয় নি। আজকের চালগুলোও যাবে। শ্যামা একবার ব্যাকুল হয়ে ওঁর মুখের দিয়ে চেয়ে যেন কী বলতে গেল—শেষ পর্যন্ত বলতে পারলে না। কীই বা বলবে, যে পুজো করবে সে কেন চাল ছেড়ে দেবে? ওঁরা যে এই বন্দোবস্তেই রাজী হয়েছেন এই ঢের। এখনই যে তাড়িয়ে দেন নি, এই জন্যেই মনে মনে কৃতজ্ঞতা বোধ করল সে।

সেই ব্যবস্থাই হ'ল। পুরাতন ব্রাহ্মণ এসে বার বার সবাইকে শুনিয়ে গেলেন, 'নেশাই করি আর যাই করি, বামুন ত বটে। জাত সাপ। তাড়িয়ে দিলেই হ'ল! আবার ত শেষে সেই ডাকতে হ'ল। তা বাবু আমার এমন একটিনি করা পোষাবে না। ও যদি না করে ত পুজোটা আমাকেই দেওয়া হোক।'

হেম কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সকালে কতকগুলো কালোজাম তাকে খেতে দিয়েছিল শ্যামা। দুপুরে সকলে ঘুমোলে বাগান থেকে কতকগুলো ডুমুর পেড়ে এনে সেদ্ধ ক'রে নুন দিয়ে খাওয়ালে। নিজেও খানিকটা খেলে তাই। উপবাস করতে তার আপত্তি নেই কিন্তু মেয়েটার মুখ চেয়ে প্রাণপণে চোখের জল চেপেও সেই ডুমুরসেদ্ধ খেতে হ'ল!

পরের দিন আর সহ্য করতে না পেরে মঙ্গলাকে গিয়ে বললে, 'ছেলেটার মত একগাল চাল যদি দেন মা—নেতিয়ে পড়েছে একবারে।'

'ওমা, ঘরের বুঝি এমনি অবস্থা! একেবারে ভাঁড়ে মা ভবানী? তোমারও মুখ-

চোখ বসে গেছে যে, মুখে আগুন অমন সোয়ামীর। আমি হ'লে অমন সোয়ামীর মুখে জ্যান্ত নুড়ো জ্বেলে দিয়ে চলে যেতুম। খান্‌কী-খাতায় নাম লেখাতে হ'ত তাও ভাল। হাত্তোর বামুনের ঘর রে!'

এক রেক চাল বার ক'রে দিয়ে বললেন, 'এইতেই টিপে টিপে চালাও গে, সে ছোঁড়া কতদিনে আসে তার ঠিক কি!'

টিপে টিপে চালালেও এক রেক চাল এক রেকই। আরও দিন কতক উপবাসের পর একদিন নরেন্দ্রনাথ দেখা দিলে। কাঁধে একটা বস্তা, খালি পা—উড়ুনিখানাও নেই; পরনের কাপড়খানা যেমন ময়লা তেমনি শতছিন্ন, গামছাটা গায়ে জড়ানো।

ধপাস্‌ ক'রে বস্তাটা নামিয়ে রেখে প্রশান্ত কণ্ঠেই বললে, 'কৈ গো কোথায় গেলে,—একটু তামাক সাজো দিকি!'

তিন

ঘৃণা যখন আকণ্ঠ পূর্ণ হয়ে উপ্‌চে পড়ে তখন তিরস্কারের ভাষাও মুখ দিয়ে বেরোয় না। শ্যামারও উপবাস-শীর্ণ ঠোঁট দুটি বারকতক থর্‌থর্‌ ক'রে কাঁপল বটে কিন্তু একটি কথাও সে কইতে পারলে না, কিছুক্ষণ বৃথা চেষ্টা ক'রে ছুটে রান্নাঘরে গিয়ে উপুড় হয়ে পড়ল। ক্লান্তিতে, অবসাদে, দুঃখে ওর চৈতন্যও যেন এলিয়ে পড়েছিল।...

হাঁক-ডাকে মঙ্গলা নিজেই এলেন ছুটে। তাঁর সমস্ত লাঞ্ছনা চুপ ক'রে সহ্য ক'রে নরেন একটু হাসবারও চেষ্টা করলে। বললে, 'ও যে এত বোকা, সব ভাঁড়ার খালি ক'রে আমাকে বলেছিল তা কি ক'রে জানব! আমি ভাবলুম যে ঘরে মার দরুণ চাট্টি চাল রেখেই বলেছে হাঁড়ি খালি।...আর রোজগার করা কি মা এতই সোজা! কত ত ঘুরলুম, নিজেই কি সব দিন খেতে পেয়েছি ভাবছেন? তাহ'লে এমন ছিরি হয়?...জুয়া খেলে কিছু রোজগার করেছিলুম, আবার জুয়া খেলেই তা দিয়ে আসতে হ'ল। শেষে এই পনেরোদিন এক গোলদারী দোকানে খাতা লিখে নানান্‌ ভাঁওতা দিয়ে এই আধমণ ময়দা নিয়ে সরে পড়েছি। তা গেল কোথায়, রুটিই গড়ুক না খানকতক!'

'তোমার লজ্জা নেই, বেহায়ার একশেষ তা জানি বাছা, তোমাকে কোন কথা বলাই মিথ্যে। কিন্তু এমন ক'রে ত আমার চলবে না—তা ব'লে দিলুম। এরকম যদি করতে হয় ত পথ দ্যাখো। আমার ঘর খালি ক'রে দাও, আমি দোসরা লোক দেখি। বলে মরেও না, ছাড়েও না—আড়া আগলে পড়ে থাকে, এমন ধারা আমার চলবে না।'

'মাইরি মা, এই আপনার দিব্যি বলছি—আর হয়ত দু-একবার এমনি হবে। তারপর আমি একেবারে ভাল ছেলে হয়ে বসব এখানে এসে। আপনি দেখে নেবেন।'

বকতে বকতে মঙ্গলা চলে গেলেন। নরেন উঠে এসে শ্যামার হাত ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলে, 'নে নে, ওঠ্, আর অত ন্যাকামোয় কাজ নেই! খানকতক রুটি গড়্ দেখি ভালমানুষের মত!'

শ্যামা আঘাত পেলে কিনা বোঝা গেল না। খানিকটা কেঁদে সে বোধ হয় প্রকৃতিস্থ হয়েছিল, আঁচলে চোখ মুছে শান্ত কণ্ঠেই বললে, 'রুটি খাবে কি দিয়ে? ঘরে ডাল মশলা ত চুলোয় যাক—নুন তেল পর্যন্ত নেই!'

রাগে দাঁত কিড়মিড় ক'রে উঠল নরেন, 'উঃ! সব ঐ শোর পেটে গিলে আর গিলিয়ে বসে আছ! আ-স্তোর নিকুচি করেছে!...'

তারপর ওর মুখের কাছে হাত-পা নেড়ে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললে, 'বেশ করেছ, এখন শুধু খাও! আমি তার কি করব!'

শ্যামা মার কাছে থেকে যা নিয়ে এসেছিল তার পর যে নরেন আর এক ছটাকও ডাল মশলা নুন তেল কেনে নি—অনাবশ্যক বোধেই সে কথাটা আর স্মরণ করালে না সে। স্বামীর মুখের দিকে চাইলেও না—একটা গামলাতে খানিকটা ময়দা বার ক'রে নিয়ে মাখতে বসল।

কে জানে কেন—ওর এই নীরব উপেক্ষা আজ নরেনের চোখে পড়ল, সে খানিকটা চুপ ক'রে ওর গতিপথের দিকে চেয়ে থেকে নিজেই তামাক সাজতে বসল, তারপর বেশ একটু উচ্চকণ্ঠেই মন্তব্য করলে, 'হুঁ—তেজ হয়েছে, তেজ! তেজ ভাঙব যেদিন, বুঝবি!'

দিন দুই-তিন ঘরে বিশ্রাম করলে নরেন। আগেকার পুরোহিতকে নিজেই ডেকে বললে, 'মাইরি দাদা, যে কটা দিন না আসি তুমি চালিয়ে নিও। দেখছ ত, আমি কাজের তালেই ঘুরছি। কোথাও একটা আট-দশ টাকার কাজও যদি পাই ত চলে যাবো—এখানে কি থাকব ভেবেছ? তাহ'লেই ত ষোল আনা তোমার হয়ে গেল, বুঝলে না?...কাজেই গোল ক'রো না কিছু—আমি কাজটা তোমাকেই দেওয়াতে চাই।'

এর ভেতরে সে কোথা থেকে কিছু ডাল নুন তেলও যোগাড় ক'রে এনেছিল। চারদিনের দিন বৌকে ডেকে বললে, 'ভাঁড়ার সব গুছিয়ে দিয়ে গেলুম—নাকে কাঁদবি না, খবরদার! আমি আবার এখন দিনকতক ঘুরব। দেখি যদি কাজ-টাজ পাই।'

এখনই যে সে যেতে চাইবে শ্যামা তা ভাবেনি। সে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অতিকষ্টে যখন কণ্ঠস্বর ফিরে এল তখন বললে, 'তুমি আবার চলে যাবে?...আমাদের কে দেখবে?'

'দেখবে আবার কে? তুই কচি খুকী নাকি? দোরে খিল দিয়ে শুবি—আমি, আমি এই দিন চার-পাঁচের মধ্যেই ফিরব।'

এরপর ফিরল নরেন একেবারে দেড় মাস কাটিয়ে। অলঙ্কার বিশেষ কিছুই ছিল না। এবার মা আসবার আগে নতুন ক'রে কানের দুটো মাকড়ী, নাকের নথ এবং দুগাছা বালা দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। উপবাস সহ্য করতে না পেরে শ্যামা মাকড়ী দুটো মঙ্গলা ঠাকরুনের কাছে বাঁধা রাখতে বাধ্য হয়েছিল। তবুও তার ছেলের এবং নিজের দেহের যে অবস্থা হয়েছে তাতে চিনতে পারবার কথা নয়। নরেনও কিছুক্ষণ অবাক্ হয়ে তাকিয়ে থেকে একটু যেন অনুতাপের সুরেই বললে, 'ইস্, কি চেহারা হয়েছে রে তোর ছোট বৌ, খেতে-টেতে পাস্ নি বুঝি!...এত বড় লোকের আশ্রয়ে রেখে গেছি—বামুনের মেয়ে, তোরা ত হলি গিয়ে শুদ্দুর, কায়েত। তোদের বাড়ি আমার ঠাকুর্দা থাকলে পা ধুতেও আসতুম না।...তোরা চাট্টি চাল দিতে পারিস নি? চামার! চামার! চোখের পর্দা নেই এতটুকুও।'

খানিকটা গজগজ ক'রে বাঁ হাতের পুঁটুলিটা নামিয়ে রাখলে। ডান হাতে ছিল গালা-মাখানো একটা মাটির ভাঁড়—তাতে খানিকটা ঘি। সেটা শ্যামার হাতে দিয়ে বললে, 'পরশু একটা ছেরাদ্দর কাজ জুটেছিল—তারই ঘি। খাসা গাওয়া ঘি, আধসেরের কম নয়। আর ঐ নে, ওতে ভুজ্যির চাল ডাল আনাজপাতি মশলা দুখানা কাপড়—সব আছে। মায় আজ নেমন্তন্নের একটা মাছ পর্যন্ত।...ভাল ক'রে রান্নাবান্না কর্।'

এবারেও শ্যামা কোন কথা কইলে না। শুধু যে ঘৃণা করে ওর তাই নয়—এতদিনে সে সম্পূর্ণ বুঝেছে যে এ পশুর সঙ্গে চেঁচামেচি করা সম্পূর্ণ অনর্থক। জীবনের স্বাদ তার ঘুচে গেছে—আনন্দ দুঃখ এই বয়সেই যেন আর দাগ কাটে না। শুধু হেম আর মহাশ্বেতার মুখ চেয়ে কোনমতে প্রাণধারণের উপায় খুঁজে বেড়ায় সে এখন দিনরাত।

মঙ্গলা কিন্তু শ্যামার সহজ নিস্তব্ধতা সুদসুদ্ধ পুষিয়ে নিলেন। বললেন, 'এবার এসেছ—মাগ ছেলের হাত ধরে যে পথ দিয়ে ঢুকেছিলে সেই পথ দিয়ে বেরিয়ে যাও। এমন ক'রে আমি পারব না—সাফ কথা। আর সহজে না যাও ত পুলিস ডাকব বলে দিলুম।'

প্রথম সমস্ত বকুনিটা নরেন শুনেছিল চুপ ক'রেই, কিন্তু এই কথায় সে যেন ছিটকে তিড়িং ক'রে লাফিয়ে উঠল, 'ডাকুন না পুলিস। ঠাকুরের সম্পত্তি নিজেরা সব দুধে-মাছে খাচ্ছেন আর ঠাকুরের জন্যে ঠেকিয়ে রেখেছেন আধ সের চাল!...লজ্জা করে না আপনার! আপনার কি, আমি ত একটিনি দিয়ে গেছি। কাজ পেলেই হ'ল।...পুলিস ডাকবেন! এখনও চন্দর-সূয্যি উঠছে—বুঝলেন, হাজার হোক আপনারা শুদ্দুর আর আমরা বামুন! যদি বেরোতে হয় পৈতে ছিঁড়ে বেরিয়ে চলে যাবো। ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করেন, সবাই মুখে রক্ত উঠে মরে যাবে এই বলে দিলুম!'

মঙ্গলা অভিযোগে ততটা ভয় পান নি যতটা পেলেন এই অভিশাপের সম্ভাবনায়। মুখ শুকিয়ে উঠল তাঁর। গলাটাও অনেকটা নামিয়ে গজগজ করতে করতে চলে গেলেন নিজের বাড়ির দিকে। তিনি অদৃশ্য হয়ে যেতেই নরেন যেন মনের খুশিতে একপাক নেচে নিয়ে হি হি ক'রে হেসে বললে, 'দেখলি কেমন জোঁকের মুখে নুন পড়ল! তুই ত ভেবেই খুন। যখন যাবো নিজের খুশিতে যাবো। তা ব'লে ওরা তাড়াবার কথা বলবে! ইস, বলুক দিকি! এক তুড়িতে উড়িয়ে দেবো না!'

সন্ধ্যা পর্যন্ত টানা খানিকটা ঘুম দিয়ে উঠে বসে প্রথমেই নরেন ফরমাশ করলে, 'অনেকদিন ভালমন্দ খাই নি। আজ খানকতক লুচি ভাজ্ দিকি আমার মত। লুচি আর আলুর দম। তোরাও না হয় দুখানা ক'রে খাস।'

শ্যামা একটু অবাক্ হয়ে তাকিয়ে থেকে বললে, 'কিন্তু ময়দা পাবো কোথায়? তোমার ও পুঁটুলিতে ত ময়দা ছিল না!'

'সে কি! কেন, সেই যে ময়দা ছিল আধ বস্তা!'

শ্যামার বাক্‌রোধ হয়ে এল বিস্ময়ে, 'সেই ময়দা আজও থাকবে? তুমি কদ্দিন বাড়িছাড়া হিসেব করেছ? আর কী রেখে গিয়েছিলে? ছেলেমেয়েদের বাঁচাই কী দিয়ে? মাকড়ী-জোড়া রেখে সরকার-গিন্নী চার টাকা দিয়েছিলেন, তাও ত সব চলে গেছে। এই তিনদিন কুমড়ো আর ডুমুরসেদ্ধ খেয়ে আছি আমরা। ওদের বাগান থেকে চুরি ক'রে আনতে হয়েছে কুমড়ো।...আমাদের দিন কী ক'রে চলে তার কোনদিন হিসেব রেখেছ? আমি মরি তাতে দুঃখ নেই একটুও—ছেলেমেয়েগুলোকে ত তুমি এনেছ সংসারে! তাদের কথাও ভাবো কোনদিন?'

বলতে বলতে এতদিনের জমাট-বাঁধা দুঃখ যেন অন্তরের শাসন ভেঙে দুই চোখের কূল ছাপিয়ে বেরিয়ে এল। কান্নায় গলা বুজে এল শ্যামার।

কিন্তু সে অশ্রুর প্রতিক্রিয়া হ'ল নরেনের ওপর ঠিক বিপরীত। সে যেন জ্বলে উঠল, 'তাই ব'লে তুমি সেই আধ বস্তা ময়দা নুন-তেল দিয়ে সবাইকে গিলিয়ে বসে আছ! ছেলেমেয়ে, ছেলেমেয়ে আমার স্বগ্‌গে বাতি দেবে!...হারামজাদা, শুয়োরের বাচ্ছা সব!'

শ্যামারও ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল এবার। সেও কণ্ঠস্বর বেশ একটু চড়িয়েই বললে, 'তুমি ত চারদিন খেয়ে তবে এ বাড়ি থেকে গেছ। দু'বেলা তিনটে লোক ময়দা খেলে আধ মণ ময়দার কত বাকী থাকে?'

'দেখাচ্ছি কত বাকী থাকে! ঐ গোরাবেটার জাতকে আগে এক এক কোপে সাবাড় করি, তারপর তোকে কেটে যদি ফাঁসি না যাই ত আমি বামুনের ছেলে নই!'

এই বলে মুহূর্ত-খানেক এদিকে ওদিকে চেয়েই ঘরের কোণ থেকে কাটারিখানা তুলে নিয়ে উঠোনে বেরিয়ে এল, 'কৈ, কোথায় গেল সে বেটা-বেটিরা? আজ তাদের শেষ ক'রে তবে অন্য কাজ।'

চরম বিপদের সময় একরকম মরীয়া হয়ে ওঠে মানুষ, সাহস ও বুদ্ধি দেখা দেয় অপ্রত্যাশিত ভাবে। রান্নার জন্য বাগান থেকে কুড়িয়ে আনা কয়েকটা গাছের ডাল ছিল ঘরের কোণে, অকস্মাৎ তাই একটা তুলে নিয়ে শ্যামাও বাইরে বেরিয়ে এল প্রায় ছুটে, তারপর অপ্রত্যাশিত দৃঢ় কণ্ঠে বললে, 'নামাও বলছি কাটারি, নইলে আমি ঠিক মাথা ফাটিয়ে দেব।...নামাও!'

কী ছিল সে কণ্ঠে তা নরেন না বুঝলেও এটুকু কেমন ক'রে অনুভব করলে যে, আজ এই মুহূর্তে শ্যামার পক্ষে সবই সম্ভব। হয়ত সে নিজের মনে মনেই বুঝেছিল যে স্ত্রীর ধৈর্যের ওপর চরম আঘাত সে হেনেছে। আস্তে আস্তে উদ্যত হাত নামিয়ে কাটারিখানা উঠোনেই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে, 'আচ্ছা আজ থাক। কিন্তু তোদের মৃত্যুর আর বেশি দেরি নেই তা বলে দিলুম।'

এক

উমাদের খালি বাড়িটা যেন উমাকে ভ্যাংচায়। এক এক সময় সে ভাবে তার মুখের দিকে চেয়ে হা-হা ক'রে হাসছে নোনাধরা দেওয়ালগুলো। সত্যি সত্যিই যেন হাসির আওয়াজ পায় সে। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে উমা। আজকাল এই চিন্তাটা তার বড় বেশি হয়েছে—সে পাগল হয়ে যাচ্ছে নাকি!

মাঝে মাঝে নাকি সে আপন মনে বকেও। অন্তত মা তাকে একাধিক দিন তাই বলেছে। তিনিই চমক ভেঙে দিয়েছেন। কিন্তু তার ত মনে পড়ে না—কখন মনের কথাগুলো ঠোঁটের ওপর নাচে অমন ক'রে!

মাঝে মাঝে তার মনে হয় স্বামীর কথা। অমন সুপুরুষ স্বামী তার! কার্তিকের মতই রূপবান...একবার তার মনে হয়, না-ই বা স্বামী তাকে নিয়ে ঘর করলেন—শ্বশুরবাড়ি না-ই বা যেতে পেলে সে—এক-আধবারও যদি তিনি আসতেন সে ধন্য হয়ে যেত। দুটি একটি রাত্রির সঙ্গলাভও যদি সে করতে পারত। আত্মসম্মান নয়—অভিমান নয়, কোনপ্রকার অনুযোগেও সে বিব্রত করত না স্বামীকে, কোন কৈফিয়ত চাইত না। কোন দায় চাপাত না—বোঝার মত ঘাড়ে চাপত না।

সন্তান?

সন্তান হ'লে সে পরের বাড়ি রাঁধুনীগিরি ক'রে কিংবা দাসীবৃত্তি ক'রে মানুষ করত। স্বামীকে কিছু বলত না। একবার আসুক না শরৎ, এসেই দেখুক না। এই ত ঝি বলছিল, 'কত পুরুষ ত বাইরের মেয়েমানুষ রেখেছে, তাই বলে কি ঘরের বৌ নিয়ে ঘর করে না তারা? এ আবার কেমনতারা অনাছিষ্টি কাণ্ড বাপু!...কোন্ পুরুষের আজকাল বার-দোষ নেই? এ ত শহর-বাজার জায়গা—আমাদের পাড়া-গাঁয়েও দেখ গে যাও ঘর-ঘর এই সব কীত্তি? কিন্তু মেয়েমানুষের বাড়ি পড়ে থাকা—এমন সোন্দর বৌ—তা দেখা নেই ছোঁওয়া নেই—এমন কখনও শুনি নি!'

তারই অদৃষ্টে এমন অনাসৃষ্টি কাণ্ড।

একবার কাছে পেলে সে স্বামীর পায়ে ধরেও রাজী করাত।

কিন্তু কোথায় সে? কোন খবর পর্যন্ত পায় না। শুনেছে যে আজকাল নাকি সে বাড়িতেও আসে না—মাকে একটা পয়সা পর্যন্ত দেয় না। তার সেই মেয়ে-মানুষের বাড়ি খোঁজ করতে যাওয়া কিংবা ছাপাখানায় যাওয়া? ছিঃ, সে তা পারবে না!

তাছাড়া সে সম্ভব নয়। প্রথমত সে তার ঠিকানাও জানে না। দ্বিতীয়ত মার কাছে এ কথা পাড়লে—? দুখানা ক'রে কেটে ফেলবেন তিনি।

মনে মনে এই সব কথা আলোচনা করে যখন, তখন বোধ হয় মুখ কখনও কখনও নড়ে ওঠে—সে টের পায় না। লজ্জিত হয়ে প্রতিজ্ঞা করে—আর কখনও এমন অন্যমনস্ক হবে না।

মাস কতক পরে উমার তবু একটা কাজ জুটল। মানে, সময় কাটাবার কাজ। পাড়ায় একটা বস্তি ছিল, হঠাৎ সেটা ভেঙে ফেলতে শুরু করলে। শোনা গেল ওখানে

নাকি একটা নতুন থিয়েটার-বাড়ি তৈরী হবে।

থিয়েটার? সেটা আবার কি?

'ঐ যে,'—ঝি হাত-পা নেড়ে বললে, 'নাটক হয় গো, নাটক! পেলে হয়! সব রং-চং মেখে বেরোয়, নাচগান কথা-বাত্তারা হয়, তারপর আবার যে যার বাড়ি চলে যায়। যেমনকে নিঝ্ঝুম তেমনি। জানো না!'

উমা দেখে নি কখনও থিয়েটার—তবে নাটক সে পড়েছে দু-একখানা। ব্যাপারটা ঝাপ্সা ঝাপ্সা আন্দাজ করবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাতে অন্য দিক দিয়ে কৌতূহল কমবার কোন কারণ ঘটে না। বাড়িটা হচ্ছে ওদের গলিটা যেখানে বড় রাস্তায় গিয়ে পড়েছে তারই কাছাকাছি—উল্টো দিকটায়। ওদের ছাদ থেকে খানিকটা স্পষ্ট দেখা যায়। উমা আজকাল অবসর পেলেই ছাদে গিয়ে দাঁড়ায়। হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকে। কী দেখে তা সে জানে না। মিস্ত্রী খাটে, মজুররা যোগাড় দেয়। একটি বাবু দিনরাত দেখাশোনা করেন আর মিস্ত্রীদের গাল দেন, তার ভাষা এখানে এসে পৌছয় না—অঙ্গভঙ্গীটা লক্ষ্য করা যায়। আর আসে সবটা মিলিয়ে একটা কোলাহল। অদ্ভুত, অপূর্ব লাগে উমার। তবু একটা বৈচিত্র্য, তবু একটা প্রাণচঞ্চলতা। ঐখানে দাঁড়িয়ে থাকাটা যেন নেশায় দাঁড়িয়ে যায় ওর।

রাসমণি বকেন, কিন্তু খুব জোরে নয়। বড়জোর বলেন, 'আ মরণ! একটা বাড়ি উঠছে, মিস্ত্রী খাটছে, তার মধ্যে এমন কি মজা আছে তা ত বুঝি নে। দিন-রাত রোদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অসুখ করবে যে। রং ত পুড়ে যাচ্ছে একেবারে।'

বেশী কিছু বলেন না। ও যে কত দুঃখে এইটে নিয়ে ভুলে থাকতে চায় তা তিনি মায়ের প্রাণে ভালই বোঝেন।

কিন্তু এরা বাড়িই তৈরী করাচ্ছে। থিয়েটারের লোক এরা নয়, তা উমা বোঝে।

মধ্যে মধ্যে একটা গাড়ি চেপে একটি বাবু আসেন তদ্বির করতে, হয়ত তিনিই মালিক।...থিয়েটারের লোক কেমন? এমন কি সাধারণ মানুষের মতই? কে জানে? ওর কৌতূহলী মন কল্পনায় তাদের বিচিত্র মূর্তি আঁকে।

অবশেষে—থিয়েটারের বাড়ি শেষ হয়ে আসার মুখে অপ্রত্যাশিত ভাবে সত্যিকার থিয়েটারের লোক এসে হাজির হয় ওদের বাড়ি।

একদিন ঝি এসে রাসমণিকে বললে, 'একটি বুড়ো গোছের বাবু এসেছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।' রাসমণি বিস্মিত হয়ে মাথায় ঘোমটা দিয়ে নেমে এলেন, উমাকে বার বার সতর্ক ক'রে দিলেন—নিচে না উঁকি মারে সে।

কিন্তু উমার কৌতূহল অদম্য। সে সিঁড়ির ওপরদিককার একটা ধাপে প্রায়

শুয়ে পড়ে একটা খাঁজ দিয়ে চেয়ে থাকে। সে দেখতে পায় ঠিকই কিন্তু তাকে দেখা যায় না। যে লোকটি এসেছিলেন তিনি ভেতরে এসে দাঁড়ালেন। বুড়ো নয় মোটেই—বেশ শক্তসমর্থ জোয়ান লোক। হয়ত বড়জোর চল্লিশ বয়স। কিন্তু মাথার চুলগুলো সব সাদা হয়ে গেছে অল্প বয়সেই। লম্বা দোহারা গঠন, সাদা থান-ধুতির কোঁচা সামনে পাট-করা গোঁজা—সাদা চীনে কোট গায়ে, তাতে বোতামের ঘরের দুদিকে চমৎকার সুতোর কাজ করা, পায়ে শুঁড়-তোলা চটি। সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক।

ভদ্রলোক ভেতরে এসে নমস্কার ক'রে দাঁড়ালেন হাত জোড় ক'রে, 'মা, আমি আপনার কাছে একটি ভিক্ষা নিয়ে এসেছি।'

রাসমণি বললেন, 'বলুন!'

'জানেন বোধ হয় যে এইখানে, এই মোড়ে একটা থিয়েটার-বাড়ি হচ্ছে। ওটা এখনও শেষ হয় নি অথচ এদিকে দেরি হয়ে যাচ্ছে বলে আমরা রিহার্স্যাল—মানে মহড়া শুরু করেছি। কিন্তু এখানে এখনও পাইখানা-কল কিছুই তৈরী হয় নি। এতগুলো লোক আসবে—একটু খাবার জলও দরকার—আমাদের চাকরকে রোজ দু-তিন ঘড়া খাবার জল নেবার অনুমতি দেন ত এতগুলি প্রাণীর জীবনটা বাঁচে।'

রাসমণি বিপন্ন মুখে খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'জল চাইলে না বলতে নেই—কিন্তু বাবা, একা মেয়েছেলে একটা সোমত্ত মেয়ে নিয়ে ঘর করি—থিয়েটারের লোক বাড়ি এলে কে কী বলবে—বড় ভয় পাই।'

সে ভদ্রলোক বললেন, 'মা, পাড়ার এখানে আর কারো বাড়ি কল নেই আমি খবর নিয়ে জেনেছি। তা থাকলে কিছুতেই আপনাকে বিরক্ত করতুম না। তাছাড়া, থিয়েটারের লোক সবাই ত খারাপ নয় মা—আমি বামুনের ছেলে, ভদ্রলোকের ছেলে, লেখাপড়াও করেছি। পাথুরেঘাটা ঠাকুরবাড়ির দৌউত্তুর আমি।—চাকর এসে জল নিয়ে যাবে এক-আধ কলসী বৈ ত নয়। হিন্দুস্থানী বেয়ারা, তারাও সৎ জাত।'

রাসমণি একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'আচ্ছা, তাই হবে। এতে যদি পাড়ায় কোন কথা ওঠে কি আর কোন উপদ্রব হয় ত শেষ পর্যন্ত আমায় এ ব্যবস্থা বন্ধ করতে হবে, তা আপনাকে জানিয়ে রাখছি।'

ভদ্রলোক হেঁট হয়ে নমস্কার ক'রে বেরিয়ে গেলেন। মা এদিকে ফেরবার আগেই উমা নিঃশব্দে তার খাঁজ থেকে উঠে পালিয়ে গেল। তার বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করছে—ধরা পড়বার ভয়ে নয়, বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে—বিশেষত নিতান্ত যা কল্পলোকের বস্তু সেই থিয়েটারের সঙ্গে—যোগাযোগ স্থাপিত হবার সম্ভাবনায়।

দুই

রাসমণির একটা সুবিধা ছিল এই যে পাড়ার লোক কি বলছে না বলছে সেটা তাঁর জানবার বিশেষ সম্ভাবনাই ছিল না। তিনি কারও বাড়ি যেতেন না, তাঁর বাড়িতেও লোকে আসত কদাচিৎ। সাদিকরা আসতেন, তা তাঁরাও কারও কথায় থাকতেন না। ঝি তাঁর প্রায় দিনরাতের—পাড়ায় কেচ্ছা বহন ক'রে বেড়াবে এ আশঙ্কাও কম।

সুতরাং থিয়েটারের জল নেওয়ার ব্যবস্থাটা অব্যাহতই রইল। শুধু তাই নয়—রাসমণির অনিচ্ছাতেও ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাটা একটু বাড়ল। হঠাৎ একদিন একটি স্ত্রীলোক একেবারে হুড়মুড়িয়ে ভেতরে ঢুকে এসে বললে, 'মা জননী, রাগ ক'রো না মা—বড় বিপদে পড়েছি, আপনার ঐ দিকটা একটু ব্যবহার করব।' এই বলে সে কল-পাইখানার দিকটা দেখিয়ে দিলে।

ইচ্ছা থাকলেও বাধা দেবার উপায় ছিল না। চক্ষুলজ্জায় বাধে। তাছাড়া সে অনুমতি চাইলেও তার জন্যে অপেক্ষা করে নি। দামী শান্তিপুরী শাড়ির ওপরই কাঁধে একখানি গামছা ফেলে সেদিকে চলে গিয়েছিল।

তারপর সেখান থেকে ফিরে 'আঃ বাঁচলুম' বলে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে রাসমণির রান্নাঘরের সামনের রকে বসে পড়ে বলেছিল, 'একটা পান দেবে মা জননী? পান ফেলে এসেছি বাড়িতে।'

অগত্যা তাঁকে বলতে হ'ল,—'মেঝেতে বসলে মা! একটা আসন এনে দিক ঝি!'

জিভ কেটে মেয়েছেলেটি উত্তর দিলে, 'বাপ রে, আপনাদের আসনে বসতে পারি! আমরা নরকের কীট। অনেক জন্মের পাপ ছিল মা, এ জন্মে তাই এই সব ঘরে জন্মেছি, আবার কি বামুনের আসনে বসে পাপ বাড়াবো!'

নরম হয়ে আসে রাসমণির মন।

'তোমার নাম কি বাছা?'

'আমার নাম এককড়ি, মা। ছেলেবেলায় মা একটা কড়ি দিয়ে বেচেছিল। আমি ওদের থিয়েটারে য়্যাক্টো করি। বড় বড় পার্ট সব আমার মা—তোমাদের আশীর্বাদে।'

হাত জোড় ক'রে নমস্কার করে সে।

বেশ দেখতেও। শ্যামবর্ণের মধ্যে দিব্যি ছিরি, মনে মনে ভাবে উমা।

'এইটি বুঝি তোমার মেয়ে, মা? কী নাম ভাই তোমার? উমা? আহা, উমাই বটে! কী রূপ!'

অমনি দু একটা কথার পর সেদিনের মত সে উঠল। কিন্তু অতঃপর আর ওদের দলকে বাধা দেওয়া গেল না। আরও দু-একজন অমনি প্রাকৃতিক প্রয়োজনে আসতে শুরু করল। রাসমণি যদিও সেই প্রথম দিনের পর উমাকে বারণ ক'রে দিয়েছেন—'খবদ্দার, ওদের সামনে থাকিস্ নি। ওরা নাকি সব বেশ্যে, বেশ্যে ছাড়া এ কাজ করতে আসেই বা কে! আমি বুড়োমানুষ—সে একরকম, তুই ওদের সঙ্গে কথা কইলে ভারি নিন্দে হবে পাড়ায়। উমা তবু ভেবে পায় না যে সাধারণ মেয়েদের থেকে ওদের তফাত কোথায়। ভারি মিষ্টি কথাবার্তা, যেমন ভদ্র তেমনি বিনয়ী। সবাই ওর মাকে মা ব'লে দূর থেকে প্রণাম করে, ছোঁয়া যাবার ভয়ে পায়ে হাত দেয় না। অনেকখানি ব্যবধান রেখে বসে সবাই, মেঝেতেই বসে, জল খেয়ে আসে কল থেকে, ওদের ঘটি পর্যন্ত চায় না। এদের সঙ্গে মেশায় দোষ কি তা কিছুতেই বুঝতে পারে না সে। বেশ্যা বলতে কি বোঝায় তা সে ভাল জানত না, কিন্তু ইতিমধ্যে ঝি পুঁটির মার কৃপায় মোটামুটি বুঝে নিয়েছে। শুনে তারও ঘৃণা হয় বটে তবে মানুষগুলোকে দেখে সে-ঘৃণা আর সে রাখতে পারে না।

এককড়ি আজকাল ঘন ঘন আসে। প্রথম দিন যে ভদ্রলোকটি এসেছিলেন তাঁর পরিচয় ওর মুখেই পেয়েছে উমারা। চন্দ্রশেখর মুস্তফী নাম, খুব নাকি ভাল অভিনেতা—শিক্ষকও ভাল। এককড়ি বলে, 'ভারি কড়া ম্যাস্টার। বেত হাতে ক'রে বসে থাকে রিয়েশ্যালে। পান থেকে চুন খসলেই অমনি বেত পড়ে ছুঁড়িদের পিঠে। আমাকে অবিশ্যি কিছু বলতে সাহস করে না—আমি আবার ওর যে গুরু তাঁর কাছে শিখি কিনা।—তিনি হ'ল আবার এখন আমার শখের পতি। তবে আমিও মুস্তফীমশাইকে খুব ভয় করি।'

আবার কোনদিন হয়ত বলে, 'ঠিয়েটার খুলুক—আমি মা তোমাকে একদিন দেখাতে নিয়ে যাবো। এই ত দু মাস পরেই খুলবে।'

রাসমণি প্রবল বেগে ঘাড় নাড়েন, 'ওমা ছি, থিয়েটার দেখতে যাবো কি!'

'তাতে কি হয়েছে মা, ঠাকুর-দেবতার পালাই ত বেশির ভাগ। এই ধরো না—সীতের বনবাস। আমি সীতে সাজব। আমার যে গুরু তিনি সাজবে রাম। দেখবে কেমন হয়!'

এমনি আরও বহু কথা অনর্গল বকে যায় সে। নিজের ব্যক্তিগত জীবনের কথাও অনেক বলে। সে যেন এক নতুন রাজ্য—মানুষগুলোও আর এক রকমের প্রাণী। সে সব কথা বলবার সময় এককড়ির গলা নেমে এলেও উমা তা শুনতে পায়। শোনে আর শিউরে ওঠে। অথচ একটা যেন অদ্ভুত আকর্ষণও অনুভব করে

—না শুনেও পারে না।

একদিন এককড়ি একটু অসময়েই এসে গেল।

তখন বেলা দেড়টা হবে, রাসমণি ওপরে বিশ্রাম করছেন আর পুঁটির মা ঝিয়ের একান্ত অনুরোধে উমা তার মেয়ে পুঁটিকে প্রথম ভাগ পড়াবার চেষ্টা করছে। নিচের দোর কি কারণে খোলাই ছিল, ঝি হয়ত সামনের বাড়ির ঝির সঙ্গে গল্প করতে গেছে দোর খুলে রেখে, তাই এককড়ি কখন নিঃশব্দে একেবারে সামনে এসে পড়েছে তা কেউ টের পায় নি।

উমা চমকে উঠল, কিন্তু তার চেয়েও বিস্ময় এককড়ির।

সে গালে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে থেকে বললে, 'ওমা, তুমি লেখাপড়া জানো বুঝি! ঐটুকু মেয়ে দিব্যি গড়গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে গা! ওমা কি হবে, কোথায় যাবো!'

ঈষৎ একটু গর্ব বোধ হয় বৈকি। আর তার সঙ্গে করুণাও।

'তু—আপনি বুঝি জানেন না?' উমা সসঙ্কোচে প্রশ্ন করে।

'মোটেই না। আমাদের কে-ই বা জানে! একজন দুজন। বাকী সবাই গো-মুখ্যু। মেয়েছেলে কে বা লেখাপড়া শিখছে—তা আবার আমাদের ঘরের কথা—!'

আড়াল থেকে শুনে শুনে এদের অনেক কথাই উমার জানা হয়ে গেছে, তাই সে প্রশ্ন ক'রে বসল, 'তা পার্ট মুখস্থ করেন কি ক'রে?'

'আমাকে আপনি-আজ্ঞে কেন করছ? তুমি বামুনের মেয়ে তায় সধবা, আমাদের মাথায় পা রাখলেও আমাদের জন্ম সাত্থক্‌ হবে।...হ্যাঁ, তা যা বলছিলুম, পাট? পাট মুখস্ত করি শুনে। ঐ একজন পড়ে যায়, আমরা শুনে শুনে মুখস্ত করি। মুখস্ত কি হতে চায়? হয় না।'

তারপর একটু দম নিয়ে খানিকটা পানদোক্তা মুখে পুরে বলে, 'মা কোথায়?'

'ওপরে শুয়ে আছেন।'

'ঘুমোচ্ছেন?'

'না—ভাল ঘুম কখনও হয় না ওঁর। বই-টই পড়েন। নয়ত এমনি শুয়ে থাকেন। আজ এমন অসময়ে যে?'

তুমি বা আপনি বলার দায়টা কৌশলে এড়িয়ে যায় উমা।

'ওমা—মাও লেখাপড়া জানেন বুঝি? ও, তাই তোমরা লেখাপড়া শিখেছ।'

'না—তা কেন? আমরা যে পাঠশালায় পড়েছি।'

এককড়ি ওপর উঠে গিয়ে চৌকাঠে বসে পড়ে।

'মা জননী কৈ গো?'

বই পড়তে পড়তে বোধ করি রাসমণির একটু তন্দ্রা এসেছিল, ওর ডাকে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বলেন, 'ওমা, এসো এসো। ভেতরে এসে বসো না। ছি, চৌকাঠে বসতে নেই! তা এমন দুপুরে যে মেয়ে?'

'আজ একটা বাগানে যাবার বায়না আছে মা সন্ধ্যেবেলা, তাই দুপুরে রিয়েস্তাল বসেছিল। আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে কিনা—এখন গান গটানো হচ্ছে, আবার একটু পরে আমার ডাক পড়বে, তাই মা তোমার কাছে পালিয়ে এনু। বড্ড তেষ্টাটাও পেয়েছে।'

'আহা তা পাবে না, এই দুপুরবেলা ছোটাছুটি!'

রাসমণি উঠে দুটো নারকেল নাড়ু আর এক ঘটি জল দেন।

'জলটা আমার হাতে ঢেলে দিন মা।'

অপ্রতিভ হয়ে রাসমণি বলেন, 'না না—তুমি অমনি খাও। তাতে দোষ কি? তুমিও ত মানুষ!'

তবু সন্তর্পণে আলগোছে জল খেয়ে ঘটিটা এক পাশে নামিয়ে রাখে। তারপর একথা-সেকথার পর বলে, 'মা, একটা কথা বলব, বলো, রাগ করবে না?'

'না না—রাগ করব কেন? বলো না—'

'না মা। অপরাধ নিও না কিন্তু, সব দিক ভেবেই বলছি। তোমার মেয়ে উমা ত খুব লেখাপড়া শিখেছে—'

'খুব আর কৈ বাছা, ছাত্রবৃত্তি পাস করেছে।'

'ওমা—পাসও করেছে! তবে ত দিব্যি লেখাপড়া জানে!'

'ইংরিজি ত জানে না। আজকালকার মেয়েরা নাকি ইংরিজিও শিখছে কেউ কেউ।'

'তা ইঞ্জিরি চুলোয় যাক্। বলছিলুম কি, তোমার মেয়ে আমাদের লেখাপড়া শেখাবে? আমরা আট-দশটা মেয়ে শিখতে পারি। এক টাকা দু টাকা ক'রে যার যা ক্ষ্যামতা দেব, মাস গেলে পনরোটা টাকা আসবে হেসে খেলে। এক-সঙ্গেই শিখব, তাতে বেশি মেহনত হবে না। বড়জোর এক ঘণ্টা।'

দৃঢ়তরে সঙ্গে ঘাড় নাড়েন রাসমণি, 'না, সে হয় না। তাতে বড় নিন্দে হবে!'

'নিন্দে কিসের মা? লেখাপড়া শেখানোয় নিন্দে কিসের? তাছাড়া—' গলাটা একটু কেশে সাফ্ ক'রে নিয়ে এককড়ি বলে, 'তুমি ত দয়া ক'রে সবই বলেছ মা, আমার ত জানতে কিছুই বাকী নেই—এখন ত সারাজীবন পড়ে রইল মেয়েটার, তুমি চোখ বুজলে ও কি করবে তা ভেবে দেখেছ? হয় রাঁধুনীগিরি নয় ঝি-গিরি —নইলে বড়জোর বড় বোনের বাড়ি বিনে-মাইনের দাসীবিত্তি!'

রাসমণি বোধ করি একটু বিরক্তই হন এতটা অন্তরঙ্গতায়। ভ্রূ কুঁচকে বলেন, 'সে যা হয় হবে মা, কিন্তু এখন এই সোমত্ত মেয়েকে দিয়ে আমি টাকা রোজগার করাতে পারব না। তা ছাড়া তোমরা দশ-বারোজন দল বেঁধে রোজ সন্ধ্যেবেলা এখানে এলে—কিছু মনে ক'রো না—পাড়ার লোকে কি ভাববে?'

'বেশ ত, সন্ধ্যের পর না হয় গাড়ি পাঠিয়ে ওকে নিয়েই যাবো?'

এবার আর রাসমণির বিরক্তি চাপা থাকে না, তিনি বলেন, 'আমার মেয়ে যাবে থিয়েটারে—তোমার আস্পদ্দাও ত কম নয় মা! এসব কথা আর কোন দিন যেন না শুনি।'

অপ্রতিভ ভাবে এককড়ি বলে, 'সে-ভাবে থিয়েটারে যাবার কথা ত বলি নি মা, তুমি মিথ্যে রাগ করছ। তাছাড়া—আগেই ত বলিয়ে নিয়েছি যে রাগ করতে পারবে না!'

রাসমণি শান্ত হন কিন্তু কথার উত্তর দেন না। অপমানবোধের চাপা ক্রোধ নিঃশব্দ-দহনে জ্বলতে থাকে তাঁর ভেতরে ভেতরে।

এককড়ি আরও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে একসময় উঠে পড়ে।

কথাটা উমার কানেও গিয়েছিল, কারণ সে তখন সিঁড়ির মুখটায় দাঁড়িয়ে। এর তিন-চার দিন পরে সে সমস্ত সংকোচ এবং শঙ্কা বিসর্জন দিয়ে প্রকাশ্যেই বিদ্রোহ ঘোষণা করলে, 'আপনি ত সব কথাতেই না বলেন, কিন্তু সত্যিই আমার কি ব্যবস্থা করবেন তাই শুনি? আপনার যা পুঁজি, বড়জোর আর পাঁচ-সাত বছর এমন ক'রে বসে খেতে পারবেন। তারপর আপনি বা খাবেন কি আর আমিই বা দাঁড়াবো কোথায়?'

রাসমণি স্থির-দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে থেকে বললেন, 'বেশ, তোমাকে তোমার শ্বশুরবাড়িতে রেখে আসছি। তারপর তুমি যা খুশি তাই ক'রো।'

'কেন সেখানে যাব আমি? খুন হ'তে? আপনারাই ত দেখে-শুনে বিয়ে দিয়েছেন। তার দায় বুঝি আমার?'

'সে তোমার অদৃষ্ট!—আমরা ত চেষ্টার ত্রুটি করি নি।'

'তার বেলায় অদৃষ্ট!…এর বেলা অদৃষ্ট মানছেন না কেন? আমি না হয় খেটে খাবারই চেষ্টা দেখি।'

'তাই ব'লে তুমি ঐ থিয়েটারের বেশ্যে মাগীদের যাবে লেখাপড়া শেখাতে? তোমার দশ-পনের টাকায় আমার কী-ই বা সুসার হবে?'

'দশ-পনেরো টাকা বিশ-পঁচিশ হ'তে কতক্ষণ! কাজটার অভ্যেস হ'ত। আর

দশ-পনেরো টাকায় একটা পেট বেশ চলে যায় মা।'

উমা যেন নিজের সাহসে নিজেই অবাক হয়ে যায়।

'কিন্তু সে বয়েস এখনও আসে নি মা। রূপ-যৌবন বড় শত্রু। এত বড় শত্রু সঙ্গে ক'রে কি কাজই বা করতে যাবে? আর, কে বলতে পারে যে পাঁচ-সাত বছরে জামাইয়েরই মতিগতি ফিরবে না?'

সে আশা কি উমার মন থেকেই একেবারে গেছে!

সে চুপ ক'রে যায়। তার রূপবান তরুণ স্বামী—কন্দর্পকান্তি! সেই রূপের স্মৃতি যেন কামনার বাতাসে হতাশার ভস্মস্তূপের মধ্যে থেকে আশাকে সঞ্জীবিত ক'রে তোলে অনেক দিনের পর। মনের জমাট-বাঁধা স্তব্ধতা কোন্ এক অজানা দক্ষিণা-বাতাসে দূর হয়ে গিয়ে ওর দেহলতা কাঁপতে থাকে থর্থর্ ক'রে।

তিন

দিন-দুই পরে অকস্মাৎ একদিন চন্দ্রশেখর মুস্তফী স্বয়ং এসে উপস্থিত হলেন। হাত জোড় ক'রে বললেন, 'মা, আমার একটি নিবেদন আছে।'

কারণটা ঠিক অনুমান করতে না পারলেও কেমন একটা আক্রমণ আশঙ্কায় কঠিন হয়ে ওঠেন রাসমণি, 'বলুন!'

'আমি ব্রাহ্মণ, আপনার সন্তান। একটা কথা যদি বলি ত অপরাধ নেবেন না। এককড়ির কাছে সব শুনলুম। যদি আপনার কন্যা—আমার ভগ্নী এ কাজটি করতে পারে ত মহৎ দায় উদ্ধার করা হয়। আমি একটি আলাদা ঘর দেব। সে ঘরে পুরুষ কখনও ঢুকবে না—এ কথা দিচ্ছি। আমার ঝি এসে প্রতিদিন রাত সাতটা নাগাদ নিয়ে যাবে, ঘোমটা দিয়ে টুপ ক'রে চলে যাবে, কেউ অত লক্ষ্যও করবে না। আমি দোরের কাছে দাঁড়িয়ে থাকব—কেউ ওর দিকে মুখ তুলে চাইতে পর্যন্ত সাহস করবে না।...ওরা ন'জন পড়বে—দু টাকা ক'রে দেবে, এ থিয়েটার থেকে বারো টাকা ক'রে দিয়ে ঐ পুরো ত্রিশ টাকাই ক'রে দেব ...আর মা, লোকে যদি জানতে পারে নিন্দে করবে? আমি ত সবই শুনেছি, কি ক্ষতি হবে তাতে মা, আপনার ত আর মেয়ে নেই যে বিয়ে দিতে হবে! সমাজের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি?'

রাসমণি কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'কিন্তু আমার অন্য মেয়ে-জামাইরা আছেন—তাঁদের ত সমাজ আছে!'

'এটা কলকাতা শহর মা। এখানে সমাজের শাসনই বা কি আর কে-ই বা এখানে কার কথা জানতে পারছে!'

'না বাবা—এসব কথা আর তুলবেন না। সে আমি পারব না।'

রাসমণি যেন অসহ্য একটা ক্রোধে জ্বলে ওঠেন। এ উমা ওঁর ভাগ্যের ওপর—এত ক'রেও কি অদৃষ্ট-দেবতার সাধ মেটে নি? আরও নিচে তাঁকে নামাবার জন্য এমন চক্রান্ত তাঁর?—প্রলোভনের জাল ক্রমেই রমণীয় ক'রে তুলছেন, ঘিরে ধরছেন চারিদিক দিয়ে।...রাসমণি পিছন ফিরে ওপরে চলে গেলেন, ইচ্ছা ক'রে মুস্তফীকে অপমানিত করার জন্যই।

কিন্তু আক্রমণ এখানেই থামল না।

আবার এককড়ি এল। নানা রকম যুক্তি, নানা প্রলোভন।

অবশেষে কমলা একদিন এসে সব শুনে বললে, 'পাঠিয়ে দিন মা, আর দু-মত করবেন না।'

'তুইও বলছিস্? জামাই কি ভাববেন যদি শোনেন?'

'সে আমি তাঁকে নিজে বলতে পারব, সে সাহস আছে আমার। এতে দোষ কি? অকারণ সমাজকে এত ভয় করেন কেন মা—সমাজ আপনাকে খেতে পরতে দেবে? পরের দয়ায় বেঁচে থাকার চেয়ে যে-কোন রকমে খেটে খাওয়া ভাল।'

'কিন্তু ঐ রূপের থাপ্‌রা মেয়েকে কোথায় পাঠাই বল্ ত?'

'ওখানে ত মুস্তফী মশাই ভাল প্রস্তাব করেছেন মা—রূপের থাপ্‌রা মেয়ে যদি খারাপ হয় ত আপনি পাহারা দিয়েই সামলাতে পারবেন? কত চোখে চোখে রাখবেন! তাছাড়া আমার বোনেরা তেমন নয় মা।'

আরও দু-চারদিন ভেবে—আরও অনুরোধ-উপরোধের পর রাসমণি দুর্বল হয়ে আসেন। একসময় সম্মতি দেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও। কিন্তু তারপর পুজোয় বসে তাঁর দু'চোখ জলে ভেসে যায়। ঠাকুর, এ কী করলে তুমি!

উমার বুক কাঁপে সারাদিন। অজ্ঞাত কি একটা আশঙ্কা, নাম-না-জানা কি একটা আশা। কিছুতেই স্থির হয়ে কোথাও বসতে পারে না, কিছু একটা ভাবতে পারে না মাথা ঠিক রেখে।

সন্ধ্যার কিছু আগে মনে হ'ল মাকে গিয়ে বলে, 'ও আমি পারব না মা—আপনি বারণ ক'রে দিন।'

কিন্তু নূতন আশা—কাজে ব্যস্ত থাকার আশা, অর্থ উপার্জনের আশা—এমনি নানা আশা এসে বাধা দেয়। সেই আশাই একসময় তাকে থিয়েটারের পদ্ম-ঝির পিছু পিছু অমোঘ, অপ্রতিহতবলে টেনে নিয়ে যায়। মাথায় ঘোমটা টেনে গায়ে চাদর মুড়ি দিয়ে অন্ধকারে কোনমতে যেন ছুটে পার হয়ে যায় রাস্তাটুকু—তবু মনে

হয় পাড়ার হাজার জোড়া কৌতূহলী দৃষ্টি তাকে লক্ষ্য করছে ও বিদ্রূপের হাসি হাসছে।

থিয়েটারে পৌঁছে অবস্থা আরও খারাপ হয়। দু-চারজন চেনা কিন্তু বাকী সবাই এমন ভাবে তাকিয়ে থাকে যে উমার মনে হয় তাদের সে দৃষ্টির আড়ালে একটা কৌতুকের হাসি আছে। যেন ওদের মনের ভাব নিঃশব্দে বলছে—আর কত দিন, শীগগিরই ত আমাদের দলে এসে দাঁড়াবে—দেরি নেই! ও ভদ্রতার ঔদ্ধত্য আর বেশী দিন রাখতে হবে না—ঢের দেখেছি আমরা!

তাছাড়া, মুস্তফী মশায়ের কড়া শাসন সত্বেও দু-একটি পুরুষ উঁকি মারে এদিক ওদিক থেকে। তাদের দিকে না তাকিয়েও উমা বুঝতে পারে সেটা।

ঘেমে নেয়ে ওঠে উমা, বুকের মধ্যে কেমন করে ওর, হাত পা ঝিমিয়ে আসে।

মিনিট-কতক কোনমতে কাটিয়েই হঠাৎ কেঁদে ফেলে এককড়িকে বলে, 'আজ, আজ আমার বড্ড ভয় করছে দিদি, আমায় বাড়ি পাঠিয়ে দাও।'

এককড়ির চোখ করুণার্দ্র হয়ে ওঠে, 'বুঝেছি ভাই—অমন হয় প্রথম দিন। এতগুলো অচেনা লোক ত। তা আজ আর পড়াতে হবে না। একটু বসে গল্প করো বরং—।'

'না না—আমার বড্ড গা গুলোচ্ছে। আমাকে এখনি বাড়ি পাঠিয়ে দিন।'

এই বলে সে নিজেই বেরিয়ে পড়ে। উল্টো দিকে বেরোতে গিয়ে স্টেজে ঢুকে দড়াদড়ির গহন অরণ্যে দিশাহারা হয়ে ওঠে।

'অ পদ্ম, ছাখ কাণ্ডখানা! যা যা তুই শীগ্‌গিরি। এই যে বোন, এই দিকে এসো। আমি নিজে তোমাকে পৌঁছে দিচ্ছি না হয়।' এককড়ি চেঁচাতে থাকে।

পদ্ম-ঝি ছুটে এসে একরকম উমার হাত ধরেই বাইরে নিয়ে আসে।

একটি মেয়ে এককড়িকে বললে, 'তোমার যেমন কাণ্ড দিদি, ও যে একেবারে খুকী—ওকে এখানে আনে কখনও?'

আর একজন চিমটি কেটে বললে, 'ওলো থাম্! অমন অনেক খুকী দেখেছি আমরা। এরপর এস্টেজে নেমে ধিতিং ধিতিং ক'রে নাচতেও ভয় পাবে না।'

এককড়ি তাকে ধমক দিয়ে ওঠে।

থিয়েটারের বাইরে এসেও উমা প্রথমটা যেন হকচকিয়ে গিয়েছিল। তারপর পদ্ম-ঝি যখন তার হাত ধরে আকর্ষণ ক'রে বললে, 'এই যে ইদিকে, অমন বোকার মত চারিদিকে চাইছ কি?' তখন যেন ওর সম্বিৎ ফিরে এল। নিজেদের গলিটা চিনতে পেরে সে হাতটা মুঠো থেকে টেনে ছাড়িয়ে নিয়ে একরকম ছুটেই বড় রাস্তা

পার হয়ে গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল।

কিন্তু ঠিক নিজেদের বাড়িতে ঢুকতে যাবে এমন সময় কে যেন পরিচিত কণ্ঠে পেছন থেকে বললে, 'শুনছ উমা, একটু শুনে যাও!'

চমকে কেঁপে উঠল উমা, হয়ত পড়েই যেত দেয়ালটা না ধরে ফেললে। খুবই সামান্য পরিচয় এ কণ্ঠস্বরের সঙ্গে, তবু সমস্ত অন্তরে যেন এর প্রত্যেকটি সুর সদাজাগ্রত—হৃদয়ের তন্ত্রী এই সুরেই যেন বাঁধা হয়ে গেছে চিরকালের মত।

এ যে তার স্বামী—শরৎ!

উমা চোখ খুলে না তাকিয়েও তাকে চিনতে পারলে, উপস্থিতিটা অনুভব করতে পারলে—সারা দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণু দিয়ে।

'তোমাকে এইমাত্র ঐ থিয়েটারটা থেকে বেরোতে দেখলুম যেন, এ কি সত্যি?'

এই সহজ প্রশ্নের অন্তরালে যে প্রচ্ছন্ন একটু অনুযোগ ছিল তাতেই উমার মন কঠিন হয়ে উঠল, এতক্ষণ তার গলা যেন বুজে আসছিল, এবারে পরিষ্কার কণ্ঠে জবাব দিলে, 'হ্যাঁ, কি হয়েছে তাতে?'

'শেষে তোমার এই দুর্গতি, ছিঃ!'

জ্বলে ওঠে উমা, 'তুমি ত আমাকে ত্যাগ করেছ, আমার চলবে কিসে তা কোনদিন ভেবে দেখেছ কি? বিধবা মা কোথা থেকে পুষবে আমাকে চিরকাল? তারপর মা গেলেই বা দাঁড়াব কোথায়?'

'তোমার কাছে আমার অপরাধ ঢের—তা সত্যি, বলবারও কোন হক হয়ত আমার নেই, তবু—তুমি থিয়েটারে নামছ—না, না, উমা এ আমি ভাবতেই পারি না। এ কাজ ক'রো না। ছিঃ!'

এই বলে শরৎ যেন একরকম ছুটেই অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ও যে এখানেই আসে নি, এটা যে আকস্মিক পথের দেখা তা উমা কল্পনা করে নি। তাই ভেতরে যাবার কোন আমন্ত্রণও জানায় নি। 'ভেতরে চলো—আজকের রাতটা থেকে যাও'—এ যে ওর সারা অন্তরের আর্ত কাকুতি, এ কি উনি জানেন না? অনাবশ্যক-বোধেই মুখে তা বলে নি উমা, বলবার অবকাশও পায় নি। তাই ব'লে উনি চলে গেলেন!

কত কথা যে ওঁকে বলবার আছে, কত ভিক্ষা আছে ওঁর কাছে চাইবার! বাঞ্ছিত আরাধিত দেবতা, হাতের কাছে এসে আবার কোন্ অনির্দিষ্ট কাল ও সীমাহীন স্থানের মধ্যে হারিয়ে গেল!

আর কি কখনও বলা হবে সে-সব কথা!

ওঁর অনুযোগটাও যে কত মিথ্যা, তাও ত জানানো হ'ল না!

এ কী হ'ল ওর, এ কী হ'ল!

আড়ষ্ট পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে উমা দাঁড়িয়ে রইল সেখানেই, তেমনি একটা পা চৌকাঠে দিয়ে, এক হাতে দরজার কাঠটা ধরে, বহু—বহুক্ষণ ধ'রে। একটুখানি নড়বারও আর শক্তি নেই ওর।

নবম পরিচ্ছেদ

এক

সেদিন সমস্ত রাত ধরে জেগে অনুপস্থিত স্বামীকে উমা এই কথাটাই বার বার বলতে লাগল, 'বেশ করব যাবো। আমার যা খুশি করব। না—বরং তুমি বারণ করেছ বলেই করব। কেন, কেন তুমি আমাকে বারণ করবে? কি অধিকারে? আমাকে তুমি কোন্ অধিকার দিয়েছ? একদিনের জন্যও ত গ্রহণ করো নি—তবে কেন তোমার মান-মর্যাদা নিয়ে আমি মাথা ঘামাব?'

এটা সে বোঝে নি যে তার অন্তরের মধ্যে স্বামীর অনুরোধ নিষেধাজ্ঞা রূপে মেঘমন্দ্র স্বরে ধ্বনিত হচ্ছে, কিন্তু অন্তরের অবচেতনে এটা বুঝেছে যে সে অনুরোধ অমান্য করার শক্তি তার নেই—সেই জন্যই বার বার সে নিজের মনেই এত আস্ফালন করছে। এ যে একেবারেই দুর্বলের স্পর্ধা—এটা বোঝবার মত আত্মবিশ্লেষণ-শক্তি তার ছিল না। কিন্তু সকালে উঠে নিজের কাছেই এটা স্বীকার করতে সে বাধ্য হ'ল শেষ পর্যন্ত। নিশীথ অন্ধকারে অনেক সময় মানসিক বৃত্তি-গুলোও বাহ্য প্রকৃতির মত অস্পষ্টতা বা জড়তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে—সূর্যোদয়ে তা আবার স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। উমাও নিজের মনের মধ্যেকার সত্যটাকে পরিষ্কার দেখতে পেলে। যে স্বামী একদিনের জন্যেও ওকে স্ত্রীর মর্যাদা দেয় নি, যে স্বামী অত্যন্ত তুচ্ছ কারণে ওর জীবনটাকে নষ্ট ক'রে দিয়েছে—যার কাছ থেকে নির্মম উপেক্ষা এবং যার আত্মীয়দের কাছ থেকে অবহেলাই মাত্র ও পেয়ে এসেছে—তারই অন্যায় ও অসঙ্গত অনুরোধও ওর কাছে অনুপেক্ষণীয়। শুধু নিজের অসহায় অবস্থার কথা মনে ক'রেই সকালবেলা ও কেঁদে ফেললে। সে অশ্রু ক্ষোভ ও অভিমানের—অদৃষ্টের ওপর অভিমান, অভিমান নিজের ওপরও বোধ হয়।

বিকেলবেলা পদ্ম-ঝি এল ডাকতে।

তার আগেই উমা মাকে বলে রেখেছিল—মা স্পষ্ট দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'মা, তুমি মুস্তফী মশাইকে ওর নমস্কার জানিয়ে ব'লো যে ওর দ্বারা ও-কাজ হবে না, ওকে যেন তিনি মাপ করেন।'

ঝি আরও কি বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে রাসমণি বললেন, 'না না—রাজী হওয়াটাই ওর মস্ত ভুল হয়েছিল—অল্পেই সে ভুল ভেঙেছে, এই ভাল ! গুরু রক্ষা করেছেন । আমি আর এ সম্বন্ধে কোন কথাও কইতে রাজী নই, তাঁকে বলে দিও ।'

তাঁর মুখের রেখার দিকে চেয়ে পদ্ম-ঝির আর কোন কথা বলতে সাহস হ'ল না ।

দুই

শ্রাবণের মাঝামাঝি রাসমণির বড়দি এসে হাজির হলেন । সঙ্গে তাঁর সেই অদ্বিতীয় ঘটিটি, আর বগলে থান তিনেক থান কাপড় গামছায় জড়ানো । এসেই বললেন, 'মরতে এলুম রে রাসু ! তোর কাছে মরব—এ কথাটা বরাবরই মনে ছিল । মরার সময়ই মানুষের শেষ বাহাদুরি ।...বলে—জপো তপো করো কি, মরতে জানলে হয় !... ভগবানকে ত তাই অষ্টপ্রহর বলি, জন্ম এস্তক ত আমার পেছনে লেগেছ—মরণটাতে আর জ্বালিও না ।...রাসুর কাছে যেন মরতে পারি—আর যার কাছে যাবো সে-ই আপদ-বালাই করবে ।'

উমা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে তাঁর দিকে । এই ত দিব্যি শক্ত-সমর্থ চেহারা । বয়স অবশ্য ষাট হয়েছে কি আরও বেশী, কিন্তু না পড়েছে একটি দাঁত—না পেকেছে বেশী চুল । বার্ধক্যের ছোপের মধ্যে—একটু যেন কোমরটা বেঁকেছে, কিন্তু সে সামান্যই । আর ত কোথাও একটা রোগের চিহ্নও নেই । এই লোক মরবে !

'অমন ক'রে চেয়ে আছিস কেন্ লা ?' হেসেই জিজ্ঞাসা করেন বড় মাসিমা।

'আপনার কি অসুখ বড় মাসিমা ?'

'অসুখ । এখন কিচ্ছু না । অসুখ হ'লে চলবে কেন ? এতটা পথ কি তা'হলে আসতে পারতুম ? ছিলুম ত মেজ ভাইপোর কাছে সেই মালদয় । এই রেল ইস্টিমার ক'রে দুদিন থাড়া উপোস দিয়ে আসছি ।'

'তবে ?' আরও অবাক্ হয়ে প্রশ্ন করে উমা ।

'কি তবে ? মরবার কথা বলছি, তাই ?...ও আমি টের পেয়েছি । ধানের চালের ভাত তেতো লেগেছে—আর আমি বেশী দিন বাঁচব না এটা ঠিক । বড় জোর ছ মাস ।...হ্যাঁ, অসুখ একটা করবে বৈকি । যাহোক একটা হবে—হয় জ্বর হবে, নয় পেট ছাড়বে । নইলে দুটোই । তারপর ব্যস—ফেঁসে যাবো—অক্কা !'

রাসমণি মেয়েকে ধমক দিয়ে ওঠেন, 'আগে একটু পায়ে জল দে, নাইবার যোগাড় ক'রে দে, তা নয়—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাজে কথা !'

অপ্রতিভ উমা তাড়াতাড়ি একঘটি জল এনে আলগোছে পা ধুইয়ে দেয় । মাথায়

দেবার তেল এনে বাটি ক'রে রাখে চৌবাচ্চার পাড়ে। তারপর রাসমণির একটা ফরসা কাপড় এনে হাতে ক'রে দাঁড়ায়। বড় মাসিমা সঙ্গে যে কাপড় এনেছেন তা রেলে এসেছে—সবই কেচে দিতে হবে।

চান ক'রে উঠে কাপড় ছাড়ছেন তিনি, উমা আবারও প্রশ্ন করে ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে—'আচ্ছা, মা ছাড়া যদি আর কেউ যত্ন করবেন না জানেন ত মার কাছেই থাকেন না কেন ? এই বয়সে এখান ওখান ঘোরেন কেন ?'

'আমি কি এত বোকা রে !' চতুরের হাসি ফুটে ওঠে ওঁর মুখে, 'আমার স্বভাব জানি, যেখানেই কিছুদিন থাকব তারাই ত জ্বলেপুড়ে খাক্‌ হয়ে যাবে। এইটে হ'ল আমার মরণকালের আস্তানা, একে কি চটিয়ে রাখতে পারি, তাহলে মরবার সময় দাঁড়াবো কোথা, দেখবে কে ? শেষ আশ্রয় কি নষ্ট করতে আছে রে ? চিরদিন থাকলে যত রাগ জমা হয়ে থাকে—মরণকালে তার সব শোধ নেবে। উঁহু, সে বান্দা আমি নই !'

বলেন আর হাসেন আপন মনে।

উমা বড় মাসিমাকে পেয়ে যেন বেঁচে গেল। তবু যাহোক একটা কাজ পেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে, দফায় দফায় সেবা যোগায় এবং কারণে অকারণে বকুনি খায়। তাও যেন ভাল লাগে উমার। একান্ত নিষ্ক্রিয়তার চেয়ে এ-ও ভাল। তা ছাড়া সে যেন নিজেকে দিয়ে বুঝেছে বড় মাসিমার কষ্টটা—তাঁর অন্তরের জ্বালাটা। এই অল্প সময়ের মধ্যেই সে যেন পাগল হয়ে উঠেছে, আর বড় মাসিমা দীর্ঘ এত কাল সহ্য করছেন। অন্তরে যে অনির্বাণ আগুন জ্বলছে তার তাপ কিছু উদ্‌গারিত হবে বৈ কি।

রাসমণিও তা বোঝেন। তবু এক এক সময় অসহ্য হয়ে ওঠে। রান্নাঘরের চৌকাঠ চেপে বসে যে বিষ বড়দি ঢালতে থাকেন, একেবারে নীলকণ্ঠ না হ'লে তা সহ্য করা শক্ত। সুতরাং সেই সব অসহ অসতর্ক মুহূর্তে দুজনায় ঝগড়া বেধে ওঠে। রাসমণি কথা বলেন কম—যা বলেন তা কিন্তু মর্মান্তিক। বড় মাসিমা একেবারে জ্বলে ওঠেন—চেঁচিয়ে গালাগালি দিয়ে লাফিয়ে কেঁদে-কেটে পাগলের মত হয়ে ওঠেন। খানিকটা চেঁচাবার পর ও-পক্ষ থেকে সাড়া না এলে তর্‌তর্‌ ক'রে হয়ত ঘটিটা নিয়ে নেমে আসেন। সে সময় উমার মনে হয় রাগ ক'রে বুঝি চলেই যাবেন। কিন্তু তা তিনি যান না, সদরের কাছে গিয়ে ধপাস্‌ ক'রে বসে পড়েন, আপন মনে খানিকটা কাঁদেন বিনিয়ে বিনিয়ে—তারপর আবার উঠে আসেন। বলেন বোনকে উদ্দেশ ক'রে, 'ভেবেছিস্‌ এমনি জ্বালাবি আর আমি চলে যাবো ! কোথাও যাবো

না, গেলে আমার চলবে কেন? মরবার কালে সেবা খাব, মরব, তবে বেরোব এ বাড়ি থেকে!'

ভাদ্রের শেষে সত্যি-সত্যিই বড়মাসিমা শয্যা নিলেন। প্রথমে জ্বর, তারপর পেট ছাড়ল। তুটোই চলল সমানে। রাসমণি দিন তিনেক দেখে ডাক্তার ডাকতে পাঠালেন। বড় মাসিমা জানতেন না, ডাক্তার আসতে সেই জ্বরের ঘোরেই উঠে বসলেন তড়বড় ক'রে, 'হ্যাঁলা রাস্থ, তোর মতলব কি? আমাকে বিনা চিকিচ্ছেয় মেরে ফেলবি?'

রাসমণি অবাক্।

'তাই ত ডাক্তার ডেকেছি বড়দি!'

'বেশ করেছ, কেদাত্ত করেছ একেবারে। চারকাল পেরায় গিয়ে সিকিকালে ঠেকেছে, কখনও যা করলুম না—তাই করব, ঐ মড়াকাটা ডাক্তারের ওষুধ খাব! ডাক কবরেজ্‌কে?'

কবিরাজ এসে নাড়ী টিপে বললেন, 'জ্বরাতিসার।'

তাঁকেও ধমক দিলেন বড় মাসিমা, 'সে ত ঐ তুধের বাচ্ছা মেয়েটাও জানে। জ্বর আর অতিসার হ'লে জ্বরাতিসারই হয়।...'

কবিরাজ সান্ত্বনা দিয়ে বলতে গেলেন, 'ভয় নেই, ভাল হয়ে যাবেন।'

'ছাই হবো! তুমি যা পণ্ডিত তা বুঝে নিয়েছি। দেখতে পাচ্ছ না যে, মরণ-রোগ ধরেছে। তার জন্যে নয়, ভালো আমি হবো না—তবে তুমি ওষুধ দাও। ওষুধ খাবো না কেন! মরব বলে কি আর বিনা চিকিচ্ছেয় মরব?'

দিন দশেক পরে খুবই বাড়াবাড়ি হ'ল। ক্রমশঃ হাত-পা ফুলতে শুরু হ'ল।

পুজোয় ষষ্ঠীর দিন ভোরবেলা বোনকে ডেকে বললেন, 'বেশীদিন আর ভোগাতে পারলুম না রে! অল্পে অল্পে বেঁচে গেলি!'

রাসমণি না বুঝে চেয়ে থাকেন ওঁর দিকে।

'বুঝতে পারলি না? ডাক এসেছে। লোকজন ডাক্—গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা কর্।'

উমা কিছুই বুঝতে পারে না। মৃত্যু কি মানুষ এমনি ক'রে আগে থাকতে বুঝতে পারে? এমনি নিঃসংশয়ে এত নির্ভয়ে তার সম্মুখীন হয়?...তার চোখে জল ভরে আসে, এই তুর্মুখ কলহপরায়ণা বৃদ্ধার জন্যও—সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কে মন শিউরে ওঠে, তারও কি তাহলে এই পরিণাম?

কমলাকে খবর দিতে বড় জামাই এলেন, আরও লোকজন জড়ো হ'ল। খাটে তোলবার সময়ও বড় মাসিমা—যারা তুলছিল তাদের অনবধানতার জন্য তিরস্কার

করলেন। ঘটিটা দিয়ে গেলেন বোনকে, বললেন, 'সব বন্ধন মুক্ত হয়ে যেতে হয়—নইলে আবার কি ফিরে আসব? তা বন্ধনের মধ্যে ত ঐ ঘটিটা—তুইই নিস রাসু। ব্যস্—এইবার আমার ছুটি। গঙ্গা, গঙ্গা—হরিবোল হরিবোল!'

সমস্ত পথটা ইষ্টনাম জপ করতে করতে গেলেন। গঙ্গার ঘাটে গিয়ে একবার খাটসুদ্ধ জলের ধারে নামানো হ'ল, রাসমণি জল দিলেন মুখে—সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে। গঙ্গামৃত্তিকা নিয়ে কপালে বুকে লেপে দিলেন। বড় মাসিমা চোখ বুজেই পড়ে ছিলেন, এই সময় শুধু একবার বললেন, 'পেটটা—পেটটাও লেপে দে। আহা—ঠাণ্ডা হোক্। বড় জ্বলছে।'

তারপর ওঁকে এনে গঙ্গাযাত্রীর ঘরে রাখা হ'ল। তখন নিমতলার ঘাটে এই ঘরটির অবস্থা ছিল শোচনীয়। ভাঙা ঘর, কোন দিকে দোর নেই—বৃষ্টির জল বাইরের চেয়ে ভেতরেই বেশি পড়ে। সে নির্জন শ্মশানের মধ্যে ভাঙা ঘরের আবহাওয়া দিনের বেলাই থমথমে, ভয়াবহ। তবু সেখানে রাখা ছাড়া উপায় কি? যারা এনেছিল তারা স্নান ক'রে চলে গেল। রাসমণি একা রইলেন ওঁকে নিয়ে। কথা হ'ল বড় জামাইয়ের চাকর মধ্যে মধ্যে এসে খবর নিয়ে যাবে। তিনি নিজে সকাল বিকেল আসবেন।

বড় মাসিমা ঘরে আসার পর মাত্র একটা কথাই বলেছিলেন, 'গঙ্গাতীরে আর কোন নোংরা কাজ করব না রাসু—তুই নিশ্চিন্তি থাক্। তবে প্রাণটা বেরোতে যা দেরি!' তারপরই অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

সেই ভাবেই সারাদিন কাটল। বিকেলে আরও দু-একজন এলেন খোঁজ করতে। একজন মহিলা বললেন, 'পাট করো, পাট করো—নইলে কড়ে রাঁড়ী সহজে মরবে না!' পাট করার অর্থ—ডাব পান্তাভাত ঘোল এই সব খাওয়ানো। গঙ্গাযাত্রার এই বিধি—যেমন ক'রে হোক মেরে ফেলা। এ রুগী ফিরিয়ে নিয়ে যেতে নেই।

কিন্তু রাসমণি ঘাড় নেড়ে বললেন, 'বোল হ'রে গেছে, দাঁতি লেগেছে। খাওয়াবো কাকে? ডাব কিনে দিয়ে যাও, পারি ত ঐ একটু মুখে দেবো।'

সন্ধ্যার পর থেকে যেন প্রলয়ের বর্ষা নামল। সারারাত চলল অবিশ্রাম বর্ষা। জল প'ড়ে রাসমণি নিজেও ভিজলেন, মুমূর্ষুও ভিজতে লাগল। কোথাও এমন একটু শুকনো জায়গা নেই যেখানে সরে যান। আলোর মধ্যে একটা ছোট প্রদীপ—সেটাও বাইরের হাওয়ায় বার বার নিভে যাচ্ছে। দেশলাই জ্বলে না। তখন রাসমণি প্রাণপণে প্রার্থনা করছেন যে অন্তত কেউ মড়া পোড়াতেও আসুক। কিন্তু সে দুর্যোগে কেউ মড়া নিয়েও বেরোতে সাহস করলে না। একা সেই অন্ধকারে অচৈতন্য মৃত্যুযাত্রিণীকে নিয়ে সেই ভাবেই কাটালেন সারারাত।

উমাকে আগলাবার জন্য কমলা এসে এ বাড়িতে ছিল। সে আর উমা দুজনেই ঘুমোতে পারল না। এই অন্ধকার দুর্যোগের রাতে মা একা শ্মশানে বসে আছেন মনে ক'রে উমা নিজেই ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগল।

সপ্তমীর দিন সকালেও জল থামল না। তেমনি হু-হু বাতাস, মেঘের গুরু গুরু শব্দ আর অবিশ্রাম মুষলধারে বর্ষণ। এরই মধ্যে উমা এবং কমলা গাড়ি ডেকে গিয়ে হাজির হ'ল শ্মশানে। বুড়ী তখনও আছে। নাভিশ্বাস উঠেছে, হয়ত শীগগিরই মরবে। রাসমণি ওদের তিরস্কার করলেন, 'তোরা কি করতে এলি! যা, গিয়ে চান করে ফেল্‌গে যা!'

বড় জামাই এলেন। তিনিও চলে যেতে বাধ্য হলেন খানিক পরে। আবার সেই একা। গঙ্গার জল কূলে কূলে ভরে উঠেছে, হয়ত বা কূল ছাপিয়েই উঠবে। দুশ্চিন্তায় সকলের মুখেই ভ্রূকুটি ঘনিয়ে এল। কিন্তু উপায় কি? তীরস্থ যাত্রীকে ঘরে ফিরিয়ে নিতে নেই।

সারাদিন পরে সন্ধ্যায় বর্ষণের বেগ কমল কিন্তু বন্ধ হ'ল না। বরং ঝড়ের বেগ বাড়ল আরও। ফাঁকা ভাঙা ঘরে আলো জ্বালার চেষ্টাও করলেন না রাসমণি। আগের রাতের মতই অন্ধকারে বসে একমনে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে লাগলেন। সারাদিন কিছুই খাওয়া হয় নি; স্নান ক'রে উঠে—জলে দাঁড়িয়েই একটা ডাব খেয়েছিলেন মাত্র। বড়দিকেও কিছু খাওয়ানো যায় নি, ডাবের জল দেবার চেষ্টা করেছিলেন, কশ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে গিয়েছিল।

অষ্টমীর দিন শেষরাত্রে সেই নাভিশ্বাস কণ্ঠে এসে পৌছল, নবমীর দিন প্রত্যূষে শেষ। তিনদিন তিনরাত্রি একভাবে একা সেই ভাঙা ঘরে নাভিশ্বাস-ওঠা রোগিণীর সঙ্গে কাটালেন রাসমণি। তখন তাঁর মুখ দেখে কোন চিত্ত-বৈলক্ষণ্য বোঝা যায় নি কিন্তু পুড়িয়ে স্নান ক'রে বাড়িতে আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। সে মূর্ছা ভাঙল দু-তিন ঘণ্টা পরে।

তিন

বড় মাসিমার মৃত্যু উমাকে নতুন ক'রে ভাবিয়ে তুললে। বড় মাসিমার স্বভাবটাও সে লক্ষ্য করেছিল। যে জ্বালা ছড়ায় সে আগে জ্বলে। আগুনে তাঁর সমস্ত অন্তর পূর্ণ ছিল। ঐ আগুন কি তার অন্তরেও জ্বলছে না? এখনও ইন্ধন কাঁচা, তাই সে অগ্নি আছে সঙ্গোপনে, কিন্তু এই ব্যর্থতার বাতাস যদি তাতে অবিরত লাগে তবে একদিন কি দশা হবে! বড় মাসিমার তবু আত্মীয়স্বজন ছিল—দাঁড়াবার জায়গাও ছিল—তার যে দুটি অন্নের জন্য ভিক্ষা করতে হবে।

আর ঐ অবস্থা !

সকলে ধিক্কার দেবে, বিদ্রূপ করবে—সকলে চাইবে এড়িয়ে চলতে।

না—তার আগেই উমা খুঁজে নেবে তার সার্থকতার পথ।

আজকাল উমা প্রায় সারাদিন এবং সন্ধ্যায়ও অনেকখানি কাটায় তাদের ছাদের এক কোণে—যেখানটা থেকে ওদের গলিটার মোড়ে বড় রাস্তার একফালি দেখা যায়, নতুন থিয়েটার-বাড়ির সামনেটা।

ওর বিশ্বাস সেদিন সন্ধ্যায় যে শরৎকে দেখা গিয়েছিল, সেটা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়—নিশ্চয় এ রাস্তা দিয়ে সে যাতায়াত করে। আর এক দিনও যদি দেখতে পায় ত ঝিকে পাঠিয়ে ডাকিয়ে আনাবে। একবারও কি তিনি আসবেন না—পাঁচ মিনিটের জন্যেও ? অন্তত তাঁর ভুলটা ত সে ভাঙিয়ে দিতে পারবে। তাঁর সেদিনের ভুল বোঝাটা কাঁটার মত বিঁধছে উমার অন্তরে—দিনরাত্রিকে বিষাক্ত ক'রে দিয়েছে সেই একটিমাত্র ধিক্কারের স্মৃতি।

কিন্তু চেয়ে থেকে থেকে চোখ ক্লান্ত হয়ে পড়ে, রোদে আর ঝাঁজে মাথা ধরে ওঠে প্রত্যহই—তার প্রতীক্ষার শেষ হয় না। একদিন রাসমণি বকলেন খুব, 'অমন ক'রে ছাদে দাঁড়িয়ে থাকিস্ সোমত্ত মেয়ে, পাড়ায় ডবগা ছেলের অভাব আছে কিছু ? শেষে একটা দুর্নাম উঠবে যে !'

উমা ম্লান হেসে জবাব দিলে, 'আমার আর সুনাম দুর্নাম কি মা ! আপনাদের যদি কিছু অসুবিধে হয় সে আলাদা কথা। সে রকম দুর্নাম যেদিন উঠবে সেদিন একগাছা দড়ি কিনে দেবেন, তাহ'লেই বুঝব। শেষ ক'রে দিয়ে যাব সব জ্বালা আপনাদের।'

এ কথার পর রাসমণি আর কিছু বলতে পারেন নি। এর মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে যে প্রচ্ছন্ন অভিযোগ ছিল তা তিনি অস্বীকার করেন কি ক'রে ?

দুর্নাম কিছু রটেছিল—কেন না অমন ক'রে বড় রাস্তার দিকে চেয়ে অতবড় মেয়ের সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকাটা আদৌ শোভন নয়। বিশেষ ক'রে যে মেয়েকে স্বামী নেয় না—তার। কিন্তু রাসমণির একটা সুবিধা ছিল যে পাড়ার কারও সঙ্গে তিনি মিশতেন না। সে দুর্নাম কানে আসার সম্ভাবনা ছিল কম।

দিন সপ্তাহ মাস কেটে যায়—প্রতীক্ষার একাগ্রতা ক্ষুণ্ণ হয়, অন্তরের অগ্নি ওঠে দীপ্ততর হয়ে।...

উমা একদিন মাকে এসে বললে, 'মা, আমি যদি থিয়েটারই করি, ক্ষতি কি ?'

রাসমণি তীব্র কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'তার মানে ?'

আগে হ'লে সে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে উমা ভয় পেত কিন্তু আজ আর পেল না, বললে,

'আমাকে ত একটা কিছু করতে হবে। মানুষের জীবন-মৃত্যুর কথা কে বলতে পারে —আপনার হঠাৎ কিছু হ'লে কোথায় দাঁড়াব আমি ?'

রাসমণি একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'আজকাল তুমি বড় বেশি নিজের ভবিষ্যৎ ভাবছ উমা ! সেই সঙ্গে আমার মৃত্যু !'

'ভাবাই ত উচিত মা। অপর কেউ ভাববার থাঁকলে আমি ভাবতুম না। আর মৃত্যু ত অবধারিত, তার জন্যে সঙ্কোচে চুপ ক'রে থাকার কোন মানে হয় না।'

সমস্ত দ্বিধা, সমস্ত সঙ্কোচ যেন কোথায় ভেসে চলে যায় উমার। কোথা থেকে এতখানি মনের বল সে পায় তা সে নিজেই বুঝতে পারে না।

খানিক পরে রাসমণি চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'তেমন যদি হয় কমলা কি তোমাকে ভাসিয়ে দেবে ?'

'না, তা হয়ত দেবে না। কিন্তু সেখানে কি ভাবে আমি থাকব ? আমি ত আগেই বলেছি আপনাকে, হয় গলগ্রহ হয়ে লাঞ্ছনার ভাত খেতে হবে নয়ত বিনা মাইনের দাসীবৃত্তি করতে হবে।'

'কিন্তু বেশ্যাবৃত্তি নেওয়ার থেকে সেটাও বাঞ্ছনীয় নয় কি ?'

'যে যেমন ভাবে মা। বেশ্যাদের সঙ্গে মিশলেই যে বেশ্যাবৃত্তি নিতে হবে তার ত কোন মানে নেই। তাছাড়া উপায়ই বা কি।'

তারপর কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে, যেন চরম সাহসে ভর ক'রে বলে, 'আর এক উপায় আছে—মুসলমান হয়ে আর একটা বিয়ে করা—কিন্তু তাতেই যে আমি সুখী হবো তারও ত ঠিক নেই। কোন অবস্থাতেই আপনি আর আমাকে ঠাঁই দিতে পারবেন না তা জানি—তবে এ-ও আপনাকে বলে দিচ্ছি মা, আপনি যদি অন্য পথ আমাকে দেখাতে না পারেন ত থিয়েটারেই আমাকে যেতে হবে। বড় মাসিমার মত হুতাশন হয়ে থাকতে পারব না। সুখ না পাই, স্বাধীন ভাবে বাঁচবার পথ ত পাবো।'

রাসমণি আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকেন ওর কথা শুনে।

এত সাহস যে উমার হবে—এমন কথা ওঁর মুখের ওপর বলবে তা তিনি কোন-দিন স্বপ্নেও ভাবেন নি—কিন্তু সত্যিই যখন বললে তখন ভৎর্সনা করবারও শক্তি রইল না তাঁর। মেয়ে যে কি জ্বালায় জ্বলে এতখানি ধৃষ্ট হ'তে পেরেছে তা মায়ের প্রাণে উপলব্ধি ক'রে তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

চার

তিন-চারদিন কেউ কারও সঙ্গে কথা কইলেন না। সে এক বিচিত্র অবস্থা। একটা দোতলা বাড়িতে ঝিকে নিয়ে তিনটি প্রাণী। ঝির সঙ্গে দু'একটা কথা হওয়ায় যা কিছু শব্দ হয় এ বাড়িতে। তাও সে দুবেলা অন্য বাড়িতে ঠিকে কাজ করতে যায়, সে সময় মনে হয় বাড়ি সম্পূর্ণ খালি।

এই গুমোট আবহাওয়া যখন প্রায় অসহ্য হয়ে উঠেছে—অকস্মাৎ শ্যামা তার ছেলেমেয়ে নিয়ে এসে হাজির হ'ল একদিন।

প্রথমটা ওরা কেউ চিনতে পারে নি।

তারপর উমা ছুটে এসে শ্যামাকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল, রাসমণি দু'-হাতে নিজের কপালে কঠিন আঘাত করতে লাগলেন।

যেন দুর্ভিক্ষের দেশ থেকে এসেছে ওরা,—মূর্তিমান দুর্ভিক্ষ-অবতার!

কঙ্কালসার চেহারা, রুক্ষ চুল—জট পাকানো, ময়লা ছেঁড়া কাপড়। অমন দুধে-আলতা রং পুড়ে কালি হয়ে গেছে একেবারে। ছেলেমেয়ে দুটোকে দেখলেও আঁতকে উঠতে হয়, হেমটা ত রীতিমত ধুঁকছে। মনে হয় প্রাণশক্তি কে নিংড়ে বার ক'রে নিয়েছে ওদের মধ্যে থেকে।

'এ কি অবস্থা রে তোর! এমন হ'ল কি করে? আমাদের চিঠি লিখতে পারিস নি।' এক নিঃশ্বাসে উমা প্রশ্ন করে।

শ্যামার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। ক্ষীণকণ্ঠে বলে, 'একটু বসি আগে। এক ঘটি জল দে। সারা পথ হেঁটে এসেছি—এই চার ক্রোশ পথ। তার ওপর কোলে মেয়ে। আমি আর পারছি না—'

উমা তাড়াতাড়ি শরবৎ ক'রে এনে দেয়। দুধ গরম ক'রে এনে ছেলেমেয়ে দুটোকে খাওয়াতে বসে।

শ্যামা তখন শুয়ে পড়েছিল নিচের রকেই। ওরই মধ্যে হাঁ-হাঁ ক'রে উঠল, 'একটু জল মিশিয়ে নে, একটু জল মিশিয়ে নে,—নইলে যে পেট ছেড়ে দেবে! কদিন উপোসের পর খাঁটি দুধ খেতে পারে? এক ভাগ দুধ তিন ভাগ জল—'

নিজেরই করাঘাতে রাসমণির কপাল ফুলে উঠেছিল এর মধ্যে। তিনি এইবার নিঃশব্দে উঠে রান্নাঘরে চলে গেলেন। মেয়ের এ অবস্থা কেন হ'ল তা প্রশ্ন করবারও প্রবৃত্তি ছিল না তাঁর।

অবশ্য শ্যামা নিজেই ক্রমশঃ সব বললে। বলবার কিছুই নেই। মধ্যে মধ্যে নরেন যেমন ডুব মারে তেমনি—এবার বেশিদিন ডুব মেরেছে। ঠিকে পূজারী পুজো

ক'রে আগে শুধু সকালের চাল নিত, এখন বিকেলের দুধটাও নেয়। বলে, 'তোমরা ত মিছিমিছি ঘর জোড়া ক'রে রেখেছ। কাজ আমি করব ষোল আনা, তোমাদের ভাগ দেব কেন ?' প্রথম প্রথম সরকার-গিন্নী বা পাড়ার লোক দয়া-ধর্ম করত, এখন কেউ খবর পর্যন্ত নেয় না, সাহায্য করবার ভয়ে। যা সামান্য সোনা-রূপো ছিল তা গেছে, বাসন-কোসনসুদ্ধ বাঁধা পড়েছে, তারও পরে সাতদিন উপবাসে কাটিয়ে আজ মরীয়া হয়ে বেরিয়ে পড়েছে শ্যামা। ঘরে চাবি দিয়ে এসেছে, তাও ফিরে গিয়ে দখল পাবে কিনা সন্দেহ! ইত্যাদি···

বিকেলে খাওয়া-দাওয়া সারা হয়েছে, রাত্রের আর ঝঞ্ঝাট নেই। উমা ছাদে শুয়েছে মাদুর পেতে ছেলেমেয়েদের নিয়ে। ঝি বাইরের কাজ সেরে আসতে শ্যামাই গেছে তাকে ভাত বেড়ে দিতে। ঝি খেতে খেতে গল্প করছে, তাদের কথা বলার একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন কানে আসছে। রাসমণির কোন দিকে মন ছিল না। তিনি সারা সন্ধ্যাটাই অন্ধকার ঘরে কেমন স্বপ্নাচ্ছন্নভাবে বসে ছিলেন—এমন সময় শ্যামার তীব্র কণ্ঠস্বর কানে গেল, 'মা, এসব কি শুনছি ?'

চমকে উঠলেন রাসমণি, 'কেন, কী হয়েছে ? কী শুনেছিস ?'

গলাটা খানিক নামিয়ে অথচ বেশ তীক্ষ্ণকণ্ঠেই শ্যামা বলে, 'উমি নাকি থিয়েটারে যাচ্ছে—ও নাকি থিয়েটার করবে ?'

ওর বলার ধরনে রাসমণি চটে উঠলেন, 'বেশ ত, কী হয়েছে তাতে ?'

'তাহ'লে ত আর আমার এক দণ্ডও এ-বাড়ি থাকা হয় না। এই মুহূর্তে চলে যেতে হয়। আমার স্বামী শুনলে আমার আর মুখ দেখবেন না।'

রাসমণি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি ত তোমাকে এরে-বেরে আনতে যাই নি মা, যে, তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ! তোমার স্বামীর আশ্রয়েই যাও না—'

'সে যাই হোক্ মা, সে-ই আমার আশ্রয়। এই শিক্ষাই ত এতকাল দিয়েছেন। আমি এখনই যাবো—'

উমা ছুটে এসে ওর দুটো হাত চেপে ধরলে, 'তুই কি পাগল হলি রে! আগে সব কথা শোন্—'

'না ভাই, ঢের শুনেছি। তুই ছাড়্—'

'অবুঝ হ'সনি ছোড়দি, শোন্—তোর দু'টি পায়ে পড়ি—'

শ্যামাকে সে ছাদে টেনে নিয়ে গিয়ে সব কথা খুলে বলে। তখন খানিকটা সুস্থ হয় শ্যামা। কিন্তু বলে, 'ভাই, তুই যদি এ কাজ করিস, মা তোকে ত্যাগ করতে পারবেন না—তাহ'লে আমার আর এই সময়ে-অসময়ে এসে দাঁড়াবার

আশ্রয়ও থাকবে না। ছিল, তাই ছেলেমেয়েগুলো বাঁচল—নইলে সত্যিই শুকিয়ে মরত।'

উমা চুপ ক'রে রইল, একটা বিদ্রোহ, একটা অভিমান আকণ্ঠ ফেনিয়ে উঠছে ওর।

খানিক পরে বললে, 'তোর আশ্রয়ের কথাই ত ভাবছিস, আমার কথা ভেবে দেখেছিস!'

শ্যামা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, 'আমার কথায় তুই রাগ করিস নি উমি, কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে যত নির্যাতনই হোক্, স্বামী যেমনই হোন—সেইখানটা মেয়েমানুষের আগে। তোর উচিত পায়ে-হাতে ধরে সেখানেই যাওয়া। ভদ্রঘরের মেয়ে থিয়েটারে যাবে কি—ছি! এই দেহটাই কি এত বড়?...না ভাই, সে হ'লে আমাদের আর সম্পর্ক রাখা সম্ভব হবে না। শ্বশুরবংশের নামে আমি কালি মাখাতে পারব না।'

বড় মাসিমার বুকের আগুনের খানিকটা আন্দাজ পায় কি উমা?

অন্ধকারে শ্যামা দেখতে পায়না কি বিচিত্র হাসি ফুটে ওঠে উমার মুখে। স্বামীকে যদি একেবারেই না পেত শ্যামা, তাহ'লে কেমন ক'রে এ কথা বলত সে—তাই বুঝতে চায় উমা। শ্বশুরবংশের প্রতি এ প্রীতি থাকত কি না!

শ্যামা আবারও বলে, 'না না, বুঝছিস না! ছেলেমেয়ে বড় হবে, তাদের একটা পরিচয় আছে—আমার কথাটা ভাব্ একবার!'

তা বটেই ত।

উমা দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে গিয়ে বলে, 'ভয় নেই তোর, তোদের আশ্রয় আমি নষ্ট করব না। যা, তুই শুতে যা—এদের নামিয়ে নিয়ে যা।'

'আর তুই?'

'আমার দেরি আছে।'

অন্ধকার নিস্তব্ধ রাত্রে, সেই তারাভরা আকাশের দিকে চেয়ে প্রাণপণে যেন শুধু জীবনের সম্বল খোঁজবার চেষ্টা করে উমা। ওর অন্তরের বেদনা চারিদ্দিকের নৈঃশব্দ্যসাগরে কিসের ঢেউ জাগায় কে জানে!

প্রহরের পর প্রহর উত্তীর্ণ হয়ে যায়। ওপরে জাগে উমা, নিচে জাগেন রাসমণি।

দশম পরিচ্ছেদ

এক

দিন-পনরোর বেশি থাকতে সাহস হ'ল না শ্যামার। মুখে সে ঘরের অজুহাতই দেখায়, 'কি জানি মা, মুখপোড়া চক্কত্তী যদি জোর ক'রে তালা ভেঙে এসে ঢোকে —সেই ভয়!' কিন্তু আসল ভয় তার অন্যত্র—সেটা উমা বুঝতে পারে। নরেন যদি ইতিমধ্যে এসে ফিরে যায়—আর যদি কোনদিন না ফেরে—রাগ ক'রে চলে যায় চিরকালের মত—এই ভয়ই ওর সবচেয়ে বেশী। একদিন উমা সেই প্রসঙ্গটা স্পষ্টই তুললে, বললে, 'অত ভাবিস নি, জামাইবাবু এসে যদি দেখেন ঘরে চাবি দেওয়া ত বুঝতেই পারবেন এখানে এসেছিস্—চলে আসবেন সোজা।'

'হ্যাঁ—তার ভাবনায় ত আমার ঘুম হচ্ছে না। তুইও যেমন। তা নয়—ঘরটার জন্যেই। আশ্রয় চলে গেলে কোথায় দাঁড়াব বল্!'

উমা একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বলে, 'যদি তার ভাবনাই না থাকে ত অত ভাবছিস কেন, আর সেখানে উপোস করতেই বা যাবি কেন? এখানেই থাক না —দুজনে থাকলে তবু সুবিধে, যা হয় ক'রে চালাব। না হয় দু বোনে পৈতে কাটব, ঠোঙা গড়ব—তাতেই দুটো ছেলেমেয়ে মানুষ হয়ে যাবে।'

'বাপ রে!'—শিউরে ওঠে শ্যামা, 'অমন কথা মুখে উচ্চারণ করিস নি ভাই, স্বামীকে ছেড়ে চিরকাল বাপের বাড়ি দাসীবিত্তি করা, সে আমি পারব না। বাপ থাকতে ছেলেমেয়েগুলোকে পিতৃপরিচয়ে বঞ্চিত করলে এর পর ওরা কি বলবে! তার চেয়ে সেখানে উপোস ক'রে পড়ে থাকাও ভাল। আর ক'টা দিন গেলে, ছেলেটা আট বছরের হ'লেই পৈতে দিয়ে দেব যেমন ক'রে পারি—তারপর ত আর ভাবনা নেই। ও ঘরটা ত বজায় থাকবেই—চাই কি অন্য যজমানী ক'রেও খেতে পারবে। মেয়ের বিয়ে দিতে হবে—সে ভাবনাও আছে।'

উমার মুখ আজও অপমানে রাঙা হয়ে উঠল। শ্যামা কি বোঝে না তার কথা —না, ইচ্ছে ক'রেই আঘাত দেয়!

খানিকটা চুপ ক'রে থেকে তবু শান্ত কণ্ঠে বলে, 'ছেলেকে পুরুতবামুন করবি?'

'তা কি করব বল্! সবাই কি আর লেখাপড়া শিখতে পারে? অল্প বিদ্যেয় শাঁখে ফুঁ—চলতি কথাতেই ত আছে। তাছাড়া শিষ্যি-যজমান দেখা ত ওদের কুল-কর্ম।'

উমা আর কথা বলে না। এদের সামনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতেও তার লজ্জা করে।...

শ্যামা গুছিয়ে পুঁটলি বাঁধে। মার কাছ থেকে জোর ক'রে সোনা যোগাড় ক'রে দু'গাছা পেটি গড়িয়ে নেয়। রাসমণি বললেন শুধু, 'ক'দিন রাখতে পারবি মা—আবার ত বাঁধা দিতে হবে, নয়ত বিক্রি করতে হবে!'

শ্যামা অম্লান বদনে বলে, 'সেজন্যেও ত দরকার। আর বাপের বাড়ি এসেও এমনি কড় নোয়া সার ক'রে যদি যাই ত লোকে বলবে কি?'

চাল ডাল তেল নুন মশলাপাতি গুছিয়ে নিতে কিছু ভুল হয় না। মায় বাসন-কোসন কাপড়-চোপড় পর্যন্ত। একদিন দিদির বাড়ি গিয়ে তার ছেলের পরিত্যক্ত ছোট-হয়ে-যাওয়া গরম জামা সব চেয়ে নিয়ে আসে। সামনে শীত আসছে। কমলা ওর লোলুপতা দেখে বিস্মিত হয়—একটু লজ্জিতও হয় বুঝি বা, বলে, 'আমি না হয় নতুন জামা করিয়ে দিচ্ছি। ওগুলো—'

'না, না। কি দরকার! সে তুমি বড়জোর দুটোই দেবে দুজনকে। এ আমি অনেকগুলো পাচ্ছি। এ ত তোমার কোন কাজে আসবে না। ঝিয়ের ছেলেমেয়েকে দেবে শেষ পর্যন্ত। তার চেয়ে আমাকে দুটো নগদ টাকা দিও, খেয়ে বাঁচবে ওরা।'

কমলা ভেবেছিল, কথার কথা! কিন্তু যাবার সময় সত্যিই শ্যামা চাইলে, 'কৈ দিদি, টাকা দুটো? ভেবে ছাখো, নতুন জামা করাতে গেলে কত বেশি পড়ত তোমার!'

কমলা দুটো নয়—পাঁচটা টাকাই এনে ওর হাতে দিলে; তার সঙ্গে নিজের দুটো পুরোনো আর একটা নতুন শাড়ি।

কিন্তু শ্যামার এই নির্লজ্জতায় সে যেন মরমে মরে গেল।

তার সেই ফুলের মত সুন্দরী বোন! শৌখিন ভদ্র বিবেচক বোনের বদলে সে দেহে এ কে এল? এ কী মৃত্যু ঘটল শ্যামার!

সব গুছিয়ে নিয়ে গাড়ি ডাকিয়ে যাবার সময় শ্যামা মাকে উপদেশ দিয়ে গেল, 'আপনার গুরুদেবকে ডাকিয়ে এনে উমিকে যা হোক একটা দীক্ষা দিন মা। তবু পুজো-আচ্চায় মনটা ভুলে থাকবে। সত্যি, ও কী নিয়েই বা থাকে বলুন!'

রাসমণি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'তুমি নিজের চরকায় তেল দাও মা, আমাকে আর জ্ঞান দিতে এসো না।'

শ্যামাকে মুখে যা-ই বলুন, কথাটা নিয়ে রাসমণিও খুব নাড়াচাড়া করেন মনে মনে। এ কথা ওঁরও যে মনে হয় নি তা নয়। বংশপরম্পরায় এই কথাই ত শুনে এসেছে সকলে হিন্দুর ঘরে—বিশেষত বাঙালী হিন্দুর ঘরে—'মেয়ের যদি কপাল পুড়ে থাকে ত যা হয় ক'রে তাকে একটা মন্তর দিয়েই দাও…তবু ইষ্টকে নিয়ে ভুলে

থাকবে। ভগবানের দিকে মন থাকলে সংসারের প্রলোভন জয় করতে পারবে!' এ কথা শুনতে শুনতে সংস্কারে দাঁড়িয়ে গেছে। সে সংস্কার রাসমণির রক্তেও আছে বৈ কি!

তবু রাসমণির মনে সংশয় জাগে। এ সংশয় বহুকালই জেগেছে—হয়ত বা নিজের মন দিয়েই অপরের মনের হদিস পেয়েছেন খানিকটা—ঈশ্বরকে চিন্তা ক'রে এ জন্মের দৈহিক ভোগ-সুখ-প্রলোভন কি সত্যিই ভোলা যায়? কোন শক্ত আঘাত পেয়ে মনে বৈরাগ্য না আসা পর্যন্ত মন কি ফেরানো যায় সংসার থেকে?

সংস্কার ও সংশয়ের, শ্রুতি ও অভিজ্ঞতার এই দ্বন্দ্বে ক্লান্ত হয়ে পড়েন রাসমণি—কিন্তু কিছুতেই যেন কূলকিনারা পান না কোথাও—পথ তাঁর চোখে পড়ে না।

অবশেষে একদিন উমাকেই জিজ্ঞাসা করেন, 'তুই দীক্ষা নিবি মা? নিতে চাস? শ্যামা সেদিন বলছিল, কিন্তু আমি জোর ক'রে দেব না। নেবার জন্যে পরামর্শও দেব না। তোর মন যা বলে তাই কর্।'

উমা স্তব্ধ হয়ে ভাবে খানিকটা। জীবনতরী তার অকূল সমুদ্রে ভাসছে। নাবিক নেই, পথের সন্ধান নেই। তীরের চিহ্ন পর্যন্ত নজরে পড়ছে না। নিবিড় নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ঘিরেছে তাকে—এর মধ্যে পারবে কি কেউ পথ দেখাতে? ঈশ্বর—তিনি কেমন? শুনেছে ত যে তিনিই পরম নাবিক, দিক্‌দিশাহীন জীবনযাত্রার একমাত্র পথ-প্রদর্শক। তাঁকেই অবলম্বন করবে নাকি শেষ পর্যন্ত?

হয়ত আছে ওখানেই পথের ইঙ্গিত, নূতন উষার স্বর্ণাভাস। তাঁর দিকে টেনে নেবেন বলেই হয়ত ভগবান দুঃখ দিয়ে তার মন ফিরিয়ে নিচ্ছেন সংসার থেকে। পুড়িয়ে পুড়িয়ে তাকে খাঁটি সোনা ক'রে নিতে চান তিনি। হয়ত সুখও আছে ঐখানে—

তাঁকে চিনিয়ে দেবেন, হাত ধরে তাঁর কাছে নিয়ে যাবেন যিনি, তিনিই গুরু। 'অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।'—এ ত মাকে প্রত্যহ পাঠ করতে শোনে সে।

মন্দ কি?

উমা আরও একটু চুপ ক'রে থেকে বলে, 'সেই ব্যবস্থাই করুন মা। আমি দীক্ষা নেব।'

'ভাল ক'রে ভেবে ছাখো। তাড়াহুড়ো ক'রো না। যে-সে জিনিস নয় ইষ্টমন্ত্র!'

উমা ভেবে দেখেছে বৈ কি! তবু একটা কিছু অবলম্বন ত পাবে। সেই কথাই জানায় মাকে সে।

কিন্তু রাসমণি আরও বিপদে পড়েন। সেকালে ইচ্ছামত শৌখিন গুরু বেছে

নেবার প্রথা ছিল না। কুলগুরু ত্যাগ করতে নেই—'গুরু ছেড়ে গোবিন্দে ভজে, সে পাপী নরকে মজে'—এই ছিল ওঁদের বিশ্বাস। যে মেয়ের বিয়ে হয়েছে, শ্বশুরবংশের গুরুই তার কুলগুরু। কিন্তু তাঁর সন্ধান দেবে কে? অনেক ভেবেচিন্তে মেয়েকে বললেন, 'তুই না হয় আমার জবানীতে—না না কাজ নেই—কমলার জবানীতে জামাইকে একটা চিঠি লেখ্—তোদের কে কুলগুরু আছেন, তাঁর ঠিকানাটা যদি পাওয়া যায়!'

উমা শিউরে উঠল—অন্ধকার পথে সাপ দেখলে মানুষ যেমন শিউরে ওঠে, তেমনি। থরো-থরো-কাঁপা ঠোঁটে সে বললে, 'না মা—দরকার নেই। সবই যখন ত্যাগ করলুম তখন ও গুরুইষ্টও থাক। তবে ওঁরা শাক্ত সেটা জানি—শাশুড়ীর ঘরে দশমহাবিদ্যার পট টাঙানো আছে, সেইখানে বসে নিত্য সন্ধ্যা-আহ্নিক করেন তিনি।'

'না মা। তুমি চিঠি লেখো। কুলগুরু ত্যাগ করতে নেই। তাছাড়া তোমাকে স্বামীর অনুমতিও নিতে হবে।'

স্বামীকে চিঠি লিখতে হবে! এই প্রথম—এতকাল পরে—তাও পরের জবানীতে।

উমার মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। কেন, কেন তাকে নিয়েই বা বার বার এই ছেলেখেলা?

কুলগুরু? কিসের কুল তার—কে-ই বা তার স্বামী! যে স্বামী একবার মাত্রও স্পর্শ করলেন না তাকে, পায়ে স্থান দিয়েও স্ত্রী ব'লে স্বীকার করলেন না!

আবার মনে হয়, স্বীকার করেছেন ঠিকই।

সেদিনের কথাটা মনে পড়ে যায়, '…না না উমা, এ আমি ভাবতেই পারি না। এ কাজ কোরো না, ছি!'

স্বীকার করেছেন ঠিকই। কিন্তু এভাবে চিঠি লেখা?

তবু লেখে সে। লিখতে বাধ্য হয়। তিন-চারখানা চিঠি ছিঁড়ে দিদির জবানীতে একটা চিঠি লেখে—শুষ্ক, প্রয়োজনীয় চিঠি।

এই প্রথম চিঠি। প্রথম স্বামী-সম্ভাষণ—কৈশোরে পা দেওয়ার পর থেকেই যে চিঠি লেখার স্বপ্ন দেখে মেয়েরা। হায় রে!

উত্তর আসে তিন-চার দিনের মধ্যেই। অস্পষ্ট হস্তাক্ষর—আঁকাবাঁকা লাইন—তবু চিঠি। এই প্রথম চিঠি স্বামীর কাছ থেকেও।

প্রিয়—প্রিয়তম-দয়িতের চিঠি—কল্পনা করতে চেষ্টা করে উমা, খোলবার আগে।

চিঠি তাকেই লেখা—

'কল্যাণীয়াসু—তোমার পত্র পাইয়া নিজেকে আরও অপরাধী মনে হইতেছে। ঈশ্বর আমাকে কোনদিনই ক্ষমা করিবেন না—অথচ যে জালে জড়াইয়াছি—ছাড়া পাইবারও উপায় নাই।...যাক্—যখন আমাদের কোন সংস্রব রাখ নাই—গুরুর ব্যাপারেও আর যোগ রাখিও না। তোমার মার গুরুদেবের কাছেই মন্ত্র লইও। আমি অনুমতি দিতেছি, তাহাতে দোষ হইবে না...যদি কোন পাপ হয়—সেও আমার হইবে। ইতি—তোমার হতভাগ্য স্বামী শরৎ।

পুঃ—কোন অধিকার নাই, তবু সেদিনের কথাটা ভুলিতে না পারিয়া তিন-চারদিন থিয়েটারে গিয়াছিলাম, কিন্তু তোমাকে দেখিতে না পাইয়া বুঝিয়াছি আমারই ভুল, ক্ষমা করিও।'

বার বার পড়ে উমা। বার বার বুকের কাছে রেখে দেয়।

চোখের জলে আর বুকের ঘামে অক্ষর অস্পষ্টতর হয়ে ওঠে—তবু যেন আশা মেটে না।

আশাও জাগে কোথায়, হয়ত তার স্বামী তার কাছে একদিন ফিরে আসবেন, নইলে এত খবর রাখতেন না। চিঠিতে অনুতাপের সুরও স্পষ্ট। সারারাত চিঠিটা গালের নিচে রেখে জেগে কাটিয়ে দেয় উমা।

দুই

আর এক নতুন সমস্যা দেখা দিল। গুরু কাকে করবেন এই নিয়ে মহা চিন্তায় পড়লেন রাসমণি।—সব শুনে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'যখন কুলগুরুই ত্যাগ করতে হবে তখন আর আমার গুরুবংশ ধরে কাজ নেই। গুরুদেব দেহ রেখেছেন, গুরুভাই যে আছে সে শুনেছি তো লোক ভাল নয়, মদ গাঁজা খায়—হয়ত অভক্তি হবে তার ওপর। তার চেয়ে বড় জামাইয়ের সন্ন্যাসী গুরু আছেন এক, তাঁর কাছেই নয়ত দীক্ষা নে। কী বলিস্!'

উমা আর কি বলবে, সে চুপ ক'রেই রইল।

তবে দিদির গুরুকে দেখে তার শ্রদ্ধাই হ'ল। দীর্ঘদেহ, গৌরবর্ণ—প্রৌঢ় সন্ন্যাসী। গেরুয়া পরেন কিন্তু জটা নেই। পিঠ পর্যন্ত এলানো দীর্ঘ কেশ। কপালে তান্ত্রিকদের মত রক্তচন্দনের ফোঁটা। অত্যন্ত মিষ্টভাষী—সস্নেহ ব্যবহার সকলের সঙ্গেই। গানের গলাটি ভাল—যখন-তখন রামপ্রসাদী গান ধরেন, উমা সে গান শুনে চোখে জল রাখতে পারে না।

যত্ন ক'রে দীক্ষা দিলেন, প্রতিদিন এসে অভ্যাস করান, উপদেশ দেন, শিক্ষা দেন।

উমা প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে এই নতুন জীবনকে। দিনে দিনে অন্তত একটা বৈরাগ্য ঘিরে ধরে ওকে, জগৎ থেকে সে যে প্রত্যহই দূরে সরে যাচ্ছে এটা সে অনুভব করে নিজে নিজেই।

গুরু প্রথম প্রথম নিত্য আসতেন, তারপর নিয়মিত দুদিন অন্তর আসতে লাগলেন। উমা তাঁকে ভক্তি করে দেবতার মত, সেবা করে সন্তান বা পিতার মত। রাসমণি তার এই ভাব দেখে মনে মনে শান্তি পান।

হঠাৎ একদিন গুরুদেব বললেন, 'উমা, তোমাকে মা নিজে পাঠিয়েছেন আমার কাছে। তোমার জীবন সার্থক। মহাভাগ্য তোমার, তাই লোকে যেটাকে সৌভাগ্য বলে তা থেকে বঞ্চিত হয়েছ।'

হেঁয়ালি বুঝতে না পেরে, উমা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

গুরুদেব হাসেন, 'পাগলী, এটা আর বুঝলি না? আমার সিদ্ধির জন্যে এমনি একটি মেয়েই দরকার ছিল—যখন খুঁজে খুঁজে প্রায় আশা ছেড়ে দিয়েছি তখন মা তোকে মিলিয়ে দিলেন অভাবনীয় ভাবে। এ তাঁর দয়া ছাড়া আর কি? তোর ওপরও দয়া কম ভাবিস নি। সাধনার কাজে লাগবি—এ কি এক জন্মের সুকৃতি ভেবেছিস? জন্ম-জন্মান্তরের পুণ্য। স্বামী যদি তোকে গ্রহণ করতেন, তাহ'লে সম্ভব হ'ত না।'

সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ হয় উমার। সত্যিই কি মার এত দয়া তার ওপর? সত্যিই কি এ তার জন্মান্তরের সুকৃতি? তার জীবন অধিকতর সার্থক করবেন বলেই কি তাকে আপাত-সার্থকতা থেকে বঞ্চিত ক'রে রেখেছেন?

সে যেন বিশ্বাস করতে পারে না কথাটা, তবু খুশির ঢেউ বয়ে যায় তার মনের ওপর দিয়ে। সাধনার সহায় হবে সে? তপস্যার সঙ্গিনী হবে গুরুদেবের? তপস্বিনী, সন্ন্যাসিনী হবে সে?

সাগ্রহে প্রশ্ন করে গুরুদেবকে, 'সে সাধনা কবে শুরু করবেন বাবা? কী করতে হবে তাতে আমাকে?'

'বলব রে, বলব!' ওর ডান হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে সস্নেহে চাপ দেন তিনি।

প্রায়ই প্রশ্ন করে উমা—কল্পনা করতে চেষ্টা করে অনেক রকম কিন্তু কোনটাই যেন মেলে না।

গুরুদেবও ঠিক স্পষ্ট জবাব দেন না। নীরবে সস্নেহে পিঠে হাত বুলোন। নয়ত

ওর বিপুল কেশভার-সুদ্ধ মাথাটা নিজের কোলে টেনে নিয়ে মাথায় হাত দিয়ে আদর করেন।

ইদানীং ওঁর কথাবার্তাও যেন কি রকম অদ্ভুত হয়ে উঠেছে। উনি অবশ্য বলেন, 'গুরুর কাছে শিষ্যের কোন অবস্থাতেই কোন সঙ্কোচ নেই' কিন্তু উমা লজ্জাই পায়। উনি পুরাণ থেকে গল্প বলেন, সব আদিরসাত্মক। জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে নানা উদাহরণ দেন উপদেশের মধ্যে, তাও যেন কেমন কেমন!

উমার ভাল লাগে না এসব। অথচ গুরুদেবের সামনে থেকে যেতেও পারে না। সে কেবল বলে, 'ওসব কথা থাক বাবা—আপনি আমাকে কবে তপস্যার কাজে টেনে নেবেন তাই বলুন, কী করতে হবে আমাকে বুঝিয়ে দিন্। আমি সন্ন্যাসিনী হ'তেই চাই।'

অবশেষে একদিন শোনে সে—কী করতে হবে তাকে।

ছুটে এসে মার কাছে মাথা খোঁড়ে—ঢিব্ ঢিব্ ক'রে।

'কী হ'ল রে, কী হ'ল?'

'মা, কেন গুরুদেবের ওপর ভক্তি রাখতে পারছি না, কেন এমন সব সন্দেহ জাগছে মনে? কী হবে আমার?'

'কী হ'ল বল্ ত', জোর ক'রে ওর মুখখানা তুলে ধরেন রাসমণি!

'উনি ত বলছেন এ বড় পুণ্যের কাজ, ওঁর সাধনার সহায় হওয়া—কিন্তু আমি ত—না মা—সে আমি পারব না। আমি যে ওঁকে সাক্ষাৎ ইষ্ট বলেই জানি মা।'

পাথর হয়ে যান রাসমণি।

'তুই বোস্। আমি আসছি।' তিনি উঠে এসে গুরুদেবের সামনে হাতজোড় ক'রে বললেন, 'ভগবান যাকে মারবেন তার আশ্রয় কোথাও নেই, এইটেই আজ বুঝলুম। আপনি ওকে অব্যাহতি দিন। আর আপনি আসবেন না।'

গুরুদেব মুখ কালি ক'রে চলে গেলেন।

উমা রাসমণির সামনে মাথা খুঁড়তে খুঁড়তে বললে, 'এ সংশয় কেন এল মা? সত্যিই কি আমার কোথাও আশ্রয় নেই? তবে আমি কি করব?'

একাদশ পরিচ্ছেদ

এক

একটি একটি ক'রে বছর কাটে।

মহাকাল তাঁর হিসেবের খাতায় একটি ক'রে পাতা ওল্টান! সেই পাতার মধ্যে বহু সুখদুঃখের বিবরণ চিরকালের মত চাপা পড়ে যায়। কত মর্মান্তিক

ইতিহাস—কত বুকভাঙা বেদনা।

আজ যা মনে অসহ্য—কাল তাই একটা অস্পষ্ট বেদনাদায়ক অনুভূতিতে পরিণত হয়ে স্মৃতির কোন্ সুদূর দিগন্তে মিলিয়ে যায়!

শ্যামারও বছর কাটে। এক-এক সময় মনে হয় বুঝি কাটল না কিছুতে—মনে হয় এতকাল পরে সংসারের তরণী বুঝি এই ঘূর্ণিতে ডুবল, বুঝি বা এই তুফানে বানচাল হ'ল। আবারও তা কোনমতে হেলে-বেঁকে একসময় সোজা হয়ে দাঁড়ায়। স্তব্ধ নিঃশ্বাস আবার সহজে বেরিয়ে আসে—উঁচু পর্দায় বাঁধা স্নায়ুতন্ত্রী আবার নিশ্চিন্ত আলস্যে শিথিল হয়ে যায়। এই ত প্রায় প্রতি দরিদ্র সংসারের ইতিহাস। শ্যামার জীবনেই বা তার অন্যথা হবে কেন?

নরেনের ডুব মারাটা আজকাল সয়ে গেছে শ্যামার। বরং যখন সে আসে তখনই যেন বেশী অসহ্য বোধ হয়। চালটা পায় বটে—স্বামীকেও কাছে পায়—এই পর্যন্ত, কিন্তু তার ঝঞ্ঝাট-ঝামেলাও বড় কম সইতে হয় না। শ্যামার এক-এক সময় মনে হয় আর বুঝি সে পারে না।

মঙ্গলা ঠাকরুণ অবশ্য এদের তাড়াবার চেষ্টা কম করেন নি। আগের পূজারীকে দিয়েই যখন পুজো করাতে হবে অর্ধেকদিন, তখন মিছিমিছি এরা ঘর-জোড়া ক'রে থাকে কেন? তাছাড়া সে পূজারীও বড় গোলমাল করে—নরেন মধ্যে মধ্যে এসে দেড়মাস দু'মাস থাকে যখন, তখন তার বরাদ্দ মারা যায়। প্রথম প্রথম ঝগড়া ক'রে নরেনকে দমিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু দু'একবার মাত্র সে চেষ্টার পর হাল ছেড়ে দিয়েছে। নরেন একেবারে কাটারি কি বঁটি ধরে। সে সময় তার যা প্রচণ্ড মূর্তি হয়, তাতে সামনে দাঁড়ানো শক্ত। অগত্যা চুপ ক'রে সহ্য করা ছাড়া পূজারীর উপায় থাকে না—সহ্যই করে, আর মধ্যে মধ্যে অনুযোগ করে মঙ্গলা ঠাকরুণের কাছে।

অথচ মঙ্গলাই বা কি করবেন ভেবে পান না! এ হয়েছে তাঁর স্বখাত সলিল। নরেনের দ্বারা ভাল পুজো হবে সে আশা-ভরসা আর তাঁর নেই। ও যেন গেলেই তিনি বাঁচেন। বিশেষত নরেনের প্রকৃতির যে পরিচয় তিনি পাচ্ছেন দিন দিন, তাতে এ বিশ্বাসও বদ্ধমূল হয়েছে যে, নতুন বামুনঠাকুর একেবারে পাগল। একদিন ত হাতে-নাতেই ধরলেন। পাইখানার কাপড়ে এসে, না স্নান না কিছু, পুজো করতে বসে গেল। হাঁ-হাঁ ক'রে এলেন মঙ্গলা ঠাকরুণ, 'ও কি ঠাকুর, ও কী করলে গো! সর্বনাশ করলে! এখুনি তুমি বেরোও—বেরোও বলছি!'

প্রথমটা নরেনও একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল, 'কেন গো, কী হ'ল আবার?'

'কী হ'ল আবার জিজ্ঞেস করছ! সদ্য পাইখানার কাপড়ে এসে ঠাকুর ছুঁলে।

আবার বলা, কি হ'ল ?'

'কে বললে পাইখানার কাপড়—না ত !'

'আবার মিছে কথা বলছ ঠাকুর ? আমি স্বচক্ষে দেখলুম তুমি মাঠ থেকে পুকুরে গেলে আর সোজা উঠে এসে গাছ থেকে ফুল পেড়ে নিয়ে মন্দিরে ঢুকলে। আমি দাঁড়িয়ে দেখছিলুম আক্কেলখানা। তা এত সাহস যে হবে তা স্বপ্নেও ভাবি নি। ধন্যি বুকের পাটা বাবা। যাক্ যা হয়েছে তা হয়েছে। খুব আক্কেল হয়েছে আমার। এখন বেরোও, আমি বেচা ঠাকুরকে ডেকে অভিষেক করাই—। আজই তুমি বিদেয় হয়ে যাবে আমার ভিটে থেকে—বলে রাখলুম।'

মিছে কথা বলে পার পাবার আর উপায় নেই দেখে নরেনও নিজমূর্তি ধরলে, 'থাম্ মাগী—মেলা ভ্যানর ভ্যানর করিস নি। ঠাকুরের সেবা কি হবে না হবে সে কথা বামুন বুঝবে আর ঠাকুর বুঝবে। এ হ'ল গে আমাদের কাজ, যার যা। বলে যার কম্ম তারে সাজে অন্যের মাথায় লাঠি বাজে !'

তবু মঙ্গলা হাল ছাড়েন না। বলেন, 'তাই বলে তুমি যা-তা কাপড়ে ঠাকুর ছোঁবে ? হেগো-হাতে পুজো করবে ?'

নরেন খিঁচিয়ে ওঠে, 'আলবত করব। মাগী, এত শাস্তর জানিস আর এটা জানিস না যে বামুন এক পা গেলেই শুদ্ধ ? হাওয়া লাগলেই বামুন শুচি হয় তা জানিস না ? না জানিস ত জিজ্ঞেস ক'রে দেখ্ গে যা কোন টুলো পণ্ডিতকে। শুনেছি ত মন্তর হয়েছে, সেই গুরুকেই জিজ্ঞেস করিস।'

এই বলে সে ঠাকুরকে স্নান করাতে শুরু ক'রে দিলে।

'এ ত কম অত্যেচার নয় গা ! বামুন বলে যা খুশি তাই করবে ?'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ। করব। বামুনের পায়ের ধুলো ভগবান বুক পেতে নেন। তোরা শুদ্দুর, কি বুঝবি এর মম্ম ! আমরা হলুম গে গুরুবংশ। আমরা সব জানি।'

সম্প্রতি কালনায় গিয়ে কথকতা শুনে এসেছে নরেন। এখনও মনে আছে ঘটনাটা। শুধু ভৃগুর নামটা মনে পড়ল না ব'লে আফসোস হ'তে লাগল। নইলে জমত আরও।

মঙ্গলা তবু একবার শেষ চেষ্টা করলেন, 'আমি ঠাকুর তোমাকে রাখব না, আমার খুশি, তুমি আজই পথ দেখবে। সিধে বাত !'

তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে উঠে যেন ছিটকে বেরিয়ে আসে নরেন, 'যেতে পারি আমি, কিন্তু পৈতে ছিঁড়ে ঐ নারায়ণের সামনে মাথা খুঁড়ে ব্রহ্মরক্ত-পাত ক'রে চলে যাবো তা বলে দিলুম। ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করো—তোমার তাতে ভাল হবে ত ?'

এর পর আর একটি কথাও বলতে সাহসে কুলোয় নি মঙ্গলার। তখনকার দিনে কুলোনো সম্ভবও ছিল না। তিনি এক পা এক পা ক'রে পিছিয়ে চলে গেলেন বিড়বিড় ক'রে বকতে বকতে, 'ষাট্ ষাট্! এ কি সাংঘাতিক সর্বনেশে লোক রে বাবা! আজই বাছাদের কপালে পাঁচ পয়সা ক'রে ঠেকিয়ে তুলে রাখতে হবে। মার ওখানে যেদিন যাবো পুজো দেব। হে হরি, হে নারায়ণ, রক্ষে করো বাবা!'

নরেন একা দাঁড়িয়ে হি হি ক'রে হাসতে লাগল সেখানেই।

সব শুনে শ্যামা বলেছিল, 'তারপর? তোমার ত ছুট্ বলতেই যাওয়া। একা পেয়ে আমাকে যদি একদিন তাড়িয়ে দেয়?'

'ইস্, দিলেই হ'ল! আমার বৌ হয়ে এই কথা তুই মুখে আনলি! ওরে হাজার হোক আমরা হলুম বামুন, গোখ্‌রো সাপের জাত। আমাদের ঘাঁটাতে সাহস করবে না সহজে।...তেমন হয় বলবি—এই আমি তিনদিন উপোস ক'রে পড়ে রইলুম। তে-রাত্তির ক'রে তবে বেরোব।'

তখন সে কথায় অতটা আমল দেয় নি শ্যামা। কিন্তু একসময় কথাটা খুব কাজে লেগে গেল। মঙ্গলা একদিন স-পুত্রকন্যা একেবারে রণচণ্ডী মূর্তিতে এসে দাঁড়ালেন, 'বাম্‌নি, তুই যাবি কিনা, বল্। না বেরোস্ ত জোর ক'রে বার ক'রে দোব। ভাল চাস্ ত মালপত্তর যা নিয়ে যেতে হয় নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যা—আমি গাড়িভাড়া দিচ্ছি।'

মরীয়া হয়ে মানুষ যা করতে পারে, আগে থেকে তা কল্পনা করা শক্ত। নরেনের মুখে কথাটা শোনবার সময়ে শ্যামা কল্পনাও করে নি যে ঐ কথাগুলো সত্যিই তার মুখ দিয়ে বেরোবে। কিন্তু এখন, যখন একান্ত অসহায় অবস্থায় পড়ে মনে হ'তে লাগল ওর পায়ের নিচে থেকে মাটি সরে যাচ্ছে, তখন অনায়াসেই সে বলে ফেললে, 'আমার স্বামী বাড়ি নেই বলে দল বেঁধে গায়ের জোর দেখিয়ে আমাকে তাড়িয়ে দিতে এসেছেন মা—বেশ, গায়ে হাত দিয়ে বার করতে হবে না—আমি নিজেই ছেলেমেয়ের হাত ধরে রাস্তায় গিয়ে বসছি। তবে অমনি যাব না মা—রাস্তার ওপর ত আর আপনার জোর নেই—আপনার বাড়ির সামনে বসে তে-রাত্তির ক'রে—যদি যেতে হয় ত তখন যাবো। জিনিসপত্তরে কি দরকার—ও আপনারা ফেলে দিন। আয় রে খোকা—'

মঙ্গলা অবাক্ হয়ে গালে হাত দিয়ে থাকেন কিছুকাল।

'শুনলি, তোরা শুনলি একবার! যেমন দ্যাবা তেমনি দেবী। বেইমানের ঝাড় একেবারে। এতকাল ঘরে রেখে পুষলুম, তার এই শোধ, আমারই সব্বনাশ করার

চেষ্টা! বেশ, তাই তুমি থাকো মা, আমার ঘর-জোড়া ক'রে। তাই যদি তোমার ধম্মে বলে তাই করো।'

সদলবলে গজ্‌গজ্‌ করতে করতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। শ্যামাও সেদিন হেসেছিল আপন মনে—পাগলই হোক বদমাইশই হোক কিন্তু লোকটার যে বুদ্ধি আছে তা মানতেই হবে।

দুই

সেদিন থেকে সোজাসুজি তাড়াবার চেষ্টা আর মঙ্গলা করেন নি। কিন্তু তাছাড়া যত রকমে করা যায় তার কোন পথটাই বাদ দেন নি। হেম,আর মহাশ্বেতার ওপর ত অত্যাচারের অন্তই ছিল না—শ্যামার পক্ষেও সে সব সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। শুধু আর কোথাও কোন পথ নেই বলে চুপ ক'রে সইতে হ'ত।

এমনিই ত দিন চলে না। নরেন যখন থাকে না তখন বরাদ্দ চাল বন্ধ হয়ে যায়—গহনা যা সামান্য থাকে তাতে কয়েক দিনও চলে না ভাল ক'রে। তারপর উপবাস। খুব অসহ্য হয় যখন ছেলেমেয়েগুলোকে ঘরে চাবি দিয়ে রেখে শ্যামা চলে যায় হেঁটে কলকাতায়—মার কাছে একবেলা খেয়ে কিছু চাল ডাল টাকা নিয়ে আবার হেঁটেই ফিরে আসে। ছেলেমেয়েদের নিয়ে যেতে ভরসা হয় না—ঘরে যদি আর ঢুকতে না পায় ফিরে এসে!

নরেন থাকলে—এক-আধবার যখন মেজাজ ভাল থাকে তখন সে নিজেই ওদের পাঠিয়ে দেয়, বলে, 'তুই নিশ্চিন্তি হয়ে চলে যা ছোট বৌ—আমি এই মাটি কামড়ে পড়ে রইলুম, তুই না ফিরলে নড়ছিনি!' সে রকম ক্ষেত্রেও সাত-আট দিনের বেশি থাকতে ভরসা হয় না। তবু তাতেই ঢের উপকার হয়। রাসমণি নামই দিয়েছেন, দুর্ভিক্ষ অবতার। আসে যখন কঙ্কালসার চেহারা, একমাথা উকুন, গায়ে ময়লা ছেঁড়া কাপড়। এখানে এসে মাথা ঘষে, তেলসাবান মেখে চক্‌চকে হয় আবার—নতুন কাপড় পায়, ছেলেমেয়েদের অঙ্গেও জামাকাপড় ওঠে। যাবার সময় পাঁচ-দশটা টাকাও আঁচলে বেঁধে ফেরে।

এর বেশি রাসমণি দেন না। প্রথমত তাঁরই সংসার চলা শক্ত। আরও কতদিন বাঁচতে হবে তাঁকে কে জানে, উমারও ত এই অবস্থা—বিশেষ ক'রে উমার চিন্তাই যেন তাঁকে আরও বেশি বিব্রত ক'রে তুলেছে। সেক্ষেত্রে কত টাকা ওদের দেওয়া সম্ভব? তাছাড়া নরেনকে বিশ্বাস করেন না তিনি একটুও, বেশি টাকা নিয়ে মেয়ে ফিরলে সে টাকা তার ভোগে হবে কিনা সন্দেহ!

শ্যামা কিন্তু এতে একটু ক্ষুণ্ণই হ'ত। দীর্ঘকাল ধরে অহরহ দারিদ্র্য ও

উপবাসের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে ওর মনটাও যেন পাল্‌টে গেছে অনেকটা। মা যে বেশি ক'রে টাকা দেন না, সেটা যেন মায়ের অন্যায়। মা কোথায় পাবেন সে কথা একবারও ভাবে না। শুধু এইটেই মনে হয়, নিজেরা ত বেশ ভোগে-সুখে আছেন —আমার বেলাই যত নেই নেই!...ওর মানসিক পরিবর্তন ও নিজেও যেন অনুভব করে—তবু তার প্রভাব এড়াতে পারে না।

কিন্তু মার আশঙ্কা যে কতটা সত্য তা একদিন প্রমাণিত হয়ে গেল। ইতিমধ্যে আবার অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিল শ্যামা। প্রসবের সময় হিসেব ক'রে রাসমণি চিঠি লিখলেন তাঁর কাছে যাবার জন্যে। শ্যামার তা সাহসে কুলোল না। একমাস দেড়-মাস সেখানে থাকতে হবে হয়ত, কিংবা আরও বেশি। তাহলে এ বাসা ঘুচবে চিরকালের মত। মার ওখানে তার আশ্রয় মিললেও মিলতে পারে—নরেনের যে স্থান হবে না এটা ত ঠিক। কাজেই অনেক ভেবেচিন্তে সে মাকে লিখলে, 'কিছু টাকা যদি সম্ভব হয় ত পাঠান মা—যাওয়া আমার হবে না।'

হাজার হোক, সন্তান। রাসমণি অনেক কষ্টে পঞ্চাশটি টাকাই যোগাড় ক'রে পাঠালেন। টাকা যেদিন এল সেদিন নরেন সেখানে উপস্থিত। লোলুপ দৃষ্টিতে টাকাটার দিকে চেয়ে রইল সে, কিন্তু শ্যামার ভয়ে তখন কিছু বলতে পারলে না। ইদানীং শ্যামাও শক্ত হয়ে উঠেছে। তাকে ভয় দেখিয়ে কিছু করা যায় না।

সন্ধ্যার সময় শ্যামা রান্না চাপিয়েছে, নরেন কাছে এসে বসল।

'কি খবর বলো দিকি? এত ন্যাওটোপনা করছ কেন?' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় শ্যামা।

'না—এমনি। অনেকদিন যেন তোকে ভাল ক'রে দেখি নি। মাইরি বলছি ছোটবৌ,এত দুঃখু-কষ্টে এখনও তোর রূপটা কিন্তু নষ্ট হয় নি। এখনও আর এক-বার বিয়ে দিয়ে আনা যায়।'

এ স্তুতির আড়ালে আর কিছু আছে জেনেও পুলকিত হয় শ্যামা। আগুনের তাতে তার শুভ্র ললাটে স্বেদবিন্দুর মধ্যে যে রক্তিমাভা ফুটে উঠেছিল তা নিবিড়তর হয়ে ওঠে।

'আর হবে না-ই বা কেন? আমার শাশুড়ীঠাকরুণের রূপটাই কি কম! অন্ধকারে যেন জ্বলে। কত বড় বংশের মেয়ে। রাজা-রাজড়ার ঘরে মানাত তোকে—নেহাত আমার হাতে এসে পড়েছিস, তাই।'

শ্যামা বাঁকা কটাক্ষে ওর মনের কথাটা বোঝবার চেষ্টা করে কিন্তু বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না। গলাটা হঠাৎ একটু নামিয়ে বলে, 'মাইরি, ছোটবৌ, তোর

তুটি পায়ে পড়ি—তিনটে টাকা দিবি ?'

'টাকা ? টাকা কি হবে ? টাকা কোথায় পাবোই বা।'

'অনেকদিন নেশাভাঙ্ করি নি, তোর দিব্যি বলছি। আজকে শরীরটাও বড় ম্যাজম্যাজ করছে—যাবো আর আসবো। একটু বিলিতি খাবার ইচ্ছে হয়েছে আজ।'

'আচ্ছা, তোমার একটু লজ্জা করছে না। আমার আঁতুড়ের খরচ বলে মা পাঠিয়েছেন—একমাস আঁতুড় ঠেলতে হবে। দাই আছে, খাওয়া-দাওয়া আছে,—তোমার ত পাত্তাই থাকবে না। এ সময় উপোস ক'রে থাকলে চলবে ? তোমারই দেওয়ার কথা—মা পাঠিয়েছেন, বিধবা মানুষ, তাঁকে দেনে-আলা ত কেউ নেই। তাইতেই ত তোমার লজ্জায় মরে যাওয়া উচিত। আর উলটে কি না—ছি ছি ! তোমার কাছে থেকে ঘেন্না-লজ্জা আর আশা করি না, তবু মানুষের কোন পদার্থ কি আর নেই ?'

'মাইরি বলছি, এই তোর তুটি পায়ে পড়ছি—এইবারটি দে, তারপর যদি লক্ষ্মীছেলে হয়ে ঘরে বসে না থাকি ত কি বলছি। তু'মাস কোথাও নড়ব না—এই পৈতে ছুঁয়ে বলছি। তোকে, ছেলেমেয়েদের রেঁধে দিতে হবে না ?'

কোমল হয়ে আসে শ্যামার মন। সে আস্তে আস্তে গোপন ভাণ্ডার থেকে তিনটি টাকা বার ক'রে দেয়।

তিন

সেই দিনই রাত্রে শ্যামার ব্যথা উঠল। তখন আর উপায় নেই—পাড়ায় যে তুলে-বৌ দাইয়ের কাজ করে তাকেই ডেকে পাঠাতে হ'ল। ছ'বছরের ছেলে হেম সেই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে অন্ধকার রাত্রে তাকে ডাকতে গেল—আর দ্বিতীয় লোক কৈ ! মঙ্গলা ঠাকরুণ অবশ্য পরে এলেন—কিন্তু তাঁর ছেলেমেয়েদের ঘুম থেকে তুলে যে দাই ডাকতে পাঠাতে দেবেন না তিনি—এটা শ্যামা বেশ জানত।

হেম ভয়ে চোখ বুজে হোঁচট খেতে খেতে কোনমতে গেল—আসবার সময় তুলে বৌ সঙ্গে এল এই যা ভরসা। কিন্তু ততক্ষণে আপনা থেকেই একটি মৃত সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে শ্যামার। তুলে-বৌ-এর মুখে খবরটা শুনে শ্যামার তু চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল, এত কষ্টের সন্তান যদি বা হ'ল—বাঁচল না !

মঙ্গলা এসে হেঁট হয়ে দেখে বললেন, 'এ বাছা তোমার সোয়ামীর দোষ। নিশ্চয়ই ওর খারাপ ব্যামো আছে। নইলে এমন হ'ত না। আমি ভাবছিলুম যে রাত-বিরেত অন্ধকারে যাও আমার ফলগাছগুলোর সব্বনাশ করতে—পেটের জ্বালায়

কিছুই ত মানো না—তাই বুঝি কি নজর-টজর লেগেছে! কিন্তু এ ত···দেখেছিস বসনের মা?'

বসনের মা দাই ঘাড় নাড়ল, 'আমারও তাই মনে হচ্ছে মা।'

ওর জা রাধারাণীর কথা মনে পড়ে যায় শ্যামার···তা হ'লে কি তার কোন ছেলেই আর বাঁচবে না?···এর কি কোন প্রতিকার কি চিকিৎসা নেই?

কিন্তু ক্লান্ত চোখ দুটি অবসন্ন হয়ে বুজে আসে। এ সব কথা এখন আলোচনা করতে ইচ্ছাও করে না।

মঙ্গলা আবশ্যকীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে দিয়ে বললেন, 'তবে তুই সব ধুইয়ে মুছিয়ে দিয়ে যা বসনের মা। আমার আবার ঘরদোর পড়ে রয়েছে, কর্তাকে দোর দিতে বলেছি, দিয়েছে কি না জানি না—হয়ত ঘুমিয়েই পড়ল। মনটা আমার সেইখানেই পড়ে রয়েছে। আমি এখন যাই—'

বসনের মাও শেষরাত্রে চলে গেল। ছেলেটা ছেঁড়া কাপড়ে জড়ানো পড়ে রইল—নরেন এসে যা হয় একটা ব্যবস্থা করবে।

বসনের মা যাবার সময় প্রশ্ন করলে, 'দোর?'

'ভেজানো থাক। রাত ত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। উনিও এসে পড়বেন এখন।'

ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ। শ্যামার চোখও তন্দ্রায় অবশ হয়ে আসে। তাই সে টেরও পায় না কখন নরেন এসে ঘরে ঢোকে। নেশায় তার চোখ লাল কিন্তু দৃষ্টিতে ঘুমের আমেজ নেই, তাতে ফুটে উঠেছে অপরিসীম ধূর্ততা। নিঃশব্দে ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটলির মধ্যে থেকে ন্যাকড়ায় বাঁধা টাকাগুলো বার করে। সবগুলোই নিয়ে চলে যাচ্ছিল, কি ভেবে ঘুরে এসে দশটা টাকা রেখে যেমন এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে চলে গেল।

পরের দিন বসনের মা সকালে এসে ঘুম ভাঙাতে শ্যামা হেমকে বললে টাকা বার ক'রে দিতে। কিন্তু পুঁটলি খুলতেই শ্যামা সব বুঝতে পারলে। লজ্জায় অপমানে ঘৃণায় আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ। নরেন চামার—কিন্তু এ যেন তার পক্ষেও বিস্ময়কর আচরণ।

ব্যাপার-গতিক দেখে বসনের মা চারটি টাকা নিয়েই চলে গেল। ক্লান্ত শ্যামা মরা ছেলেটাকে দেখিয়ে বললে, 'ওটার একটা গতি তুমিই করো বসনের মা, যা হোক—'

মঙ্গলা এসেও সব শুনলেন।

[illegible] মা, [illegible] চামার!···তুমি যাই সতী-সাধ্বী [illegible] তাই ওর সঙ্গে ঘর

করো।…ঘেন্না করে অমন ভাতারের নামে।…যাক্ গে, তুমি আজ আর উঠো না, আমিই সাবু ক'রে পাঠিয়ে দিচ্ছি, ছেলেমেয়েদেরও খানকতক রুটি গড়ে দিক পিঁটকী। বামুনের ছেলেমেয়ে, ভাত ত দিতে পারব না। বামুন ঠাকরুণ আবার এই সময় দেশে গেলেন কিনা।'

তারপর একটু থেমে দম নিয়ে বললেন, 'ঐ জন্যেই ত কেবল টিকটিক্ করি—দোরটা যদি উঠে দিয়ে রাখতে…সোয়ামীই হোক যেই হোক—এমন নিঃশব্দে কিছু আর নিয়ে যেতে পারতো না।'

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

এক

হেম একসময় আট বছরে পড়ল। কথাটা অবিশ্বাস্য হ'লেও সত্য। যেখানে এক বছরও কাটবার কথা নয় সেখানে এত কাল কি ক'রে কাটল ভেবেই পায় না শ্যামা।

সরকারদের প্রকাণ্ড বাগানের পাকা তাল, নোনা, আতা, নারকেল, পেঁপে, কলা—চুরি ক'রে ক'রে সংগ্রহ করে শ্যামা। শুধু শ্যামাই বা কেন—হেম, মহা—সবাই! এটা আর গোপনও নেই—সরকাররা সবাই জানে, এখন শুধু চলে লুকোচুরি খেলা—পিঁটকীর ছেলেটা সব চেয়ে বড় শত্রু, সে আজকাল প্রায় সারাদিনই বাগানে বসে থাকে, আর ওদের কারও টিকি দেখলেই নাকে কাঁদে, 'ওঁ মা দ্যাখো, আবার ওঁই বাঁমুনগুলো এঁসেছে চুরি করতে—ওঁ মা—'

আর মহা, ওদেরই কাছে শুনে শুনে গালাগাল শিখেছে, সে আধো-আধো কণ্ঠেই আঙুল মট্‌কে শাপ দ্যায়, 'হতচ্ছাড়া ছেলে মরেও না—মর্ মর্—'

এইভাবে চলে টানাটানি—যখন ধরা পড়ে তখন চোরের মার খায় একদিন, বামুনের ছেলে ব'লে রেয়াৎ করে না কেউ। শ্যামা দিনের আলোয় ও চেষ্টা করে না—রাত্রির অন্ধকারে গা ঢেকে ঘুরে বেড়ায় নিশাচরী প্রেতিনীর মত। আগে আগে সরকাররা ভয় পেত, সত্যি-সত্যিই 'অপ্সি দেবতা' মনে ক'রে চিৎকার ক'রে রামনাম করতে করতে দৌড়ত, অন্ধকারের মধ্যে সাদা কাপড় পরা ওকে দেখে—কিন্তু ক্রমে কথাটা জানাজানি হয়ে পড়ায় তারাও নির্ভয়ে বেরোয় বাগানে। তাল কি নারকেল পড়ার শব্দ হ'লেই দু দলে চলে প্রতিযোগিতা—কে আগে আসতে পারে। সরকারদের ছেলেমেয়েরাও নির্ভয়ে বেরিয়ে আসে—বামনী ত আছেই বাগানে, ভয় কিসের?

যেদিন শ্যামা আগে পৌঁছয়, ফল সংগ্রহ ক'রে নিয়ে নিঃশব্দে ফিরে চলে আসে।

ওরা সারা বাগান তোলপাড় ক'রেও কিছু খুঁজে পায় না। তখন ফিরে যাবার সময় হেমদের জানলার কাছে এসে দাঁড়িয়ে গালাগাল দিয়ে যায়, 'বামুন না ঘোড়ার ডিম! চোর, চোর সব! চোর আবার বামুন হয়? মর্ মর্—ওলাউঠো হোক্!'

কিন্তু শুধু ত সংগ্রহ করাই নয়—তা থেকে কিছু অর্থ-সমাগমও প্রয়োজন।

সেটা আরও কঠিন। পাড়াগাঁয়ে সবাই কিছু কিছু জমি নিয়ে বাস করে—ফল-ফুলুরী সব্জী প্রত্যেকের বাড়িতেই হয়, সুতরাং পাড়াঘরে এসব কেনবার লোক নেই। বিক্রি হয় সুদূর শিবপুরের বাজারে পাঠালে—কিংবা আরও দূরে—শালিমারে। একসঙ্গে সব কিছু সংগ্রহ হয় না। রোজ রোজ অত দূরে যায় কে? কাজেই অধিকাংশ দিনই ঐ সব পাকা ফল খেয়ে ফেলতে হয়, ঐ খেয়েই জীবনধারণ করতে হয়। যে দিন দু' রকম তিন রকম জিনিস জমে সেদিন শ্যামা বেরোয় খদ্দেরের খোঁজে। তাও পাহারার শেষ নাই। অনেকক্ষণ ধ'রে একটা একটা ক'রে জিনিস সরিয়ে কোন গোপন স্থানে রেখে আসে, তারপরে মা ছেলে দু' পথে গিয়ে সেখানে মিলিত হয়। মহা একা বাড়ি থাকে। শ্যামা মাল বয়ে নিয়ে গিয়ে বাজারের বাইরে কোথাও গাছের আড়ালে অপেক্ষা করে, হেম ভেতরে গিয়ে বিক্রি করে। দর একেই কম—ছেলেমানুষ দেখে আরও কম দেয়—অর্থাৎ এত কাণ্ড ক'রে, এত পথ হেঁটে পয়সা মেলে কোনদিন দু আনা, কোনদিন দশ পয়সা, কোনদিন বা আরও কম।...ফেরবার পথে যেদিন হেম রৌদ্রের তাপে আউতে-ওঠা দোলনচাঁপার পাপড়ির মত নেতিয়ে পড়ে সেদিন বড়জোর এক পয়সার বাতাসা কিনে মায়ে-বেটায় কোন পুকুরপাড়ে বসে একটু জল খেয়ে নেয়। তার চেয়ে বেশি খরচ করতে ভরসা হয় না, কারণ ঐ সামান্য পয়সা-তেই চাল কিনতে হবে। আজকাল এই ভাত খাবার দিনগুলো ওদের কাছে মহোৎসবের দিন।

আর এত কষ্টের পর যেদিন চালান করার মুখে ছেলেমেয়েরা ধরা প'ড়ে নির্যা-তিত হয়—মালও হয় বাজেয়াপ্ত, সেদিন শ্যামা অন্তরালে থেকে অসহায় ভাবে মাথা খুঁড়ে কপাল ফুলিয়ে ফেলে শুধু—কোন প্রতিকারই করতে পারে না। আর সে নির্যাতনেরও নব নব রূপ—দস্তুরমত যেন গবেষণা ক'রে বার করা হয়। একদিন বা হাত বেঁধে গায়ে আলকুশী ঘষে দেওয়া হ'ল—আর একদিন হয়ত বিছুটি ঘষে জল ঢেলে দিলে গায়ে। এমনি নানারকম কৌশল। সব চেয়ে কষ্ট হয়েছিল শ্যামার যেদিন সত্যিই অপরের বাগান থেকে চেয়ে আনা একটা নোনার জন্য মহাশ্বেতাকে শীতের বিকেলে পুকুরের জলে ডুবিয়ে ওর মাথায় পা দিয়ে চেপে রইলেন অক্ষয়বাবু স্বয়ং, চোর বলেই ধ'রে নিলেন, কোন কথাই বিশ্বাস করলেন

না। দু'তিন মিনিট ঐভাবে থেকে হাঁপিয়ে মেয়ে যখন নীল হয়ে উঠেছে তখন হেমের মুখে সব কথা শুনে শ্যামা আর থাকতে পারলে না, ছুটে এসে জোর ক'রে মেয়েকে টেনে জল থেকে কোলে তুলে নিয়ে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, 'এই ত পাশেই চট্টপাধ্যায়দের বাড়ি, ওরা দিয়েছে কিনা জেনেই না হয় মেয়েটাকে খুন করতেন! এই দুধের বাছাকে এমনভাবে মেরে ফেলতে লজ্জা হয় না আপনার?'

অক্ষয়বাবুও ভেংচি কেটে জবাব দিলেন, 'লজ্জা হয় না তোমাদের বাগানসুদ্ধ ফল চুরি করতে?'

শ্যামা এর আগে কোনদিন কথা কয়নি ওঁর সঙ্গে, বলে ফেলে লজ্জিতই হয়েছে—তবু এখন আর ফেরা যায় না—সেও সদম্ভে জবাব দিলে, 'ফল ত কত পাখি-পাখালি কাকে-বাদুড়ে-ভামে খেয়ে যাচ্ছে, না হয় খেলেই বামুনের ছেলে-মেয়েরা দুটো।...তাই বলে বামুনের কুমারী মেয়ের মাথায় পা! মা সতীরাণী এর বিচার করবেন।'

এতক্ষণে আরও ভাল ক'রে মেয়ের নীল মুখের পানে চেয়ে দেখবার ফুরসুত হয়েছে শ্যামার। কেমন যেন হয়ে গেছে মহাশ্বেতা, ঠোঁট দুটো কাঁপছে শুধু, কাঁদতেও পারছে না। সেই দেখে আরও জোরে কেঁদে উঠে পাগলের মত একটা আমগাছে সে মাথা খুঁড়তে লাগল।

এইসব গোলমালে ততক্ষণে মঙ্গলারা ছুটে এসেছেন। মঙ্গলা স্বামীকে তিরস্কার করলেন। জোর ক'রে শ্যামার চোখের জল মুছিয়ে মেয়েটাকে নিজের শুকনো আঁচল দিয়ে গা মুছিয়ে বুকের মধ্যে ক'রে নিয়ে ঘরে পৌঁছে দিলেন, 'ষাট্ ষাট্, কিছু মনে করিস্ নি মা, ও মিন্‌সে অমনি। রাগলে আর ওর জ্ঞান থাকে না!'

শ্যামা কিছু বললে না। কিন্তু দৈবক্রমে সেই দিনই পিঁটুকীর এক মেয়ের প্রবল জ্বর হ'ল—দিন দুই পরে ডাক্তার ডাকতে শোনা গেল, নিমোনিয়া। ওরা যত ভয় পেলে—শ্যামাও তত, সত্যি-সত্যিই কিছু ভালমন্দ হবে না তো মেয়েটার? হে মা দুগ্‌গা, হে মা কালী, রক্ষে করো মা। দিনরাত জপ করে শ্যামা। বড় দুর্দিনে আশ্রয় দিয়েছে, উপকারও যে কিছু করে নি তা নয়।

মঙ্গলা এসে জোর ক'রে একদিন ওকে ধরে গিয়ে ওর পায়ের ধুলো মেয়েটার মাথায় গায়ে মাখিয়ে দিলেন। ওর হাত দুটো ধরে বার বার বলতে লাগলেন, 'তুই ওকে মাপ কর্ বামনি, মাপ কর্, নইলে দুধের বাছা আমার বাঁচবে না।' পিঁটকী এসে দুটো পা ধরে পড়ে রইল। 'কি শাপ দিলি বামুন-দি, মেয়েটা আমার শুকিয়ে মরে গেল!'

কেমন ক'রে বোঝাবে শ্যামা ওদের যে, শাপ সে সত্যিই দেয় নি। এত ছোট

মন নয় তার।

সে কিছুই বলতে পারলে না, শুধু হাউ হাউ ক'রে নিজেও খানিক কাঁদলে। তারপর অচৈতন্য মেয়েটার মাথার কাছে বসে প'ড়ে ওর সর্বাঙ্গে হাত বুলোতে বুলোতে বলতে লাগল, 'ওর সব বালাই নিয়ে আমি যেন মরি মা—ওর যেন কোন অনিষ্ট না হয়। ছি ছি—কী বলছেন আপনারা, এ আমি স্বপ্নেও কোন দিন ভাবিনি!'

যাই হোক্—শ্যামা কাঠ হয়ে রইল কদিন। সে যেন কণ্টকশয্যা। অক্ষয়বাবু নিজে একদিন উঠোনে দাঁড়িয়ে মাপ চেয়ে গেলেন। এক ধামা চালও পাঠিয়ে দিলেন এর ভেতর। তেরোদিন পরে ডাক্তার যেদিন বললে আর ভয় নেই—সেদিন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুটি ঝুড়ি বোঝাই ক'রে এল সিধে—চাল ডাল তেল ঘি আটা ময়দা—মায় একটা শাড়ি পর্যন্ত।

সেই থেকে এঁরা আর বিশেষ ঘাঁটান নি শ্যামাদের। বরং বলা চলে, মঙ্গলা একটা রফাই ক'রে নিলেন। স্থির হ'ল যে বাগানে যা নারকেল পাতা পড়বে—মায় গাছ ঝাড়িয়ে যা কেটে ফেলা হবে, সব শ্যামা পাবে, তা থেকে ঝাঁটার কাঠি করিয়ে শ্যামা শহরে বিক্রি করতে পাঠাবে, শুধু সরকারদের দরকার-মত কিছু কিছু দেবে ওঁদের। আর জ্বালানী পাতা—অর্ধেক ওদের, অর্ধেক শ্যামার।

সেই শুরু হ'ল পাতা-জমানো।

এ বন্দোবস্তে শ্যামা খুশী হ'ল। নারকেল গাছ কম নয়—খ্যাংরা এক-একবারে পাঁচ সের আন্দাজ জমলে বয়ে বয়ে নিয়ে যায় সে শিবপুরের বাজারে। পাঁচ আনা ছ'আনা পয়সা হয়। তার সঙ্গে ফল-ফুলুরি কিছু কিছু বেচেও দু'চার পয়সা হয়।

অর্থাৎ কোনমতে উপবাসে শুকিয়ে মরাটা বাঁচে।

কমলা মধ্যে মধ্যে দু'পাঁচ টাকা অবশ্য পাঠায় ছেলেমেয়েদের নাম ক'রে। সে টাকা এলে তেল মশলা কাপড় ইত্যাদি কেনে শ্যামা—একেবারে কিনে ফেলে। নইলে ত শুধু নগ্নতার জন্যই বাইরে বেরোনো বন্ধ হয়ে উপবাস ক'রে মরতে হ'ত ওদের।

নরেন আজকাল আসে ছ মাস আট মাস অন্তর। কিছু কিছু হয়ত হাতে ক'রেই আসে কিন্তু সেগুলি নিজেই খেয়ে নিঃশেষ ক'রে যায়। এদের কথা চিন্তা করার অভ্যাস তার নেই।

কোথায় যায় সে, কোথায় ঘোরে—কী খায় কী করে—এ সব প্রশ্ন আজকাল আর শ্যামা করে না। সে সহজ ভাবেই মেনে নিয়েছে তার স্বামীভাগ্যকে। শুধু

ওর কথাবার্তার মধ্যে থেকে প্রকাশ হয়ে পড়ে যে সে একরকমের ভ্রাম্যমাণ পুরোহিতের পেশা থেকেই সাধারণত পেট চালায়—প্রয়োজন হলে চুরি-জুচ্চুরিতেও আপত্তি নেই। জুয়া খেলার কৌশল খুব ভাল রকম আয়ত্ত করেছে, এমন কি পথে-ঘাটে অপরিচিত লোকের সঙ্গেও খেলতে বসে যায়, জিতলে সে পয়সা ট্যাঁকে গুঁজে সোজা কোন পতিতালয়ে বা মদের দোকানে গিয়ে ওঠে—আর হারলে অম্লান বদনে জানায় যে তার সঙ্গে কিছু নেই; সত্যি-সত্যিই থাকে না কিছু, সুতরাং বিজয়ী পক্ষ কিছুই করতে পারে না, কেউ শুধু গালাগাল দিয়ে ছেড়ে দেয়, কেউ দু'চার ঘা দেয় উত্তম-মধ্যম।

'ট্যাঁক থেকে যখন পয়সা খসছে না তখন আর কি, কোনটাতেই আমার আপত্তি নেই। যত মারই দিক, একপো ধেনো কিনে মালিশ করলেই গায়ের ব্যথা মরে যায়। হুঁ হুঁ বাবা, নগদ টাকা বার করবে এ শম্মার কাছ থেকে, এমন লোক এখনও জন্মায় নি।'

বিজয়গর্বে কথাগুলো প্রচার ক'রে নিজের বুকে নিজেই ঘুষি মারে!

দুই

বুদ্ধিটা মঙ্গলাই দেন। তাঁরও প্রয়োজন ছিল অবশ্য। বেচা ঠাকুর কিছুদিন ধরেই নানান্‌খানা রোগে ভুগছে—আজকাল পুজো করানো হয়েছে এক সমস্যা।

একদিন দুপুরবেলা এসে ওদের ঘরে জেঁকে বসে বললেন, 'এক কাজ কর্ বামুন মেয়ে, ছেলেটা ত আট বছরে পড়ল, ওর একটা পৈতে দিয়ে দে।'

'পৈতে! এরই মধ্যে?'…হকচকিয়ে যায় শ্যামা, 'আমি কোথায় কি পাবো, কেমন ক'রে দেব?'

'যেমন ক'রে হোক দে। এই ত ঠিক পৈতের বয়স। পৈতেটা হয়ে গেলে পুজোটা ও-ই হাতে নিতে পারবে। নিত্যি নেই নিত্যি নেই, নিত্যি উপোস—সেটা ত ঘুচবে। চালটা হাতে পাবি, দুধ-বাতাসা থাকবে—এক রকম ক'রে চলে যাবে। চাই কি, গাঁয়ের দু-একটা মনসা পুজো লক্ষ্মী পুজো—এও কোন্ না করতে পারবে। আমাদেরই ত লেগে আছে বারো মাসে তেরো পব্ব।'

শ্যামা কথাটা ইদানীং ভাবে নি কোনদিন। এককালে সে-ই বলেছিল এই কথাই। কিন্তু এই নিঃস্বতার মধ্যে আর কিছু মনে ছিল না, সব ভুলে বসে ছিল। সে যেন আঁধারে কূল দেখতে পেলে। ছেলেটা এত বড় হয়ে গেল, লেখাপড়া শেখানোরও কোন ব্যবস্থা করতে পারে নি। যেটুকু নিজে জানত সেটুকু অবশ্য শিখিয়েছে কিন্তু আজকাল একটু ইংরিজী না জানলে কি চলে! কমলা লিখেছিল

ওকে তার কাছে পাঠাতে, শ্যামা তা পারে নি। সে থাকবে কাকে নিয়ে, কেমন ক'রে ? শুধু ভালবাসার প্রশ্নও নয়—হাত-মুড়কুৎ ঐ ত একটি, রোজগার করতে—পুরুষমানুষ বলতেও ত ঐ এক।

না, হেমকে ছেড়ে দিতে পারবে না সে।

কিন্তু এ কথা হ'ল স্বতন্ত্র। হেমের যদি নিজস্ব উপার্জন কিছু হয়, তাহ'লে হেড-মাস্টারের হাতেপায়ে ধরে মিড্‌ল ইস্কুলে ভর্তি ক'রে দিতে পারে সে। সরকাররা বললে কিছু আর 'না' বলতে পারবে না। ওদেরই ইস্কুল।

এক নিমেষে বহুদূর পর্যন্ত ভেবে নিলে সে। কল্পনা চলে গেল অনেকখানি, অনেক বাস্তব বাধা ডিঙিয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পানে। বিহ্বল ভাবে মঙ্গলার দিকে তাকিয়ে বসে রইল সে একদৃষ্টিতে।

খানিকটা ওর উত্তরের জন্য অপেক্ষা ক'রে ক'রে হাতে ক'রে আনা পিকদানীতে পিচ্‌ ক'রে খানিকটা পিক্ ফেলে মঙ্গলা বললে, 'কী হ'ল, অমন হাঁ করে চেয়ে আছিস কি ? কী ঠিক করলি ?'

'ঠিক ?' যেন চমকে জেগে ওঠে শ্যামা, 'ঠিক আর আমি কি করব বলুন, আমার অবস্থা ত সবই জানেন ?'

মঙ্গলা বিশেষ একরকম কণ্ঠস্বর বার ক'রে বললেন, 'নেকু! তা আর জানি নি ? হ্যাঁ—আমরাও কিছু সাহায্য করলুম না হয়, পিঁটুকীকে না হয় ভিক্ষেমা ক'রে দিলুম ওর—এ সব কাজ ত খারাপ নয়, পুণ্যি আছে ওতে—কিন্তু তোর মা মাগীকেও এক কলম লেখ্‌ না। ঠিক কিছু পাঠাবে এখন ধার-দেনা ক'রে। তোদের আর কি, তোদের ত কলমের জোর আছে, কারুর খোশামোদ করতে হবে না, এক কলম নিজেই লিখবি, ডাকে দিবি, আর টাকা !...তবে তাও বলি, মেয়ে-মানুষ লেখাপড়া শিখতে নেই। তোর মা তোদের লেখাপড়া শিখিয়েছে ব'লেই এত দুর্দশা। আমার বাবা আমাকে ঐজন্যেই লেখাপড়া শিখতে দেন নি। বলতেন মেয়েরা হ'ল লক্ষ্মী, ঘরের লক্ষ্মী পর হয়ে যাবে—সরস্বতীর সঙ্গে যে ওদের চিরকালের ঝগড়া। আসলে সরস্বতী ত লক্ষ্মীর সতীন ; সতীন-কাঁটাকে কে দেখতে পারে বল্‌ মা ?'

শ্যামা মাথা হেঁট ক'রে বসে রইল। আশা কি জিনিস তাই যখন সে ভুলতে বসেছে তখন এ কি এক নতুন শিহরণ নিয়ে এল নতুন আশা! তাহ'লে সেও কোনদিন দাঁড়াতে পারবে, মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠবে।

'কি করবি তাহ'লে ?'

'চিঠি লিখব মা। আপনারাও একটু দেখবেন।'

'হ্যাঁ, তাই লিখিস। কত্তাকে আবার বলি। কত্তার হাতে এখন সব গিয়ে পড়েছে কিনা। যা চারদিকে চুরি ডাকাতি হচ্ছিল—ভয় ধ'রে গিয়ে আমার সব পুঁজি-পাটা বার ক'রে ওর হাতে দিয়েছি, ও কি ব্যাং ম্যাং কোথায় রেখেছে সায়েবদের কাছে। এখন কতকটা ওর হাতে আমি। ওর হাত-তোলায় থাকা। দেখি, আদায় করব'খন।'

টাকা রাসমণিও কিছু পাঠালেন। কমলাও। শ্যামা তা থেকে অনেকখানি সরিয়ে রেখে দিলে দুর্দিনের জন্যে। সে যতটা পারলে সরকারদের ওপরই চাপালে। রাসমণি লিখেছিলেন কলকাতায় নিয়ে যেতে—তাহ'লে তাঁরাই পৈতেটা দিয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু এইজন্যেই শ্যামা যায় নি। কি দরকার মায়ের গোনা পুঁজি খসাবার! পরের ঘাড় দিয়ে যদি হয়ে যায় ত যাক না!

পৈতে হয়ে যাবার দিন সাত-আট পরেই নরেন কোথা থেকে এসে হাজির।* সেটা বিকেলের দিক, আবছা হয়ে এসেছে দিনের আলো। তবু উঠোনে পা দিয়েই হেমকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল, 'এ কি, মাথা ন্যাড়া কেন? গলায় ওটা কি? য়্যাঁ, আমাকে না জানিয়ে আমার ছেলের পৈতে দেওয়া হয়েছে! কার এত সাহস শুনি? এত বড় আস্পদ্দা? আমি কেউ নই, না? আমি হলুম ওর জন্মদাতা পিতে—আমাকে না জানিয়ে এত বড় কাজটা ক'রে বসল ভুম ক'রে! মেয়েমানুষের এত সাহস! আজ যদি গো'র-বেটার জাতকে এক কোপে সাবাড় না করি ত—'

যেন তুড়িলাফ খেয়ে নেচেকুঁদে পাগলের মত কাণ্ড বাধিয়ে তুললে নরেন। শ্যামা গিয়েছিল পুকুরে—আসতে আসতে এই আস্ফালন শুনে সেও জ্বলে গেল, ছুটে এসে রান্নাঘরে ঢুকে একেবারে উনুন থেকে একটা জ্বলন্ত কাঠ তুলে এনে বললে, 'চুপ করবে, না জ্যান্ত এই নুড়ো জ্বেলে দেব! চুপ! আর একটা কথা না শুনি! পিতে! জন্মদাতা পিতে! লজ্জার মাথা ত খেয়েছ—হায়া-পিত্তি বলেও কি কিছু থাকতে নেই?'

ওর সেই রণচণ্ডী মূর্তির সামনে আস্তে আস্তে যেন কুঁকড়ে গেল নরেন।

'থাম্ থাম্, খুব হয়েছে। চুপ কর্।...একটু আগুন দে দেখি কলকেটায়!'

তারপর দাওয়ায় বসে একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, 'ঐ পুঁটুলির মধ্যে এক কোণে একটু চা বাঁধা আছে। চা কর্ দিকি—খাই একটু।'

তারপর চা-তামাক খেয়ে একথা সেকথার পর সহসা যেন কথাপ্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে গেল, 'ঐ ভ্যাখ, আসল কথাটা বলা হয় নি। যেজন্যে হঠাৎ চলে এলুম! আমার বড় ভায়রা যে ফর্সা!'

'য়্যাঁ !' আর্তনাদ ক'রে উঠল শ্যামা। 'কি, কী বললে ?'

'অক্কা! সাবাড়!' হি-হি ক'রে হেসে বললে নরেন, 'কলকাতায় গিয়েছিলুম, ওদের বাড়িওলার সঙ্গে দ্যাখা। তিন দিন হ'ল—কি একটা যাগযজ্ঞি করতে গিয়ে নাকি বুকে ব্যথা ধরে—ব্যাস, তাইতেই শেষ!'

সেই প্রথম আর্তনাদের পর শ্যামার কণ্ঠ থেকে কোন স্বরই বেরোয়নি। নরেনই একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললে, 'মানে কথা, এবার তোমার দিদি বিধবা হ'ল। পয়সার দ্যামাক এবার একটু কমবে। বেশি পয়সা যে কত্তা রেখে যেতে পেরেছেন তা না। হেঁ-হেঁ! পুরোনো জামা দিয়ে গরীব বোনকে সাহায্য করা—এবার ওকে কে সাহায্য করে তাই দ্যাখো!'

যেন উল্লাসের সুর ফোটে ওর গলায়।

তিন

শ্যামার হয়ত তখনই কলকাতায় চলে যাওয়া উচিত ছিল, খবরটা শুনে কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়া ওর হয়ে ওঠে না। কারণ বিস্তর। প্রথমত কমলার এই অবস্থায় সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর সাহস সঞ্চয় করতে পারে না কিছুতেই। সে নিজে মেয়েছেলে, মেয়েছেলের এত বড় সর্বনাশ যে আর নেই তা বোঝে, বিশেষত হিন্দু বাঙালীর ঘরে। ওর সেই রাজেন্দ্রাণীর মত দিদি—চওড়া লালপাড় শাড়ি ও গয়নায় ঝলমল করত—তার নিরাভরণ শুভ্র বেশ দেখতে হবে, তার চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল। উঃ, দিদি না জানি কি করছে! ওকে দেখলেই হয়ত চিৎকার ক'রে উঠবে—হয়ত আছড়ে পড়বে—। না, না—এখন সেখানে গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়ানো তার পক্ষে সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, হেমকে সবে ইস্কুলে ভর্তি করা হয়েছে। ইস্কুলের কর্তারা দয়া ক'রে বিনা মাইনেয় ভর্তি ক'রে নিয়েছেন কিন্তু ব'লেই দিয়েছেন কামাই করা চলবে না একদিনও। কামাই করলেই এ সব সুবিধা বন্ধ ক'রে দেওয়া হবে। বেচু চক্কোত্তি শয্যাগত—হেমই নিত্যসেবা করছে। নরেন ত পরের দিনই আবার উধাও হয়েছে। হেমকে কার কাছে কোন্ ভরসায় রেখে যাবে? কে তাকে খেতে দেবে?

তাছাড়া—তাছাড়া সে আবার অন্তঃসত্ত্বা। এ অবস্থায় হেঁটে যাওয়া!—এখন গিয়ে কিছু আর মার কাছ থেকে হাত পেতে টাকা নেওয়াও চলবে না—আবার হেঁটেই ফেরা। বড় কষ্টকর!

সুতরাং চোখের জল চোখে চেপে শ্যামা দৈনন্দিন অভ্যস্ত জীবনযাত্রাতেই ফিরে আসে ধীরে ধীরে।

অবশ্য উমার চিঠিতে খবর সবই পাওয়া যায়।

কথায় বলে, 'অল্প শোকে কাতর অধিক শোকে পাথর।' রাসমণির সেই অবস্থা। আঘাত খেয়ে খেয়ে তাঁর সমস্ত অন্তরই যেন পাষাণ হয়ে গেছে। নতুন কোন আঘাতের প্রতিক্রিয়া জাগা শক্ত, তবে বজ্রাহত-বনস্পতির মত খাড়া থাকলেও ভেতরটা বোধ করি আমূলই শুকিয়ে গেছে।

কমলা বাপের বাড়ি এসে ওঠে নি। ওর ভাশুর এবং দেওর আছেন অনেকগুলি, কিন্তু তার স্বামী ইদানীং তাদের সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখতে দেন নি। সুতরাং আজ এতদিন পরে তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালে কি অভ্যর্থনা মিলবে তা কমলা অনুমান করতে পারে সহজেই। সাংসারিক জ্ঞান খুব বেশি না থাকলেও মানুষকে এটুকু সে চেনে। হয়ত তারা প্রথমেই তাড়িয়ে দেবেন না কিন্তু শীগ্গিরই এমন অবস্থা ক'রে তুলবেন যে আর টেঁকা যাবে না।

ওর স্বামী চাকরি করতেন কোন এক সওদাগরী ফার্মে, মাইনে মোটা ছিল না। কিন্তু শতকরা চার আনা কমিশন একটা পেতেন, তাতেই ওদের সচ্ছলে সংসার চলত। ঝি রাঁধুনী চাকর—এলাহি ব্যাপার ছিল। দু'একবার কমলা সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার যে চেষ্টা করেনি তা নয়, কিন্তু তিনি উড়িয়ে দিয়েছেন বরাবর। বলেছেন, 'ভয় কি, আর কিছুদিন চাকরি ক'রে নিজের ফার্ম খুলব। মূলধন? এদের সঙ্গেই অর্ডার সাপ্লাই-এর কাজ করব—মূলধন কি হবে? আমাদের এই ছোট্ট সংসার, কিই বা ভাবনা? তার জন্যে এখন থেকে দুশ্চিন্তা ক'রে লাভ নেই। চলেই যাবে এক রকম ক'রে।'

চলেই হয়ত যেত—এমনিতেই। কিন্তু মরবার কিছুদিন আগে এক তান্ত্রিক এসে জুটেছিল। ঠিক দীক্ষাগুরু নয়—দীক্ষা নিয়েছিলেন কুলগুরুর কাছে—এমনি শিক্ষাগুরু বলা যেতে পারে। তারই প্ররোচনায় এক কালী স্থাপনা ক'রে জমি-জমা যেখানে যা কিছু ছিল সমস্তই দেবোত্তর ক'রে দিয়েছিলেন—নগদ টাকা সব খরচ হয়ে গিয়েছিল বাড়ি ও মন্দিরে। সেই তান্ত্রিক তার আইনসম্মত সেবাইত এখন। সে অবশ্য বিধবাকে আশ্রয় দিতে আপত্তি করে নি কিন্তু কমলা সংক্ষেপে বলেছিল, 'ঐ ত আমার স্বামীকে খুন করেছে! ওর আশ্রয়ে ছেলে মানুষ করার আগে ছেলের মুখে বিষ তুলে দেব…।'

এই নতুন মন্দিরেই কি একটা তান্ত্রিক-ক্রিয়া করতে গিয়ে হঠাৎ বুকে ব্যথা ওঠে তাঁর—অজ্ঞান হয়ে যান। সেই অবস্থাতেই একদিন পরে হয় মৃত্যু, কমলাকে কিছু বলেও যেতে পারেন নি।

কমলার নিজের হাতে যৎসামান্য নগদ টাকা যা ছিল তা এই ক'দিনেই শেষ হয়ে গেছে শ্রাদ্ধশান্তি করতে। অফিস থেকে প্রাপ্য কিছু ছিল কমিশন আর মাইনে বাবদ, তার সঙ্গে সামান্য যোগ ক'রে দিয়ে পাঁচশ টাকা দিয়ে গেছে তারা। আর আছে গায়ের গহনাগুলো। কমলা এই বিপদে একটুও মাথা গুলিয়ে ফেলে নি, সে শুধু বালা জোড়াটা গোবিন্দর বৌয়ের জন্য এবং গোবিন্দর অন্নপ্রাশনের গহনাগুলো তার ছেলেমেয়েদের উদ্দেশ্যে তুলে রেখে বাকী সব গহনাগুলো বেচে দিল। সবসুদ্ধ বাইশ'শ টাকা। এই টাকাটা একেবারে সে তুলে দিলে ওর স্বামীর বন্ধু এক সুবর্ণ-বণিক ব্যবসায়ীর গদীতে। তিনি পাকা রসিদ দিয়ে টাকাটা নিলেন—কথা রইল টাকাটা যথেচ্ছ খাটাবেন তিনি—লাভ-লোকসান তাঁর—তিনি শুধু এর সুদ বাবদ মাসে আঠারো টাকা ক'রে দেবেন কমলাকে।

কমলা অতঃপর ফার্নিচার পর্যন্ত বেচে দিয়ে মাসিক চার টাকা ভাড়ায় এক-খানি ঘর নিয়েছে এবং ছেলেকে নিয়ে সেইখানেই এসে উঠেছে। ভদ্র ব্রাহ্মণ-বাড়ির মধ্যে ঘর—সব দিক দিয়েই নিরাপদ আশ্রয়। অতঃপর সে ঐ আয়েই দিন গুজরান ক'রে ছেলেকে মানুষ ক'রে তুলবে, এই তার প্রতিজ্ঞা। মা তাঁর দুটি যমজ মেয়েকে নিয়েই বিব্রত, আবার তার ওপর বোঝা চাপাবে না কমলা—এই এক কথা, দ্বিতীয় কথা, যা অনেক পরে প্রকাশ পেয়েছে, মেয়েদের বিধবা হবার পর বাপের বাড়ি গিয়ে ওঠা তার স্বামী একেবারেই পছন্দ করতেন না। তিনি নাকি অনেকদিন আগে একবার বলেও ছিলেন, 'যদি তেমন কোন দুর্দিন আসে ত চেষ্টা ক'রো ছেলেকে নিজেই মানুষ ক'রে তুলতে। তার জন্যে যদি গতর খাটাতে হয় ত লজ্জা নেই, কিন্তু বিধবা মায়ের কাছে গিয়ে উঠো না। সে বড় অশান্তি। দুই বিধবা বোন বাপের বাড়ি থাকলে আগুন জ্বলে। ওতে মন ছোট হয়ে যায়—ছেলেও মানুষ হয় না। তোমার উমা ত বিধবারই সামিল?'

খবরটায় কমলার জন্য দুঃখবোধ একটু করে বৈকি শ্যামা। আহা, সেই দিদি—তার কখনও কিছু করা অভ্যাস নেই, কখনও এক গ্লাস জল পর্যন্ত গড়িয়ে খায় নি! সে কি পারবে এত সব কাজ গুছিয়ে করতে? ঐ ত আয়! খুব কষ্ট না করলে দুটো পেট চালিয়ে ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে পারবে না। আবার মনে মনে কোথায় যেন একটু আশ্বস্তও হয়। তার মনের গোপন কোণে বিশ্বাস বাসা বেঁধে আছে বহুদিন থেকেই যে, এখনও তার মায়ের হাতে কিছু সোনা আছে। এবং সেটা তিনি মরবার পর উমা ও শ্যামার মধ্যেই ভাগ হবে। কিন্তু কমলা এসে উঠলে সেও ত ভাগ পেত।

কমলা এসে ঐ বাড়িতে না থাকলেও যে তার এক ভাগ পাওনা হয় ন্যায়ত

ধর্মত—এবং এখন তার যা অবস্থা তা'তে পাওয়াই উচিত—এ কথাটা কে জানে কেন শ্যামা একবারও ভাবে না। তার আত্মকেন্দ্রিক মন নিজের দাবীটাকেই সর্বদা বড় ক'রে দেখে।

চার

এবারেও মঙ্গলা ঠাকরুণই কথাটা পাড়েন, 'হ্যাঁলা, মেয়ের বিয়ে দিবি? ছাখ্—দিস্ ত দে!'

আকাশ থেকে পড়ে শ্যামা। মেয়ের বিয়ে! তার মেয়ে যে সবে সাত পেরিয়েছে!

'আহা, তা হোক না সাত বছর। এই ত বিয়ের বয়স। অষ্টম বর্ষে গৌরীদান। তারও ত একটা পুণ্য আছে। তোর ভালর জন্যেই বলছিল। নইলে ব্যাটাছেলের আবার বিয়ের ভাবনা? কত মেয়ের বাপ তাদের দোরের মাটি রাখছে না। আমার কথাটা মনে পড়ল তাই। বলি ফুটফুটে মেয়ে তোর, হয়ত ওদের নজরে পড়ে গেলেও যেতে পারে। এই ফাঁকে পার হয়ে যায় ত যাক।'

লোভে কম্পমান হয় শ্যামার মন, যেদিন থেকে মেয়ে হয়েছে সেই দিন থেকেই ত বলতে গেলে দিন গুনছে। বরং বলা চলে যে, মেয়ে হবার আগে থেকেই দিন গুনছে—কবে মেয়ে হবে! মেয়ে হ'লে শীগ্‌গির কুটুম হয়, নাতি-নাতনী—ছেলের বিয়ের জন্যে অনেকদিন অপেক্ষা করতে হয়।

'কিন্তু মা, আসল কথাটা যে ভাবছেন না! আমার হাতে কিছুই নেই। কোথায় কি পাবো বলুন ত? আবার এই একটা মেয়ে হ'ল। এরই দেনা এখন শোধ হয়নি!'

'বলি, গায়ে গু মাখলে ত আর যমে ছাড়বে না! আমাদের হিঁদুর ঘরে মেয়ে যখন বিইয়েছিস্ তখন বিয়ে দিতেই হবে—খেতে পাস্ না পাস্। মেয়ে দেখা না—দেখাতে দোষ কি? দেখালেই ত আর বিয়ে হচ্ছে না। পছন্দ হলে চাই কি টাকা-কড়ি নাও নিতে পারে।'

কথাটা শ্যামার মনে লাগল। হেম আর একটা নিত্যসেবার কাজ পেয়েছে। এ গ্রামের বাইরে সেটা—প্রায় মাইল খানেক হেঁটে যেতে হয়। তা হোক—রাত চারটেয় উঠে হেম আগে সেখানে চলে যায়, তারপর এখানের পূজো শেষ ক'রে পড়তে বসে। খুব জোরে যায় আর জোরে আসে—ঘণ্টাখানেকের বেশি লাগে না। সেখানে ব্যবস্থা ভাল, চাল ঐ আধসেরই বটে, কিন্তু তেমনি মাসে তিন টাকা মাইনে। রাত্রে শেতলে দু'খানা বড় বাতাসা—একপো দুধ। সেটা ঠিক বামুন-

কায়েতের বাড়ি নয়—কিন্তু যাঁর আপত্তি হতে পারত সেই মঙ্গলা ঠাক্‌রুণই অভয় দিয়েছেন, 'কে বা আজকাল অত সব মানছে, তুমিও যেমন! ঐ বেচাই লুকিয়ে লুকিয়ে করত। নিয়ে নে—নিয়ে নে, ভাতের দুঃখ ত ঘুচবে।'

বেচু অসুস্থ হয়ে পড়েছে বলে এমনি মনসাপুজো, লক্ষ্মীপুজোও দু'একটা পায় হেম—অর্থাৎ ঠিক উপবাস করার অবস্থাটা ঘুচেছে। আর একটি শিশু এসেছে কোলে বটে—চাঁদের মত রং, পদ্মফুলের মত সুন্দর মেয়ে। কমলা চিঠিতে নাম পাঠিয়েছে ঐন্দ্রিলা। সে যাক—তার আর কতই খরচা! যদি মা কিছু দেয় এবং মঙ্গলা যদি কিছু ধার বলেও দেন ত কোনমতে কাজ সারা যেতে পারে হয়ত, দেনা সে রাখবে না—যেমন ক'রেই হোক কষ্ট ক'রে কাজ সারবে।

আয়ের ইদানীং আর একটা পথও বেড়েছে। মৌড়ীর কুণ্ডুবাবুরা সাতখানা গাঁয়ে ক্রিয়াকর্মে সামাজিক বিলোন, পুজাপার্বণে ছাঁদা দেন। এ গ্রামও সেই তালিকায় পড়ে; ব্রাহ্মণমাত্রেই পায়—এতদিন এরা পায়নি স্থায়ী বাসিন্দা নয় বলে। বহুদিনের চেষ্টায় ওদের খাতায় নাম উঠেছে। সামাজিক মানে নিমন্ত্রণের সঙ্গে একটা পেতলের হাঁড়ি কিংবা ঘড়া ক'রে তেল নয়ত কাঁসার থালায় সন্দেশ—দিয়ে যায় বাড়ি বাড়ি। তেলটা ঘরে থাকে, বাসনটা বিক্রি করা যায়।···আর পূজায় রাসে ছাঁদার ব্যবস্থা আছে—মাথাপিছু ষোলখানা লুচি ও বারোটা সন্দেশ। তিন-চার দিন ধরে সপরিবারে খাওয়া চলে। সদ্যোজাতা ঐন্দ্রিলাও এ ছাঁদার অধিকারী।

খানিকটা চুপ ক'রে থেকে শ্যামা মনে মনে কত কি স্বপ্নজাল বোনে, কল্পনায় বহুদূর এগিয়ে যায়। তারপর বলে, 'বেশ ত, দেখুন না মা। তা ছেলে কি করে, বয়স কত?'

ছেলে নাকি ঐ মৌড়ীগ্রামেই থাকে—মঙ্গলার কাছে যা খবর পাওয়া গেল। কোন্ এক বিলিতি কারখানায় কাজ করে, উনিশ টাকা আন্দাজ মাইনে পায়; রোজ হিসেবে মাইনে, ঐ রকমই দাঁড়ায়। মা আর দু'টি ছোট ভাই আছে সংসারে। দুটো বোনও বুঝি আছে। পৈতৃক বাড়ির ভাগ খান-দুই ভাঙাঘর আছে, তবে জমি আছে অনেকখানি—প্রায় তিন-চার বিঘের বাগান।

মঙ্গলা বললেন, 'ব্যাটাছেলে, রোজগার করছে, বাড়ি করতে কতক্ষণ! জমি আছে, বাড়ি তুলে নেবে দেখিস্—দেখতে দেখতে। তারপর তোর মেয়ের বরাত। যদি তেমন তেমন পয় ফলাতে পারে ত ওর আয়ও বেড়ে যাবে না কি চড়চড় ক'রে?'

'বয়স কত মা—ছেলের?'

'বয়স?' একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বোধ করি হিসেব করারই চেষ্টা করেন

মঙ্গলা, 'বয়স আর কত, তেইশ-চব্বিশ হবে বড়জোর।'

'চব্বিশ বছর! আমার মেয়ে যে মোটে সাত বছরের মা!'

'ওমা, বলিস্ নি ওসব কথা! সাত বছর কি সোজা বয়স মেয়েছেলের? আগে ত এই বয়সে বিয়ে না হ'লে লোকে নিন্দেই করত। আর ও বরের কথা যদি বলিস—বেটাছেলের আবার বয়স কি লা? দোজবরে ত নয়। আগে ত শুনেছি তোদের কুলীন বামুনের ঘরে পাঁচ বছরের মেয়ের সঙ্গে ষাট বছরের ঘাটের মড়ার বিয়ে হ'ত।'

তবু শ্যামা চুপ ক'রেই আছে দেখে মঙ্গলা ঠাকরুণ আবার বললেন, 'আর বামুনের ঘরের কথাই বা কেন—আমারই ত বড় জা রয়েছে, তুই ত দেখেছিস তাঁকে, ঐ যে পিঁটকীর কোলের ছেলেটার অন্নপেরাশনে এসেছিল! এয়োরাণী ভাগ্যিমানী পাকা চুলে সিঁদুর পরছে—কিন্তু ওদের কি বিয়ে হয়েছিল শুনবি? আমার জায়ের যখন পাঁচ বছর, তখন বটঠাকুর আটাশ পেরিয়ে উনত্রিশে পড়েছেন। বাইরে বাইরে পশ্চিমে ঘুরে কাজ-কর্ম করতেন, বিয়ে করবার ফুরসুত পান নি! তারপর হঠাৎ ঠাকুরের কানে গেল যে ছেলের স্বভাব-চরিত্তির বিগড়েছে, যেখানে থাকতেন সেখানে নাকি ইহুদী ম্যাম্ রেখেছেন বাঁধা। যেমন কানে যাওয়া অমনি তার পাঠিয়ে দিলেন, মা মরো-মরো, ঝট্ ক'রে চলে এসো। ছেলে যেদিন এসে পৌঁছল সেইদিনই দিলেন পিঁড়িতে বসিয়ে তিন-চার দিন মোটে সময়, মেয়ে ত আর দেখবার সময় পেলেন না—হাতের কাছে ছিল ঐ পাঁচ বছরের মেয়ে, তাই সই!...তা সে যা মজা মা বুঝলি, লজ্জার কথা এসব কাউকে বলিস নি, বলতে গেলেও হাসি পায়—আমার জা ফুলশয্যের রাত্তিরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে কাপড়-খানা গুটিয়ে বগলে চেপে ভাশুরকে ডাকছে—ও বল্ বল্, শুনছ, আমার যে পেচ্ছাপ পেয়েছে, দাঁড়াবে চলো।...বল্ দিকি কি কাণ্ড?'

মঙ্গলা হা-হা ক'রে হেসে ওঠেন।

শ্যামা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে, 'তা দেখুন মা, যা ভাল বোঝেন। আপনাদের দয়া হ'লে মেয়ে পার হয়েই যাবে।'

'হ্যাঁ—যাই আবার আবার দেখি—পিঁটকী হয়ত দোর-তাড়া খোলা রেখেই ঘুমিয়ে পড়ল! ওর কাণ্ড! মেয়েটা বড্ড বাউণ্ডুলে!'

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

এক

সত্যি-সত্যিই যে মহাশ্বেতার এখানেই বিয়ে ঠিক হয়ে যাবে তা শ্যামা কখনও ভাবে নি—এমন কি যখন দিন পর্যন্ত স্থির হয়ে গেল তখনও যেন তার বিশ্বাস হ'তে চায় না কথাটা। তা মঙ্গলা করেছেনও ঢের—তিনি একরকম জোর ক'রেই ছেলের মাকে চেপে ধরে এ সম্বন্ধে রাজী করিয়েছেন। একান্ন টাকা নগদ, চেলির জোড়, তিনখানা নমস্কারী, দানের বাসন আর দু'গাছা সোনাবাঁধানো পেটি এই দিতে হবে। বাসন কিছু কিছু মঙ্গলা নিজের ঘর থেকে বার ক'রে দিলেন—ঝালাই পালিশ ক'রে নেওয়া হ'ল। নগদ টাকাটা রাসমণি পাঠালেন। কমলা এত দুঃখের মধ্যেও পাঁচটা টাকা নগদ আর একখানা পার্সী শাড়ী পাঠিয়েছে। উমা ইদানীং ক্রুশ বুনে খুঞ্চিপোশ ক'রে বিক্রি করে—তার হাতেও দু'চার টাকা জমেছে, সে তা থেকে পাঠিয়েছে পাঁচ টাকা। আর এধার-ওধার ক'রে কিছু চেয়ে-চিন্তে আনলে শ্যামা। একরকম ভিক্ষে ক'রেই। বাকী কিছু ধার হ'ল। মঙ্গলাই ধার দিলেন। কথা রইল মাসে মাসে দু এক টাকা ক'রে শ্যামা শোধ করবে—মঙ্গলা সুদ নেবেন না।

শ্যামা পুরোনো ঠিকানায় বড় জায়ের নামেও একখানা চিঠি দিয়েছিল কিন্তু কোন উত্তর এল না। তবে আর একটা দিক থেকে অপ্রত্যাশিত ভাবে কিছু এসে গেল। না এলে শ্যামা বিব্রত হ'ত—কারণ বরযাত্রী আসবে ত্রিশজন এ তাঁরা বলেই দিয়েছিলেন, ওটা কিছুতেই কমানো গেল না। বরদের নিকট-আত্মীয়ই নাকি ওর চেয়ে বেশি। এখানেও দু-একজনকে না বললে চলবে না! সরকারদের বাড়িতেই ছেলেবুড়ো নিয়ে বাইশ জন। পাড়াতেও আছে। মঙ্গলা অবশ্য বারণ করেছিলেন এত হাঙ্গামা করতে কিন্তু শ্যামার তাতে মন ওঠে নি। এই প্রথম সন্তানের বিয়ে ওর, এই প্রথম কাজ ওর নিজের জীবনে ও সংসারে। যে রকম দেখে ও অভ্যস্ত বাল্যকাল থেকে, ঠিক সেরকম হবে না তা ত সে নিজেও জানে কিন্তু তাই বলে একেবারে সব কিছু বাদ,—সে সম্ভব নয়।

তাছাড়া মরুভূমে ওয়েসিস্ দেখা গেছে, তৃষ্ণার্ত পথিকের মন হয়ে উঠেছে দুরাশা-চঞ্চল। এখনই কত কি স্বপ্ন দেখছে ওর কল্পনা—কত কি সুদূর ও অসম্ভব স্বপ্ন। মনে তাই জোরও এসেছে—ঋণ করতে যেন আজ আর ভয় নেই। মনে মনে কোথায় এ আশ্বাস ওর জেগেছে যে, এ দেনা শোধ হয়ে যাবেই।

তবুও হয়ত শেষে সামলানো যেত না—যদি না একত্রিশটা টাকা ভগবান প্রায় ছপ্পড় ফুঁড়ে দিতেন। মঙ্গলা বললেন 'মেয়েরই পয় বামুন মা। মেয়ে আয়-পয় ফলাবে বলেই মনে হচ্ছে।'

কি ক'রে যে টাকাটা এল—তা আজও যেন শ্যামার ধারণার অতীত। অত সাহসই যে কে ওকে দিয়েছিল! সত্যিই বোধ হয় ভগবানের হাত।

বিয়ের ঠিক তিনদিন আগে নরেন এসে পড়ল কোথা থেকে—একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে। হাতে কচুপাতায় জড়ানো খানিকটা হরিণের মাংস আর সের দুই ময়দা।

'ভাল ক'রে পঁ্যাজ দিয়ে রাঁধ্ দিকি মাংসটা! চাট্টি খড় দিয়ে আগে সেদ্ধ ক'রে জলটা ফেলে দিস্—নইলে মেটে মেটে গন্ধ ছাড়বে, খেতে পারবি না!'

তারপরই ওর চোখে ধরা পড়ল আয়োজনটা।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলে, 'এ সব ব্যাপার কি? য়্যাঁ? এত সব চক্‌চকে বাসন, নতুন চৌকি, বরণডালা—বলি মতলবটা কিসের? কার বে?'

শ্যামা হাত থেকে মাংসটা নিয়ে রান্নাঘরে রেখে ঘটি ক'রে জল এনে দাঁড়িয়েছিল, 'হাতটা আগে ধুয়ে নাও দিকি, বিয়ের খবর পরে নিলেও চলবে।'

নরেনের স্বর সপ্তমে চড়ে গেল, 'না, পরে নেবো না আমি। ওসব চালাকি চলবে না, বল্ শীগ্‌গির কার বে…নইলে অনথ করব!'

'বিয়ে আবার কার? তোমার মেয়ের!'

'এঁ!' অদ্ভুত একটা স্বর বার করে নরেন গলা দিয়ে, 'আমার মেয়ের বিয়ে! আমি জানলুম না—আমার মেয়ের বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেল! দেওয়াচ্ছি আমি বিয়ে, ভাল ক'রে দেওয়াব। ঐ এক পাত্তরে তোদের মা-বেটি দু'জনকে পার করব—এই বলে রাখছি। দেখে নিস!'

সে কি আস্ফালন ওর! যেন ধেই ধেই ক'রে নাচতে লাগল সারা উঠোনটা-ময়।

তবু শ্যামার ধৈর্যচ্যুতি ঘটেনি। সে বুঝিয়েই বলতে চেষ্টা করলে, 'ছ্যাখো—মিছিমিছি ছোটলোক্‌মি ক'রো না বলে দিচ্ছি। তুমি কি বাড়িতে থাকো, না আমাদের খবর রাখো? তোমাকে বিয়ের কথা জানাবো কি, আমরা ক'দিন অন্তর খাই সে খবরটা জানবার চেষ্টা করেছ কখনও?'

'থাম্ হারামজাদী, ওসব লম্বা লম্বা বাত রাখ্! আমার মেয়ের বে আমি দোব না, দোব না। বলে পাঠা তাদের এখুনি যে ওসব চলবে না। তারপরও যদি বিয়ে

করতে আসে ত এই নাদ্‌না রইল, সব কটার মাথা যদি না ফাটিয়ে দিই ত আমার নাম নেই !'

চেঁচামেচিতে কখন অক্ষয়বাবু এসে পেছনে দাঁড়িয়েছেন ওরা কেউ টের পায় নি। তিনি এইবার একটু মুচকি হেসে বললেন, 'কিন্তু তাতে জেল হবে যে —চাই কি কেউ খুন হ'লে ফাঁসিও হতে পারে।'

'জেল হয় খেটে নেব। তাতে কি, ও আমার অভ্যেস আছে। জেলকে ভয় করিনে। মোদ্দা মেয়ের বে আমি দিতে দোব না। দেখি কেমন ক'রে ছ্যায়। উ ! মেয়ের বে দিয়ে উনি নিশ্চিন্ত হবেন ! আমি বেঁচে থাকতে সেটি হচ্ছে না !'

অহেতুক একটা আক্রোশ যেন ওর কণ্ঠে।

অকস্মাৎ বোধ হয় ভগবানই বুকে দুর্জয় সাহস এনে দিলেন। শ্যামা মাথার কাপড়টা আর একটু টেনে দিয়ে অক্ষয়বাবুকে উদ্দেশ ক'রে বললে, 'আপনি একটু আসুন ত বাবা আমার সঙ্গে, আমি থানায় যাবো !'

থানা শব্দটা শোনবার সঙ্গে সঙ্গেই বেলুন যেন চুপ্‌সে গেল।

'উঃ ! তবে ত ভয়ে আমি একেবারে কেঁচো হয়ে যাবো।...যা না থানায়, থানায় গিয়ে কি বলবি তাই শুনি !'

কথাগুলো বলে, কিন্তু কণ্ঠস্বরে যে আর জোর নেই তা উপস্থিত সকলকার কাছেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আর ওর সেই জোরের অভাবটাই যেন শ্যামার মনে অভূতপূর্ব একটা জোর এনে দেয়। কোথা থেকে যেন কথাগুলোও কে জুগিয়ে দেয় ওর মুখে, সে বেশ শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলে, 'বলব যে তুমি রোজ লুকিয়ে লুকিয়ে জুয়া খেল, আমি তা জেনে পুলিসে খবর দেব বলেছিলুম তাই তুমি চেঁচামেচি মারধোর করছ। কনস্টেবল্ চাইব তোমাকে বেঁধে নিয়ে যাবার জন্যে—'

এবার সত্যিই জোঁকের মুখে নুন পড়ল। মুখ কালি ক'রে একরকম ক্ষীণ কণ্ঠেই নরেন বললে, 'যা না—বলগে যা না। বললেই অমনি তারা বিশ্বাস করছে কি না। সাক্ষী চাই নে, প্রমাণ চাই নে, কিচ্ছু না ! এ যেন শ্বশুরবাড়ি !'

তারপর গলা আরও নামিয়ে এনে বলে, 'বেশ ত দিগে যা না তোর মেয়ের বে। আমার কি ? আমি ত তোর ভালর জন্যেই বলছি। বলি কে না কে ঠকিয়ে মেয়েটাকে নিয়ে যাবে। তুই ত বুঝিস্ ছাই—মেয়েমানুষ দশহাত কাপড়ে কাছা আঁটতে পারে না—বুদ্ধি ত একতিল ঘটে নেই। শুধু নাচতেই জানিস্।'

অক্ষয়বাবু এবার একটু তিরস্কারের ভঙ্গীতেই বললেন, 'মেয়ের আমার যদি বুদ্ধি না থাকত তাহ'লে কি আর তুমি বাঁচতে ঠাকুর, না এই সংসারটাই বজায় থাকত !

…ও যা বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করেছে, তা তোমার ইহজীবনে জুটত না। নাও, আর বেশি গোল ক'রো না। চুপচাপ শুয়ে পড়োগে।…হ্যাঁ, আর দেখো, যেন মেয়ের দানের বাসনগুলো চুরি ক'রে বেচে দিয়ে এসো না! তাহ'লে কিন্তু মেয়ে যাক না যাক আমিই থানায় যাবো।'

সত্যি-সত্যিই চাদরটা খুলে আলনায় রেখে গজগজ ক'রে বকতে বকতে গিয়ে নরেন বিছানায় শুয়ে পড়ল।

পরের দিন দুপুরবেলা ভাত চাপিয়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে টাকার কথাটাই ভাবছে শ্যামা, পিঁটকীর সেজ মেয়েটা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললে, 'জানো বামুন মাসি, বামুন মেসোর কাছে অনেক টাকা আছে, অ-নে-ক টাকা।'

'তুই কি ক'রে জানলি?' শ্যামার চোখ-দুটো যেন লোভে আগ্রহে জ্বলে ওঠে।

'এই যে এখন পুকুরে নাইতে নেমেছিল না? নেয়ে উঠে ভিজে কাপড়ের সঙ্গে কোমর থেকে একটা গেঁজে খুলে কতকগুলো টাকা বার ক'রে পুকুরপাড়ে ঘাসের ওপর রেখে গেঁজেটা শুকুতে দিয়েছে। আর বসে বসে তাই পাহারা দিচ্ছে।'

তবু যেন বিশ্বাস হয় না কথাটা। শ্যামা ঈষৎ সন্দিগ্ধ স্বরে প্রশ্ন করে, 'কি ক'রে জানলি সেটা গেঁজে? তুই গেঁজে কাকে বলে জানিস্?'

'হুঁ—' লম্বা স্বরে টেনে বলে কালীতারা, 'গেঁজে জানি নি! দাদু কোথাও টাকা নিয়ে যেতে হ'লেই ত গেঁজেতে ক'রে নিয়ে যায়!'

শ্যামা ওর গাল টিপে আদর ক'রে বলে, 'বড় ভাল খবর দিয়েছিস মা!'

'আমায় বেশি ক'রে আনন্দনাড়ু খাওয়াবে!' উৎসুক আগ্রহে প্রশ্ন করে কালী।

'নিশ্চয়। যত খেতে পারিস্!'

তখন আর উচ্চবাচ্য করলে না শ্যামা। বিকেলের দিকে যখন বিয়ের নানা যোগাড় উপলক্ষে মঙ্গলা এসে বাইরের রকে জাঁকিয়ে বসেছেন, শ্যামা সোজাসুজি গিয়ে নরেনকে বললে, 'কৈ কুড়িটা টাকা দাও ত, আমি আর কিছুতেই পেরে উঠছি না। ময়দা ঘি, এখনো সব বাকী, তবু ত মাছ মা কাল পুকুর থেকে ধরিয়ে দেবেন বলেছেন।'

'টাকা! টাকা আমি কোথায় পাবো? এক পয়সা নেই আমার কাছে।…আর ঘি কি হবে, তেলেভাজা লুচিই ত বেশ! কিংবা ভাত খাওয়াগে যা। বামুনবাড়ি তাতে দোষ নেই। পুজুরী বামুনের মেয়ের বিয়ে—তাতে আবার লুচি!'

শ্যামা বললে, 'এ তোমার গুপ্তিপাড়া নয়—এখানে তেলেভাজা লুচি খাওয়ানোর রেওয়াজ নেই। ভাত ত খাবেই না। দুপুরে বৌভাতের যজ্ঞি হ'লে চলত। বিয়েতে

ভাত খাওয়াতে গেলে নিন্দে হবে। আর শুধু ত বিয়ের রাতই নয়—ফুলশয্যে পাঠানো আছে, দশটা টাকার কম কি ফুলশয্যে পাঠানো হবে!'

'তবে মরগে যা। আমি কি জানি, নবাবী করতে হয় নিজের কোমরের বল বুঝে করবি!'

'কোমরের বল বুঝেই ত করছি। যা কিছু ত আমিই করছি, আর করছেন মা। তুমি যে জন্মদাতা পিতে বলে চেঁচাও—তা তুমি কি করলে তাই শুনি। মেয়ে তোমার নয়?'

'মেয়ে আমার তা হয়েছে কি। আমি ত আর বিয়ে দিতে যাই নি। আমার যখন ক্ষ্যামতা হ'ত আমি বিয়ে দিতুম! তুই কি আমার মত নিয়ে বিয়ে ঠিক করিছিলি?'

'বেশ ত—তা যেমন করিনি তোমার ভরসায় ত ছিলুমও না। এসে পড়েছ, টাকাও আছে, তাই চাইছি। সংসারটা ত তোমার, সংসার-খরচ বলেই না হয় কিছু দিলে।'

'আমি—আমার কাছে টাকা!' যেন আকাশ থেকে পড়ে নরেন। উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ায় একেবারে, 'আমি কোথায় টাকা পাবো? মাইরি, মা কালীর দিব্যি বলছি, আমার হাতে এক পয়সাও নেই।'

বাইরে থেকে মঙ্গলাও কতকটা স্বগতোক্তি করলেন, 'তুই আর টাকা চাইবার লোক পেলি নে বামুন মেয়ে! ওর কাছে আবার টাকা!'

কিন্তু শ্যামার মুখ ততক্ষণে কঠিন হয়ে এসেছে, সে এক পা কাছে এগিয়ে গিয়ে বললে, 'ছাখো, জেনেশুনে মিছিমিছি দিব্যিগুলো গেলো না বলে দিলুম। টাকা আমার চাই-ই—ভাল চাও ত দাও, নইলে তোমারই একদিন কি আমারই একদিন!'

'মিছিমিছি!' আরও আকাশ থেকে পড়ে যেন নরেন, 'এ যদি মিছে হয় ত কি বলিছি, তোর ঐ ছেলের দিব্যি বলছি—আমার হাতে এক পয়সাও নেই! বলিস্ ত ছেলের মাথায় হাত দিয়ে—'

'ফের!'

বলেই শ্যামা ওর কোমরে কোঁচার যে কাপড়টা সযত্নে জড়ানো বাঁধা ছিল তাতে এক হ্যাঁচকা টান মেরে গেঁজেটা টেনে বার করলে। হয়ত ভাল ক'রে মুখবন্ধ ছিল না বা আর কিছু—গেঁজেটায় টান দিতেই ঝন্‌ঝন্ ক'রে টাকাগুলো ছড়িয়ে পড়ে গেল মেঝেতে।

সত্যিই যে ওর কাছে অতগুলো টাকা আছে তা শ্যামা আশা করে নি। সে

মুহূর্তকয়েক যেন সেই রজতমুদ্রা বর্ষণের শব্দের মধ্যে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিন্তু সে যথার্থ ই কয়েক মুহূর্ত মাত্র, তারপরেই ক্রোধে দিগ্বিদিগ্‌ জ্ঞানশূন্য হয়ে, যতটা শক্তি ওর হাতে ছিল তার সবটা প্রয়োগ ক'রে মারলে এক চড় নরেনের গালে! বহুদিনের বহু সঞ্চিত ক্ষোভ, স্বামীর অমানুষিক আচরণের জন্য সমস্ত তিক্ততা ওর অন্তরে যা জমেছিল এতকাল—তা যেন ঐ চড়ের শক্তি ও প্রেরণা জোগাল ওকে নিজের অজ্ঞাতসারে, সম্পূর্ণ অতর্কিতে। এ ঘটনার পূর্বমুহূর্তেও এ ছিল ওর ধারণার অতীত, পরেও বহুক্ষণ পর্যন্ত রইল তা বিশ্বাসের বাইরে। জ্যেষ্ঠ এবং একমাত্র পুত্রসন্তানের নামে মিথ্যা দিব্যি গালাতেই ওর এতকালের সঞ্চিত চিত্তক্ষোভের বারুদে অগ্নিসংযোগ হয়ে গেল। এ বোধ হয় পৃথিবীর সমস্ত মায়েরই সহ্যের বাইরে!

যাই হোক—চড় মেরেও দু'তিন মুহূর্ত ব্যাপারটা মনের মধ্যে ধারণা ক'রে নিতে দেরি হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তারপরই শ্যামা মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে টাকাগুলো কুড়িয়ে নিতে শুরু করলে। মোট যতটা পাওয়া গেল—একত্রিশটা টাকা। অনেকক্ষণ ধরে খুঁজে দেখলে আরও, তক্তাপোশের নিচে, বাক্সের পাশে —আর পাওয়া গেল না।

একত্রিশ টাকা একসঙ্গে পাওয়াই ওর কাছে অবিশ্বাস্য।

নরেন কিন্তু বেশী স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল ব্যাপারটায়। সত্যিই যে শ্যামা কোনদিন ওর গায়ে হাত তুলবে এ সে কল্পনাও করতে পারে নি। ওর কেমন একটা ভয় হয়ে গেল—নইলে তখনও হয়ত কাড়াকাড়ি ক'রে কয়েকটা টাকা বাঁচানো চলত। কিন্তু সে চেষ্টাও সে করলে না—তেমনি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে, শ্যামা মেঝেতে হামাগুড়ি দিয়ে টাকাগুলো কুড়িয়ে কুড়িয়ে তুলে নিলে। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে মঙ্গলার সামনে এসে বসে পড়ে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললে, 'দেখলেন! দেখলেন হারামজাদীর কাণ্ডটা, দেখলেন? আমার গালে পাঁচ আঙুলের দাগ পড়ে গেছে একেবারে। জ্বালা করছে আমার গালটা।'

মঙ্গলা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'তোমার যা কেলেঙ্কার ঠাকুর, আর ব'লো না! নিজের মেয়ের বে—কুড়িটা টাকা চেয়েছিল, সহমানে দিয়ে দিলেই হ'ত তা নয় আবার ছেলেটার নাম ক'রে মিথ্যে দিব্যি গালা! গলায় দড়িও জোটে না! দড়ি না জোটে ঐ পৈতেগাছটা ত আছে, আর আমি কলসী দিচ্ছি, গলায় বেঁধে পুকুরে গিয়ে ওলো গে।...লজ্জা করে না আবার নাকে কাঁদতে! বেশ করেছে মেরেছে। আমরা হ'লে অমন ভাতারের পাতে আকার ছাই বেড়ে দিতুম।'

টাকার শোকে সেদিন নরেন রাত্রে খেলে না—পরের দিন যেন কতকটা

প্রতিশোধ নেবার অভিপ্রায়েই আবার ডুব মারলে বাড়ি থেকে। শ্যামা যতটা সম্ভব চোখে চোখে রেখেছিল বলে আর কিছু নিতে পারে নি, শুধু একখানা কোরা কাপড় কি ক'রে চাদরের মধ্যে লুকিয়ে নিয়েছিল—ওরা কেউ টের পায় নি। খোঁজ করে যখন পাওয়া গেল না তখন সকলেই ব্যাপারটা অনুমান করলে! মঙ্গলা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'তা বাপু একত্রিশটা টাকার বদলে না হয় গেলই একখানা তের আনা দামের বিলিতি কাপড়! আর সত্যি, ওরও ত কিছু চাই!'

দুই

মহাশ্বেতার কাছে সবটাই পুতুল খেলা। বরং যে দারিদ্র্যের মধ্যে, যে একান্ত অভাবের মধ্যে সে মানুষ হয়েছে—সে অভিজ্ঞতার কাছে এই সত্যিকারের বিয়ের উদ্যোগ-আয়োজন যেন রূপকথার রাজ্যের মতই অবিশ্বাস্য এবং স্বপ্নের দেশেরই সূচনা বহন করে ওর মনের মধ্যে। শ্বশুরবাড়ি হয়ত ততটা খারাপ জায়গা নয়, ওকে ক্ষ্যাপাবার জন্যে পিঁটকীরা যেমন বর্ণনা করে। আর বর, সেই বা না জানি কেমন! সত্যিই কি রাজপুত্তুরের মত হবে সে? কিন্তু তাই বা ঠিক কি রকম? মঙ্গলার এক বুড়ী ননদ কোন কোন দিন সরকার-বাড়ির ছেলেমেয়েদের নিয়ে রূপকথার গল্প বলতে বসত—মহাশ্বেতাও বহুদিন গিয়ে বসেছে সে দলে। রূপকথার রাজপুত্র, কেবলই সে রাক্ষস মেরে রাজকন্যাদের উদ্ধার করে—তারই একটা ধারণা করবার চেষ্টা করত মনের মধ্যে। জিজ্ঞাসাও করত এক-একবার, 'হ্যাঁ দিদ্‌মা—রাজপুত্তুর কেমন?' বুড়ী চোখ বড় বড় ক'রে বলত, 'ওমা তা জানিস না? এই ফরসা রং তোর মার মত—পটোল-চেরা চোখ, টিকোলো নাক, কাত্তিকের মত ফুরফুরে গোঁফ—এই ঠাকরুণ পিতিমের কাত্তিক ঠাকুরের মত আর কি কতকটা!' ব'লে শেষ করতেন। দুর্গা তাঁর শাশুড়ীর নাম। তাই ঠাকরুণ বলতেন। এমন কি সকালে উঠে রোজই বলতেন, 'ঠাকরুণ দুর্গতিনাশিনী মা গো!'

মহাশ্বেতা কার্তিককে ভাববার চেষ্টা করে ওর বর। ভাল লাগে না। ও কি খেলাঘরের পুতুলের মত—ছোট্ট একরত্তি—বাবরি চুল! না, অমনই যদি রাজপুত্তুর হয় ত চাইনে ওর রাজপুত্তুরের মত বর! অবশ্য রাজপুত্তুরের মত কেন হবে ওর বর—এ প্রশ্নটা একবারও মনে জাগে না। সেই প্রথম দিন সরকার দিদ্‌মা ওর মাকে বলেছিলেন, রাজপুত্তুরের মত ছেলে—সেই কথাটাই ওর মনে বাসা বেঁধেছে বোধ হয়।

অবশেষে বিয়ের দিন এল।

বর এসে পৌছতেই বরের উত্তরীয় চেয়ে এনে পিঁড়ির ওপর পেতে ওকে বসিয়ে

দিলে সবাই। পিঁটুকী চোখ রাঙিয়ে বললে, 'খবরদার, এক পা নড়বি নি এখান থেকে, উঠতে নেই! একেবারে সাতপাক ঘোরাতে নিয়ে যাবে পিঁড়িসুদ্ধ!'

কিন্তু মহাশ্বেতা বেশীক্ষণ বসে থাকতে পারলে না। সরকারদের বৈঠকখানা ঘরে বর এসে বসেছে—মেয়েরা সব গেছে ভিড় ক'রে দেখতে আড়াল থেকে। ওর কাছে কেউ নেই—যে ঘরে ও বসেছিল সে ঘরে আছে শুধু গুটি-দুই ঘুমন্ত শিশু। কৌতূহলে স্থির থাকতে না পেরে একসময় এদিক-ওদিকে চেয়ে মহাশ্বেতাও বরের উত্তরীয়খানা কুড়িয়ে বুকে ক'রে নিয়ে ছুটল যথাসম্ভব নিঃশব্দ গতিতে। যেদিক দিয়ে সবাই দেখছে সেদিক দিয়ে গেলে চলবে না—বাইরে দিয়ে যাবার ত উপায়ই নেই—থৈ থৈ করছে পুরুষ। দ্রুত ভেবে নিলে সে ছুটতে ছুটতেই—ওপাশে পিঁটুকী-দের ঘরের দিকে একটা ছোট জানলা আছে ঘুলঘুলির মত—সেখান থেকে দেখা যেতে পারে। হ্যাঁ—এখানে ভিড় সত্যিই কম, একটা-দুটো ছোট ছেলে, তাদের ঠেলেঠুলে সরিয়ে মহাশ্বেতা উঁকি মেরে দেখলে। সবটা না হোক—পাশটা দেখা যাবে। হ্যাঁ, লম্বাচওড়া জোয়ান বটে, রংটাও খুব ফরসা, কিন্তু ওমা, একি, একগাল কালো আর ঘন দাড়ি যে! গোঁফদাড়িতে মুখখানা একেবারে…। এ আবার কি!

মহাশ্বেতা ক্ষুণ্ণ হয় একটু। অবাক্‌ও হয়। জ্ঞান হবার পর যে তিন-চারটে বিয়ে ও পাড়ায় দেখেছে, তার কোন বরই ত এমন দাড়ি নিয়ে বিয়ে করতে আসেনি! প্রতিমার কার্তিকের মত যে নয় তাতে ও খুশী বটে, তা বলে এমনি চোয়াড় হবে! অক্ষয়বাবুর অফিসের যে ভোজপুরী দারোয়ান আসে তার কতকটা এমনি দাড়ি আছে। তবু—তার দাড়ি দুদিকে ভাঁজ করা, কেমন কানের সঙ্গে বাঁধা—এমন জংলী দাড়ি ত নয়!

দেখছে—অবাক হয়েই দেখছে মহাশ্বেতা—পেছন থেকে কে এসে কান ধরলে। চমকে চেয়ে দেখে—পিঁটুকী।

'পৈ পৈ ক'রে না বারণ ক'রে এলুম! সেই অলুক্ষুণে কাণ্ড করা হ'ল! উঠতে নেই একে পিঁড়ি থেকে—তায় শুভদৃষ্টির আগে বর দেখা! একরত্তি মেয়ে ভেতরে ভেতরে পেকে উঠেছ! আর তর সইছে না দুটো ঘণ্টা! বর দেখা হচ্ছে লুকিয়ে লুকিয়ে!'

চাপা গলায় গজরাতে থাকে সে। শ্যামা ত ছুটে এসে একটা চড়ই কষিয়ে দিলে। মঙ্গলা হাঁ হাঁ করে উঠলেন, 'করিস্ কি, করিস্ কি—আজকের দিনে!'

শ্যামা বললে, 'দেখুন দিকি, শুভদৃষ্টির আগেই বর দেখে নিলে, যদি ভালমন্দ কিছু হয়? যত সব অলক্ষুণে কাণ্ড!'

'ওলো, শুভদৃষ্টি ত আর হয়নি। বর ত অন্য দিকে চেয়ে ছিল। নে, আর মন খারাপ করিস নি।'

অপমানে আর অভিমানে মহাশ্বেতার চোখে জল এসে গিয়েছিল। তাই সত্যিই যখন শুভদৃষ্টির সময় এল তখন সে চোখ বুজে বসে রইল জোর ক'রে! অনুরোধ অনুনয়, ধমক—কিছুতেই আর চোখ খুলতে পারে না।...শেষকালে অক্ষয়বাবু এসে আদর ক'রে মুখখানা তুলে ধরে যখন বললেন, 'একবার চোখ চাও ত দিদি, এ-ই, বা! বেশ হয়েছে। দেখো ভালো ক'রে!' তখন কোনমতে এক লহমার জন্যে চোখ খুলেই আবার বুজে নিলে। তাতে শুধু ওর চোখে পড়ল, ঈষৎ পিঙ্গল একজোড়া চোখের গভীর স্থির দৃষ্টি।

ওর যেন কেমন ভয় করতে লাগল।

তিন

ওমা এ কি ছিরির শ্বশুরবাড়ি! পাল্‌কি থেকে নেমে মাথা হেঁট ক'রে থাকলেও, আড়ে এক ঝলক দেখে নিয়েছে মহাশ্বেতা। বিরাট ঝুপ্‌সী বাগান, উঠোনে প্রকাণ্ড একটা কাঁঠাল গাছ সেই দিনের আলোতেই যেন অন্ধকার ক'রে রেখেছে—আর তার মধ্যে জরাজীর্ণ স্যাঁতসেঁতে একটি নিচু নিচু পুরোনো ঘর। এই নাকি একটিই ঘর, পাশেও একটা ঘর আছে, তার ছাদের খানিকটা ভেঙে পড়ে গেছে, সেখানে আবার গোলপাতা দেওয়া ছাউনি খানিকটা। যত দুঃখেই পদ্মগ্রামে থাক্ ওরা, ভাল পাকা ঘরে থাকে, পোতা উঁচু ঘর, খট্ খট্ করছে শুক্‌নো। এইখানে থাকতে হবে ওকে, সা-রা-জী-ব-ন?

শাশুড়ী অবশ্য মন্দমানুষ নন। ছোটখাটো একরত্তি মানুষটি। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কথা-বার্তা। কোলে ক'রেই নামালেন পাল্‌কি থেকে। বরণের পর ঘরে এনে বসিয়ে বললেন, 'পুরোনো বাড়ি দেখে ঘেন্না ক'রো না মা—এ তোমার শ্বশুরের ভিটে। তোমার পয়ে এইখানেই একদিন রাজ-অট্টালিকা উঠবে দেখে নিও।'

কুশণ্ডিকার হাঙ্গামা চুকল বেলা তিনটে নাগাদ। ক্ষুধাতৃষ্ণায় মহাশ্বেতা তখন নেতিয়ে পড়েছে। তবু একটা জিনিস এরই মধ্যে সে লক্ষ্য করেছে যে কুশণ্ডিকার শেষের দিকে সে প্রায় টলে টলে পড়ে যাচ্ছিল—কিন্তু যতবারই মাথা ঘুরেছে ততবারই বর আগে থেকে যেন বুঝে নিয়ে কোনমতে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে ওকে ঠেক্‌নো দিয়ে সামলে নিয়েছে। খুব লক্ষ্য আছে কিন্তু লোকটার!

জলখাবার এলো দুটো নারকেল নাড়ু আর দুখানা জিলিপি। কে তাই দেখে তাড়াতাড়ি গিয়ে একটু আখের গুড় গুলে সরবৎও ক'রে দিলে। কিন্তু তাই

তখন অমৃত মহাশ্বেতার কাছে। কনেকে যে প্রায় কিছুই খেতে নেই, একটু শুধু ভেঙে মুখে দিতে হয় তা তখন সে ভুলেই গেছে।

জল খেয়ে একটু সুস্থ হয়ে বসতে আশেপাশে যারা ভিড় ক'রে ঘিরে ছিল তাদেরও দেখবার সুযোগ পেলে মহাশ্বেতা। মানুষগুলোও যেন কি রকম, কি রকম এখানকার। জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত মহাশ্বেতার জগৎ দুটি বাড়িতে সীমাবদ্ধ। এক কলকাতায় দিদিমার বাড়ি, আর এক পদ্মগ্রামে সরকার বাড়ি। দিদিমার বাড়ির যে দুটি-তিনটি মানুষ তাদের শিক্ষাদীক্ষা সভ্যতার পরিমাণ বোঝার মত বয়স ওর হয় নি বটে কিন্তু সবটার ছাপ পড়েছে ওর মনে ঠিকই। সরকার বাড়িরও চলচলনে বিশেষত বেশভূষায় কলকাতার ছোঁয়া আছে। কিন্তু এখানকার মানুষগুলো যেন সে-সব থেকে একেবারে আলাদা। যেমন মলিন ও দীন পোশাক, তেমনি কথাবার্তার ধরণ। পুরুষদের হাঁটুর ওপর কাপড়, খালি পা, কাঁধে হয় একটা গামছা নয়ত কতদিনের ছেঁড়া পুরোনো কোট। ওর দুটি দেওর এবং দুটি ননদ। বড় ননদটির বিয়ে হয়েছে—বারো তের বছরের মেয়ে, প্রকাণ্ড একটা নথ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে মুরুব্বীর মত। তবু তারই একটু ফরসা কাপড় চোপড়, দেওর দুটির একটি বছর এগারো, একটি পাঁচ—কারও গায়েই জামা নেই। এই বিয়েবাড়িতেও তারা খাটো খাটো ময়লা ধুতি পরে খালি গায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর তেমনি কি পাকা পাকা কথাবার্তা! মহাশ্বেতার মন বিরূপ হয়ে ওঠে।

বরটাও যেন কেমন কেমন। যতক্ষণ চেলির জোড় ছিল ততক্ষণ এক রকম। ব্যাস্, এখনই একটা মোটা চটের মত কোরা কাপড় পরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাঠের গুঁড়ি চেলা করতে লেগে গেছে। কাল যজ্ঞি হবে—তারই কাঠ। তবু কি ভাগ্যি একেবারে খালি গায়ে নেই -একটা ফতুয়া আছে গায়ে।

কিন্তু লোকটার খুব রং বাপু—যাই বলো! মনে মনে স্বীকার করে মহাশ্বেতা। ওর চাইতে অনেক বেশি ফরসা। পরিশ্রমে কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে। আর মুখখানা হয়ে উঠেছে লাল—মহাশ্বেতার মনে হ'ল ঘাম নয়, সকালে যে দুধে-আলতায় দাঁড়িয়েছিল, সেই দুধে-আলতাই ওর মুখে কে ছড়িয়ে দিয়েছে। অত দাড়ি যদি না থাকত ত বেশ হ'ত!

শ্যামা ফুলশয্যার তত্ত্ব পাঠিয়েছিল ভালই। সবাই সুখ্যাতি করতে লাগল।

দশ টাকার বেশি খরচ হয় নি বটে কিন্তু নিজের কায়িক পরিশ্রমে অনেক পুষিয়ে দিয়েছে সে। দু থালা চন্দ্রপুলি, এক থালা ক্ষীরের ছাঁচ—আর এক থালায় জলখাবারের কচুরি, সিঙাড়া, সন্দেশ, পান্তুয়া—সব নিজে করেছে শ্যামা। জামাইয়ের

ধুতি-চাদর, মেয়ের লালপাড় শাড়ি, ফুলের থালা, মালা-চন্দন, ক্ষীর-মুড়কির বাটি কিছুই ভুল হয় নি। মায় একটি ছোট ডালায় অল্প একটু ঘি-ময়দা, সামান্য আনাজ চিনি মিছরি পর্যন্ত সাজিয়ে দিয়েছে। সকলেই স্বীকার করলে এ গ্রামে এমন ফুলশয্যার তত্ত্ব আর কখনও আসেনি।

বৌভাতের যজ্ঞি দুপুরেই মিটে গিয়েছিল—। যজ্ঞি ত কত—"ভেতো যজ্ঞি" – ভাত, ডাল, ছ্যাঁচড়া, মাছের ঝোল, অম্বল—শেষপাতে দই জিলিপি। মহাশ্বেতার চোখে জল এসে গিয়েছিল—অত ভাল ক'রে বিয়ে হ'ল তার, আর বৌভাতে এই খাওয়া! তেমনি অবশ্য নিমন্ত্রিতরাও—মুখ-দেখানি পাওয়া গেল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সিকি আর দুয়ানি—কেবল কে এক এদের আত্মীয়—কলকাতার লোক, সে-ই যা গোটা একটা টাকা দিয়ে গেল। আর হেম এসেছিল কন্যাপক্ষের হয়ে নিমন্ত্রণ রাখতে, সে দিয়ে গেল একটা আধুলি। রাজবাড়ির সরকার একটি ছোট ছেলে সঙ্গে ক'রে এসে নিমন্ত্রণ রেখে গেলেন, তিনি দিলেন সব চেয়ে বেশি—পাঁচ-পাঁচটা টাকা।

তবু সব গুনে-গেঁথে মন্দ দাঁড়াল না। মহাশ্বেতার সামনেই শাশুড়ী গুনে বাক্সতে তুললেন, সাতাশ টাকা প্রায়।

বৌভাতের ঝঞ্ঝাট সকাল ক'রে মিটে গিয়েছিল বলেই ফুলশয্যাও সকাল ক'রে হল। মেয়েরা সকলেই ক্লান্ত, জা-দেইজীরা বাড়ি যাবার জন্য ব্যস্ত—কোনমতে অনুষ্ঠান সেরে সকলেই চলে গেলেন। মহাশ্বেতাও বাঁচল, সারাদিন কাঠের পুতুলের মত কনে সেজে বসে থেকে আর অবেলায় ভাত খেয়ে তার দু'চোখের পাতাতে টান ধরেছে, সে তখন একটু ঘুমোতে পারলে বাঁচে।

কিন্তু সত্যি-সত্যিই যখন মেয়েরা অনুষ্ঠান শেষ ক'রে ওদের শুইয়ে রেখে বেরিয়ে গেল তখন আর যেন কিছুতেই ওর ঘুম এল না।

সেই একমাত্র পাকা ঘরখানিতেই ওদের ফুলশয্যার আয়োজন হয়েছে। পুরোনো কাঁঠাল কাঠের তক্তাপোশে পাতলা বিছানা। খানকতক ছেঁড়া কাঁথার ওপর বোধ হয় একটা সাদা চাদর পাতা। টিম টিম ক'রে রেড়ির তেলের পিদিম জ্বলছে এক পাশে, বাতাসে তার শিখাটা কাঁপছে আর সেই সঙ্গে কাঁপছে পুবদিকের দেওয়ালে ভাঙা তোরঙ্গটার ছায়া। পুরোনো ছাদের কড়ি বরগায় আলকাতরা মাখানো, দেওয়ালে চুনবালি নেই অনেক জায়গাতেই। কেমন যেন একটা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ। তবু মহাশ্বেতা একপাশ ফিরে সেই ঘরেরই খুঁটিনাটি দেখতে লাগল চেয়ে চেয়ে। ঘুমে চোখের পাতা দুটো ভারী হয়ে এসেছে, ব্যথা করছে দুটো চোখ—তবু যেন ঘুম আসে না। পাশে যে মানুষটা শুয়ে আছে, তার সম্বন্ধে কৌতূহলই যেন সব

চেয়ে উগ্র। ভয় হচ্ছে খুব—শুয়ে শুয়েই বেশ টের পাচ্ছে পা-দুটো কাঁপছে সামান্য সামান্য। হাতের মুঠোয় ঘাম। ভয় অথচ কৌতূহলেরও যেন সীমা নেই।

ঘরের বাইরে খস্‌খস্‌ শব্দ—বোধ হয় কেউ আড়ি পেতেছে। তা পাতুক। কি লাভ আড়ি পেতে তা বোঝে না মহাশ্বেতা। ওর শুধু হাসি পায়। হেসেই ফেলত যদি না ঐ লোকটা ঠিক পেছনে গায়ের কাছে শুয়ে থাকত।

একটু উস্‌খুস করতেই বর লোকটি ওর কানের কাছে মুখ এনে খুব কোমল, খুব সস্নেহ কণ্ঠে বললে, 'কি, ঘুম পাচ্ছে না? একটু জল খাবে?'

সাগ্রহে ঘাড় নাড়ে মহাশ্বেতা। সত্যিই ত, তেষ্টাই ত ওর পেয়েছে—লোকটা ঠিক বুঝতে পেরেছে ত!

বর যথাসম্ভব নিঃশব্দে উঠে পেতলের একটা চুমকি ঘটিতে ক'রে জল এনে দিলে। মহাশ্বেতা উঠে বসে জল খেয়ে আবার শুয়ে পড়ল।

তারপর কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। বাইরের খস্‌খসানি একটু থামতে বর ওকে টেনে খানিকটা নিজের দিকে ফিরিয়ে বললে, 'ঘুম না হয় ত একটু গল্প করো না।'

চুপিচুপি যে বরের সঙ্গে কথা কইতে হয় তা কেউ না বললেও মহাশ্বেতা কেমন ক'রে বুঝেছে। সে ফিসফিস ক'রেই বললে, 'কি গল্প করব?'

'যা খুশি।'

একটু পরে মহাশ্বেতা বললে, 'তুমি দাড়ি কামাও না কেন? সরকার দাদুদের বাড়ি, আমাদের পাড়ায় সবাই ত দাড়ি কামায়। বুড়ো হলে তবে দাড়ি রাখে।'

বর বললে, 'খরচে কুলোয় না।'

'খরচ হয় নাকি দাড়ি কামাতে?'

'হ্যাঁ, এক পয়সা ক'রে নেয় নাপিত। মাসে দু আনা।'

'ভারি ত খরচ!' ঠোঁট উল্টে বলে মহাশ্বেতা।

বর একটু গম্ভীরভাবে বলে, 'আমি মাইনে পাই মোটে উনিশ টাকা। পাঁচটি লোক খেতে, বোনের বিয়ে দিয়েছি। তুমি এলে, ছ'জন হ'ল। এ আয়ে কি কুলোয়? বাড়িঘর তুলতে হবে ত? আর দাড়ি রাখলেই বা মন্দ কি?'

'না, মন্দ আর কি!' মুরুব্বীর মত বলে মহাশ্বেতা।

খানিক পরে হঠাৎ সে-ই আবার প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা, চোর কেমন দেখতে হয়?'

'তা ত জানি না। মানুষের মতই দেখতে হয় বোধ হয়।...তা হঠাৎ চোরের কথা কেন?'

একটু অপ্রতিভ হয়ে মহাশ্বেতা বলে, 'না, ঐ যে মা কাকে বলছিলেন, বাইরে কাপড়-চোপড় আছে কিনা দেখে শুতে—চোরে না নিয়ে যায়।...চোর

আসে বুঝি এখানে ?'

'না। আমাদের কীই বা আছে চোরে নিয়ে যাবে!'

তারপর আর কি প্রসঙ্গ তুলবে ভেবে পায় না মহাশ্বেতা। ও লোকটাও ত কিছু কিছু বললে পারে! নিজে বেশ চুপ ক'রে শুয়ে আছে।...যত দায় যেন মহাশ্বেতারই। 'গল্প করো না!' বা-রে! বেশ লোক ত!

অনেক ভেবে-চিন্তে একসময়ে মহাশ্বেতা প্রশ্ন ক'রে বসে, 'তোমাদের বাড়িতে পুঁই গাছ আছে?'

একটু হেসে বর বললে, 'আছে। কেন? তুমি বুঝি পুঁই খুব ভালবাস?'

কিন্তু ততক্ষণে বাইরে উচ্চ হাসির রোল উঠেছে। বোঝা গেল আড়ি পাতবার লোক তখনও অপেক্ষা করছিল, কেউ শুতে যায় নি। মহাশ্বেতা আরও বুঝতে পারল যে সে বিষম বোকার মত একটা কিছু কথা বলে ফেলেছে। তাই সে যৎপরোনাস্তি অপ্রস্তুত হয়ে ওপাশ ফিরে বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে রইল—বরের কথার উত্তর দিলে না।

পিদিমের শিখাটা কাঁপছে আর তার সঙ্গে কাঁপছে উপরি উপরি রাখা ছুটো তোরঙ্গের ছায়া পুবদিকের দেওয়ালে। একটি চোখ ঈষৎ ফাঁক ক'রে সেই দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল মহাশ্বেতা।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

এক

কথা ছিল মহাশ্বেতা আটদিনের দিন জোড়ে এসে এক বছর থাকবে। এ-ই নিয়ম। এই এক বছরে জামাই আসতে পারে কিন্তু মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যাবে না। এ অঞ্চলের এই প্রথা, তাছাড়া মহাশ্বেতা একেবারেই ছেলেমানুষ—এক বছরের বেশি থাকলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু মহাশ্বেতার শাশুড়ী ক্ষীরোদা এক অদ্ভুত প্রস্তাব ক'রে পাঠালেন। তিনি নাকি কোন্ টোলে মত নিয়েছেন, বিয়ের আট-দিনের মধ্যে মেয়ে জামাই যদি বাপের বাড়ি আসে আর সন্থ ফিরে যায়—তাকে নাকি বলে 'ধুলো পায়ে দিন'—তাহ'লে আর এক বছর বাপের বাড়ি থাকার দরকার নেই; ক্ষীরোদার ইচ্ছা মহাশ্বেতাকে তিনি মধ্যে মধ্যে নিয়ে যাবেন। ছু-এক মাস ক'রে অবশ্য বাপের বাড়ি থাকবে—কিন্তু তাঁরও ত একটি হাত-মুড়কুৎ দরকার—একেবারে টানা এক বছর বাপের বাড়ি ফেলে রাখতে পারবেন না।

শ্যামার মুখ শুকিয়ে উঠল। তার ছুধের মেয়ে, আর ঐ সাজোয়ান জামাই

—এখন থেকে শ্বশুরবাড়ি থাকবে কি! শ্বশুরবাড়ির ত ঐ ছিরি। হেমকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন ক'রে শ্যামা মেয়ের শ্বশুরবাড়ির যে চিত্র পেয়েছে তাতে তার ঐ সাত বছরের মেয়ে শ্বশুরবাড়ি আছে ভাবলেই বুকের মধ্যে কেমন করে যেন।

কিন্তু বিয়ে হ'লেই মেয়ে পর! তার ওপর আর জোর কি?

অগত্যা শ্যামা মঙ্গলার শরণাপন্ন হয়।

'কী হবে মা! ওরা যে এখন থেকেই মেয়ে আটকাতে চায়!'

মঙ্গলা একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বলেন, 'শুনেছি আজকাল এরকম হচ্ছে। ধুলো পায়ে দিন ক'রে নিচ্ছে কেউ কেউ। তার আর কি করবি বল্! জোর ত আর নেই, বরং এর পর টেনেটুনে দু মাসের জায়গায় তিন মাস ক'রে আটকে রাখা যাবে। ওখানে নিয়ে গেলে আবার দু' মাস পরেই ফিরিয়ে আনবি'খন।'

'কিন্তু এটুকু মেয়ে এখন থেকে শ্বশুরবাড়ি থাকলে শুকিয়ে উঠবে যে। তারপর যা ভারিক্কি জামাই, মেয়ে হয়ত ভয়ে দব্‌কে দব্‌কে সারা হয়ে যাবে।'

'ঐটুকু মেয়ে ঢের অমন শ্বশুরঘর করছে—তার জন্যে কিছু নয়। আর জামাইয়ের কথা যদি বললি—এক বছর তোর কাছে থাকলেই কিছু তোর মেয়ে একেবারে লায়েক হয়ে উঠবে না। তারপর ত ঐখেনে পাঠাতে হবে, তখন কি করবি? তাছাড়া তোর একটা পেট ত বাঁচল!'

অগত্যা শ্যামাকে চুপ ক'রে যেতে হয়।

জামাই অভয়পদ কিন্তু খুব ভদ্র। বিয়ের দিন অত বুঝতে পারে নি শ্যামা। কিন্তু যেদিন ওরা ধুলো পায়ে দিন করতে এল আর যেদিন জোড়ে এল, দু'দিনই ভাল ক'রে ওকে লক্ষ্য ক'রে দেখে শ্যামা আশ্বস্ত হ'ল। বলতে গেলে জামাই আর সে একবয়সী—কাজেই খোলাখুলি কথা কইতে তার লজ্জা করে—কোন মতে মাথায় একহাত ঘোমটা টেনে সে সামনে আসে, নেহাত খাবার সময় দু'একটা অনুরোধ করতে হয়, করে—কতকটা নৈর্ব্যক্তিক ভাবে, চাপা গলায় ফিস ফিস ক'রে, কিন্তু হেম এবং মঙ্গলার সঙ্গে যখন কথা বলে অভয়, তখন উৎকর্ণ হয়ে শোনে সে। না, কথাবার্তা বেশ ভাল। শুধু মিষ্টি নয়, বেশ জ্ঞানবান বা বুদ্ধিমানের মতই কথা। এই বয়সে বরং এতটা জ্ঞান ও জগৎ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা কেমন ক'রে হ'ল তাই ভেবেই শ্যামার একটু অবাক লাগল। অবশ্য কারণটা সে অনুমান করতে পারে—নিতান্ত বালক বয়সে সংসারের ভার মাথায় এসে পড়েছে, সংসারের বিদ্যালয়ে সর্বাপেক্ষা কঠিন এবং নির্মম গুরুমশায় বাস্তবের কাছেই পাঠ নিতে হয়েছে তাকে; তাই বোধ হয় বয়সের অনুপাতে ঢের বেশী অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে সে। বয়স্ক লোকের বোঝা বইতে বইতে কিশোর দেহের মধ্যেকার মানুষটা কখন বয়স্ক ও প্রবীণ হয়েছে—তা

বোধ হয় বেচারী নিজেও টের পায় নি। শ্যামার মায়া হয় এই অকালপক্ক তরুণটির উপর। আহা, এই ত ওর আমোদ-আহ্লাদের বয়স, এখনই কি আর এমন বুড়িয়ে পেকে যাবার কথা ওর!

অভয়পদর আচরণও একটু অদ্ভুত!

জলখাবার, ভাত, যা তাকে সাজিয়ে দেওয়া যাক না কেন, শ্যামা লক্ষ্য ক'রে দেখে, ঠিক অর্ধেকটা খেয়ে অর্ধেকটা রেখে দেয় পাতে। জলখাবারের একটা রসগোল্লা দিলে ভেঙে আধখানা খায়। ভাত থেকে শুরু ক'রে মাছ পর্যন্ত সবই যেন মেপে আধাআধি খেয়ে ওঠে। প্রথমটা অত বুঝতে পারে নি শ্যামা কিন্তু পরে বুঝেছিল যে এটা সে ইচ্ছা ক'রেই রাখে মহাশ্বেতার জন্য। শ্বশুরবাড়ির পুরো পরিচয় না পেলেও বহুদর্শী অভয়পদ এক নজরে আন্দাজ ক'রে নিয়েছিল, সে জানত এতগুলি লোকের জন্য সমান আয়োজন করা এখানে সম্ভব নয়—যা তাকে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে তা শুধু তার জন্যই সংগৃহীত। ওর খাওয়া হ'লে মহাশ্বেতাই সে পাতে বসবে নিশ্চয়—সুতরাং বালিকা বধূর প্রতি মমত্ববশত সে সব জিনিসেরই চুলচেরা ভাগ রেখে যায়।

এ আচরণ অভয়পদ চিরকাল বজায় রেখেছিল। কোন অনুরোধ বা অনুযোগেই তাকে টলানো যায় নি কখনও। শেষে হাল ছেড়ে দিয়েছিল শ্যামা। বরং সম্ভব হ'লে বেশি ক'রেই ওর পাতে সাজিয়ে দিত—যাতে অর্ধেক রাখলেও একজনের মত যথেষ্ট হয়।

মহাশ্বেতা প্রথম প্রথম অবশ্যই পুলকিত হ'ত। শ্যামা কিছু সবটাই তাকে ভোগ করতে দিত না—হেমকেও ভাগ ক'রে দিত ভাল ভাল খাবারগুলো। তাতে মহাশ্বেতার খুব বিশেষ আপত্তি ছিল না। একটা দাদা ত! তাকে দিয়েও যা পেত তার কল্পনায়ও অগোচর!

প্রথম দিন, ধুলো পায়ে দিন করতে যেদিন আসে ওরা, আকণ্ঠ খেয়ে উঠে মহাশ্বেতা বলেই ফেলেছিল, 'যাই বলো বাপু, মানুষটা কিন্তু মন্দ নয়!'

সত্যিই প্রথমটা বুঝতে পারে নি শ্যামা, প্রশ্ন করেছিল, 'কে রে, কার কথা বলছিস?'

'আবার কে! ঐ বরটার কথা বলছি।'

মহাশ্বেতার মুখ লাল হয় নি। কিন্তু শ্যামার কপালে ও গালে কে সিঁদুর ঢেলে দিয়েছিল।

সে কি শুধু লজ্জায়? না—সুখেও। নিজের নিদারুণ অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ ক'রে এ ক'টা দিন সে আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে ছিল। আজ অভয়পদকে ভাল

ক’রে দেখে এবং মেয়ের কথা শুনে সুখেই তার চোখে জল এসে গেল।

নিশ্চিন্ত হ’ল সে। ‘মানুষের হাতে পড়েছে, জন্তুর হাতে নয়। এখন মেয়ে যত দুঃখই পাক—ওর তাতে কোন ক্ষোভ নেই।

প্রথম দিন ওরা চলে যাবার সময় হেম গিয়েছিল এগিয়ে দিতে। মল্লিকদের বাগান ছাড়িয়ে চট্‌থণ্ডীদের বাড়ি পর্যন্ত গিয়ে পাকা রাস্তায় তুলে দিয়ে হেম যখন ফিরে এল—তখন তার হাতে চক্‌চক্ করছে একটা রুপোর টাকা।

‘এ কি রে, কোথায় পেলি!’ শ্যামা সচকিত হয়ে প্রশ্ন করে।

হেম উজ্জ্বলমুখে টাকাটা মায়ের হাতে তুলে দিয়ে বললে, ‘জামাই দিলে মা। আমি কিছুতেই নেবো না, সেও ছাড়বে না। বলে, সন্দেশ কিনে খেও। আর মহাটা কি পাজী জানো মা, আমাকে কানে কানে বলে কিনা—দিচ্ছে, নে না! আবার যেদিন জোড়ে আসব, সেদিন খরচা নেই ?...এমন লজ্জা করছিল আমার শুনে!’

লজ্জার কথাই বটে, তবে কথাটা সত্যিই। শ্যামার দুর্ভাবনার শেষ ছিল না সেদিনের কথা মনে ক’রে। বিয়ে দিতেই তার হাত নিঃশেষ হয়ে গেছে। কোথাও থেকে যে কিছু পাওয়া যাবে সে সম্ভাবনাও নেই। নরেন সরে গেছে, খুব তাড়াতাড়ি ফিরলেও দু মাস। এক ভরসা ওর নারকেল পাতা—তাও এই গোলমালে কদিন হাত দেওয়া যায় নি, খুব খাটলেও চার-পাচ আনা পয়সা আসবে। তারপর ?

এই তার পরের প্রশ্নটাতে যখন বুকের রক্ত হিম হয়ে আসছিল, তখন যেন দেবতার আশীর্বাদের মত টাকাটা এসে পড়ল।

জামাই দীর্ঘজীবী হোক। মহাশ্বেতা সুখী হোক। হে মা মঙ্গলচণ্ডী, এতদিনে কি একটু মুখ তুলে চাইলে মা ?

মঙ্গলচণ্ডীকে প্রণাম করতে গিয়ে মঙ্গলার কথাও মনে পড়ল। ভাগ্যিস্ তখন বয়সের কথা শুনে ইতস্তত করে নি! মঙ্গলার কাছে তার ঋণ শোধ হবার নয়।

দুই

শ্বশুরবাড়ির দারিদ্র্যের চেহারাটা বিয়ের আটদিন ভাল নজরে পড়ে নি মহাশ্বেতার। বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘরে ধারদেনা ক’রেই হোক আর ভিক্ষে চেয়েই হোক—বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক ব্যাপারে এক রকমের কৃত্রিম প্রাচুর্য সৃষ্টি করা হয়, তাতে ক’রে গৃহস্থের ঠিক অবস্থাটা ঠাওর করা শক্ত হয়ে ওঠে। বরং অবস্থাপন্ন ঘরে কৃপণতা দেখা যায় কোথাও কোথাও, বোধ হয় সম্পন্ন অবস্থা ব’লেই সেটা দেখাতে সাহস

করেন তাঁরা—দরিদ্রের সংসারে, যেখানে যত অভাব, সেখানে তত সচ্ছলতা প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লাগেন কর্মকর্তারা।

অভয়পদর বাড়িতেও তার অন্যথা হয় নি। পণের একান্ন টাকা ছাড়াও অভয়পদ তার বহু কষ্টে সঞ্চিত ষাটটি টাকা তুলে এনে দিয়েছিল—তা ছাড়াও কিছু ধার করতে হয়েছে। সংসার চালাতে হবে—এবং দেনা শোধ করতে হবে, সবই ঐ উনিশ টাকা ছ' আনা মাইনের মধ্যে। সুতরাং বধূর সামনেও কোন ছদ্ম-সম্ভ্রম রাখা সম্ভব নয়। মহাশ্বেতা যখন দুমাস পরে আবার ঘর করতে এল তখন বাইরের কৃত্রিম আবরণ শুধু নয়—যেন মাংস আর চামড়াও খসে পড়েছে! বেরিয়ে এসেছে কঙ্কালটা!

অভয়পদর অফিস নাকি হাওড়ার পোলের কাছে কোথায়। কারখানার চাকরি—আটটায় হাজ্‌রে। সুতরাং সে ছটার মধ্যেই ভাত খেয়ে বেরিয়ে পড়ে। পাকা আড়াই ক্রোশ পথ হেঁটে বড় রাস্তায় পৌছলে, সেটা যদি সওয়া সাতটার মধ্যে পৌছনো যায় ত, বাকী দেড় ক্রোশের প্রায়ই একটা সুব্যবস্থা হয়—অর্থাৎ অফিসের সাহেবদের গাড়ী যায় অনেকগুলো সেই দিক দিয়ে—কেউ কেউ দয়াপরবশ হয়ে কোচম্যানের পাশে তুলে নেন ওকে, নইলে সেটাও পায়ে হেঁটে সারতে হয়। ফেরবার সময়ও অবশ্য ঐ একই ব্যবস্থা।

যাই হোক—আগের রাত্রের বাসি ডাল-তরকারির সঙ্গে গরম ভাত দিয়ে আহারপর্ব সারতে হয় অভয়পদকে। যেদিন তা থাকে না, সেদিন বড়জোর একটু ডালভাতে দিয়ে আগাগোড়া ভাত খেয়ে ওঠে। এর বেশি ক্ষীরোদা পেরে ওঠেন না। ওঠেন তিনি রোজই রাত চারটেয় কিন্তু বাসি পাট সেরে চান ক'রে ভাত চড়াতে চড়াতে কোথা দিয়ে পাঁচটা বেজে যায় বুঝে উঠতে পারেন না। শুধু যেদিন বাসি ডাল তরকারি কোন কারণে থাকে না সেদিন একটু হা-হুতাশ করেন—'আহা রে, নির্লখ্যে একটু ডালভাতে দিয়ে কি ক'রেই বা খাবি, তাই ত! ঘরেও কিছু নেই, ঐ জন্যে বলি একটা দুটো আলু অন্তত এনে রাখিস্। এই সময় একটা আলু থাকলে কত সুবিধে হ'ত!'

বলা বাহুল্য, অভয়পদ কোনদিনই এসব কথার কোন উত্তর দেয় না। খাওয়া নিয়ে সে কোন আলোচনাই করে না কারও সঙ্গে। এমন কি ডালে নুন না হলেও বলে না, বা চেয়ে নেয় না, ভুলে ডবল নুন পড়লেও কোন অনুযোগ করে না। রাত্রেও সে-ই সর্বাগ্রে খায়—কিন্তু তাকে খাইয়ে কোন ভরসা পান না ক্ষীরোদা। আগে আগে তিনি অভিযোগ করতেন, 'তুই কি রে, তখন বললে ত আবার নুন দিয়ে ফুটিয়ে নিতে পারতুম!' কিন্তু তাতে অভয়পদর মুখের প্রশান্তি

বা নীরবতা নষ্ট হ'ত না, খুব বাড়াবাড়ি হ'লে জবাব দিত, 'কি দরকার! যে রেঁধেছে সেও ত খাবে। তখনই বুঝবে।'

'তা তোর মুখে কি সাড় লাগে না? তুই খাস কি ক'রে?'

'খাই যখন, তখন অসুবিধে হয় না বুঝতে হবে।' এর বেশি কথা সে বলে না কোনদিনই।

অভয়পদর মত ভাত হয় ছোট তিজেলে ক'রে পাতার জালে। তারপরই ক্ষীরোদা বেরিয়ে পড়েন পাড়ায়। কার পাঁদাড়ে ডুমুর হয়েছে, কোথায় দুটো ডাঁটা, কারও বাড়ি গিয়ে গোটাকতক আমড়া, কোথাও বা একফালি থোড়—এই সংগ্রহ ক'রে ফেরেন একেবারে আটটা নাগাদ। তারপর হাঁড়ি ক'রে ডাল চাপে। মহাশ্বেতা এসে পর্যন্ত দেখছে একই ডাল—অড়র। একদিন শাশুড়ীকে সে বলেই ফেলেছিল, 'হ্যাঁ মা, রোজ অড়র ডাল রাঁধেন কেন?' তাতে শাশুড়ী উত্তর দিয়েছিলেন, 'ওমা, তা জানো না, অড়র ডাল যে পোষ্টাই খুব! সায়েবরা পর্যন্ত খায়!'

কিন্তু পরে মহাশ্বেতা শুনেছিল কথাটা তা নয়। ওর সমবয়সী ননদ বুড়ী একদিন খুব অন্তরঙ্গতার অবসরে ব'লে ফেলেছিল, 'হ্যাঁ, পোষ্টাই না ছাই! আসলে সস্তা। দাদা কোথা থেকে অড়র ডাল আনে—পোস্তা না কোথা থেকে—চার পয়সা সের। ঐ ক্ষুদি ক্ষুদি ডাল—ও আবার পোষ্টাই! কুণ্ডুবাড়ি অড়র ডাল আসে এই এত বড় বড় দানা! তাও ওদের ওখানে ও ডাল খায় শুধু খোট্টা দারোয়ানেরা।'

ঐ ডাল আর একটা চচ্চড়ি, সকাল বিকেল একই অবস্থা। কোনদিন আমড়া কি কাঁচা তেঁতুল কোথাও থেকে পাওয়া গেলে বড়জোর একটু অম্বল কিংবা টক দিয়ে ডাল। তাও অম্বলে মিষ্টি পড়ত না—তাতে নাকি অসুখ করে।

শুধু ডাল-চচ্চড়ি দিয়ে খেতে মহাশ্বেতার আপত্তি হবার কথা নয়। যদি সেটাও ভালভাবে পেত সে। প্রতিদিনই দেখত যে পুঁই ডাঁটা বা কুমড়ো ডাঁটার (এই দুটো শাক ওদের উঠোনেই হয়েছিল অপর্যাপ্ত) সঙ্গে গা থেকে ডুমুর থোড় বা কাঁচকলা—যেদিন যা যোগাড় হ'ত চচ্চড়ির—চেঁচে নিয়ে পুরুষদের এবং ছোট ননদের পাতে দেওয়া হ'ত, ওদের শাশুড়ী-বৌয়ের জন্য অবশিষ্ট থাকত শুধু ডাঁটার অংশটুকু। যেদিন নাজনে ডাঁটা পাওয়া যেত সেদিনটা মহাশ্বেতার কাছে উৎসবের দিন, কিন্তু সে কদাচিৎ কখনও। জলের মত ডাল মেখে শুধু পুঁইডাঁটা দিয়ে ভাত খেতে এক-একদিন মহাশ্বেতার চোখে জল এসে যেত। শাশুড়ীও অবশ্য তাই খেতেন, কিন্তু তাতে সান্ত্বনা পেত না সে।

একদিন সে প্রশ্ন করেছিল, 'হ্যাঁ মা, আমাদের বাজার হয় না কেন?'

চকিতে ক্ষীরোদার মুখ রাঙা হয়ে উঠেছিল, 'হয় বৈ কি মা। তবে কি জানো, চলে যায়, পাঁচজনে ভালবাসে, এটা-ওটা দেয়—তাই আর আমার অভয়পদ গা করে না তেমন!'

সব চেয়ে মুশকিল, স্বামীকে কাছে পায় না মহাশ্বেতা। এবার শ্বশুরবাড়ি আসার পর দেখছে শোবার ব্যবস্থা অন্য রকম হয়েছে, বড় ঘরে সে, তার ছোট দেওর, ননদ এবং শাশুড়ী শোয়—ভাঙা ঘরে বাকী দু ভাই। সে একটু ক্ষুণ্ণই হয়েছিল এতে, শ্বশুরবাড়ির মধ্যে তার বর লোকটিই যে সব চেয়ে ভাল, আর যা কিছু তার মনের কথা একমাত্র ঐ লোকটিকেই নির্বিচারে বলা চলে—এ কথাটা কেমন ক'রে মহাশ্বেতা যেন নিজে নিজেই বুঝেছিল। কিন্তু উপায় কি? এ কথা ত মুখ ফুটে বলা যায় না যে—সে বরের কাছেই শুতে চায়। বিশেষত শাশুড়ী বলেই দিয়েছিলেন যে, 'এখন তুমি বড্ড ছেলেমানুষ বৌমা, তুমি দিনকতক আমার কাছে শোও। নইলে হয়ত ভয়-টয় পাবে—'

হাসি পেয়েছিল মহাশ্বেতার কথাগুলো শুনে। প্রথম আটদিন ভয় পেলো না—এখন পুরোনো শ্বশুরবাড়ি ভয় করবে?

ওরই মধ্যে একদিন এক ফাঁকে—সেটা বোধ হয় রবিবার—বলে ফেলেছিল সে অভয়পদকে নির্জনে পেয়ে, 'একদিন পটল এনো না। বড্ড পটল খেতে ইচ্ছে করে। বেশি ক'রে এনো কিন্তু, নইলে আমার আর মার অদৃষ্টে জুটবে না।'

অভয়পদ বলেছিল, 'তা আনবো। কিন্তু তুমি আর মাকে বাজারের কথা বলো না। আমাদের অভাবের সংসার—বাজার-হাট ক'রে আনতে গেলে কি চলে? চেয়ে-চিন্তে সংসারটা চলে গেলেই হ'ল। মিছিমিছি মা লজ্জা পান।'

অপ্রতিভ হয়ে গিয়েছিল মহাশ্বেতা সেই বয়সেই। 'আর কখনও বলব না' বলে প্রায় ছুটে পালিয়েছিল।

পরের দিনই সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ঢুকল অভয়পদ গামছায় পুঁটুলি ক'রে একরাশ পটল নিয়ে। মার সামনে নামিয়ে দিয়ে বললে, 'পোস্তার দিকে একটু দরকার ছিল আজ—পেয়ে গেলুম এক পয়সায় এতগুলো, তাই পটল নিয়ে এলুম।'

কিন্তু সে পটলের চেহারা দেখে হাসবে কি কাঁদবে মহাশ্বেতা ভেবে পায় না। যত রাজ্যের হলদে পাকা পটল—কতক কতক হাজাও আছে। কোন-কোনটা ভাঙা দুখানা করা।

সেদিন রাত্রে সেই সব পটলের মধ্যে বেছে যেগুলো আর এক রাতও থাকবে

না সেইগুলো পোড়ানো হ'ল। সেই পোড়া পটলই রাত্রে একমাত্র ভরসা। শাশুড়ী রাতে ভাত খান না, মুড়ি খান—তিনিও পটল পোড়া দিয়ে মুড়ি খেলেন। ভারি খুশী, বললেন, 'পাকা পটল কেমন মিষ্টি লাগে দেখেছ বৌমা? আমি খুব ভালবাসি পাকা পটলপোড়া খেতে!'

মহাশ্বেতার আদৌ ভাল লাগল না এসব। পটল সে দিদিমার বাড়ি খেয়েছে, ভাজা কিংবা ঝোলে—কি আলু-পটলের ডাল্না! এ কী ছাই!...বার বার নিজের মনে বলতে লাগল, এই শেষ! ঐ ছিষ্টিছাড়া মানুষটাকে যদি সে আর কোনদিন কিছু বলে! তার খুব শিক্ষা হয়েছে!

মহাশ্বেতা একদিন শাশুড়ীকে খেতে খেতে বলে ফেলেছিল, 'আচ্ছা মা, আপনি এত পাতলা ডাল রাঁধেন কেন? আমার দিদিমা অড়র ডাল কি ছোলার ডাল রাঁধে—এই চাপ-চাপ! ঠাণ্ডা হয়ে গেলে তাতে সর পড়ে ফেটে যায়। সেই ত বেশ!'

তাতে এমন হেসেছিলেন ক্ষীরোদা যে মহাশ্বেতার লজ্জার শেষ ছিল না। এই ভ্যাখো কাণ্ড, সে আবার কী বলতে কী বলে ফেলেছে বোধ হয়! বর আবার না তাকে আড়ালে পেয়ে গম্ভীর মুখে শাসন করে!

ক্ষীরোদা বলেছিলেন, 'ওমা! অড়র ডাল আবার চাপ-চাপ? শুনলে লোকে হাসবে যে! যা বলেছ বলেছ আমার কাছে বলেছ—আর কারুর সাক্ষেতে যেন ব'লে ফেলো না অমন কথা।'

অড়র ডাল ঘন খেলে এমন কি লজ্জার কথা আছে তা ভেবে পায় না মহাশ্বেতা। খেতে ত সেইটেই ভাল লাগে। তবু মনে মনে আরও একবার প্রতিজ্ঞা করে যে, খাওয়ার কথা আর কখনও তুলবে না। বাপের বাড়িতে দুবেলা ভাত জোটাই ত তার স্বপ্নের অগোচর ছিল বলতে গেলে। দুটো ভাত যে খেতে পাচ্ছে পেট পুরে, এই ঢের।

বয়স অল্প হ'লেও অভাব ও দারিদ্র্য অনেক বেশি পাকিয়ে দিয়েছে মহাশ্বেতাকে, সে বেশ ভারিক্কী লোকের মতই নিজেকে বোঝাতে বসে মধ্যে মধ্যে।

কিন্তু তার কান্না পায় একটা ব্যাপারে। ওর দেওর ননদরা রোজই আগে খায়—যার পাতে যা কিছু পড়ে থাকবে, শাশুড়ী একটা বাটি ক'রে জড়ো ক'রে তুলে রাখবেন আর তাকে দেবেন সেইগুলো খেতে। ডাল তরকারি মাখা ভাত ছড়িয়ে বিছড়ে খায় ওরা, বিশেষত ছোট দেওর দুর্গাপদর ত সর্বদাই সর্দি লেগে আছে, তার খাওয়ার দৃশ্য মনে হ'লেই বমি আসে মহাশ্বেতার—আর সে-ই ঠিক

রোজ এতগুলো ক'রে ভাত চেয়ে নিয়ে খানিকটা পাতে ফেলে রেখে উঠবে। তাই কি তরকারি একটু রেখে যাবে? কোনদিনও না, তার বেলা সেয়ানা ছেলে, ঠিক চেটেপুটে খেয়ে যায়! শুধু শুধু ডালমাখা ভাতগুলো—মাগো, সাত পাতের ঐ কুড়োনো ঠাণ্ডা ভাত—! এক-একদিন আড়ালে মাথা কুটত মহাশ্বেতা, আর কাঁদত ডাক ছেড়ে। কোন কোন দিন রেগে আঙুল মটকে গালাগালও দিত, 'মর্, মর্—আঁটকুড়ো, চোখখেগো! মর্! এত লোকের ওলাউঠো হয়, তোর হয় না?'

সরকার বাড়ির পুকুরে চান করতে এসে পোদেদের গিন্নী ঠিক এই ভাষাতেই গালাগাল দিতেন তার দেওরদের। হুবহু সেইটেই মনে আছে মহাশ্বেতার।

এক-একদিন কাজের সময় বায়না ধরে কাঁদত যখন দুর্গাপদ তখন ক্ষীরোদা বলতেন, 'একটু ভোলাও ত বৌমা—থাক থাক, কোলে করতে যেও না, এমনি হাত ধরে নিয়ে গিয়ে ভোলাও একটু।'

সেই ছিল মহাশ্বেতার সুযোগ। প্রাণভরে অন্তর-টিপুনী দিত এক-একদিন। তার ফলে ডাক ছেড়ে যখন কেঁদে উঠত সে, তখন আপনমনে দাঁতে দাঁত চেপে বলত, 'রাক্কোস ছেলে! মর্ মর্ তুই, মরিস্ ত আমার হাড় জুড়োয়!' আর প্রকাশ্যে চেঁচিয়ে শাশুড়ীকে ডাকত, 'ও মা, আসুন না একবার, কিছুতেই থামছে না যে।'

তিন

মহার শ্বশুরবাড়িতে বিগ্রহ আছেন রাধা-দামোদর—সে কথাটা বিয়ের সময় অত ভাল ক'রে বুঝতে পারে নি সে। একটা ঠাকুরঘরে নিয়ে গিয়ে প্রণাম করানো হয়েছিল এই মাত্র—ছোট্ট অন্ধকার ঘরে নিচু বেদীর ওপর ন্যাড়াবুঁচো দুটি মূর্তি, কেষ্টটি পাথরের, রাধিকা পেতলের (বা অষ্টধাতুর)—সামনে একটি সিংহাসনে একটা শালগ্রাম আর একটি ছোট্ট পাথরের শিব। স্যাঁতসেঁতে ভিজে ঘরে অসংখ্য আরশোলা বেড়াচ্ছে, কেমন একটা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ—মোট কথা মহাশ্বেতার আদৌ ভক্তি হয় নি সে ঠাকুর দেখে। দিদিমার সঙ্গে গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে আনন্দময়ী-তলায় ঠাকুর দেখেছে, বাগবাজারের মদনমোহন দেখেছে—দক্ষিণেশ্বরে একবার গিয়েছিল, সে সব কেমন ঠাকুর! কি জাঁকজমক, কত গয়নাগাঁটি, ফুলচন্দনের গন্ধ! এমন কি, ওদের সরকারবাড়ির ঠাকুরঘরও কেমন আলাদা মন্দিরের মত, কত উঁচু! আর এ কি বিশ্রী!

কিন্তু সে যাই হোক—এ ঠাকুর যে ওদেরই তা তখন বুঝতে পারে নি।

একেবারে বুঝতে পারলে মাস আষ্টেক পরে যখন শুনল যে আসছে মাস থেকে ঠাকুরের পালা পড়বে তাদের।

'তার মানে কি মা ?' প্রশ্ন করেছিল মহাশ্বেতা।

ক্ষীরোদা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, 'তোমার শ্বশুররা খুড়তুতো জেঠতুতো ধরে তিন ভাই—ঠাকুর হ'ল গে আমার দাদাশ্বশুরের—তা এ বংশের সকলকারই ত সেবা করার কথা। মরে হেজে গিয়ে এখন এই তিন ঘরে ঠেকেচে—তাই পালা ক'রে ক'রে এক এক বছর সেবা করা হয়। এ বছরটা ছিল আমার ভাশুরের, এবার আমার পড়বে। আবার আমরা এক বছর সেবা করলে আমার দেওর আছেন একজন, তাঁদের ওপর ভারটা পড়বে। বুঝলে মা ?'

'তা সবাই মিলে একসঙ্গে করেন না কেন ?'

'সে হয় না মা। তাহলে কেউ করত না—সবাই সরে থাকত, ফাঁকি দেবার চেষ্টা করত।'

এ আবার কি কথা—মহা ঠিক বোঝে না। ঠাকুরসেবা করা এ ত ভাগ্যের কথা, মাসিমার মুখে কতদিন শুনেছে—তাতে ফাঁকি দেয় নাকি কেউ !

তবু কথাটা শুনে ওর খুব আনন্দই হ'ল। ছেলেমানুষের মন—ঠাকুরসেবার মধ্যে পুতুলখেলার স্বাদটা পায়। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে, 'কবে আসবেন মা ঠাকুর ?'

'আসবেন না ত—ঐ ঘরেই থাকবেন। আমরা ঐখানে গিয়ে সেবা করব। ওদের দিকের দোরটা বন্ধ ক'রে রেখে আমাদের দিকের দোরটা খোলা হবে। এই শুধু। ছ্যাখো নি—ও ঘরে তিনটে দরজা ?'

সে কিন্তু দিন গোনে। ঠাকুরের পালা তার হাতে এলে সে ঐ ঘর ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করবে। আরশুলাগুলোকে মারবে ধরে ধরে—ত্'বেলা ধুনো দিয়ে ঐ ভ্যাপ্‌সা গন্ধ নষ্ট করবে। আরও কত কি— !

একদিন অভয়পদর অফিস যাবার সময় বুঝে খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে বাগানে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল একটা বুড়ো আমগাছের আড়ালে। অভয়পদ অত লক্ষ্য করে নি, হনহন ক'রে এগিয়ে যাচ্ছিল—মহাশ্বেতা ডাকলে, 'শোন।'

অভয় ত অবাক ! কাছে এসে একটু মুচকি হেসে বললে, 'কি খবর গো, বলো বলো—বেলা হয়ে গেছে, কিছু ফরমাশ আছে বুঝি ? কী চাই এবার ?'

মহাশ্বেতা প্রায় মরীয়া হয়ে বলে উঠল, 'আসছে মাস থেকে ত আমাদের ঠাকুরের পালা পড়বে—একটা উঁচু দেখে কাঠের সিংহাসন কিনে এনো—বুঝলে ? ঠাকুর অত নিচু হয়ে দেখতে হয়—আমার বড্ড খারাপ লাগে।'

হু', গম্ভীর হয়ে বলে অভয়পদ, 'ফরমাশ ত বেশ লম্বা-চওড়া দেখতে পাচ্ছি। মাসে একটা টাকাও বাড়তি থাকে না। আজ দু'মাস ওপরটাইম বন্ধ। কিনব কোথা থেকে ? জানো—এখনও বিয়ের দেনা শোধ হয় নি ?'

মুখ ম্লান হয়ে যায় মহাশ্বেতার। কেন যে মরতে এসব ফরমাশ করতে যায় সে বরকে! প্রতিবারেই এমনি কথা শুনতে হয়, এমনি অপমান! ছিঃ ছিঃ! আবারও সে প্রতিজ্ঞা করলে—আর কোনদিন কিছু বলবে না।

কিন্তু সেই রবিবারেই দেখা গেল অভয়পদ বাগানের এক কোণে জড়ো ক'রে রাখা কতকগুলো কাঠ্‌রা নিয়ে বসে গেছে সকাল থেকে। যন্ত্রপাতি সব ওর কাছেই থাকে বোধ হয়—অন্তত মহাশ্বেতার তাই মনে হ'ল, কৈ, কোথাও থেকে চেয়ে নিয়ে এল ব'লে ত মনে হ'ল না—সে যাই হোক সন্ধ্যানাগাদ দেখলে বেশ উঁচু গোছের একটা সিংহাসন তৈরি হয়ে গেল। বা রে! মনে মনে ভাবে মহাশ্বেতা, লোকটা ত কারিগর মন্দ না!

প্রথমটা ওর খুব আনন্দ হয়েছিল। ওর একটা সামান্য শখও সে মনে ক'রে রেখেছে আর সেটা মেটাবার জন্যে এত মেহনত করছে! কিন্তু তারপরই ভয়ে বুক দুরদুর করতে লাগল। যদি বলে দেয় লোকটা ? মাকে যদি বলে, 'তোমার বৌ ফরমাশ করেছিল তাই করলুম!' ওমা, সে কি ঘেন্নার কথা হবে! মা-ই বা কি মনে করবেন, ভাববেন হয়ত বৌ তাঁর ছেলের সঙ্গে অমনিই রোজ রোজ লুকিয়ে কথা কয়, আবার এরই মধ্যে ফরমাশ করতে শুরু করেছে। হে মা কালী, বলে না ফেলে কথাটা!

লোকটা কিন্তু খুবই ভাল। ক্ষীরোদা যখন প্রশ্ন করলেন, 'হ্যাঁ রে, কী করছিস্ রে সারাদিন ধরে ?' তখন বেশ সহজ ভাবেই বললে, 'পূর্ণিমে থেকে ত ঠাকুর আসছেন ঘরে—তাই ভাবছি একটা বেশ উঁচু দেখে ভাল সিংহাসন তৈরি করি। দেখি—কতদূর কি হয়।'

সন্ধ্যাবেলা কাজ শেষ হয়ে গেলে অভয়পদ মাকে ডেকেই দেখালে, 'দ্যাখো দিকি মা কেমন হয়েছে ?'

মা একটু খুঁতখুঁত ক'রে বললেন, 'হয়েছে ত ভালই। তবে ঠাকুরের সিংহাসন, পুরোনো কাঠে করলি, ওতে দোষ হবে না ত ?'

'হ্যাঁ—তুমিও যেমন! চেঁচে-ছুলে দিয়েছি, তাছাড়া জিনিসটা ত নতুন তৈরি হ'ল। কাঠে দোষ কি ?'

কিন্তু ঠাকুর যখন সত্যি-সত্যিই ওদের দিকের দরজা খুললেন তখন মহাশ্বেতা

বুঝলে যে ঠাকুরসেবাটা আর যাই হোক্, পুতুলখেলা নয়। হাজারো রকমের কাজ আর ঝঞ্ঝাট। পুজোর কোন আয়োজন নেই কিন্তু নিয়ম অজস্র। মাটির বাসি হাঁড়ির ভাত চলবে না। প্রতিদিন মাজা পেতলের হাঁড়িতে ভাত রান্না হয়—ভাতের উপকরণ যাই থাক, বামুনবাড়ির ঠাকুর, অন্নভোগ দিতেই হবে। তাছাড়া ভোগ দেওয়াই বা কি হবে? সকালে দুখানা বাতাসা ছাড়া কিছুই থাকে না—পাড়ার লোক কেউ শশাটা পেয়ারাটা দিয়ে গেলে কিংবা কোন মানসিকের পুজো দিতে এলে তবে ঠাকুর নৈবেদ্যের মুখ দেখতেন। পর্বদিনে পাড়া থেকে পুজো আসত বিস্তর—তেমনি তা বিলোতেও হ'ত—লাভের মধ্যে খাটুনির সীমা থাকত না। ভোগও ত ডাল ভাত আর চচ্চড়ি, কোনদিন একটু পায়েসও জুটত না। আধ-পো দুধ নেওয়া হ'ত রাত্রের শেতলের জন্যে—সেটুকু শাশুড়ী খেতেন। মহাশ্বেতা বলেছিল একদিন, 'ঠাকুরের ভোগে যে পায়েস দিতে হয় শুনেছি মা?' তাতে শাশুড়ী উত্তর দিয়েছিলেন, 'ওমা, সে আমাদের নয়, আমাদের যে আত্মবৎ সেবা। নিজেরা যা খাবো তা-ই ঠাকুরকে দেব।' মহাশ্বেতার একবার মনে হয়েছিল রাত্রের শেতলের কথা—ওরা ত আর রোজ দুধ খেত না, ভাতই খেত, তবে ঠাকুরকে তা দেওয়া হয় কেন? কিন্তু শেষ অবধি সাহসে কুলোয় না।

ঠাকুর আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা উপসর্গ জুটল—গোরু। অভয়-পদ কোথা থেকে একটা বড়-সড় বাছুর নিয়ে এল, এ নাকি বড় হয়ে বছর দেড়েকের মধ্যেই দুধ দেবে। দুধ দেবে কিনা মহাশ্বেতা জানে না, কিন্তু কাজ যা বাড়ল তাতে ওর চক্ষুস্থির! খড় কাটা, জাব দেওয়া, জল দেওয়া, গোয়াল কাড়া সবই করতে হয় তাকে। শাশুড়ী ঠাকুরঘর নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, তাঁর নিশ্বাস ফেলার সময় থাকে না—তা মহাশ্বেতা নিজের চোখেই দেখে, সুতরাং তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না—রাগ ধরে ওর ননদের ওপর। ওরই বয়সী ননদ—অন্তত শাশুড়ী তাই বলেন (মহার মনে হয় আরও বেশী বয়স)—তবু সে কুটি ভেঙে দু'খানি করে না। শাশুড়ীও কিছু বলেন না ওকে—সারাদিন পুতুল খেলে ঘুরে বেড়ায়। তার ওপর বৌদির নামে নাগিশ করতে পারলে আর কিছু চায় না। একটু কিছু হ'লেই সুর তোলে, 'ও-মা-আ-খো-না-বৌ-দি—' ইত্যাদি! হাড় জ্বলে যায় মহাশ্বেতার ওকে দেখলে। শাশুড়ীকে বললে বলেন, 'তা বৌমা, ওর অত্যেচার একটু সইতে হবে বৈ কি! ননদ ত—তাছাড়া ওর কিই বা জ্ঞান-বুদ্ধি হয়েছে বলো!...র'সো না, পরের বাড়ি গেলেই জব্দ হয়ে যাবে।'

অঘ্রাণ মাসে আর এক খাটুনি বাড়ল। কোথায় নাকি ওদের জমি আছে—

সরিকানা জমি, প্রতি বছর এই সময় তার দরুণ ভাগের ধান এসে পড়ে। কমই আসে অন্য বছর, একই সঙ্গে চাল করিয়ে তোলা হয়। মাস-তিনেকের মত চাল হয়। এবার অন্য সরিকের ধানও সস্তায় কিনেছে অভয়পদ, তাছাড়া ধান হয়েছেও বেশী। সুতরাং বস্তা করেই ধান ঘরে তোলা হ'ল। মাঝে মাঝে বার ক'রে সে ধান সেদ্ধ করতে হয়, নেড়ে-চেড়ে শুকোতে হয়, তারপর নিয়ে যেতে হয় ওদের জেঠশ্বশুরের ঢেঁকিশালে ভাঙাতে। তারপর আছে ঝেড়ে-বেছে তুঁষ-কুড়ো আলাদা করা। অসম্ভব খাটুনি।

এত খাটুনি অভ্যাস নেই, শরীরেও কুলোয় না। মাঝে মাঝে মহাশ্বেতার চোখে জল এসে যায়। ভাত খেয়ে উঠেই গোরুর কাজ সেরে ধান শুকিয়ে তুলে রেখে হয়ত আবার এসে শাশুড়ীর সঙ্গে ঘাটে বাসন মাজতে বসতে হয়। সে সময় আর চোখের জল বাধা মানে না, সকলের অজ্ঞাতে আপনিই টপ্‌ টপ্‌ ক'রে ঝরে পড়ে জলের ওপর। শাশুড়ীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে সে সে-সময়। কোন প্রতিকার ত হবেই না, মিছিমিছি নানা রকমের জবাবদিহি করা···হয়ত ছেলের কাছেই লাগাবেন। দুঃখ সে চেপেই থাকে প্রাণপণে।

এমন কি, মাকেও কখনও বলে না। তবে মধ্যে মধ্যে গিয়ে যখন পনরো কুড়িদিন বাপের বাড়ি থাকে তখন যেন মনে হয় জেলখানা থেকে ছাড়া পেয়েছে সে। মা সঙ্কোচ করে মেয়েকে আনতে—মেয়ে এলেই জামাইকেও আনতে হয়, সে খরচ আছে, তাছাড়া মেয়েকেও ভাল ক'রে খেতে দিতে পারে না। আর যাই হোক শ্বশুরবাড়ি পেট পুরে ত ভাত খেতে পায় দুবেলা। কিন্তু মহা অত বোঝে না, গলা জড়িয়ে ধরে মাকে বলে, 'আমাকে একটু তাড়াতাড়ি এনো মা, তোমার কাছে না খেয়ে থাকলেও শান্তি।'

আগে আগে শ্যামা ভাবত যে এটা নিছক তার ওপর প্রীতি। কিন্তু তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কথার ছলে বোকা মেয়ের কাছ থেকে সব কথাই বার ক'রে নেয় সে। কষ্ট হয় খুবই, তবু মনকে সান্ত্বনা দেয়, গরিবের ঘরে জন্মেছে যখন তখন ত খাটতেই হবে। জামাই ভাল হয়েছে, এইটুকুই লাভ।···

এক বছর পরে মহাশ্বেতার ভাগ্য একটু ফিরল। শোবার ব্যবস্থা পালটালো। কোথা থেকে কি বাড়তি টাকা পেয়ে ছোট ঘরটা সারিয়ে-সুরিয়ে নিলে অভয়পদ— তার পর থেকে স্বামীর ঘরেই মহাশ্বেতার শোয়ার হুকুম হ'ল।

সে যেন বাঁচল। দুটো কথা কওয়া যায় প্রাণভরে, তা অভয়পদ উত্তর দিক বা না দিক (অধিকাংশ কথারই উত্তর দেয় না)—মধ্যরাত্রে শেয়ালের ডাকে ঘুম ভেঙে হঠাৎ ভয় পেয়ে গেলে তাকে জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে মুখ লুকোনো যায়—

এটাই কি কম লাভ? মানুষটা সত্যিই ভাল—যত দিন যাচ্ছে, ততই বুঝছে মহাশ্বেতা—দূরে কোথাও শবযাত্রার 'বল হরি, হরিবোল' আওয়াজ পেলে নিজেই বুকের মধ্যে নেয় বৌকে, পিঠে হাত বুলিয়ে প্রশ্ন করে, 'ভয় পাও নি ত?'

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

এক

মেয়ের বিয়ের পর একটা বছর কাটল শ্যামার, যেন এক যুগ। বারো বছরেও মানুষকে বোধ হয় এত দুঃখ, এত কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয় না—এত দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তা ভোগ করতে হয় না। এক-একটা দিন এমন আসে, মনে হয় বুঝি কাটবে না। সামান্য কিছু উপার্জনের পথ হয়েছে এটাও ঠিক, তেমনি হেম ইস্কুলে পড়ছে—'ফ্রি' হ'লেও কিছু খরচ ত আছেই। যখন-তখন যজমানি করতে যেতে পারে না। তার ওপর আছে মেয়ে-জামাই আনা, জামাইবাড়ি তত্ত্ব করা।

সে যেন এক সাধনা।

একদিন—তখন সবে মাস-কতক বিয়ে হয়েছে—লোকমুখে হেমের খুব জ্বর হয়েছে খবর পেয়ে এক শনিবার জামাই এসে হাজির। ঘরে কিছুই নেই—হেমের জ্বর। সরকারদের বাড়ির প্রায় সকলেই মঙ্গলার বাপের বাড়ি কি একটা ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষে গেছেন। টাকাপয়সা হাতে নেই—কখনোই থাকে না—থাকলেই বা আনাত কাকে দিয়ে? এরকম লজ্জায় বোধ হয় জীবনে কোন দিন পড়ে নি শ্যামা। ঐন্দ্রিলা বাগান থেকে কোনমতে বুকে ক'রে নারকেলটা আসটা কুড়িয়ে আনতে পারে বটে কিন্তু তাকে বাজারে পাঠানো চলবে না। বাক্স-প্যাটরা ঘেঁটে দশটা পয়সা বেরোল কিন্তু যায় কে? যেতে গেলে ওকেই যেতে হয়। জামাইয়ের সামনে দিয়ে বাজারে যাওয়া? ছি! জামাই যদি দেখতে পায়?

আকাশ-পাতাল ভাবল শ্যামা। শরীরটাও ভাল নেই। সদ্য একটি মেয়ে হয়েছে ওর—এখনও তিন মাস হয় নি। প্রসবের পর থেকে নানা রোগে ওকে যেন জেরবার ক'রে দিয়েছে—ভূতের মত খাটবার শক্তি ত গেছেই, মাথাতেও যেন সব সময় সব কথা আসে না।

দশটা পয়সা হাতে ক'রে অভিভূতের মত রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে থাকে শ্যামা। শোবার ঘরে হেমকে অসুখের খবর জিজ্ঞাসা করছে জামাই, ঐন্দ্রিলা কি সব বকে যাচ্ছে আপন মনে—কোথায় কোন্ আম গাছের ডালে বসে বসন্ত-বৌরি পাখিটা কটর কটর করছে—এই সব শব্দের দিকে যেন কান পেতে থাকে সে।

অনেকক্ষণ পরে—একটা দমকা গরম বাতাসে ওর যেন চমক ভাঙে। ধড়মড় ক'রে উঠে দাঁড়ায়। পথও দেখতে পায় চোখের নিমেষে। ঠিক ত, ডাল ত আছে! আর আছে সদ্য সিধে-পাওয়া একটু গাওয়া ঘি ও ময়দা। হেমেরই উপার্জন—কি একটা ব্রত করিয়ে পেয়েছে সে।

ডাল ভিজিয়ে দেয় দু-তিন রকম। কাঠ জ্বেলে ছোলার ডাল চাপায়। একটা বার্লির কৌটোর এক কোণে দুটি সুজি পড়ে আছে—একটু হালুয়া ক'রে দেওয়া চলবে জামাইকে—এখন জলখাবারের মত। হঠাৎ যেন উৎসাহের জোয়ার লাগে ওর দেহমনে। বিত্তের দৈন্য বুদ্ধি দিয়ে ঢেকে নেবে—এই ওর সংকল্প। তিন ঘণ্টা পরে যখন জামাইকে খাবার সাজিয়ে দেয় তখন নিজেই অবাক হয়ে যায়। ধোঁকার ডালনা, ছোলার ডাল, পরোটা, রসবড়া, পায়েস! পায়েসটা নিয়েই বিপদে পড়েছিল, প্রথম কারণ চিনি বাতাসা মিশ্রী—যা কিছু ঘরে ছিল কুড়িয়ে কুড়িয়ে এর আগে হালুয়া আর রসে খরচ হয়ে গেছে। অথচ মিষ্টি আনানো যায় নি, সে অভাবটা শুধু রসবড়া দিয়ে সারতেও যেন কেমন লাগে, তাও তেলে-ভাজা রসবড়া—মায়ের মত ঘিয়ে-ভাজা রসবড়া করবে, সে ঘি কোথায়? এই ত তাই—লুচি ক'রে দেওয়া যায় নি—পরোটা ক'রেই দিতে হয়েছে! অথচ শেতলের দুধটাও ত আছে। অনেক ভেবে শেষে আঁধারে কূল পায়। কিছুদিন আগেই কুণ্ডুবাড়ির ছাঁদা পাওয়া গিয়েছিল, তার দরুন সন্দেশ ক'টা আজও পড়ে আছে হাঁড়িতে। একে চিনির ডেলা সন্দেশ, তায় এতদিনের বাসি—সামান্য গন্ধও হয়ে গেছে—সে সন্দেশ জামাইকে দেওয়া যায় না ব'লে ও-কথা আর মনেই রাখে নি। এখন মনে হ'ল চিনির ডেলা ত চিনির কাজে লাগানো যেতে পারে! মিছিমিছি নষ্ট ক'রে লাভ কি? গন্ধ? বর্ষাকালে ঘরে থাকলে চিনিতেও ত একটু ম'দো গন্ধ হয়! তাছাড়া খুঁজেপেতে যদি একটা ছোট এলাচ বেরোয় বাড়ি থেকে তাহলে গুঁড়িয়ে দিলেই ত গন্ধটুকু ঢেকে যাবে।

বেশ তৃপ্তি ক'রেই খেলে অভয়। কোনদিনই কিছু বলে না কিন্তু আজ ব'লেই ফেললে উচ্ছ্বাসভরে, 'অনেকদিন এত ভাল খাই নি। রান্না সব হয়েছে যেন অমৃত।' অভয় এখনও ঠিক 'মা' বলে নিঃসঙ্কোচে সম্বোধন করতে পারে না। প্রায় সমবয়সী শাশুড়াকে মা বলে ডাকতে বোধ করি ওর একটু লজ্জাই হয়।

সেদিনের কৃতিত্ব নিয়ে বেশ একটু গৌরববোধই হয়েছিল শ্যামার। অনেকদিন পর্যন্ত সে-কথা মনে হ'লে আনন্দে গর্বে বুকটা ফুলে উঠত। মঙ্গলাও বাপের বাড়ি থেকে ফিরে এসে যখন সব শুনলেন, কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়ে বসেছিলেন,

কথা কইতে পারেন নি। অনেকক্ষণ প'র বলেছিলেন, 'তোর ত খুব মাথাখানা খেলে বামূনি, আমি ত' বাপু সাত রাত ভাবলেও এত কথা মাথা থেকে বার করতে পারতুম না। তা এ ত বেশ ভাল খাওয়াই হ'ল—আর কি!'

কিন্তু শুধু কি গর্ব—একটু লজ্জার কথাও ছিল বৈকি। যত তৃপ্তি ক'রেই থাক—বুদ্ধিমান জামাইয়ের চোখে আসল ব্যাপারটা ঢাকা থাকে নি। ঐন্দ্রিলার হাতে একটা টাকা ত দিয়ে গিয়েই ছিল, পরের দিন বিকেলে পাড়ারই কে একটি ছেলেকে দিয়ে একরাশ বাজার পাঠিয়ে দিয়েছিল—ডুমুর, থোড়, কাঁচকলা—বিনা মূল্যের আনাজ, আর তার সঙ্গে কিছু সাগু, মিশ্রী হেমের জন্যে।

লজ্জা বোধ হয়েছিল খুবই, মাথা কাটা গিয়েছিল জামাইয়ের কাছ থেকে এই সাহায্যটুকু—সাহায্য ছাড়া আর কি!—নিতে, কিন্তু আনন্দেও চোখে জল এসে গিয়েছিল। এত বিবেচনা যার তার হাতে পড়ে মেয়ে সুখী হবে, তার মত দুঃখ কিছুতেই পাবে না।

অভয় এলে তার ছেলেমেয়েদের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এটাও শ্যামা লক্ষ্য করেছিল। শুধু যে এলেই ওদের হাতে টাকা বা আধুলি দিয়ে যায় তাই নয়—ভাল খাবার যা কিছু ওর জন্য তৈরি হয় তারও ভাগ পায় তারা। শুধু তারা কেন—হেম অসুস্থ—সেদিন জামাইয়ের পাতে যা ছিল তা ঐন্দ্রিলার পক্ষে সব খাওয়া সম্ভব নয় এই অজুহাতে কি সেও খায় নি সে সব খাবার? অনেক ইতস্তত করেছিল অবশ্য জামাইয়ের পাতের উচ্ছিষ্ট খাবার আগে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত লোভের আর প্রয়োজনের জয় হয়েছিল। ঘরে কিছুই নেই, শরীর দুর্বল, সদ্য-প্রসূতির অসহ্য ক্ষুধা—লোভ সামলানো শক্ত। খেয়েছিল এবং খেয়ে খুশীই হয়েছিল। সে কথা মনে পড়লে এতকাল পরেও লজ্জা হয়—কিন্তু সেদিন উপায় ছিল না।

দুই

শ্যামা অনেকদিন ধরেই ভাবছে যে কলকাতায় যাবে কিন্তু আগেকার মত যাওয়াটা আর তার সহজ নেই বলেই হয়ে ওঠে নি। অথচ যাওয়াটা তার প্রয়োজন—এবারের প্রসবের পর থেকে শরীরটা যেন কিছুতেই সারছে না। কিছুদিন শুধু বসে খেতে পারলেও বোধ হয় একটু বল পেত সে। কিন্তু এদিকে হেমের ইস্কুল। তার বাঁধা বন্দোবস্তের নিয়ম-পূজা রয়েছে দু-দুটো। অথচ হেমকে ফেলেই বা যায় কি ক'রে? কে তাকে খেতে দেবে—কে দেখবে? এই সাতপাঁচ ভেবেই তার যাওয়া হয় না—ক্লান্ত দেহটাকে যেন চাবুক মেরে চালায়।

এরই মধ্যে চিঠিটা এল। লিখেছে উমা—মার শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছে, ডাক্তার বলেছে চেঞ্জে নিয়ে যাওয়া দরকার। মাকে রাজী করানো গেছে, এখন যাবার আগে মা তাঁর তিন মেয়েকেই একবার একসঙ্গে দেখতে চান—আর ফেরেন কি না ফেরেন তার ঠিক কি! শ্যামা কি দু-চার দিনের জন্য আসতে পারবে?

শ্যামা ব্যাকুল হয়ে উঠল চিঠি পড়ে, হওয়াই স্বাভাবিক। মা শুধু মা-ই ত নন—এখনও তার ভরসা, আশ্রয়। চরম কোন অবস্থায় পড়লে মার কাছে গিয়ে দাঁড়ানো যাবে, তা সে জানে। মার কি আছে—কতটুকু আছে, সে খবর সে রাখে না। তবে মা চালাবেনই যেমন ক'রে হোক। এই বিশ্বাসটা মনের গোচরে, কিছু বা অগোচরে—আছে বলেই এমন ক'রে জীবনযুদ্ধ চালাতে পেরেছে শ্যামা। পেছনে কোথাও আছে ভরসা, আছে শেষ নিরাপদ অবলম্বন, এই জ্ঞান বা অনুভূতিই দিয়েছে তাকে শক্তি। সেই অবলম্বন কি শেষে ভেঙে পড়বে? এত তাড়াতাড়ি, এমন অসময়ে? এখনও যে হেম মানুষ হয়ে উঠল না! এখনও যে --

স্বার্থপরের মত শোনালেও এইটেই বোধহয় স্বাভাবিক। কোন দুঃসংবাদ শুনলে মানুষের প্রথম প্রতিক্রিয়া হয় তার স্বার্থের স্থানটিতেই। শ্যামাকে তাই দোষ দেওয়া যায় না।

যাওয়া প্রয়োজন—আর এখনই।

শুধু যে মাকে শেষ দেখা তাই নয়, কোথায় আর তাঁর কি আছে—কতটুকু তার হেমের পাওনা—সেটাও জানা দরকার।

কিন্তু যাওয়া কি সম্ভব!

চিঠি হাতে নিয়ে উদ্বিগ্ন মুখে বসে আছে শ্যামা, অশ্রুসজল দৃষ্টি,—এমন সময় একমুঠো পানের খিলি মুখে পুরে চিবোবার চেষ্টা করতে করতে দেখা দিলেন মঙ্গলা।

'কী হয়েছে রে বামুন মেয়ে? অমন কাঁদো কাঁদো হয়ে বসে আছিস কেন? ওমা—হাতে চিঠি যে—কোন খারাপ খবর নাকি? মা মাগী ভাল আছে ত?' রুদ্ধ কণ্ঠ ভেদ ক'রে কথাগুলো বেরিয়ে আসে।

কেঁদেই ফেললে শ্যামা উত্তর দিতে গিয়ে।

সব শুনে মঙ্গলা বললেন, 'এখনই চলে যা। এখনই। হেম থাক না, আমরা দেখব এখন। আমি না হয় এসে রাত্রে থাকব'খন। ভয় কি?'

'কিন্তু ওর খাওয়া-দাওয়া?'

'তাই ত!' একটুখানি চুপ ক'রে গেলেন মঙ্গলাও—তারপরই আবার তাঁর

মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'তা সে-ও একরকম ক'রে হয়ে যাবে এখন। আমি কি পিঁটুকী যদি ভাতটা চাপিয়ে দিই, তাহলে কোন রকম ক'রে ও নামিয়ে নিতে পারবে না?'

হেম কাছেই বসেছিল, সে বললে, 'তা বোধ হয় পারব—দেখিয়ে দিলেই পারব।'

উৎসাহিত হয়ে ওঠেন মঙ্গলা, 'তোদের ত আতপ চালের ভাত—ফ্যানেভাতে খাওয়াও অভ্যাস আছে। এমন ভাবে জল দেব যে ফ্যানও গালতে হবে না। আর আমার ওদিকে আ-সকড়িতে যা ডাল তরকারি হয় দিয়ে যাবো'খন। রাত্রে দুখানা রুটি গড়েও দিতে পারবো। তুই নিভ্‌ভরসায় চলে যা বাম্‌নি, আমি তোর ছেলেকে দেখব।…আর উনি ত রাঁধুনী রাখবেন বলে আবার চেষ্টা করছেন। আমারও শরীর খারাপ, পিঁটুকীও গুছিয়ে রাঁধতে পারে না। রাঁধুনী পেলে আর ভাবনা কি, আমাদের ওখানেই খাবে। পাওয়া যায় ঢের, তবে কি জানিস, সোমত্থ মেয়েছেলে আমি রাখব না। সে আমার এক কথা—খেতে পাই আর না পাই! ওদের দোষ ওই, এসেই কত্তাটিকে গিলে খাবার চেষ্টা করে। ছুঁৎকো ব্যাটাছেলেও চলবে না। সোমত্থ সোমত্থ মেয়ে আমার ঘরে। তাই ত মুশকিল! যেটা ছিল তাকে ত আমিই তাড়ালুম বলতে গেলে। আমার যে হয়েছে শতেক জ্বালা—চোরছ্যাঁচোড় না হয় তাও দেখতে হবে ত!'

তারপর একটু থেমে পানের পিচ ফেলে আবার বললেন, 'তুই কাল সকালেই চলে যা।'

রাসমণির শরীর কিছুদিন ধরেই ভাঙছিল। কমলা ও উমার চিঠিতেও ওঁর অসুখের খবর পেয়েছে সে—কিন্তু সত্যিই যে এত খারাপ হয়েছে তা শ্যামা কল্পনা করে নি। অমন রাজেন্দ্রাণী মূর্তি যেন শুকিয়ে ঝলসে কুঁকড়ে গেছে। উজ্জ্বল গৌর বর্ণে কালি মেড়ে দিয়েছে কে। দাঁতগুলো পড়ে গেছে সব কটাই। নিত্য জ্বর হচ্ছে—খুব সম্ভব ম্যালেরিয়া, কিন্তু ডাক্তার ডাকতে দেন নি এতকাল। পাড়ার এক বৃদ্ধ কবিরাজ চিকিৎসা করছেন—কিছুতেই যখন কিছু হয় নি তখন কমলা একদিন জোর ক'রে ডাক্তার নিয়ে এসেছে। তিনি দেখে ওষুধ দিতে জ্বর ওঠাটা বন্ধ হয়েছে কিন্তু একেবারে ছাড়ে নি। বিকেলের দিকে গা-গরম হয় প্রত্যহ। ডাক্তারবাবু বলেছেন হাওয়া বদল করতে হবে—নইলে এ পুরোনো জ্বর ছাড়বে না কিছুতেই। আর হাওয়া বদল করতে গেলে পশ্চিমে যাওয়াই দরকার। দেওঘর গেলেই ভাল হয়—তবে অতদূর যদি না যেতে চান রাসমণি

ত বর্ধমান কিংবা নলহাটি যেতে পারেন—জল-হাওয়া ভাল, উপকার হবে। নলহাটি ত আবার তীর্থস্থান, ললাটেশ্বরী আছেন, বাহান্নপীঠের এক পীঠ।

রাসমণি অনেক ভেবেছেন। উমাকে একা ফেলে যাওয়া চলবে না—নিয়ে যেতে হবে। এ বাড়িতে কে থাকবে? কমলা হয়ত রাজী হ'তে পারে। কিন্তু তিনিই বা একা যান কার ভরসায়? এই দুর্বল দেহ, তাছাড়া কখনও একা কোথাও যান নি, কলকাতার বাইরে কোথাও যাওয়া অভ্যাস নেই। কে সঙ্গে যাবে?

কিন্তু সে ব্যবস্থাও কমলা ক'রে দিলে। ওদের বৃদ্ধ পুরোহিত—রাঘব ঘোষাল বহু তীর্থ ঘুরে এসেছেন, বিদেশ যাওয়া তাঁর অভ্যাস আছে, তিনি সঙ্গে যেতে রাজী হলেন। খরচ আর খোরাকি দিলেই তিনি যাবেন, তাঁর কোন অসুবিধা নেই। তাঁর ছেলে বড় হয়েছে, যজমানী সে-ই বজায় রাখতে পারবে। মাঝখান থেকে তাঁর শরীরটাও সারিয়ে নিতে পারবেন।

এবার আর রাসমণি 'না' করতে পারলেন না। তাছাড়া তিনি চিরদিনই একরোখা মানুষ, তেজের সঙ্গে থাকতে ভালবাসেন। এমন অকর্মণ্য জবুথবু হয়ে, মেয়েদের সেবার ওপর ভরসা ক'রে থাকা তাঁর পক্ষে মৃত্যুর সমান। এতকালের গঙ্গাস্নান তাঁর—কোনদিন কোন কারণে যা বন্ধ করেন নি তা বন্ধ হয়েছে, সেটা যেন আরও কষ্টকর। মনে আছে প্লেগের বছরে যখন সারা কলকাতা শ্মশান হয়ে গিয়েছিল, তখনও তিনি প্রত্যহ ভোরে উঠে স্নান করতে গেছেন। রাস্তার দুধারে বড় বড় খালি বাড়িগুলো হাঁ-হাঁ করছে, নিস্তব্ধ পথ যেন গিলতে আসছে, তবু রাসমণি ভয় পান নি। তিনি পালানও নি। মৃত্যুকে—ত্বরিত মৃত্যুকে তাঁর ভয় নেই। শহর উজাড় ক'রে পালিয়েছে সব, স্ক্যাভেঞ্জার গাড়িগুলো ধুয়ে তাতে বসে পালিয়েছে সপরিবারে—গাড়ির অভাবে। ঐ গাড়িগুলোই নিয়েছে পনরো-বিশ টাকা—এখান থেকে চন্দননগর কি চুঁচড়ো যেতে। দেখেছেন আর হেসেছেন। প্রাণ কি এমন ক'রেই এরা ধরে রাখতে পারবে চিরকাল! এমন কি পুলিস থেকে যখন ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে নিমতলায় গঙ্গাস্নান যাওয়া বন্ধ করলে—তখনও রাসমণি বিচলিত হন নি - শুধু সময়টা একটু এগিয়ে দিয়েছিলেন মাত্র। রাত চারটেয় যেতেন - তিনটেয় যাওয়া শুরু করলেন। অত ভোরে পুলিস থাকবে না তা তিনি জানতেন।

না—ভয় পাবার মেয়ে রাসমণি নন। তখন মৃতদেহের সংখ্যা বেশি বলে হুকুম হয়েছিল দু-ঘণ্টার বেশি কেউ চিতা জ্বালাতে পারবে না। ঐ দু-ঘণ্টায় যা পুড়ল পুড়ল—বাকী যা থাকবে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিতে হবে। সেই জন্যই গঙ্গাস্নান

আরও নিষিদ্ধ হয়েছিল। এই রকমই একটা কন্ধ-কাটা শব ভেসে এসে স্নানের ঘাটে সিঁড়ির নিচে আটকে ছিল—রাসমণি ঘাটে নামতে গিয়ে পা দিয়ে ফেলেছিলেন তার গায়ে কিন্তু চেঁচিয়ে ওঠেন নি, সেখান থেকে ছুটে পালান নি—কোন রকমেই বিচলিত হন নি। বরং হেঁট হয়ে আব্ছা আলোয় ব্যাপারটা ভাল ক'রে দেখে বুঝে 'নমঃ শিবায়' বলে এক গণ্ডূষ জল ছিটিয়ে দিয়েছিলেন তার গায়ে, তারপর তাকে প্রদক্ষিণ ক'রে গঙ্গায় নেমে গিয়েছিলেন। সঙ্গে যে শুকনো তসরের কাপড়খানা ছিল সেটাও অপবিত্র হ'ল মনে করেন নি।

বাড়িতে এসে কথাটা বলতে উমা চেঁচামেচি ক'রে উঠেছিল ভয়ে। রাসমণি হেসে তাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, 'ওমা, ভয় কি? অগ্নিদগ্ধ হয়ে গঙ্গায় পড়েছে, ও কি ভূত হয়ে আমাকে তাড়া করবে? ও শবও যা শিবও তাই।'

'কিন্তু অসুখটার ভয়ও ত আছে! ঐ ছোঁয়াচে রোগ যদি লাগে? দুদিন গঙ্গা নাওয়া বন্ধ করলে কি হয়?'

'হ্যাঁ—কি না কি, আমি গঙ্গা নাওয়া বন্ধ করব। আমার ও রোগ লাগবেই বা কেন? ও সব যারা মরছে তারা কি জানিস মা, বছুরকে মড়া, ওরা বছর বছরই মরে। একটা ক'রে হুজুগ ওঠে আর গণ্ডায় গণ্ডায় মরে। আমি মরব কেন?'

সেই গঙ্গা নাওয়া আজ তাঁকে বন্ধ করতে হয়েছে! এইটেই চরম ব্যথা।

জীবনের যত বেদনা, যত ব্যথা—পুঞ্জীভূত যত গ্লানি, সব ভুলিয়েছে মা জাহ্নবীর ঐ সর্বদুঃখহরা শীতল জল। চোখের গরম জল দিনের পর দিন মার ঠাণ্ডা জলে ঝ'রে পড়ে বুকের তাপ ঠাণ্ডা করেছে। ওঁর উষ্ণ দীর্ঘনিঃশ্বাস মিশেছে মার বুক থেকে ভেসে-আসা তাপনাশা বাতাসে—করেছে তাঁকে শান্ত, সমাহিত। সহ্য করার শক্তি খুঁজে পেয়েছেন, পেয়েছেন আবারও যুদ্ধ করার শক্তি—দুঃখের সঙ্গে, দুর্ভাগ্যের সঙ্গে।

গঙ্গা ত শুধু তাঁর নেশা নয়—তাঁর আশ্রয় যে! সব—সব দুঃখ তিনি ঐখানে নিবেদন করেছেন দিনের পর দিন—নইলে বোধ হয় তিনি পাগল হয়ে যেতেন। নিজের জীবন দিয়ে অনুভব করেছেন—কি শান্তি, কি অভয় লুকিয়ে আছে মার ঐ উর্মিমুখর স্রোতে! কি দয়া মা গঙ্গার—তা রাসমণি ছাড়া বুঝি আর কেউ জানে না।

সেই গঙ্গাস্নান তাঁর বন্ধ হ'ল বেঁচে থাকতেই—! কতকটা সেই জন্যই বোধ হয় রাজী হয়েছিলেন রাসমণি বিদেশে যেতে।

কিন্তু যদি যেতেই হয় ত বর্ধমান নলহাটি কেন—দেওঘরই বা কেন—যাবেন কাশীতেই। একটু সুস্থ হয়ে যদি বাবার মাথায় এক ঘটি জল ঢালতে পারেন কোন

দিন ত সেটাও হবে একটা লাভ। এ জীবনে কোন তীর্থেই প্রায় কখনও যাওয়া হয় নি। মরবার আগে কাশীতে একবার গেলেও সান্ত্বনা পেতে পারেন।

কাশীতে যাবেন তিনি। রাঘব ঘোষালকে বলে দিয়েছেন, পাণ্ডাকে চিঠি লিখে ঘর ঠিক করতে।

তিন

শ্যামা এসে দাঁড়াতে যেমন শ্যামার দু'চোখ দিয়েও জল ঝরে পড়ল, তেমনি রাসমণির চোখও শুষ্ক রইল না। এ কি চেহারা হয়েছে তাঁর শতদলের মত রূপসী মেয়ের? এ যে কঙ্কাল! এর আগেও অনাহার-শীর্ণ দেহে অনেকবার এসে দাঁড়িয়েছে সে—কিন্তু এত দুর্বল তাকে কখনও দেখেন নি।

নিজের রোগশীর্ণ কম্পিত হাতখানি ওর গায়ে-মাথায় বুলোতে বুলোতে বললেন, 'তুই যাবি মা আমার সঙ্গে? চল্! তোর শরীরও সারবে।'

'আমি? কাশী যাবো?'

'হ্যাঁ—চল্ না। তাহলে উমাকে আর নিয়ে যাই না। ওরা দুজনে এখানে থাক। উমারও মেয়ে পড়ানোর ক্ষতি হয় না—'

'কী পড়ানো!'

উমা পাশে এসে বসেছিল, মাথা হেঁট ক'রেই বসেছিল, এবার চোখ তুলে শ্যামার চোখের দিকে চেয়ে বলল, 'তুমি জানো না—তোমাকে বলাও ত হয় নি! আমি এই পাড়াতেই মেয়ে পড়াচ্ছি। এখন অনেকেই মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে চায়, কিন্তু লোক পায় না। ছোট-বড় অনেকগুলি মেয়েকে আমি পড়াচ্ছি। কোন কোন বাড়িতে বৌ এমন কি গিন্নীরা সুদ্ধ পড়ছে।'

'তুই—তুই বাড়ি বাড়ি গিয়ে পড়িয়ে আসছিস?'

'কী করব, বলো? তারাই বা আমার বাড়ি আসবে কেন? কেউ কেউ হয়ত আসতে পারে, কিন্তু সবাই আসতে চাইবে না!'

শ্যামার তবু যে বিশ্বাস হয় না, 'আমাদের বাড়ির মেয়ে, বাড়ি বাড়ি ছেলে-মেয়ে পড়িয়ে বেড়াচ্ছিস্!'

উমার মুখ আগুন-বর্ণ হয়ে উঠল! সে একটু কঠিন কণ্ঠেই বললে, 'তোমার এখানে বুঝি আয়না নেই ছোড়দি? এই বাড়ির মেয়ে নারকোল আর ঝাঁটার কাঠি নিয়ে বাজারে গিয়ে বেচে আসছে— সেটা দ্যাখো নি?'

তা বটে। শ্যামা এবার মাথা হেঁট করে।

রাসমণির দেহেরই শুধু পরিবর্তন হয় নি—মনেরও হয়েছে। নইলে তিনি

কৈফিয়ত দেবার মানুষ নন। আজ যেন কতকটা সেই সুরেই কথা বললেন, 'কি করব বল্—ও যখন বললে, আর না বলতে পারলুম না! সত্যিই ত, কি খাবে? আর ত কিছুই নেই। আমিই যদি দুটো দিন বেশি বাঁচি, আমাকে কে খেতে দেবে সেই ত এক ভাবনা। কমলির ত ঐ যোল টাকা ভরসা! বড় জামাই থাকলে তিনিই দেখতেন। তবু ত ওর পেটটা চলবে!'

শ্যামার বিষয়বুদ্ধি এবার উগ্র হয়ে ওঠে, 'কত ক'রে পায়?'

'মেয়ে পিছু দু টাকা—কোথাও কোথাও এক টাকাও আছে। তিনটে মেয়ে এক জায়গায় পড়ে, তারা দেয় চার টাকা। মোটমাট মন্দ হয় না, কোন কোন মাসে যোল-সতেরো টাকাও পায়।'

'কখন যাস্ রে?' শ্যামা এবার সোজাসুজি উমাকেই প্রশ্ন করে।

'এই খেয়েই বেরুই। এগারোটা নাগাদ। সন্ধ্যের সময় ফিরে আসি। সবই এই পাড়াতে।'

রাসমণি নিজের প্রশ্নের জের টানেন, 'কি বল্লিস্, যাবি?'

'আমার এই ছানাপোনা নিয়ে?'

উমা বললে, 'ঐন্দ্রিলা না হয় থাকবে আমাদের কাছে। খুকীটাকে নিয়ে যাও।'

'কিন্তু হেম? হেমকে একা ফেলে এসেছি যে! কি করছে ছেলেমানুষ—নিজেকে ভাত রেঁধে খেতে হচ্ছে, হাত-টাত যদি পুড়িয়ে ফেলে?'

এবার সকলেই চুপ করে যান।

শ্যামার মন কিন্তু দুলতেই থাকে লোভে। কাশী সমস্ত বাঙালীর মেয়েরই স্বপ্ন—সুদূর স্বপ্ন। আজকের মত তখন অত বেড়াতে যাওয়ার চল হয় নি। কাশীতে আর শ্রীক্ষেত্রে জীবনে একবারই যেতে পারত মানুষ, তাও অনেক চেষ্টাচরিত্র করলে।

সারাদিন ভেবে ভেবে শ্যামা একখানা চিঠি লিখলে হেমকে, জোড়া পোস্টকার্ড দিয়ে।

দুদিন পরে উত্তর এল—অভাবনীয় সুসংবাদ। মঙ্গলা এক বুড়ী রাঁধুনী পেয়েছেন। হেম ওঁদের ওখানেই খেতে পারবে—মঙ্গলা অনুমতি দিয়েছেন—যতদিন খুশি মার সেবা ক'রে যেন আসে বামুন-মেয়ে। পিঁটকীর যে ছেলেটা হেমের সমবয়সী সে-ই হেমের সঙ্গে শুচ্ছে, ওঁরা অনবরত খবর নিচ্ছেন। কোন ভয় নেই।

শ্যামা বাঁচল। স্থির হল কমলা এখানে এসে উমার কাছে থাকবে, ঐন্দ্রিলাকে ওরাই দেখাশুনা করবে। শ্যামা যাবে ওঁদের সঙ্গে।...

পাঁজিপুঁথি দেখে মোটঘাট বেঁধে একদিন রওনা হ'লেন। সঙ্গে গেলেন রাঘব ঘোষাল এবং তাঁর ছোট ছেলে সত্যহরি—বছর ষোল বয়স, রাঘবও বুড়ো হয়েছেন, রাসমণির এই অবস্থায় একা তিনি সামলে নিয়ে যেতে পারবেন কিনা সন্দেহ হ'ল শেষ পর্যন্ত, তাই এই ব্যবস্থা। সত্যহরি আর কিছু না করুক—ছুটোছুটি ত করতে পারবে। অনেক ভেবে তার খরচও বহন করাই শ্রেয় বোধ হ'ল। যাওয়া-আসা গাড়িভাড়া গোটা আষ্টেক টাকা—আর এক মাস খেতে কাশীতে আর কতই বা লাগবে—বড় জোর চার টাকা।

শ্যামার মনে হ'ল এই পয়সায় হেমকে আনা চলত। আহা, যদি নিত্য-সেবার কাজগুলো না থাকত!

রাসমণি এর মধ্যে তিন-চারবার বলেছেন যে তাঁর আর কিছুই নেই। এক-জোড়া যশম বিক্রি ক'রে এই একশ টাকার ব্যবস্থা করেছেন। আর যা রইল যদি বছর তিনেকের বেশি বাঁচেন ত কুলোবে না, উমার উপার্জনের ওপর নির্ভর করতে হবে। একটা বাড়িতে আলাদা থাকার যে বিলাস, তাও আর চলবে না।

কিন্তু শ্যামার কথাটা বিশ্বাস হয় নি। সে আরও সেইজন্যেই সঙ্গে যাচ্ছে। ঠিক আর কতটা আছে—কী কী আছে সেটা ভাল ক'রে জানতে চায় সে। ঐন্দ্রিলার বিয়েটাও যদি ওঁর ওপর দিয়ে সেরে ফেলা যেত। ঐন্দ্রিলাটা যে বড়ই ছোট।

কমলা আর গোবিন্দ গিয়েছিল তুলে দিতে। সঙ্গে পাড়ারই একটি ছেলে নিয়ে গিয়েছিল। ফিরে এসে পালকি থেকে নামতেই প্রথম যার সঙ্গে চোখো-চোখি হ'ল সে নরেন। একমুখ খোঁচা-খোঁচা গোঁফদাড়ি, হাঁটু পর্যন্ত ধুলো, খালি পা, ছেঁড়া মেরজাই গায়ে—বাইরের রকে উবু হয়ে বসে আছে। পাশে একটা গামছায় কী পুঁটুলি বাঁধা।

কমলাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বিনা ভুমিকাতেই বললে, 'ছাখো দিকি দিদি, উমির কি আস্পদ্দা! আমাকে দেখে দোর খুললে না, বলে কি না দিদি আসুক। কেন আমি কি বাঘ না ভালুক?'

'তার চেয়ে বেশি যে ভাই, চোর-ছ্যাঁচোড় বাঘ-ভালুকেরও বাড়া।'

'তুমিও এই কথা বললে দিদি?' আহত কণ্ঠে বলে নরেন।

'তুমিই ত বলাও। আমি কি আর বলি। চলো চলো, ভেতরে চলো।'

ভেতরে এসে চৌবাচ্চা থেকে জল নিয়ে পা ধুতে ধুতে বললে, 'বাড়ি ফিরে খোকার মুখে শুনেই আমি ছুটতে ছুটতে এলুম। তা হেঁটে আসা ত—তোমাদের

মত গাড়ি পালকি চড়ার ক্ষ্যামতা ত আমার নেই—ঠিক তোমরা বেরিয়েছ আর আমি এসেছি। তা আমার পরিবার কি সত্যিই চলে গেল?'

'গেল বৈকি। গাড়িতে তুলে দিয়ে এলুম।'

'কিন্তু এটা কি শাশুড়ী ঠাকরুণের নেয্য কাজ হয়েছে? তুমিই বলো দিদি। উনি ত এত সভ্য-ভব্য মানুষ—আমার পরিবারকে আমার বিনা হুকুমে তিনি কোন্ আইনে নিয়ে যান?'

'তোমার পরিবার তোমার হুকুমে চলবে—সে অবস্থা কি তুমি রেখেছ? পরিবারকে খেতে দাও তুমি?'

'দিই নে ত কি? বলি হেম যে নিত্যি-সেবার কাজ করছে—সেটা কার কাজ? আমি যদি এসে কেড়ে নিই?'

'তাহলে ত বাঁচে ও। তুমি খেটে ওদের খাওয়াবে—সেইটেই ত নিয়ম। হেম করছে সে তোমার ভাগ্যি।'

'ইস্, ভারি নিয়ম! আমি খাটব আর ঐ গোরবেটার জাত বসে খাবে!'

কমলা চুপ ক'রে যায়। ইতরটার সঙ্গে মিছিমিছি বকে মুখ ব্যথা করা।

পুঁটুলি খুলে হুঁকো কলকে চকমকি বার করে নরেন। তামাক ধরাতে ধরাতে বলে, 'হুঁ। তা কে কে গেল সঙ্গে?'

'মা, শ্যামা, রাঘব ঘোষাল আর তার ছোট ছেলে সত্যহরি।'

'কে, কে গেল?' তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে নরেনের কণ্ঠ, 'রাঘব ঘোষাল, সে আবার কে? কত বয়স?'

'ওরে বাবা, আমাদের সেই বুড়ো পুরুত! তোমার বিয়েও সে-ই দিয়েছে। তার প্রায় ষাট বছর বয়স।'

'হলোই বা ষাট। এমন কিছু বুড়ো নয় দিদি। আমার এক যজমান সাতষট্টি বছর বয়সে চতুর্থ পক্ষে বিয়ে করেছে—তার পরও তাঁর তিনটে ছেলেমেয়ে!'

কমলা ক্লান্তভাবে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছিল। সেইভাবেই চুপ ক'রে বসে রইল। মনটা ভাল নেই। মা ঐ অবস্থায় গেলেন, সুস্থ হয়ে ফিরবেন কি না কে জানে! তারও ত মাথার ওপর মা ছাড়া আর কেউ নেই।

হঠাৎ কানে আবার সেই তীক্ষ্ণ কণ্ঠের প্রশ্ন পৌঁছয়, 'আর ওর ছেলে কি যেন বললে সত্যহরি না ফত্যহরি—তার বয়স কত?'

'পনরো-ষোল হবে।' সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয় কমলা।

'ওমা, তবে ত যুবো ছেলে! তা গাড়িতে কে কোথায় বসল?'

'সবাই এক গাড়িতে উঠেছে। মার শরীর খারাপ, মেয়ে-গাড়িতে তুলতে

ভরসা হ'ল না।'

'তবেই ত বললে ভাল! তা আমার পরিবারের পাশে কে বসল?'

'মা।'

'সে ত গেল এক পাশে। আর এক পাশে?'

'আর একদিকে পুরুত ঠাকুর আছেন, ভয় নেই।'

'হুঁ। তাহলে আমার পরিবার বসেছে রাঘব ঘোষাল আর শাশুড়ী মাগীর মাঝখানে! আর সেই ছোঁড়াটা? সে আবার মাঝরাস্তায় গিয়ে আমার পরিবারের পাশে এসে বসবে না ত?'

কমলা উঠে দাঁড়ায় এবার, রাগ ক'রে বলে, 'অত আমি জানি না, ইচ্ছে হয় উড়ে গিয়ে দেখে এসো গে।'

'বা রে, বেশ মজা ত! আমার পরিবার কার পাশে বসে যাচ্ছে আমি খবর নেব না?'

ততক্ষণে কমলা ওপরে উঠে গেছে। সেদিকে চেয়ে বসে খানিকটা তামাক টানবার পর একসময় কতকটা আপন মনেই ব'লে উঠল, 'ফিরে আসুক একবার। গোরবেটার জাতকে এক কোপে যদি সাবাড় না করি ত আমার নাম নেই।'

ওপর থেকে মুখ বাড়িয়ে উমা প্রশ্ন করলে, 'রাত্রে খাবে নাকি এখানে?'

'ও হরি, শউর বাড়ি এসেছি—খাবো না? একটু ভালো ক'রে মৌরী বাটা দিয়ে ঘন ঘন বিউলির ডাল রাঁধ্‌ দিকি উমি, অনেকদিন খাই নি।'

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

এক

উমা ছেলেমেয়ে, পড়ায় সবসুদ্ধ ন'টি। এর কম পড়ালে কোন কাজ হয় না। কারণ মাইনে বেশি নয় কোথাও। সে ইংরেজী জানে না, ছেলেদের পড়ানো তার পক্ষে অসম্ভব, আজকাল সবাই চায় ছেলেদের ইংরেজী শেখাতে, যেমন-তেমন ক'রে দু-পাতা ইংরেজী শিখতে পারলেই ভাল চাকরি মিলবে। মেয়েদের ইংরেজী শেখাটা এখনও তত চল হয় নি তবে বেশিদিন অচলও থাকবে না, শোনা যাচ্ছে এখনই কেউ কেউ শেখাতে শুরু করেছেন, আগেকার মত মেয়ে ইস্কুল আর ফাঁকা পড়ে থাকে না। উমার চাড় আছে, লোক পেলে সে ইংরেজী শিখে নিতে পারে অল্পদিনেই। কিন্তু সে লোক কৈ? গোবিন্দ সবে পাড়ার পাঠশালায় যেতে শুরু করেছে, তার সম্বল ফার্স্ট বুক। সে যেটুকু জানে সেটুকু উমা অবশ্য

শিখে নিয়েছে কিন্তু সে ত অক্ষর পরিচয় মাত্র। অসহিষ্ণু উমা আরও এগিয়ে যাবার জন্য ছট্‌ফট করে—পাঁচ-ছ বছরের বালকের আধার বুঝে পণ্ডিত মশায় সাবধানে এগোন, উমার প্রয়োজন বুঝে তিনি ত আর ডিঙিয়ে চলবেন না! পূর্ণবয়স্কা উমা যেটা পাঁচ মিনিটে আয়ত্ত করতে পারে—শিশুর তাই আয়ত্ত করতে লাগে পুরো এক সপ্তাহ।

মেয়ে পড়ানোর রেওয়াজ খুব বেশি না হ'লেও এখন অনেকেই সচেতন হয়ে উঠেছেন। কিন্তু এ পাড়াটা বিশেষ এক শ্রেণীর বনেদী 'কলকাত্তাই' ব্যবসায়ী-বহুল, এবং তাঁদের ধারণা মেয়েদের লেখাপড়া শেখালে লক্ষ্মী থাকবে না। এঁদের রীতিনীতি আচার-ব্যবহার এখনও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রত্যেকটি প্রচলিত পথ অনুসরণ করে। এঁরা এগোতে চান না—লক্ষ্মী হারাবার ভয়ে। যদিও সে লক্ষ্মীকে তাঁরা তেমন করে ধরে রাখতেও পারেন নি। কলকাতার এই বিশেষ ব্যবসায়ী সমাজ পেছিয়ে গেছেন নিজেদের আসন মারোয়াড়ীদের ছেড়ে দিয়ে।

সে যাই হোক—উমাকে একটু দূরে-দূরেও যেতে হয়। সদর রাস্তা পার হয়ে ওধারের দু-একটা গলিতেও। কিন্তু উমা আর ভয় পায় না। সে কেমন ক'রে বুঝেছে যে ভয় পেলেই ভয় চেপে ধরে। সে কারও নিষেধ বা সতর্কবাণীও শুনতে রাজী নয়। আজ যারা সতর্ক করতে আসছে তারা চরম দুর্দিনে কেউই এসে দেখবে না, অন্ধকার ঘরে বসে শুকিয়ে মরতে হবে সেদিন। তাই কি ঘরে বসেই মরতে পারবে? বাড়িটাও ত নিজেদের নয়। ভাড়া না দিলেই তাড়িয়ে দেবে। এক উপায় আছে সোজাসুজি গলায় দড়ি দেওয়া কিন্তু সে পথ ত খোলা রইলই। শেষ পর্যন্ত না দেখে, অদৃষ্টের সঙ্গে শেষ বোঝা না বুঝে ও-পথে যাবে না উমা। মহাভারতে সে পড়েছে আত্মহত্যা মহাপাপ—মহাপাপ সে আর করবে না। গতজন্মে কি মহাপাপ করেছিল, কি চরম বঞ্চনা করেছিল আর কাউকে, তাই এ জন্মে এমন ভাবে বঞ্চিত হ'ল। সধবা মেয়ে রূপ-যৌবনের ভরা ডালি সাজিয়ে বসে রইল অথচ সে ডালি কারও পায়ে সঁপে দিতে পারলে না। এ জীবন রইল অস্পর্শিত—এ কুসুম রইল চিরদিনের জন্য অনাঘ্রাত। আবার এ জন্মে মহাপাপ করতে রাজী নয় সে—যত কিছু পাপ এ জন্মেই ধুয়ে মুছে যাক।

ন'টি ছেলেমেয়ে পড়ায় কিন্তু মোট তাকে যেতে হয় দু'টি বাড়িতে। এক বাড়িতে দু'টি, আর এক বাড়িতে তিনটি পড়ে একসঙ্গে। দুটি পড়ে এক ডাক্তারের ছেলেমেয়ে, তিনি দেন সোজাসুজি চার টাকাই। তিনটি পড়ে যেখানে—দুটি মেয়ে একটি ছেলে—সে ভদ্রলোক কায়স্থ, কোন এক বড় বিলিতী

কোম্পানীর মুচ্ছুদ্দি, মোটা টাকা আয়—কিন্তু অত্যন্ত কৃপণ—তিনি ঐ তিনটি মিলিয়ে দেন চার টাকা। আর চারটি মেয়েকে আলাদা আলাদা পড়াতে হয়, দুজন দেয় দু'টাকা হিসেবে, বাকী দুজন দেয় এক টাকা ক'রে। এরা ঐ বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে। সাহস ক'রে লক্ষ্মীকে অগ্রাহ্য করেছেন এঁদের অভিভাবকরা, সেজন্যে কিছু সুবিধা যেন দাবীই করেন।

এত হাঙ্গামা করতে হ'ত না সাদিক মিয়াদের বাড়ি পড়াতে রাজী হ'লে। ওঁদের বাড়িতেই মোট আট-নটি ছেলেমেয়ে—বৃদ্ধ সাদিক আজও বেঁচে আছেন, তিনি এমনও প্রস্তাব করেছিলেন যে উমাদিদির যদি ওখানে যেতে বাধা থাকে, তিনি তাঁর নাতি-নাতনীদের এ বাড়িতে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারেন, কিন্তু রাসমণি তাতে রাজী হন নি। তিনি সাদিকের কাছে হাত জোড় ক'রে বলেছিলেন, 'আপনার নাতি-নাতনীকে পড়িয়ে তার জন্য যদি হাত পেতে টাকা নিতে হয় ওকে, ত তার চেয়ে লজ্জার কথা আর কিছু নেই, তার আগে ওর গলায় দড়ি দেওয়াই ভাল। তার ওপর সবই ত বোঝেন বাবা আপনি, ব্রাহ্মণের মেয়ে আপনাদের কাছে চাকরি করলে জাতে ঠেলবে শেষ পর্যন্ত। ওর আর ভয় কি—আমার অন্য মেয়ে ত আছে, তাদের সমাজও আছে, তাদের বিপন্ন করা কি ওর উচিত হবে?'

এর পর আর সাদিক পীড়াপীড়ি করতে পারেন নি। নসিবনের বিয়ে হয়েছে টেরিটিবাজারে এক ধনী দিল্লীওয়ালার ঘরে—ওর স্বামীর ইচ্ছা তার ছোট বোনকে ও ভাইকে অর্থাৎ নসিবনের দেওর ও ননদকে বাংলা শেখায়। নসিবনদের গাড়িও আছে, সে বলেছিল উমাকে গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে যাবে এবং পৌঁছে দেবে কিন্তু তাও হয়ে ওঠে নি—ঐ একই কারণে। রাসমণি নসিবনের পিঠে হাত দিয়ে সস্নেহে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ব্যাপারটা। তাছাড়া অপরিচিত মুসলমান পরিবারের মধ্যে যাওয়ার অন্য বিপদ আছে। বিপদ না ঘটলেও দুর্নাম রটতে পারে।

অগত্যা উমাকে এই ছটি বাড়িতে ঘুরে ঘুরে পড়াতে হয়। নিজের বাড়িতে পড়ানো সম্ভব নয়—ঐটুকু-টুকু মেয়ে কেউই বাড়ির বাইরে যেতে দিতে রাজী নন। সব চেয়ে মুশকিল হয় সময় পাওয়া নিয়ে। বেলা বারোটা-একটা নাগাদ সংসারের কাজ সেরে বেরিয়ে পড়ে—ফিরতে ফিরতে পাঁচটা ছ'টা বেজে যায়। গরমের দিনে একটু দেরি করলেও চলে, কারণ সন্ধ্যা হয় বহু বিলম্বে, শীতকালে যেন ঝপ্ ক'রে অন্ধকার হয়ে আসে চারদিকে, নিঃশ্বাস ফেলতেও অবকাশ পাওয়া যায় না। অন্ধকার হবার পর আর রাস্তায় থাকতে সাহস হয় না—থাকবার উপায়ও নেই। মধুলুব্ধ মধুকরের দল সর্বকালেই আছে। বেকার যুবকের সংখ্যা তখনও কম ছিল না। এখন বেকার থাকে বাধ্য হয়ে, কাজ পায় না বলে, তখন বেকার থাকত—

থাকলে চলত বলে। সে একটানা নিশ্চিন্ত বেকারী, যৌবন যতদিন থাকত ততদিন দুর্বৃত্ততা ও দুশ্চরিত্রতায় ভাঁটা পড়ত না। দিনের বেলাতেও তাদের সাহস খুব কম হবার কথা নয়—তবে এক্ষেত্রে উমার কিছু জোরও ছিল। রাসমণিকে এ পাড়ার অনেকেই সমীহ করতেন, তাঁর ইতিহাস সবাই জানতেন—তাঁর চরিত্রের মাধুর্যের সঙ্গে দৃঢ়তার যে অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছিল তার পরিচয়ও কিছু কিছু পেয়েছেন অনেক। সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা দুইই তিনি আকর্ষণ করেছেন সমানে। সুতরাং বেশী কিছু ধৃষ্টতা করলে অভিভাবকদের কাছ থেকে চাপ আসবে তা সকলেই জানত। আর ভয় ছিল সাদিক মিয়ার বলিষ্ঠ ছেলে ও নাতিগুলিকে। সেজন্যে দিনের বেলায় রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করায় অতটা ভয় ছিল না। কিন্তু রাত্রির কথা আলাদা। দিনের বেলা যা শুধু সাহস, রাত্রে সেইটাই দুঃসাহস।

অথচ মাইনে যাঁরা দেন তাঁরা দু টাকাই দিন আর এক টাকাই দিন—ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখেন সবাই। এক ঘণ্টা পড়াতেই হয়—বড়জোর তা থেকে দু-পাঁচ মিনিট চুরি করা যায়। সুতরাং এক বাড়ি থেকে আর এক বাড়ি সে যায় ঊর্ধ্বশ্বাসে—আস্তে চলার অভ্যাস তার এই ক-মাসের মধ্যেই যেন কোথায় চলে গেছে। তবু এক-একদিন শেষ বাড়ি থেকে বেরোতে (যদিও শেষের জন্যে সে ডাক্তারের বাড়িটাই রেখে দেয়, কারণ ঐটেই সব চেয়ে কাছে, তাছাড়া ওঁরা মানুষ খুব ভদ্র, তেমন দেরি হ'লে সঙ্গে ঝি দিয়ে বাড়িতে পৌঁছেও দেন) বেশ ঘোর হয়ে আসে চারিদিকে।

একদিন এমনি তাড়াতাড়ি সারবার চেষ্টা সত্ত্বেও দেরি হয়ে গেছে। ঝি সেদিন গেছে কুটুম-বাড়ি তত্ত্ব নিয়ে, ডাক্তারের গৃহিণী প্রস্তাব করলেন, 'আমার খোকাই না হয় এগিয়ে দিক তোমাকে। কী বলো গো মেয়ে?'

খোকা অর্থাৎ তাঁর তেইশ-চব্বিশ বছরের ছেলেটি। ওর চাউনিটা উমার ভাল লাগে না কোন দিনই—বিশেষ ক'রে তার সঙ্গে অন্ধকারে একা পথ চলার চেয়ে অদৃষ্টদেবতাকে বিশ্বাস করাই ভাল। উমা ঘাড় নেড়ে বললে, 'না না কাকীমা—আমি এমনিই চলে যাবো, এইটুকু ত পথ।'

সে ওঁদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে একরকম দৌড়তেই শুরু করলে। পথ খুব বেশি না হ'লেও দুটো গলি পেরোতে হয়। প্রথম গলি যেটা বেশী নির্জন, সেখানে একটা বাড়িতে এই সময় একদল বৃদ্ধ বসে আড্ডা দেন, সেইটাই উমার ভরসা কিন্তু গলিতে ঢুকে অনেকটা এগিয়ে এসে দেখল আজ সে রক খালি, বৃদ্ধের দল কোন অজ্ঞাত কারণে অন্যত্র কোথাও আড্ডা বসিয়েছেন কিংবা কেউই বাড়ি থেকে বেরোন নি। তখন আর ফেরা সম্ভব নয়—মনে মনে দুর্গা নাম জপ করতে করতে এগিয়ে চলল সে, কিন্তু ঠিক এই সময়েই মনে হ'ল তার পেছনে আর

একটা পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে—কে যেন তার পেছনে পেছনে আসছে। হয়ত সবটাই ভয়, নিছক ভয়—তবু পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখাও সম্ভব নয়। সে আরও জোরে, প্রায় উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে লাগল—আর তারই ফলে একেবারে মোড়ের কাছাকাছি এসে সজোরে ধাক্কা লাগল একটি পুরুষের সঙ্গে—অপরিচিত এবং পরপুরুষ ত অবশ্যই! দোষ লোকটিরও নয় কারণ সে ওপাশ থেকে আসছিল, তার পক্ষেও আগে থাকতে উমাকে দেখে সতর্ক হওয়া সম্ভব ছিল না। আতঙ্কে, আশঙ্কায়, লজ্জায়, ক্ষোভে—উমা হয়ত অজ্ঞানই হয়ে পড়ত যদি না অত্যন্ত সুপরিচিত একটি কণ্ঠের বিস্ময়সূচক ধ্বনি কানে এসে বাজত—'এ কি, তুমি!'

আর একটু থেমে—মুহূর্ত কতক মাত্র--বাকী প্রশ্নগুলোও শেষ করলে সে, 'এখানে, এমন একা?'

লোকটি শরৎ—তার স্বামী।

এই লোকটির সঙ্গে তার পরিচয় খুবই অল্পকালের, তাকে ভরসা করার মত, তাকে অবলম্বন করার মত নির্ভরতা বোধ করে এমন কোন কারণই নেই—তবু উমার তখনকার নিশ্চিন্ততা কল্পনা করার নয়। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চোখ বুজে সে দাঁড়িয়ে দম নেবার চেষ্টা করলে, কিন্তু দাঁড়াতে পারলে না কোনমতেই, এতগুলি পরস্পরবিরোধী প্রবল অনুভূতির সংঘাতে তার সমস্ত স্নায়ু যেন অবশ হয়ে গিয়েছিল—সে প্রাণপণে নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা ক'রেও শেষ পর্যন্ত সামলাতে পারলে না—টলে ঠিক নয়, এলিয়েই পড়ল শরতের বুকের মধ্যে।

'এই ত্যাখো—এ কি কাণ্ড? কী হ'ল তোমার?'

আনাড়ীর মত অপ্রস্তুতভাবে শরৎ ওকে ধরে ফেললে এবং পরস্ত্রীর মতই আড়ষ্ট ভাবে ধরে রইল।

উমা অবশ্য অল্পক্ষণের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিলে। স্বামীর এই সামান্য আড়ষ্টতার মধ্যে ,যে তীব্র অপমান ছিল সেটাও ওর অবসন্ন স্নায়ুকে সক্রিয় ক'রে তুলতে কতকটা সাহায্য করলে হয়ত। সমস্ত পরিচিত ইতিহাস মনের মধ্যে লেপে মুছে গিয়ে, সব কিছু যুক্তি-তর্ক ছাপিয়েও যে আশ্বাস ও আশা স্ত্রীর মনে জাগা স্বাভাবিক সেইটাই হয়ত স্বামীর বুকে এলিয়ে পড়বার সময় উমার মনেও জেগেছিল, ভীত ক্লান্ত স্ত্রীর অবস্থা দেখে সস্নেহেই বুকে আশ্রয় দেবে শরৎ -অন্তত কিছুকালের জন্য। পর হলেও মানুষ এমন সময় আশ্বাস দেয়, আশ্রয় দেয়।

কণ্ঠস্বরে কোন দুর্বলতা না ফুটে ওঠে—হে ভগবান!

উমা একটুখানি চুপ ক'রে থেকে সহজভাবেই উত্তর দিলে, 'বড্ড ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম!'

'তা ত দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু কেন? এমন সময় এই নির্জন গলি দিয়ে যাচ্ছিলেই বা কোথায়—অত দৌড়ে।'

'বাড়ি যাচ্ছিলুম। সরো, পথ ছাড়—একেবারে অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে, আর দেরি করার সময় নেই।'

'থাক—অমন ক'রে আর দৌড়তে হবে না, চলো তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

চরম বিপদের দিনে লোকটার সঙ্গে দেখাও হয়ে যায় ত ঠিক! এত দুঃখের মধ্যেও কথাটা মনে ক'রে হাসি পায় ওর। আহা—কি সম্পর্ক!

পাশাপাশি চলতে লজ্জাই করে। শরৎ একটু আগে আগে যায়—উমা পিছু পিছু।

শরৎ আবারও প্রশ্ন করে, 'কোথা থেকে আসছিলে?'

'মেয়ে পড়িয়ে।'

'কী—কী ক'রে?' চমকে দাঁড়িয়ে যায় শরৎ।

'পথের মধ্যে অমন ক'রে দাঁড়াতে হবে না। চলো। কেউ দেখলে কি মনে করবে। তোমাকে ত এ পাড়ায় কেউ চেনে না।'

কণ্ঠস্বরে সামান্য একটু ব্যঙ্গই ফুটে ওঠে ওর।

শরৎ চলতে শুরু করে বটে কিন্তু প্রশ্নটা থেকেই যায়।

'কিন্তু কী করছিলে তাই যে বুঝতে পারলুম না!'

'মেয়ে পড়াচ্ছিলুম, ছেলেমেয়ে পড়ানোর কাজ করি আমি এখন। এক টাকা দু টাকা মাইনে - নটা ছেলেমেয়ে পড়াই। এই ছ ঘণ্টা খেটে ফিরছি। বুঝেছ—শরীর আর মনের কি অবস্থা? অন্য-দিন এর চেয়ে আলো থাকতে থাকতে ফিরি, আজ দেরি হয়ে গেছে বলেই ভয় পেয়ে ছুটছিলুম।'

গলার আওয়াজ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে উমার।

তবু শরতের অবিশ্বাস যেন যায় না।

'তুমি বাড়ি বাড়ি ঘুরে ছেলেমেয়ে পড়াচ্ছ? এই বয়সে? একা? সে কি!'

'কেন, তাতে অবাক্ হবার কি আছে?'

'তোমার—তোমার এত পয়সার দরকার হয়েছিল?'

'হওয়াটা কি অন্যায়?' ততক্ষণে নিজেদের বাড়ির দরজা পর্যন্ত পৌঁচেছে উমা। সদরের চৌকাঠে একটা পা দিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, 'যার স্বামী ভরণপোষণ করার প্রতিজ্ঞা ক'রেও সে প্রতিজ্ঞা রাখতে পারে না, তার আর কি উপায় আছে বলতে পারো? কী আশা করেছিলে তুমি, আমার বিধবা মা

আজীবন বসে খাওয়াবে, আর এত টাকা রেখে যাবে যে মা মরবার পরও বসে খেতে পারব ? নাকি সোজাসুজি বেশ্যাবৃত্তি করলেই ভাল হ'ত ?···অবাক হয়ে গাছ থেকে পড়লে যে একেবারে ! যে প্রশ্নগুলো আমাকে করছিলে সেগুলো আমার স্বামীকে ক'রে ত্যাখো না, তিনি কি বলেন !'

উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে উমা—কথা কইতে কইতে ।

'চলো চলো, ভেতরে চলো,—তোমার গলার আওয়াজ যা চড়ছে, এখনই আশেপাশের বাড়ির জানলায় লোক এসে দাঁড়াবে, অপ্রতিভভাবে বলে শরৎ ।

উমাও একটু লজ্জিত হয়ে দালানের মধ্যে ঢুকে পড়ে । পিছু পিছু শরৎও কয়েক পা এগিয়ে আসে ।

'বারোটায় বেরিয়েছি, ছটা বাড়ি ঘুরতে হয়েছে—আর সমানে বকতে হয়েছে কতগুলো ছেলেমেয়ের সঙ্গে । তার ওপর এই আতঙ্ক । দিনরাত দুটো শত্রু সঙ্গেই আছে—রূপ আর যৌবন ! এ যে আমি আর পারি না !'

উত্তর দেওয়া শরতের পক্ষে কঠিন হ'ত—কিন্তু দিতে তাকে হ'ল না ।

'কার সঙ্গে কথা কইছিস রে উমি ?'

আলো হাতে ক'রে অবাক হয়েই নিচে নেমে আসে কমলা ।

'ওমা, এ যে শরৎ জামাই । এসো এসো । ওপরে এসো । কি ভাগ্যি !'

'না দিদি—আজ যাক । হঠাৎ পথে দেখা হয়ে গেল ওর সঙ্গে—তাই—আমি বরং—'

কথাবার্তা অসংলগ্ন হয়ে পড়ে শরতের ।

কমলা এসে একেবারে হাত ধরে ওর, 'আমি তোমার দিদি হই ভাই—একদিন একটা কথা শোন । দু মিনিট স্ত্রীর কাছে বসে গেলে কেউ তোমার নিন্দে করবে না । এসো—ওপরে এসো ।'

যাকে বলে যন্ত্রচালিতের মতই শরৎ ওপরে গিয়ে বসে । এবার আলোয় ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখে উমা, বড়ই রোগা হয়ে গেছে শরৎ, কেমন যেন বুড়িয়ে গেছে এই বয়সেই । অমন সুন্দর মুখ—গাল চড়িয়ে চামড়া কুঁচকে বিশ্রী হয়ে গেছে । কমলা ওদের বসিয়ে রেখেই 'আসছি' বলে বেরিয়ে গিয়েছিল । দুজনে একা । নিজের অজ্ঞাতসারেই কথাটা মুখ থেকে বেরিয়ে যায়, 'এমন চেহারা হয়েছে কেন তোমার ? অসুখ করেছিল নাকি ?'

'আমার ? কৈ না ত !' তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, 'খাটুনি বেড়েছে বেজায় ! নিজে একটা ছোটোখাটো প্রেস করেছি কিনা বড্ড খাটতে হচ্ছে । পুঁজি ত অল্প ।'

তারপর দুজনেই চুপচাপ—

খানিক পরে মাথা হেঁট ক'রে মেঝেতে আঙুল দিয়ে দাগ কাটতে কাটতে শরৎ বললে, 'চারদিকে দেনা—নইলে তোমার খরচপত্র ত—কতই বা—তা অল্প দু-এক টাকার দরকার আছে তোমার ?'

'না। নিজেই রোজগার করছি এইমাত্র ত শুনলে। স্বামীর কাছ থেকে ভিক্ষেটা আর নাই নিলুম। তাতে ত আর আমার অভাব ঘুচবে না।'

'আচ্ছা, তাহ'লে উঠি এখন।' শরৎ সত্যিই উঠে দাঁড়ায়।

'এখনই !' চাপা আর্তস্বরে বলে ওঠে উমা, 'বহু লোকে ত বিয়ে করা বৌ রেখে বেশ্যাবাড়ি যায়,—তুমি, তুমি বেশ্যাকে ফেলে বিয়ে-করা বৌয়ের কাছে দু দণ্ডও থাকতে পারো না !'

শরতের মাথাটা হেঁটই ছিল, আরও হেঁট হয়ে এল, অনেক ইতস্তত ক'রে যেন প্রাণপণ চেষ্টায় সে উত্তর দিলে, 'স্ত্রী বলেই তোমার কাছে থাকতে চাই না। ভাল না বেসে মেয়েমানুষের কাছে যাওয়া যায়—স্ত্রীর কাছে যাওয়া যায় না। তার সঙ্গে ঘর ক'রে, তার হাতে ভাত খেয়ে, তোমার কাছে আসাটা তোমাকে কি আরও অপমান করা হ'ত না ? আমি তোমার স্বামী হবার যোগ্য নই—স্বামী নইও—তা বলে তোমার মর্যাদা আমি জানি না এটা মনে করো না। যেখানেই থাকি, যে অবস্থাতেই থাকি, মনে মনে অহরহ ভগবানকে ডাকি, আমি যেন শীঘ্র যেতে পারি। তুমি বিধবা হ'লে তবু এই অপমানের হাত থেকে বাঁচবে।'

শেষের দিকে শরতের গলা কেঁপে গিয়েছিল, সেই কাঁপন-লাগা গলার সুর আর শেষের কথাগুলো তন্ময় হয়ে উপভোগ, হ্যাঁ উপভোগই করছিল উমা—স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে প্রদীপটার দিকে তাকিয়ে ছিল সে—কেমন একটা বিহ্বল ভাবে। তাই কখন যে শরৎ বেরিয়ে গেছে তাও যেমন টের পায় নি, কমলা ভগ্নাপতির জন্যে জল-খাবারের থালা সাজিয়ে যখন ঘরে ঢুকল তখন সেটাও তেমনি টের পেলে না।

'এ কি, জামাই চলে গেল ! মুখপড়ি দুটো মিনিটও ধরে রাখতে পারলি নি !'

উমার কানে বোধ হয় এ অনুযোগও পৌঁছল না। সে তেমনি পাথরের মতই দাঁড়িয়ে রইল স্থির হয়ে।

দুই

উমার সে অভিভূত অবস্থা সারারাতের মধ্যেও কাটল না। সমস্ত রাত সে ঠায় জেগে কাটিয়ে দিল। অবশ্য সেটা এখন তার প্রায় প্রাত্যহিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাল ক'রে ঘুম তার একদিনও হয় না। তবে আজকের ব্যাপারটার

মধ্যে একটা বিশেষত্ব ছিল—সে ঘুমোবার চেষ্টাও করে নি। সারারাত বসেই ছিল। কমলা মধ্যে মধ্যে ঘুমের ঘোরে একটু বিস্ময় প্রকাশ করেছে, 'ওমা উমি, তুই এখনও বসে আছিস্?' আর প্রতিবারই উমা তাকে আশ্বাস দিয়েছে, 'এই যে শুই দিদি!' কিন্তু শোবার চেষ্টাও করে নি। আজকের রাত ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব।

শরতের শেষের কথাগুলোও—কথাগুলোও ততটা নয় যতটা তার গলার আওয়াজ ওর সমস্ত মর্মমূলকে গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছে। শেষের কথাগুলো বলার সময় তার গলা কেঁপেছিল, কণ্ঠস্বর হয়ত বা একটু গাঢ় হয়েই এসেছিল—সে যে কতটা, বা কী, তখন ভাল ক'রে শোনা বা বিচার করার অবসর মেলে নি, এতই আকস্মিকভাবে অতর্কিতে ও স্বল্প সময়ের মধ্যে কথাগুলো বেরিয়ে এসেছিল শরতের মুখ দিয়ে—শুধু ওর চেতনার ওপর সেই কথাগুলোর এবং স্বরের যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সেই স্মৃতিটুকুই এক অপূর্ব মাধুর্যের ইন্দ্রজাল রচনা ক'রে রেখেছে উমার মনের মধ্যে। মরুভূমির মধ্যে যে তৃষ্ণার্ত পথিক পথ হারিয়েছে সে পয়ঃপ্রণালীর জল পঙ্কিল কিনা বিচার করে না। উমা জীবনে স্বামীর ভালবাসা কি সে স্বাদ পায় নি—অপরের মুখে তার একটা ঝাপ্‌সা আভাস পেয়েছে মাত্র—তবু তৃষ্ণা যে সহজাত,—তৃষ্ণার উগ্রতা ত কিছুমাত্র কম নেই তার জন্য! ঐ সামান্য গলা ভার হয়ে আসা, ঐ সামান্য কাঁপনটুকুকেই তাই ওর অন্তরের সমস্ত তৃষ্ণা আঁকড়ে ধরেছে। গাঢ় অন্ধকারে আলোকরেখাকে অনেক সময় মানুষ সত্যি সত্যিই হাত বাড়িয়ে ধরতে যায়, দৈহিক স্পর্শ করতে চায়—ক্ষণকাল পূর্বের একটি কণ্ঠস্বরকেও তেমনি উমা শুধু সমস্ত মন দিয়ে নয়—বিভ্রান্ত বিমূঢ় অবস্থায় যেন মধ্যে মধ্যে হাত বাড়িয়েও ধরবার চেষ্টা করছিল।...

অবশেষে একসময় দূরে টেগোর ক্যাসেলের পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে তিনটে বেজে যেতে উমা যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে দোর খুলে বাইরে বেরিয়ে এল। রাত-বিরেতে একা সোমথ মেয়ের ছাদে বেরনো নিষেধ ছিল, কমলা বার বার ব'লে রেখেছিল বাইরে বেরোতে হলে যেন ডেকে বেরোয়। কিন্তু আজ যেমন কমলাকে ডাকাও সম্ভব নয়, তেমনি ঘরের এই ক্ষীণ সেজ্-এর আলোতে চুপ ক'রে বিছানায় বসে থাকাও অসম্ভব। কি বলবে কমলাকে, অসময়ে ডাকার কি কৈফিয়ত দেবে? তার চেয়ে ভরসা ক'রে একা বেরিয়ে পড়া ঢের সহজ। কি আর হবে, চোর ডাকাত কি আর রোজই সব সময় ওৎ পেতে বসে আছে বাইরে? তাছাড়া মনের এ অবস্থায় কোন দ্বিতীয় ব্যক্তির কথা কি কণ্ঠস্বর সে শুনতে প্রস্তুত নয়। কি এক অপূর্ব অনাহত সঙ্গীত যেন মনের তন্ত্রীতে বেজে চলেছে, সেদিকে সমস্ত ইন্দ্রিয়ই

দিয়ে কান পেতে আছে সে—অন্য কোন পরিচিত কণ্ঠস্বরের আঘাত লাগলেই যেন সে তন্ত্রী ছিঁড়ে যাবে—সে সুর কেটে যাবে!

ছাদের ঠাণ্ডা বাতাসে তার রাত্রিজাগরণক্লিষ্ট দেহ জুড়িয়ে গেল। ওর মুখে চোখে যেন কে একটা স্নিগ্ধ প্রলেপ মাখিয়ে দিলে। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ নতুন বাজারের আড়ালে তখনও ঢলে পড়ে নি কিন্তু তার আলোও বিশেষ নেই। তা না থাক, অন্ধকারও তেমন জমাট নয়—রাস্তায় আলোর দুটো তিনটে রেখা যে পড়েছে বোসেদের তিনতলা বাড়ির দেওয়ালে, তারই আভায় বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ছাদটা।

উমা এগিয়ে এসে আলসেয় ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।

নিস্তব্ধতা ও শান্তি! বিরাট শহর ঘুমোচ্ছে। নিজের মনের দিকে কান পেতে থাকার অপূর্ব অবসর।

মল্লিকদের বাড়িতে কুক সর্দার হাঁক দিয়ে যাচ্ছে একটানা ভয়াবহ একটা আওয়াজ ক'রে—ওদের চিড়িয়াখানার সারস দুটোও শেষ প্রহর ঘোষণা ক'রে ডেকে উঠল বিশ্রী কর্কশ কণ্ঠে। আগে আগে এসব আওয়াজে ভয় করত উমার। বিশেষত ঐ কুক সর্দারের একটানা গম্ভীর ডাকে—কিন্তু আজকাল আর করে না। এমন কি আজ সে শব্দে ওর চিন্তারও ব্যাঘাত হ'ল না। তেমনি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে একমনে উপভোগ করতে লাগল ওর নবলব্ধ অভিজ্ঞতার অপরূপ অভিনবত্ব। নিশীথ রাত্রির শান্ত নীরবতা ও স্নিগ্ধ অন্ধকার ওর সে জাগ্রত স্বপ্নের বরং যেন সহায়তাই করল খানিকটা।

সকালে উঠে উমার আরক্ত চোখের দিক চেয়ে কমলা বিস্মিত হ'ল না। হতভাগিনীর মনের অবস্থা সে বোঝে বৈকি। রাতে ঘুম না হওয়াই ত স্বাভাবিক। বিধবা হবার পর কত রাত সে নিজেও ত চোখে-পাতায় করতে পারে নি। তাই সে প্রশ্নও করলে না।

কিন্তু সে সত্যিই বিস্মিত হ'ল আর একটু পরে। উমির হ'ল কি! ওর মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি! লক্ষ্য করতে করতে রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল কমলা!

উমা বরাবরই ধীর স্থির শান্ত প্রকৃতির মেয়ে। ওর মধ্যে কোন চপলতা কখনও লক্ষ্য করে নি কমলা। কিন্তু আজ ও অকস্মাৎ এমন লঘু হয়ে উঠল কেন?

সিঁড়ি উঠছে সে লাফিয়ে লাফিয়ে, কাজ-কর্ম করছে অন্য দিনের অর্ধেক সময়ে—সে-কাজে যে অনেক ভুল ঘটছে তা বলাই বাহুল্য—আর সব চেয়ে

আশ্চর্য কথা, রান্নাঘরে কাজ করতে করতে—সেদিকে কেউ নেই ভেবে গুনগুন ক'রে কি একটা গানও গাইছে।

উদ্বিগ্ন হবারই কথা—বিশেষত এই দীর্ঘকাল যে দেখেছে উমাকে—তার পক্ষে এই একেবারে অস্বাভাবিক আচরণে। কিন্তু একটু পরেই মনের মধ্যে দুই আর দুইয়ে চার মিলিয়ে পেয়ে কমলার মুখ সকৌতুক স্মিতহাস্যে সহজ হয়ে আসে। কাল বোন এবং ভগ্নীপতির মধ্যে কি কথা হয়েছে সে জানে না। স্বাভাবিক সঙ্কোচে সে প্রশ্নও করে নি। কি দরকার ব্যথার স্থানে ঘা দিয়ে? তবে একটা কি কথা হয়েছে ওদের মধ্যে এটা ঠিক, যার ফলে উমার অমন স্তম্ভিত ভাব, অপলক দৃষ্টি কাল সে দেখেছে। ভেবেছিল আরও দুঃখের, আরও বেদনা-দায়ক কিছু ঘটেছে—শরতের মধ্যে আরও বেশি হতাশার আভাসই পেয়েছে উমা।

আজ প্রথম মনে হ'ল যে তা হয়ত নয়। হয়ত বা শরৎ তার ব্যবহারে একটু সহানুভূতি বা একটু স্নেহের ভাবই দেখিয়েছে। হয়ত বা—

আজও প্রশ্ন করতে সঙ্কোচে বাধল কিন্তু আড়ে আড়ে যতই লক্ষ্য করলে কমলা ততই তার এই বিশ্বাসই দৃঢ় হ'ল। মনের মধ্যে দক্ষিণা বাতাস বয়েছে ওর—তাই বাইরে ওর এই লঘু চপলতা। কোন্ বসন্তের স্পর্শ লাগল তা অনুমান করাও ত শক্ত নয়!

উমা আজ টেনে টেনে অনেক কাজ করল। বেশি ও বাড়তি কাজ। সর-ময়দা নিয়ে মাখাতে বসল কমলাকে। কোন নিষেধই শুনল না। বললে, 'বিধবা হয়েছ ব'লে কি গায়ের ময়লা জমিয়ে রাখতে হবে নাকি?' গোবিন্দকে অকারণ আদর করতে লাগল যখন-তখন। কথায় কথায় হাসিতে ফেটে পড়তে লাগল। ওর পক্ষে এটা এতই অস্বাভাবিক যে বুড়ো ঝিটা পর্যন্ত বিস্মিত হয়ে কমলার দিকে চাইতে লাগল বার বার। তার দৃষ্টিতে নীরব প্রশ্ন—ব্যাপার কি?

ফলে কমলাও খুশী রইল সারাদিন।

কিন্তু সেদিন আরও অঘটন ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল। সন্ধ্যের দিকে একটি ঝি-গোছের স্ত্রীলোক কড়া নেড়ে ফরসা ন্যাকড়ায় জড়ানো একটু পুলিন্দা দিয়ে বলে গেল, 'আমাদের বাবু—শরৎবাবু পাঠিয়ে দিয়েছেন বৌদির জন্যে—তোনার দিদির হাতে দিতে বলেছেন।'

ওদের ঝি গিরিবালা সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল লাফাতে লাফাতে। কথাটা এতই অবিশ্বাস্য যে বুঝতে কমলার বেশ খানিকটা সময় লাগল। তারপর যখন সত্যিই শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারল তখন সে ব্যাকুল হয়ে বললে, 'ওরে তাকে ডাক ডাক—

সবটা শুনি। ওকে একটু জল খাওয়াতে হবে যে, কিছু পয়সা—'

কিন্তু ততক্ষণে সে মানুষটি উধাও হয়েছে। বোধ হয় সেই রকমই নির্দেশ ছিল শরতের। কমলা বিলাপ করতে লাগল, ওদের ঝি গিরিও অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল, 'আমি ত তাকে চলে যেতে বলি নি বড়দি, দাঁড়াতেই ত বল্লু। বল্লু যে, এখানে তুমি খাড়া থাকো, আমি বড়দিকে খবরটা দিয়ে আসতিছি—তা সেই বা কেমনতরো মানুষ, বলা নেই কওয়া নেই—যার জিনিস তার হাতে পঁওছাল কি না তার খবর নেই—অমনি ছুট ক'রে হাওয়া?'

কমলা ওপরের ন্যাকড়াটা খুলতেই দেখলে একজোড়া কালোপাড় ভাল ফরাস-ডাঙার শাড়ি। খেলো হাটুরে কাপড় নয়—বেশ দামী শাড়ি। অন্তত ছ-সাত টাকা জোড়া হবে। শরৎ পাঠিয়েছে তার স্ত্রীর জন্য। আনন্দে চোখ ছল-ছল করতে লাগল কমলার।

তখন উমা ছিল না, পড়াতে গিয়েছিল। পড়িয়ে সন্ধ্যের আগে বাড়ি ফিরতে কমলা প্রায় ছুটতে ছুটতে গিয়ে খবরটা দিলে, 'উমি উমি, শরৎ জামাই তোর জন্যে একজোড়া কাপড় পাঠিয়েছে। বিলিতি কাপড় নয়, হেটো শাড়িও নয়—আসল ফরাসডাঙার বেশ দামী শাড়ি!'

'কে, কে পাঠিয়েছে?'

প্রায় আর্তনাদের মতই শোনায় উমার প্রশ্নটা।

'শরৎ জামাই। কে একটি মেয়েছেলে এসে দিয়ে গেল।'

আঘাত সয়েছিল উমা এতকাল অনায়াসেই। কিন্তু স্নেহের এই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত নিদর্শনে ওর মনে বহু বিপরীতমুখী ভাবের যে প্রতিক্রিয়া হ'ল—সেটা সইতে পারলে না। বিশেষত গতকাল সন্ধ্যা থেকে এই চব্বিশ ঘণ্টা ওর মনের ওপর দিয়ে একটা অবর্ণনীয় ঝড় বয়ে গেছে, তার ফলে ওর স্নায়ু হয়ে পড়েছে আরও অবসন্ন, আরও ক্লান্ত। এই প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করার শক্তি আর তার নেই।

কী যেন একটা বলতে চেষ্টা করল উমা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই বলা হ'ল না, সামান্য একটা অস্ফুট শব্দ হ'ল মাত্র, ঠোঁট দুটো কাঁপল থর্‌থর্‌ ক'রে—তারপরই দিদির বুকের ওপর ওর মূর্ছিত দেহটা এলিয়ে পড়ল।

তিন

কাশীতে আসার দিন পনরোর মধ্যেই রাসমণি অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলেন। এর আগে কখনও তিনি এদিকে আসেন নি, তাছাড়া বহুদিন ধরেই কলকাতার ঐ

সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে বিশেষ চারটে দেওয়ালে আটকে ছিলেন, কাজেই তাঁর উন্নতি দ্রুত হবারই কথা। তাছাড়া জল-হাওয়ার গুণ ত আছেই। ঘি-দুধ-আনাজ সবই সস্তা এবং সুস্বাদু। তার ওপর—গঙ্গা এবং বিশ্বনাথ। অনেক দিন পরে যেন মনটাও তাঁর হালকা আর সহজ হয়ে ওঠে।

একটু সুস্থ হয়ে ওঠার পর থেকেই রাসমণি পায়ে হেঁটে বিশ্বনাথ দর্শনে যেতে শুরু করলেন। আরও দিন পাঁচেক পরে বিকেলে রাণীভবানীর গোপাল-বাড়িতে কথকতা আর দশাশ্বমেধ ঘাটে রামায়ণ গান শোনা আরম্ভ হ'ল। এ এক নতুন জীবন। অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দ আছে এতে। রাসমণি এত আনন্দ কল্পনা করেন নি বহুকাল। কলকাতার বাড়িতে যে দুটি-তিনটি প্রাণী আছে তাদের চিন্তা যেন সেই বাড়িতেই সীমাবদ্ধ আছে, এতদূরে এসে পৌঁছয় নি।

কিন্তু শ্যামা ছট্‌ফট করে। হেম আছে সেখানে পড়ে। কে তাকে রেঁধে খাওয়াচ্ছে? নরেন এল কিনা কে জানে! এসে যদি হেমকে মারধোর করে—সে দুশ্চিন্তা ত আছেই। দু-একটা যা ঘটিবাটি আছে তাও হয়ত বেচে খাবে সে। তাকে ব'লে আসাও হয় নি। হাজার হোক স্বামী ত! বহুদিন তার দেখা পায় নি—সে কথাটাও মনে আছে বৈকি। একবার যদি এসে ফিরে যায়—আবার হয়ত কত দিন আসবে না! বিচিত্র কারণে তার অভাববোধটাও মধ্যে মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে।

তাছাড়া—রাসমণি সম্বন্ধেও শ্যামা একটু হতাশ হয়েছে মনে মনে। সে কথা অস্বীকার ক'রে কোন লাভ নেই।

এই এক মাস সেবার সুযোগ, সহস্র অন্য প্রসঙ্গের ফাঁকে ফাঁকে বার বার ঐ কথাটাই পেড়েছে শ্যামা। রাসমণির হাতে ঠিক কতটা আছে, কতখানি ভরসা করা যেতে পারে তাঁর ওপর! কিন্তু প্রতিবারেই ঐ এক উত্তর পেয়েছে, বেশী নেই, তলা চুঁয়ে এসেছে এবার। বড়জোর আর তিন-চার বছর। তারও বেশী যদি বাঁচেন ত সিন্দুকের বাসন বেচতে হবে হয়ত।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই একই কথা। শোনে আর মনের মধ্যে একটা হিম-শীতল হতাশা অনুভব করে শ্যামা। রাসমণি মিছে কথা বিশেষ বলেন না তা সে জানে। টাকার কথায় এতকাল পরে মিছে বলবেন সেটা বিশ্বাস্য নয়। আর এই এত বার এত ভাবে জেরা ক'রে যখন একই উত্তর মিলছে, তখন সামান্য মাত্র সংশয়েরও অবকাশ কোথায়! পাকা মিথ্যেবাদীরাও এত জেরায় মিথ্যাকে জিইয়ে রাখতে পারে না।

অর্থাৎ আশা-ভরসা আর কোথাও বিশেষ রইল না। যা করতে হবে তাকেই

করতে হবে।

এই সত্যটাই যেমন একটু একটু ক'রে মনের মধ্যে দৃঢ়মূল হয়, তেমনি এই প্রবাসের ওপর বিতৃষ্ণা বাড়ে। বাড়ি ফেরবার জন্য ছট্‌ফট করে সে।

ঠিক সতরো দিনের মাথাতেই কথাটা পাড়ে সে, 'মা, তাহ'লে ফেরার কথাটা কি ভাবছেন?'

রাসমণি যেন চমকে ওঠেন। ফেরার কথা এরই মধ্যে? তিনি যে একেবারেই না ফিরতে পারলে বাঁচেন। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রাঘবের দিকে চান।

'এরই মধ্যে কি গো মেজদি! এই ত সবে দু হপ্তা হ'ল। শরীরটা মার সারুক একটু। এত তাড়াহুড়ো ক'রে ফিরিয়ে নিয়ে গেলে এত পয়সা খরচ সব বরবাদ হয়ে যাবে। সেখানে গিয়ে আবার পড়বেন। তার চেয়ে আর কটা দিন থাকো কাদায় গুন ফেলে।'

তারপর একটু থেমে বলেন, 'আর দুদিন পরেই নাকি রামনগরের বেগুন উঠবে, শুনেছি একোটা বেগুন সাত-আট সের পর্যন্ত ওজন হয় আর তেমনি নাকি মিষ্টি। এখানে আবার সের দরে বিক্কিরি হয়—এক পয়সা সের। সে বেগুন না খেলে জীবনই বৃথা! বড় কপিও উঠবে শীগ্‌গিরি—এলে কত কাণ্ড ক'রে, খেয়ে যাবে না?'

শ্যামা বেশ একটু বিঁধিয়েই জবাব দেয়, 'তোমার কি বলো না বামুনদাদা, তুমি দিব্যি পরের পয়সায় বসে বসে ভালমন্দ খাচ্ছ, তোমার কি আর যেতে মন সরবে? কিন্তু আমি যে ছেলেমেয়ে ছেড়ে এসেছি সেখানে। দুধের বালক একা পড়ে রয়েছে—দু-দুটো নিত্য-সেবা, তার ওপর পড়াশুনো—কী করছে কে জানে! যদি অসুখেই পড়ে?...এখানে ঐ এক ফোঁটা মেয়ে নিয়ে দিদিও হয়ত হয়রান হচ্ছে।

রাঘব ঘোষালের বয়স হয়েছে, তার ওপর এদের বহুকাল দেখছেন। তিনি চটলেন না, বরং বেশ প্রশান্ত মুখেই জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ গো শ্যামা ঠাকরুন, তা সত্যি—পরের পয়সায় এসেছি, ভালমন্দ খাচ্ছি—এমন কি আর এ কাঠামোয় জুটবে আবার? সে লোভ ত আছেই। তা তোমারও ত সেই কথাই ভাই। পরের পয়সা না হলে তোমারই কি আর আসা হত? তাছাড়া এটাও ভেবে গ্যাখো—যার পয়সা আর যার জন্যে এত খরচা, তার দিকটাও ত দেখতে হবে। আর কটা দিন অন্তত না থাকলে এসে আর লাভ কি হ'ল এত কাণ্ড ক'রে?'

শ্যামা গুম্ খেয়ে যায়।

রাঘব ঘোষাল বলেন, 'মেয়ে তোমার ভালই আছে। এক যা ছেলে—তা ছেলের কথা যদি বলো, দুঃখীর ঘরে জন্মেছে, দুঃখ ত ভোগ করতেই হবে। এই

বয়সে ছেলে তোমার কী না করলে! এই কি আর ওর খেটে খাবার বয়স?'

শ্যামা সেদিন চুপ ক'রে গেলেও বেশীদিন চুপ ক'রে থাকে না, মধ্যে মধ্যেই তাগাদা—'মা, বাড়ি ফেরার কথা কি ভাবছেন?'

রাসমণি শেষ পর্যন্ত উত্যক্ত হয়েই ওঠেন। কিন্তু তবু যেতেও মন সরে না। বহুদিন পরে একটু শান্তির মুখ দেখেছেন। নীল স্বচ্ছসলিলা গঙ্গা—আর বিশ্বনাথ। জ্বালা জুড়োবার এই ত জায়গা। গঙ্গার জলে চোখের জল মিশে বিশ্বনাথের মাথায় পড়ে যখন, তখন সত্যিই প্রাণটা ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

'এক মাসের ভাড়া দেওয়া আছে যখন, তখন এ কটা দিন অন্তত থেকে যাই। আর না হয় বেশী দিন ভাড়া না-ই দিলুম।'

অগত্যা শ্যামাকে বিরস বদনে চুপ ক'রে থাকতে হয়।

অবশেষে একদিন আঁধারে একটুখানি আলো দেখতে পায় শ্যামা।

রাঘব ঘোষালই একদিন খাওয়াদাওয়ার পর তামাক ধরাতে ধরাতে প্রশ্ন করেন, 'তোর মেজ মেয়েটাকে একটু লেখাপড়া শোখাবি না মেজদি? বয়স কত হ'ল? চার না পাঁচ? নাকি ওকেও অমনি মুখ্যু ক'রে রেখে বিয়ে দিয়ে সেরে দিবি?'

'লেখাপড়া কোথায় শেখাব বামুনদাদা? ও বন-গাঁয়ে ওসব কথা কি কেউ শুনেছে? এক ঘরে পড়াতে পারি—নিজে যতটুকু জানি, কিন্তু তাই বা সময় কোথায় বলো?…দুঃখের পেছনে দড়ি দেব না ঐ করব?'

'তা বটে!'

হঠাৎ শ্যামা বলে বসে, 'আচ্ছা, ঐন্দ্রিলা উমির কাছেই দিনকতক থাক না মা—ও ত কত পরের মেয়েকে লেখাপড়া শেখাচ্ছে, নিজের বোনঝিকে একটু পড়াতে পারবে না?'

রাসমণি চমকে ওঠেন।

'উমির কাছে? ওর সময় কোথায়? বারোটায় যায় সন্ধ্যেয় ফেরে।'

'সে ত আরও ভালো মা—ঐ সময় আপনি একা থাকেন তবু হাত-নুড়কুৎ একটু কাছে থাকতে পারে। মেয়ের আমার বয়স কম বটে—কিন্তু দুঃখীর ঘরের মেয়ে, শান্ত আছে—অন্তত বায়না নিয়ে কাঁদবে না। তাছাড়া কাজকর্মও কিছু কিছু শিখেছে—আদর দেবার মত ত আমার অবস্থা নয়। আমার কাছে দু বছর বয়স থেকেই খাটতে শেখে।'

রাসমণি তবু চুপ ক'রে থাকেন। নতুন ক'রে ঝঞ্ঝাটে জড়াতে যেন ইচ্ছা করে না। আবার ভাবেন, সত্যিই উমাটা বড় একা, তবু একটা ছোট ছেলেমেয়ে কাছে থাকলে তাকে নিয়েও দু দণ্ড কাটে।

'কী বলেন মা ?'

'তোমার বাছা সব তাইতে তাড়া।' একটু বিরক্ত হয়ে ওঠেন রাসমণি, 'ভেবে দেখি। গিয়ে উমাকে বলি। তার মতামত নিয়ে হবে ত। ঝুঁকি ত তারই।'

শ্যামা নিশ্চিন্ত হয়। উমাকে রাজী করানো এমন কিছু কঠিন ব্যাপার হবে না। ঐন্দ্রিলা তার সুন্দরী মেয়ে—গর্ভের সেরা। কোনমতে আর তিনটে বছর কাটলেই বিয়ের সম্বন্ধ ক'রে ফেলতে হবে। ততদিন এঁদের মায়া পড়ে যাবে। এঁরাই কি আর ফেলতে পারবেন! বিয়ের খরচটা যেমন ক'রেই হোক টানবেন।

মনে মনে হিসাব করতে বসে সে · আরও কি কি সুবিধা হবে।

এখানে থাকা তার ফলে ক্রমে বেশী অসহ্য হয়ে ওঠে।

কমলার চিঠি এসেছে কদিন আগে। তাতে নরেনের খবর আছে, আর আছে শরতের খবর। শরৎ নাকি একজোড়া কাপড় পাঠিয়েছে উমার জন্যে। হয়তো এতদিনে উমার দিকে মন টেনেছে।...তা যদি হয়—উমা যদি স্বামীর ঘর করতে চলে যায় কোন অদূর ভবিষ্যতে—তার নিজেরই ছেলে-পুলে হ'তে শুরু হয়—তখন কি আর ঐন্দ্রিলাকে দেখবে সে! না শরৎ ওকে নিয়ে যেতেই দেবে!...নিজের অজ্ঞাতসারেই শঙ্কিত হয়ে ওঠে শ্যামা। তারই কপাল, নইলে এতদিন পরে ঠিক এই সময়েই শরৎ—

না না—ছিঃ ছিঃ! এ কি কথা ভাবছে সে! একসময় চমক ভেঙে দারুণ লজ্জিত হয়ে পড়ে নিজের স্বার্থপরতার জন্যে। উমা সুখী হোক। তার জন্যে কিছু নয়। তার কপালে যা আছে তা আছেই। তা ছাড়া এখনই কিছু সব হয়ে যাচ্ছে না। শরতের ন্যাওটোপনা করতে করতেও কোন্ না দু-একটা মাস কাটবে। ততদিনে উমার ত মায়া পড়ে যাবেই—চাই কি মায়েরও পড়তে পারে।

নরেন এসেছিল! কোথায় গেল কে জানে! আবার কবে আসবে ....জানলা দিয়ে ওপারে রামনগরের দিগন্ত-প্রসারিত ধূ-ধূ মাঠের দিকে চেয়ে স্বামীর কথা ভাবে শ্যামা।

চার

উমাকে রাজী করানোটা যত সহজ হবে ভেবেছিল শ্যামা, কলকাতায় ফিরে তার কাছে প্রস্তাবটা করতে দেখা গেল—কাজটা মোটেই তত সহজ নয়। উমা প্রথমটা বুঝতে পারে নি, শ্যামার মুখের দিকে বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে ছিল। দ্বিতীয়বার কথাটা বুঝিয়ে বলতে সে একবার ঘাড় তুলে মার মুখের দিকে তাকাল। সে মুখ ভাবলেশহীন—জপের মালা হাতে তিনি স্থির শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন

জানলাটার দিকে—অর্থাৎ কোন দিকেই মেয়েকে প্রভাবিত করতে চান না। সেদিক থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে একবার দিদির দিকেও তাকাল উমা, তারপর মাথা নিচু ক'রে আস্তে আস্তে বললে, 'তুমি আমাকে মাপ করো ভাই, সে আমি পারব না।'

শ্যামা আর যাই হোক এখন সাফ জবাব আশঙ্কা করে নি। সে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল বোনের দিকে।

'পারবি না? সে কি? কেন? ভালই ত হ'ত থাকলে'—বেশ কিছু সময় নিয়ে আস্তে আস্তে থেমে থেমে—কতকটা যেন অসংলগ্নভাবেই প্রশ্ন করে শ্যামা।

'আমার ভালটা আমাকেই দেখতে দাও তোমরা। সে আর কারুর পক্ষেই কোন দিন দেখা সম্ভব নয়।'

'কিন্তু কেন—তোর কি অসুবিধা হবে শুনি?' এতদিনের সমস্ত জল্পনা-কল্পনা এই ভাবে হঠাৎ তাসের বাড়ির মত ভেঙে পড়বে! আশাভঙ্গের ক্ষোভে তীক্ষ্ণ শোনায় শ্যামার কণ্ঠস্বর।

উমা বোধ হয় একটু কঠিন জবাবই দিতে যাচ্ছিল, হয়ত বলতে যাচ্ছিল যে 'সুবিধাই বা কি হবে?' কিংবা হয়ত বলতে যাচ্ছিল, 'আমার সুবিধা-অসুবিধা আমি বুঝব, তোমাকে কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি?' কিন্তু মুখ ফাঁক ক'রেও থেমে গেল সে। খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বললে, 'কি দরকার, ভগবান যখন ও ঝঞ্ঝাট আমাকে দেন নি, তখন মিছিমিছি পরের হাঙ্গামায় জড়িয়ে কি হবে?'

'ও কি তোর পর?' কমলাও যেন একটু বিরক্ত হয়ে ওঠে উমার এই রূঢ় প্রত্যাখ্যানে।

'নিজের সন্তান ত নয় দিদি। যত যত্নই করি সে ওরই সন্তান হয়ে থাকবে, তার ওপর আমার সত্যিকার অধিকার কোন কারণে কোনদিনই জন্মাবে না।'

'বেশ ত, তুই পুষ্যি নে ওকে।' শ্যামা সাগ্রহে বলে।

'তাতেও ঐ পুষ্যি শব্দটা লেগেই থাকবে চিরকাল। ওটা শুনলেই আমার ঘেন্না করে। না ছোড়দি, অশ্বত্থামার মত পিটুলি-গোলা খেয়ে দুধের স্বাদ আন্দাজ করার দরকার নেই আমার। সংসারের জন্যে ভগবান আমাকে পাঠান নি।'

এরপর সকলেই কিছুকাল চুপচাপ বসে থাকেন।

রাসমণির জপের মালা তেমনিই ঘোরে। তাঁর মুখ দেখে বোঝবার জো নেই তিনি কি চান।

খানিক পরে শ্যামা তার কৌশল বদলায়। ঈষৎ ক্ষুণ্নস্বরে বলে, 'আর কিছু নয়—লেখাপড়াটা একটু শিখত। মার কাছে থাকলে আদব-কায়দাগুলোও রপ্ত

হ'ত। সুন্দর মেয়ে, একটু লেখাপড়া শেখালে ভাল ঘরে পড়তে পারত—এই আর কি!'

কমলা এবার সোজাসুজি মাকে আক্রমণ করে, 'মা কি বলেন?'

রাসমণি শান্তভাবেই জবাব দেন, 'আমি কি বলব বাছা, আমার ত ও ধকল সহ্য করার শক্তি নেই যে আমি জোর ক'রে বলব রেখে যাও। যাকে করতে হবে সে নিজের সুবিধে-অসুবিধে বুঝবে—ওর মধ্যে আমার কথা বলা ঠিক নয়।'

কমলার মন ইতিমধ্যে গলেছে, সে একটু জেদ করার মতই বললে, 'কিন্তু মার কথাটাও তোর ভাবা উচিত উমি, তুই ত চার-পাঁচ ঘণ্টা বাইরে থাকিস্ —সে সময় এত বড় বাড়িতে উনি একা থাকেন। ওঁর ত ঐ শরীর। তবু মেয়েটা কাছে থাকলে একটু মাথায় বাতাস করতে পারে, এক ঘটি জল গড়িয়ে দিতে পারে!'

উমা উঠে দাঁড়ায় একেবারে, 'তোমাদের সকলের যখন ইচ্ছে তখন আর আমার মত নিচ্ছ কেন! বেশ, থাক ও। কিন্তু দিদি, মা নিজেই কতদিন বলেছেন, পরের বাছা নাচাবে হাসাবে, কাঁদাবে না। শাসন করার অধিকার না থাকলে ছেলেমেয়ে মানুষ করা যায় না।'

শ্যামা ব্যস্ত হয়ে ওঠে, 'শাসন তুই যা খুশি কর না। ওমা সে কি কথা—তুই ওকে কেটে দু'খানা ক'রে ফেললেও আমি কিছু বলব না।'

'তা হয় না ছোড়দি', দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই জবাব দেয় উমা, 'সে তুমিও জানো, আমিও জানি। বাজে কথা বলে লাভ কি! যত যত্নই করি সে কথা কেউ মনে রাখবে না, সামান্য যদি শাসন করি সেই দুর্নাম চিরকাল থাকবে। পরের সন্তান মানুষ করার ঐটুকু পুরস্কার! মা ত সামনেই বসে আছেন—ওঁরই মুখে এসব আমার শোনা। ওঁকেই জিজ্ঞাসা করো না।'

সে আর দাঁড়ায় না, ঘর থেকে বেরিয়ে যায় একেবারে।

এর পর হয়ত মেয়েকে নিয়ে যাওয়াই উচিত ছিল শ্যামার কিন্তু এতদিনের দারিদ্র্য তাকে যে সব মহৎ শিক্ষা দিয়েছে তার মধ্যে এইটি প্রধান: স্বার্থসিদ্ধি যেখানে উদ্দেশ্য—সেখানে চক্ষুলজ্জা করার কোন অবসর নেই। সে উমার সমস্ত খোঁচা নীরবে হজম ক'রে ঐন্দ্রিলাকে এখানেই রেখে গেল।

পাঁচ

একটানা দারিদ্র্যের মধ্যে শ্যামার দিন তেমনি একঘেয়ে ভাবেই কাটে। তেমনি প্রতিদিনের যুদ্ধ। পরের দিনের কথা ভেবে প্রায় প্রতি রাত্রেই তেমনি দুশ্চিন্তায়

কণ্টকিত থাকা।

হেম পড়াশুনো করে—নিয়মিত পুরুতগিরি করলে তার ইস্কুলে কামাই হয় অর্ধেক দিন। তাছাড়া সে ছেলেমানুষ, দশকর্মের কাজে অর্থাৎ বিয়ে-পৈতেতে তার ডাক পড়ে না। দুটো নিত্য সেবা আর লক্ষ্মীপুজো—ভরসা ত এই। ষষ্ঠীপুজো মনসাপুজোতেও ইদানীং ডাকছে কেউ কেউ। হয়ত আর দু-এক বছর গেলে সরস্বতী পুজোতেও ডাকবে। কিন্তু সে দূরের কথা। খন্দ লক্ষ্মীপুজো কি মনসা-পুজোতে কেউ কাপড় দেয় না। ষষ্ঠীপুজোতেও তাই—বড়জোর দেড়হাতি লাল গামছা। শুধু নৈবিদ্যির চাল, কাটা ফল, বাতাসা এই ত পাওনা। আর চার পয়সা, বড়জোর দুআনা দক্ষিণে। তাও পৌষ ভাদ্র চৈত্র—এ ছাড়া নয়। ষষ্ঠীপুজোটাই নিয়মিত ছাড়া আকস্মিকও হয় ছেলেপুলে হ'লে, তবে তাতে হেমকে কেউ ডাকে না। লক্ষ্মীপুজো মনসাপুজোটাই ভদ্রপাড়ায় প্রায় ঘর-ঘর হয়, এবং সেই সময়ই পড়ে পুরুতের টানাটানি।

সুতরাং দীর্ঘকালব্যাপী টানা উপবাসগুলো বন্ধ হয়েছে মাত্র, আর কিছুই হয় নি। উঞ্ছবৃত্তি তেমনিই চলেছে। তেমনি পাতা কুড়োনো, ফল চুরি। পিঁটকী প্রকাশ্যেই বলে, 'বাব্‌বা, বামুনদিদি এক মাস ছিল না—বাগানের দুটো ফলের মুখ দেখেছিলুম। আবার তোমার কাশী যাওয়ার দরকার হয় না—হ্যাঁ, বামুনদি?'

এসব কথায় কান দিতে গেলে চলে না—স্মিত-প্রসন্ন মুখে ও সপ্রতিভ ভাবেই 'তাই ত? তা আর নয়!' বলে, আর কথাটা পিঁটকীর তরফে নিছক ঠাট্টা এই ভাবে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে।

এর ভেতর আর একটি সন্তানও হয়েছে শ্যামার। সেই সময়টা কয়েকবার ঘন ঘন এসেছিল নরেন—মঙ্গলা ঠাকরুণ বলেন, ফল-টানে। কারণ শ্যামা অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার সংবাদটা শুনেই সেই যে সে অন্তর্হিত হয়েছে আর আসে নি। শুধু তাই নয়, বাসন-কোসন বেচেও হয়ত আঁতুড়টা তোলা যেত—কিন্তু সে উপায়ও রেখে যায় নি। শেষবার যাবার সময়—যা দু-একটা দানে বা সামাজিকে পাওয়া পেতলের বাসন ছিল—সমস্ত নিঃশেষ ক'রে নিয়ে গেছে! কতকগুলো পুরনো বাসন শিবপুর বাজারে ঝালাতে দেবার নাম ক'রে আগের দিন সরিয়েছিল, বাকী অর্ধেক অর্থাৎ নতুনগুলো শ্যামার স্নানে ও হেমের নিত্যসেবায় বেরিয়ে যাওয়ার অবসরে কখন নিয়ে সরে পড়েছে তা কেউই টের পায় নি। সে যে এই সামান্য পেতলের বাসন চুরি করবে, তা শ্যামা কল্পনাও করে নি, নইলে হয়ত সাবধান হ'ত।

তাও—সবই যে গেছে, এতটা বুঝতে পারে নি। কিন্তু মঙ্গলা এসব ব্যাপারে পাকা মানুষ, তিনি চোখের পলকে সবটা অনুমান ক'রে নিলেন, 'অ বামুনি, তোর

সেদিনের ফুটো বাসনগুলোর ঐ এক দুগ্‌গতি হয়েছে দেখ্‌গে যা। একদিনে অত হাঁড়ি কলসী সরাতে পারবে না ব'লেই সেদিন ঐসব কথা ব'লে অদ্ধেক সরিয়েছে।। ফন্দিটা কেমন খেলেছে! মিন্‌সে কম ফন্দবাজ! তা নইলে যে মানুষ সংসারের কুটি ভেঙে দুখানা করে না, সে এখান থেকে দেড়কোশ দুকোশ রাস্তা ভেঙে শিবপুর যাবে তোর ফাটা বাসন ঘাড়ে ক'রে সারাতে! ক্ষেপেছিস তুই!'

কথাটা ঠিকই। এখন সেটা শ্যামাও বুঝতে পারে। তখনই কথাটা বিশ্বাস করা বাতুলতা হয়েছে। এত গরজ নরেনের হবে সংসারের জন্যে যে ভাঙা ফুটো বাসন ঘাড়ে ক'রে যাবে শিবপুরের বাজারে। অথচ সেদিন যখন সে প্রস্তাবটা করেছিল তখন একটুও অসম্ভব শোনায় নি কথাটা, 'কবে রাং-ঝাল-ও'লা দয়া ক'রে আসবে সেই ভরসায় বসে থাকবি? তাছাড়া ও বেটারা ত গলাকাটা! দে বরং শিবপুরের বাজার থেকেই সারিয়ে আনি। কতক্ষণ আর লাগবে—যাবো আর আসবো।'

পয়সা বেশি চায় নি, 'গণ্ডা চার পসয়া দে এখন। বাকিটা পৈতে দেখিয়ে সেরে নেব।'

'পৈতে দেখিয়ে মানে—?'

'বেশি পয়সা চাইলে প্রথমটা বলব বামুনের ছেলের কাছ থেকে বেশি নিস নি বাবা, যা দিচ্ছি তাই নে। তাতে যদি না শোনে ত পৈতে ছিঁড়ে শাপ দেবার ভয় দেখাবো। তারপর পয়সা চাইবে এমন কার বুকের পাটা আছে ও বাজারে তাই শুনি! হিন্দু ত হিন্দু—পৈতে ছিঁড়ে মন্যি দেবে শুনলে মুসলমানরা সুদ্ধ ভয় পাবে!'

হা-হা ক'রে হেসেছিল নরেন—নিজের চতুরতায়।

শ্যামা আজও স্বামীকে বিশ্বাস করে, আশ্চর্য! বিশ্বাস ক'রেই চার আনা পয়সা খুঁজে-পেতে বার ক'রে দিয়েছিল। বড় ঘড়াটার জন্যে সবচেয়ে অসুবিধা হচ্ছিল—একেবারে একঘড়া জল আনলে নিশ্চিন্ত! নইল ছোট ঘড়ায় বার বাব জল আনতে কষ্ট হয়। যাওয়া-আসার মেহনত ত সমানই। একবারের কাজ তিনবারে করার সময়ই বা কৈ ওর!

এমন কি সন্ধ্যেবেলা যখন খালি হাতে ফিরে এল নরেন—তখনও এতটা সন্দেহ করে নি শ্যামা। ওকে ফিরে আসতে দেখেই সমস্ত সংশয় চলে গিয়েছিল মন থেকে। মুখেই বলেছিল, 'কৈ গো আমার বাসন কৈ? বেচে খেয়ে এলে নাকি?'

হা-হা ক'রে হেসেছিল নরেন তাতেও, 'বেড়ে বলেছিস ত! তোর ঐ ফুটো-ফাটা পেতলের বাসন গোচ্ছার—কে কিনবে তাই শুনি? কিনলেই বা ক পয়সা

হবে? তা নয়, আজ যে শিবপুর বাজারে বারোয়ারী—আজ কাল কেউ হাপর জ্বালবে না পরন্তু সক্কালবেলা ক'রে রাখবে বলেছে- যখন হোক গিয়ে নিয়ে আসব।'

শ্যামা আশ্বস্ত হয়েছিল।

সত্যিই ত, ঐ ত কটা চাদরের ঘড়া আর হাঁড়ি—কীই বা তার দাম! আর বেচে দিলে ফিরে আসবেই বা কেন, তাহলে ত ঐখান থেকেই পালাত!

তাই—পরের দিনের চুরিটা যখন একটু একটু ক'রে ধরা পড়ল তখনও তার সঙ্গে আগের দিনের ঘটনার কোন যোগযোগ দেখতে পায় নি শ্যামা। এখন মঙ্গলার কথাতেই সবটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

'এখন আঁতুড় তুলবি না বাসন কিনবি, কী করবি কর্!' এই বলে আর এক এক দলা দোক্তা মুখ-গহ্বরে ফেলে নিশ্চিন্ত হয়ে বেরিয়ে যান মঙ্গলা।

কিন্তু শ্যামা ঘুমোতে পারে না। চেয়েচিন্তে সামান্য হয়—পুরো খরচা ওঠে কি ক'রে?

অবশেষে মাকেই চিঠি লিখতে হয়েছিল। মা চিঠির উত্তর দেন নি, শুধু পাঁচটি টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, আর কমলা বোধ হয় মার কাছ থেকে শুনেই—গোপনে আর দুটি টাকা পাঠিয়েছিল।

'আহা—দিদিটারও যদি অবস্থা ভাল থাকত!' মনে মনে আক্ষেপ করে তাই শ্যামা—'বলে,আঁটকুড়ো যে হয় তার পৌত্তুরটি আগে মরে! আমারও হয়েছে তাই, যে দয়া করতে পারত তার সর্বনাশ আগেই হয়ে ব'সে রইল। শুধু আমাকে দুঃখ দেবেন ব'লেই ভগবান এই কাণ্ড করলেন।'

জীবনে সমস্ত দিক যখন এমনি দিক্‌চিহ্নহীন নৈরাশ্যের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন, ভবিষ্যতের কোন পথরেখা যখন কোন দিকে নেই, তখন অকস্মাৎ একটি সংবাদ শ্যামার কানে এসে পৌঁছল। ওর মনে হ'ল রাত্রির শেষ হয়েছে এবার, উষার স্বর্ণ-রেখা কুয়াশার ধূসর অনিশ্চিয়তাকে দ্বিখণ্ডিত ক'রে উজ্জ্বল পথের ইঙ্গিত দেবে।

শোনা গেল বার-দুই থার্ড ক্লাসে ফেল্‌ করবার ফলে অম্বিকাপদর ইস্কুলে যাওয়ার পর্ব শেষ হয়েছে, জামাই অভয়পদ ভাইকে নিজের অফিসে ঢুকিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ অম্বিকাপদ এখন রোজগেরে অফিসার বাবু!

এই ত পথ, সামনেই প্রসারিত। যে পথের শেষে প্রাচুর্য এবং নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রা।

অম্বিকাপদ অবশ্য হেমের চেয়ে তিন-চার বছরের বড়ই। কিন্তু তাতে কি, হেমও

ত ফোর্থ ক্লাসে পড়ছে। আর ক-টা মাস পরেই থার্ড ক্লাসে উঠবে। বিদ্যেতে ত এমন কোন তফাত নেই। অম্বিকাপদ যদি পারে সাহেবদের কাজ করতে হেম কেন পারবে না? হেম বরং বুদ্ধিমান আর চটপটে ঢের বেশী—অম্বিকাপদর চেয়ে।

জামাইকে একদিন ডেকে পাঠায় শ্যামা হেমকে দিয়েই। আজকাল বড় একটা জামাইকে সে ডাকে না, কারণ--জামাই এলেই একটা কিছু হাতে ক'রে আসে। সব রকমের জিনিসই, কখনও বা একটা লণ্ঠন (অফিস থেকে সরানো), কখনও বা দুটো আনাজ, কখনও বা খানিকটা কেরোসিন তেল। জিনিস যাই আসুক না কেন, সবটাই প্রয়োজনে লাগে—প্রয়োজন বুঝেই আনে জামাই—কিন্তু শ্যামার যেন কেমন লজ্জা করে। অভাব বুঝে জামাই সাহায্য করবে আর তাই হাত পেতে নিতে হবে, ছি! এখনও এটুকু আত্মসম্মানবোধ তার আছে।

জামাই এসে রান্নাঘরের দাওয়াতে পা ঝুলিয়ে বসল। হাতে একটা পুঁটুলি, তাতে দুটো নারকোল, খানিকটা ডেলা-পাকানো কেমন শক্ত গুড় (এ নাকি বড়বাজার অঞ্চলে পাওয়া যায়, আখের গুড়, গুড়ও ভালো—তবে একেবারে শুকনো ডেলা-পাকানো, এই যা। এ ওরা গোরুকে খেতে দেয়—এক পয়সা দু পয়সা সের) —তার সঙ্গে খানিকটা মোটা তার। হেমাকে উপলক্ষ ক'রে সংক্ষেপে শুধু বললে, 'তোমাদের কাপড় শুকুতে দেওয়ার অসুবিধে হয়—এই তার টাঙিয়ে দিয়ে যাবো বলে এনেছি—শোবার ঘরের জানলার সঙ্গে রান্নাঘরের চালের বাতায় দিব্যি টাঙানো যাবে।'

জামাইকে ডেকে পাঠিয়েছে—শ্যামা একটু জলখাবারের আয়োজনও ক'রে রেখেছিল; চারখানা চন্দ্রপুলি আর দুটো পাকা কলা জামাইয়ের সামনে দিয়ে একটু দূরে ঘোমটা টেনে বসল শ্যামা। এত বড় জামাইয়ের সঙ্গে মাথার কাপড় খুলে ভাল ক'রে কথা বলা যায় না, বড্ডই লজ্জা করে।

জামাই অভ্যাস-মত একটা কলা আর দুটো মিষ্টি খেয়ে বাকিটা সরিয়ে রাখলে। যাই কেন দাও না - অর্ধেকের বেশী সে খায় না। সেইটে হিসেব ক'রেই বেশী দিতে হয়।

অদ্ভুত মানুষটি। আজও যেন শ্যামা জামাইকে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। অমন রূপ—কখনও মাথা আঁচড়ায় না, কখনও দাড়ি কামায় না। গায়ে সেই এক জিনের কোট—হপ্তা অন্তর নিজে ক্ষারে কেচে নেয়। দশহাতি কাপড় পরলেও সর্বদা হাঁটুর ওপর গোটানো থাকে। বিয়ের পর দু-এক মাস অপেক্ষাকৃত একটু ভদ্র ভাবে আসা-যাওয়া করেছিল—তারপর থেকেই এই—এক বেশভূষা!

জলখাবার শেষ ক'রে অভয়পদ বার-দুই কেসে গলাটা সাফ ক'রে নিলে।

'আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন মা?'

ঘোমটার মধ্যে থেকে ফিসফিস ক'রে হলেও আজ ছেলেমেয়ে কাউকে উপলক্ষ না ধ'রে সোজাসুজিই জামাইয়ের সঙ্গে কথা বললে শ্যামা, 'বলছিলুম কি, আমাদের হেমের কোথাও একটা চাকরি-বাকরি হয় না? শুনলাম অম্বিকাপদকে কোথায় যেন ঢুকিয়ে দিয়েছ!'

একটু চুপ করে থেকে অভয় উত্তর দিলে, 'অম্বিকা ত যাহোক একটু লেখা-পড়া শিখেছে তাই ত ওকে কেরানীর চাকরিতেই ঢোকাতে পেরেছি। আমাদের এ কুলি-কামারীর কাজে আর জানাশোনা আপনার লোককে ঢোকাতে ইচ্ছা করে না।'

'কিন্তু বাবা', বেশ একটু গর্বের সঙ্গেই বললে শ্যামা, 'হেমও ত কিছু কম লেখাপড়া শেখে নি। ও-ও ফোর্থ ক্লাসে পড়ছে—ক-মাস পরেই থার্ড ক্লাসে উঠবে। এই ত আমাদের অক্ষয়বাবু খুব ভাল কি একটা চাকরি করেন উনি ত শুনেছি আরও কম পড়েছেন। অমন নাকি হয়?'

'আগে হ'ত—এখন আর অত সহজে হয় না। একটু ইংরিজি না বুঝলে সাহেবরা নিতে চায় না। এখন একটা পাস-করা ছেলেই যে গণ্ডা-গণ্ডা।—হেমের কত বয়স হ'ল?'

'তা হ'ল বৈকি। চোদ্দ চলছে।'

'সেও এক ফ্যাসাদ। অত অল্পবয়সী ছেলেকে সাহেবেরা কেরানীর টুলে বসাতে চায় না। আচ্ছা দেখি কি করতে পারি!'

সেদিন কোন আশ্বাস দিতে না পারলেও হপ্তা-তিনেক পরেই একদিন অভয়-পদ এসে হাজির হ'ল। 'বাবুর চাকরি কিছু খালি নেই—আর থাকলেও এতটুকু ছেলে, যে অফিসের কাজ কাকে বলে তাই জানে না, তাকে দিতে চাইছে না! একটা কাজ আছে 'রংকলে'—লেবেল আঁটার কাজ—মাত্র দশ টাকা মাইনে। দিতে চান ত দিতে পারেন। তবে একবার ঢুকে পড়লে চাই কি ওধারে কাজও শিখতে পারে—চোখকান খোলা রেখে অফিসের কাজ ব্যাপারটা কি যদি বুঝে নেয় ত, ওদিকেও চলে যাওয়া শক্ত হবে না। ওখানে আমার জানাশোনা লোক আছে, ভেতরে ঢুকলে একটা হিল্লে হতে পারবে। কী বলেন?'

একটু ক্ষুণ্ণই হ'ল শ্যামা। নিজের ভাইয়ের বেলা অফিসের কাজ ঠিকই পাওয়া গেল। বিদ্যে ত সমানই, বয়সে একটু বড় এই যা। তার জন্যেই ওর ছেলের

আর অফিসের চাকরি জুটল না? এসব ব্যাপারে শ্যামা অপর স্ত্রীলোকদের মত স্বাভাবিক ভাবেই অবুঝ। সে এমনও ভাবলে, তার ভাই যে হেমের চেয়ে এক 'কেলাস' অন্তত উঁচুতে পড়ত সেইটে বোঝাবার জন্যেই জামাই ইচ্ছে ক'রে ওকে অফিসের চাকরি দিলে না।

খানিকটা চুপ ক'রে থেকে শ্যামা বললে, 'সে জানি। ভাল চাকরি পাবার মত কি আর বরাত করে এসেছে ও! দুয়োর কড়ি হাটে যায়—কাপাস তুলো উড়ে যায়! লোকে ত যাচ্ছে আর চাকরি পাচ্ছে বাবা—আমার হেম কি আর পাবে? তাহলে আমার পেটে আসবে কেন?'

অভয়ের ভ্রূ দুটো একবার যেন নিমেষের জন্য কুঁচকে উঠল—কিন্তু সে সেই এক নিমেষই। শ্যামা তার আভাসও পেলে না।

সে-ও একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, 'তবে এটা থাক। আর একটু বেয়েচেয়ে দেখি না হয়।'

শ্যামা যেন একেবারে ব্যাকুল হয়ে উঠল, 'না না বাবা—তুমি ও বৃথা চেষ্টা করো না। সে কপাল ওর নয়। শেষে এটাও যাবে। যা পেয়েছ তুমি এখন তাইতেই ঢুকিয়ে দাও। আমি যে এধারে আর টানতে পারছি না!'

অভয় প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলে না। শাশুড়ীর মন্দভাগ্যজনিত আক্ষেপের কোন গূঢ়ার্থ সে বুঝল কি না, তাও তার আচরণের কোথাও প্রকাশ পেল না। কোনদিন কারও অভিমানে বিচলিত হবার মত স্বভাব ভগবান তাকে দেন নি। সে তার স্বাভাবিক শান্তকণ্ঠে শুধু বললে, 'কাল সকাল সাড়ে ছটার মধ্যে খাইয়ে ওকে তৈরী করে রাখবেন, আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবো।'

'সাড়ে ছটায় তৈরী থাকবে?—কিন্তু তাহলে নিত্য-সেবা?

'তার আগেই সেরে ফেলতে হবে। আটটায় হাজ্‌রে···পাকা দেড় ক্রোশ পথ—প্রথম দিন একটু আগে না গেলে চলবেও না। শুধু পৌছে দিলেই ত হবে না—কাজ শুরু হবার আগে সাহেবের সঙ্গে দেখা করাতে হবে। তাছাড়া আমার অফিস আছে—কাল বলে-কয়ে এক ঘণ্টা ছুটি করিয়ে এনেছি, নটার মধ্যে আমাকেও পৌছতে হবে।'

অভয়পদ আর দাঁড়াল না।

দেড় ক্রোশ পথ ভেঙে রোজ যাওয়া-আসা! আটটায় হাজ্‌রে—মোটে দশ টাকা মাইনে! মাত্র চোদ্দ বছরের ছেলে তার!

একবার মনটা কেমন করল শ্যামার। ভাবলে জামাইকে ডেকে বলে—দরকার নেই; কিন্তু পারলে না। আর পারে না সে—আর একা এই যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া

সম্ভব নয়।

মঙ্গলা শুনে বললেন, 'এ ত সুখবর লো বামুনি। চাকরিতে একবার কোথাও ঢুকে পড়তে পারলেই হ'ল, যেমন-তেমন চাকরি দুধভাত। আজ দশ আছে, কুড়ি হতে কদ্দিন? এইবার তোর বরাত খুলল, আর কি দেখছিস? সওয়া পাঁচ আনা পুজো মানসিক ক'রে রাখ, আঁতুল সিদ্ধেশ্বরী-তলায় দিয়ে আসিস প্রথম মাসের মাইনে পেলে। আর আমাদেরও ঠাকুরের কিছু পুজো দিস—বলতে গেলে ওঁর সেবা ক'রেই তোর হেমের এই উন্নতি।'

নিশ্চয়ই দেবে। ওরই মধ্যে থেকে একটা টাকা সরিয়ে সে সত্যনারায়ণও দেবে। দেবে বৈ কি! এঁদের দয়াতেই ত—

সারারাত সেদিন ঘুম হ'ল না শ্যামার। মন কত কি আশা করে—আবার আশঙ্কাও হয়, ওর যা কপাল, হয়ত কিছুই হবে না, কোন উন্নতিই হবে না হেমের। মনকে শাসন করে, অত স্বপ্ন দেখবার এখন থেকে দরকার নেই। ওর যা কপাল, পোড়া শোলমাছ ধুতে গেলেও পালিয়ে যাবে—শ্রীবৎস রাজার মত।

কিন্তু মন সে শাসন মানে না। এক সময় লক্ষ্য করে মন আবার কখন নিজেরই অজ্ঞাতে স্বর্ণ-স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। তারও বাড়ি হবে, নিজস্ব বাড়ি—জমি বাগান পুকুর। কারও লাঞ্ছনা, কারও মুখনাড়া সইতে হবে না। নিজের বাড়িতে নিজের সংসারে নিজে সর্বময়ী কর্ত্রী। বৌ নাতি নাতনী—ভরপুর সংসার।

আবার যখন চমক ভাঙে, নিজেরই কল্পনার বহরে নিজে লজ্জিত হয়। কোথায় কি তার নেই—এখন থেকে অত আশা ভাল নয়। কী আছে তার অদৃষ্টে কে জানে!

এমনি আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে সারারাত বসে কেটে যায় ওর। চারটের ভোঁ কানে যেতেই উঠে পড়ে ধড়মড়িয়ে। ছেলের অফিসের ভাত চাই, এখুনি রাঁধতে বসতে হবে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

এক

মহাশ্বেতা স্বামীকে প্রায়ই তাগাদা দেয়, 'মেজঠাকুরপোর বিয়ের কি করছ, হ্যাঁ গা?'

অভয়পদ নিদ্রালু অন্যমনস্কতার সঙ্গে উত্তর দেয়, 'হ্যাঁ—এই যে, এবার হবে।'

'রোজই ত বলো এবার হবে। কবে হবে? এই ত প্রায় বছর দেড়েক চাকরি করছে, আর কি? আমি যে আর পারি না। খেটে খেটে কি দশা হচ্ছে ত্যাখো দিকি!'

ও পক্ষ থেকে উত্তর আসে না। অভয়পদ ততক্ষণে গাঢ় ঘুমে অচেতন। প্রত্যহই এই রকম চলে। মহাশ্বেতার বিরক্তির অন্ত থাকে না, অথচ উপায়ই বা কি? দিনের বেলা টিকি দেখবার উপায় নেই লোকটার। অফিসে বেরোয় ত বলতে গেলে রাত থাকতে। শীতকালে সত্যিই রাত থাকে। একই অফিসে ত কাজ করে দু ভাই, কিন্তু হ'লে কি হবে—অম্বিকাপদ নাকি 'বাবু' তাই তার ন'টায় হাজ্‌রে আর অভয়পদ মিস্ত্রী তাই তার আটটায়। আবার অম্বিকাপদর আস্পদ্দা কত! বলে কি না, 'নেহাত কানে খারাপ শোনায় ব'লে বলি মিস্ত্রী, সাহেবরা ত কুলীই বলে! খাতায়-পত্তরে কুলীই লেখা আছে।' বাবু! আঠারো টাকা মাইনের বাবু! গা জ্বালা করে মহাশ্বেতার ওর বাবু-বাবু ভাব দেখলে। বাবুর ফরসা কামিজ চাই রোজ—আবার বলে চাদর নেব। যত জুলুম মহাশ্বেতার ওপরই ত—ক্ষার কেচে কেচে পাল্‌কা কন্‌কন্‌ করে, হাত তুলতে পারে না এক-একদিন। 'তাও ঐ এক বেয়াড়া মানুষ গ্যাখো না! উনসুনি ইস্টিশান থেকে গাড়ি হয়েছে আজকাল—এই পোন্‌ কোশ (পৌনে এক ক্রোশ) রাস্তা হেঁটে রেলগাড়ি চেপে গেলেই হয়—যেমন মেজ্‌ঠাকুরপো যায়—তা যাবে না। ঐ এক জেদ। হেঁটে যাবেন। এই কটা পয়সা না বাঁচালে আর চলে না। তাও যেদিন সাহেবরা দয়া ক'রে গাড়ি থামিয়ে তুলে নেয় সেদিন বাঁচোয়া—নইলে পুরো চারটি কোশ পথ হেঁটে যাওয়া আর ফেরা!'

গজগজ করে মহাশ্বেতা আপন মনেই।

কিন্তু অভয়পদর কানে তা পৌঁছয় না। রাত থাকতে যায় আর রাত্রে ফেরে। ছুটি বলতে এক রবিবার, কিন্তু সেদিনও কি মানুষটাকে হাতের কাছে পাবার জো আছে ছাই! কোথা থেকে যে যত রাজ্যের বাজে বাজে কাজ খুঁজে বার করে! কোথায় হয়ত বনবাদাড় সাফ করছে, নয়ত দেখ গে কাঠকুটো পাতালতা কুড়িয়ে পাহাড় করছে—মাটি-কাটা, বাগান করা ত আছেই। আজকাল আবার মাথায় ঢুকেছে রাজমিস্ত্রীর কাজ শিখে নিজের বাড়ি নিজেই করবে, সেইজন্যে ছুটি পেলেই কোথায় নতুন বাড়ি তৈরী হচ্ছে খুঁজে খুঁজে সেখানে গিয়ে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবে।...তাহলে মহাশ্বেতা তার কথাগুলো শোনায় কখন?

এমনি দিনের বেলায় স্বামীর সঙ্গে কথা কওয়ার হুকুম নেই যে গিয়ে প্রকাশ্যে কথা বলবে। আড়ালে-আব্‌ডালে পেলেও না হয় চট্‌ ক'রে দু-একটা কথা কয়ে নিতে পারে। 'তা-ও পোড়ার মানুষ কি সেই পাত্তর?'

এক সময় রাত্রিতে! কিন্তু যত তাড়াতাড়িই করুক না কেন, অভয়পদর শুতে আসবার অন্তত দেড়টি ঘণ্টা পরে না হ'লে মহাশ্বেতার ছুটি মেলে না। ওরা দু'ভাই একসঙ্গেই প্রায় খেতে বসে, সে ত পাঁচ মিনিট—তারপর সেই পাতে বসবে কুঁচোরা

— ছোট দেওর আর ননদ। তারা ফেলে-ছড়িয়ে ঝগড়া ক'রে খাবে প্রায় আধঘণ্টা ধরে। তারপর খাবে মহাশ্বেতা। যত রাজ্যের পাতে-পড়েথাকা ভাত কুড়িয়ে জড়ো ক'রে খেতে হয় ওকে। ভাত ফেলার হুকুম নেই। এর ওপর পান্তাভাত খাওয়া আছে। শাশুড়ীর হুকুম, 'গেরস্তবাড়িতে মাপ মতো ভাত নিতে নেই মা। কে কখন আসে ভিখিরী অতিথ,—তা কি বলা যায়? দুপুরবেলা এসে দুটো ভাত পাবে না, সে ভারি লজ্জার কথা। একেবারে পেট মেপে চাল নেয় যারা—তাদের হ'ল গে ডেয়ো-ডোক্‌লার ঘরকন্না। ওতে গেরস্তর ইজ্জত থাকে না—লক্ষ্মীও থাকে না।...নাও না দু মুঠো ভাত বেশী, ফেলা ত যাবে না। না হয় জল দেওয়া থাকবে—তুমি আমি ত আছিই।'

অবশ্য ভিখিরী আসে প্রায়ই। আর এ বাড়ির এক অদ্ভুত নিয়ম, মুঠো ক'রে চাল দেওয়ার রেওয়াজ নেই—একেবারে পাত পেতে ভাত ঢেলে দিতে হবে তাদের সামনে। তারাও জেনে গেছে, যার যেদিন ভাত খাবার দরকার ঠিক দুপুরবেলা এসে হাজির হয়। যেদিন আসে কেউ সেদিনটাই বাঁচোয়া—নইলে সেই বাড়তি ভাতে জল দেওয়া থাকে, রাত্রে সেইগুলি খেতে হয় মহাশ্বেতাকে। অবশ্য বাড়তি থাকলে শাশুড়ীও খান, কিন্তু তিনি ত খান একবেলা, দুপুরবেলা মাত্র—তাতে আর কত ভাত খাবেন তিনি? তবে আউতি-জাউতিও আছে। পাড়াগাঁয়ে ভাত রাঁধার সময় হিসেব ক'রে কেউ কুটুমবাড়ি যায় না। উঠোনে ঢুকেই হাঁক দেয়, 'দাও গো—কাঠের উনুনটায় চারটি ভাতেভাত চড়িয়ে।' পাতা-লতা সব বাড়িতেই আছে, উনুনেরও অভাব নেই। কাউকে বিব্রত করা হবে একথা ভাবে না কেউ। আর সেইটেই রক্ষা—মহাশ্বেতার কাছে।

সে যাই হোক, পাতকুড়োনো পান্তা—যাই জুটুক, মহাশ্বেতার আজকাল গা সওয়া হয়ে গেছে—শুধু যদি একটু আগে ছুটি পেত! সবাইকার খাওয়া যখন শেষ হবে তখন শাশুড়ী হুকুম করবেন, 'আমাকে অম্‌নি মুঠো-খানেক মুড়ি দিও গো বৌমা।'

কিছুতেই আগে বলবেন না। কতদিন মহাশ্বেতা সেধে বলেছে—নিজে খেতে বসবার আগেই—'ও মা, আপনাকে খেতে দিই কিছু?'

'দাঁড়াও বাছা, খাবো কি না তাই এখনও বুঝতে পাচ্ছি না। পোড়ার পেটে কিছু না দিলে নয় তাই। মুখে কি কিছু যেতে চায়?'

অথচ প্রত্যহই খান তিনি। সন্ধ্যা-আহ্নিক শেষ ক'রে সেই যে থুম্‌ হয়ে রান্না-ঘরের দাওয়ায় বসেন—একবারও নড়েন না। হাতে একটা জপের মালা থাকে ঠিকই কিন্তু ইষ্টনামের চেয়ে রসনায় সুখাদ্যের তালিকাই বেশি উচ্চারিত হ'তে

থাকে। তাঁর বাপের বাড়ির অবস্থা ভাল ছিল, প্রথম বয়সে তিনি অনেক ভাল ভাল খাবার খেয়েছেন—সেই সব গল্প প্রত্যহই তাঁর করা চাই। এর ভেতর ছেলেরা এসে শেতল দেয়, একে একে খেতে বসে। তাদের সঙ্গে চলে গল্প, তারা করে তাদের অফিসের গল্প, উনি কিছু বোঝেন কিনা বোঝা না গেলেও—শোনেন খুব মন দিয়ে। কিন্তু তখনও উনি বুঝতে পারেন না, তাঁর রাত্রে কিছু খাবার দরকার হবে কি না।

একেবারে মহাশ্বেতার খাওয়া হয়ে গেলে তবে ফরমাশ হবে। তখন মুড়ি মেখে দিতে হবে তেল-নুন দিয়ে, তার সঙ্গে উঠোনের শসা থাকলে তা কুঁচিয়ে দিতে হবে—নইলে বসতে হবে নারকোল কুরতে। মুড়ি থাকে কম দিনই—যত রাজ্যের ক্ষুদ ভেজে রাখেন, ওরই মধ্যে বড় গোছের ক্ষুদ ভাজা তেল-নুন মেখে খাওয়া চলে, ছোটগুলো আবার গুঁড়িয়ে গুড় দিয়ে মেখে দিতে হয়। তা হোক—তাতে মহাশ্বেতার আপত্তি নেই। কিন্তু সে শুধু ভাবে—একটু আগে বললে কি হয়? এঁটো বাসন বড়ঘরের তক্তাপোশের নিচে জড়ো করা থাকে, সেখানে রেখে এসে রান্নাঘর ধুয়ে মুছে, পরের দিনের ভাত চড়াবার সব যোগাড় ক'রে রেখে যায় চাল পর্যন্ত ধুয়ে সব কাজ শেষ ক'রে সে এসে বসে শাশুড়ীর সামনে। তখনও চলে তাঁর মুড়ি খাওয়া কুড়ুর কুড়ুর ক'রে। তাও শুধু খেতে আর কত সময় লাগত? গল্পই বেশি। সেই তাঁর শৈশব ও কৈশোরের কাহিনী, তাঁর জগৎ যেখানে থেমে আছে চিরকালের মত।

'কলকাতা বৌমা, শুনতেই শহর! বলি ঐ ত শ্যামপুকুরে—ওখানে এখনও বাঘ বেরোয়!'

'কৈ, তেমন ত কখনও শুনি নি মা।'

'কে জানে বাছা কেন শোন নি, আমার আইবুড়ো বেলায় দু-দুটো বাঘ মারা হয়েছিল।'

'সে ত অনেক দিনের কথা মা।'

'এমন কি আর অনেকদিন বাছা, আমি কি আর আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ী!' বিরক্ত কণ্ঠেই উত্তর দেন শাশুড়ী।

ভয়ে ভয়ে চুপ ক'রে যায় মহাশ্বেতা। হয়ত কোনদিন বলেন, 'ডাক বৌমা ঘোড়ার গাড়িতে যায়। ছ' কোশ সাত কোশ দূরে দূরে আস্তাবল আছে, তাকেই বলে ডাকখানা, সেইখানেই ঘোড়া বদল হয়, নতুন ঘোড়া জুড়ে আবার গাড়ি চলে। ওকে বলে ডাক বদল করা। ঐ ডাকখানাতেই চিঠি-পত্তর ওঠে নামে। বড় বড় লোক রাজা-মহারাজারাও অমনি ঘোড়ার ডাক বদল ক'রে দেশ-বিদেশে ঘোরে।'

তন্দ্রালু চোখ দুটি যতদূর সম্ভব বিস্ফারিত ক'রে তাকিয়ে থাকে মহাশ্বেতা। হয়ত কোনদিন প্রতিবাদ ক'রে বলে, 'কিন্তু আমি ত শুনেছি মা ডাক এখন রেল-গাড়িতে যায়।'

দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ করেন শাশুড়ী, 'আমি বাবার মুখে কতদিন এ গল্প শুনেছি! তিনি মিছে কথা বলতেন ?'

'ওমা, সে অনেক দিন আগে বোধ হয়—তাই যেতো।'

'অ বৌমা—কি তোমার বুদ্ধি বাছা! সরকারী নিয়ম বুঝি ক্ষ্যাণে ক্ষ্যাণে বদলায়! তখন এক রকম যেতো আর এখন এক রকম যায়—তাই কি হয় মা? অমন কথা আর কাউকে বলো না, শুনলে লোকে হাসবে'

এই চলে বহু রাত্রি পর্যন্ত, কত রাত্রি তা জানে না মহাশ্বেতা—শুধু এইটুকু জানে যে শাশুড়ীর খাওয়া যখন শেষ হয়—তখন নিষুতি রাত থম্‌থম্‌ করে। পাড়া ঘরে জনপ্রাণীর সাড়া নেই, হয়ত কেউ জেগে থাকে কিন্তু তাদের অস্তিত্ব বোঝবার কোন উপায় নেই—না সাড়ায় না আলোয়। কেবল যেদিন টগরের বাবা মদ খেয়ে এসে চেঁচামেচি করে আর ওর মা কাঁদে—সেদিন যা পাড়া সরগরম থাকে। কিন্তু মাতাল শব্দটা শুনলেই চিরদিন মহাশ্বেতার হাত-পা পাথর হয়ে আসে ভয়ে—এখানে এই এত কাছে মাতলামির শব্দে বুকের মধ্যে গুরগুর করতে থাকে। তার চেয়ে মনে হয় ওর, অন্ধকার ঝিঁঝিঁ-ডাকা জোনাকি-জ্বলা নিস্তব্ধ রাত ঢের ভাল।

শাশুড়ীর খাওয়া হ'লে তাকে সব পেড়ে-ঝেড়ে রান্নাঘরে তালা দিয়ে গিয়ে নিয়ম মত শাশুড়ীর শয়নকক্ষে বসতে হয়। শাশুড়ী পিদিমের আলোয় হাতড়ে হাতড়ে পান সাজেন, ছেলেমেয়েরা কে কি ভাবে শুয়েছে দেখে তাদের সরিয়ে শোয়ান, তারপর বধূর দিকে ফিরে সস্নেহে বলেন, 'যাও বৌমা, তুমি শুয়ে পড় গে—আর রাত করছ কেন মা? ছেলেমানুষ ঢুলে ঢুলে পড়ছ। যাও—আমার এখন আর ত কিছু দরকার নেই।'

তবে ছুটি পায় মহাশ্বেতা। কিন্তু ততক্ষণে অভয়পদ অন্য এক রাজ্যে চলে যায়। তাকে বিশেষ দোষ দেওয়াও যায় না। ভোরে যে বিছানা ছাড়ে সে, একেবারে রাত্রে শুতে যায়, এর ভিতর বিশ্রাম ব'লে কোন শব্দ ওর জানা নেই। শোওয়া ত দূরের কথা, বসতেই পায় না।

মহাশ্বেতার কিন্তু প্রতিদিনই এই সময়টায় রাগ ধরে। এক-একদিন দুঃখে কান্না আসে ওর। শাশুড়ীর মুণ্ডুপাত করে মনে মনে, 'রাক্ষুসী ডাইনি! পিণ্ডি গিলবে ঠিক জানে, তবু আগে গিলবে না!'

দড়াম্‌ ক'রে কপাট বন্ধ করে সে। ও ঘর থেকে শাশুড়ী প্রত্যহই বলেন, আস্তে,

বৌমা, আস্তে। ভয় পেলে নাকি ?...অমন করলে কাঠের দোর আর ক'দিন টিকবে বাছা ?' কিন্তু সেওঘর থেকেই—পরের দিন সকালে আর তাঁর মনে কিছু থাকে না। মহাশ্বেতাও তাই ভয় করে না। দুম্ দুম্ ক'রে চলে সে, অকারণে বাক্স-পেঁটরার আওয়াজ তোলে, তাতেও যখন অভয়ের ঘুম ভাঙে না, তখন বিছানায় শুয়ে পা টিপতে বসে।

এইবার একটু হয়ত চৈতন্য হয়। জড়িত কণ্ঠে বলে, 'কে ও ? ও—বড় বৌ ! এসো এসো, শুয়ে পড়ো। আমার পা-টিপতে হবে না—রাত ঢের হয়েছে।'

এইটুকু চেতনার অবকাশ নিয়েই মহাশ্বেতা দুটো একটা কথা বলতে যায়—নিতান্ত থাকতে পারে না তাই, কিন্তু একটু পরেই নিজের নির্বুদ্ধিতা নিজের কাছে ধরা পড়ে, তখন চুপ ক'রে যায়। যেদিন খুব রাগ হয় সেদিন অভয়ের কাঁধে এক ধাক্কা দেয়, 'আচ্ছা মানুষ বটে, শুলো তো আর সাড় নেই ! এর চেয়ে পাথরের সঙ্গে ঘর করাও ভাল !'

তখন হয়ত চোখ মেলে চায়। দুটো-একটা কথাও বলে, একটু বা আদরও করে। সেইদিন হয়ত নিজের বক্তব্য শোনানোও যায়, সংক্ষেপে তার উত্তরও মেলে। তবে সে দৈবাৎ। বেশির ভাগ দিনই নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে আপনমনে আপ্সায় সে। তারও পরিশ্রম কম হয় না সারাদিন, তবু যেন ঘুম আসতে চায় না সহজে। অন্তরের ক্ষোভ-রোষ-অভিমান আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিটি ব্যর্থ রাত্রির বেদনায় তাকে উত্তেজিত ও উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে তোলে। কেবল যখন নিশীথ রাত্রের স্তব্ধতার মধ্যে বিনা বাতাসেই বাঁশঝাড়ের মধ্যে পাকা বাঁশের গা-নাড়বার শব্দ ওঠে কট্‌কট্ ক'রে, তখন ভয় পেয়ে শিউরে উঠে স্বামীকে জড়িয়ে ধরে তার দেহের খাঁজে মুখটা চেপে ধরে। দেখতে দেখতে দু'চোখে তন্দ্রাও নেমে আসতে তখন দেরি হয় না। স্বামীর দেহের সংস্পর্শে ও গন্ধে—সমস্ত বেদনা-অভিমান ধুয়ে-মুছে গিয়ে আশা ও আশ্বাসে ওর নবীন বয়সের কোরক-প্রাণ যেন নতুন ক'রে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে।

দুই

এমনিই একদিন দুর্লভ মুহূর্তে, অভয়পদর পূর্ণ চেতনার অবকাশে উত্তর মিলল মহাশ্বেতার প্রশ্নের, 'দাঁড়াও আর একটা ঘর করি—নইলে খোকা শোবে কোথায় ?'

ভাইকে এখনও অভয় মধ্যে মধ্যে খোকা বলে ডাকে।

উৎসাহের দীপশিখা যেন এক ফুঁয়ে নিভে যায় মহাশ্বেতার, 'ওমা—ঘর করবে, তবে বিয়ে দেবে মেজ্‌ঠাকুরপোর ! সে ত ঢের দেরি ! তা'হলেই বিয়ে হয়েছে !'

'না, দেরি আর নেই। গ্যাখো না, শীগ্‌গিরই আরম্ভ করছি। খোকার টাকায় ত আমি হাত দিই না, ওটা ওর কাছেই জমছে। ঐতেই ঘরটা ক'রে নেব।'

মহাশ্বেতার অগাধ বিশ্বাস ওর স্বামীর ওপর, তবু সে একটু হতাশ হয়, আপন মনেই বলে, 'দূর! সে ঢের দেরি।'

সত্যিই কিন্তু লোকটা মাস-কতকের মধ্যেই আরম্ভ করলে। আর সবই কি অদ্ভুত মানুষটার! লোকে মিস্ত্রী ডাকে, যোগাড়ে ডাকে, বাড়ি করায়। অভয়পদ সে ধার দিয়েও গেল না। জন বা মজুর লাগল ওর দিন-কতক মাত্র, ভিত্‌ খোঁড়া এবং ভিতে খোয়া-পেটার জন্যে,—তাও রবিবার দেখেই করাতো, যাতে নিজেও তাদের সঙ্গে লাগতে পারে—তারপর যা কাজ, করত সম্পূর্ণ একা। অফিস থেকে ফিরেই পাঁচি-ধুতি একখানা পরে লাগত দেওয়াল গাঁথতে। মশলার তাগাড় ক'রে রাখত নিজেই, ইটও আগে থাকতে বয়ে এনে সাজিয়ে রাখত হাতের কাছে, তারপর লেগে যেত গাঁথুনির কাজে। শুধু মশলা ফুরোলে অম্বিকা খালি কড়াটা নিয়ে গিয়ে তাগাড় থেকে খানিকটা তুলে এনে দিত।

প্রথমটা মহাশ্বেতার হাসি পেয়েছিল, লোকটা কি পাগল! অবশ্য অনেক কিছু জানে মানুষটা, কিন্তু তাই বলে ঘর গাঁথবে মিস্ত্রীদের মত!

'হি-হি, তুমি যেন কি! মিছিমিছি পয়সা অপ্‌চ!'

খুব হেসেছিল সে।

কিন্তু তারপরই বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে দেখল দেওয়াল ত বেশ উঠছে একটু একটু ক'রে! যেমন অন্যদের বাড়িতে ওঠে প্রায় তেমনি!

একদিন কাজের ফাঁকেই স্বামীর কাছে গিয়ে ফিসফিস ক'রে বললে, 'হ্যাঁগো —এ ত ঠিক গ্যালের মতই দেখতে লাগছে!'

কর্ণিকটা একটু থামিয়ে হাতের উল্‌টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছে অভয়পদ মুচকি হেসে বলেছিল, 'তবে তুমি কি ভেবেছিলে ইঁটের গাঁথুনিটা বাঁশের বেড়ার মত হবে?'

অপ্রতিভ ভাবে মহাশ্বেতা উত্তর দিয়েছিল, 'না, তাই বলচি।'

অফিস থেকে 'না-ব'লে-আনা' ভারি ভারি কর্নিক, সাবল, কোদাল—কেমন অনায়াসেই না চলে ওর হাতে! অবাক হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে মহাশ্বেতা। পিছন থেকে ঘোমটার আড়াল দিয়ে লক্ষ্য করে, সেই সব ভারি ভারি জিনিস চালানোর সময় ওর প্রশান্ত সুগৌর পিঠের পরিপুষ্ট পেশীগুলো কেমন ফুলে ফুলে উঠছে, আবার পরক্ষণেই মিলিয়ে যাচ্ছে। সুন্দর কপালে ও গলায় ঘামগুলোও যেন কেমন ভাল দেখায়।

না, লোকটা সুন্দর দেখতে তাতে কোন সন্দেহই নেই! আপন মনেই স্বীকার করে মহাশ্বেতা। মাঝে মাঝে ভাবে দাড়িটা না থাকলে হয়ত আরও ভাল হ'ত —আবার এক এক সময় মনে হয় অত ফরসা রঙের সঙ্গে কালো কুচকুচে দাড়ি ভালই মানিয়েছে!

ঘুমন্ত স্বামীকে পিঠে হাত দিয়ে প্রশ্ন করে, 'হ্যাঁ গা, গা-হাত-পা একটু টিপে দেব? যা খাটুনি—গা-গতরে ব্যথা হচ্ছে ত খুব?'

জড়িত কণ্ঠে অভয়পদ বলে, 'না না, তোমাকে আর এই এত রাত্তিরে গা টিপতে বসতে হবে না। তুমি শুয়ে পড়ো!'

কতকটা লজ্জায়, কতকটা ভয়ে ভয়ে পিছন থেকে খুব সন্তর্পণে আলতো ভাবে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়ে মহাশ্বেতা।

'ওর কাছে আমি কতটুকু! মাগো!'

শেষের দিকে দিন-কয়েকের জন্যে একটা মিস্ত্রীও ডাকতে হ'ল, জনও লাগল গোটা-দুই। কিন্তু ঘর সত্যিই এক সময় শেষ হয়ে গেল। পাড়ার লোকে বলা-বলি করতে লাগল, 'এদের আবার বরাত ফিরল! যাই বলো বাপু, বৌটারও পয় আছে।'

কথাটা শুনে মহাশ্বেতার বুক ফুলে ওঠে গর্বে।

ঘরে যেদিন কলি ফেরানো পর্যন্ত শেষ হয়ে গেল, সেদিন মহাশ্বেতা এদিক-ওদিক দেখে টিপ্ ক'রে এক প্রণাম করে স্বামীকে।

'ও আবার কি?'

'না বাপু, তোমার ক্ষ্যামতা আছে।'

কিন্তু রাগও কম হয় না। শাশুড়ী নিজেই বললেন, 'এত করে খেটেখুটে ঘরটা করলি, ওটাতে তুই থাক। অম্বিকে বরং এই ছোট ঘরটায় শুক এখন—'

উনি বাবু উদারভাবে বললেন, 'না না—আমি বেশ আছি, অম্বিকেই শুক ও ঘরে। আমার কিছু দরকার নেই।'

'কেন রে বাপু, এত আদিখ্যেতার দরকার কি? বলি সন্নিসী ত নই। আমিই ত বড়, আমারই ত আগে পাওনা—। যার বিচ্ছিরি হয়, তার সব বিচ্ছিরি!'

পুকুরঘাটে বাসন মাজতে গিয়ে বোধ হয় নির্জন পুকুরে মাছগুলোকেই শোনায় সে।

আবার, এতদিন টাকা এনে শাশুড়ীর হাতেই দিত, ক-মাস থেকে আদর করে ভাইয়ের হাতে এনে দেওয়া হচ্ছে—'তুই-ই সংসার চালা। ওসব ঝঞ্ঝাটে আমি

থাকতে চাই না। তোর ত শেখা দরকার। মা আর কদিন এসব ঝামেলা পোয়াবে ?'

'কেন ? মার পরে ত আমিই বাড়ির গিন্নী, আমাকে দাও না ?'

বলেও ছিল একদিন মুখ ফুটে। তার জবাব এল, 'তবেই হয়েছে ! একে ছেলে-মানুষ, তায় লেখাপড়া জানো না, তুমি কি হিসেব রাখবে ?'

সর্বাঙ্গ জ্বালা করে না কথাগুলো শুনলে ? ওঁর মা-ই বড় লেখাপড়া জানেন ! তিনি কি ক'রে এতকাল সংসার চালিয়ে এলেন ?

কিন্তু রাগ করাও বৃথা। যাকে দরকারী কথাই শোনানো যায় না, তার সঙ্গে ঝগড়া করার ফুরসুত কোথা ? তারপর এই ধরনের কথা বলতে গেলেই যে কুলুপ এঁটে মুখ বন্ধ করে, আর মাথা খুঁড়লেও মুখ খোলানো যায় না। যেন পাথরের মানুষ।

মনের জ্বালা ক্রমশ জুড়িয়ে যায় মহাশ্বেতার। কেবল সে ঐ নতুন ঘরখানার দিকে কিছুতেই ভাল ক'রে তাকাতে পারে না।

তিন

অম্বিকার বিয়ে ঠিক হ'ল ওদেরই এক বহু দূর-সম্পর্কের ভাগ্নীর সঙ্গে। সম্পর্ক থাকলেও এত দূর যে তাতে বিয়ে আটকায় না। এখন ত নয়ই—তখনও আটকাত না।

এগারো-বছরের ফুটফুটে মেয়ে—নাম প্রমীলা। একশ এক টাকা নগদ, দানের বাসন আর চেলির জোড় এই পাওনা হ'ল ছেলের। উলুবেড়ে থেকে নেমে দেড় ক্রোশ গেলে তবে ওদের বাড়ি। অম্বিকা একটু গজগজ করলে আড়ালে, 'খুব বে হচ্ছে বাবা, শ্বশুরবাড়ি যেতে গেলে চালচিঁড়ে বেঁধে যেতে হবে ! ঠ্যাঙের ওপর কাপড় তুলে আল্ ধরে আগে তিন কোশ হাঁটো—তবে শ্বশুরবাড়ি পৌছবে ! দাদাটা যেন কি—একটু যদি বুদ্ধি-বিবেচনা আছে !'

প্রায় মহাশ্বেতারই বয়সী কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশী সাহস প্রমীলার। অত ছেলেবেলা থেকে আসার জন্যেই হোক আর বরাবরই একটু ভীরুপ্রকৃতির বলেই হোক, এখনও মহাশ্বেতা শাশুড়ীর সামনে ভরসা করে যেসব কথা বলতে পারে না, প্রমীলা তা বলে দেয় অনায়াসে। একটু ডানপিটেও আছে। বিয়ের কনে এসেই একদিন গাছে চড়েছিল। সাঁতার কাটতেও ওস্তাদ। জায়ের অকর্মণ্যতায় সে হেসেই খুন, 'ওমা দিদি, তুমি সাঁতার জানো না ! এসো তোমাকে শিখিয়ে দিই,

না না—ভয় কি, আচ্ছা এই ঘড়াটা উপুড় করো—এই ছাখো, ভাসছে ত, এবার এর ওপর বুক দিয়ে হাত-পা ছেড়ে দাও। ভয় কি, আমি ত আছি!'

কিন্তু মহাশ্বেতা ভয়ে কাঁদো-কাঁদো, 'না ভাই, ও আমি পারব না। না না, তোমার পায়ে পড়ি—আমার বড্ড ভয় করছে।'

হেসে চপল লঘু হাতে এক ঝলক জল ওর চোখে ছুঁড়ে মেরে প্রমীলা বলেছিল, 'আলগোছ-লতা একেবার! আচ্ছা থাক—আজ প্রথম দিনটা। তোমায় কিন্তু আমি সাঁতার শিখিয়ে তবে ছাড়বো। দেখে নিও।'

উৎসব-বাড়ির সমারোহ শেষ হয়ে আসতেই এ বাড়ির স্বাভাবিক জীবনযাত্রা যখন একটু একটু প্রকাশিত হল, তখন প্রমীলা গেল অবাক হয়ে!

'ও দিদি, এই পুঁইয়ের খাড়া দিয়ে ভাত ঠেলতে হবে দুবেলা? ওমা, এরা কি তরকারি-পাতি খায় না? মাছ কৈ?'

'তবেই হয়েছে! মাছ? একটু আনাজ পেলে বেঁচে যেতুম! এ বাড়ির ধারা ঐ। আনাজ যা, তা পুরুষের পাতে পড়ে, আমাদের বেলা ঢু-ঢু। ছাখো ছাখো—এই ত সবে শুরু, দিনকতক যাক—বুঝতে পারবে!'

বিজ্ঞের মত ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে বলে মহাশ্বেতা।

'বয়ে গেছে! আমি এই দিয়ে খাচ্ছি! আমাকে তুমি তাই পেয়েছ কিনা? এসব আমি ঢিট ক'রে দিচ্ছি ছাখো না!'

পরের দিনই পুকুরে নাইতে নেমে প্রমীলা প্রস্তাব করলে, 'ও দিদি, গামছার ঐ খুঁটটা ধরো ত ভাল ক'রে!'

'কি হবে মেজ-বৌ?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করে মহাশ্বেতা।

'মাছ ধরবো। দেখছ না কত মৌরলা মাছ ঝাঁক বেঁধে বেড়াচ্ছে?'

'ওমা, গামছা দিয়ে মাছ ধরবি! দূর, তাই কখনও হয়?'

'তুমি ছাখো না ধরতে পারি কি না। দুটো-চারটে ঠিক ধরব। ওদের ত গেলা শেষ হয়ে গেছে। বাকী তুমি আর আমি! দুটো-চারটে মাছ ধরতে পারলেই তুলে নিয়ে গিয়ে বাটি-চচ্চড়ি বসিয়ে দেব। নইলে কি না খেয়ে মরব নাকি? তোমার মত ভাই আঙুল ঠেলে ভাত খেতে আমি পারব না!'

সত্যি-সত্যিই বার-কতক চেষ্টা করতে করতে মুঠোখানেক মাছ ধরলে প্রমীলা। মাছগুলো কচুপাতায় মুড়ে পুকুরপাড়ে একটা ইট চাপা দিয়ে রেখে প্রমীলা নিশ্চিন্ত হয়ে স্নান করতে নামে। তার স্নান করাও কম নয়—অন্তত পক্ষে বার-চারেক এপার ওপার। দুঃসাহসিনীর অসমসাহসিকতার দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকে মহাশ্বেতা আর ভেতরে ভেতরে ভয়ে শুকিয়ে ওঠে।

'বাটি ক'রে মাছ চাপাবে মেজ-বৌ, মা যদি কিছু বলেন!'

'ওমা—কী বলবেন? আচ্ছা, সে আমি দেখছি—'

বাড়িতে ঢুকে প্রমীলা নিজেই গিয়ে শাশুড়ীকে বললে, 'আজ গোটাকতক মাছ পেয়েছি মা গামছা-ছাঁকায়—সামান্যই। আর রান্নার হ্যাঙ্গাম না ক'রে একটু বাটিচচ্চড়ি মত চাপিয়ে দিই!'

'দাও না মা।' শাশুড়ী বলতে বাধ্য হন, 'কি মাছ? মৌরলা? কটা মাছ? পারো ত দু-একটা বুড়ী দুগ্‌গার জন্যে রেখো—বিকেলে ভাতের সঙ্গে খাবে—'

মাছ বেছে বাটিচচ্চড়ি চড়াতে চড়াতে প্রমীলা বলে, 'এবার যখন ঘর করতে আসব একটা বঁড়শি আর হাত-কতক সুতো আনব, তাহ'লে আর মাছের দুঃখু থাকবে না।'

'ওমা, মেয়েছেলে হয়ে বঁড়শিতে মাছ ধরবি! লোকে কিছু বলবে না!'

'কী বলবে লোকে? বলার কি ধার ধারি? তাছাড়া দুপুরে দুপুরে ধরব—লোকে জানতে পারবে না। ছিপ হ'লে লোকে বুঝতে পারে। ক'হাত মাত্তর মুগা সুতো, দেখতে পেলে ত।'

মাস-কতক পরে যখন ঘর-বসত করতে এল প্রমীলা, তখন সত্যিই তার প্যাঁটরার তলায় দেখা গেল গোটা কতক বঁড়শি আর খানিকটা সুতো।

মহাশ্বেতা বাঁচল। অবশ্য সব দিন মাছ ধরবার সময় হয় না।—কিন্তু আরও অনেক কিছু জানে মেজ-বৌ। ঝিনুক গুগ্‌লি তোলে এক-একদিন, মাথার কাঁটা দিয়ে ভেতর থেকে মাংসটা বার ক'রে কচুপাতায় সংগ্রহ করে, তারপর চুপিচুপি একটা পিঁয়াজ কুঁচিয়ে নিয়ে চাপিয়ে দেয় উনুনে। প্রথম প্রথম মহাশ্বেতার ঘেন্না করত এসব খেতে—কিন্তু প্রমীলার পীড়াপীড়িতে খেতে হ'ল—সয়েও গেল ক্রমশ। পিঁয়াজ আগে আসত না এ বাড়িতে, সেটাও প্রমীলা তার স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে ব্যবস্থা করেছে। তাছাড়া এখন ডাঁটার গায়ে একটু আনাজও লেগে থাকে—নইলে প্রমীলা কটকট ক'রে শাশুড়ীকে শুনিয়ে দেয়, 'ও ডাঁটা ক'গাছাই বা রাখেন কেন মা, আমরা বৌ বই ত নয়—আমরা শুধু-ভাতই বেশ খেতে পারব।'

শাশুড়ী অপ্রস্তুত হয়ে বলে, 'ওমা তা কেন—কাল থেকে আর একটু ক'রে আনাজপত্তর কুটে দিও বড় বৌমা, তোমার বাপু বড্ড দিষ্টিকিপ্পনতা।'

প্রমীলার কাছে আর একটি শিক্ষাও পেলে মহাশ্বেতা, এ সম্বন্ধে ওর কোন জ্ঞানই ছিল না এতদিন।

হঠাৎ একদিন পুকুরঘাটে গিয়ে ওর গলা জড়িয়ে প্রমীলা প্রশ্ন করলে, 'তোর কাছে দুটো টাকা হবে দিদি? তাহলে এই রাসের মেলায় একটা জিনিস কিনব!'

আকাশ থেকে পড়ে মহাশ্বেতা, 'টাকা! টাকা কোথায় পাবো ভাই?'

'আহা ঢং! বলে, "ন্যাকা ঢং হলসে কানা, জল ব'লে খায় চিনির পানা!" মেয়েমানুষের টাকা কোথা থেকে আসে?'

এবার বুঝতে পারে মহাশ্বেতা, 'হ্যা, সেই মানুষই তোর ভাশুর কিনা! মাইনের পাই-পয়সাটি ত ফি-মাসে তোর বরের হাতেই তুলে দেয়, তুই জানিস না?'

'ওমা, সে ত গেল সংসার-খরচের টাকা! তা বলে দু'চার পয়সা তোর হাতে দেয় না?'

'এক পয়সাও না।'

'মিছে কথা।'

'এই তোকে ছুঁয়ে বলছি মেজ-বৌ। যা ব'লে দিব্যি করতে বলবি করব।'

খিলখিল ক'রে হেসে ওঠে প্রমীলা। হাসতে হাসতে তার চোখে জল এসে যায়।

'তুই ভাই একটা আকাট বোকা। সত্যি তোকে দেখলে মায়া হয়।'

'ওমা, তা আমি কি করব না দিলে—'

'ওরে হাঁদারাম, এমনি কি কেউ দেয়? আদায় করতে হয়। ঝগড়াঝাঁটি করবি, রাগারাগি করবি, তবে ত দেবে! দু'এক পয়সা মধ্যে মধ্যে না রাখলে তোর হাতে কি থাকবে? মানুষের জন্ম নিয়েছি, হ'লেই বা মেয়েমানুষ, আমাদের কি সাধ-আহ্লাদ কিছু নেই? সংসার খরচের টাকা থেকে জমিয়ে ওরা কবে সাধ-আহ্লাদ মেটাবে—সেই ভরসাতে থাকবি তুই? তবেই হয়েছে!'

আবারও হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ে প্রমীলা।

মহাশ্বেতা কাঠ হয়ে বসে থাকে। এ যেন এক নতুন জগৎ নতুন এক চেহারা নিয়ে ওর চোখের সামনে খুলে যাচ্ছে একটু একটু ক'রে। একে দেখে ভয় করে!

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

এক

ঐটুকু মেয়ে—কিন্তু বয়সের তুলনায় যেন ঢের বেশী পাকা। এরই মধ্যে ওর মতামত স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ। বালিকার দেহ থেকে কচি গলাতে যখন পাকা পাকা ভারী কথাগুলো বেরিয়ে আসে তখন রাসমণি সুদ্ধ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন। ওঁদের ঝি গিয়ে বলে, 'মাগো, ওর ওপর বোধ হয় কোন গিন্নীবান্নীর ভর হয়! কথা বলে দেখেছো—যেন তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে! ওর যেন কোথাও গণ্ডা গণ্ডা ছেলেপিলে নাতি-নাতনী আছে, এমনিধারা কথাবাত্রা!'

প্রথম প্রথম ভাল লাগত সকলকারই—সেই যখন চার-পাঁচ বছরেরটি ছিল। এখন একটু বেশী এঁচোড়ে পাকা মনে হয় ঐন্দ্রিলাকে।

কালো রংটা দুচক্ষে দেখতে পারে না সে। যে গয়লা দুধ দেয় তার রং কালো ব'লে দুধ খেতে চাইত না আগে।

'মাগো, কি বিচ্ছিরি কালো! ঘামলে মনে হয় আলকাতরা গড়িয়ে পড়ছে!' বলেছিল তার সামনেই। উমা ত অপ্রস্তুত।

রাসমণি খুব বকে দিয়েছিলেন সেদিন, তার পর থেকে একটু সতর্ক হয়েছে এই মাত্র—কিন্তু রংটার ওপর থেকে বিদ্বেষ যায় নি। কালো মাছ খাবে না মেয়ে—কই, শোল, মাগুর, সিঙ্গি—কিচ্ছু না। যে তিজেলটাতে ওদের মাছ রান্না হয়, সেটা কাঠের জ্বালে কালো হয়ে যায় ব'লে প্রায়ই খুঁতখুঁত করে—কিন্তু বেশী আপত্তি করতে সাহস করে না—শুধু রাসমণি যখন থাকেন না তখন উমাকে শোনায়, 'মাসিমা, তোমরা এখনও তিজেলে রাঁধো কেন? সে ত ঐ পাড়াগাঁয়ের লোকেরা রাঁধে, কয়লা পাওয়া যায় না ব'লে। তোমাদের ত কয়লার এলাঢেল—তবু কাঠ পোড়াও কেন?'

কমলা যখন এখানে আসে—তখন মধ্যে মধ্যে মুখ টিপে হেসে বলে (অবশ্য অনুচ্চ কণ্ঠেই—রাসমণির সামনে বলা সম্ভব নয়), 'মুখপুড়ী, দেখিস্ ঠিক তোর একটা কালো বর হবে!'

ঐন্দ্রিলা তার পাতলা পাতলা দুটি রক্তিম ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে, 'ঈস্! আমি তার সঙ্গে ঘর করলে ত! সেই দিনই তার কপালে মুড়ি খ্যাংরা মেরে চলে আসব না!'

'ওলো, তোর কপালেও খ্যাংরা পড়বে তাহ'লে!'

'কেন?'

'খেতে পরতে দেবে কে ?'

'কেন—', তীক্ষ্ণকণ্ঠেই উত্তর দেয় ঐন্দ্রিলা, 'মাসিমার মত মেয়ে পড়িয়ে খাবো। মাসিমাকেও ত তার বর নেয় না, সে কি উপোস ক'রে আছে ? খাচ্ছে পরছে না ?'

'চুপ চুপ !' অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে কমলা। এঁচোড়ে-পাকা মেয়েকে ঘাঁটানোই ভুল হয়েছে ওর। উমা যদি শুনতে পায়, ছি ছি !

গলা নামিয়ে বলে, 'ওসব কথা তোমাকে বলতে নেই মা, ছি! ছোট মুখে বড় কথা শুনলে দিদিমা বড় রাগ করবেন।'

মুখ ঘুরিয়ে উত্তর দেয় ঐন্দ্রিলা, 'দিদিমার কথা ছেড়ে দাও, সব তাইতেই রাগ !'

কমলা যে কথাটা বলতে পারত সেটা হচ্ছে এই যে, মাসিমার মত মেয়ে পড়িয়ে খেতে গেলে নিজের কিছু লেখাপড়া শেখার দরকার। অথচ ওটাতে কিছুতেই ঐন্দ্রিলা কোন উৎসাহ বোধ করে না। উমা হার মেনে গেছে—দু'বছর ধরে দ্বিতীয় ভাগের গণ্ডী আর পার হ'তে পারছে না মেয়ে কোনমতেই। অথচ সংসারের কাজে-কর্মে দ্বিগুণ উৎসাহ। প্রায়ই ভোর চারটেয় উঠে দিদিমার সঙ্গে গঙ্গা স্নান করতে যায়। যেদিন হয়ে ওঠে না, সেদিন ফেরার আগেই স্নান সেরে পুজোর আয়োজন ক'রে রাখে—নইলে তাঁর সঙ্গে ফিরেই তাড়াতাড়ি চন্দন ঘষে ফুল বেল-পাতা সাজিয়ে ঠিক করে দেয়। রাসমণি প্রত্যহ শিবপুজা করেন—তারই যোগাড়। তারপর উমার সঙ্গে রান্নার কাজে লেগে যায়। কুটনো কোটা, দুধ জ্বাল দেওয়া ত বটেই—এখন রান্নাও করতে বসে এক-একদিন। উমা ওকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে—পরের মেয়ে তায় আইবুড়ো, কিসে কি হয়ে যাবে, পুড়ে-ঝুড়ে যাবে হয়ত—তখন সারা জীবন তাকেই কথা শুনতে হবে। কি দরকার বাপু! কিন্তু ঐন্দ্রিলা শোনে না কোনমতেই। রাগ করে, ঝগড়া করে, অভিমান করে। রাসমণিও বলেন, 'দে দে—রাঁধতে চায় ত রাঁধতে দে। কোন্ দুঃখীর সংসারে গিয়ে পড়বে, সেখানে শুধু ত হাঁড়ি ঠেলা নয়—জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই করতে হবে হয়ত। যেমন মহাটার হচ্ছে। একটু অভ্যাস থাকা ভাল।'

ঘর-সংসারের সব কাজেই ওর সমান মন। 'সেজ'-এর আলো জ্বলে সারারাত—সে সব সাজানো, আজকাল কেরোসিনের আলো হয়েছে, তা ঝাড়ামোছা করা—বিছানা পাতা—উমা যখন থাকে না তখন সব গেছে ক'রে সাজিয়ে রেখে দেয়। এসবগুলো যে ক্লান্ত উমাকে ফিরে এসে করতে হয় না, সেজন্য উমা বরং কৃতজ্ঞ। এমন কি বিকেলের খাবারের আয়োজনও সে ঠিক ক'রে রেখে দেয়—কুটনো কুটে

উনুন সাজিয়ে ময়দা মেখে—উমা এসে কাপড় কেচে আহ্নিক করতে গেলে উনুনে আঁচও সে দিয়ে দেয়। তারপর যাহোক তরকারি আর রুটি, ওদের দুজনের মত একটু রান্না—কতক্ষণই বা লাগে!

রাসমণি রাত্রে একটু দুধ ছাড়া কিছু খান না। আজকাল দিন রাতের ঝি রাখা হয় না—প্রধানত ক্ষমতার অভাব—গিরিবালা এসে কাজকর্ম ক'রে দিয়ে চলে যায়। মাসিক দু'টাকা মাইনে তার—খাওয়াপরার কোন দায়িত্ব নেই। শীতকাল হ'লে এক-একদিন উমা দুপুরেই রান্না ক'রে রেখে দেয়, বিকেলে কাঠের জ্বালে ঐন্দ্রিলা শুধু দুধ জ্বাল দেয় আর সকালের তরকারিটা গরম ক'রে রাখে।

শ্যামা মধ্যে মধ্যে চিঠি লেখে মাকে, 'ঐন্দ্রিলার জন্য শহরের দিকে একটা পাত্র দেখুন মা। ও আমার গর্ভের সব চেয়ে সুন্দর ফল, এই সব বন-গাঁয়ে ধান সিদ্ধ করা আর গোয়াল সাফ করবার জন্যে বিয়ে দিতে মন চায় না। উমার চিঠিতে যা পড়ি তাতে মনে হয় ওর লেখাপড়া আর হবে না! তাহ'লে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দেওয়াই ভাল।'

রাসমণি চিঠি পড়ে কঠিনভাবে হাসেন। চিঠি নিয়ে আসে হেম। ওর অফিসে নানা ধরনের শিশি আসে, বিলিতী শিশি—হেম সেইগুলো রোজই দুটো-একটা ক'রে সরায় আজকাল। কতকগুলো জমলে এক-এক রবিবার পুঁটুলি বেঁধে নিয়ে সটান হেঁটে কলকাতায় চলে আসে—এখানে নাকি শিশি-বোতলের খুব দর, বেচলে ভাল দাম পাওয়া যায়। সেই টাকা নিয়ে দিদিমার বাড়ি আসে, খাওয়াদাওয়া ক'রে আবার সন্ধ্যের পর হাঁটা দেয় বাড়ির দিকে।

রাসমণি অবশ্য এ খবর জানেন না। হেমের বয়স অল্প হলেও এটুকু সে চিনে নিয়েছিল দিদিমাকে, চোরাই মালের কারবার করা কখনও তিনি বরদাস্ত করবেন না। তিনি ভাবেন হেম বুঝি এমনি—ওর বোনের খবর নিতে আসে। তিনি খুশীই হন মনে মনে। ভাই-বোনে টান থাকা ভাল।

কিন্তু সে অন্য কথা। শ্যামার চিঠি পড়ে হেমকেই উত্তর দেন, 'তোর মায়ের দেখছি দুঃখে-কষ্টে মাথাটা একেবারেই খারাপ হয়ে গেছে। আমি এখান থেকে পাত্র দেখব কি ক'রে? আমার কি কোন পুরুষ অভিভাবক আছে, না আমি নিজে কারও বাড়ি যাওয়া-আসা করি? আমাকে পাত্র দেখতে গেলে ঘটক-ঘটকী ডাকা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু ঘটকের সাধ নিজেকে দিয়ে, উমাকে দিয়েও কি তার মেটে নি? বরং বলগে যা জানাশোনার মধ্যে পাড়া-ঘরে ভাল ছেলে দেখতে। মেয়ে কি তার রঙের রাধা যে গোয়াল কাড়তে গিয়ে মরে যাবে!'

হেম মাথা হেঁট ক'রে সব শোনে। উত্তর বয়ে নিয়ে যায় মায়ের কাছে।

শ্যামা রাগ করে, 'মায়ের যত সব অনাছিষ্টি কথা! ঘটক-ঘটকী কি আর কোথাও ভাল বে দিচ্ছে না? আমাদের বরাতে যা ছিল তাই হয়েছে। ওদের কি দোষ?'

হেম মুচকি হেসে উত্তর দেয়, 'তোমার মেয়ের বরাতেও যা আছে তাই হবে। এখানেই বিয়ের পাত্তর ছাখো না।'

'তুই থাম্।' শ্যামা ধমক দেয়।

'হ্যাঁ—দিদিমা আরও একটা কথা ব'লে দিয়েছেন, বলেছেন ঘটক-ঘটকী যে সম্বন্ধ আনবে তাতে শুধু-ভাত মুখে উঠবে না—পাওনা-খোওনা চাই। কত টাকা তোর মা খরচ করতে পারবে তাই শুনি!'

মুখ গোঁজ ক'রে শ্যামা বলে, 'টাকা যদি আমিই খরচ করব ত ঝিয়ের মত খাটতে মেয়েকে আমার সেখানে ফেলে রেখেছি কেন?'

মায়ের অকৃতজ্ঞতায় হেম সুদ্ধ যেন চমকে ওঠে, একটু থেমে বলে, 'তাহ'লে ওকে আনিয়েই নাও না মা! কি দরকার ফেলে রাখবার?'

'দেখি একটু বেয়ে-চেয়ে। মা কালী কি মুখ তুলে চাইবেন না!'

দুই

সেদিন দুপুরবেলাই কালো ক'রে মেঘ ঘনিয়ে এল। উমা সব কাজ ফেলে ছুটল ছাদে। ওর এই অসময়ের কালো মেঘ দেখতে খুব ভাল লাগে। কেমন চারদিক অন্ধকার ক'রে আসে, মিষ্টি মিষ্টি ঠাণ্ডা হাওয়া দেয়, আর অন্ধকারের মধ্যেও সেই দিকচক্র-রেখার দিকে কেমন একটা অদ্ভুত আলো দেখা যায়। মেঘগুলোও যেন ঢেউয়ের পরে ঢেউয়ের মত গড়িয়ে এসে একসময় আকাশ ছেয়ে ফেলে, মধ্যে মধ্যে গুম্ গুম্ শব্দ হ'তে থাকে। উমার মনে হয় মহাপ্রলয় বুঝি ঘনিয়ে আসছে —আর দেরি নেই। ঐ রাশি রাশি কালো পাথরের মত মেঘগুলো বুঝি এখনই ঝাঁপিয়ে পড়বে পৃথিবীর বুকে, সব ভেঙে-চুরে গুঁড়িয়ে চাপা দিয়ে দেবে।

'ছোট মাসিমা!' ঐন্দ্রিলা উমাকে খুঁজতে খুঁজতে ছাদে আসে। 'ঐ! শুরু হয়েছে! কি যে বাপু তোমার এক মেঘ দেখা তা বুঝি না। মেঘ হ'ল ত কাজ-কর্ম ফেলে ছুটলে ছাদে! কী আছে মেঘে? কালো কালো বিচ্ছিরি মেঘগুলো, দেখলেই ত ভয় করে!'

উমা কিন্তু চোখ নামায় না। ওর তৃষ্ণার্ত হৃদয় বুঝি সজল মেঘের মধ্যেই শান্তি খোঁজে। দুই চোখ ভ'রে পান করে সেই শ্যামল শোভা।

অসহিষ্ণু ঐন্দ্রিলা আবার ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, 'এখন আমার কথাটা শুনবে, না কি? মেঘ ত আর পালাচ্ছে না। ও ত রোজই আছে।'

চোখ না ফিরিয়েই উমা হেসে বলে, 'তোর ও-করাও ত রোজ আছে। দিন-রাত আছে। মেঘই বরং পালাবে। ছাখ না, ঐ বৃষ্টি নেমে গেছে—ঐ যে নতুন বাজারের ওধারে ঐ পশ্চিম দিকের আকাশের কাছটা ঝাপ্‌সা হয়ে এসেছে—তার মানে গঙ্গার ওপর জল নেমেছে। এখানে এসে গেল বলে—'

'তোমার বাপু সব তাইতে বাড়াবাড়ি!'

'চুপ চুপ। ঐ শোন্, রাজেন মল্লিকের চিড়িয়াখানার ময়ূর ডাকছে। কান পেতে শোন্ দিকি!'

অর্ধস্বগতোক্তি করে ঐন্দ্রিলা, 'ভারি শোনবার জিনিস কি না! ক্যাঁ ক্যাঁ—কি আমার মিষ্টি ডাক গো!'

বেশীক্ষণ অবশ্য তাকে অপেক্ষা করতে হয় না। চটপট শব্দ ক'রে বড় বড় ফোঁটায় জল নেমে পড়ে। 'ও মা গো' ব'লে তিন লাফে রান্নাঘরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল ঐন্দ্রিলা। উমা কিন্তু তবুও যেন কিসের আশায় দাঁড়িয়ে থাকে। দেখতে দেখতে প্রবল বর্ষণ শুরু হয়ে যায়—উমার গা-মাথার কাপড়—দৌড়ে আসতে আসতেও ভিজে লেপ্‌টে যায় গায়ের সঙ্গে।

'হ'ল ত!' ঐন্দ্রিলা রাগ করে, 'কি যে আদিখ্যেতা তোমার তা বুঝি না। সেই থেকে বলছি! কাপড়টি ত বেশ ক'রে ভেজালে, এখন কি করবে? কাপড় আনতে যাবে কে নিচে?—যে যাবে সে-ই ত ভিজবে।'

গায়ের কাপড় খুলে নেংড়াতে নেংড়াতে উমা উত্তর দেয়, 'কাপড় আর আনতে হবে না—এ এখনই শুকিয়ে যাবে আগুন-তাতে।'

'হ্যাঁ, তা যাবে বৈকি। ভিজে কাপড়ে সারাবেলা থেকে তারপর জ্বরে পড়ো। দেখি, আমারই আবার পোড়ার ভোগ আছে আর কি!'

বলতে বলতে, উমা বাধা দেবার আগেই, বড় একখানা গামছা গায়ে-মাথায় জড়িয়ে ছুটে চ'লে যায় সিঁড়ির দিকে, তারপর তেমনি ভাবেই বুকের মধ্যে ক'রে একখানা শুকনো শাড়ি নিয়ে ছুটে আসে আবার।

'নাও ধরো। আমার হয়েছে এক জ্বালা!'

বকতে গিয়েও ওর কথা বলার ধরনে হেসে ফেলে উমা, 'তারপর, তুইও ত ঐ ক'রে ভেজালি কাপড়—এখন আবার আমি আনতে যাই?'

'না না—এ আমার কিছু ভেজে নি, দু-পুরু গামছা ছিল।'

'কি বলছিলি তখন? কি এমন জরুরী কথা?' কাপড় ছাড়তে ছাড়তে উমা প্রশ্ন করে।

'শোন নি? গিরি মাসি নুন কিনতে গিয়েছিল—নুন পায় নি!'

'নুন পায় নি? সে আবার কি কথা?'

'দোকানী বলেছে—বিলিতী নুন নাকি আর সে বেচবে না। পাড়ার ছোকরা বাবুরা সব স্বদেশী হয়েছে, বিলিতী নুন আর কাউকে পাড়ায় বেচতে দেবে না। সন্ধব নুন কিনতে হবে, তা বেশী পয়সা চাই। তাও নাকি লাল লাল বিচ্ছিরি নুন—মাটির ডেলা!'

'তা অন্য দোকানে দেখলে না কেন? গিরিকে বললি না? নগদ পয়সা দেবে যখন—'

'সে সব দোকান ঘুরে দেখেছে। ছাতুবাবুর বাজারে কেউ বিলিতী নুন বেচবে না। আছে সবার কাছেই—কিন্তু সাহস নেই কারও। বিলিতী নুন বিলিতী কাপড় কিচ্ছু বেচা চলবে না।'

কথাটা আজ নয়—ক'দিন আগেই শুনেছে উমা। ছাত্রীদের বাড়িতে প্রবল আলোচনা হয়—কানে না এসে উপায় নেই। বড়লাট সাহেব নাকি বাংলাকে দুখানা ক'রে দিয়েছেন—তাতে বাঙালীর সর্বনাশ হয়ে যাবে। বাঙালীকে জব্দ করার জন্যেই নাকি এই সব ব্যবস্থা। তাই সবাই ক্ষেপে উঠেছে। বিলিতী জিনিস কেনা বন্ধ করেছে সবাই—তাতেই নাকি ইংরেজ ঠাণ্ডা হবে সব চেয়ে। ওতে ওদের ভাতে হাত পড়বে।...বিলিতী কাপড়ের কথাটাই শুনেছে সে বেশি ক'রে—নুনের কথা ত কৈ শোনে নি!

ওর মনের কথারই প্রতিধ্বনি ক'রে যেন ঐন্দ্রিলা ব'লে উঠল, 'কাপড়ও ত কিনতে দেবে না! তবেই ত চিত্তির!'

'তাতে আর আর আমাদের কি? আমরা ত তাঁতের কাপড় পরি!'

একরত্তি ঐন্দ্রিলা হাত-পা নেড়ে বলে, 'সবাইয়েরই ত আর তোমার মত ফরাসডাঙার কাপড় পরার ক্ষ্যামতা নেই। আমাদের মত গরীবগুর্বোর কি হবে?'

একটু অপ্রতিভ হয়ে উমা বলে, 'সেও ত শুনছি বোম্বাইয়ের ওধারে কোথায় কাপড়ের কল বসেছে। সে ব্যবস্থা হচ্ছে।'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ—রেখে বসো! ঐ ত গিরি মাসি শুনে এসেছে—সে যা কাপড় আসবে—থলের মত বিচ্ছিরি মোটা—তাও ডবল দাম! এমন চোদ্দ আনায় বারো আনায় এত ভাল কাপড় পাবে না!'

উমা কথাটা উড়িয়ে দেয়, 'ভেবে কি আর হবে বল্! যা সবার অদৃষ্টে আছে আমাদেরও তাই হবে—বেশি ত আর নয়।'

'মার কানে যদি কথাটা যায়—মা লাফাবে একেবারে!'

আরও খানিক গজ্‌ গজ্‌ করে ঐন্দ্রিলা আপন মনেই, কিন্তু উমার কাছ থেকে কোন উৎসাহ না পেয়ে খানিকটা পরে আপনিই থেমে যায়।

সত্যিই শ্যামা লাফাতে থাকে একেবারে।

মঙ্গলা ঠাকরুন হাত-পা নেড়ে এসে গল্প করেন, 'শুনেছিস্‌ বামনি—স্বদেশী-ওলাদের হুজুগ ?'

'কৈ না ত মা! কী-ওলা বললেন ?'

'ঐ যে বাপু স্বদেশী না কি এক ফ্যাচাঙ উঠেচে! দেশের ছোকরা বাবুরা উঠে পড়ে লেগেছেন—ইংরেজ নাকি এদেশে আর রাখবেন না, তাড়িয়ে তবে জলগেরণ করবেন। যত সব বাউণ্ডুলে উন্‌পাঁজুরে বরাখুরে ছোঁড়ারা জুটেছে—একটা-না-একটা হুজুগ লেগে আছেই!'

'তা তারা কি চায় ?' শ্যামা তখনও সংবাদটার সমস্ত অন্তর্নিহিত গূঢ়ার্থ বুঝতে পারে না।

'ওলো, কেউ নাকি বিলিতী কাপড় পরবে না, বিলিতী নুন চিনি কিচ্ছু খাবে না—সব নাকি বয়কট করবে। ওকে নাকি বয়কট করা বলে!'

নিশ্চিন্ত অবিশ্বাসের হাসি হেসে শ্যামা বলে, 'না কিনে করবে কী ? আপনিও যেমন ক্ষেপেছেন!'

'ওলো না—আমাদের কত্তা কাল চিনি কিনে আনছিলেন, হাত থেকে কেড়ে নিতে গেছল। অনেক ধমক্‌-টমক্‌ ক'রে তবে পার পেয়েছেন।'

'তবে ? চিনি না হ'লে চা খাবেন কি ক'রে ? ওঁর ত আবার চা খাবার অভ্যেস!'

'তাই ত বলছি। বলে কিনা গুড় দিয়ে চা খেতে হবে।'

খানিকটা চুপ ক'রে থাকে শ্যামা, বলে, 'ও দুদিনের হুজুগ মা—দুদিনেই থেমে যাবে। আপনিও যেমন!'

'হ্যাঁ—আমিও তাই বলছিলুম ওঁকে। বিলিতী কাপড় না কিনলে পরবে কি ? কটা লোকের ফরাসডাঙা শান্তিপুর পরার ক্ষ্যামতা আছে তাই শুনি ? কিন্তু—' গলাটা নামিয়ে এবার একটু চিন্তিত ভাবে বলেন মঙ্গলা, 'উনি যেন কেমন ভরসা পাচ্ছেন না। বলছেন তোমরা যা ভাবছ তা নয়—এ নিয়ে রীতিমত গোলমাল বেধে উঠবে। চাকরি নিয়ে না টানাটানি পড়ে!'

কথাটা শুনে শিউরে ওঠে শ্যামা। অক্ষয়বাবুর চাকরির জন্যে তার ভাবনা নয়—চাকরি গেলেও তাঁর চলবে, তার ভাবনা হেমের চাকরির জন্যে। গত মাস

থেকে বারো টাকা হয়েছে মাইনে। আরও বাড়বে—সাহেবের সুনজরেও চাই কি পড়ে যেতে পারে কোন রকমে। (কেমন ক'রে সেটা পড়া যায় তা শ্যামা জানে না—তবে ঝাপ্‌সা রকম একটা ধারণা আছে যে এ রকম অঘটন ঘটলে আর কোন ভাবনা নেই।) এই সময় এসব আবার কি বিঘ্ন!

সে গজরাতে আর গাল পাড়তে থাকে।

স্বদেশী কী তা সে জানে না, কেন এদের এ বিক্ষোভ তাও জানতে চায় না, কোথা দিয়ে কী ক্ষতি হ'তে পারে, ওর এবং জাতির,—জাতির সুবিধার জন্যে যে কোন কোন মানুষের সামান্য ব্যক্তিগত ক্ষতি স্বীকার করতেই হয় মধ্যে মধ্যে—এ সব কোন কথাই শ্যামার জানা নেই। শুধু হেমের চাকরি এই আন্দোলনের ফলে কোন দিন যেতে পারে এই সম্ভাবনাতেই—সে যেন ক্ষেপে ওঠে একেবারে।

'মুখে আগুন মড়াদের! মরুক, মরুক সব। ওলাউঠো হোক। একধার থেকে নিব্বংশ হোক্‌। স-পুরী এক গাড়ে যাক, হুজুগ করবার আর সময় পেলেন না সব! গরীবকে কেবল জব্দ করা বই নয়!'

হেম বরং মধ্যে মধ্যে সান্ত্বনা দেয়—'যাক না মা, ভারি তো বারো টাকা মাইনের চাকরি, যজমানী ক'রে ওর চেয়ে ঢের বেশি এনে দেবো।'

'তুই থাম্‌। ভারি ত বুঝিস্‌ তুই!' ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দেয় শ্যামা।

কিন্তু ওর গালাগাল সে বিপুল জনসমুদ্রের কোলাহল ভেদ করতে পারে না। তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে আন্দোলন। অবশেষে শোনা গেল একদিন অক্ষয়-বাবুর হাত থেকে বিলাতি কাপড় কেড়ে নিয়ে ছেলেরা পুড়িয়ে দিয়েছে।

উড়ো উড়ো নানা খবর আসে। কলকাতাতে নাকি ভীষণ গোলমাল চলেছে, কবে যে আগুন জ্বলে উঠবে তার ঠিক নেই। অক্ষয়বাবুর অফিসে চার-পাঁচজন ছোকরার চাকরি নাকি এরই মধ্যে চ'লে গেছে—এই সব হুজুগ করার জন্যে।

অবশেষে একদিন অফিস থেকে হেম শুনে এল—সাহেব সবাইকে সাবধান ক'রে দিয়েছেন, এসব হাঙ্গামে তাঁর কলের কেউ যেন জড়িয়ে না পড়ে—তাহ'লে কিন্তু কোনক্রমেই চাকরি থাকবে না।

শিউরে উঠে শ্যামা তাকে সাবধান করে, 'দেখিস্‌ ঐ সব হাড়হাবাতে বজ্জাত ছোঁড়াদের ত্রিসীমানায় থাকিস নি কোনদিন। খবরদার—এই পই পই ক'রে বারণ ক'রে দিচ্ছি! দুর্গা দুর্গা—রক্ষে করো মা বাছাকে।'

অনেকদিন পরে একদিন নরেন এসে হাজির হ'ল। গামছার পুঁটুলিতে অনেক-খানি দামী বিলিতী চিনি।

গজগজ করতে করতেই বাড়ি ঢুকল, 'ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সদ্দার! ওঁরা তাড়াবেন ইংরেজ! শুধু যদি বক্তিমে ক'রে ইংরেজ তাড়ানো যেত তাহ'লে আর ভাবনা ছিল না। কাজের মধ্যে ত কেবল কথা—কথার ধুকড়ি এক-একটি!'

শ্যামা অবাক হয়ে বলে, 'কিন্তু এত চিনি পেলে কোত্থেকে, তবে যে শুনছিলুম বিলিতি চিনি কাউকে কিনতে দিচ্ছে না?'

'হু হুঁ, তাই ত! সেই ত সুবিধে হ'ল, বুঝলি না? কি জানিস্ গিন্নী, বুদ্ধি চাই! বুদ্ধি থাকলে কি আর কেউ মাগের শ্বশুরবাড়ি খেটে খায়?...উ-উঁহু—ওতে হাত দেওয়া চলবে না! এ আমি সরকারকে বিক্কিরি করব। চা খাওয়ার নেশা বাবুর, চিনি ত পাচ্ছেন না, চড়া দাম নেব!

'কিন্তু পেলে কি ক'রে তাই শুনি না?'

'ঐ এক সাহেবের চাপরাসী কিনে নিয়ে যাচ্ছিল। ছোঁড়ারা রে-রে ক'রে গিয়ে পড়ল। আমি দেখলুম—জিনিসটা ত নষ্ট হবেই—সাহেবের ভোগে আর হচ্ছে না। আমিও ঐ দলে মিশে গিয়ে সব্বার আগে ছিনিয়ে নিলুম। তারপর হৈ-চৈ চেঁচামেচির মধ্যে এক ফাঁকে সরে পড়তে কতক্ষণ, বুঝবি না!—তা মাল আছে ঢের, পাঁচ সেরের কম নয়। হেঁ-হেঁ!'

আত্মতৃপ্তির হাসিতে ওর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

তারপর পা ছড়িয়ে বসে শ্যামাকে তামাক সাজবার হুকুম ক'রে আবারও একচোট গালাগাল দিতে বসে আহাম্মক ছোঁড়াদের।

'তুমিও যেমন! স্বদিশী হচ্ছে না গুষ্টির পিণ্ডি হচ্ছে! ছাই হবে! লাভে হ'তে এই অপ্‌চ।...বোকা বোকা! ঝাড়ে-বংশে সব বোকা!'

বহুদিন পরে স্বামীর সঙ্গে একমত হতে পেরে শ্যামাও খুশী হয়ে ওঠে। দুজনে মিলে মনের সাধ মিটিয়ে গাল দেয় এই অস্পষ্ট, অপরিচিত—স্বদেশীওলাদের।

তিন

কেবল কোন উত্তেজনা দেখা যায় না রাসমণিরই। তিনি সবই শোনেন, কোন কথা বলেন না। উমা বুঝতে পারে না মায়ের ভাবটা। এমন ত ছিলেন না মা। যেন কোন কিছুতেই আর কোন কৌতূহল নেই, আসক্তি নেই, নিস্পৃহ উদাসীন হয়ে গেছেন তিনি। কেমন যেন ভয়-ভয় করে ওর রাসমণির এই ধরণের ভাব দেখে। উমা কমলাকেও তার আশঙ্কার কথাটা জানিয়েছিল একবার কিন্তু কমলা সেটা গায়ে মাখে নি! উড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, 'ও কিছু নয়—বুড়ো বয়সে শরীর

খারাপ হ'লে অমনিই হয়।'

অবশ্য শরীরটা খারাপই যাচ্ছে ওঁর—সেটাও ঠিক। কাশী থেকে এসে বছর-খানেক বেশ ভাল ছিলেন, তারপরই আবার খারাপ হ'তে শুরু করেছে। বিশেষত ইদানীং যেন একটু বেশী রকম কাবু হয়ে পড়েছেন। জ্বর হয় প্রায়ই, ডাক্তার বলেন পুরোনো ম্যালেরিয়া। কুইনাইন দিতে চান—রাসমণি তা খাবেন না। রাগ করে বলেন, 'হ্যাঁ, কুইনাইনে শুনেছি মাথা ঘোরে, কানে কালা হয়ে যায়! বুড়ো বয়সে ঐ খেয়ে মরি আর কি!···দূর! দূর!'

কবিরাজীও করতে চান না। কেবল অনুপান আর পাঁচন—করে কে ওসব? ঘাড় নেড়ে বলেন, 'অত হাঙ্গামা আর পোষাবে না। তাছাড়া দরকারই বা কি? রোগে ধরলে ওষুধে ছাড়ে—যমে ধরলে কি আর ছাড়ে! এবার আমায় যমে ধরেছে, বুঝছিস্ না? সময়ও ত হ'ল, আর কতকাল বাঁচব! কিছুদিন ধরে জ্বর হলেই তোদের গুষ্টিকে স্বপ্ন দেখছি। এতদিনে বোধ হয় মনে পড়ছে!'

স্বামীর প্রসঙ্গ রাসমণির মুখে কেউ কখনও শোনে নি। এ-ও এক ব্যতিক্রম। 'তোদের বাবা' এ তিনি বলেন না। স্বামীর প্রসঙ্গে 'বাবা' শব্দ, তা হোক না কেন অপরের বাবা, এ তাঁদের আমলে উল্লেখ করা নিষেধ ছিল। ওটা অসভ্যতা ব'লে গণ্য হ'ত, ঠাট্টা-তামাশা করত সবাই। সুতরাং তিনি বলেন, 'তোদের গুষ্টি'!

নতুন কি এক চিকিৎসা বেরিয়েছে হোমিওপ্যাথি বলে, পাড়ায় তারই এক ডাক্তার আছেন—কালীপদ বরাট। জ্বর যখন খুব চেপে আসে, এক-একদিন কাঁপতে কাঁপতে দাঁতি লেগে অজ্ঞান হয়ে যান রাসমণি, তখন উমা ভয় পেয়ে বরাটকেই ডাকে। ছোট একটা ছেলের মাথায় কাঠের বাক্স চাপিয়ে নিয়ে তিনি চলে আসেন। বেশ জাঁকিয়ে বসেন রোগিণীর পাশে, নানা প্রশ্ন করেন ওদের (সম্ভব হলে রোগিণীকেও), এবং প্রত্যেকটি উত্তর শুনেই একবার ক'রে বিজ্ঞভাবে টেনে টেনে বলেন 'হুঁ—।' তারপরই আবার একটি নতুন প্রশ্ন নিক্ষেপ করেন। এইভাবেই চলে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ মিনিট।

অনেকক্ষণ পরে শেষ একটি 'হুঁ' ছেড়ে কাঠের বাক্স খোলেন। ঐন্দ্রিলাকে হুকুম করেন, 'একটা পরিষ্কার পাথরের বাটিতে ক'রে একটু জল এনে দাও ত খুকী-মা!'

পাথরের বাটিতে জল এসে পৌঁছলে সাবধানে বেছে বেছে একটি শিশি বার করেন, তারপর তা থেকে পরিষ্কার জলবৎ কি একটা ওষুধ—খুব সন্তর্পণে শিশির মুখে ছিপি লাগিয়ে একটি ফোঁটা মাত্র ঢেলে দেন।

'শ্রীবিষ্ণু! নাও, এবার খাইয়ে দাও ত মা-ঠাকরুনকে চট্‌পট!'

প্রথম প্রথম রাসমণি খেতে চাইতেন না।

'এ যে কেমন কেমন গন্ধ ডাক্তারবাবু!'

'মদের মত গন্ধ— এই ত!' ডাক্তার বরাট মুখের কথা টেনে নিয়ে বলতেন, 'তা ত হবেই মা। যে জিনিসের যা। এ যে সুরাসার দিয়ে তৈরি। কিন্তু তাতে ত দোষ নেই—জানেন ত শাস্ত্রের বচন,—ঔষধার্থে সুরাপান।—তাও চলে!'

ইদানীং আর আপত্তি করেন না। কিছুতেই যেন আপত্তি নেই তাঁর। ক্লান্তভাবে হাঁ করেন— কে কি ওষুধ ঢেলে দিচ্ছে চেয়েও দেখেন না।

কিন্তু তাতেও রোগ ভাল হয় না।

তিন দিন চার দিন ভাল থাকেন আবার পাল্‌টে জ্বরে পড়েন। এই সময় আর একবার হয়তো পশ্চিমে নিয়ে গেলে হ'ত কিন্তু কে নিয়ে যাবে? রাঘব ঘোষাল বাতে পঙ্গু— তার ছেলেই সব যজমানী দেখছে। উমার যাওয়ার উপায় নেই, তাছাড়া সব চেয়ে বড় কথা হ'ল খরচা। অত খরচ দেবে কে? এখন যা অবস্থা—সংসার চলাই ভার।

সুতরাং কিছুই হয় না। রাসমণি রোগে ভোগেন—আর যখন ভাল থাকেন, ক্লান্ত অবসন্নভাবে দূরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বসে মালা জপেন।

আজকাল সব দিন আর গঙ্গাস্নানেও যেতে পারেন না। দু'তিনদিন উপরি উপরি ভাত খেয়েও যদি জ্বর না আসে ত চুপিচুপি ঐন্দ্রিলাকে সঙ্গে ক'রে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু হেঁটে যদি বা যান আসার সময় প্রায়ই আর আসতে পারেন না— পালকি ক'রে ফেরেন। যেদিন হেঁটে আসেন—সেদিনও টানা আসতে পারেন না, পথে অনেক জায়গায় বসে পড়তে হয়। খানিকটা বসে জিরিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করেন।

যেদিন স্নান করতে যান সেদিন গঙ্গার ঘাটেও শোনেন স্বদেশী হাঙ্গামার কথা। সুরেন বাঁড়ুয্যে বিপিন পাল আর রবি ঠাকুর নাকি ছেলেদের খেপিয়ে তুলছেন। কোন বিলিতী জিনিস কেনা হবে না—সাহেবদের ভাতে মারতে হবে, এই হয়েছে হুজুগ। নুন, চিনি, বিলিতী কাপড় কিছু কেনা যাবে না। কেনা সম্ভব নয়। কেউ কেউ নাকি লুকিয়ে কেনার চেষ্টা করছে কিন্তু ধরা পড়ে তেমনি লাঞ্ছনাও হচ্ছে তাদের। স্বদেশী ছেলেরা নাস্তানাবুদ ক'রে ছাড়ছে।

শোনেন, কানে যায় এই পর্যন্ত। কাথাটা তাঁকে কোনরকমে বিচলিত করতে পারে না। মন তাঁর এতটুকুও জাগে না। অথচ এককালে তিনি খবরের কাগজ

পড়তে ভালবাসতেন। বরাবর সাপ্তাহিক কাগজ একখানা ক'রে নেওয়া হ'ত। পড়ার অভ্যাস ছিল তাঁর। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, গোলেবকাওলি, চাহার দরবেশ, গোল-সনুবর, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী—এসব বই এখনও তাঁর বাক্স খুঁজলে পাওয়া যাবে। পয়ারে অনূদিত বেতাল পঞ্চবিংশতি এক কালে তাঁর মুখস্থ ছিল। কিন্তু কিছুদিন ধরে যেন সবই ভুলে যেতে বসেছেন। বই পড়তেও আর ভাল লাগে না। এক-একদিন উমা নিজে থেকেই প্রস্তাব করে—'কিছু পড়ে শোনাব মা?' রাসমণি তাতেও ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানান, 'থাক গে, ভাল লাগছে না।'

কী যে ভাল লাগবে তাঁর, উমা তা বুঝতে পারে না। দিনরাতই কি যেন ভাবছেন। বসে থাকলে জানলা দিয়ে বোসেদের বাড়ির কার্নিসটার দিকে, নয়ত ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকেন। কী এত ভাবেন মা—উমা হাজার চেষ্টা ক'রেও আন্দাজ করতে পারে না! তবে কি তিনি তাঁর ফেলে-আসা দীর্ঘ জীবনের কথাই ভাবেন দিনরাত? অথবা যেদিন থাকবেন না, তাঁর এই তিনটি মেয়ের কি হবে সেই কথা কল্পনা করার চেষ্টা করেন!

কিছুই বোঝা যায় না তাঁর এই স্তম্ভিত অথচ উদাসীন ভাব দেখে। প্রশ্ন করতেও সাহস কুলোয় না। চিরদিন মাকে ভয় করা অভ্যাস তার— সে অভ্যাস স্বভাবেই দাঁড়িয়ে গেছে। ভয় কাটে নি।

ঐন্দ্রিলা মাঝে মাঝে প্রশ্ন ক'রে বসে 'আচ্ছা দিদিমা, কি ভাবেন অত?'

'য়্যাঁ' যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে ওর মুখের দিকে তাকাবার চেষ্টা করেন রাসমণি, 'কি বললি? ভাবছি? না—ভাবছি আর কৈ!'

আবার তেমনি নৈঃশব্দ্যে ডুবে যান।

কেবল একটি দিন ওঁর ভাবান্তর দেখেছিল উমা। সেটা তিরিশে আশ্বিনের দিন। কথা ছিল সেদিন রাখীবন্ধনে সব বাঙালী সব বাঙালীকে বাঁধবে 'ভাই' বলে। নাড়ীর টান আরও নিবিড় ক'রে তুলবে।

তার আগে প্রায় তিন-চার দিন জ্বর হয় নি রাসমণির। স্নান করতে যাওয়ার পথে কথাটা শুনলেন। আজ কোন বাড়িতে হাঁড়ি চড়বে না, এবেলা রান্না হবে না কোথাও। গঙ্গাস্নান করবে সবাই। স্নান ক'রে খালি পায়ে এক এক দল এক এক দিকে যাত্রা করবে, রাখী পরাতে পরাতে যাবে পথের দুধারে। এই পথেই বুঝি যাবে সবাই।

বাড়ি এসেও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জিজ্ঞাসা করলেন উমাকে। তার আগে

নিষেধ করলেন উনুনে আঁচ দিতে।

উমা প্রশ্ন করল, 'কিন্তু আপনি কী খাবেন মা তাহলে? অন্তত দুখানা কাঠ জ্বেলে আপনাকে একটু দুধ গরম ক'রে দিই?'

'না না, তার দরকার নেই'—প্রবল বেগে ঘাড় নেড়ে বললেন রাসমণি, 'তুই কি পাগল হয়েছিস? আমার এই বয়সে দু-তিন দিন না খেলেও কিছু ক্ষেতি হবে না। বরং ঘরে যদি মিষ্টিটিষ্টি থাকে ত ঐ মেয়েটাকে একটু কিছু খাইয়ে দে। ছেলেমানুষ, নেতিয়ে পড়বে শেষে।'

স্বদেশী ব্যাপারে ঐন্দ্রিলার কোন সহানুভূতি ছিল না, থাকবার কথাও নয়। সে কিছু বুঝত না এসব। কিন্তু হুজুগে মেতে ওঠারই বয়স তার। দিদিমা কিছু খাবেন না—সে খাবে কচি খুকী ব'লে? কক্ষনো না।

সে বললে, 'আমার কিছু হবে না দিদিমা, আমি বেশ থাকব।...একটা বেলা বৈ ত নয়। এই ত গতবার আমি শিবরাত্তির করলুম।'

রাসমণির প্রশ্নের উত্তরে উমা যতটা জানত সবটাই বলে। কে নাকি বড়লাট—কার্জন ব'লে—বাঙালীকে জব্দ করবার জন্যে বাংলাটাকে দু ভাগ ক'রে দিয়েছে। বাঙালীরা নাকি এত বেশী লেখাপড়া শিখে ফেলেছে যে ইংরেজদের রাজত্ব করা দায় হবে এদেশে—তাই দেশটাকে দু'আধখানা ক'রে বাঙালীকে চিরদিনের মত দমিয়ে রাখতে চায়। সেই জন্যেই সব দেশ ক্ষেপে উঠেছে। ইংরেজদের ধনপ্রাণও নাকি নিরাপদ নয়—মুখ শুকিয়ে গেছে সকলকার।

দেশ যে ক্ষেপে উঠেছে তা রাসমণিও লক্ষ্য করেছেন। আজকাল গঙ্গাস্নান করতে গেলে পথেঘাটে নজরে পড়ে এক অদ্ভুত দৃশ্য! দুজন ছোকরার যদি দেখা হয়ে গেল তবে আর রক্ষা নেই। তা কে জানে চেনা আর কে জানে অচেনা! একজন বলবে 'বন্দে—', বলে সে থামবে। আর একজন পাদপূরণ ক'রে দেবে 'মাতরম্'। এই নাকি এ যুগের সম্ভাষণ। প্রণাম নমস্কার আর কেউ করবে না। 'বন্দে মাতরম্' বললেই নাকি সব সারা হয়ে গেল।

এ নাকি এক মন্ত্র উঠেছে—সকলেরই মুখে এক কথা—'বন্দে মাতরম্'!

রাসমণি বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' বই পড়েছিলেন, 'বন্দে মাতরম্' গানও পড়ে গেছেন, কিন্তু সেই গানই যে দেশসুদ্ধ লোকের মন্ত্র হয়ে উঠেছে তা অত বুঝতে পারেন নি! সে কথাটাও আজ শুনলেন। থিয়েটারে নাকি 'আনন্দমঠ' নাটক হয়ে অভিনীত হয়েছে, তাতে সুর বসিয়ে ঐ গানটাও গাওয়া হয়েছে। আর সেই গান গেয়েই ক্ষেপে উঠেছে সারা দেশ। সাহেবরা তাই আজকাল 'বন্দে মাতরম্' শুনলেই আঁতকে ওঠে—বন্দুকের গুলির চেয়েও 'বন্দে মাতরম্' শব্দ দুটি হয়ে

উঠেছে ভয়াবহ। দু-এক জায়গায় নাকি সাহেব-মায়াও চলছে।

মন দিয়ে শোনেন রাসমণি মুখে একটু তাঁর সংশয়ের ছায়াও ফুটে ওঠে। মুখে বলেন, 'শুনেছি মহারাণীর রাজত্বে সূর্য অস্ত যায় না—সারা পৃথিবীতে তাঁর রাজত্ব। সেই মহারাণীর লোকের সঙ্গে কি আর শুধু-হাতে লড়তে পারবে এরা? কে জানে!'

মহারাণী যে মারা গেছেন এটা কিছুতেই মনে থাকে না রাসমণির। আগে আগে উমা ভুল সংশোধনের চেষ্টা করত, এদানী হাল ছেড়ে দিয়েছে।

তবু আজ যেন কি একটা উৎসাহ বোধ করেন রাসমণি। এতকাল পরে কি এক নূতন উদ্দীপনা। মন আবার যেন কোথায় একটা কৌতূহলের কেন্দ্র খুঁজে পেয়েছে। জীবন পেয়েছে নব প্রাণরস। উত্তেজনায় চোখেমুখে নতুন আলো জেগেছে তাঁর।

তিনি নটার সময় গিয়ে সদরে বসেন। দলে দলে লোক গিয়েছে স্নান করতে এইবার ফিরবে তারা। এই পথেই ফিরবে। রাখী পরাবে। ঐন্দ্রিলা গিয়ে তাঁর পাশটিতে চুপ ক'রে বসে।

কিন্তু বড় রাস্তা দূরে। একটা বাড়ি পেরোলে তবে বড় রাস্তা। গঙ্গার ঘাটে যাবার পথ। সেই পথেই আজ চরম উত্তেজনা। এখান থেকে নজরে পড়ছে সেখানকার অভিনব দৃশ্য। দলে দলে ছেলেরা চলেছে সব—খালি পা, রুক্ষ চুল। আজ পথে গাড়ি নেই। যারা জীবনে কখনও হাঁটে নি, তারাও আজ রাস্তায় পা দিয়েছে।

ঐন্দ্রিলা থেকে থেকে বলে, 'দিদিমা, চলুন না ঐ বোসেদের রোয়াকে গিয়ে বসি।'

'ক্ষেপেছিস তুই!' রাসমণি থামিয়ে দেন ওকে, 'গিস্‌গিস্‌ করছে লোক ওদের রকে, তার ভেতর আমি যে কোথায় গিসে বসুব। এইখানে থেকেই বেশ দেখা যাবে।'

মধ্যে মধ্যে হুঙ্কার উঠছে, 'বন্দে—মাতরম্‌'···বলো ভাই আবার বলো, 'বন্দে—মাতরম্‌'!

রাস্তায় যাবার ভিড় কমেছে। এইবার ফিরবে ওরা। ক্লান্ত দেহ অবসন্ন হয়ে আসে রাসমণির—তবু উনি ওঠেন না। জীবনের আবার নতুন ক'রে অর্থ খুঁজে পেয়েছেন তিনি। ঘরে শুয়ে থাকা অসম্ভব।

দূরে যেন মেঘের গর্জনের মত কি যাচ্ছে। কান পেতে শুনলেন, 'বন্দে—মাতরম্‌!' কান পেতে শুনলেন গানের সুর। ঐ বুঝি সে দল এদিকেই আসছে!

রাসমণি চৌকাঠ ধরে দাঁড়ালেন।

আহা হা—কি সব রূপ! সোনার চাঁদ ছেলেরা, ধনীর দুলাল—গরম রাস্তায় পা ফেলতে পারছে না তবু সবাই চলেছে খালি পায়ে। ওদের মধ্যে একটি লোককে দেখে রাসমণি চোখ ফেরাতে পারলেন না। কন্দর্পের মত রূপ। মুখখানি যেন কে পাথর কুঁদে বার করেছে। গৌর তনু, কুঞ্চিত কেশ, ঘনকৃষ্ণ শ্মশ্রু। অল্প বয়স, তবু একটি সুমধুর গাম্ভীর্য বিরাজ করছে তাঁর সর্বাঙ্গ ঘিরে।

লোকটিও যেতে যেতে এদিক ফিরে তাকালেন। এক বৃদ্ধা ও এক বালিকা। বৃদ্ধটি যে রুগ্‌ণা তা মুখের দিকে চাইলে নজরে পড়ে। রোগশয্যা থেকে উঠে এসেছেন হয়ত বা মৃত্যুশয্যা থেকেই—দেশের ডাকে সাড়া দিয়ে। দেশব্যাপী এই প্রাণ-মহোৎসব থেকে দূরে রাখতে পারেন নি নিজেকে সরিয়ে।

পাশের লোকদের দিকে মুখ ফিরিয়ে কি যেন তিনি বললেন আস্তে আস্তে। বোধ করি এই সব কথাই। তারপর থমকে একটু থেমে নিজেই এগিয়ে এলেন গলির দিকে। নিজের হাতে রাখী পরিয়ে দিতে এলেন রাসমণি ও ঐন্দ্রিলার হাতে। পরানো শেষ হ'লে নিজেই হাত তুলে নমস্কার করলেন। বড় রাস্তার বিরাট দলটি চারিদিকের আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে গর্জন ক'রে উঠল, 'বল ভাই বন্দে মাতরম্!'

তারই মধ্যে রাসমণি প্রশ্ন করলেন, 'তোমার নামটি কি বাবা?'

'আমার নাম?' একটু ইতস্তত করলেন তিনি, তারপর সস্মিতমুখে মাথাটি নত ক'রে উত্তর দিলেন, 'আমার নাম শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর!'

'ও, তুমিই সেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির ছেলে? দ্বারিক ঠাকুরের নাতি তুমি? তোমার নাম রবি ঠাকুর? বেঁচে থাকো বাবা, দীর্ঘজীবী হও। তোমার মার জন্ম সার্থক!'

প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করেন রাসমণি।

রবীন্দ্রনাথ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, মুখে তাঁর তেমনি সবিনয় মধুর হাসি। তারপর আর একবার হাত তুলে নমস্কার ক'রে আবার রাস্তায় গিয়ে দলে যোগ দিলেন। বাকী ছেলেরা অন্য বাড়ির লোকেদের রাখী পরাচ্ছিল, তারাও কাজ সেরে ফেলেছে ততক্ষণে। আবার সেই বজ্র নির্ঘোষ—'বন্দে মাতরম্!'

রাসমণির চোখে জল এসেছিল। ঐ সুন্দর ছেলেটি নিজে এসে তাঁর হাতে রাখী পরিয়ে দিয়েছে। হেসে কথা কয়েছে, নমস্কার করেছে। তিনি যেন কৃতার্থ হয়ে গিয়েছেন। তাঁর যদি অমনি একটি ছেলে থাকত আজ! মেয়েরা শুধুই বোঝা। আজ পরপারে যাবার পথেও পায়ে বেড়ির মত এঁটে ধরেছে তাদের

দুর্ভাগ্য নিয়ে। মরেও শান্তি নেই তাঁর।

উদ্‌গত দীর্ঘনিশ্বাস দমন ক'রে আবারও সদরের চৌকাঠে বসে পড়েন তিনি।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

এক

ঐন্দ্রিলার বিয়েটা একরকম হঠাৎই ঠিক হয়ে গেল। শ্যামার জ্বর উপলক্ষে ঐন্দ্রিলা পদ্মগ্রামে এসেছিল দিন সাতেকের জন্যে। আড়গোড়ের মাধব ঘোষাল শিবপুর থেকে ফিরছিলেন হাঁটাপথে। ঐ সময়ে দেখা। দুপুর রোদে অতখানি পথ হেঁটে তৃষ্ণা পাওয়া খুবই স্বাভাবিক। আর পিপাসা-বোধ প্রবল হওয়াতে যে তাঁর অক্ষয়বাবুর বাড়ির কথাটা মনে পড়বে এতেই বা আশ্চর্য হবার কি আছে? মাধব ঘোষাল আর অক্ষয়বাবু আগে একই অফিসে কাজ করতেন। তারপর এখানকার রেল অফিসটা নতুন খুলতে মাধব ঘোষাল এসে ঢুকলেন, অক্ষয়বাবু আর এলেন না। কারণ তখনই তাঁর আর বড়বাবুর মধ্যে দুটি মাত্র বাবুর ব্যবধান ছিল।

সেই থেকে অক্ষয়বাবুর সঙ্গে তাঁর ছাড়াছাড়ি। তবু আসা-যাওয়া আছে—ক্রিয়া-কর্ম উপলক্ষে ত বটেই, এমনিও দু-একবার এসেছেন। বাড়িটা তাঁর মনে ছিল। অচেনা লোকের বাড়ি জল চেয়ে খাওয়ার চেয়ে চেনা লোকের বাড়ি গিয়ে ওঠাই ভাল। চাই কি যদি রাঁধুনী বামুন থাকে ত দুটো ভাত পাওয়াও বিচিত্র নয়। যেখানে গিয়েছিলেন সেখানে একটু দেরি হয়ে গেছে। এতটা দেরি হবে ভাবেন নি। এখনও আড়গোড়ে পাকা আড়াই ক্রোশ রাস্তা। ক্লান্ত ও অভুক্ত অবস্থায় হাঁটতে বেলা গড়িয়ে যাবে। অনেক ভেবেচিন্তে মাধববাবু অক্ষয়বাবুর বাড়ির পথই ধরলেন।

চেনা হ'লেও গত পাঁচ-ছ বছর এ পথে আসেন নি মাধব ঘোষাল। পথটা ঠিক করতে না পেরে ঈষৎ বেঁকে খিড়কীর দিকের বাগানে ঢুকে পড়লেন। আর করমচা গাছের ঝোপটা ছাড়াতেই তাঁর নজরে পড়ল ঐ অপরূপ দৃশ্য।

নির্জন পুকুর-ঘাটের বাঁধানো পৈঠেতে বসে আছে একটি বছর দশ-এগারোর মেয়ে। পরনে ছোট খয়েরী রঙের শাড়ি, তাতে ওর উজ্জ্বল গৌরবর্ণ যেন আরও খুলেছে। একমাথা কালো চুল। চোখ দুটি খুবই ডাগর কিন্তু বেমানান নয়, চোখের পাতা এত দীর্ঘ যে ওর নিটোল সুগৌর গাল দুটির অনেকখানি পর্যন্ত তার ছায়া পড়েছে—এখান থেকেই সে ছায়া বোঝা যায়। নাকটি তেমন টিকোলো নয় কিন্তু তাতেই যেন আরও ভাল দেখাচ্ছে। বিস্ফারিত আয়ত চোখে ও অমন ফুটফুটে গৌর

বর্ণে টিকোলো নাক হয়ত তেমন মানাত না। পাশেই একরাশ বাসন রয়েছে জলে ভেজানো, বোধ করি বাসন ক-খানা মাজতেই এসেছে, কিন্তু আপাতত সে রকম কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। পা দুটি জলে ডুবিয়ে বসে বসে অন্যমনস্ক ভাবে এক হাতে একটা ডাঁসা পেয়ারা খাচ্ছে মেয়েটা আর এক হাতে অলস ভাবে একটা শুকনো আমড়া-পাতা নাড়াচাড়া করছে। এত স্থির হয়ে বসে আছে যে হাত নাড়লেও পা নড়ছে না—ফলে পুকুরের জলে ঈষৎ কাঁপন মাত্র আছে, আর আছে তে-চোকো মাছের সূক্ষ্ম নিঃশ্বাসের বুদ্বুদ। তাতে পুকুরের কালো জলে এমন কোন তরঙ্গ ওঠে না যে ছবিটা নষ্ট হবে। বড় বিলিতী আমড়া গাছটার ফাঁক দিয়ে আধোছায়া-মাখা রোদ এসে পড়েছে ওর মুখে-চোখে—সেই ছবি সবটাই প্রতিবিম্বিত হয়েছে পুকুরের স্থির জলের আয়নায়। স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে বাতাস নেই কোথাও, গাছের পাতা কখনও কখনও কাঁপছে মাত্র, তাতে যেটুকু আলোর খেলা চলে—সেটুকুরর ছবিও ধরা পড়ছে পুকুরের ছায়াতে।

অপূর্ব সে ছবি। মাধব ঘোষাল কবি নন—মাইকেল আর হেম বাঁড়ুয্যের নাম হয়ত শুনেছেন—কিন্তু তাঁদের কাব্য-কালিমার এতটুকু ছোঁয়া লাগে নি মনে। তবু তিনি চোখ ফেরাতে পারলেন না। নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন সে ছবি।

পেয়ারা খেতে খেতে মেয়েটি একসময় পেয়ারাসুদ্ধ হাত নামিয়ে চুপ ক'রে কি ভাবতে লাগল। তাতে আরও সুন্দর হয়ে উঠল ছবিটি। মাধব ঘোষালও তৃষ্ণা ভুলে দাঁড়িয়ে রইলেন। জীবনে যার কখনও প্রকৃতির দিকে সৌন্দর্যের দিকে তাকাবার অবসর হয় না—প্রকৃতি তার ওপর এমনি ক'রেই শোধ নেন, একএকটি দুর্লভ মুহূর্তে অকস্মাৎ, বিস্মিত স্তম্ভিত ক'রে দেন কর্মব্যস্ত বিষয়ী মানুষকে। তার চোখে ও মনে বুলিয়ে দেন মায়ার তুলি। মাধব ঘোষালও এই মুহূর্তে শুধু যে তাঁর পিপাসার কথা ভুললেন তাই নয়—ভুলে গেলেন তাঁর জরুরী মকদ্দমার কথা, ভুলে গেলেন যে তাঁর বুড়ো ফজলি আমের গাছটা (গত চার বছর একটাও ফল দেয় নি বউল পর্যন্ত আসে না কি লাভ ও গাছ রেখে?) আজ কিনতে আসবে কথা আছে; তার দরদস্তুর করা দরকার, বায়নার টাকাটাও যদি গিন্নীর আঁচলে আটক পড়ে ত বেহাত হয়ে যাবে; ভুলে গেলেন যে পগার-ধারের বাঁশঝাড়টা নিয়ে গত ছ মাস যাবৎ মল্লিকদের সঙ্গে যে বিবাদ চলছে, আজই তার আপস হবার কথা। মধ্যস্থ রিদয় (হৃদয়) বাবুর সঙ্গে দুপুরেই একটু গোপন আলাপ সেরে নিতে পারলে মীমাংসাটা তাঁর দিক ঘেঁষেই হ'তে পারে। তিনি সব কিছু ভুলে চেয়ে রইলেন এই ছবির দিকে—এবং বুঝতেও পারলেন না যে কোন দেবশিল্পীর

আঁকা এক অপরূপ ছবি দেখে তিনি সৌন্দর্য-মুগ্ধ হয়ে এমন ক'রে তাকিয়ে আছেন। বুঝতে পারলে নিজের এই কবিসুলভ দুর্বলতায় লজ্জিত হতেন কিনা—কে-বলতে পারে!

কতক্ষণ তিনি এভাবে দাঁড়িয়েছিলেন এবং থাকতেন কে জানে, হঠাৎ সেই মেয়েটির চোখ পড়ল ওঁর দিকে এবং কচি মিষ্টি গলায় অত্যন্ত পাকা ও কটু ভঙ্গীতে ব'লে উঠল সে, 'কে রে অলপ্পেয়ে মিন্‌সে, চোখের মাথা খেয়ে চেয়ে আছে অমন ক'রে? নিজের ঘরে গিয়ে চেয়ে থাকতে পারে না?'

স্বপ্নভঙ্গ হ'ল বৈকি!

তবু মাধব ঘোষালের তখনও মোহ কাটে নি সম্পূর্ণ। তিনি দু পা এগিয়ে এসে মিষ্টি ক'রেই বললেন, 'খুকী মা—অক্ষয়বাবুর বাড়ি কি এইটে? আমি তাঁকেই খুঁজছি!'

'খুকী মা' কিন্তু কিছুমাত্র নরম হ'ল না তাতে। তেমনি ঝাঁজের সঙ্গেই বললে, 'আমি তাঁকেই খুঁজছি! তা তাঁর কি সদর বাড়ি নেই? ও ধারের পথ ছেড়ে খিড়কীর বাগানে এসে অমন ক'রে দাঁড়িয়ে না থাকলে চলে না!'

'কার সঙ্গে অমন ক'রে ঝগড়া কচ্ছিস লা খেঁদি?'

মঙ্গলা ঠাকরুন ভাত খেয়ে উঠে আঁচাতে আসছিলেন, কাছাকাছি আসতেই তাঁর নজর পড়ল মাধববাবুর দিকে, তাড়াতাড়ি টানাটানি ক'রে মাথায় কাপড়টা দিতে দিতে ফিসফিসিয়ে বললেন 'ওমা, এ যে আমাদের ফাদববাবু!...তুই ওঁর সঙ্গে অমন গাছ-কোমর বেঁধে ঝগড়া করছিলি?'

মাধব বুঝি ওঁর মামাতো জ্যাঠশ্বশুরের নাম।

এতক্ষণে ঐন্দ্রিলাও একটু অপ্রস্তুত হয়েছে। তাড়াতাড়ি সে জল থেকে উঠে এসে ওপরের চাতালে দাঁড়াল। মনে পড়ে গেল যে সত্যিই কাপড়খানা তার গাছ-কোমর ক'রে বাঁধা। অপ্রতিভ ভাবে কোমরের বাঁধনটা খুলতে খুলতে বলল, 'ওমা—আমি যে—আমি ভাবলুম—কে না কে একটা মিন্‌সে—'

আর একটু এগিয়ে এসে মাধব ঘোষাল প্রশ্ন করলেন, 'বৌ-ঠাকরুন, অক্ষয় বাড়ি আছে?'

বেশ শ্রুতিগোচর ভাবেই মঙ্গলা উত্তর দিলেন, 'বল্ না খেঁদি—ঐ বাইরের রোয়াকে বসে তামাক খাচ্ছেন!'

আর কথা না বাড়িয়ে মাধব ঘোষাল এগিয়ে গেলেন।

দুই

তবু তখনও মেয়েটি সম্বন্ধে কোন আশাই পোষণ করেন নি মাধববাবু। কায়স্থর ঘরের মেয়ে—ভাল লেগেছে এই পর্যন্ত, তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ স্থাপন করা সম্ভব তা কল্পনাও করেন নি।

কিন্তু প্রাথমিক কুশল-বিনিময়ের পরই প্রথম প্রশ্ন করলেন তিনি ওর সম্বন্ধেই, 'হ্যাঁ হে অক্ষয়, পুকুর-ঘাটে দিব্যি ফুটফুটে একটি মেয়ে দেখলুম, কে হে? তোমার কেউ ভাগ্নী কি নাতনী—'

খোঁচাটুকু নীরবে হজম ক'রে অক্ষয় হাতের হুঁকো নামিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'ফুটফুটে মেয়ে? আমার পুকুর-ঘাটে? সে আবার কি?'

তখন মোটামুটি একটা বর্ণনা দিলেন মাধব ঘোষাল; শুনতে শুনতেই অক্ষয় বলে উঠলেন, 'ও হো হো—আর বলতে হবে না। ও হ্যাঁ—বামুন মেয়ের মেজ মেয়েটা এসে আছে বটে ক-দিন। ও ত এখানে থাকে না, ওর কথাটা মনেই ছিল না!'

'বামুন মেয়ের মেয়ে? সে কে, তোমার রাঁধুনী?'

'না না—তার চেয়ে একটু উঁচু। আমাদের নিত্যসেবা করার জন্যে একঘর বামুন এনে বসানো হয়েছিল। তা সে বেটা ত চামারের অগ্রগণ্য—কোথায় নেশা-ভাঙ্ ক'রে পড়ে থাকে। ঐ মেয়েটির দাদাই এখন পুজোপাট সব করে।'

'ও পুজুরী বামুন? তা কি গোত্তর ওদের?'

'কেন হে? ছেলের বিয়ে দেবে নাকি, গাঁই-গোত্তর সব খবর নিচ্ছ?

'দিতেও ত পারি। মেয়েটি দেখতে বেশ!'

আবারও হুঁকো নামালেন অক্ষয়। একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'তোমাদের ত বাৎস্য গোত্তর? গোত্তরে আটকাবে না—তবে দেবে ওর সঙ্গে ছেলের বিয়ে? বাপটা বড় ছোট, বড় নীচ। আর ছেলেমেয়েগুলো—অবিশ্যি অভাবের সংসার ব'লেই—বড় চোর। আমার বাগানে ফল-ফুলুরি হবার যো নেই। লুকিয়ে লুকিয়ে চুরি করে আর বেচে আসে। মেয়েটাও বড় বাচাল, ঝগড়াটি।...তবে হ্যাঁ—ওর মা বেশ ভদ্র বংশের মেয়ে বলেই মনে হয়। লেখাপড়াও জানেন—আমাদের এদিক-ঘরে যা একেবারে দুর্লভ।'

'তাহ'লে এমন পাত্তরের হাতে পড়ল কি ক'রে?'

'তখন নাকি ওদের অবস্থা বেশ ভাল ছিল। ঘরবাড়ি জমি-জমা—সম্পত্তি ছিল বিস্তর। গুরুবংশ ওরা। সব খুইয়েছে এরা দু'ভাই। বামুনের ঘরের গরু

হ'লে যা হয়—একেবারে নিরেট মুখ্যু ত!'

জলখাবার ইতিমধ্যে এসে পৌঁচেছে। তা ছাড়াও—চোখে চোখে মঙ্গলার সঙ্গে অক্ষয়বাবুর কথাবার্তা হয়ে গেছে। অর্থাৎ ভাতের ব্যবস্থা হয় না? মঙ্গলা ঘাড় নেড়ে জানিয়েছেন যে সে কথা তিনি ভেবেছেন—হবে।

বামুন-মেয়ের দুদিন জ্বর। মঙ্গলাদের হেঁশেলে ভাত হবে না। লুচি ভেজে দেওয়া যায়—ঘরে ময়দা আছে। কিন্তু এই দুপুরে লুচি?

তাছাড়া ওঁদের কথার টুকরো দু-একটা মঙ্গলার কানে এসে পৌঁচেছে। মতলব গেছে মাথায়। আনন্দে উত্তেজনায় তাঁর চোখে জলে উঠেছে আগুন। এই শ্রেণীর ষড়যন্ত্রে মঙ্গলার বড় উৎসাহ।

উনি হাঁপাতে হাঁপাতে শ্যামার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। খাওয়া-দাওয়া সেরে সবে সে মেঝেতে আঁচলটা বিছিয়ে শুয়েছে।

'বাম্‌নি বাম্‌নি—শীগ্‌গির ওঠ্‌! দে দিকি পাতার উনুনে একগাল আলোচাল চড়িয়ে। দুটো আলুভাতে দিয়ে ভাতটা চাপিয়ে দে—আমার হেঁশেলে আ-সগ্‌ড়ি ডাল-চচ্চড়ি আছে, এনে দিচ্ছি। আর একটু দুধ দিই—তাতেই হয়ে যাবে। নে নে—হাঁ ক'রে শুয়ে থাকিস নি, ওঠ্‌।'

'তা ত উঠছি। কিন্তু মা, আমার হেঁশেলে খাবে—বামুন বুঝি?'

'ওলো হ্যাঁ। নেকী! বামুন বামুন—তোদের পালটি ঘর! ঘোষাল বামুন—তবে বামুন ত? তোরাই বা কি এমন নৈকুষ্যি কুলীন? পুজুরী বামুন আবার বামুন! নে নে—তাকিয়ে থাকিস নি অমন জড় ভরত হয়ে। ওর বড় ছেলের বে এখনও হয় নি বোধ হয়। হ'লেও আরো দুটো বাকী। সব রেল অফিসে কাজ করে। তোর মেয়ে খেঁদিকে দেখেছে—দেখে পছন্দও হয়েছে। সেই জন্যেই ত তোর খপ্পরে এনে ফেলছি। ছাখ যদি খেলিয়ে তুলতে পারিস! আমার হেঁশেল থেকে ত ভাত দিতে পারবো না—বামুন ঠাকুরুনের জ্বর—আমাদের ছোঁয়া নেপায় রান্না হয়েছে। এ এক রকম শাপে বর হ'ল, কী বলিস!'

মঙ্গলা ভারি খুশী হয়ে উঠেছেন ততক্ষণে। এ এক রকম খেলা। বৈচিত্র্যহীন জীবনে বর্ণাঢ্য বিচিত্রতা। তিনি নিজেই বিপুল দেহ নেড়ে যতটা পারেন সাহায্য করেন। পাতা এগিয়ে দেন উনুনে গোছা গোছা ক'রে।

শ্যামাও ইঙ্গিতটা বুঝে ফেলেছে বৈকি।

শুধু আলুভাতেই নয়—কদিন আগে হেম সিধে পেয়েছিল কোথায়, তাতে একটু গাওয়া ঘি পাওয়া গিয়েছিল, পাঁপরও ছিল দুখানা। এ খাবার এদেশে দুর্লভ বলে সযত্নে তুলে রেখেছিল শ্যামা, জামাই আসার অপেক্ষায়। ডাল আর

একতাল চচ্চড়ি মঙ্গলা এনে দিয়েছিলেন ওঁদের হেঁশেল থেকে ; শ্যামা তাড়াতাড়ি ক'রে দিলে বড়িভাজা, পাঁপরভাজা, বড়ির ঝাল। গরম ভাতে গাওয়া ঘি ঢেলে সযত্নে ঠাঁই ক'রে খেতে দিলে শ্যামা। ইতিমধ্যে মঙ্গলা ঠাকরুন ঐন্দ্রিলাকে একটু সাজিয়ে-গুজিয়ে দিয়েছেন। মাধব ঘোষালের সামনে শ্যামা বেরোবে না—যা দরকার হবে ঐন্দ্রিলাই দেবে।

এদের রান্নাঘরের দাওয়ায় খেতে বসে একটু অবাকই হয়ে গেলেন মাধব ঘোষাল। বাটির মত ছোট ক'রে ভাত বাড়া, তার ওপর ছোট একটি বাটিতে গাওয়া ঘি—ভাতের চূড়োর ওপর বসানো, ভাতে ভাজা তরকারি নিখুঁত পরিপাটির সঙ্গে সাজানো, থালারই এক কোণে গোল ক'রে কলাপাতা কেটে তাতে নুন-লেবু, সবটার ভেতরই যেন একটা নাগরিক পরিপাট্য।

পরিতৃপ্তির সঙ্গেই খেলেন। ক্ষুধার অন্ন বলেই নয়, আয়োজনও ভাল। মঙ্গলা একটু দুধ এনে দিয়েছিলেন। সেই দুধের বাটিতে একটা পাকা কলা ও গুড় দিয়ে ঐন্দ্রিলা এনে পাতার কাছে নামিয়ে রেখে প্রশ্ন করলে, 'আর দুটি ভাত এনে দিই আপনাকে ?'

তার সেই 'সবিনয়' ভঙ্গিমা, শুভ্র গৌর গণ্ডে লজ্জারক্ত লালিমা—সবটা জড়িয়ে বড় ভাল লাগল মাধববাবুর। তিনি বললেন, 'তা আনো মা। খুব দুটিখানি!'

তারপর ভাত খাওয়া শেষ হলে আঁচিয়ে উঠে পান নেবার সময় ওর গালটি তুলে ধরে মাধববাবু প্রশ্ন করলেন, 'তুমি আমাদের বাড়ি যাবে মা-লক্ষ্মী ?'

সপ্রতিভ ঐন্দ্রিলা তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে, 'কেন যাবো না ? আপনিই বললেই যাবো! কিন্তু আপনিও আবার আসবেন—মা বলে দিলেন। আজ খাওয়ার বড় কষ্ট হ'ল, আর একদিন খবর দিয়ে আসবেন। কেমন ?'

একটু মুচকি হেসে মাধব বললেন, 'আসব বৈ কি। ঘন-ঘনই আসব হয়ত।'

অক্ষয়বাবুর ঘরে গিয়ে বসে কিছুক্ষণ নীরবে তামাক খেয়ে মাধববাবু বললেন, 'আমি মন স্থির ক'রেই ফেললাম। তুমি ভাই ওর মার কাছে কথাটা পাড়ো!'

'কার সঙ্গে ?'

'আমার বড়ো ছেলে—হরিনাথ। তার ত এখনো বিয়ে হয় নি।'

'তার বয়স কত হ'ল ? মানাবে ? এর বড় জোর দশ।'

'বয়স ওর একটু বেশীই হয়েছে। ঠিক মনে নেই আমার, তবে তেইশ-চব্বিশের কম না। হয়ত পঁচিশ হতে পারে, তা আর কি হবে! লোকে ত দোজবরে ওর চেয়ে বেশী বয়সে বিয়ে করছে। ন দশ বছরের মেয়ে! আমাদের

পাড়ার গোকুল মুখুজ্জে চল্লিশ বছর বয়সে যে সাত বছরের মেয়ে বিয়ে করে বসল। না—না—তাতে আটকাবে না।'

অক্ষয় বললেন, 'কিন্তু পয়সাকড়ি ঢুঁ-ঢুঁ—তা বলে দিচ্ছি! শুধু ভাত মুখে উঠবে ত? বোঠানের?'

'হ্যাঁ, উনি একটু গোলমাল করবেন বটে। তবে আমি মন স্থির করে ফেলেছি। আমি ত এই, তায় আমার পরিবার একেবারে আবলুস—ছেলেমেয়ে হয়েছে, চাওয়া যায় না। আমি তাই একটু পনটাই বদলাতে চাই।'

তারপরে, যেন মানসচক্ষে গৃহিণীর উগ্র মূর্তিটা একবার দেখে নিয়েই, কণ্ঠস্বরে জোর দিয়ে বললেন, 'কি আর হবে—না হয় মাগী দশবাই-চণ্ডী হয়ে খানিক নাচবে ধেই ধেই ক'রে! আর ত কিছু করতে পারবে না। তুমি দ্যাখো কথাটা পেড়ে।'

হুঁকো নামিয়ে রেখে মাধব ঘোষাল আবার আড়গোড়ের পথ ধরলেন।

তিন

মঙ্গলা ছুটতে ছুটতে এসে খবরটা দিলেন।

'দাঁড়া-হরির লুট দে লো বামুনি! হ্যাঁ—জোর বরাত বটে তোর মেয়ের। পাত্তর পক্ষ নিজে থেকে সেধে কথা পাড়ে এমন ত কখনও শুনি নি। ইস্—আবার নিজেই স্বীকার হয়ে গেল যে পয়সার কামড় করবে না!'

আনন্দের প্রথম আলোড়নটা থেমে যেতে শ্যামা ছেলের খবর নিতে লাগল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। মঙ্গলা জানেন না কিছুই। অক্ষয়বাবুকে বার বার জিজ্ঞাসা ক'রে আসতে হ'ল। অক্ষয়বাবুও বিশেষ কিছু জানেন না। শুধু জানেন যে, ওদের ঢের বিষয়সম্পত্তি আছে। জমি থেকে বছরের খোয়ারী ধানটা উঠে যায়। চার ভাই ছেলেরা—এইটি বড়। ইংরেজী ইস্কুলেও নাকি পড়েছিল ক-বছর। রেল অফিসে কাজ করে। সব দিক দিয়েই সুপাত্র। দোষের মধ্যে বয়স একটু বেশী আর রং নাকি কুচকুচে কালো।

'কালো! বয়স বেশীর জন্যে ভাবি না মা—মেয়ের আমার ত দেখছেন কালোতে কি ঘেন্না! শেষে জামাইয়ের সামনে বাঁকা বাঁকা কথা বলবে না ত?

'ওলো থাম্ দিকি। অমন কত ঘেন্না দেখলুম! রাখ্। সব ঠিক হয়ে যাবে। পুরুষের আবার রূপ নিয়ে ব্যাখ্যানা! নে, কলকাতায় চিঠি লেখ্। দ্যাখ্ তোর মা-মাগীর কাছ থেকে কিছু বাগাতে পারিস্ কিনা!'

শ্যামা সেই উপদেশই শোনে। রাত্রে পিদিমের আলোতে বসে দীর্ঘ পত্র লেখে উমাকে। মার শরীর খারাপ—তাছাড়া তিনি আজকাল যেন কি রকম উদাসীন

হয়ে পড়েছেন! যা করবে উমাই।

পাত্রের মোটামুটি বিবরণ দিয়ে, সেদিনের ঘটনাটা আনুপূর্বিক বিবৃত ক'রে শ্যামা শেষ অনুচ্ছেদ লিখলে,

"এমন অযাচিত ভাবে পাত্রপক্ষ আসিয়া পড়ায় এবং নিজ হইতে প্রস্তাব করায় ঘটনাটাকে প্রজাপতির নির্বন্ধ বলিয়াই বোধ হইতেছে। এ প্রস্তাব আপত্তি করারও কিছু দেখিতেছি না। আমার মত ভিখারীর মেয়ের আর ইহা অপেক্ষা ভাল সম্বন্ধ কি হইতে পারে? আশা করি তুমি বা মা-ও এ পাত্র পছন্দ করিবে না। একমাত্র যা পাত্রের গায়ের রং শ্যামবর্ণ। তা কি আর সব মনের মত হয়? তবে শুনিতেছি স্বাস্থ্য খুব ভাল।

"এক্ষণে কথা হইতেছে, এ মেয়ে তোমারই। তোমার অমতে কিছু হইতে পারে না। তোমার নিকট হইতে কথা না পাইলে কোন চেষ্টা করিব না। মার শরীর খারাপ—আমার ইচ্ছা বিবাহ কলিকাতার বাড়ি হইতেই দিই। তাহা না হইলে মা কোন নাতি-নাতনীর বিবাহ দেখিতে পাইবেন না। আশা করি ইহাতে তোমার কোন আপত্তি হইবে না।"

অনেক মুন্সিয়ানা ক'রে চিঠিটা লিখলে শ্যামা। দেনা-পাওনার কথা একবারও উল্লেখ করলে না। কলকাতার বাড়িতে বিয়ে দিলে সবই ওদের ঘাড়ে পড়বে—তখন কি আর হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারবে! শ্যামা খামখানা মুড়তে মুড়তে আপন মনেই হেসে উঠল।

চিঠিটা পড়ে উমাও হাসল অনেকক্ষণ ধরে। শ্যামার চালাকি কি আজও সে ধরতে পারবে না—শ্যামা এতই বোকা ভাবে নাকি ওকে? আশ্চর্য!

রাসমণিও চিঠিখানা পড়লেন। ঐন্দ্রিলার ওপর এই ক'বছরে ওঁরও একটা মায়া পড়ে গিয়েছে। মুখে স্বীকার না করলেও মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হন তিনি।

সেদিন আর কিছু বললেন না। পরের দিন উমা যখন এসে প্রশ্ন করলে, 'তাহলে ছোড়দিকে কী লিখব মা?' তখন একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'আমি পঞ্চাশটা টাকা দেব, আর আমার কানের কেরাপাত জোড়া। তবে ওসব ঝঞ্ঝাট এখানে হবে না, তাই লিখে দাও।'

উমা এই প্রস্তাব জানিয়ে নিজেরটাও জুড়ে দিলে। তার হাতে নিজস্ব পনরো-ষোল টাকা আছে, ভাল শাড়ি যেন সেই টাকায় একটা কিনে দেয় হেম। মার শরীর খারাপ, তিনি যেতে পারবেন না। এখানে ত বিয়ে দেওয়া অসম্ভব। চেঁচা-

যেটি গোলমাল রাসমণি একদম সহ্য করতে পারেন না। সুতরাং তাদের বাদ দিয়েই যেন শ্যামা মেয়ের বিয়ের আয়োজন করে। বরং যদি মেয়ে-জামাই একদিন আসে ত খুব ভাল হয়—যথাসাধ্য আদর-যত্ন সে করবে। আর তাহলে রাসমণিও নাতজামাই দেখতে পাবেন।

শ্যামা এই কঠিন চিঠির জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে আশা করেছিল ঢের—তার কিছুই পেলে না। তবে পড়ে-পাওয়া চোদ্দআনাই লাভ! মঙ্গলা কিছু ধার দেবেন হেমও তার যজমান বাড়ি থেকে চেয়ে-চিন্তে কিছু আনতে পারবে। হয়েই যাবে একরকম ক'রে।

কিছু দিতে পারবে না বলেও একেবারে অব্যাহতি পায় নি শ্যামা। শাশুড়ী বেঁচে আছেন, খুব বেশী কষাকষি করতে গেলে হয়ত বিগড়ে যাবেন। শ্বশুরও তখন পিছিয়ে যাবেন হয়ত। একশ এক টাকা নগদ। আট গাছা চুড়ি। জামাইয়ের আংটি, চেলির জোড়। দান সামিগ্‌গির ত আছেই। সব জড়িয়ে অনেক পড়ে যাবে।

কিন্তু উপায় কি?

শ্যামা একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখলে।

ঐন্দ্রিলা বিয়ের কথার পর কলকাতা চলে এসেছিল, আশীর্বাদ উপলক্ষে নিয়ে যেতে হবে। শ্যামা নিজে নিতে এল ওকে। কলকাতা থেকে কিছু বাজার ক'রে নিয়ে যাবে হেম, সেই সঙ্গেই ওরা ফিরবে।

উমা মৃদু অনুযোগ করলে, 'এত কাণ্ড ক'রে তোমার আসবার দরকার কি ছিল ছোড়দি!'

'এ ত আমি আসিই রে। বিয়ের আগে তোদের সঙ্গে একবার দেখা করব না তাই বলে?'

পথশ্রম কাটিয়ে আহারাদি ক'রে শ্যামা মার কাছে গিয়ে বসল। রাসমণি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন একেবারে। সেদিন জ্বরটা ছিল না, তবু শুয়েই ছিলেন। বিছানারই এক পাশে বসে খানিকক্ষণ নিঃশব্দে পায়ে হাত বুলোবার পর শ্যামা বললে, 'মা, আপনাকে যদি একখানা গাড়ি ক'রে নিয়ে যাই এখান থেকে—সোজা! আপনি যেতে পারেন না? খেঁদির বিয়েটা দেখতেন!'

রাসমণি চোখ বুজে শুয়ে ছিলেন, সেই ভাবেই রইলেন। সংক্ষেপে শুধু বললেন, 'না।'

'কেন মা?' শ্যামা আবার প্রশ্ন করে।

'ইচ্ছে নেই।' সংক্ষিপ্ত উত্তর।

একটু পরে চোখ খুলে বললেন, 'জামাই-বাড়ি আমি যাব না—তা ত ভালো ক'রেই জানো মা, আমার শরীরও বইবে না। সেজন্যে তুমি আসোও নি। মতলবটা কি খুলে বলো দিকি? আমার পেটে হয়েছ মা, আমি তোমার পেটে হই নি। আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না।'

শ্যামা একটু ক্ষুণ্ণই হ'ল। সবটাই কি সত্যি-সত্যিই তার স্বার্থ?

হয়ত উমাই দিনরাত ওঁকে বোঝায় যে ছোড়দির শুধু স্বার্থ ছাড়া অন্য কোন চিন্তা নেই।

বেশ একটা আহত ভাবই দেখাতে পারত শ্যামা, বক্তব্যটা মুহূর্ত-কয়েকের মধ্যেই মনে মনে গুছিয়ে এনেছিল, কিন্তু সব মাটি ক'রে দিল হতভাগা মেয়েটা। এখানে আসবার আগে মঙ্গলার সঙ্গে শ্যামার কথাবার্তা সে কিছু কিছু শুনেছিল। সে ফুট ক'রে বলে বসল, 'মা কেন এসেছে জানেন দিদিমা, দানের বাসনগুলো বাগাতে! যদি পাওয়া যায়!'

'তুই ছোট মুখে বড় কথা বলিস কেন বল্ ত—সব তাইতে! যা, সুমুখ থেকে বেরিয়ে যা বলছি। হতচ্ছাড়ী বাঁদরী মেয়ে কোথাকার! আমি ওর ইয়ার!'

তারপর একটু থেমে ওপাশে দেওয়ালটার দিকে চেয়ে বললে, 'সত্যি কথাই ত, চেয়ে-চিন্তে ভিক্ষে ক'রেই যখন আমাকে বিয়ে দিতে হবে তখন আর চক্ষুলজ্জা করলে চলবে কেন?…বাসন কখানা যদি দিতে পারেন ত সত্যিই উবগার হয়!'

রাসমণি আবার সংক্ষেপে বললেন, 'সে এখন হবে না বাছা'।

শ্যামার ধৈর্যের বাঁধ এবার ভাঙল, বললে, 'আপনার এক সিন্দুক বোঝাই বাসন, আমি কি তা থেকে দুখানা পেতে পারি না?…আমারও ত ভাগ একটা আছে!'

রাসমণি এবার পূর্ণদৃষ্টিতে চাইলেন ওর দিকে, কঠিন কণ্ঠে বললেন, 'আমি বেঁচে থাকতে কিসের ভাগ লা তোর? তাছাড়া আমি এখনও কদিন বাঁচব তার ঠিক কি? হয়ত এরপর ঐ বাসন বেচেই খেতে হবে। মানুষের জীবনমরণ কি বলা যায় কিছু! না, ও আমি এখন হাতছাড়া করতে পারব না।'

শ্যামা মাকে চিনত। ওঁর এ কণ্ঠস্বরের পর আর কিছু বলতে সাহস হ'ল না। ক্ষুণ্ণ মনেই নগদ পঞ্চাশটা টাকা আর কেরাপাত জোড়া আঁচলে বাঁধল। কেবল অব্যাহতি পেলে না উমা। শুধু পনেরোটা টাকা দেওয়া চলল না। টুকিটাকি দু-একটা জিনিস কিনে দিতে হ'ল—ছাত্রীদের বাড়ি থেকে আরও দু চার টাকা আগাম চেয়ে এনে দিতে হ'ল।

ঐন্দ্রিলা আশা করেছিল যে উমা শেষ অবধি যেতে রাজী হবে। উমাকে এই ক'বছরে সে একটু ভালই বেসেছিল। যাবার সময় বললে, 'তুমি সত্যিই

যাবে না নাকি ছোট মাসি? ওমা, তবে কি হবে!'

শ্যামাও বললে, 'চ না রে উমি, তোরই ত মেয়ের বিয়ে।'

উমা মাথা নিচু ক'রে ধীরে ধীরে বললে, 'আমার ছায়া যেন কোন বিয়েতে না পড়ে ছোড়দি—এ ত আপনার জন! অতি বড় শত্রুও বিয়ের সময় যেন আমার মুখ না দেখে।'

শ্যামা ঠিক এ উত্তরটার জন্য প্রস্তুত ছিল না। এর পর কোন অনুরোধ করতে তারও মুখে বাধল। নীরবে নতমুখে খানিকটা দাঁড়িয়ে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নেমে গেল।

কী হ'ল ঐন্দ্রিলা তা বুঝল না কিন্তু উমার কণ্ঠস্বরে অকারণেই তারও বুকটা উদ্বেল হয়ে দুই চোখে জল ভরে এল। মাসির সব কথা বোঝার মত বয়স তার হয় নি, সবটা শোনেও নি সে। শুধু এইটুকু বুঝলে যে এমন একটা শোচনীয় ব্যর্থতার ইতিহাস আছে ওর—এই বাইরের হাসিখুশি প্রতিদিনকার আচরণের আড়ালে—যার এক ভগ্নাংশও কোন মেয়ের জীবন থেকে সুখ-সৌভাগ্য হরণ করার পক্ষে যথেষ্ট। তাই মাসি তার দুর্ভাগ্যের ছায়া পর্যন্ত ফেলতে চায় না ওর বিবাহে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে নিজের ভাবী জীবন সম্বন্ধে কেমন এক ধরনের নাম-না-জানা আশঙ্কা অনুভব লাগল সে নিজের অজ্ঞাতেই। অতটা সে বুঝল না—শুধু মনটা তার ভারী হয়ে রইল অনেকক্ষণ পর্যন্ত।

চার

বিয়ের মাসখানেকের মধ্যেই শ্যামা একদিন মেয়ে জামাই নিয়ে এসে হাজির হ'ল। মহার বিয়ের পর এঁরা অভয়কে নিমন্ত্রণ করতে দু-একদিন সে এসেছিল বটে কিন্তু সে একাই এসেছিল এমন ঘটা ক'রে মেয়ে জামাই নিয়ে শ্যামা কখনও আসে নি। হঠাৎ এতখানি মনোযোগের কারণটা বুঝতে না পেরে উমা অনেক কিছুই আন্দাজ করতে চেষ্টা করে।

শ্যামার অবশ্য একটা কৈফিয়ত তৈরিই ছিল, 'মায়ের যে অবস্থা দেখে গেলুম, খেঁদির বর যে দেখাতে পারব এ আশা আর ছিল না। তাড়াতাড়ি তাই হুড়তে-পুড়তে ছুটে এলুম। তা জামাইয়ের আবার ছুটি হবে তবে ত! রবিবারের সঙ্গে আর একটা দিন ছুটি পড়ল এবার, তাই আর দেরি করলুম না।'

ঐন্দ্রিলার বরের দিকে তাকিয়ে উমা স্তম্ভিত হয়ে গেল।

এ যে শ্যামা-শিবের উলটোটা! যে মেয়ে কালো হাঁড়িতে খেতে চাইত না,

কালো মাছ পাতে দিলে উঠে চলে যেত—তার এ কি বর হ'ল ?

কুচ্‌কুচে কালো হরিনাথ। এত কালো যে চোখমুখ অন্ধকারে বোঝা কঠিন। কিন্তু স্বাস্থ্যবান ছেলে। তেমনি বিনত ও ভদ্র। কথা বলতেও জানে—অভয়ের মত গম্ভীর স্বল্পভাষী নয়। বেশ হাশি-খুশি স্বভাবের। খানিক কথাবার্তা বলবার পর উমার ভালই লাগল জামাইকে।

শ্যামাও বার বার বলতে লাগল, 'এই-ই বলতে গেলে তোমার আসল শাশুড়ী বাবা, আমি ত মেয়ে পেটে ধরেই খালাস!'

ওর এই অতিশয়োক্তিতে লজ্জা করে উমার। এসব কথার সঙ্গে যে কৌতূহল জড়িয়ে থাকা স্বাভাবিক—কেন উমা বাপের বাড়ি থাকে, কেন ঐন্দ্রিলার বিবাহে যায় নি সে কথা উঠেছে কিনা, হরিনাথ কিছু শুনেছে কিনা কে জানে! যদি সব শুনে থাকে ত কি লজ্জা!

ছি-ছি! স্বামী যাকে গ্রহণ করলে না, সে স্ত্রীর কোন ভদ্র সমাজেই বুঝি মুখ দেখানো উচিত নয়।

কিন্তু হরিনাথের কথা থেকে কিছুই বোঝা যায় না। সে সহজ ভাবেই এটা ওটা গল্প ক'রে যায়। রাসমণির সঙ্গে দু-একটা রসিকতার চেষ্টাও করে। তবে রাসমণির সহজ গাম্ভীর্যে ও নিস্পৃহ নিরাসক্তিতে ধাক্কা খেয়ে সে রসিকতা জমতে পায় না। অবশ্য রাসমণিরও ভাল লাগে হরিনাথকে। তিনি সামনে বসিয়ে ওকে খাওয়ান। মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেন।

ওদের ঘরবাড়ি পরিবার সম্বন্ধে দু-একটা প্রশ্ন করেন রাসমণি। হরিনাথও বেশ খুঁটিয়ে সব জানায়। বহুক্ষণ ধরে বসে গল্প করে।

বিরাট একান্নবর্তী সংসার ছিল ওদের। এই সবে ওর বাবা ও কাকারা পৃথক হয়েছেন। তবে মামলা-মকদ্দমা কিছু হ'তে দেন নি বাবা। তিনটি সমান ভাগ ক'রে কাকাদের বলেছেন এক একটা ভাগ বেছে নিতে। যে ভাগটা বেঁচেছে সেইটিই উনি নিয়েছেন। তাতে ঠকেন নি মাধব ঘোষাল—বরং কিছু যেন জিতেছেনই। ওরা সকলেই রেলে চাকরি করে। কেবল ছোট ভাইটা স্কুলে পড়ছে। জমি-জমা যা আছে তাতে বছরের ভাত হয়ে যায়। গরু বাছুর আছে। ছাগলও ছিল—গুরুদেব এসে বারণ করেছেন, পূর্বধর্ম বিনাশপ্রাপ্ত হয় ছাগলনাদি মাড়ালে—তাই বাবা বিলিয়ে দিয়েছেন বাধ্য হয়ে। মোটামুটি ওদের সুখের সংসার। এক বুড়ী ঠাকুমা আছেন, বাপের পিসি—তা তিনিও মানুষ ভাল। আপন মনেই বকেন। তবে ঝগড়া-ঝাঁটি বিশেষ করেন না।

অনর্গল বকে যায় হরিনাথ।

ওর বিয়েতে কি কম বাগড়া পড়েছিল ? বিয়ে হয়ত বন্ধই হয়ে যেত। বিয়ের ঠিক দুটি দিন আগে ওর এক ভাই বিপিন আসছিল শিবপুর থেকে—পথে এক পুলিস-হাঙ্গামে জড়িয়ে পড়ে। কতকগুলো স্বদেশী ছেলে আসছিল সেই পথে—ওকে পেয়ে ওর সঙ্গে সেধে গল্প করতে শুরু করে। বিপিন অত জানত না হঠাৎ পুলিস ঘেরাও করে। তিন দফা চার্জ তাদের নামে—ডাকাতি, নরহত্যা, আরও একটা কি। সেই কথা শুনে বাড়িতে ত কান্নাকাটি। ওর বাবা ছুটলেন তখনই হাওড়ায়—ভাগ্যিস ওর সঙ্গে বিয়ের বাজার ছিল, আর ডাকাতির দিন সে অফিসে ছিল, সাহেব নিজে লিখে দিলেন, তাই কোনমতে ঘুষ-ঘাস দিয়ে মাধববাবু ছাড়িয়ে আনতে পেরেছিলেন। তাও ত্রিশ ঘণ্টা হাজতবাস করতে হয়েছিল। বিপিন ছাড়া না পেলে হয়ত এ বিয়েই হ'ত না। ওর মা ছেলেদের বড্ড ভাল-বাসেন কি না—

এমনি কত কথা বলে যায় হরিনাথ। শ্রান্ত অর্ধ-নিমীলিত চোখ দুটি মেলে শোনেন রাসমণি। পৃথিবী থেকে একটা পা বাড়িয়ে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন তিনি—এখন এ সব কথা যেন শিশুকণ্ঠের কাকলি বলে মনে হয়। তবুও মিষ্টি লাগে শুনতে। নবীন জীবন এদের, আশা আকাঙ্ক্ষা আসক্তিতে ভরপুর। আহা বেঁচে থাক, ভোগ করুক জীবনটা। তাঁর রক্ত আছে বলেই ভয় হয়। তাঁর দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের ছোঁয়া না লাগে ওদের জীবনে। প্রসারিত জীবনপথ ওদের সহজ ও ছায়া-শীতল হোক—কাঁটা যা কিছু তাঁদের মা-মেয়ের ভাগ্যেই যেন শেষ হয়ে যায়।

মৃত্যু-স্তিমিত চোখে স্নেহ ও আশীর্বাদ উপচে পড়ে রাসমণির।

পাঁচ

ঐন্দ্রিলাকে নির্জনে পেয়ে প্রশ্ন করে উমা, 'হ্যাঁলো, বর পছন্দ হয়েছে ত ? ঠিক ক'রে বল্।'

ঐন্দ্রিলার শুভ্র গাল দুটিতে কে যেন মুঠো ক'রে আবির ছড়িয়ে দেয়। মাথা হেঁট হয়ে আসে লজ্জায়। তবু পাকা বুড়ীর মতই উত্তর দেয়, 'ওমা, তা না হয়ে আর উপায় আছে! মেয়েমানুষের বর আবার পচন্দ অপচন্দ কি বলো ? এ ত একজন্মের কথা নয়—কিংবা কাপড় জামাও নয় যে অপচন্দ হ'ল আর ছেড়ে দিলুম। এ যে জন্মান্তরের সম্বন্ধ গো।'

উমার মুখটাও রাঙা হয়ে ওঠে নিমেষে।

জন্মান্তরের সম্বন্ধ—ঠিকই ত! কিন্তু জন্ম-জন্মই কি তাকে এই অভিশাপের

বোঝা বয়ে বেড়াতে হয়েছে আর হবে? ঐ স্ত্রীলোকটাও কি জন্ম জন্ম ধরে তার স্বামীকে অনুসরণ করছে? নাকি ওরই সম্পর্কটা জন্ম-জন্মের—নেহাত কোন অভিশাপে এবার নিচু ঘরে এসে জন্মেছে কিন্তু ঐকান্তিক আগ্রহ ও প্রেম স্বামীকে টেনে এনেছে নিচে!…তাহ'লে উমার সম্পর্কটা কি ছিল?

অবোধ্য কতকগুলো প্রশ্ন মনের মধ্যে নিমেষে জেগে নিমেষেই মিলিয়ে যায়। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিয়ে হাসি-হাসি মুখেই প্রশ্ন করে উমা, 'তবে যে বড় কালোকে ঘেন্না করতিস! কত বিচক্ষণা করতিস কালো জিনিস নিয়ে! কইমাছ মাগুরমাছ খেতিস না! এখন এত কালো সহ্য করছিস কি ক'রে?'

হাত-পা নেড়ে ঐন্দ্রিলা বলে, 'সে কেলেঙ্কারের কথা আর ব'লো না ছোট মাসি। কালো শুনেছিলুম এই পজ্জন্ত, বে'র সময় ত আর চেয়ে দেখতে পারি নি ভাল ক'রে। ভয়ে লজ্জায় যেন চোখ বুজে আসছিল, চোখ মেলে চাইব কি! শুভদৃষ্টির সময় একবার চোখ চেয়েছিলুম কিন্তু সত্যি বলছি মাসি সে সময় ভাল ক'রে কিচ্ছু নজরে পড়ে নি। হারিকেন লণ্ঠনের আলোতে ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা কী যেন একটা, সব তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল। পরের দিন কুসুমডিঙের সময় ত আগাগোড়া ঘাড় হেঁট ক'রে বসে। মা শিখিয়ে দিয়েছিল, খবরদার মাথা তুলবি নি, তাহ'লে লোকে বলবে বৌটা বেহায়া। একেবারে ফুলশয্যের রাত্তিরে সময় মিলল। কিন্তু আমি ত সেয়ানা আছি, জানি সবাই আড়ি পাতবে আমি বিছানায় শুয়েই বালিশে মুখ গুঁজে ঘুমের ভান ক'রে পড়ে রইলুম। ও হরি, ভান ভান—রাতও ত ঢের হয়ে গিছল—আমি সত্যি-সত্যই কখন ঘুমিয়ে পড়েছি!'

এক নিঃশ্বাসে এতগুলো কথা বলে, বোধ হয় দম নেবার জন্যেই থামল ঐন্দ্রিলা। কিন্তু থামলে উমার চলে না। ঐ বালিকার আনন্দের নেশা লেগেছে তার মনে। সে সাগ্রহে বললে, 'তারপর?'

তারপর—আদ্দেক রাত্তিরে ঘুম ভেঙে গেছে, আপনিই কি ক'রে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে চেয়ে দেখি—মাগো মা, বললে বিশ্বাস করবে না ছোট মাসি—ঠিক মনে হ'ল একটা বুনো মোষ শুয়ে আছে আমার পাশে। আমার এমন ভয় হ'ল—আমি একেবারে ডুকরে কেঁদে উঠেছি। লোকটা কিন্তু খুব চালাক, বুঝলে সেই শব্দে ওরও ঘুম ভেঙে গেছে, আর ও না—উঠেই বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটা। উঠেই এক লাফে মেঝেতে নেমে, ঘরে যে পিদিম জলছিল সেটা নিভিয়ে দিয়ে ফিরে এসে আমার হাত দুটো ধরে বললে, 'ভয় কি—আমাকে দেখে কি তোমার ভয় করছে? আমি ত বাঘ-ভালুক নই! ত্থাখো—এখন ত আর ভয় করছে না?'

'তখন? তুই কি বললি?' রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করে উমা।

'আমার তখন অন্য ভয় হয়েছে। আমি বললুম, 'তুমি যে আলোটা বড় ফস ক'রে নিবিয়ে দিলে, অলুক্ষুণ হবে না? ফুলশয্যের রাত্তিরে আলো যে নিবুতে নেই!'...ও লোকটা তখন আমায় খুব আদর-টাদর ক'রে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললে, রাত আর কোথায়? ভোর হতে বেশি দেরি নেই। তা বলো ত আবার জ্বেলে দিই। যোদ্ধা আমাকে দেখে ভয় পাবে না ত? আমি তখন—'

লজ্জায় রাঙা হয়ে এইখানেই থেমে গেল ঐন্দ্রিলা। উমাও প্রশ্ন করলে না। একটুখানি চুপ ক'রে থেকে শুধু বললে, 'তা জামাইটি বাপু বেশ, আমার ত খুব পছন্দ হয়েছে—কী বলিস!'

আবার উৎসাহে যেন সোজা হয়ে ওঠে ঐন্দ্রিলা, 'সে কথা একশবার। লোকটা খুব ভাল মাসি, এত ভাল যে বাইরে থেকে দেখে তার কিছুই বোঝা যায় না। ওর আবার বাড্‌সাই খাবার অব্যেস আছে জানো ত, আমি বলেছিলুম, ওসব ছাইভস্ম খাও কেন—মুখে যে বিচ্ছিরি গন্ধ হয়! তা সেই দিন থেকে রাত্তিরে খাওয়ার পর মোটে খায় না। পাছে মুখে গন্ধ হয়। এদাস্তে আবার আমার মায়া হয় বলি—বলি, তা বাপু খাও না, তোমার যখন এত দিনের অব্যেস! তাও খায় না, বলে—আমার অব্যেসটা বড় কথা না তোমার কষ্টটা বড় কথা?'

উমার বুকের কাছে কি একটা নিঃশ্বাস আটকে যায়?

আস্তে আস্তে সে বলে, 'তা তুই ঘর করতে কবে যাবি? এক বছর পর?'

এদিক-ওদিক চেয়ে চুপিচুপি উমার কানের কাছে ফিসফিস ক'রে বলে ঐন্দ্রিলা, 'মা তাই বলছে! আমার কিন্তু বাপু তা পছন্দ নয়। আমি ওকে শিখিয়ে দিয়েছি জোর করতে। ও জেদ করলে মা আর রাখতে পারবে না। 'ধুলো পায়ে দিন' ত করাই আছে। দিদির বেলা হয়েছিল, কায়েত দিদি বললে এবারও করিয়ে রাখতে। আসল কথা কি জানো মাসি—আগে ভাবতুম বুঝি শ্বশুরবাড়ি গিয়ে এক-দিনও থাকতে পারব না, কিন্তু এখন হয়ে উঠেছে ঠিক উল্টো, ওকে ছেড়ে এক দণ্ড এখন আর থাকতে ইচ্ছে করে না। বড্ড মন কেমন করে!'

উমার ম্লান মুখেও কৌতুকের হাসি ফুটে ওঠে, 'ও-টা আবার কে রে?'

হাসি চাপতে চাপতে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে ঐন্দ্রিলা উত্তর দেয়, 'কে আবার? ঐ বুনো মোষটা!'

শ্যামাও খুঁজে বেড়ায় কখন উমাকে একটু নির্জনে পাওয়া যাবে!

'হ্যাঁ রে উমি, একটা কথা ভাবছি কাল থেকে। মা ত শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন, তোর ত চার-পাঁচ ঘণ্টা বাইরে কাজ—একটা ত কাউকে হাত-নুড়কুৎ

রাখতে হয়। তা আমি বলি কি কালই না হয় হেমের সঙ্গে তরুটাকে পাঠিয়ে দিই? কী বলিস?'

দুটি হাত জোড় করে উমা বলে, 'ঐটি তুমি মাপ করো ছোড়দি। আর না। ভগবান যা দেন নি তা জোর ক'রে পেতে চাই না। ঐন্দ্রিলা যখন যায় তখন সাতরাত ঘুমোতে পারি নি।...না, ও শখ আমার মিটে গেছে।'

অপ্রসন্ন মুখে শ্যামা বলে, 'মার অসুখ বলেই বলা—নইলে আর কি বল্! লেখা পড়া শিখবে এ আশা আর আমি করি না। খেঁদিটা তো কতই শিখলে! আপনার লোককে কি আর পড়ানো যায়? মাইনে দিলে তবে চাড় হয়।'

উমা উত্তর দিতে গিয়েও সামলে নেয়। সহজ কণ্ঠেই বলে, 'মার জন্যে ভাবতে হবে না। দিদি ত দুপুরে এসে থাকেই—মনে করছি এবার জোর ক'রেই দিদির বাসা উঠিয়ে ওদের এখানে এনে রাখব।'

দিদি এবং গোবিন্দ।

মা কবে যাবেন শ্যামা হয়ত খবরও পাবে না। হয়ত বা মরবার আগেই মার কি খেয়াল হবে, যা কিছু আছে ওদের মধ্যে ভাগ ক'রে দেবেন। বলা ত যায় না। মরবার মুখে মতিচ্ছন্ন, কথাতেই আছে! মার যে একেবারে কিছু নেই—তা ত নয়। তাহ'লে এ ঠাট বজায় থাকত না।

আরও একবার চেষ্টা ক'রে দেখে সে, 'তা দিদি এলেও ত তার সুবিধে হ'ত। হাতের কাছে—'

উমা চুপ ক'রে থাকে।

'দিদি এলে না হয় জিজ্ঞেস করি!' কতকটা আপন মনেই বলে শ্যামা।

'দোহাই তোমার ছোড়দি। আমাকে অব্যাহতি দাও—তোমার পায়ে পড়ি। এসব জ্বালা আর আমার সহ্য হয় না।'

'জানি নে বাছা! আপনার লোক অসহ্য হয়—পর ভাল। কালে কালে কতই শুনব? তুমি যে কেন আমার ছেলেমেয়েকে সহ্য করতে পারো না তাও বুঝি না! ওরা তোমার কি করলে?'

রাগ ক'রেই সেখান থেকে উঠে যায় শ্যামা।

উমা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে সেখানে।

হয়ত এতটা না বললেও হ'ত। কিন্তু—কিন্তু সত্যিই, সে-ও আর পারে না।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

এক

রাসমণি দিন দিন বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে যাচ্ছেন। আর যে আশা নেই, তা উমাও বোঝে একসময়। বোঝে আর তার বুকের মধ্যে হিম হয়ে আসে, আশ্রয় এবং অবলম্বন—দুটোই তার একসঙ্গে খসে পড়বে।

অথচ কীই বা করতে পারে সে?

অনেক কষ্টে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে হোমিওপ্যাথ পালটে কবিরাজ ডাকা হ'ল। কবিরাজের পর ডাক্তার। রাসমণি জীবনে কখনও ডাক্তারী ওষুধ খান নি, আপত্তি ছিল যথেষ্ট—শুধু উমার চোখের জলেই রাজী হলেন শেষ পর্যন্ত। আহা, ওকে ত একেবারেই পথে বসিয়ে যাচ্ছেন বলতে গেলে—ওর পক্ষে তাঁকে ধরে রাখবার চেষ্টা খুবই স্বাভাবিক, ডাক্তার ডেকেই যদি মনে শান্তি পায় ত পাক। তেজস্কর উগ্র আর কটু আস্বাদের ডাক্তারী ওষুধ খেতে তাঁর গা বমি আসত, চোখে জল বেরিয়ে যেত—তবু প্রাণপণে খেতেন।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না।

জ্বর ঠিক নিয়মিত আসে বিকেলের দিকে, সন্ধ্যার কিছু পরে ছেড়ে যায়। রেখে যায় অপরিসীম দুর্বলতা।

এমন সময়ে উমা বলে, 'চলুন মা, আপনাকে নিয়ে দেওঘর যাই—যা আছে সব বেচেও সারিয়ে আনি। দেওঘরের হাওয়া শুনেছি খুব ভাল। যে যায় সে-ই সেরে আসে। বাবা বদ্যিনাথের দয়ায় আপনিও ভাল হয়ে উঠবেন নিশ্চয়ই।'

রাসমণি হাসেন। অতি কষ্টে বলেন, 'ক্ষেপেছিস তুই। আমি তো মড়াই, মড়া নিয়ে কোথায় যাবি? যেতে যেতেই হয়ে যাবো। না—টানাহেঁচড়ায় আর কাজ নেই।'

কমলাও জিদ করে, 'চলুন না মা। না হয় সেকেন্ কেলাসে শুইয়ে নিয়ে যাবো। ওতে অত ভিড় হয় না। আগে থাকতে রিজাব করা যায়। না হয় আমার একটা গয়নাই বিক্রি করবো।'

ধমক দেন ওরই মধ্যে। বলেন, 'কার গয়না তুই আমার জন্যে বিক্রি করবি তাই শুনি? ও ত তোর ছেলের গয়না। ছেলে মানুষ করতে হবে তোকে। ...ঘাটের মড়াকে ঘাটে পাঠাবার ব্যবস্থা কর্। আর কেন? ধানের ভাত তেতো লাগছে—আর কি আমি বাঁচব! আমার দিন ফুরিয়েছে।'

ক্রমশ দিন ফুরোবার অন্ত লক্ষণও প্রকাশ পায়।

ছেলেমানুষের মত হয়ে পড়েন। অমন গাম্ভীর্য, অমন স্থিরবুদ্ধি কোথায় যেন চলে গেল! কে বলবে সেই মানুষ! আহারে লোভ কোনদিন ছিল না, ক্রমশ তাও দেখা দেয়। কেবলই কুপথ্য খেতে চান, না দিলে রাগ করেন। ডাক্তার বলেছে ভাত দিতে—গলাভাত অল্প ক'রে আর কাঁচকলার ঝোল। কিন্তু কাঁচকলার ঝোল দেখলেই রেগে যান। যেদিন হাতে একটু জোর থাকে—ছুঁড়ে ছড়িয়ে ফেলে দেন ভাত—কান্নাকাটি করেন। দুধ বার্লি খাওয়াতে গেলে দাঁতে দাঁত চেপে থাকেন। কেবল খেয়াল থাকে একাদশীর কথাটা। প্রায়ই জিজ্ঞাসা করেন, 'হ্যাঁরে, একাদশী কবে হ'ল? তোরা একাদশীতে খাইয়ে দিচ্ছিস্ না ত?'

ওরা আগে আগে বোঝাবার চেষ্টা করত। এতকাল ক'রে এসেছেন—এখন অপটু শরীরে আর কেন! আতুরে নিয়মো নাস্তি। কিন্তু রাসমণি কিছুতেই বোঝেন না। বলেন, 'এতকাল ক'রে এসেছি, এখন ফেলে দেব? এই ক'টা দিনের জন্যে? লাভ কি? শরীর ত যেতে বসেছেই—তাকে আর দুটো দিন ধরে রাখতে ধর্মটা দেব কেন?'

অগত্যা মিছে কথা বলতে হয়। এখনও দেরি আছে বলে চালিয়ে, কিছু দিন পরে বলা হয়—একাদশী ত কবে কেটে গেছে!

রাসমণি বলেন, 'কৈ, তা তোরা আমাকে বললি না ত?'

'হ্যাঁ, আপনি করলেন যে! আপনি আজকাল বড্ড ভুলে যান।'

ছেলেমানুষের মতই আশ্বাস লাভ করেন সহজে। বলেন, 'তা হবে। মরণকালে ভীমরতি হয় মানুষের। বেব্‌ভুল হয়ে যায় সব—কিছু কি মনে থাকে! থাকে না।

একদিন—ঠিক একাদশীর আগের দিন,—হঠাৎ বলে বসলেন, 'পাঁজিটা আন্, আমি পাঁজি দেখব!'

অগত্যা পাঁজি আনতে হ'ল। হাত কাঁপে, বই ধরতে পারেন না। গোবিন্দ উঁচু ক'রে ধরলে বুকের ওপর। চোখের দৃষ্টি হয়ে এসেছে ঝাপ্‌সা—ভাল ক'রে দেখা যায় না কিছু। অতি কষ্টে বহু দূরে রেখে যদি বা নজর চলে ত তারিখ তিথি সব গোলমাল হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত গোবিন্দকে জিজ্ঞেস করেন, 'আজ কি তারিখ দেখ্ তো। মিছে কথা বলিস্ ত আর কখনও ভালবাসব না!'

কমলার চোখ-টেপা গোবিন্দ দেখতে পায় না। সে তারিখটা বলে দেয়।

রাসমণি হিসেব ক'রে দেখে বলেন, 'কাল ত একাদশী! ঠিক হয়েছে—মনে ক'রে রাখব।'

পরের দিন সত্যিই তাঁকে কিছু খাওয়ানো গেল না। সন্ধ্যাবেলা প্রবল

জ্বরের ধমকে তৃষ্ণায় বুক পর্যন্ত শুকিয়ে উঠল যখন, তখন হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন শুধু, 'মুখে একটু গঙ্গাজল দে উমি, শুনেছি গঙ্গাজলে দোষ নেই। আর পারছি না!'

সেই এক চুমুক গঙ্গাজল খেয়েই সেদিন সারা দিনরাত কেটে গেল। আশ্চর্য এই যে—ওরা যতটা আশঙ্কা করেছিল তার কিছুই হ'ল না। প্রতিদিন যেমন থাকেন তেমনই রইলেন।

দুই

মাঝে মাঝে পুরোনো ব্যক্তিত্বের বিদ্যুৎস্ফুরণ ঘটে।

জ্যৈষ্ঠের গোড়ার দিকে রাসমণি হঠাৎ একদিন বলে বসলেন, 'শ্যামাকে খবর দে উমি, আমি বেঁচে থাকতে থাকতে যা ক্ষুদকুড়ো আছে ভাগ করে দিয়ে যাই—নইলে তাকে ত আমি চিনি—তার সঙ্গে তোরা পেরে উঠবি না!'

উমা ক্লান্ত সুরে বললে, 'কি হবে মা আপনার এই দুর্বল দেহ ব্যস্ত ক'রে? না হয় সে-ই সব নেবে। আমার আর কি হবে?'

'তোমাকে আর গিন্নিত্ব করতে হবে না মা—যা বলছি তাই শোন! বাসন-গুলো থাকলে অসময়ে বিক্রি ক'রে খাওয়া যায়, রোগ হ'লে ডাক্তার দেখানো যায়। তুমি কি আমার চেয়ে বেশি বোঝ?'

'তার ছেলেমেয়ে আছে—' তবুও উমা বলতে চেষ্টা করে, 'তার দরকার বেশী।'

'তোমার সঙ্গে আমি আর বকতে পারি না মা। আমার মুখ ব্যথা করে। ওর ছেলেমেয়ে আছে বলেই দরকার কম। তারা মানুষ হয়ে ওকে দেখবে। তোমাকে কে দেখবে? তুমি কি এমন তালেবর যে, দু'শ পাঁচ'শ টাকা রোজগার ক'রে জমাবে!'

অগত্যা শ্যামাকে চিঠি লেখা হ'ল।

শ্যামা শশব্যস্তে এসে পৌঁছল। প্রায় ছুটতে ছুটতে।

এতদিনের আশা ও আশঙ্কা তার।

আশাই বেশি। মা কি আর সত্যি কথাই বলেছেন! কিছুই কি নেই! মনে তা হয় না।

রাসমণি ইঙ্গিতে বসিয়ে দিতে বললেন। তিন-চারটে বালিশ উঁচু ক'রে পিঠের নিচে দিয়ে তাঁকে বসিয়ে দেওয়া হ'ল। তারপর কমলা ও উমা সিন্দুক খুলে বাসনের স্তূপ এনে তাঁর সামনে সাজাতে লাগল। শ্যামাও ছুটে গিয়ে ওদের সাহায্য করতে শুরু করল। কাঁসার বাসনের স্তূপ। খাগড়াই বাসন, ঢাকাই বাসন—কটকীও আছে দু-একখানা, কিন্তু সে খুব কম। ভারী ভারী থালা।

এ ছাড়া পাথরের বাসন। সাদা পাথরের সেট, কষ্টিপাথরের সেট। জয়পুর, গয়া ও মুঙ্গেরের ভাল ভাল বাসন। লোভে চোখ জ্বলতে থাকে শ্যামার।

সব বাসন উজাড় ক'রে এনে সাজিয়ে দেওয়া হ'ল।

তারপর চোখের ইঙ্গিতে উমা হাতির দাঁতের কাজ-করা কাঠের বাক্সটা এনে রাখল ওঁর পাশে। গয়নার বাক্স। উৎকণ্ঠিত শ্যামা নিঃশ্বাস রুদ্ধ ক'রে আছে। কি অচিন্তিত রহস্য ওর মধ্যে লুকিয়ে আছে কে জানে!

আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন রাসমণি। কমলা তিনটে ভাগ করতে থাকে। যেগুলো তিনের পর্যায়ে আছে সেগুলো আপনিই ভাগ হয়। যেমন এক সাইজের থালা ছিল ছ'খানা—ছ'খানা ক'রে পড়ল। যা ঠিক ভাগ-মত নেই, সেগুলোর মনে মনে একটা হিসেব ক'রে নেন রাসমণি।

চারটে ছোট বাটি দু' ভাগ ক'রে তার জায়গায় একটা বড় বাটি আন্দাজমত দেন তৃতীয় ভাগে। এইটুকু করতেও ক্লান্তি বোধ হয় তাঁর। তিনি মধ্যে মধ্যে চোখ বুজে বিশ্রাম ক'রে নেন খানিকটা, আবার একসময় চোখ মেলে কাজ শুরু করেন।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত ভাগ করা দেখে দেখে একসময় আর থাকতে পারলে না শ্যামা। বলে উঠল, 'ভাগটা কি সমান করা উচিত হচ্ছে মা! আমার এতগুলো ছেলে-মেয়ে, উমার মোটেই নেই, দিদির ত মোটে একটা! দরকার আমারই বেশী।'

লজ্জায় কমলার মুখ লাল হয়ে ওঠে। শ্যামা এমন নির্লজ্জভাবে বললে কি ক'রে—ওরা ভাবে। শ্যামারও যে একেবারে লজ্জা করে না তা নয়। তবে তার প্রতিকূল ভাগ্য এতাবৎ তাকে এই শিক্ষাই দিয়েছে যে এসব ব্যাপারে চক্ষুলজ্জার স্থান নেই। লজ্জা করতে গেলেই ঠকতে হয়।

রাসমণি তাঁর রোগক্লান্ত চক্ষু দুটি মেলে স্থির দৃষ্টিতে তাকান কিছুক্ষণ শ্যামার মুখের দিকে। কথা কইতে আজকাল তাঁর একটু সময় লাগে, যেন ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় ক'রে নেন। তারপর বলেন, 'তোমার ছেলেমেয়ের ভাবনা তুমি ভাবো মা, আমি ভাবছি আমার মেয়েদের ভাবনা। তার বেশী ভাবতে গেলে ত আমার চলে না। কত দূর ভাব্‌ব বলো—এই গোবিন্দরই হয়ত দশটা ছেলে হ'তে পারে। তোমার হেমের হয়ত একটাও হ'ল না!...উমার স্বামীও এসেছিলেন, দেখা ক'রে গেছেন। কে জানে তাঁর মত ফিরবে কি না—এই উমারই হয়ত একঘর ছেলেমেয়ে হবে একদিন! তাছাড়া তোমার ছেলেমেয়ে আছে ব'লেই ত তোমাকে আর কিছু দেওয়া উচিত নয়। তোমার হেম ত এখনই রোজগার ক'রে খাওয়াচ্ছে। উমাকে কে দেখবে!'

শ্যামা দমবার পাত্রী নয়। সে বললে, 'হেমই দেখবে।'

'সে আমি জানি। অশক্ত হয়ে তোমার ছেলের ঘাড়ে গিয়ে পড়লে হয়ত এক-মুঠো ভাত সে দেবে। কিন্তু ধার ক'রে ডাক্তার দেখাবে না এটাও ঠিক।... আর হেমই যদি দেখে—সে-ই ত একদিন পাবে এসব, নেহাত যদি উমার কপাল কোনদিন না ফেরে!'

শ্যামা বোধ করি আরও কি বলতে যাচ্ছিল, রাসমণি কম্পিত হাতের তর্জনী তুলে নিষেধ করলেন। তারপর কমলাকে ইঙ্গিত করলেন ভাগ ক'রে যেতে।

সব বাসন ভাগ করা শেষ হ'লে রাসমণি আর একবার শ্যামার মুখের দিকে তাকালেন। ম্লান অথচ বিদ্রূপের একটুখানি হাসি তাঁর ঠোঁটের কোণে খেলে গেল।

'তাই বুঝি মা তুমি ওদের অত সাহায্য করতে দৌড়চ্ছিলে! বড় খাগড়াই বাটিটা আর সরপোশ দেওয়া গেলাসটা আসতে আসতে কোথায় হাতসাফাই করেছ ব'লে দাও—গোবিন্দ গিয়ে নিয়ে আসুক!'

কমলা ও উমা স্তম্ভিত। একবার সন্দেহ হ'ল মার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে সত্যি-সত্যিই? এমন কথা কি ক'রে বলতে পারলেন তিনি? কিন্তু আরও স্তম্ভিত হ'ল শ্যামার অবনত আরক্ত মুখের দিকে চেয়ে। অপরাধ স্বীকারের এমন স্পষ্ট ভাষা তারা আর কখনও ইতিপূর্বে এভাবে কারও মুখে ফুটে উঠতে দেখে নি। শ্যামার সুগৌর মুখ অগ্নিবর্ণ হয়ে উঠেছে, এই কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ললাটের স্বেদবিন্দু মুক্তোর মত বড় বড় হয়ে উঠেছে।

শ্যামা বার-দুই ঢোঁক গিলে বললে, 'আপনি অকারণ আমাকে অপমান করেন মা—আনতে আনতে বড্ড ভার বোধ হ'ল তাই—তারপর একদম ভুলে গেছি।'

'বেশ ত, কোথায় রেখেছ বলো?'

'আমি আনছি—'

শ্যামা একরকম দৌড়েই চলে যায়। উমা উঁকি মেরে দেখে সিন্দুকেরই তলা থেকে বেরোয় বাসন দুটো।

রাসমণি হাসেন।

'বেবভুল হয়েছে ঠিকই, হবার কথাও। কিন্তু শুনেছি দিন শেষ হ'লে আবার সব মনে আসে। আমারও আর দেরি নেই রে। সব যেন আমার গোনাগাঁথা—এমনি মনে পড়ছে।'

উমার চোখে জল টলটলই করছিল, এবার আর বাধা মানল না। ঝরে পড়ল

ঝরঝর ক'রে। সেদিকে চেয়ে আর একবার হাসলেন রাসমণি। বাটি আর গেলাস এনে ওঁর সামনে নামিয়ে দিয়ে শ্যামা নত মুখে বসল। তার আর যেন কথা বলবার ক্ষমতা নেই।

রাসমণি বললেন, 'কমলা, আমার ইচ্ছে এ দুটো মহাশ্বেতার বরকে দিই! কী বলো তুমি?'

কমলা তাড়াতাড়ি বললে, 'বেশ ত, দিন না মা।'

'আর ঐ বড় ফুলকাটা রেকাবিখানা—ফরমাশ দিয়ে গড়ানো ওটা, দু' সের ওজন—ঐটে দিও খেঁদির বরকে। কিছুই নয়—দিদিমার একটা স্মৃতিচিহ্ন, এই আর কি!'

এইবার গয়নার বাক্স খোলা হ'ল। সব ভুলে শ্যামা উদ্‌গ্রীব লোলুপ হয়ে উঠল আবার। আশা বা আশঙ্কা কোন্‌টা ফলে কে জানে!

কিন্তু যা বেরোল বাক্স থেকে—তা সত্যিই হতাশ হবার মত। খান দশেক গিনি, একটা সাতনরী হার, একজোড়া বড় কান, দুজোড়া ঝুমকো আর একগাছা বালা। আর কিছু কুঁচো সোনা। গোটা-দুই আংটি, হীরের নাকছাবি একটা, আর একটা আসল মুক্তোর নথ। একটা বালা সম্প্রতি বিক্রি করা হয়েছে—নইলে এক জোড়াই ছিল।

একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন সেদিকে রাসমণি। চেয়ে চেয়ে তাঁরও চোখে জল ভরে এল। কত কী যে তাঁর মনে হচ্ছিল কে বলবে! কত পুরোনো স্মৃতি ও অতীতের প্রায়-ভুলে যাওয়া দাম্পত্য প্রেমের ঝাপ্‌সা ইতিহাস! প্রতিটি অলঙ্কারের পিছনে একটা ইতিহাস আছে বৈকি, ছোট বা বড়। সে সব ইতিহাস আজ এতকাল পরে এই মৃত্যুপথযাত্রিণীর মনে ভিড় ক'রে এসে দাঁড়িয়েছিল কি না, তাই বা কে বলবে? এগুলো যে নারীর সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু, শুধু তাও ত নয়—এ যে তাঁর এই দীর্ঘ নিঃসম্বল জীবনের অবলম্বনও বটে। তাঁর জীবনে বিড়ম্বনা ও দুঃখ ছিল কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত কারও কাছে ভিক্ষা না ক'রে মর্যাদার সঙ্গে কাটিয়ে যেতে পারলেন এইটেই বড় লাভ। আর তা সম্ভব হয়েছে এগুলোর জন্যই। তাছাড়া একদা তিনি স্বামীর প্রিয়তমা ছিলেন—তারও চিহ্ন বহন করছে এই স্বর্ণখণ্ডগুলি। কারণে অকারণে প্রিয়াকে খুশী করার জন্যই অলঙ্কার উপহার দিয়েছেন তিনি—তাঁর সেই প্রেমেরই নিদর্শন এই সব অলঙ্কার। সেইজন্যই এরা সাধারণ অলঙ্কারের চাইতে অনেক বেশী মূল্য বহন করছে চিরকাল তাঁর কাছে।

অনেক—অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন রাসমণি। অশ্রুতে ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে ক্ষীণ দৃষ্টি—তবু চোখ নামাতে পারেন না যেন।

অবশেষে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এলিয়ে পড়েন বালিশে। কিছুই বলতে পারেন না, চিন্তা আচ্ছন্ন হয়ে আসছে কিনা তাও বোঝা যায় না। ঘরসুদ্ধ সকলেই চেয়ে থাকেন ওঁর দিকে। কেবল উমা ছাড়া ; তার চোখের জল আর কিছুতেই অবরোধ মানছে না—সে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে বারান্দায় প'ড়ে কাঁদছে ফুলে ফুলে

অবশেষে একসময় আবার রাসমণি চোখ মেলে তাকান। আঙুল দিয়ে কমলাকে কাছে ডাকেন। উৎকণ্ঠিতা শ্যামাও আর থাকতে না পেরে কাছে এগিয়ে আসে।

রাসমণি ফিসফিস ক'রে বলেন, 'বালাটা বোধ হয় লাগবে, আরও যে কদিন বাঁচব তার জন্যে। গিনি ক'খানা রইল—শ্রাদ্ধের খরচ। ওর চেয়ে বেশী খরচ করতে যেও না। বাহুল্যতার দরকার নেই। সাতনরী হারটা উমাকে দিও, তার কাজে লাগবে। কান জোড়াটা গোবিন্দর রইল। ঝুমকো দু'জোড়া শ্যামার। আর কুচো যা আছে আংটি,ফাংটি—সবই উমার থাক। ওকেই সব চেয়ে অসহায় রেখে গেলুম, এটুকু ওকে দিতে তোমাদের আপত্তি থাকার কথা নয়। তোমাদের কারও বিয়েই খুব ভাল দিতে পারি নি—কিন্তু ঈশ্বর জানেন, আমার কোন অপরাধ ছিল না। তবু উমার দুর্ভাগ্যের ভাবনা আমাকে পরলোকে গিয়েও শান্তি দেবে না। শুধু তোদের দুঃখই ভেবে ভেবে গুমরে গুমরে অকালে বুড়ী হয়ে গেলুম—এই ভেবে আমাকে মাপ করিস তোরা।'

রাসমণি আবারও এলিয়ে পড়লেন। অজ্ঞানের মত হয়ে পড়েছেন তিনি। কমলা ছুটে গিয়ে পাখা এনে বাতাস করতে লাগল।

কেবল শ্যামা বসে রইল পাথরের মত স্থির হয়ে। ওর হতাশার পরিমাণ ওর বিবর্ণ ভাবলেশহীন মুখের দিকে চেয়ে বোধ করি একমাত্র রাসমণিই অনুমান করতে পারতেন কিন্তু তাঁর সে শক্তি তখন ছিল না।

তিন

রাসমণি ইদানীং ওষুধ খাওয়া ছেড়েই দিয়েছিলেন একেবারে, এমন কি বরাটের হোমিওপ্যাথি ওষুধ দেখলেও যেন জ্বলে উঠতেন—এখন আহারও ত্যাগ করলেন। কিছুই মুখে রোচে না। কমলা পীড়াপীড়ি করলে বলতেন, 'কেন জোর করছিস —বুঝতে পারছিস না যে আমার এখানকার খাওয়া শেষ হয়ে গেছে! নইলে মুখে সব তেতো লাগবে কেন? আর দেরি নেই—ধানের ভাত যখন তেতো লেগেছে তখনই বুঝেছি—এ পৃথিবীর খাওয়া শেষ হয়েছে। আর জোর করিস্ নি।'

কমলা তবু হয়ত মৃদু অনুযোগ করে, 'কিন্তু দেহটা যতদিন আছে—'

'আছে কেন, শেষ হয়ে যাক না! লোকে না খেয়েও ত থাকে দেখি! আর এ দেহ বাঁচিয়েই বা লাভ কি? শুধু শুধু তোদের ভোগান্তি।'

জ্বর দেখারও উপায় নেই। থার্মোমিটার দেখলে একেবারেই ক্ষেপে যান। কোথা থেকে ঐ পাত-করা দেহে শক্তি আসে তা ভেবে পায় না উমা। পর পর দুটো থার্মোমিটার ভাঙলেন। অকস্মাৎ শীর্ণ হাত বাড়িয়ে এমন অতর্কিতে টেনে নিয়ে আছড়ে ফেলে দেন যে উমা সতর্ক হবারও সময় পায় না। মুখ ভেঙিয়ে বলেন, 'ঐ এক শিখেছেন ওঁরা!···যখন-তখন জ্বর-কাঠি গোঁজা। কাজ নেই কম্ম নেই। কী হবে? জ্বর মেপে দেখলেই আমি সেরে উঠব?'

শেষ দিনে এমন একটা কুৎসিত কটু মন্তব্য করলেন যে উমা সহ্য করতে না পেরে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। এ কী হ'ল? আজীবন সংযতবাক্ দেবীর মত মহিমময়ী তার মায়ের এ কি অধঃপতন! একেই কি তাহলে ভীমরতি বলে?

কমলা ওকে সান্ত্বনা দেয়, 'মরণের আগে এমনি হয়, তাই বলে মরবার আগে মতিচ্ছন্ন! এ সইতেই হবে—উপায় ত নেই।'

এমনি চিকিৎসা-সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে বিরক্ত না করলে রাসমণি চুপ ক'রে পড়েই থাকেন। কথা কন না, পাশও ফেরেন না। শুধু বুকের কাছে ধুকধুক করে জীবন। বেশীদিন যে আর নয় তা ক্রমে স্পষ্ট হয়ে এল সকলের কাছেই। কমলা বললে, 'আত্মীয়-স্বজনদের চিঠি দে উমি—এখন ত ভেঙে পড়লে চলবে না! যা কর্তব্য করতেই হবে। যদি কেউ দেখে যেতে চায় ত যাক।'

শ্রান্ত কণ্ঠে উমা বলে, 'গোবিন্দকে বলো দিদি। আত্মীয়-স্বজনই বা কে তাও ত বুঝি না!'

অগত্যা কমলা গোবিন্দকেই কখানা পোস্টকার্ড লিখে দিতে বলে। ক-খানাই বা! সত্যিই ত,, আত্মীয়-স্বজন আর ওদের এমন কে আছে?

একটু ইতস্তত ক'রে কমলা জিজ্ঞাসা করে, 'শরৎ জামাইকেও ত তাহ'লে একটা খবর দেওয়া উচিত। না কি বলিস!'

উমা চমকে ওঠে। ওর ক'দিনের রাত্রি-জাগরণে শীর্ণ-বিবর্ণ হয়ে-যাওয়া মুখে এক ঝলক রক্ত যেন কে ছড়িয়ে দেয়।

তারপর সহজ কণ্ঠে বলে, 'না। কি দরকার? তার সঙ্গে কিই বা সম্পর্ক? শুধু শুধু মার মৃত্যুর সময় আবার নতুন ক'রে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়া!'

তা বটে। কমলাও স্বীকার করলে মনে মনে কথাটার যৌক্তিকতা।

হেম এসে কাছে বসে দিদিমার শীর্ণ হাতখানা হাতের মধ্যে টেনে নিলে। কতকটা ভয়ে ভয়ে—সসঙ্কোচে। দিদিমার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা করবার সাহস ওর কোনকালেই ছিল না। আজ উপায় নেই ব'লেই এতদিনের সসম্ভ্রম দূরত্ব ঘুচিয়ে ফেলে। আস্তে আস্তে ডাকে, 'দিদিমা !'

জীবনের লক্ষণ দেখা দেয় আগে ঠোঁটে। ঠোঁট দুটো একটু কাঁপে—বোধ হয় প্রশ্ন বেরোতে চায়—'কে ?' কিন্তু দন্তহীন গহ্বরের মধ্যে থেকে শিথিল ওষ্ঠকে টেনে তোলা যায় না কিছুতেই। তারপর চোখের পাতা নড়ে। একটু একটু ক'রে অর্ধ-উন্মীলিত হয় চোখ দুটি--শেষে প্রশ্নও বেরোয়,—'কে ?'

'আমি হেম, দিদিমা। আমাকে কিছু বলবেন ?'

হেমকে কাছে ডাকেন, সেই ঘোলাটে বিবর্ণ দৃষ্টি ! হেম খুব কাছে মুখ নিয়ে যায়।

আস্তে আস্তে বলেন রাসমণি, 'আমাকে একটা কথা দিবি ভাই ? যা বলব তা শুনবি ?'

'নিশ্চয়ই শুনব দিদিমা। কথা দিচ্ছি।'

'ছোট মাসিকে একটু দেখিস্। যথাসাধ্য অবশ্য। তোর মা হয়ত ভুলে যাবে বোনের কথা। কিন্তু তুই একটু দেখবি ত ? বল্, কথা দে ?'

'আমার যতটুকু ক্ষমতা দেখব দিদিমা। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'বাঁচালি ভাই। বোধ হয় এই জন্যেই প্রাণটা যাচ্ছিল না। তুই ছেলেমানুষ —তবু তোর এই কথাতেই যেন ভরসা হ'ল খানিকটা। আমার এই মৃত্যুশয্যায় কথা দিলি, মনে থাকে যেন।'

আবার চোখ বোজেন। ঠোঁট দুটিও মুখগহ্বরের ভেতরে ঢুকে এঁটে যায়। শুধু দুই চোখের কোল বেয়ে দুটি ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে।

আর একবার চোখ খোলেন অভয়পদ এসে কাছে বসতে।

অভয়পদ এসেও ওঁরই বিছানার এক পাশে বসে আস্তে আস্তে ডাকে, 'দিদিমা ?'

নতুন কোন কণ্ঠ, তা সেই জড়-আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যেও কেমন ক'রে বোঝেন। আজও চোখের পাতা কাঁপে, একটু একটু ক'রে চোখ খোলেন। বেশির মধ্যে ভ্রূটা ঈষৎ একটু কুঁচকে যায়। অর্থাৎ বিস্ময় বোধ করেন।

'আমি অভয়পদ দিদিমা !'

কমলা মাথার কাছে মুখটা এনে বলে, 'আপনার 'নাতজামাই এসেছেন মা। বড় নাতজামাই—মহার বর।'

প্রসন্ন হাসি ফুটে ওঠে মুখে। ঠোঁট দুটি খুলতে পারেন না ভাল ক'রে···কিন্তু বিস্তারিত হয়ে বুঝিয়ে দেয় যে তিনি হাসতেই চাইছেন। অনেক কষ্টে ঠোঁট নেড়ে কি যেন বলেন, বোধ হয় আশীর্বাদই করেন।

অভয়পদ বলে, 'এখন কেমন আছেন দিদিমা ?'

এইবার ভাল ক'রেই হাসি ফোটে মুখে। একটু ঘাড়ও নাড়েন।

তারপর কোনমতে বলেন, 'একেবারেই ভাল ভাই। আর দেরি নেই।'

'দিদিমা, কিছু খাবেন ? কী খেতে ইচ্ছে করে বলুন ?' অভয়পদ একটু ইতস্তত ক'রে প্রশ্ন করে। এ অবস্থায় আর কী বলা যেতে পারে তা ঠিক সে বুঝতে পারে না।

চোখ দুটো বিস্ফারিত হয় বিস্ময়ে। রাসমণি প্রথমটা যেন বুঝতেই পারেন না ওর কথা। তারপর অনেক কষ্টে বলেন, 'তুমি খাওয়াবে ভাই, তোমার পয়সায় !'

'হ্যাঁ দিদিমা। আমিই খাওয়াবো।'

'রাজ-রাজ্যেশ্বর হও ভাই। বেঁচে থাকো। মহার মহাভাগ্য তোমার হাতে পড়েছে।'

'কিন্তু আপনি কি খাবেন তা ত বললেন না ?'

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থাকেন। হয়ত বা মৃত্যুপথযাত্রিণী তাঁর বিগত জীবনের ঝাপ্‌সা-হয়ে-আসা ইতিহাসের মধ্যে নিজের প্রিয় খাদ্য খুঁজে বেড়ান। অথবা সবই আজ একাকার হয়ে গেছে মনের ভেতর—প্রিয়-অপ্রিয়, স্মৃতি আর চিন্তাশক্তি কোন্ অতল আঁধারে তলিয়ে গেছে, নাগালই পাচ্ছেন না।

অবশেষে একসময় বলেন ঠোঁট খুলে, 'আনারস খাবো ভাই। আনারস আর গরম সন্দেশ, খাওয়াবে ত ?'

'এখ্‌খুনি নিয়ে আসছি দিদিমা।'

তখনও আনারসের সময় নয়। সেটা বৈশাখ মাস। তবু অভয়পদ নতুন বাজার থেকে খুঁজে খুঁজে পাকা আনারসই সংগ্রহ করে। আর তিনকড়ি ময়রার দোকান থেকে গরম গরম সন্দেশের ঠাসা।

কিন্তু জিরের মত করে আনারস কুচিয়ে যখন কমলা মুখে দিতে গেল, তখন অকস্মাৎ রেগে গেলেন রাসমণি, 'তোরা সবাই মিলে আমাকে একাদশীতে খাওয়াতে এসেছিস্ ? যা নিয়ে যা—থু—থু !'

কমলা ব্যাকুল কণ্ঠে বোঝাতে গেল, 'আজ যে চতুর্দশী মা। আমি আপনাকে ছুঁয়ে বলছি আজ একাদশী নয়। পরশু একাদশীর উপোস হয়ে গেছে। কাল

তেরোস্পর্শ গেছে, আছ চতুর্দশী। আপনি খান।'

'দূর দূর! দূর হয়ে যা! সব্বনাশীরা মরবার সময় আমার সব্বনাশ করতে এসেছে।'

অভয়পদও বোঝাবার চেষ্টা করে, 'আমি বলছি দিদিমা আজ একাদশী নয়। নইলে আমি আনব কেন?'

'তোরা সব বেইমান। আমি জানি। থু—থু!'

প্রাণপণে ঠোঁট দুটো চেপে ধরে রাসমণি। কিছুতেই কেউ বোঝাতে পারে না যে সেদিন একাদশী নয়।

*　　　*　　　*

পূর্ণিমার দিন ভোরবেলা মারা গেলেন রাসমণি। আগের দিন সেই যে মুখ বুজেছিলেন আর খোলেন নি। চোখও চান নি। নিস্তব্ধ নিঃসাড়ে পড়ে ছিলেন। তবু সকলেই কেমন ক'রে বুঝেছিল যে শেষের শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রায় সারা-রাতই সকলে ঘিরে বসে রইল। তিন মেয়ে, নাতি-নাতনী, দুই নাতজামাই। ছিল না কেবল জামাইরা কেউ। নরেনের পাত্তা জানা নেই—শরৎকে ইচ্ছে ক'রেই খবর দেওয়া হয় নি।

শেষরাত্রির দিকে শ্বাসলক্ষণ দেখা দিল। নাকটা ভেঙে গেল। রাঘব ঘোষাল বসে ছিলেন; তিনি বললেন, 'আর দেরি নেই। নাক ভেঙেছে—এইবার হয়ে এল। গোবিন্দ, তুই বাবা গঙ্গাজল দে একটু মুখে। তোমরা সবাই নাম শোনাও। অন্তে নারায়ণ ব্রহ্ম।...গঙ্গাযাত্রা করবে নাকি?'

অশ্রুমুখী কমলা প্রবলবেগে ঘাড় নাড়ে। বড় মাসিমার অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট।

শেষরাত্রে অকস্মাৎ নিঃশ্বাসটা সহজ হয়ে আসে। একসময় আবারও ঠোঁট দুটি নড়ে। মনে হয় যেন কী বলতে চাইছেন!

একেবারে মুখের কাছে কান পেতে শোনে অভয়পদ—নামই করছেন রাসমণি:

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।"

গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে অভয়পদ বলে, 'উনিও নামই করছেন। আপনারা—'

সে আর বলতে পারে না। ক্রন্দনের কলরোলের মধ্যে রাঘব ঘোষালের কণ্ঠ বেজে ওঠে:

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।"

গোবিন্দ গঙ্গাজল দিতে যায় মুখে, হাত কেঁপে জল গলায় পড়ে। রাঘবই হাত ধরে মুখে গঙ্গাজল দেওয়ান।

কিন্তু সে জল আর গলার ভেতর পর্যন্ত গেল না, কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল।

দীর্ঘদিনের বিপুল ব্যথা-বেদনার সঞ্চার নিয়ে রাসমণি কোন্ অজানা সান্ত্বনার পথে যাত্রা করলেন, তা কে জানে!

একবিংশ পরিচ্ছেদ

এক

শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার লোকের ঠিক অভাব ছিল না। রাঘব ঘোষালের ছেলে, দুই নাত জামাই—হরিনাথ আর অভয়পদ এবং হেম। রাঘব ঘোষাল নিজেও আছেন। তবু কান্নার শব্দ পেয়ে পাড়ার অনেকেই এলেন। পাড়াটা কায়স্থ-প্রধান হ'লেও, দু'একটি ব্রাহ্মণ ছেলেও পাওয়া গেল। তারা নিজেরাই এসে সঙ্গে যেতে চাইল। এ পাড়ায় দীর্ঘদিন আছেন রাসমণি, ভোরবেলা তাঁর সদ্য-গঙ্গাস্নাত তসরের থানপরা মূর্তি এ পাড়ার অনেকেরই পরিচিত। চিরদিন দূর থেকে দেখলেই সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিয়েছেন তাঁরা। এই নির্বিরোধী আত্মসম্ভ্রমসম্পন্না মহিলাকে সকলেই মনে মনে শ্রদ্ধা করতেন। সুতরাং তাঁর মৃত্যুতে অনেকেই আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করতে লাগলেন।

সাদিক মিয়া আজও বেঁচে আছেন। যদিও গত দু'তিন বছর ধরে তাঁর স্মৃতিটা গেছে। কাউকে চিনতে পারেন না, কিছু বুঝতেও পারেন না। কিন্তু কি জানি কেন আজ এ বাড়িতে কান্নার রোল শুনে হঠাৎ কি ভেবে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠলেন—'নিশ্চয়ই আমার মেয়ে মারা গেল! আমার মেয়ে! আমাকে নিয়ে চ, আমি একবার শেষ দেখা দেখি!'

উমা একবার মাত্র কেঁদে উঠেছিল—মৃত্যুটা নিশ্চিত জানবার সঙ্গে সঙ্গেই। তারপর আর কাঁদে নি বটে, মাথাও তোলে নি। সেই যে মাকে আঁকড়ে ধরে তাঁর বুকে মুখ গুঁজে পড়ে ছিল, আর তার মধ্যে কোন প্রাণ-লক্ষণ দেখা যায় নি। তার সেই কঠিন বন্ধনের মধ্যে থেকে রাসমণির মৃতদেহ উদ্ধার করবার প্রস্তাবে অনেকেরই মুখ শুকিয়ে উঠল।

কেবল বিচলিত হ'ল না অভয়পদ; সে এতক্ষণ নির্লিপ্ত এবং উদাসীনভাবে একদিকে সরে দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই এগিয়ে এল এবং পাশে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত সহজ কণ্ঠে ডাকলে, 'মাসিমা!'

উমার দেহটা শুধু বারেক শিউরে উঠল—আর কোন প্রাণস্পন্দনই জাগল না সে অনড় দেহে।

শাশুড়ীকে প্রণাম করা ছাড়া ছোঁয়ার রেওয়াজ নেই। অভয়পদও সামান্য একটু ইতস্তত করলে, তারপর হেঁট হয়ে উমার পায়ে হাত দিয়ে একটু নাড়া দিয়ে বললে, 'মাসিমা, এবার আপনাকে সরতে হবে যে। আপনি ত সবই জানেন, আর ত ধরে রাখার উপায় নেই।'

উমা এইবার মাথা তুলল। কেমন একরকম বিহ্বল হয়ে চাইল চারিদিকে—তারপর কেউ কিছু বোঝবার আগেই অকস্মাৎ রাসমণির পায়ের কাছে মেঝেতে মাথা খুঁড়তে লাগল, সবেগে ও সজোরে।

এক লহমা—চকিতে ওর মাথাটা ধরে ফেললে অভয়পদ। দৃঢ় কণ্ঠে বললে, 'ছিঃ মাসিমা! আপনি বুদ্ধিমতী—এমন অবুঝ হলে চলে?

ততক্ষণে কমলাও ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। সে এসে জোর ক'রে উমাকে টেনে নিলে বুকে। এইবার উমার বাঁধ ভাঙল। আবারও হাহাকার ক'রে কেঁদে উঠল সে।

অভয়পদ ইঙ্গিত করলে বাকী সকলকে। মৃতদেহ সরাবার এই সুযোগ।

রাঘব ঘোষাল কেশে গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বললেন, 'বড়দি, তোমাকেও ত যেতে হয়! মুখাগ্নি করবে কে?'

কমলা যেন চমকে উঠল, 'আমাকেই যেতে হবে? অন্য উপায় নেই?'

'সন্তান থাকতে—! আচ্ছা গোবিন্দই চলুক। 'ওর কাছ থেকে নুড়োটা নিয়ে নিও শ্রাদ্ধের দিন।'

শবযাত্রীদের হরিধ্বনি গলির মোড়ে মিলিয়ে যেতেই সহসা যেন তন্দ্রা ভাঙল উমার। সে একবারে দাঁড়িয়ে উঠল।

কমলা একটু ভয় পেয়েই ডাকল, 'উমা—?'

সহজ কণ্ঠে উমা উত্তর দিলে, 'আমি শ্মশানে যাবো দিদি।'

'না না, তোকে যেতে হবে না। গোবিন্দ ত গেছে।'

'আমি ঠিক ফিরে আসব। আমার জন্যে ভেবো না। এখানে বসে বসে—না দিদি, সে আমি পারব না। আমাকে ছেড়ে দাও—'

তর তর ক'রে সিঁড়ি বেয়ে সে নেমে এল একতলায়, এবং কমলা বা শ্যামা কোন বাধা দেবার আগেই হাঁটতে শুরু করলে।

কমলা ব্যাকুল হয়ে বললে, 'ওরে— অ গিন্নির মা, যাও যাও ভাই একটু সঙ্গে! এ আবার কী হ'ল—'

গিরির মা ছুটেই বেরিয়ে গেল। কিন্তু একটু পরে ফিরে এসে বললে, 'কাউকে যেতে হবে না বড়দি। যার জিনিস সে-ই সঙ্গে আছে।'

'সে আবার কে রে? কার কথা বলছিস্?'

'ছোট জামাইবাবু। তিনি যেন তৈরি হয়েই বাইরে দাঁড়িয়ে ছেল্‌। তিনিই সঙ্গে যাচ্ছে।'

শরৎ অবশ্য তৈরি হয়ে আসে নি, নিজের কাজে বড় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ হরিধ্বনি শুনে চমকে চেয়ে দেখতেই নজরে পড়ল রাঘব ঘোষালকে, গোবিন্দকেও চিনতে পারল সে।...বুঝতে দেরি হ'ল না শবদেহটা কার। মিনিটখানেক সে সেইখানেই দাঁড়িয়ে ইতস্তত করল। এখন এতদিন পরে এই সময় গিয়ে দাঁড়াতে তার লজ্জাই করছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লজ্জার চেয়ে কর্তব্যবোধই প্রবল হয়ে উঠল—এবং এটাও বুঝতে পারল যে প্রয়োজনটা তার শ্মশানের চেয়ে বাড়িতেই বেশি।

কিন্তু বাড়িতে ঢুকতে হ'ল না, তার আগেই বেরিয়ে এল উমা। শরতের সামনাসামনি পড়ে মুখ তুলে তাকালও একবার উদাস বিহ্বল দৃষ্টিতে, তারপর পাশ কাটিয়ে চলে গেল নিমতলার রাস্তা ধরে। স্বামীকে সে চিনতে পারল কিনা তা কিছুই বোঝা গেল না ওর মুখ দেখে।

শরৎ বিপন্ন হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুকাল। উমাকে ডাকবে কিনা তাও বুঝতে পারল না। অথচ উমা বেশ দ্রুতগতিতেই এগিয়ে যাচ্ছে। শেষে সেও উমাকেই অনুসরণ করল।

শ্মশানে যতক্ষণ চিতা জ্বলল—উমা সেদিকে চেয়ে স্থির হয়ে বসে রইল। শরৎ তার পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল, খানিক পরে রাঘব ঘোষাল চিনতে পেরে এগিয়ে এসে আলাপ করলে, অন্য জামাইদের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিলে। অগত্যা শরৎকে ওদের কাছে গিয়েও দাঁড়াতে হ'ল খানিকটা। তবে সে বেশীক্ষণ নয়—একটু পরেই ফিরে সে উমার কাছেই এসে দাঁড়াল।

হয়ত সে কিছু সান্ত্বনার কথাই বলতে চেয়েছিল। হয়ত তার মনে হয়েছিল যে ওর হাত দুটো ধরে কিছু আশা ও ভরসার কথা শোনানো এ সময়ে তার উচিত। কিন্তু আজ এতকাল পরে সে প্রয়াস নিষ্ঠুর পরিহাসের মত শোনাবে ব'লেই বোধ হয় সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার সুগৌর ললাটে বার বার লজ্জার রক্তোচ্ছ্বাস ফুটে উঠলেও কণ্ঠ ভেদ ক'রে কোন স্বর বেরোল না।

অবশেষে একসময় চিতা নিভল। রাসমণির শেষ চিহ্নটুকুও ভস্মাবশেষে

পরিণত হ'ল। চিতার আগুন নিভিয়ে এ:ক একে সকলে গিয়ে নামল গঙ্গায়।

এইবার প্রথম মুখ খুলল শরৎ। মাথাটা নামিয়ে উমার মাথার কাছে এনে বললে, 'তোমাকেও ত চান করতে হয় এবার।'

গঙ্গার অপর পারের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বসে ছিল উমা। সে চমকে উঠল না। কোন চাঞ্চল্যও দেখালে না। সহজ অকম্পিত কণ্ঠে বললে, 'যাচ্ছি।'

উমার জন্য কেউ কাপড় আনে নি। উমারও সে কথা মনে ছিল না। এক বস্ত্রেই সে চলে এসেছে। সে জলে নামতে শরতেরই মনে পড়ল কথাটা। ছুটে গিয়ে সামনের একটা দোকান থেকে একখানা কোরা লালপাড় শাড়ি কিনে নিয়ে এল।

শাড়িখানা স্বামীর হাত থেকে সহজেই নিলে উমা। তার সে শোক-স্তম্ভিত পাষাণের মত মুখে কোন ভাবাবেগই ফুটল না, যেন এইটেই সে আশা করছিল।

ফেরার পথে পুরুষরা ইচ্ছে ক'রেই এগিয়ে গেল। উমা যাওয়ার সময় যত জোরে গিয়েছিল, ফেরার সময় ঠিক তেমনই আস্তে হাঁটছে। কোন দিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই, সামনের দিকে স্থির দৃষ্টি মেলে কোন রকমে যেন শ্রান্ত দুটি পা ফেলে এগিয়ে চলেছে সে।

শরৎ তার পাশে পাশে তেমনি আস্তে আস্তে চলল। একেবারে বাড়ির দরজা পর্যন্ত।

ততক্ষণে অগ্রগামীরা শুদ্ধ হয়ে ভেতরে চলে গেছে। ভেতরে আবার নতুন ক'রে উঠেছে ক্রন্দনের কলরোল।

উমা একেবারে দরজার বাইরে এসে একবার থমকে দাঁড়াল।

কাঠের আগুন জ্বলছে এক কোণে। লোহা, নিমপাতা ও মটর ডাল ছড়ানো। যন্ত্রচালিতের মত উমা নিয়ম কর্মগুলো সেরে নিল।

আরও কয়েক মুহূর্ত সেই ধূমায়িত কাঠটার দিকে চেয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল সে। চোখ দুটো তার ঈষৎ লাল—এ ছাড়া সমস্ত মুখে শোকের কোন চিহ্নই নেই। একটা ধূসর বর্ণহীনতা তার শুধু দেহে নয়—যেন সারা মনকেও আচ্ছন্ন করেছে।

শরৎ আর একটু কাছে এসে দাঁড়াল। খুব আস্তে আস্তে বললে, 'আমাকে কিছু বলবে?'

এই প্রথম—একটা শিহরণ দেখা দিল উমার দেহে। সেটা শরৎও অনুভব করল পাশ থেকে।

কোন উত্তর দিলে না উমা। তেমনিভাবেই আরও মুহূর্তকাল দাঁড়িয়ে থেকে

নিঃশব্দে বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

আকস্মিক আঘাত পেলে মুখের যেমন অবস্থা হয়, শরতের মুখখানাও নিমেষে তেমনি হয়ে উঠল। কিন্তু সে কোন ক্ষোভ প্রকাশ করল না, শুধু নতমুখে সেইখানেই আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে এক সময় বাড়ির পথ ধরল।

দুই

শ্রাদ্ধ পর্যন্ত কোনমতে ঠেকিয়ে রাখলেও, সব চেয়ে বড় প্রশ্নটাকে আর কিছুতেই এড়ানো গেল না। এবারে সে তার বীভৎস চেহারাটা নিয়ে একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল। এত বড় বাড়ি এবং দিনরাতের ঝি, এ দুটোর কোন বিলাসই আর তাদের চলবে না। কমলা ও উমার যা মিলিত মাসিক আয়, তাতে এভাবে তাদের এক সপ্তাহও চলবার কথা নয়।

শ্রাদ্ধের দিন হঠাৎ নরেন এসে পড়েছিল কোথা থেকে। বোধ হয় পদ্মগ্রামে গিয়ে খবর পেয়েই এখানে এসেছিল। আহারে বসে সামনে কলাপাতায় রাশীকৃত লুচি দেখে মনটা অকস্মাৎ উদার হয়ে উঠেছিল নরেনের, আসনে দাঁড়িয়েই হাত নেড়ে বলেছিল, 'না দিদি, লোকে বলে যজ্ঞির ভাত, কলার পাত আর মায়ের হাত। তা যজ্ঞির ভাত না হয় লুচি, আরও ভালো কথা—কলার পাত ত আছেই, মায়ের হাত না হোক, বড় শালী—ও মায়েরই সমান ধরো। আমোদ ক'রেই আজ খাবার কথা। কিন্তু এ খেয়ে সুখ নেই। সেই থেকে, এসে ইস্তক তোমাদের কথাই ভাবছি। শাশুড়ী মাগী ত গেল—এখন তোমরা দাঁড়াও কোথা!'

ম্লান মুখে হাসি ফুটে উঠেছিল কমলার। বলেছিল, 'তুমি খেতে বসো ভাই। তবু ভাল যে একজনও আছে আমাদের কথা ভাববার!'

আসনে বসে বিনা আচমনেই প্রকাণ্ড একখানা লুচি আস্ত মুখে পুরে প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠে বললে নরেন, 'ভাবব না! বলো কি? এ ত আমাদের কর্তব্য। বলি পর ত আর নই। কি বলব মরমে মরে রয়েছি পয়সার অ ভাবে, নইলে কর্তব্য কাজ কি আর জানি না? কত বড় বংশ আমাদের!'

পিছন থেকে অস্ফুট অর্ধস্বগতোক্তি শোনা গেল, 'মুয়ে আগুন তোমার আর তোমার বংশের!'

নিমেষে জলে উঠল নরেন, 'শুনলেন, শুনলেন দিদি ও-মাগীর কথাগুলো! বলি আজ আমার এ অবস্থা হ'ল কেন? ঐ মাগী আর ওর শুয়োরের পাল ছেলেমেয়ে

নিয়েই ত আমায় এই হাল! নইলে আমার ভাবনা কি? রোজগার কি কম করি? কী করব—বাইরে বাইরে সব উড়ে যায়। ঘরে সুখ থাকলে ত ঘরে ফিরব—ওদের জ্বালায় আমায় বাইরে বাইরেই ঘুরে বেড়াতে হয়।'

আর একখানা লুচি ও খানিকটা কুমড়োর ডালনা মুখে পুরে নরেন একটু শান্ত হ'ল। অপেক্ষাকৃত নিম্নকণ্ঠে বলল, 'না দিদি, অনেক ভেবে দেখলুম এত বড় বাড়ি ত কোনমতেই রাখা চলবে না। ভাড়া টানবেন কোথা থেকে? তার চেয়ে এই পাশেই ত বস্তি রয়েছে, ওখানে একখানা খোলার ঘর-টর পাওয়া যায় না! দেখুন না খোঁজ ক'রে। ভাড়াও কম হয়—আর ওখানে গেলে ঝিও লাগবে না। নিজেরাই হাতাপিতি ক'রে কাজকর্ম সেরে নিতে পারবেন। কী বলেন, তাই ভাল না?'

'বস্তি! আমরা বস্তিতে যাবো?' স্তম্ভিতভাবে অর্থহীন প্রশ্ন করে কমলা।

'কি করবেন বলুন? যা কপাল! নইলে দাদাই বা যাবেন কেন আর উমিটারই বা অমন হবে কেন?' বেশ নিশ্চিন্ত স্বরে উত্তর দেয় নরেন।

শ্যামা আর সহ্য করতে পারলে না। এগিয়ে এসে বললে, 'খেতে হয় ত ছাইপিণ্ডি মুখ বুজে খাও, নইলে উঠে চলে যাও। আমাদের বংশের কাউকে দরদ দেখাতে এসো না। চামার কোথাকার! কথাগুলো মুখে আনতে একটু বাধল না?'

'ঐ লাও!' ছানার ডালনার আলুটা ভেঙে লুচি দিয়ে জড়াতে জড়াতে উত্তর দিলে নরেন, 'যার জন্যে চুরি করি সে-ই বলে চোর! আমি খারাপটা বললুম কি? বলি যত্র আয় তত্র ব্যয় ত করতে হবে। শাস্তরেই এ কথা লেখা আছে যে।'

'পোড়া কপাল আমার, শাস্তরের কথা তোমার কাছে শুনতে হবে! চুপ ক'রে খাও দিকি, নইলে ঐ পাত টেনে ফেলে দেব আঁস্তাকুড়ে!'

'থাম মাগী! মেলা ফ্যাচফ্যাচ করিস নি।' বললে নরেন কিন্তু কণ্ঠে আর তেমন জোর ফুটল না। সে আশ্চর্যরকম শান্তভাবে আহারে মন দিলে।

'এটা কি আনারসের চাটনী? দিব্যি হয়েছে ত! ও দিদি, আর একটু দিতে বলো। ল্যাংড়া আম আছে ত? গোটা তিন চার বাছো ভাল দেখে—'

সমস্ত কাজ সেরে ছাদে এসে বসল তিন বোন। গভীর রাত, মল্লিকদের বাগানে সারস ডেকে থেমেছে এইমাত্র। প্রহরে প্রহরে ডাকে ওরা। রাত বারোটার কম হবে না। তবু সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পরও ওদের চোখে যেন ঘুম নেই।

কিছুক্ষণ ঝির্‌ঝিরে হাওয়ায় বসে থাকবার পর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কমলা বললে, 'কানে যতই লাগুক শ্যামা, নরেন জামাই কথাটা তুলেছে ঠিকই। এ বাড়ি আমাদের এই মাসেই ছেড়ে দেওয়া উচিত। এ মাসের ভাড়াটা কোথা থেকে টানব তাই ত ভাবছি!'

'কিন্তু তাই বলে সত্যিই ত আর খোলার ঘরে গিয়ে থাকতে পারবে না দিদি। এমনি ভদ্দরলোকের বাড়ি দেখে দু'খানা ঘর ভাড়া করতে হবে।'

'তাই ত ভাবছি, এত জিনিস কোথায় ধরবে—এই এক ভাবনা।'

'তা জিনিস বলো ত—' একটুখানি ঢোঁকি গিলে শ্যামা বলে, 'কিছু কিছু আমার ওখানে নিয়ে গিয়েও রাখতে পারি। আবার যখন গোবিন্দ বড় হয়ে বাড়িঘর করবে তখন না হয় ফিরিয়ে নিও!'

'তা সেটা মন্দ বলিস নি। উমা কি বলিস্?'

'ছোড়দিরও ত একখানা ঘর দিদি! আর সেও পরের বাড়ি! তা ছাড়া এখান থেকে নিয়ে যাওয়াই কি সোজা?' আস্তে আস্তে উত্তর দেয় উমা।

'না না, আমি নিয়ে যাবো এখন—যেমন ক'রে হোক! না হয় একখানা ঘোড়ারগাড়ি-টাড়ি ক'রে—'

এবার উমার কণ্ঠে আর একটু দৃঢ়তা দেখা দেয়, 'না দিদি, জিনিসগুলো ছিল মায়ের প্রাণ। তিনি যা বলে গেছেন তার নড়চড় করতে পারবো না। ছোড়দিকে দেবার ইচ্ছে থাকলে তিনিই দিয়ে যেতেন।...আমরা যদি নিজেরা মাথা গুঁজে কোথাও থাকতে পারি ত ওগুলোর ব্যবস্থাও হবে।'

বাতাস অস্বাচ্ছন্দ্যকর হয়ে উঠছে দেখে কমলা অন্য প্রসঙ্গ পাড়ে, 'শরৎ জামাই আজও এসেছিলেন উমি। বেলা চারটে নাগাদ এসে একটু মিষ্টি মুখে দিয়েই চলে গেলেন।'

উমা ক্লান্ত কণ্ঠে বললে, 'জানি।'

তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে আবারও বললে, 'কেন অকারণ টানা-হেঁচড়া করছ দিদি!'

'না, তা নয়'—অপ্রস্তুত কণ্ঠে বলে কমলা, 'সেদিন শ্মশানে গিয়েছিল, আমাদেরও ত একটা কর্তব্য আছে। তাই হেমকে পাঠিয়েছিলাম ওর ছাপাখানায় নেমন্তন্ন করতে। তোর ঘাটের কাপড় অবিশ্যি ও আগেই পাঠিয়েছে!'

উমা উত্তর দিলে না। পূবের আকাশে মেঘ জমেছে একটু একটু করে—সেদিকে চেয়ে বসে রইল সে।

কমলা খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বললে, 'শরৎ জামাইকে বলছিলুম, থান-

তুই ঘর দেখে দেবার কথা। অভাবে একটা বড় ঘর—'

বোধ করি উমার কাছ থেকে কোন সাগ্রহ প্রশ্ন আশা ক'রেই মাঝপথে থেমে গেল কমলা। কিন্তু উমা তেমনিই বসে রইল। শ্যামাই বরং প্রশ্ন করলেন, 'তা কি জবাব দিলে সে ?'

'বলেছ ত দেখে দেবে। সন্ধানে আছে বুঝি কোথায়—কালই খবর পাঠাবে।'

'তোমাদের দেখবে কে ?' বেশ কিছুক্ষণ অখণ্ড নীরবতার পর শ্যামা প্রশ্ন করে।

'ভগবান !' সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয় কমলা।

তিন

শরৎ পরের দিন সত্যিই খবর পাঠালে। ঘর আছে—ব্রাহ্মণ পরিবারের মধ্যে, একতলায় দুখানা ঘর—দুখানা নামেই অবশ্য, দেড়খানাই বলা উচিত—সাত টাকা ভাড়া। এ ভাড়াও ওদের দেওয়া কষ্টকর। কিন্তু উপায়ই বা কি ? এত জিনিস-পত্র ধরে কোথায় ? তবু ঠিক হয়েছে যে কিছু কিছু ডেয়ো-ঢাক্না—যেমন জল-চৌকি তক্তাপোশ এমনি সব—লোক ডেকে বেচে দেওয়া হবে। তৎসত্ত্বেও যা থাকবে—কমলার যা আছে সব জড়িয়ে—ঐ দেড়খানা ঘরই গুদাম মনে হবে।

কমলা আর দেরি না ক'রে ঐ ঘরই ঠিক করলে। বাড়িওয়ালাদের পুরুষ কম—মেয়েছেলে বেশি, বৃদ্ধাও আছেন একাধিক, সুতরাং আশ্রয় হিসাবে অনেক নিরাপদ। ঘরগুলো খুব স্বাস্থ্যকর হয়ত নয়—একতলার ঘর, আলোবাতাসও কম, তবু আর অপেক্ষা করার সময় নেই। সব রকম সুবিধা পাওয়া যখন সম্ভব নয়, তখন যতটা পাওয়া যায় ততটাই ভাল।

এ বাড়িওয়ালাদের উঠে যাবার কথা বলে দেওয়া হ'ল, ওঁদের অগ্রিম দেওয়া হয়ে গেছে। হেম আর অভয়পদ একটা রবিবারে এসে ওদের মালপত্র ও-বাড়ি সরিয়ে দেবে ঠিক হয়েছে। সময় আসন্ন। কিন্তু উমা যেন ক্রমশ পাথর হয়ে যায়। কি এক একান্ত নির্লিপ্ততা ওকে পেয়ে বসে। কেমন যেন অবসন্ন হয়ে পড়ে ওর হাত-পা। যেন এখনও ওর বিশ্বাস হয় না যে এ বাড়ি সত্যিই ছাড়তে হবে।

কমলা একাই সব করে। দীর্ঘদিনের সংসার। শিশিবোতলওলা ডেকে তিন চার ঝুড়ি শুধু খালি শিশিবোতলই বিক্রি করে সে। পুরনো পাঁজি এক রাশ। এটা-ওটা কত কি। তারের ফাইলে—চিঠি গাঁথা। চিঠি আর ভাড়ার রসিদ। কুলুঙ্গিতে কুলুঙ্গিতে জমে রয়েছে দীর্ঘদিনের জীবনযাত্রার নানা স্মৃতি ও সাক্ষ্য ভাঁড়ার ঘরের বড় বড় জালা আর কলসীগুলো কোন কাজেই লাগবে না।

বেচাও যাবে না। ইদানীং কতকগুলো টিনে ঢাকনা করিয়ে নেওয়া হয়েছিল, সেগুলো নিয়ে যেতে হবে। ছোট সংসার হ'লেও চাল ডাল ত রাখতেই হবে।

উমা এত বড় বাড়িটার ঘরে ঘরে উদাসভাবে ঘুরে বেড়ায়। প্রতিটি ছোট-খাটো জিনিসও ওর জীবনের সঙ্গে জড়িত। আশৈশব এই বাড়িতে, এই পরিবেশে কেটেছে তার। পরিবেশটা বরং আজন্মই বলা চলে। শ্বশুরবাড়িতে ত গোনা কটা দিন ছিল সে।

ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে ওর দুই চোখ জ্বালা ক'রে জল ভরে আসে। রাসমণি গোছালো মানুষ ছিলেন। সারি সারি ইট সাজানো, তার ওপর নতুন চওড়া তক্তা পাতা। তার ওপর মোটা বিঁড়েতে সার সার জালা বসানো। জালার ওপর কলসী, কলসীর ওপর হাঁড়ি। এর কোন্‌টায় কি থাকে তা উমার আজও মুখস্থ। এর প্রতিটি জালা-কলসীর গায়ে আজও রাসমণির হাতের স্পর্শ মাখানো রয়েছে। নিয়মিত ন্যাকড়া দিয়ে এদের গা থেকে ধুলো মুছে নিতেন তিনি।

হাঁ হাঁ করে বাড়িটা। বিদায়ের হাওয়া উঠেছে। জানলা-দেওয়ালগুলো পর্যন্ত যেন করুণ মুখে অদৃশ্য চোখ মেলে চেয়ে আছে। এরা তার কৈশোরের স্বপ্ন-কল্পনা থেকে শুরু ক'রে যৌবনের চরম ব্যর্থতা—অন্তরের সমস্ত ইতিহাসেরই খবর রাখে। বহু গোপন অশ্রুর সাক্ষী এরা।

গোটা বাড়ি আর পরিষ্কার করা হয় না। অনাবশ্যক বোধেই গিরির মা বৃথা পরিশ্রম করে না। ঘরগুলোতে ধুলো জঞ্জাল জমে উঠেছে কদিনেই। জানালা দরজা খোলাই থাকে—বাতাসে কপাটগুলো যখন আছড়াতে থাকে, উমার মনে হয় ওরা আর্তনাদ করছে। ময়লা ছেঁড়া কাগজগুলো উড়তে থাকে ঘরের ভেতরেই—ভূতে পাওয়ার মত আচরণ যেন তাদের। মধ্যে মধ্যে উমা গিয়ে এক-একখানা কাগজ কুড়িয়ে নিয়ে দেখে। নিতান্তই বাজে কাগজ—তবু এরা কবে কি কারণে এ বাড়ি ঢুকেছিল তা আজও মনে আছে উমার।

অবশেষে একেবারে ছেড়ে যাবার দিনটিও এসে যায়।

সেদিন উমা এক কাণ্ড ক'রে বসল। ভোরে উঠে নিজেই জল তুলে গোটা বাড়িটা ধুতে মুছতে শুরু করলে। শ্যামা ছুটে এসে বললে, 'এ কী করছিস্ উমি? এ ভূতের ব্যাগার খাটছিস্ কেন? তাও ত গিরির মাকে বললেই হ'ত—সে ত আজও আছে।'

'থাক গে ছোড়দি। আমিই করি—নইলে শান্তি পাব না। যে আমাদের এতকাল আশ্রয় দিলে, তাকে এমনভাবে ছেড়ে যাওয়া ঠিক নয়।'

শ্যামা ঠোঁট উল্টে বলে, 'তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে!'

শ্যামা এ কদিন আর যায় নি। একেবারে এদের নতুন বাড়িতে বসিয়ে দিয়ে যাবে। তার যে দুঃখ হচ্ছে না তা নয়—হাজার হোক এইটেকেই সে বাপের বাড়ি জেনে এসেছে এতকাল। তাছাড়া এদের সম্বন্ধেও তার মনে একটি ব্যথার সুর আজও বাজে। তবু তার ভবিষ্যতের স্বপ্ন তাকে নতুন আশা যোগায়।

হেমের একটু উন্নতি হলেই সে বিয়ে দেবে। খোকাটাকে লেখাপড়া শেখাবে। তরুকেও লেখাপড়া শেখাবার ইচ্ছে আছে তার। আজকাল মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার খুব চল হয়েছে, এমন কি তাদের পাড়াগাঁয়েও। স্বদেশী ছেলেরা নাকি উঠে পড়ে লেগেছে, মেয়েদের জন্যে স্কুল করবে।

আবার কখনও কখনও বলে, 'সরকার-গিন্নীকে ধরে একটু জায়গা আমি বাগাবই। তারপর যদি মাটির ঘরও একখানা করতে পারি ত আমাকে পায় কে! মাটির ঘরই বা করতে হবে কেন, হেমের বিয়েতে মোটামুটি টাকা নেব আমি—তাতে পাকা ঘর হবে—'

উমা শোনে। একই মায়ের পেটের দুই বোন যমজ বোন। একজনের জীবন উজ্জ্বল সার্থকতার দিকে প্রসারিত—আর তার? ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে কোথাও কোন আশা নেই, কোন সফলতার স্বপ্ন দেখবার মতও সূত্র একটুখানি নেই। ধূসর অন্ধকার চারিদিকে। জীবনের প্রভাতেই তার মনের আকাশ থেকে সমস্ত সোনালী রঙ মুছে গেল। এক-এক সময় হিংস্র হয়ে উঠতে চায় সে। উন্মত্ত আক্রোশে এই সৃষ্টির সব কিছু লণ্ডভণ্ড ক'রে জীবনের সমস্ত সুন্দর অস্তিত্বকে নখে চিরে ফেলতে ইচ্ছে করে তার।

খাওয়া-দাওয়ার পরই শ্যামা ছেলেমেয়ে নিয়ে ও-বাড়ি চলে গেল! সে আর হেম এদের ঘরকন্না সাজিয়ে দিয়ে যাবে। অভয়পদ রইল শুধু এদের নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

উমা যেন পালিয়ে বেড়াতে থাকে। ওর ভাব-ভঙ্গী দেখলে মনে হয় যে, এরা ওকে ধরে নিয়ে যাবে দেখা হ'লেই—সেই ভয়ে সে এদের চোখ এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

গিরির মা বাসন কখানা মেজে দিয়ে একটা বস্তার মধ্যে পুরে দিলে। এই কখানা দুপুরের খাওয়ার বাসন, বালতি আর ঘটি—এই বাকী ছিল। সে আজ সকাল থেকেই কাঁদছে—তার কান্নার বিরাম নেই। বহুদিনের লোক সে। মধ্যে ঠিকে-ঝির কাজ ক'রে বেড়াত কিন্তু এ বাড়ি একেবারে ছাড়ে নি। রাসমণির

অসুখের সময় আবার রাতদিনের কাজই ধরেছিল। তাকেও অন্যত্র চাকরি দেখে নিতে হয়েছে। নতুন বাড়িতে দেড় টাকা মাইনেতে ঠিকে-ঝি হয়েছে, সে শুধু বাসন মেজে দিয়ে যাবে। গিরির মা এখানেই অন্য কোন বাড়িতে রাতদিনের কাজ পেয়েছে—বেপাড়ায় গিয়ে ঠিকেকাজ করতে পারবে না।

অবশেষে এক সময় সে-ও বিদায় নেয়। গলায় কাপড় দিয়ে কমলাকে প্রণাম করতে গিয়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে। বেগ একটু কমতে বলে, 'বড়দি, আমাদের ছোড়দিকে দেখতে পাবো না যাওয়ার সময় ?'

একটু ইতস্তত ক'রে কমলা উত্তর দেয়, 'থাক্ গিরির মা। সে আর সইতে পারছে না। দেখছিস্ না পালিয়ে বেড়াচ্ছে! তুই এখন যা—একদিন যাস্ ও বাড়িতে। দেখে ত এসেছিস!'

'আচ্ছা' বলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে বেরিয়ে যায়। কমলা তাকে নতুন এক-খানা তসরের থান কিনে দিয়েছে। দীর্ঘকালের মানুষ—মার মতন আগলে নিয়েছিল। গোবিন্দ বড় হয়ে চাকরি করুক, ততদিন যদি গিরির মা বেঁচে থাকে ত কাছে এনে রাখবে কমলা। বৃদ্ধ বয়সে কমলাই তাকে দেখবে।

অভয়পদ এসে বলে, 'বড় মাসিমা, গাড়ি ডাকতে যাই ?'

চোখ মুছে কমলা উত্তর দেয়, 'যাও বাবা।'

কিন্তু উমাই বা গেল কোথা ?

কমলা ওপরে উঠে এঘর ওঘর খুঁজতে লাগল। খালি ঘরগুলো চা চা করছে। কেমন যেন ভয়-ভয় করে। কমলা একবার নাম ধরে ডাকলও; কিন্তু সাড়া পেলে না। কমলা উদ্বিগ্ন হয়ে তেতলার ছাদে উঠে গেল তাড়াতাড়ি।

ছাদের যে কোণটা থেকে বড় রাস্তার খানিকটা অংশ দেখা যায় সেই কোণে আলসের উপর উপুড় হয়ে পড়ে বড় রাস্তার দিকে চেয়ে উমা। কমলার মনে পড়ল, থিয়েটারটা যখন তৈরি হচ্ছে, তখন এইখান থেকেই ও দেখত।

কাছে এসে আলতো মাথায় হাত রেখে কমলা সস্নেহে ডাকলে, 'উমা—'

উমা চমকে উঠল। সে একাগ্র, তন্ময় হয়েই দেখছিল। পান্তির মাঠে সভা আছে, ছেলেরা দলে দলে যাচ্ছে সেই দিকে। পথে ভিড়। কিন্তু উমার চোখ সেদিকে থাকলেও দৃষ্টি কি সেখানে ছিল! দৃষ্টি চলে গিয়েছিল তার সুদূর অতীতে কিংবা অনাগত অন্ধকার ভবিষ্যতে—কে জানে!

'উমা, ওঠ্, বোন' ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় কমলা।

'তুমি যাও বড়দি, আমি যাচ্ছি।'

'না, তুই আয়। আমার সঙ্গে আয়। অভয়পদ গাড়ি ডাকতে গেছে।'

'চলো।' দীর্ঘনিঃশ্বাসটাও যেন ফেলতে পারে না উমা, সযত্নে চেপে যায়।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে মোহাচ্ছন্নের মত। একতলার সিঁড়ির দিকে পা বাড়াতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় উমা।

'একবার মাকে প্রণাম ক'রে যাবো না, দিদি?'

কমলা উত্তর দিতে পারে না, নীরবে ঐ ঘরের দিকে ইঙ্গিত করে। সেও যায় সঙ্গে সঙ্গে।

রাসমণির ঘর। দীর্ঘকাল এই ঘরে ছিলেন তিনি। দীর্ঘদিনের রোগশয্যাও পেতেছিলেন এইখানে। ঐ যেখানে পেরেক পোঁতা আছে মেঝেয়—ঐখানেই তাঁর শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়েছে। এই ঘরের প্রতি অণুতে মায়ের স্মৃতি। আজও যেন উমা তাঁর গায়ের গন্ধ পায় এখানকার বাতাসে।

এতক্ষণ যা প্রাণপণে রোধ ক'রে রেখেছিল, সেই চোখের জল আর বাধা মানে না উমার। হাঁটু গেড়ে বসে প্রণাম করতে গিয়েই আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে সে, মা, মাগো, আমাকেও নাও মা। আর যে পারি না আমি।'

কমলা সান্ত্বনা দেবে কি—সেও কেঁদে আকুল হয়। নির্জন, নিস্তব্ধ বাড়িতে, অসহায় অনাথিনী দুটি রমণীর কান্না দেওয়ালে দেওয়ালে ধাক্কা খেতে খেতে যেন বেরোতে পারে না। ওখানকার বাতাসেই গুমরে বেড়ায়।

সে কান্না থামে না। থামতে পারে না ওরা। অভয়পদ এসে না পড়লে কখন থামত কে জানে! এমন কি অভয়রদও ওদের ডাকতে এসে একটু ইতস্তত করে। শেষে কোনমতে গলাটা পরিষ্কার ক'রে ডাকে, 'বড় মাসিমা, গাড়োয়ানটা বড় গোলমাল করছে, এবার ত উঠতে হয়।'

উত্তর দিতে পারে না কমলা কিন্তু কোনমতে নিজেকে যেন কুড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। তারপর উমাকে এক রকম টেনে এনেই গাড়িতে ওঠে।

অভয়পদ আর একটু দাঁড়ায়। একবার শেষ দৃষ্টি বুলিয়ে নেয় ঘরগুলোয়। কিছু পড়ে না থাকে—দরকারী। তারপর রান্নাঘরের মেঝেতে এক ঘটি জল ঢেলে দিয়ে ঘটি বালতি নিয়ে সেও বেরিয়ে আসে। কপাটে তালা লাগিয়ে টেনে দেখে। এই চাবি আজই রাত্রে বাড়িওয়ালার কাছে পৌঁছে দেবার কথা। তাঁরা কেউ আসতে পারবেন না। তাকেই যেতে হবে।

চিরদিনের মত এ গলি থেকে ওরা বেরিয়ে গেল। এ বাড়ি থেকেও। বহুদিনের পুরোনো বাড়িটা আষাঢ়ের মেঘমেদুর বিষণ্ণ অপরাহ্নে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল শুধু—অন্ধকার অভ্যন্তরে বহুদিনের বহু মলিন স্মৃতি নিয়ে। বাদলা বাতাসে খোলা জানালার কপাটগুলো আছড়ে আছড়ে পড়তে লাগল। আজ আর এ বাড়িতে

আলো জ্বলবে না। আজ আর কেউ এ বাড়ির ছাদে অন্ধকারে অশ্রু বর্ষণ করবে না আল্‌সেতে মাথা রেখে। আবার হয়ত নতুন ভাড়াটে আসবে কিছুকাল পরে, আবার শুরু হবে নতুন লোকের আনাগোনা। কিন্তু সে অন্য লোক, অন্য ইতিহাস।

———

নারী ও নিয়তি

উৎসর্গ

অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

করকমলে

হতভাগ্য শাহ্‌জাদা মুরাদের পরিণতি নিয়ে বিভিন্ন সময়ে তিনটি পৃথক্ গল্প লিখি। পরে সেই তিনটি গল্পের সামান্য কিছু কিছু পরিবর্তন ক'রে এবং তার সঙ্গে অনেকখানি জুড়ে বর্তমান কাহিনীটি দাঁড়িয়েছে।

আচার্য যদুনাথ সরকার মহাশয়ের লেখা 'আওরঙ্গজেবের ইতিহাস' গ্রন্থখানি থেকেই এর উপাদান সংগৃহীত। যতটুকু ইতিহাস পাওয়া যায়, ততটুকুকে আমি অন্তত জেনেশুনে কোথাও বিকৃতি করি নি—যেখানে ইতিহাস নীরব, সেখানেই কল্পনার শরণ নিয়েছি। জনৈকা বাঁদী মুরাদকে ঘুম পাড়িয়ে তাঁর অস্ত্রশস্ত্র অপহরণ করেছিল—একথা ইতিহাসে আছে। আর মুরাদ কারাগারে যাবার সময় সরস্বতী বাঈ বলে একটি হিন্দুনারীকে আওরঙ্গজেবের কাছ থেকে চেয়েছিলেন—একথাও ইতিহাসে আছে। এখানে এই দুটি মেয়েকে আমি একই ব্যক্তি করেছি। এরা যে একই মেয়ে নয়—এমন কথাও ইতিহাসে নেই। সুতরাং তাতে দোষ হয় নি বলেই আমার বিশ্বাস। নকী খাঁর ছেলের নাম জানা যায় নি, নবী আথ্‌তার নাম আমার কল্পিত। মীর সফি খাঁও তাই। ইতি—

গ্রন্থকার

জাফর খাঁ বেশ একটু বিস্মিত হয়েই তাকালেন। তাঁর যেন কেমন ভয় হ'ল; সে ভয় ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য নয়—বিরাট একটা বিপর্যয় আসন্ন জানলে যেমন মানুষের আতঙ্ক হয় তেমনিই। সর্বগ্রাসী ভূমিকম্প কিম্বা প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের আভাস যেন পেলেন তিনি তাঁর নবীন প্রভুর ভ্রূকুটিতে।

আর সত্যই—এ কি একটা অঘটন নয়?

প্রভু হিসাবে নতুন হ'লেও আওরঙ্গজেবকে তিনি নতুন দেখছেন না। প্রবীণ বহুদর্শী রাজনীতিক জাফর খাঁ আবাল্য তাঁর প্রাক্তন প্রভুপুত্রকে দেখেছেন এবং লক্ষ্য করেছেন। সমীহও করেছেন মনে মনে। সেই আস্থা আর শ্রদ্ধা ছিল ব'লে চরম মীমাংসা হবার আগেই তিনি প্রভু ব'লে স্বীকার করেছেন এই মানুষটিকে।

সবচেয়ে জাফর খাঁ শ্রদ্ধা ক'রে এসেছেন আওরঙ্গজেবের মুখের প্রশান্তি। ওঁকে যেন কিছুতেই বিচলিত করা যায় না। ওঁর দৃষ্টির নিরুদ্বেগ কখনও এতটুকু নষ্ট হ'তে দেখেন নি উজীর-ই-আজম। নিশ্চিত মৃত্যুর সামনেও দাঁড়াতে দেখেছেন ওঁকে—যখন কিশোর বয়সে শাহানশাহ্‌ শাহ্‌জাহানের পর্বতসদৃশ হাতী সুধাকর ক্ষেপে উঠে আক্রমণ করেছে—তখনও ঐ মসৃণ সুন্দর ললাটে এতটুকু রেখা পড়ে নি। স্থির গভীর দৃষ্টিতে এতটুকু আতঙ্কের ছায়া দেখা যায় নি। তিনি দেখেন নি—কিন্তু শুনেছেন যে উত্তর-পশ্চিমের দুর্ধর্ষ তাতারদের উদ্যত অস্ত্রের একেবারে সামনে, ঘোড়া থেকে নেমে যখন বিশ্বের বাদশাহের উদ্দেশে নমাজ পড়েছিলেন—তখনও কাঁপে নি তাঁর ঐ দৃষ্টি, ললাটে দেখা যায় নি কোন কুঞ্চন। আরও শুনেছেন—বিজাপুরের সঙ্গে যুদ্ধে একদিন যখন একের পর এক তাঁর চারজন পার্শ্বচর নিহত হয়েছিল, তখনও এই ঈষৎ-পিঙ্গল অচঞ্চল নয়নে বিন্দুমাত্র উদ্বেগের ছায়া দেখা দেয় নি। অবিচলিত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন তিনি সুদূর গোলন্দাজ বাহিনীর দিকে, তাদের কর্তব্যতৎপরতা লক্ষ্য করছিলেন।

এ-হেন মানুষের ললাটে ভ্রূকুটি দেখলেন—তা সে যত অল্প সময়ের জন্যই হোক—জাফর খাঁ যে কেঁপে উঠবেন, এ আর বিচিত্র কি?

কিন্তু সত্যিই আজ বিচলিত হয়েছেন আওরঙ্গজেব।

সামুগড়ের যুদ্ধে জয়লাভের পর থেকে তিনি একটু অসতর্ক হয়েছেন এটা ঠিক। তবে সেটাও কতকটা ইচ্ছাকৃত। যা তাঁকে করতেই হবে, তার সূচনা এখন থেকে প্রকাশ না পেলে চলবে কেন? এ সাম্রাজ্যের কার্যতঃ তিনিই একেশ্বর, পিতা

বর্তমানেই একদা প্রকাশ্যে তাঁকে গদিতে বসতে হবে—এখন থেকে সেই সত্যটা তাঁর প্রজা ও অনুচরদের কাছে একটু একটু ক'রে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন বৈ কি! এসব ব্যাপারে আকস্মিক আঘাত দিলে যে প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা আছে—তা বিচক্ষণ আওরঙ্গজেবের অজানা ছিল না।

কিন্তু মুস্কিল হয়েছে মুরাদকে নিয়ে। তাঁর এই সামান্য ক্ষমতা গ্রহণের আভাসেই মুরাদ যেন ক্ষেপে গিয়েছেন। মুরাদ কি সত্যই মনে করেছিলেন যে আওরঙ্গজেব সম্পূর্ণ সাম্রাজ্যটা ওঁর হাতে ছেড়ে দেবার জন্যেই এত কষ্ট করছেন? আশ্চর্য! মুরাদ নির্বোধ তিনি জানতেন—কিন্তু এতটা নির্বোধ তা কখনও ভাবেন নি।

হ্যাঁ—তিনি বলেছিলেন মুখে এটা ঠিক যে, কেবলমাত্র কাফের দারাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্যই তাঁর এই প্রয়াস, একবার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'লে—হয় তিনি সম্রাট মুরাদের অধীনে সামান্য কোন চাকরি ক'রে পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ করবেন নয়তো সপরিবারে মক্কায় যাবেন। এবং এও ঠিক যে, সামুগড়ের যুদ্ধে বিজয়লাভের পর তিনিই প্রথম মুরাদকে সম্রাট ব'লে অভিবাদন করেন, ঘোষণা করেন যে মুরাদের রাজত্বকাল সেই তারিখ থেকেই গণনা করা হবে। তাই ব'লে···মুরাদ এত নির্বোধ!

বীর ভাই মুরাদের ওপর স্নেহও তাঁর কিছু ছিল। সেদিন যখন যুদ্ধক্ষেত্রে আহত মুরাদের মাথা কোলে নিয়ে বসেছিলেন তখন তাঁর চোখে যে জল এসেছিল তা হয়তো সবটাই ছলনা নয়। হয়তো—তেমনি অনুগত ও আজ্ঞাবহ থাকলে একেবারে বঞ্চিত করতেনও না, হয়তো তাঁর বাকী জীবনটা নিরাপদে ও সুখে থাকবার মত কোন রাজ্যখণ্ড তাঁকে দিতে পারতেন। কিন্তু মুরাদের সবুর সইল না। বড় তাড়াতাড়ি অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন।

এ অসহিষ্ণুতার সংবাদ আওরঙ্গজেব কিছুদিন ধরেই পাচ্ছেন। মুরাদ সুস্থ হয়ে উঠেছেন বেশ কয়েকদিন আগেই, কিন্তু তিনি আওরঙ্গজেবের শিবিরে আসেন না। অথচ সামুগড়ের যুদ্ধের দিন পর্যন্ত প্রত্যহ প্রভাতে নমাজের পর বড় ভাইকে 'আদাব' জানাতে আসা তাঁর নিত্য অভ্যাস ছিল। শুধু তাই নয়—তিনিও আওরঙ্গজেবের অনুকরণে খেতাব আর মনসব্ বিলোতে শুরু করেছেন। তাঁর সৈন্যসংখ্যাও নিত্যই বাড়ছে। প্রায় বিশ হাজার লোক এখন মুরাদের শিবিরে বেতনভুক্ হয়ে রয়েছে। লক্ষণ অত্যন্ত খারাপ।

কারা যে মুরাদকে কুপরামর্শ দিচ্ছে তাও আওরঙ্গজেব জানেন। কতকগুলি অন্তরঙ্গ পারিষদ—যারা মুরাদের উদারতা ও অবিমৃষ্যকারিতার সুযোগ নিয়ে পেট-

মোটা করছে এবং ভবিষ্যতে মুরাদ বাদশা হ'লে আরও বহুরকম লাভের স্বপ্ন দেখছে —তারাই ওঁর কানের কাছে অহরহ গুঞ্জন করছে, 'এ কি রকম ব্যবহার? আপনার ভাই আওরঙ্গজেব তো দিব্যি বাদশাহী শুরু ক'রে দিয়েছেন। মনসব্ দিচ্ছেন, জায়গীর দিচ্ছেন, লোককে নতুন নতুন চাকরি দিচ্ছেন—প্রত্যহ দরবার বসছে তাঁর বাসাতে! সব লোক তো ঝেঁটিয়ে যাচ্ছে তাঁকেই সেলাম দিতে। এরই জন্যে কি এত কষ্ট ক'রে আপনি এই দুটো বড় বড় যুদ্ধে জিতলেন? আপনার বাদশাহী তো আকাশ-কুসুমের মতই আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে দেখছি।'

মূঢ়ের দল। ওরা জানে না যে শুধুমাত্র শৌর্য ও বীর্যে যুদ্ধে জেতা যায় না। যুদ্ধ জিততে লাগে কিছু মস্তিষ্ক। আর সেটা খোদাতালা সবাইকে দেন না, সে শক্তি থাকে তাঁরই অনুগৃহীত ও চিহ্নিত অল্প কয়েকজন লোকের। যুদ্ধ তিনিই জিতেছেন। নইলে দারার দিকেই কি শৌর্য-বীর্যশালী লোকের কিছু অভাব ছিল? যশোবন্ত সিংহ কি কাপুরুষ?

তবু—মুরাদের এই কিছু কিছু ছেলেমানুষী ঔদ্ধত্যেও বিচলিত হতেন না আওরঙ্গজেব। তাঁর অদৃষ্টাকাশ এখনও সম্পূর্ণ মেঘমুক্ত হয় নি। দারা এখনও দিল্লীতে বসে—হিন্দুস্তানের বহু লোকের অন্তরের দুলাল দারা। শাহানশাহ্ শাহ্জাহানের বুকের নিধি! শত্রুকে ছোট ক'রে দেখতে তিনি চান না— বিশেষতঃ দারার মত শত্রু। যে কোন মুহূর্তেই সে শক্তি-সঞ্চয় করতে পারে। পূর্ব দেশে সুজাও একেবারে অবজ্ঞেয় নয়। সুজা বীর, বুদ্ধিমান। উদার-হৃদয় তো বটেই। সুজা অনেকেরই প্রিয়। দুদিকে দুই প্রবল শত্রু থাকতে মুরাদকে চটানো কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত নয় তা আওরঙ্গজেব জানেন। কিন্তু আগ্রাতে যদি চুপ ক'রে বসে থাকতেন মুরাদ, ওখান থেকে ছোটখাটো ব্যাপারে বাদশাহীর শখ মেটাতেন, এমন কি কিছু ছোট ছোট ষড়যন্ত্রও করতেন তো—অত আপত্তি থাকত না আওরঙ্গজেবের। চিন্তার কারণ থাকত, লক্ষ্য রাখতে হ'ত এইমাত্র। মুরাদের বর্তমান আচরণের মত তা বিরক্তিকর হয়ে উঠত না।

আওরঙ্গজেব যখন প্রথম দিল্লী অভিযানের কথা বলে পাঠালেন মুরাদকে, তখন তিনি অসুস্থতার অজুহাতে নড়তে রাজী হন নি। আওরঙ্গজেবও এইরকম উত্তর আশা ক'রেছিলেন; তাই আর কালবিলম্ব না ক'রে তিনি রওনা হয়েছিলেন। কিন্তু তারপরই খবর পেলেন যে মুরাদও তাঁবু গুটিয়েছেন, আসছেন তাঁর পিছু পিছুই। বোধ হয় মুরাদের পারিষদরা বুঝিয়েছে যে আওরঙ্গজেব একা নিরঙ্কুশ-ভাবে দিল্লী দখল ক'রতে পারলে সেখানে নিজেকেই বাদশাহ্ ব'লে হয়তো ঘোষণা করবেন। তখন মুরাদের দশা কি হবে? অমনভাবে ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়।

অবশ্য প্রথমটা আওরঙ্গজেব খুশিই হয়েছিলেন। কাছে থাকা মানে নজরে থাকা। কিন্তু এই দু-তিন দিনেই অসহ্য হয়ে উঠেছে ব্যাপারটা। মুরাদ পিছু পিছু আসছেন কিন্তু একেবারে সঙ্গে আসছেন না। আওরঙ্গজেবের বাহিনী থামলে ওঁর বাহিনীও থেমে যায়। সর্বদা পাঁচ ছয় ক্রোশের ব্যবধান থাকে দুই শিবিরে। অর্থাৎ আওরঙ্গজেবকে যেন ভয় দেখাতেই চান মুরাদ। যে কোন সময় তাঁর বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে আওরঙ্গজেবকে পিছন থেকে আক্রমণ করতে পারেন—এইটাই তিনি বুঝিয়ে দিতে চান।

আওরঙ্গজেব হাসলেন মনে মনে। মুরাদ এখনও তাঁকে চেনেন নি। ভয় শব্দটি যে কি, আজও তা আওরঙ্গজেব বুঝলেন না! কিন্তু মুরাদের ধৃষ্টতার এইখানেই শেষ নয়। তিনি নাকি পথে আসতে আসতেই রাজকর আদায় করতে শুরু ক'রেছেন। পীড়নের শেষ নেই। সৈন্য ও ঘোড়ার জন্যে রসদ সংগ্রহ হচ্ছে—তার দাম পাচ্ছে না ব্যাপারীরা। মুরাদের অনুগৃহীত উদ্ধত দু-একজন কর্মচারী ও পারিষদরা নানা অত্যাচারে দুর্বহ করছে প্রজাদের জীবন। এইমাত্র জাফর খাঁ সংবাদ এনেছেন—সামান্য কারণে একটা পুরো গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে সমস্ত গ্রামবাসীকে হত্যা করেছে ওঁর অনুচরেরা।

আওরঙ্গজেব আবার ভ্রূকুটি করলেন।

আর নয়। এবারে এর শেষ হওয়া চাই। প্রজাদের শত্রু করলে চলবে না। তা হ'লে সমস্ত শক্তি ভেঙে পড়বে মূল থেকে—এ তিনি জানেন। প্রজাদের পীড়ন করতেই হয়—কিন্তু এমনভাবে উৎপীড়িত করলে রাজার রাজত্ব টেকে না। যা করতে হয়—অল্পে অল্পে!

আওরঙ্গজেব সুদূর দিগন্তরেখা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। সামনে দাঁড়িয়ে আছেন জাফর খাঁ স্তব্ধ প্রস্তরমূর্তির মত। নির্নিমেষ দৃষ্টি প্রভুর মুখের ওপর নিবদ্ধ। এই জন্যই এত অল্প দিনে জাফর খাঁ তাঁর প্রিয় হ'তে পেরেছেন। চিন্তার সময় বিরক্ত করেন না জাফর।

'জাফর খাঁ সাহেব!'

'বলুন খোদাবন্দ।'

'দিল্লী যাত্রা কিছুকালের জন্য স্থগিত রাখব আমি। আপনি সেই নির্দেশ দিন।'

'যো হুকুম। কিন্তু এইখানেই কি থাকবেন? কাছেই মথুরা, হিন্দুপ্রধান স্থান।'

'আমি মন স্থির করেছি জাফর খাঁ। হ্যাঁ—দেখুন, কাল কতকগুলি নর্তকীকে দেখলুম নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সায়েস্তা খাঁর তাঁবুর দিকে। ওগুলিকে তো এর আগে দেখেছি ব'লে মনে হয় না।'

'শাহানশাহ্ ঠিকই অনুমান করেছেন। আগ্রা থেকে এসেছে ওরা—এ শিবিরে একেবারেই নতুন।'

জাফর খাঁর বিস্ময়ের আজ শেষ নেই। আওরঙ্গজেব নর্তকীদেরও লক্ষ্য করেন তা হ'লে—এবং করেন যে নতুন কিনা, এক নজরে বুঝে নেন! আশ্চর্য বটে—ফকীর, সংসার-বৈরাগী আওরঙ্গজেবের পক্ষে।

আওরঙ্গজেব অন্য প্রসঙ্গ পাড়লেন। বললেন, 'দেখুন কুড়ি লক্ষ টাকা, আর কাল যে নতুন আড়াই শ আরবী ঘোড়া কেনা হয়েছে—সেই সমস্ত ঘোড়া এবং কিছু ফিরিঙ্গী মদ এখনই আপনি মুরাদের শিবিরে পাঠিয়ে দিন। ভাইসাহেব আমাকে ক'দিন আগেই টাকার কথা বলেছিলেন—মনে ছিল না, ওঁর ফৌজের জন্যে ঘোড়াও দরকার।...আর অমনি ঐ সঙ্গে একটা খৎ পাঠিয়ে দিন যে লুঠের মাল হিসেব ক'রে শিগ্‌গিরই আমি তাঁর প্রাপ্য তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেব। আরও লিখবেন যে হাকিমের কাছে খবর পেলুম তাঁর শরীর এখনও সংপূর্ণ সারে নি বলেই আমি দিল্লী যাত্রা কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখলুম। দারার মত শত্রুর সম্মুখীন হ'তে হবে—পূর্ণ উদ্যম নিয়ে তাঁর যাওয়া চাই।'

জাফর খাঁ আভূমি নত হয়ে সেলাম জানিয়ে আদেশ শিরোধার্য করলেন। তারপর বললেন, 'অধীনের অপরাধ যদি না নেন্—দারা ইতিমধ্যে আমাদের আগ্রা ত্যাগের খবর নিশ্চয়ই পেয়েছেন—'

বাধা দিয়ে আওরঙ্গজেব বললেন, 'সে সংবাদ স্বয়ং শাহানশাহ্ শাহ্‌জাহানই তাঁকে পাঠিয়েছেন। শাহানশাহের চিঠির নকল আমার কাছেই রয়েছে জাফর খাঁ।'

আওরঙ্গজেব হাসলেন না—শুধু ক্ষীণ হাসির একটা রেখা তাঁর ওষ্ঠপ্রান্তে একবার দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।

এসবে আজকাল আর বিস্মিত হন না জাফর আলি খাঁ। মনিবকে তিনি এর মধ্যেই এটুকু চিনেছেন। তিনি বললেন, 'এখন যদি আমরা এখানে কালক্ষেপ করি তো তাঁকেই একটু সুযোগ দেওয়া হবে না কি? অতর্কিতে তাঁকে আক্রমণ করতে পারলে—'

আওরঙ্গজেব এবার হাসলেন। চিরাভ্যস্ত মধুর হাসি।

'শাহ্‌জাদা দারা শুকোহ্ আজ রাত্রি-শেষেই দিল্লী ত্যাগ করছেন। সরহিন্দ্ আর লাহোরের তোষাখানাই তাঁর লক্ষ্য। তাঁর গতিবিধি, ছেলের উপর তাঁর

নির্দেশ—কিছুই আমার অজানা নেই উজীর সাহেব। দারার জন্য আমার দুশ্চিন্তা নেই খুব। দিল্লী ত্যাগ ক'রেই তিনি ভুল করলেন—আমার সুবিধা ক'রে দিলেন। দিল্লীতে তিনি গৃহস্বামী—লাহোরে পলাতক, আশ্রিত। না—আগে মুরাদ। তারপর অন্য কথা।'

এর পরের ইতিহাস খুবই সংক্ষিপ্ত। প্রচুর উপঢৌকন পেয়ে মুরাদের মন স্বভাবতই নরম হয়ে এল। অবিশ্বাস করা তাঁর স্বভাব নয়। আওরঙ্গজেবকে যে তিনি অবিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন—সে শুধু অনুচরদের প্ররোচনায় তার জন্য কিছু কিছু অশান্তিও ভোগ করছিলেন মনে মনে। এবার সে সংশয় দূর করতে পেরে যেন বেঁচে গেলেন।

ঠিক সময় বুঝে আওরঙ্গজেব জানালেন যে, বীর ভাইয়ের আরোগ্য-সংবাদে তিনি এত খুশি হয়েছেন যে তিনি তাঁর মানসিক-মত দরগাতে দরগাতে শিন্নি পাঠিয়েছেন। তাছাড়া নিজে বিশেষ ক'রে ধন্যবাদ-জ্ঞাপক নমাজও পড়েছেন বারকয়েক। এখন একটু উৎসব করলে মন্দ হয় না। একদিন যদি মুরাদ একটু সময় দেন তো আওরঙ্গজেব ওঁর আর ওঁর অন্তরঙ্গদের জন্য একটু ভাল খাওয়া-দাওয়ারও আয়োজন করবেন। আর সেই ফাঁকে দিল্লী অভিযানের পরামর্শটাও পাকা করা যেতে পারে। কী বলেন ভাই মুরাদ?

মুরাদ হয়তো তখনই রাজী হতেন কিন্তু বুদ্ধিমান ও হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুবান্ধবের একেবারে অভাব ছিল না, তারা বুঝিয়ে দিলে যে, বাঘকে খোঁচা দেবার পর আর তার খাঁচায় প্রবেশ করা উচিত নয়। একবার বিরোধিতা করায় পর আওরঙ্গজেবের কাছে 'খানা' খাবার লোভ তাঁর সাম্‌লানোই উচিত। মুরাদও কথাটা বুঝলেন। তৈমুর বংশের রক্ত তাঁর ধমনীতেও প্রবাহিত। তিনি নানা অজুহাতে দিনের পর দিন সে আমন্ত্রণ এড়িয়ে যেতে লাগলেন।

আওরঙ্গজেব এ সম্ভাবনার জন্যও প্রস্তুত ছিলেন বৈকি!

এর মধ্যেই তিনি অত্যন্ত গোপনে লোক পাঠিয়েছিলেন—মুরাদের কোন পারিষদের কাছে নয়, বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়ের কাছে নয়—ওঁর 'খাবাস' বা খাস খানসামা নুরুদ্দীনের কাছে। কৃপণ আওরঙ্গজেব প্রয়োজনমত দরাজ-দিল হ'তে পারতেন—ওঁর লোক গিয়ে একেবারেই পাঁচ হাজার টাকা নুরুদ্দীনের হাতে দিয়ে বললে, কোন মতে মুরাদকে বুদ্ধি দিয়ে আওরঙ্গজেবের শিবির পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারলে—আরও এক লাখ টাকা সে পাবে।

খানসামা, তা সে সম্রাটের হ'লেও, এমন কিছু বেতন তার নয় যে, এক লক্ষ

টাকার প্রলোভন সে ত্যাগ ক'রতে পারবে। আর দিনরাত যে কাছে কাছে থাকে, তার মত মন্ত্রণাদাতাই বা কে আছে! কুমন্ত্রণা দেবার এত সুযোগ আর কার? সুতরাং—

আওরঙ্গজেব যে শুধু মানুষ চিনতেন তাই নয়—ঠিক লোককে ঠিক কাজে লাগাবার ক্ষমতাও ছিল তাঁর অসাধারণ। দেখা গেল এক্ষেত্রেও তাঁর হিসাবে ভুল হয় নি। দিন-তিনেক পরেই খবর এল—বলি তৈরী, যূপকাষ্ঠ প্রস্তুত করো।

আরওঙ্গজেব তাঁর নিমন্ত্রণ রোজই পাঠাতেন—সেদিন উত্তর এল, শাহান্‌শাহ মুরাদ শিকারে যাবেন, শিকারের ফেরত স-পারিষদ পৌছবেন আওরঙ্গজেবের তাঁবুতে।

আওরঙ্গজেব তৎক্ষণাৎ জাফর খাঁকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'ভাই মুরাদ নিমন্ত্রণ খেতে আসছেন। তাঁর সেবার জন্য একটি ভাল মেয়ে চাই উজীর সাহেব। ভাইয়ের আমার এদিকে একটু দুর্বলতা আছে জানেন তো! সেই যে সেদিন দেখেছিলাম আগ্রা-থেকে-আনা নতুন নর্তকীর দল—তাদের একবার ডাকুন। আমি নিজে একটি মেয়ে বেছে নেব।'

জাফর খাঁ মুখে কোন বিস্ময় প্রকাশ করলেন না, সে অভ্যাস থাকলে আজ এই পদ পেতেন না। তখনই লোক পাঠালেন সেই নর্তকীদের ডাকতে। ওরা যখন এসে পৌছল, কেবল সেই সময়টা আর চলে যেতে পারলেন না, কৌতূহল-বশতঃ দাঁড়িয়েই রইলেন এক পাশে।

আওরঙ্গজেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন ওদের দিকে। তাকিয়েই রইলেন। প্রত্যেকটি মুখের উপর তাঁর দৃষ্টি কিছুক্ষণের জন্য নিবদ্ধ হ'তে লাগল। মনে হ'ল শুধু ওদের দেহই নয়—মনের অন্তস্তল পর্যন্ত সেই কয়েক লহমায় যেন যাচাই ক'রে নিচ্ছেন। পূর্ণ-যুবতী লাস্যময়ী নারীর দল। দৃঢ়চিত্ত সন্ন্যাসীর ধ্যান ভাঙাবার পক্ষেও যথেষ্ট তারা। কিন্তু এই রূপসী তরুণীদের মধ্যে থেকে আওরঙ্গজেব শেষ অবধি যাকে বেছে নিলেন, তাকে দেখে জাফর খাঁর আসল বিশ্বাসটাই দৃঢ়তর হ'ল —নতুন মনিবটির রসবোধ বড় কম।...ভঙ্গুর চেহারার ছোটখাটো লাজুক মেয়েটি, দীর্ঘ-পক্ষ্ম চোখ-দুটি তার যেন কিছুতেই মাটির ওপর উঠতে চায় না। এর মধ্যে কি এমন অসাধারণত্ব দেখলেন আওরঙ্গজেব?

ওঁর মনের ভাব এই চতুর লোকটির কাছে চাপা রইল না। তিনি ইঙ্গিতে সেই মেয়েটিকে থাকতে ব'লে বাকী সকলকে বিদায় ক'রে দিলেন। তারপর গলা নামিয়ে জাফর খাঁকে বললেন, 'আমাকে একেবারেই আনাড়ি মনে করার কারণ নেই উজীর সাহেব, বলিষ্ঠ বীর ভাই আমার—দুর্বল ও লাজুক ধরণের মেয়েই

পছন্দ ক'রবে। সহকার বনস্পতির আলিঙ্গনের জন্য লালায়িত নয়—সে চায় লতা। মেয়েটির ভাব-ভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছে ও হিন্দু—কি নাম ওর জিজ্ঞাসা করুন তো।'

মেয়েটি দ্বিধা জড়িত অস্পষ্ট কণ্ঠে নাম জানাল—'সরস্বতী বাঈ।'

ইতিমধ্যেই প্রবল-প্রতাপ দণ্ডমুণ্ডের কর্তা শাহানশাহ্‌ আওরঙ্গজেবের তীক্ষ্ণ-দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে ঘেমে উঠেছে মেয়েটি। তার সেই আরক্ত, ঈষৎ ত্রস্ত, স্বেদ-সিক্ত মুখের দিকে চেয়ে জাফর খাঁর মনে হ'ল এইবার যে, মেয়েটি মন্দ নয়।

আওরঙ্গজেবও পছন্দসূচকভাবে ঘাড় নাড়লেন। বললেন, 'বাঃ, মেয়েটির আরও বহু গুণ আছে দেখছি। ঠিকই বেচেছি আমি—আচ্ছা, জাফর আলি খাঁ, আপনি নিজের কাজে যেতে পারেন, আমি একে একটু তালিম দিয়ে রাখতে চাই!'

মেয়েটি চকিতে একবার অসহায় দৃষ্টি তুলে তাকালে জাফর খাঁর গতিপথের দিকে। সেটাও আওরঙ্গজেবের দৃষ্টি এড়াল না। তিনি বললেন, 'ভয় নেই, এদিকে এস। তোমাকে আমার অন্য প্রয়োজন আছে।...যা বলছি মন দিয়ে শোন।'

এগিয়ে এসে নতমুখে দাঁড়াল সরস্বতী বাঈ। গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে শুনল সব নির্দেশ। বক্তব্য শেষ হ'লে আওরঙ্গজের প্রশ্ন করলেন, 'বুঝেছ ঠিক, তোমাকে কি করতে হবে?'

অভিবাদন ক'রে জানাল সরস্বতী বাঈ, সে বুঝেছে।

'মনে থাকবে ঠিক?'

'থাকবে।'

'কাজ সফল হ'লে প্রচুর পুরস্কার পাবে। আর ব্যর্থ হ'লে—আমি ব্যর্থতার অপরাধ কখনও ক্ষমা করি না, এটাও মনে রেখো। যদি সফল না হও তো প্রাণদণ্ড পাবে।'

সরস্বতী বাঈ-এর আনত মুখের একটি রেখাও কাঁপল না এই ভীতি-প্রদর্শনে। আরক্ত মুখের স্বেদবিন্দুগুলি শুধু একটি আর একটির সঙ্গে মিলিত হয়ে রেখার সৃষ্টি করতে লাগল সুশ্রী, সুডৌল কপোলে। সমস্তটা জড়িয়ে এত অসহায়, এত সুকুমার দেখাচ্ছিল ওকে যে সেদিকে চেয়ে সহসা স্নেহার্দ্র হয়ে ওঠারই কথা—সাধারণ মানুষের মন।

মুহূর্ত-কয়েক চুপ ক'রে থেকে আওরঙ্গজেব বললেন, 'আর কোন বক্তব্য আছে তোমার?'

প্রশ্ন করলেন, তবে সত্যি-সত্যিই কোন বক্তব্য আশা করেন নি। কিন্তু তাঁকে বিস্মিত ক'রে দিয়ে সরস্বতী বাঈ যেন একটু নড়ে উঠল, একটু সঙ্কোচ, একটু দ্বিধা ফুটে উঠল ওর দাঁড়াবার ভঙ্গীতে—অর্থাৎ কথা কইবারই পূর্বাভাস।

সরস্বতী বাঈ শেষ পর্যন্ত সত্যই কথা কইল! আর একবার আভূমি-নত অভিবাদন ক'রে—করজোড়ে কম্পিতকণ্ঠে বললে, 'বাঁদীর অপরাধ ক্ষমা করবেন জনাবালি, একটি প্রশ্ন করবার অনুমতি পাব কি ?'

আওরঙ্গজেবের কৌতূহল ততক্ষণে প্রবল হয়ে উঠেছে। কি প্রশ্ন থাকতে পারে এই সামান্যা বাঁদীর—তাঁর কাছে ? একটুখানি চুপ ক'রে থেকে—বোধ করি ওর মুখভাব থেকে প্রশ্নটা অনুমান করারই চেষ্টা ক'রে—বললেন, 'বল, কী বলবার আছে তোমার ?'

'আলিজা, শাস্তির কথাটা যেমন আগেই জানিয়ে দিলেন, পুরস্কারের কথাটা তো জানালেন না। আমাকে দুদিকই বুঝতে দিন।'

এ ধৃষ্টতায় ক্রুদ্ধ হবারই কথা। কিন্তু কী এক অজ্ঞাত কারণে ঠিক অতটা ক্রুদ্ধ হ'তে পারলেন না। বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুদ্ধির মর্যাদা দিতে জানেন। বুঝলেন যে মেয়েটি যত শান্ত ঠিক তত নির্বোধ নয়। বললেন, 'তোমার কি কোন বিশেষ পুরস্কারে লোভ আছে সরস্বতী বাঈ ?'

'জনাবালি অভয় দিয়েছেন ব'লেই বলছি—আছে।'

'কি পুরস্কার চাও বল। নির্ভয়েই বল।'

মেয়েছেলে আর কি চাইবে—অলঙ্কার, অর্থ, নয়তো মুক্তি। মনে মনে ভাবলেন আওরঙ্গজেব!

'শাহজাদা মুরাদকে যদি আপনি নির্বিঘ্নে বন্দী করতে পারেন তো তাঁর সেই বন্দীদশাতেও তাঁর সেবার অধিকার চাই আমি!'

এবার আওরঙ্গজেবের প্রশান্ত মুখেও বিস্ময়ের রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠল। তিনি কি ঠিক শুনছেন ? কিন্তু ভুল শোনবারও তো কোন কারণ নেই। খানিকটা চুপ ক'রে থেকে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'অর্থাৎ তুমি তাঁর সঙ্গে বন্দী হয়ে থাকতে চাও ?'

'হ্যাঁ, শাহান্‌শাহ্।'

'কিন্তু তাঁকে বন্দী করার ষড়যন্ত্রে তুমি লিপ্ত আছ জেনেও কি তিনি তোমাকে কাছে থাকতে দেবেন মনে করো ?'

'আমি যে আজ্ঞার দাসী মাত্র তা তিনি জানেন নিশ্চয়ই।...আর না হয় আমাকে তাড়িয়ে দেবেন। না হয়...না হয় পদাঘাত করবেন। তাঁর পদাঘাতে মৃত্যুও আমার কাছে প্রার্থনীয় জনাব।'

আওরঙ্গজেব স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইলেন ওর মুখের দিকে। কিছুক্ষণ পরে বললেন, 'তুমি কি তাঁকে দেখেছ কখনও?'

'হ্যাঁ, আলিজা?'

'কোথায়?'

এবার সরস্বতী বাঈয়ের স্তব্ধ থাকবার পালা। এই প্রশ্ন ওর স্মৃতির যে বীণা-তন্ত্রীতে আঘাত করল সে আঘাত শুধু ওর মনের তারেই নয়—সমস্ত দেহকেই কাঁপিয়ে, অবশ ক'রে তুলল মুহূর্তমধ্যে। ওর মন চলে গেল বহুদূরে, বহু দূর অতীতে। চোখের সামনে ভেসে উঠল ওর পিত্রালয়ের সেই ঝরোকা—যেখানে অন্যান্য পুরবাসিনীদের সঙ্গে এক কিশোরী মেয়ে নিতান্ত কৌতূহলী হয়েই এসে দাঁড়িয়েছিল, রাস্তায় সামরিক বাদ্যের আওয়াজে—তামাশা দেখতে!

তারপর?

তারপরের সে কথা আজও ওর মনের মধ্যে আগুনের ছাপে আঁকা আছে বৈ কি!

আগে আগে অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যের দল চলেছিল। নিতান্ত অলস কৌতূহলেই চেয়েছিল সেই মেয়েটি। সারির পর সারি। কোথায় যাচ্ছে এরা, —এমনিই এক অলস প্রশ্নের উত্তরে কে যেন উপেক্ষার সঙ্গেই উত্তর দিয়েছিল, শাহ্‌জাদা মুরাদ গুজরাতের সুবেদার হয়ে চলেছেন। আজই তাঁর যাত্রা শুরু।

শাহ্‌জাদা মুরাদ? সম্রাটের পুত্র!

মুরাদ বীর যোদ্ধা—একথা শোনা ছিল। এবার ওর কৌতূহলটা যেন একটু সক্রিয় হয়ে উঠল। বেশীক্ষণ অপেক্ষাও করতে হ'ল না, কোন্ এক অন্তঃপুরিকা দেখালেন, ঐ তো শাহ্‌জাদা!

হ্যাঁ, ভাল ক'রেই তাকিয়ে দেখেছিল সে, দেখে যেন নিমেষে পাথর হয়ে গিয়েছিল।

ঐ মুরাদ?

ঐ যৌবনদৃপ্ত, কন্দর্পকান্তি তরুণ? ঐ উন্নতবক্ষ যোদ্ধা—ঐ মুরাদ?

মানুষ এত সুন্দর হয়? এমন আশ্চর্য সুন্দর!

তারপর কখন সে রেসেলা চলে গেছে, কখন পথের বাঁকে অশ্বক্ষুর নিক্ষিপ্ত-ধূলিরাশির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে শেষ অশ্বারোহী—তা হুঁশও ছিল না ওর, পাথরের মূর্তির মতই স্থির অনড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল সে, পথের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে।

তারপর?

তারপর এক বিরাট বিপর্যয়ে যেন সমস্তটা ওলট্‌-পালট্‌ হয়ে গেল। মানুষের জীবনে যে এমন বিপর্যয় আসা সম্ভব তা এর আগে পর্যন্ত কখনও কল্পনাও করে নি সেই বালিকা।

সেদিন থেকে আর কোন চিন্তা, আর কোন কল্পনা ছিল না। মুরাদকে কাছে পেতে হবে ওর। ওর কুমারী-হৃদয়ের সমস্ত সুধা উজাড় ক'রে দেওয়া চাই ঐ বীরের পদপ্রান্তে। যেমন ক'রেই হোক, যে ভাবেই হোক্।

সেই সাধনাই তাকে বুঝি এই প্রচণ্ড সাহস এনে দিয়েছিল, ঘর ছেড়ে অজানার সন্ধানে বেরোবার—দুস্তর বিপদ-সমুদ্র পার হয়ে।

সেই সাধনাই বুঝি আজ তাকে নিয়ে এসেছে এই সিদ্ধির উপকূলে।...

অকস্মাৎ আওরঙ্গজেবের প্রশ্নে ওর ধ্যান ভাঙল, 'কৈ, জবাব দিলে না?' কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ—বিরক্তির আভাস সে কণ্ঠে।

চম্‌কে কেঁপে উঠল সরস্বতী বাঈ। কোথায় চলে গিয়েছিল সে? ছি ছি—এ কি গুস্তাকী তার! সে কম্পিতকণ্ঠে অতিকষ্টে স্বর ফুটিয়ে জবাব দিলে, 'অনেক দিন আগে আগ্রা থেকে তিনি যখন গুর্জর যাত্রা করছেন সেই সময় আমাদের বাড়ির ঝরোকার মধ্য থেকে তাঁকে দেখেছিলাম। সেই দিন থেকেই তাঁর বীর-মূর্তি মনে মনে পূজা করছি। আমরা হিন্দুর মেয়ে, মনে মনে যেদিন থেকে তাঁকে কামনা করছি সেই দিন থেকেই তিনি আমার স্বামী, আমি তাঁর দাসী। কোন দিন হয়তো তাঁর সান্নিধ্য পেতে পারি, অন্ততঃ দূর থেকে তাঁর সেবার অংশ নিতে পারি, এই আশাতেই স্বেচ্ছায় নর্তকী দলে নাম লিখিয়েছি শাহান্‌শাহ্‌, নইলে এখানে আসবার কথা নয় আমার। আমার মা-ও বিখ্যাত গায়িকা—তাঁর ঘরে অন্নের অভাব ছিল না।'

আরও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আওরঙ্গজেব প্রশ্ন করলেন, 'তুমি তাঁকে ভালবাস, অথচ তাঁকে বন্দী করার এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতে রাজী হ'লে! এর কারণ কি?'

'অপরাধ নেবেন না তো জনাবালি?'

'না।'

'আপনি বুদ্ধিমান, সেই হেতু শক্তিমান। আপনি যখন তাঁর সর্বনাশ করতে মনস্থ করেছেন তখন তা করবেনই। মাঝখান থেকে আমি তাঁকে কাছে পাবার, তাঁর সেবা করবার, দুঃখের দিনে প্রেমে ও পরিচর্যায় ভার লাঘব করার এ সুযোগ ছাড়ি কেন?

আওরঙ্গজেব উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বেশ, তোমার প্রার্থিত পুরস্কারই পাবে যদি

সফল হও। বিফল হ'লে—ক্ষমা আমার অভিধানে নেই সরস্বতী বাঈ।'

সরস্বতী বাঈ নীরবে শুধু আর একবার অভিবাদন করল।

দূর গোবর্ধন পাহাড়ের জঙ্গল থেকে ময়ূর আর হরিণ শিকার ক'রে ফিরছিলেন মুরাদ বক্স। লোকালয় পড়তে ওঁর খাবাস নুরুদ্দীন মনে করিয়ে দিল, 'আজ যে আপনার ওখানে খাওয়ার কথা আছে খোদাবন্দ্!'

সবিস্ময়ে মুরাদ প্রশ্ন করলেন, 'কোথায় বল্ তো?'

সারাদিনের শিকারের উত্তেজনায় মুরাদ কথাটা ভুলেই গিয়েছিলেন। কিন্তু এক লাখ টাকার আশা যার চোখের সামনে—সে ভোলে কেমন ক'রে?

নুরুদ্দীন সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিল, 'শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজেবের তাঁবুতে—'

'ও—দাদার কাছে, না? কিন্তু যাওয়া কি ঠিক হবে? থাক্‌গে—'

'আপনি কথা দিয়েছেন তাঁকে। প্রচুর আয়োজন নষ্ট হবে। তাছাড়া তিনি হয়তো মনে করবেন আপনি ভয় পেয়েই—'

'ভয়?' ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটিতে নুরুদ্দীনই ভয় পেয়ে গেল। মুরাদ একেবারে মারমুখী হয়ে বললেন, 'আমার ভয়?...এ কথা আর কোন দিন মুখে এনো না। ভয় যে আমার নেই তা দাদাও জানেন।...তবে হ্যাঁ—কৃপণ মানুষ, আরও ক-দিন তাঁর আয়োজন নষ্ট ক'রেছি। আচ্ছা চলো যাই। কিন্তু শিবিরে ফিরে স্নান ক'রে গেলে হ'ত না? লোকজন আরও কিছু সঙ্গে নিয়ে?'

'সন্ধ্যা হয়ে এল জনাব, আপনার শিবির এখনও প্রায় এক ক্রোশ। সেখানে গিয়ে ফিরে আসতে আসতে খাওয়ার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। আর আমরাও তো রয়েছি জন-চল্লিশেক। আপনাকে তো ঘিরে রাখতে পারব—আমাদের জান নিলে তবে তো তারা আপনাকে পাবে?'

আবারও সেই ভয় পাওয়ার কথা।

মুরাদ ক্ষিপ্ত হয়ে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিলেন আওরঙ্গজেবের শিবিরের দিকে।

ওঁর যে বন্ধু এবং অনুচররা সঙ্গে ছিল তারা ব্যাপারটা বুঝতেই পারে নি। অনেক কষ্ট ক'রে তারা যখন মুরাদের নাগাল পেলে তখন আওরঙ্গজেবের তাঁবু দেখা যাচ্ছে। তবু তারা ফেরাতে চেষ্টা করলে মুরাদকে! কিন্তু ক্ষুধার্ত মুরাদ আর ফিরতে রাজী হলেন না। বিশেষত নুরুদ্দীনের বিদ্রূপ তাঁকে আরও উত্তেজিত ক'রে তুললে। নুরুদ্দীন মুরাদের উজীরকে মুখের ওপরই বললেন, 'কেন—আপনারা এই চল্লিশজন শাহানশাহ্‌কে রক্ষা করতে পারবেন না? তাহলেই বা ভাববার কি আছে, শাহানশাহ্ একাই একশ!'

মুরাদ আর দাঁড়ালেন না। সোজা গিয়ে ঢুকলেন আওরঙ্গজেবের শিবিরে।

সংবাদ পেয়ে আওরঙ্গজেব শশব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন অভ্যর্থনা করতে। একেবারে বুকে জড়িয়ে নিয়ে এলেন তাঁকে। ফুলে ও লতায় তাঁর নিজস্ব তাঁবুটি বিশেষ ক'রে সাজানো হয়েছে। দরবারী তাঁবু। বাইরের দিকে প্রকাণ্ড হল-ঘর—সেখানে আওরঙ্গজেবের কয়েকজন প্রধান পারিষদ বসে—তাঁরাও উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালেন, মুরাদের সঙ্গে যে সব বন্ধু ও অনুচররা এসেছিলেন—তাঁদের আলিঙ্গন করতে লাগলেন—প্রত্যেকে প্রত্যেককে। মুরাদের সঙ্গে যে তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর কিছু আসবে, বুদ্ধিমান আওরঙ্গজেবের তা জানা ছিল। এবং সেজন্য তিনি প্রস্তুত হয়েই ছিলেন।

স্মিত সহাস্য বদনে এই মিলনের দৃশ্য দেখে আওরঙ্গজেব ভাই মুরাদকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'চল আমরা ভেতরে যাই—আমার নিজের ঘরে। ভাল আছ তো এখন বেশ? শরীরটা সেরেছে ভাল ক'রে? আল্লাকে যে কি ক'রে জানিয়েছি তা বলবার নয়। নিয়ত প্রার্থনা করেছি—খোদা ওর সব বালাই নিয়ে যেন আমি মরি—ভাই আমার সেরে উঠুক; নইলে সমস্ত হিন্দুস্থান যে অনাথ হয়ে যাবে।'

মুরাদ তখনও ধূলিধূসরিত, ক্লান্ত।

আওরঙ্গজেবের খাস কামরায় পুরু কার্পেটের উপর গা এলিয়ে শুয়ে পড়লেন তিনি। ইঙ্গিতে বান্দারা এসে ওঁর জুতো খুলে নিল পা থেকে। গোসল করার জল এনে ধরল সোনার গামলায়।

মুরাদ হাত মুখ ধুয়ে সূক্ষ্ম মসলীনের গামছায় মুখ মুছে প্রশ্ন করলেন, 'খাওয়ার দেরি কত, আমার পেটে যে আগুন জ্বলছে!'

'কিছু দেরি নেই—সব তৈরী। শুধু তোমারই অপেক্ষা করছিলাম ভাই।'

আওরঙ্গজেব হাততালি দিতেই যেন চোখের নিমিষে ওদের সামনে সাদা চাদর বিছানো হয়ে গেল—বড় বড় সোনার থালায় খাদ্য এসে পৌঁছে গেল কখন্—পোলাও, কোর্মা, কাবাব, পরোটা, আপেল, আঙুর, খেজুর। তার সঙ্গে উৎকৃষ্ট বিলাতী মদ।

মুরাদ অভ্যর্থনাতেই খুশি হয়েছিলেন, এখন ভোজ্যের আয়োজনে গলে গেলেন। সলজ্জ ও সহাস্য মুখে মদের বোতলগুলো দেখিয়ে বললেন, 'এগুলো আবার—তোমার সামনে—'

'বিলক্ষণ! আজ যে উৎসবের দিন ভাই। তোমার আরোগ্য-উৎসব বিজয়-

উৎসব! তুমি উৎকৃষ্ট সুরাতে যত খুশি হও, তত যে আর কিছুতে হও না তা যে আমি জানি! তাই তো সুরাট থেকে আনানো এই ফিরিঙ্গী দেশের মদ যত্ন ক'রে রেখে দিয়েছি সঙ্গে, তোমারই জন্যে—খাও, খাও, লজ্জা কি!'

'তা হ'লে তুমিও একটু খাও না ভাই সাহেব!'

'না—জান তো ওতে আমার তৃপ্তি নেই। তোমার সুখেই আমার আসল তৃপ্তি।'

সারাদিনের ক্লান্তির পর ভুরিভোজনে মুরাদ আরও যেন এলিয়ে পড়লেন। উগ্র ফিরিঙ্গী সুরার নেশাও বুঝি কিছু কাজ করেছে। মখমলের তাকিয়ায় আড় হয়ে পড়ে বললেন, 'আর যেন এখন যেতে ইচ্ছে করছে না।'

বিষম ব্যস্ত হয়ে উঠলেন আওরঙ্গজেব, 'বিলক্ষণ! যাবে কেন! তুমি এখানেই বিশ্রাম করো। আমি পাশের ঘরেই শুতে পারব'খন। তাছাড়া এখনও আমার ঢের কাজ বাকী—আজ রাত্রে শোওয়া হবে কিনা সন্দেহ। তুমি বেশ আরাম ক'রে শোও—'

নিজে হাতে নরম বালিস গুছিয়ে দিলেন আওরঙ্গজেব—আরামের ব্যবস্থাকে আরও ঘনীভূত ক'রে তুললেন। তারপর আর একটু মুচকি হেসে বললেন, 'আরও একটি চমৎকার জিনিস তোমার জন্যে রেখে দিয়েছি ভাই—সব সেরা জিনিস। তুমি শোও, পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি!'

আরও কি জিনিস বাকী আছে? সম্ভোগের আরও কি বিচিত্র উপকরণ? তবে কি মেয়েমানুষ? নর্তকী? ফকির অগ্রজ এ কি ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন? অথচ তাছাড়া আর কীই বা হতে পারে!

মুরাদের দৃষ্টি কল্পনাতেই আমেজী হয়ে উঠল। তিনি কোষ থেকে তরবারী খুলে পাশে রাখলেন; তারপর বর্ম, শিরস্ত্রাণ সব খুলে নামিয়ে রেখে কোমরবন্ধ আলগা ক'রে সবে আরাম বিছানার উপর এলিয়ে দিয়েছেন শরীর, এমন সময়ে লঘুপদে নূপুরের মধুর আওয়াজ তুলে ঘরে ঢুকল সরস্বতী বাঈ।

'কে?' চমকে উঠে প্রশ্ন করেন মুরাদ।

'আমি আপনার বাঁদী—সরস্বতী বাঈ।'

'বাঃ—বড় মিষ্টি তুমি সরস্বতী বাঈ। এসো, কাছে এসো তো—দেখি।'

সরস্বতী বাঈয়ের সুডৌল চিবুকটি একটা আঙুলে ক'রে তুলে ধরে সুরারক্ত বিস্ফারিত দৃষ্টিতে খানিক চেয়ে রইলেন মুরাদ, 'বাঃ—সত্যিই অপূর্ব তুমি। যেন কবির কল্পনা। না, দাদার পছন্দর তারিফ করতে হয়। এতকাল কোথায় ছিলে সরস্বতী বাঈ?'

'আপনার জন্যই তপস্যা ক'রছিলাম জাঁহাপনা।' গলা কি কেঁপে যায় সরস্বতী বাঈ-এর ?'

'যাক্—সিদ্ধি মিলেছে তাহ'লে ? কি বলো ! যেমন মিষ্টি তোমার গলার আওয়াজ, তেমনি মিষ্টি তোমার কথাগুলি সরস্বতী বাঈ। আমার জন্যে তপস্যা করছিলে ! বড় ভাল কথা বলেছ ! হা হা !'

মুরাদ শুয়ে শুয়েই ইঙ্গিত করেন মদের পাত্রের দিকে।

সরস্বতী বাঈ সোনার পাত্র ভরে দেয় রক্তবর্ণ সুরায়।

'আঃ !' সমস্ত পাত্র এক নিঃশ্বাসে নিঃশেষ ক'রে পাত্র ফিরিয়ে দেন। নেশায়, ক্লান্তিতে, আরামে মুরাদের চোখ বুজেই আসে। তবু তিনি ডাকেন, 'কই সরস্বতী বাঈ—নাজ্‌নী—কাছে এসো !'

'আমি, আমি আপনার পায়ের কাছেই আছি জাঁহাপনা। আমি বাঁদী, আরও কাছে যাবার যোগ্য নই।'

'না না, তুমি আমার বুকের কাছে এসো সরস্বতী—তোমাকে অনুভব করি।'

গলা কিন্তু জড়িয়ে অস্পষ্ট হয়ে আসে।

সরস্বতী বাঈ আর উত্তর দিলে না। মুরাদের পা থেকে চামড়ার পট্টিটা খুলে নিয়ে একটু ইতস্ততঃ করলে, তারপর হেঁট হয়ে শাহাজাদা মুরাদের দুটি সুগঠিত অথচ কঠিন পায়ের পাতায় অতি সন্তর্পণে দুটি চুমো খেলে।

সেই সময় বোধহয় দু ফোঁটা চোখের জলও পড়ে থাকবে সে পায়ে, মুরাদ তন্দ্রার মধ্যেও কি একটা বলতে চাইলেন—কথাগুলো স্পষ্ট হ'ল না—শুধু একটা আওয়াজ বেরোল মাত্র। ততক্ষণে সরস্বতী নিজের দুর্দমনীয় লোভ সামলে নিয়েছে—সম্বরণ করেছে দয়িতের দেহ আলিঙ্গনের উদগ্র কামনা। শান্ত অনুত্তেজিত ভাবে বসে বসে সে তার উষ্ণ, লঘু ও কোমল হাতে পরিচর্যা শুরু করেছে—শাহাজাদার পা দুটির।

সে সেবা ও পরিচর্যা তন্দ্রার মধ্যেও হয়ত একপ্রকারের অনুভূতি জাগিয়েছিল মুরাদের চৈতন্যে। কারণ তাঁর মুখে ধীরে ধীরে ফুটে উঠল অপরিসীম একটি তৃপ্তির হাসি।...

আরও কিছুক্ষণ। গভীর নিদ্রায় তাঁর নিঃশ্বাস ভারী ও নিয়মিত হয়ে আসে।

হয়ত বা স্বপ্নই দেখতে শুরু করেন। কী স্বপ্ন দেখছিলেন তাই বা কে জানে। সে কি তথ্‌ত্‌-এ-তাউসের—না সরস্বতী বাঈয়ের ? কোমল, ভঙ্গুর, লতার মত সরস্বতী বাঈ।

এধারে সরস্বতী বাঈ-এর চোখের জল বুঝি আর বাধা মানে না—হাত থাকে না স্থির। সে একবার অসহায় ব্যাকুলভাবে চায় চারিদিকে, পর্দার আড়ালে অদৃশ্য আছে যে নিষ্ঠুর দেবতা—তার কাছে বুঝি এক মৌন আবেদন জানায়। কিন্তু বৃথা বৃথা। সামান্য একটু শব্দ হয় বাইরে—অসি ঝনৎকারের অসহিষ্ণু শব্দ। দ্রুত কাজ সেরে নাও বালিকা, হৃদয়াবেগের সময় আওরঙ্গজেবের নেই।

সরস্বতী বাঈ ইঙ্গিত বুঝে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ায়। আরও আশ্চর্য রকম নিঃশব্দ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তুলে নেয় মুরাদের বর্ম, তরবারি, শিরস্ত্রাণ—তারপর তেমনিই লঘু গতিতে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে; শুধু পড়ে থাকে তার পায়ের দুটি নূপুর, যা কিছুক্ষণ আগে সে সুকৌশলে খুলে ফেলেছিল।

তার পরের ইতিহাস আপনারা সবাই জানেন। আওরঙ্গজেবের বিশ্বস্ত আজ্ঞা-বহ অনুচর শেখ মীর ও তার সৈন্যরা এসে একেবারে যখন ঘিরে দাঁড়িয়েছে, তখনও মুরাদ ঘুমুচ্ছেন। তাঁর অনুচরদের তো আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, মুরাদ ঘুমিয়ে পড়েছেন, আজ রাত্রে তিনি এখানেই থাকবেন! যারা বেশী প্রভুভক্ত এবং চতুর, তাদের মুখে সন্দেহ ফুটে ওঠবার আগেই শেখ মীর তাদের নিঃশব্দে সঙ্গে আসার ইঙ্গিত ক'রে দেখিয়ে দিয়েছে যে মুরাদ তপ্ত কোমল শয্যায় সত্যিই নিদ্রিত। পাশে সুরা ও রমণী। অর্থাৎ মুরাদ আজ রাত্রে আর নড়বেন না। সুতরাং বন্ধু ও অনুচর, যারা বিপদের ক্ষণে রক্ষা করতে পারত তারা বহুক্ষণ ফিরে গেছে নিজেদের শিবিরে। শত্রুর পদশব্দ শোনাবার জন্য কোন মিত্রই আর কাছে নেই।

একেবারে রূঢ় কর্কশ হাত গায়ে লাগতে ঘুম ভেঙেছিল বৈকি! চেঁচামেচিও কিছু ক'রেছিলেন শাহজাদা মুরাদ। কিছু গালাগালি, কিছু অভিযোগ, কিছু কোরাণ ও আল্লার দোহাই। তারপর আওরঙ্গজেব যখন সামনে বেরিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে, এ মুরাদের স্ব-খাত সলিল, তিনি বাদশাহীটা বড় তাড়াতাড়ি করতে গিয়েই এই বিপদ টেনে আনলেন—তখন আশ্চর্যরকম ভাবে শান্ত হয়ে গেলেন মুরাদ। একটি কথাও বললেন না, বরং তাঁর মুখেও তৈমুর-রক্ত-সুলভ আশ্চর্য প্রশান্তি নেমে এল। ভাগ্যকে যেন তিনি সহজেই মেনে নিলেন। উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা তাঁদের জন্য—সম্রাট-বংশীয়দের জন্য নয়, ওটা সাধারণ মানুষের হৃদয়বৃত্তি। তাই বোধ করি লজ্জিত হয়েই সামলে নিলেন নিজেকে। তাছাড়া মুরাদ বীর—মৃত্যুর ভয় সত্যিই তাঁর ছিল না।

কেবল ক্ষীণ একটু হাসি হেসেছিলেন যখন আওরঙ্গজেব সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা

করলেন যে নিতান্ত প্রয়োজনে পড়েই এ কাজ করতে হ'ল তাঁকে। মুরাদের কল্যাণের জন্যই—অসুস্থ মস্তিষ্ককে সুস্থ ও শান্ত করবার জন্যই। মুরাদ যেন অন্য কিছু না ভাবেন।

আর হেসেছিলেন যখন তাঁর পায়ে সোনার বেড়ী পরানো হয়েছিল। ভাই এবং সম্রাটপুত্রের জন্য আওরঙ্গজেবের বিবেচনার অভাব নেই তা হ'লে! মানীর মান রাখতে তিনি জানেন!

শেখ মীর সযত্নে সোনার বেড়ী ওঁর পায়ের কাছে রেখে অভিবাদন করতে উনি হেসে বলেছিলেন, 'শেকলটা লোহার হ'লেই ভাল বুঝতে পারি ভাইসাহেব। সোনার হ'লে কেমন ভয় করে।'

তার পরের ইতিহাসও সর্বজনবিদিত। নিশীথ রাত্রে অন্ধকারের মধ্যে একই রকমের ঘেরা হাওদা বসানো চারটি হাতী অপেক্ষা করছিল। চারটি হাতী চার দিকে যাবে—ঠিক কোনটিতে মুরাদ থাকবেন তা জানবেন সম্রাট নিজে, শেখ মীর ও তার কয়েকজন অনুচর। পরের দিন লোক-পরম্পরায় শুনেও না পিছু নেয় মুরাদের সৈন্যদল—সেইজন্যই এত সতর্কতা।

মুরাদ বেরোলেন সেই শয়নঘর থেকে। মৃত্যু-বাসর-ঘরও বলা যায় তাকে!··· শিবিরের মধ্যেও অন্ধকার সরু পথ, অন্ধকারের মধ্যেই গিয়ে হাতীতে উঠতে হবে।

কিন্তু সেই সঙ্কীর্ণ তমিস্রঘন পথে একরাশ নরম ফুলের মত ও কী এসে পড়ল তাঁর পায়ের ওপর? কোথা থেকে এল? কে, কে ও?

অন্ধকারেই প্রহরীদের অসি উদ্যত হয়েছিল বিদ্যুৎবেগে—আবার অন্ধকারেই কী যেন এক ইঙ্গিত পেয়ে শান্ত হ'ল। মুরাদ কিন্তু ঠিকই অনুভব করেছিলেন, তাঁর মুখ নিমেষে উজ্জ্বল হয়ে উঠল—যদিও সে আব্‌ছায়ায় কেউই তা লক্ষ্য করলে না।

'কে, সরস্বতী বাঈ?'

'আমাকে পিষে মাড়িয়ে দিয়ে যান শাহান্‌শাহ্‌। আপনার ঐ পা—যার সেবা করার স্বপ্ন দেখেছি এই গত এক বছরের প্রতি দিন-রাত্রি—যে পায়ের আঘাত পাবার সৌভাগ্যও আমার কল্পনাতীত, ঐ পা আমার গলায় তুলে দিন জাঁহাপনা —এ আমি কী করলুম, কী করলুম—! এ যে আমি কিছুতে সইতে পারছি না।'

মধুর হাসি দেখা না গেলেও কণ্ঠস্বরে অনুমান করা গেল। মুরাদ হেসে বললেন, 'কে বললে তুমি এ কাজ করেছ সরস্বতী বাঈ। এ আমারই দুর্বুদ্ধি,

আমার নির্বুদ্ধিতা—সবচেয়ে বড় কথা—আমার নসীব। কাফেররা যাকে বলে নিয়তি। তুমি কতটুকু, তুমি কীই বা করতে পারো!'

উত্তর এল না। কিন্তু মুরাদ অনুভব করলেন শক্ত ক'রে সে জড়িয়ে আছে তাঁর পা—তার চোখের জলে তাঁর দুই পা ধুয়ে গেল বুঝি! সে আকুল রোদনের আবেগ মুহূর্তকালের জন্য তাঁর নিজের সর্বনাশের পরিমাণকেও অকিঞ্চিৎকর ক'রে দিল।

মুরাদ অন্ধকারেই ডাকলেন, 'হিন্দুস্থানের নিষ্কণ্টক সিংহাসনের ভাবী শাহান্-শাহ্—ভাইসাহেব কাছে আছ কি?'

ব্যস্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'কেন ভাই, কিছু বলবে?'

'আমার একটি শেষ প্রার্থনা শুনবে? ছোট্ট একটি অনুরোধ?'

'নিশ্চয়ই শুনব। কী চাও ভাই বলো—কোন্ আরাম তোমার চাই?'

'এই বাঁদীকে আমায় দাও। শেষ ক-টা দিন যা দুনিয়ায় আছি, একটু শেষ আরাম ক'রে নিই!'

'সে কি কথা! বিলক্ষণ। শেষের কথা তুলছ কেন?…তা যাক্, ও তোমার সঙ্গেই যাক্। শেখ মীর, সরস্বতী বাঈ শাহ্জাদার হাওদাতেই যাবেন সেই ব্যবস্থা ক'রে দাও।'

অন্ধকারে দেখা গেল না—কী ক্রূর অথচ প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠল আওরঙ্গ-জেবের মুখে।

১০৬৭ বঙ্গাব্দের এক দুর্দান্ত এক শীতের রাত্রে গোয়ালিয়র শহরের একটি সরাই-খানায় পরস্পরের অপরিচিত চার-পাঁচটি মুসাফির জড়ো হয়েছিলো। সরাইখানা আরও চার-পাঁচটা আছে—তার ওপর আকিল খাঁর এই সরাইখানাটি শহরের এক প্রান্তে ব'লে এখানে লোক কমই আসে। হঠাৎ আজ সন্ধ্যায় এতগুলি অতিথিকে দেখে তাই আকিল খাঁ খুবই খুশি হয়ে উঠেছে। নিজে বাবুর্চিখানায় গিয়ে শিক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কাঠকয়লার মৃদু আঁচে কাবাব করতে লেগে গিয়েছে। বাবুর্চি সামশের আলী আটা সানছে—কাবাব হয়ে এলে তন্দুরায় রুটি চাপাবে। শীতের দিনে ঠাণ্ডা খাবার খাওয়ানো ঠিক নয়।

হাড়ভাঙা শীত বাইরে। সোঁ সোঁ ক'রে পাহাড়ে-বাতাস বইছে। সরাইখানার বড় ঘরখানার একমাত্র দরজা বন্ধ থাকলেও সে শীতের কামড় ভেতরে যথেষ্ট। আগন্তুকরা যে যার চারপাই সরিয়ে ঘরের মাঝামাঝি এনেছেন, কারণ সেখানে

একটু আগুন আছে। আগুন সামান্যই—একটা মাটির গামলার অধিকাংশ মাটি ও ছায়ে বুজোনো—তারই মধ্যে খানকতক মোটা মোটা ঘসি বা শুকনো গোবরের ডেলায় ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে আগুন জলছে। তাতে আগুনের চেয়ে ধোঁয়া বেশী। তবু আজকের এই ঠাণ্ডায় সেটুকু আগুনের দামও কম নয়।

একজন যাত্রী—দেখলে যুদ্ধব্যবসায়ী বলেই মনে হয়—তাঁর চিলম্ নিয়ে ঐ আগুন থেকেই তামাক ধরাবার কাজে লেগে গিয়েছেন—হঠাৎ একসময় তিনি মুখ না তুলেই বললেন, 'আজকের এ ঠাণ্ডা যেন বরফের কবর। সারা শহরটার ওপর বরফের রেজাই বিছিয়ে দিয়েছে কে!'

ওপাশে একটি বৃদ্ধ মুসলমান বসে মালা জপ করছিলেন। তিনি এবার মুখ খুললেন, 'বাইরের ঠাণ্ডা যেখানে যতো বেশী, মনেতে সেখানে বিশ্বাসের আগুন ততো বেশী জেলে রাখা দরকার ভাই! ইয়াদ রেখো।'

ওপাশ থেকে একটি লোক, রেশমের কারবার করেন ব'লে পরিচয় দিয়েছেন এসে, তিনি ব'লে উঠলেন—'যারা দরাজ-দিল তাদের অন্তরে উত্তাপের অভাব নেই ভাইসাহেব।'

তিনজনেই তিনজনের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তাকালেন। বাকী যাত্রী তিনজন ততক্ষণে নিজেদের মধ্যে গল্প শুরু ক'রে দিয়েছেন।

হঠাৎ রেশমের কারবারী লোকটি নিজের হাতটা মালা-জপ-রত বৃদ্ধের মুখের সামনে তুলে ধরে বললেন, 'দেখুন তো আমার এই আংটিটা। আফ্রিদিস্তান থেকে কিনেছি সাচ্চা মোতি ব'লে দিয়েছে।'

বৃদ্ধ সাবধানে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আংটিটা দেখলেন। তারপর ওর চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, 'সাচ্চা মোতি ব'লেই মনে হচ্ছে। আফ্রিদিস্তানের লোকেরা ঝুটা চিজের কারবার করে না।'

হাতটা ছেড়ে দেবার সময় বৃদ্ধ যেন কাগজের মত কী একটা গুঁজে দিলেন আংটির ভেতর। আংটির মালিক তাতে বিন্দুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করলেন না। খানিক বাদে তিনিও নেমে এলেন আগুনটার কাছে চিলম্ ধরাবার জন্য। সেখানে আগুনের পাশে একটি মাটির পিলসুজের ওপর একটা চিরাগও জলছিল। সেই চিরাগের আলোতে চকিতে একবার বালির কাগজের সেই টুকরোটিতে চোখ বুলিয়ে নিলেন—তারপর তেমনি গুটিয়ে ওধারে যে ফৌজী ব্যক্তিটি তামাক খাচ্ছিলেন চোখ বুজে, তাঁর জুতোর খাঁজে গুঁজে দিলেন, চোখের নিমেষে।

সিপাহীসাহেব চোখ বুজে তামাক টানছিলেন—তেমনই টানতে লাগলেন। এমন কি ব্যাপারটা টের পেলেন ব'লেও মনে হ'ল না। কিন্তু একটু পরেই

মছ্‌ছুয় বা মশা মারবার ছলে পা চুলকোতে চুলকোতে একসময় কাগজের টুকরোটি টেনেই নিলেন !

এর পর আরও কিছুক্ষণ চললো এটা ওটা খুচরো আলাপ।

হঠাৎ একসময় সেই সিপাহীটি প্রশ্ন ক'রে বসলেন, 'বারোকে বারো দিয়ে গুণ করলে কত হয় মৌলানা সাহেব ?'

যে বৃদ্ধ বসে মালা জপ করছিলেন তিনি মালাটি কপালে ঠেকিয়ে বললেন, 'টাকার হিসেব তো কখনও রাখিনি ভাইসাহেব—ইনি বলতে পারেন।'

রেশমওয়ালা টাকরায় জিভ লাগিয়ে টক ক'রে একটা শব্দ ক'রে বললেন, 'একশো চুয়াল্লিশ হয় ভাইসাহেব—একশো চুয়াল্লিশ। কিন্তু মৌলানা সাহেব, টাকার ওপর এত বীতরাগ কেন বলুন তো ! আঁধিয়ারী রাতে যখন সামনে জিন্দি-গীর দীর্ঘ পথ থাকে প্রসারিত, একা যেতে হয় সেই পথ ধ'রে—তখন সঙ্গে টাকাও কিছু দরকার বৈকি !'

মৌলানা একটু হেসে বললেন, 'যতো আঁধার নামে জীবনে ততোই ভালো। খোদাতালাকে ডাকার কথা মনে পড়বে তাতে। আর টাকা ? তাঁর করুণা হ'লে কি তুচ্ছ টাকার জন্যে আটকায় ভাই ?'

এর পর আর যেন কেমন আলাপ জমে না। সকলেই নিজের নিজের চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে পড়ে, মনের গহন গভীরে ডুব দেয়।…

খানিক পরে দরজা ঠেলে লণ্ঠন হাতে আকিল খাঁ ঢুকলো। সঙ্গে বাবুর্চি। রুটি কাবাব তৈরী। মেঝেতে ফরসা ফরাস বিছিয়ে দিল আকিল খাঁ। তার ওপর ছখানা সানকীতে কিছু কিছু কাবাব। গরম রুটি রইলো একটা গামলাতে—মাঝামাঝি।

'আসুন ভাইসাহেবরা, দেরি ক'রে কাজ নেই।'

এঁরা খেতে বসতে গিয়ে বললেন, 'কিন্তু ছখানা সানকি কেন আকিল খাঁ ?'

'ছজন না আপনারা ?'

'না, এই তো পাঁচজন।'

'ছজনই তো ছিলো।'

সকলের চোখেই ভ্রূকুটি। সঙ্গে সঙ্গে সকলের মনে সন্দেহের ছায়া ঘনিয়ে আসে। ছজন ছিলো ঠিকই। এখন কিন্তু পাঁচজন আছে—এটাও ঠিক। কে একজন সরে পড়েছে। শেষের দিকে সকলেই কম্বল জড়িয়ে বসে থাকতে থাকতে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলো, সেই ফাঁকে কখন নিঃশব্দে একজন সরে

পড়েছে।

আকিল খাঁর মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠলো।

'দেখুন ভাইসাহেবরা, আপন আপন গাঁটরি ঠিক আছে তো?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে আকিল খাঁ প্রশ্ন করে, 'যা চোর আর লুটেরার আমদানি হয়েছে আজকাল!'

সকলেই নিজের নিজের মালপত্র দেখে নিয়ে বললেন, 'না, সে সব ঠিক আছে।'

পাঁচজন এসে খেতে বসলেন।

খাওয়া শেষ হ'লে সামশের বাসন নিয়ে বেরিয়ে গেলো। আকিল খাঁ এসে হাত পাতলে—পয়সা বুঝে নিতে হবে নগদ নগদ। খাবারের দাম আর চার-পাইয়ের ভাড়া।

সিপাহী কিন্তু চার-পাইয়ের ভাড়া দিলেন না। বললেন, 'না ভাই আকিল খাঁ, আমি এখনই সরে পড়বো—'

'সে কি, আপনি যে বললেন রাতটা থাক্‌বেন।'

'বলেছিলুম কিন্তু মতলব ঘুরে গেছে।'

'কিন্তু এই আঁধিয়ারী রাত—পথ-ঘাটও ভালো নয়—' আকিল খাঁ মনে করিয়ে দিলেন।

'ঠিক আছে ভাই। আমি ফৌজী লোক, ওসব বিপদ বিপদই নয় আমার কাছে। যতক্ষণ হাতে হাতিয়ার আছে—ভয় কিসের?'

মালপত্র গুটিয়ে কাঁধে ফেলে বন্দুকটা চেপে ধরে সিপাহীজী বাইরের সেই অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আস্তাবলে বোধ করি ঘোড়া ছিলো—বাইরের পাথর-বাঁধানো পথে শব্দে উঠলো টকাটক্ টকাটক্।

আকিল খাঁ সেই শব্দ পেয়ে যেন চমকে উঠলো—'ঐ যা—ঘোড়ার খোরাকী তো আদায় করা হ'ল না।...আপনারা কেউ চেনেন নাকি একে?' রেশম-ব্যবসায়ী তখন আপাদমস্তক রেজাই মুড়ি দিয়েছে। মৌলানা সাহেব বসে মালা জপছেন। তিনিও কথা কইলেন না। বাকী দুজন মুসাফির ঘাড় নেড়ে জানালো যে তারা চেনে না।

আকিল খাঁ যদি জানত যে ঘোড়াটা কী দরের তাহ'লে আরও হায় হায় করত। কারণ আরবী ঘোড়ারা যেমন দু-একদিন না খেয়েও দৌড়াতে পারে, তেমনি অবসর আর আহার পেলে সাধারণ ঘোড়ার দ্বিগুণ খোরাক একাই উদরস্থ করে।

সিপাহীজীর ঘোড়া শহরের ভেতর সাধারণ চালেই চলেছিল। কারণ নিশীথ রাত্রে নির্জন রাজপথে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ বহুদূর পর্যন্ত যায়। দ্রুত গেলে কারুর না কারুর সন্দেহ উদ্রিক্ত হবে। অকারণ সন্দেহ জাগিয়ে লাভ নেই।

শহরের উত্তর দরওয়াজায় এসেও খানিক দেরি হয়ে গেল। ফটক বন্ধ, নিদ্রিত চৌকিদারকে জাগিয়ে তোলাই এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। তারপর যদি বা তিনি উঠলেন—লোহার শিকদেওয়া তাঁর দরজার ভেতর থেকে আঁধারে-লণ্ঠনের আলো ওর মুখের ওপর ফেলে বেশ নিশ্চিন্ত স্বরে বললেন, 'কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে সিপাহ্সালার। কোতোয়ালের হুকুম, কোন কারণেই আজ রাতে আর দোর খোলা যাবে না।'

সিপাহ্সালার বলে যাঁকে অভিহিত করা হ'ল তিনি ভ্রূকুটি করলেন। বিব্রত হয়ে নয়—বিরক্ত হয়ে। অকারণ বিলম্বের জন্য ভ্রূকুটি।

তিনি তাঁর থলের ভেতর হাত ঢুকিয়ে একটা কি টেনে বার করলেন, বললেন 'আমি যাঁর নোকর তাঁর কাজ কোতোয়ালের মর্জির অপেক্ষা রাখে না ভাই সাহেব!'

এই বলে তিনি একটি ছোট্ট লাল পাথর-বসানো একটা আংটি ওর চোখের সামনে মেলে ধরলেন।

ডান হাতে লণ্ঠন ধরাই ছিল, দ্বাররক্ষী তাড়াতাড়ি বাঁ হাতখানা সসম্ভ্রমে কপালে ঠেকিয়ে বললে, 'কী করব সিপাহ্সালার—এই রকমই হুকুম। স্বয়ং বাদশার ফর্মান থাকলেও আজ দোর খোলা নিষেধ।'

সিপাহ্সালার কিন্তু দমে গেলেন না। কণ্ঠে বিদ্রূপের সুর টেনে এনে বললেন, 'কিন্তু পাঁচ দণ্ড আগে সেই বাদশার ফর্মানেই তো খুলতে হয়েছিল নসরৎ আলি!'

নসরৎ আলি চমকে উঠল। সামনে যেমন ভূত দেখলে চমকে ওঠে—তেমনি। কারণ আঁধারে সে সিপাহ্সালারকে দেখতে পেলেও তাকে দেখবার কোন উপায় ছিল না। লোকটা যে তার নাম জানে শুধু তাই নয়—পাঁচ দণ্ড আগের ঘটনা এমন জোর ক'রে বলেই বা কী ক'রে?

অনেকক্ষণ পরে নসরৎ আলি ভূতাবিষ্টের মতই জবাব দেয়—'কে? মীর সফি খাঁ?'

'তোমার বান্দা, ভাইসাহেব!'

নসরৎ আলি খানিক নিস্তব্ধ থেকে বললে, 'কিন্তু হুকুম খুব কড়া!'

মীর সফি খাঁ উত্তর দিলেন, তোমার মত দরাজদিল লোক বন্ধুর উপকারে এটুকু ঝুঁকি নিতে ডরাবে না—তা আমি জানি।'

মীর সফি খাঁ লোহার শিকের মধ্যে দিয়ে হাতখানা গলিয়ে নসরৎ আলির বাঁ হাতটা চেপে ধরলেন। কী একটা শব্দও হ'ল, খুব মৃদু, তবু এ কথা অনায়াসে অনুমান করা চলে যে একাধিক মুদ্রা হাত-বদল করল।

নসরৎ আলি যেন একটা দীর্ঘশ্বাস দমন ক'রে বললে, 'চলো ভাইসাহেব—নসীবে যা আছে তা হবে।'

নিজের গুমটি ঘরের তিনটে বড় বড় তালা খুলে বেরোল নসরৎ আলি। তারপর কোমর থেকে, ঝোলানো প্রকাণ্ড বড় বড় চাবির গোছা টেনে বার ক'রে অনেক মেহনতের পর কাটা দোরটা খুলে দিলে।

'চলবে ?' প্রশ্ন করলে।

'চলবে বোধ হয়।'

মীর সফি খাঁ কী যেন ইঙ্গিত করেন ঘোড়াকে। ঘোড়া খেলোয়াড়-ঘোড়ার মতই আশ্চর্য কৌশলে সেই সঙ্কীর্ণ পথে গেলে বেরিয়ে যায়।

ওপারে কতকগুলি মুসাফির ভোরে ফটক খোলবার অপেক্ষায় কাটা দোরের বাইরে ঘোড়া উট মাল নিয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসেছিল—দুর্দান্ত শীতে কুণ্ডলী পাকিয়ে। অকস্মাৎ তাদের কয়েকজনকে মাড়িয়ে ডিঙ্গিয়ে ঘোড়াটা বেরিয়ে যেতেই একটা মহা হৈ চৈ গণ্ডগোল উঠল। কিন্তু জবাবদিহি করবার অবসর তখন মীর সফি খাঁর নেই। তিনিও কাটা দোরের ওপর থেকেই মারলেন এক লাফ। তিন-চারটে ঘুমন্ত উট ডিঙ্গিয়ে গিয়ে লাফ দিয়েই উঠলেন একেবারে ঘোড়ার পিঠে। শিক্ষিত আরবী ঘোড়া ইঙ্গিতমাত্র বিদ্যুৎবেগে ছুটে বেরিয়ে নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল। শুধু রাজপথে অশ্বক্ষুরের শব্দ দূর থেকে দূরান্তরে প্রতিধ্বনিত হ'তে হ'তে অনেকক্ষণ পরে একেবারেই শূন্যে মিলিয়ে গেল।···

নসরৎ আলিও বাইরের চেঁচামেচি সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে তাড়াতাড়ি কাটা কপাটটা জোরে লাগিয়ে দিলে এবং আবার যথারীতি তিনটে তালা বন্ধ ক'রে অস্ফুট স্বরে কী একটা বকতে বকতে নিজের কোটরে এসে ঢুকল। গুমটির কপাট বন্ধ ক'রে বাঁহাতের মুঠিটা খুলে এই প্রথম ভালো ক'রে দেখবার অবসর মিলল তার। হাত খুলে বস্তুটা আলোয় মেলে ধরতে অবশ্য মুখটা প্রসন্নই হ'ল।

হাতের টাকা দুটি রূপোর নয়—সোনারই।

বিদ্যুৎবেগে কারুরই চলা সম্ভব নয়—তবু ঐ শব্দটা বলতে আমরা যা বুঝি, মীর সফি খাঁর ঘোড়া সেই ভাবেই ছুটতে লাগল। এভাবে চললে সহজেই রাত্রি প্রভাতের আগে ঢোলপুর পৌঁছবার কথা। কিন্তু তা যাওয়া চলবে না। এ পথ

নিরাপদ নয়। সফি খাঁর ললাটে আবার ভ্রূকুটি ঘনিয়ে এল। শেখ মীর বসে আছে এই পথেরই ধারে। তার লোকজনের হাতে পড়লে চলবে না কোনমতেই। কিন্তু তার জন্য সফি খাঁ প্রস্তুত আছেন। এ অঞ্চলের পথঘাট তাঁর জানা আছে ভাল রকমই। তিনি অকস্মাৎ রাজপথ থেকে নেমে এক মাঠের পথ ধরলেন; পায়ে-চলা গ্রাম্য পথ, তবু সুকৌশলে সেই আঁধারের মধ্যেই পথ চিনে চিনে ঘোড়া ছুটিয়ে চললেন। ঢোলপুরে আজ তাঁকে পৌছতেই হবে—রাত্রি শেষ হওয়ার আগে। যাকে লক্ষ্য ক'রে তাঁর এই অভিযান, ঢোলপুরের এধারে তাকে ধরতে না পারলে চলবে না; ওধারে গেলে তার শক্তি বেশী, সফি খাঁ সেখানে দুর্বল। সুতরাং যা করতে হবে তা এর ভেতরেই করতে হবে। এতটা পথ ঘুরে যেতে একটু বেশী ঘুর হ'ল বটে কিন্তু তবু—সফি খাঁ তাঁর ঘর্মাক্ত সওয়ারির পিঠ চাপড়ে আত্মপ্রসাদের হাসি হাসেন—তাঁর ঘোড়া ভোরের ভেতরেই ঢোলপুর পৌছবে এবং খোদা মালিক, পথেই তিনি ধরতে পারবেন।

হ্যাঁ, লোকটা নিঃশব্দে সরে পড়েছিল ঠিকই—কিন্তু তবু সফি খাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার আগেই তার সমস্ত কিছু লক্ষ্য ক'রে নিয়েছিল। তার পরণে সাদা পিরান —কতকটা আফ্রিদিদের মত, তার ওপরে হলদে রঙের খাটো কুর্তা। মাথায় টুপিও নয় ফেজও নয়, কাফেরদের মত মুরাঠা বাঁধা। হাতের আস্তিনের ফাঁক দিয়ে মস্ত বড় একটা কাটা দাগ—তাও সফি খাঁর চোখে পড়েছে।

শেখ মীরের ছাউনি পড়েছিল গোয়ালিয়র ঢোলপুর সড়কের ওপর, ঠিক কোথায় আর কতটা জায়গা জুড়ে তাও সফি খাঁর অজানা ছিল না। সুতরাং ক্রোশ-দুই ঘুরে তিনি আবার এসে শাহী শড়কেই উঠলেন। পথ নির্জন এবং পরিষ্কার। সহজ পথ পেয়ে ঘোড়া ক্লান্ত হ'লেও অধিকতর বেগে দৌড়তে লাগল।

বহুক্ষণ এইভাবে চললেন সফি খাঁ। রাত্রি শেষ হয়ে আসছে, আকাশের দিকে চাইলেই অনায়াসেই তা বোঝা যায়। লোকটা গেল কোথায়? সরাইখানায় তার ঘোড়া ছিল না, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ সফি খাঁ। তাহলে তাঁরা আওয়াজ পেতেন।

তবে?

খানিকটা পায়ে হেঁটে তবে তাকে ঘোড়ায় চড়তে হয়েছে। তবু এখনও তিনি ধরতে পারছেন না? তারও হয়ত আরবী ঘোড়া—কে জানে! কিন্তু—

একটা মস্ত বড় সংশয়ের ছায়া এসে সফি খাঁকে ক্ষণেকের জন্যে অবসন্ন ক'রে দিল! সে শেষ পর্যন্ত সোজা শেখ মীরের তাঁবুতে গিয়েই ওঠে নি তো?

কথাটা মনে করার সঙ্গে সঙ্গেই সফি খাঁ ঘেমে নেয়ে উঠলেন।

কিন্তু না। মানুষের লোভ বড় বেশী বলবান।

সংবাদটা যথাস্থানে পৌঁছে দিতে পারলে খেতাব, জায়গীর—মোটা বখশিশ মিলবে। শেখ মীরের কাছে গেলে সে সংবাদ পৌঁছবে ঠিকই, কিন্তু সংবাদদাতার নাম যে পৌঁছবে না, সেটা কে না জানে!

এত নির্বোধ সে নিশ্চয়ই নয়। বিশেষত যখন এই কাজে নেমেছে। মনকে সান্ত্বনা দিয়ে দ্বিগুণ বেগে ঘোড়া চালালেন।

রাত্রি চতুর্থ প্রহরের কাছাকাছি পৌঁছে নক্ষত্রালোকেই পথের পাশে একটি গ্রাম নজরে পড়ল, আর নজরে পড়ল—একটি সরকারী ডাকখানা। ঘোড়ার ডাক বদল হয় সেখানে।

সফি খাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এ অঞ্চলের সব কিছুই তাঁর নখদর্পণে। স্থানটার নাম রহিমবাদ। এ ডাকখানার রক্ষক পীর আলির নামও তাঁর অজানা নয়। মানুষটার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় না থাকলেও তার হাড়হদ্দ সব তিনি জানেন।

ঘোড়া থেকে নেমে বহুক্ষণ ডাকাডাকি করতে একসময় পীর আলি বেরিয়ে এল, 'হাঁ হুজৌর। কী চাই বলুন।'

মীর সফি খাঁ ঘোড়া থেকে নেমে ঘোড়ার রাশটা পীর আলির হাতে দিয়ে বললেন, 'এখনই একে দানাপানি একটু খাইয়ে দাও আলি সাহেব—দু'দণ্ডের ভেতরই আমাকে রওনা হ'তে হবে!'

'এত রাতে—' পীর আলি তার বেকুবের মত চোখ দুটি তুলে তাকাল। তবু সে যে বেকুব নয় তা বুঝতে সফি খাঁর এতটুকুও দেরি হ'ল না।

সফি খাঁ একটা গোটা মোহর বার ক'রে পীর আলির হাতে গুঁজে দিলেন। বললেন, 'এত রাতের কাজে এত রাতের মতই দাম পাবে পীর আলি।'

পীর আলি সসম্ভ্রমে মাথা ঝুঁকিয়ে সেলাম ক'রে বললে, 'হুজুর আমাকে চেনেন দেখছি, কিন্তু আমি হুজুরকে দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না!'

'পড়বার দরকার নেই। আমি সব জানি। এক লোটা জল আমাকেও দিও।'

পীর আলি ঘোড়াকে নিয়ে নিজেই আস্তাবলে চলে গেল। সেখানে একটা মশাল জেলে ঘোড়াকে দানাপানি দিয়ে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়ে একটা তামার বদনায় এক বদনা জল এনে সফি খাঁর সামনে ধরলে।

সফি খাঁ তখন অবসন্ন ভাবে বাইরে রাখা একটা চারপাইয়ের ওপর বসে পড়েছেন। বোধ করি ক্লান্তিতেই—একটু চোখও বুজেছেন।

পীর আলি গলাটা সাফ ক'রে নিয়ে ডাকলেন, 'হুজৌর, পানি আপনার!'

সফি খাঁ চোখ খুলে তাকালেন। বললেন, 'তুমি একটু আগে খেয়ে নাও

পীর আলি।'

'এই ঠাণ্ডায়—এত রাতে—। আপনি বিশ্বাস করুন বড় মিয়া সাহেব, কোন নিমকহারামীতে আমি যাবো না। বিশেষত আমি বাদশার লোক—'

'তা হোক পীর আলি। মুসাফিরির যা দস্তুর!'

পীর আলি অগত্যা চোখ মুখ কুঁচকে সেই তুষারশীতল জল খানিকটা নিজের গালে ঢেলে দিলে। তখন প্রসন্ন মুখে সফি খাঁ বদনা নিয়ে বাকী সব জলটা এক নিঃশ্বাসে পান ক'রে 'আঃ—' ব'লে একটা আরামের নিঃশ্বাস ছাড়লেন।

তারপর গলাটা একটু নামিয়ে ডাকলেন, 'পীর আলি!'

'হুজৌর।'

'একটু আগে যে লোকটি এসেছিল, সে কোন্ পথে গেল বলতে পারো?'

'লোক? একটু আগে?'

চম্‌কে উঠল পীর আলি। বিস্ময়েই চমকে উঠল।

কিন্তু সে যে কোন্ ধরণের বিস্ময়—তা সেই সামান্য মশালের আলোতেই সফি খাঁর দেখতে বাকী রইল না। এক লহমার মধ্যে যে ভয় সারা চোখে মুখে ফুটে উঠেছিল, তাও নজর এড়ায় নি সফি খাঁর।

সফি খাঁ আচকানের ভেতর থেকে আর একটি গেঁজে বার করলেন। ধীরে সুস্থে গেঁজেটি খুলে হাতের তেলোতে ঢাললেন কয়েকটি মুদ্রা। চকিতে দেখে নিলে পীর আলি যে তা টাকা নয়—মোহর। পীর আলির চোখ দুটো শ্বাপদের মতই জ্বলে উঠল।

গুণে গুণে পাঁচটা মোহর বার ক'রে বাকীগুলো আবার গেঁজেতে বেঁধে ফেলে সফি খাঁ তাকালেন পীর আলির মুখের দিকে।

'এই মোহরগুলো দেখছ পীর আলি?'

'জী, হুজৌর!'

'এইগুলো সব তোমাকে দেব যদি ঠিক সাফ্ সাফ্ জবাব দাও।'

'কী জবাব দেব বলুন?'

'কোন লোক এসেছিল কি না এখানে, এই সামান্য কিছু সময় আগে? আমারই মত আরবী ঘোড়ায় চড়ে?'

'তোবা তোবা। খাঁ সাহেব, সে বাদশার লোক, তার খবর দিলে আমার গর্দান যাবে।'

চোখের নিমেষে সফি খাঁর কোমরে তলোয়ার মশালের আলোয় ঝিলিক দিয়ে উঠল। সাঁ ক'রে একটা হাওয়া কাটবার শব্দ হ'তে না হ'তেই ঠাণ্ডা

ইস্পাতের স্পর্শ লাগল পীর আলির গর্দানে। পীর আলির মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠল, পা দুটো কাঁপতে লাগল ঠক্ ঠক্ ক'রে।

'এখন তোমার গর্দান গেলে কে ঠেকায় পীর আলি? বাদশার লোক বহু দূরে।'

'খোদাকসম খাঁ সাহেব। সাফ্ জবাব দেব। ঐটে নামিয়ে নিন।'

সফি খাঁ তলোয়ারটা নামালেন কিন্তু খাপে পুরলেন না।

'এসেছিল কেউ?'

'এসেছিল।'

'কেমন দেখতে, কেমন পোশাক? তাড়াতাড়ি জবাব দাও।'

'আফ্রিদিদের মত পোশাক কিন্তু মাথায় মুরাঠা।'

'আস্তিনের নিচে কাটা দাগ আছে?'

'আছে—টাটকা কাটা দাগ, এখনও লাল হয়ে আছে সে দাগ।'

'ঠিক আছে। কতক্ষণ গেছে সে?'

'পাঁচ-ছ' দণ্ড হবে।'

'কোন্ দিকে গেছে—?'

ঢোলপুরের দিকের পথটা দেখিয়ে পীর আলি বললে, 'ঐ দিকে।'

আবারও বিদ্যুৎ-ঝলকে ঝলসে উঠল তলোয়ার, আবার সেই সাঁ ক'রে শব্দ।

'জানের মায়া থাকে তো ঝুট্ বলো না পীর আলি। আমি খোদার নাম করবারও অবসর দেবো না।'

'ইয়া খোদা। এ কি কাণ্ড!' কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল পীর আলি।

'সত্যি কথা বলো এখনও—নইলে—'

কাঁপতে কাঁপতে পীর আলি আস্তাবলের দিকটা দেখিয়ে দিলে। নিচু গলায় বললে, 'পথে ঘোড়া পড়ে গিয়ে জখম হয়েছে। সে সময় নিজের পায়েও চোট লেগেছে। কোন মতে হেঁটে এসে আমার আস্তানায় উঠেছে, কিন্তু তার আর চলবার ক্ষমতা নেই। আস্তাবলে ঘাসের গাদায় লুকিয়ে শুয়ে আছে। ঘোড়াও আমার আস্তাবলে—'

বলা তখনও শেষ হয় নি। সফি খাঁ বাঁশের খুঁটির গায়ে লাগানো মশালটা টেনে নিয়ে এক লাফে আস্তাবলের আগড় ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন।

কিন্তু যার জন্য তাঁর এই অভিযান সেও ততক্ষণে বেরিয়ে এসেছে ঘাসের গাদার ভেতর থেকে। ক্লান্ত আহত দেহে রাজ্যের তন্দ্রা নেমে এসেছিল ঠিকই, কিন্তু তবু সফি খাঁর ঘোড়াকে আস্তাবলে রাখতে আসার সময়ই তার ঘুম

ভেঙে যায়। তখন থেকে খোলা তলোয়ারে হাত দিয়ে কান খাড়া করেই শুয়ে আছে সে।

তবু, তবু সে ভাবতে পারে নি যে পীর আলি এতটা বেইমানী করবে তার সঙ্গে। সে-ও এসে নগদ এক মোহর গুঁজে দিয়েছে ওর হাতে। তার ওপর আহত সে, আশ্রিত। এবং সর্বোপরি বাদশার লোক। তার সঙ্গে বেইমানি করতে সাহস করল পীর আলি!

সেইজন্যই যথাসময়ে প্রস্তুত হতে পারে নি বেচারী।

তবু খোঁড়া পা টেনে ঘাসের ভেতর থেকে তলোয়ার হাতেই বেরিয়ে এসেছিল—কিন্তু সফি খাঁ তাকে ভাল ক'রে দাঁড়াবারও অবসর দিলেন না—অবসর দিলে তাঁর চলবে না।

মুহূর্তের জন্য কি কোন বিবেক, কোন ন্যায়-অন্যায় বিচার আচ্ছন্ন করেছিল তাঁর উগ্র কর্মচেতনাকে, তাঁর এই অকারণ জিঘাংসা প্রবৃত্তিকে?

কে জানে!

কিন্তু করলেও—সে মুহূর্তকালই।

তারপরই ভেসে উঠেছিল মনের পর্দায় একটি মুখ। সে মুখ শাহ্‌জাদা মুরাদের নয়। সে মুখ—পুষ্পবৃন্তের মত একটি নারীদেহের ওপর ফুটে ওঠা ফুলের মতই একখানি পূর্ণ-বিকশিত মুখ!

না, আর তিনি ইতস্তত করেন নি—

এক লাফে সামনে দাঁড়ানো একটা ঘোড়ার পিঠে উঠে বসিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর তলোয়ার ওর অনাবৃত কাঁধে। ধারালো কাটারীতে কাটা কলাগাছের মতই লুটিয়ে পড়ল সে মাটিতে।

সফি খাঁ আর দাঁড়ালেন না। তাঁর ঘোড়ার ততক্ষণে কিছু বিশ্রাম হয়ে গেছে, নিমেষমধ্যে তার মুখে লাগাম পরিয়ে বাইরে নিয়ে এলেন এবং ছোট জেবের মধ্যে রাখা মোহর পাঁচটা মাটিতে ছড়িয়ে দিয়ে পলকের মধ্যে ঘোড়ায় চেপে দূর মাঠের পথে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।...

পীর আলি চেঁচামেচি করল না, লোক ডাকল না, এমন কি তার সদ্য-ঘুম-ভাঙা ভয়ে আড়ষ্ট বিবিকেও না। খানিকটা পাথরের মত দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে মোহরগুলো মাটি থেকে কুড়িয়ে নিলে—তারপর আস্তাবলে ঢুকে একটা ভাল ঘোড়া বেছে নিয়ে বাইরে এল। আস্তাবলের আগড়ে তালা লাগিয়ে চাবির গোছাটা অনড়, স্তম্ভিত বিবির হাতের মুঠোর মধ্যে একরকম গুঁজে দিয়েই ঘোড়ায় চাপল।

ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্তত তাকে শেখ মীর সাহেবের তাঁবুতে পৌঁছতে হবে—নইলে আর রক্ষা নেই!

৩

আওরঙ্গজেব শান্ত ভাবেই বসে শুনতে লাগলেন আসাদ খাঁর কথা। আসাদ খাঁ বয়সে তরুণ হ'লেও বুদ্ধিতে প্রবীণ এটা নূতন সম্রাট ভালো করেই জানেন। তাই তিনি তাঁর সমস্ত অমাত্যদের মধ্যে এক মীরজুমলার পরেই সবচেয়ে বিশ্বাস করেন এই আসাদ খাঁকে, যদিচ আসাদ খাঁ কোন অমাত্যই নয়।

আসাদ খাঁ বলছিলেন মুরাদের কথা। বলছিলেন যে বাদশাকে জ্ঞান দিতে যাওয়া তাঁর পক্ষে ধৃষ্টতা। তবু বহুপ্রচলিত কথাটাই তিনি স্মরণ করিয়ে দিতে চান—শত্রুর শেষ রাখতে নেই। আজও মহামান্য বাদশার সিংহাসন নিরাপদ নয়। দারার অপমান ও মৃত্যু আজও বহু লোকের বুকে শেলের মত বিঁধে আছে। সুজা আজও ধরা পড়েন নি—যে কোন মুহূর্তে তিনি আবার নতুন ক'রে বল সঞ্চয় করতে পারেন সুতরাং এ অবস্থায় মুরাদের মত শত্রুকে হাতের এত কাছে জীইয়ে রাখা উচিত নয়।

সম্রাট ছাড়া আরও এক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি হলেন আমিন খাঁ, মীরজুমলার ছেলে। আমিন খাঁকে সম্রাট স্নেহ করেন, বিশ্বাসও করেন—কেবল ভরসা করতে পারেন না। কারণ অত্যন্ত উদ্ধত ও হঠরাগী আমিন খাঁ। রাজনীতিতে স্বভাবের ওই দুটি দুর্বলতাই অচল। সময়বিশেষে ঔদ্ধত্যের মুখোশ পরতে হয় বটে—কিন্তু তার বেশী কিছু নয়। আমিন খাঁ সম্বন্ধে আওরঙ্গজেব এখনও কিছু ঠিক করতে পারেন নি। কাছে কাছে রেখেছেন, লক্ষ্যও ক'রে যাচ্ছেন কিন্তু তাঁকে কোনো দায়িত্বপূর্ণ কাজ দেওয়া চলবে কি না সে বিষয়ে সংশয় তাঁর দিন-দিনই বেড়ে চলেছে।

আমিন খাঁ আসাদ খাঁকে দেখতে পারেন না। সেটা খুবই স্বাভাবিক। কারণ যদিচ আসাদ খাঁ আজও উজীরী পান নি, মীরজুমলার জন্যই এখনও তা অপেক্ষা করছে, আসাদ খাঁ সামান্য একজন বক্সী মাত্র—তবু কার্যত যে আসাদ খাঁই উজীর-ই-আজম হয়ে উঠছেন তা আমিন খাঁর চোখ এড়ায় নি।

তিনি অকস্মাৎ আসাদ খাঁর প্রতিবাদ ক'রে বললেন, 'শাহজাদা মুরাদকে নিয়ে যদি কোন বিপদ হ'তো তা হ'লে সেলিমগড়ে যতদিন তিনি ছিলেন তার ভেতরই হ'তো। দুর্ভেদ্য গোয়ালিয়র দুর্গ থেকে মুরাদ পালাতে পারবেন?'

আসাদ খাঁ হাসলেন। বিনীতভাবে আমিন খাঁকে সেলাম ক'রে বললেন,

'খাঁ সাহেব, ঝড় ওঠবার আগে বহুক্ষণ ধরে মেঘ জমে। সে সময়টা দিতে হয় বৈকি।'

আমিন খাঁ আরও উদ্ধত ভাবে কী একটা জবাব দিতে যাচ্ছিলেন। বাদশা তাঁর ডান হাতের তর্জনীটি সামান্য একটুখানি তুলে ইঙ্গিতে নিরস্ত করলেন তাঁকে। তাঁর শান্ত দৃষ্টি একবারও কিন্তু আসাদ খাঁর মুখের উপর থেকে সরে নি।

আসাদ খাঁও বুঝলেন তাঁর মনের কথা।

তিনি ব'লে চললেন, 'শাহজাদা মুরাদ বরাবরই খুব মুক্তহস্ত, সেজন্য সৈনিকদের খুব প্রিয়—তা বোধ হয় আপনি জানেন।' তারপর একটু থেমে বললেন, 'বিশেষ ক'রে যারা যুদ্ধব্যবসায়ী, আজ এখানে কাল ওখানে—ফৌজি-খাতায় নাম লিখিয়ে বেড়ায়—যারা রাজা বাদশা বোঝে না, বোঝে শুধু টাকা, তারা তো ওঁকে দেবদূতের মতো শ্রদ্ধা করে। তারা—মাপ করবেন জাঁহাপনা—তারা আপনাকে প্রকাশ্যেই কৃপণ ব'লে অপবাদ দেয়।'

এ সাহস একমাত্র আসাদ খাঁরই আছে। তিনি জানেন যে, আওরঙ্গজেব সত্য কথা শোনবার নৈতিক সাহস রাখেন—এবং সেইজন্য কোন কথাই তাঁর অজানা থাকে না। এখনও খুব মৃদু একটা কৌতুকের হাসি তাঁর ওষ্ঠপ্রান্তে চকিতের মধ্যে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেলো। তিনি চোখের চাহনিতে অভয় দিলেন আসাদ খাঁকে।

আসাদ খাঁ বললেন, 'এমনি বহু যুদ্ধব্যবসায়ী, যারা মুরাদকে জানতো অথবা নাম শুনেছে, তারা অনেকেই ওখানে জড়ো হয়েছে। তারা এখনও—বিশ্বস্ত কর্মচারীদের মধ্যস্থতায় প্রচুর অর্থ পাচ্ছে বন্দী শাহ্‌জাদার কাছ থেকে। জনা-বালির বদান্যতায় শাহ্‌জাদা মুরাদের বন্দীদশাতেও অর্থের অভাব নেই।—'

আওরঙ্গজেব এই প্রথম মুখ খুললেন, বললেন, 'শাহ্‌জাদা মুরাদ সম্রাটপুত্র এবং আমার ভাই। তা ছাড়া—তিনি এককালে আমার অংশীদার ছিলেন।··· আর তাঁর নিজের অর্থও যথেষ্ট আছে।'

আসাদ খাঁ আবার বলতে লাগলেন, 'টাকার লোভ ছাড়াও, অনেকে তাঁকে ভালও বাসে। তাঁর সাহস, তাঁর উদারতা, তাঁর ভদ্র ব্যবহার—অনেককেই আজও মুগ্ধ ক'রে রেখেছে। সামান্য সাধারণ সৈনিক, এমন কি তাঁর চাকর-বাকরদের সঙ্গেও তিনি বন্ধুর মতো মিশে থাকেন—সেজন্যেও লোকে তাঁকে একটু বেশী ভালবাসে।···সুদূর আফ্রিদিস্তান থেকে শুরু ক'রে কাবুল, কান্দাহার, মুলতান, পাঞ্জাব এমন কি বেলুচিস্তান থেকেও লোকে এসে অকারণে বসে আছে গোয়ালিয়রে। কার পয়সায় তারা খাচ্ছে এবং জলের মত অর্থব্যয় ক'রে ফুর্তি

করছে তা ভেবে দেখবার মতো। শাহান্‌শাহ্‌, কোনো মতে যদি মুরাদ গোয়ালিয়র দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন তো তাঁর সৈন্যের অভাব হবে না। সেই মুহূর্তে মাটি ফুঁড়ে তাঁর বাহিনী দেখা দেবে।'

আমিন খাঁ আর থাকতে পারলেন না, বললেন, 'কিন্তু যদিটাই মস্ত বড়ো কথা খাঁ সাহেব।'

আসাদ খাঁ আবারও মিষ্ট হাসি হাসলেন, বললেন, 'যে দেওয়াল লোহার গোলায় ভাঙা যায় না সে দেওয়াল সোনার গুলিতে অনায়াসে ভেঙে পড়ে। দরাজ-দিল মুরাদের পক্ষে গোয়ালিয়র দুর্গের কপাট খোলা এমন কিছু কঠিন কাজ নয় আমিন খাঁ। কিন্তু সে যাই হোক্—শাহান্‌শাহ্‌ জানেন আমাদের চেয়ে বেশী। আমি যা খবর জানি তাই শুধু নিবেদন করলাম।'

আওরঙ্গজেব মধুর হাসি হাসলেন, বললেন, 'আসাদ খাঁ, আপনার খবর ভুল নয়। আপনি যা শুনেছেন তা সবই ঠিক। আমিও এ খবর পেয়েছি। আমার অনেক ওম্‌রাহ্‌ও এর ভেতর আছেন—আমি তাঁদের নাম জানি। শুধু তাই নয়—চক্রান্ত অনেক দূর গড়িয়েছে। আগামী মাসের ১২ তারিখে রাত বারোটার সময় মুরাদকে ওখান থেকে উদ্ধার করবার ব্যবস্থা হয়েছে। এই সংবাদ সংগ্রহ ক'রে আমার যে গুপ্তচর আসছিলো সিপাহ্‌সালার মীর সফি খাঁ সন্দেহক্রমে তার পিছু পিছু এসে ঢোলপুরের কাছে এক ডাকখানায় তাকে হত্যা করেছে।'

আসাদ খাঁ মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনছিলেন এ ইতিহাস। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বললেন, 'তারপর? তাহ'লে এ খবর পেলেন কি করে?'

আওরঙ্গজেব প্রসন্ন হাসি হেসে বললেন, 'এতবড় কাজের ভার কোন একজনকে দেবো তা মনে করাই আপনার ভুল। যে মারা গেলো তকি খাঁ—তার ভুল হয়েছিল অতি উৎসাহে তখনই যাত্রা করা। তাইতেই মীর সফি খাঁর সন্দেহ হয়। সেই সময় সেই জায়গায় আমার আরও গুপ্তচর ছিলো কিন্তু সে ঐ ভুলটি করে নি। তাই খবর আমি যথাসময়েই পেয়েছি।'

'মীর সফি খাঁকে কী শাস্তি দিলেন শাহান্‌শাহ্‌?' অসহিষ্ণু আমিন খাঁ প্রশ্ন করলেন।

'কিছুই না।' একটু হেসে বললেন আওরঙ্গজেব।

'কিছুই না? এত বড় নেমকহারামী—'

'নেমকহারামী ঠিক বলা যায় না আমিন খাঁ। সফি খাঁ মুরাদেরই সিপাহ্‌সালার ছিল। তবে তার এতটা উৎসাহ ঠিক মুরাদের জন্য নয়, আমি তাও জানি। কিন্তু সফি খাঁ তুচ্ছ। আমার নজরেই সে আছে, ওর বাইরে যাবার ক্ষমতা তার

নেই। তার কথা থাক।'

আওরঙ্গজেব আবার হাসলেন।

আসাদ খাঁ হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, 'এই মীর সফি খাঁকেই কি গোয়ালিয়র দুর্গে মুরাদের অবস্থা জানবার জন্য পাঠানো হয়েছিল?'

'হ্যাঁ।' উত্তর দিলেন আওরঙ্গজেব।

আমিন খাঁ কী একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন আসাদ খাঁর চোখের দিকে চেয়ে। সে চোখে প্রশংসার জ্যোতি।

'আপনি তাকে ইচ্ছে করেই পাঠিয়েছিলেন শাহানশাহ্?'

'তা তো বটেই। নইলে মুরাদের লোককে আমি সেখানে যাবার অনুমতি দেব কেন?'

আভূমিনত হয়ে সেলাম করলেন আসাদ খাঁ।

'তা হ'লে মুরাদের তো এখনই একটা কিছু করতে হয়।' অসহিষ্ণু আমিন খাঁ ব'লে উঠলেন।

'অকারণে ভাই মুরাদকে হত্যা করার আমার ইচ্ছে নেই। এঁরা তাঁকে উদ্ধার করতে চান—কিন্তু তিনি যে আসতে চান তার কোন প্রমাণই তো আমরা পাই নি।...তাছাড়া, আসাদ খাঁ যা বললেন, দারার মৃত্যু জনসাধারণ এখনও ভোলে নি। জীহন আলির লাঞ্ছনার স্মৃতি আশা করি আপনারাও ভোলেন নি। সুজার পরিণাম সম্বন্ধেও নানা করুণ সংবাদ শোনা যাচ্ছে। এখনই মুরাদকে—না না, সেটা ঠিক হবে না।'

আসাদ খাঁও কিন্তু একটু যেন বিচলিত বোধ করলেন। বললেন, 'কিন্তু জনাবালি, আপনি কি কিছুই করবেন না?'

'কিচ্ছু না। আমি সব জানি। আমার আয়োজনও প্রস্তুত। মুরাদ পালালেও গোয়ালিয়র শহরের সীমানা পেরোতে পারবে না। শেখ মীরকে আমি অকারণে গোয়ালিয়রের তিনক্রোশ দূরে বসিয়ে রাখি নি। না—সেজন্য চিন্তা নেই।...তা ছাড়া—মুরাদ পালাতে পারবেন না আসাদ খাঁ।'

আবারও বিস্মিত হ'লেন আসাদ খাঁ। বললেন, 'কেন জাহাঁপনা?'

'তাঁর পায়ে নিয়তির শেকল পরিয়ে দিয়েছি। আমি পরিয়েছি বলাও হয়তো ভুল। তিনি স্বেচ্ছায়, সাধ ক'রে পরেছেন।...আমি সোনার শেকলের ব্যবস্থা করেছিলুম, তাতে ভাই আমার বিদ্রূপের হাসি হেসেছিলেন! তিনি যখন স্বেচ্ছায় সুন্দর ঐ শেকলটি পায়ে পরলেন তখন হাসবার পালা পড়েছিলো আমার, আসাদ খাঁ। না—আমার ভাই মুরাদকে আমি ভালো করেই চিনি। পালাতে তিনি

পারবেন না।'

এই পর্যন্ত বলে আওরঙ্গজেব তাঁর অর্ধসমাপ্ত চিঠিখানা আবার ধরলেন। সম্রাট কলমদানের দিকে হাত বাড়াতেই ইঙ্গিত বুঝে আসাদ খাঁ ও আমিন খাঁ কুর্ণিশ করতে করতে বেরিয়ে গেলেন।

কলম কাগজের ওপর ধরেও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইলেন আওরঙ্গজেব। তারপর অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বললেন, 'মুরাদ বাইরে বেরিয়ে এলে আমি খুশিই হবো। বিবেকের কাছে মুরাদকে সরাবার একটা কৈফিয়ৎ দিতে পারবো!'

শাহ্‌জাদা মুরাদ গোয়ালিয়র দুর্গে খুব যে দুঃখে ছিলেন এমন বলা চলে না। আসলে কোন অবস্থাতেই দুঃখ পাবার মতো মানসিক গঠন তাঁর নয়। তিনি বীর সাহসী কিন্তু সেই পরিমাণেই বিলাসী ও আরামপ্রিয়। ভাল পান-ভোজনের ব্যবস্থা, কোমল শয্যা এবং রূপসী নারীর সেবা পেলে তিনি সব দুঃখই ভুলে যেতে পারতেন। আর আওরঙ্গজেবের ব্যবস্থায় এবং নিজের আর্থিক স্বচ্ছলতায়—কোনটারই অভাব হয়নি। অভাব হতে পারত যেটার—রমণী, সে ব্যবস্থা তিনি নিজেই ক'রে এসেছিলেন।

যে রাত্রিটি তাঁর জীবনে চরম সর্বনাশ ও দুর্ভাগ্যের রাত্রি, যে রাত্রিতে তাঁর একান্ত নির্বুদ্ধিতার ফলে কতকটা স্বেচ্ছায় তিনি দিল্লীর তখত্‌—তখ্‌ত-এ তাউস বিলিয়ে দিয়ে সর্বনাশা পরিণতিকে বরণ ক'রে নিয়েছিলেন—কয়েক মুহূর্তের ভুলে—সেই রাত্রিটি তাঁর জীবনে অবিস্মরণীয় বৈকি! নানা দিক দিয়েই—সে রাতটির কথা ভোলা সম্ভব নয়।

সেই অন্ধ তামসী নিশীথে যখন শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় তাঁকে হাতীতে চড়িয়ে সেলিমগড় পাঠানো হয়েছিলো তখন সবচেয়ে কোন্ অনুভূতিটা তাঁর প্রবল ছিলো—তা আজ বলা কঠিন। ক্ষোভ? দুঃখ? অপমান? লজ্জা? নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য ধিক্কার?—না অনির্বচনীয় একটা তৃপ্তি?

কথাটা শুনলে চমকে উঠবেন হয়ত মুরাদ নিজেও। তবু মিথ্যা যে নয় তা তিনিও স্বীকার করতে বাধ্য। সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে নাম-না-জানা দুর্ভাগ্যের পথে যখন তিনি এগিয়ে চলেছেন—তখন সারা পথ শুভ্র কোমল লঘু চামেলীর মালার মতো যে মেয়েটি তাঁর পায়ের উপর কেঁদেছিলো তার সেদিনের সেই চোখের জল কি কোন পুলকানুভূতি জাগায় নি মুরাদের মনে? কোন সান্ত্বনা কি এনে দেয়নি সেই দিক্-দিশাহীন দুর্ভাগ্যের মধ্যে? তার সেই পুষ্পিত যৌবনের উষ্ণ কোমল স্পর্শ কি বিশেষজ্ঞ মুরাদের চিত্তে একটুখানি আশা ও আকাঙ্ক্ষার

আলো জ্বালায় নি ?

আজ মুরাদের পক্ষেও এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া শক্ত।

সরস্বতী বাঈ তাঁর জীবনের চরম অভিশাপ ও পরম আশীর্বাদ। তাই আওরঙ্গজেবের ছলনা বুঝতে না পেরে যেদিন তিনি স্বেচ্ছায় তাঁর শিবিরে এসেছিলেন সেদিন এই মেয়েটিই তাঁকে অত্যাশ্চর্য সেবায় ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিলো, তারপর নিঃশব্দে করেছিল অপহরণ তাঁর বর্ম ও অস্ত্র। নইলে হাতিয়ার হাতে থাকতে মুরাদকে বাঁধবে এমন বীর শেখ মীর নয়। দশজন-বিশজনের কাজ তো নয়ই—একশজনও পারতো কি না সন্দেহ।

অথচ এই সর্বনাশ নাকি সে করেছিলো ওঁকে ভালবেসেই। এই চরম বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার চেয়ে নিয়েছিল সে আওরঙ্গজেবের কাছ থেকে—স্বেচ্ছায় কারাবরণ। মুরাদকে সে ভালোবেসেছিল। হতভাগিনী তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার আর কোন পথ না দেখে এই পথই বেছে নিয়েছিলো।

অদ্ভুত, দুর্জ্ঞেয় মেয়ে। বিচিত্র ওর মনের গতি। মুরাদ আজও ওর অর্থ খুঁজে পান না।

অবশ্য তাঁর আচরণও কম দুর্জ্ঞেয় নয়। সেদিন যখন অনুতাপে জর্জরিত হয়ে মেয়েটি তাঁর শৃঙ্খলিত পায়ে লুটিয়ে পড়ে কেঁদেছিলো, মুরাদই চেয়ে নিয়েছিলেন ওকে—বাদশা, হ্যাঁ, বাদশা আওরঙ্গজেবের কাছ থেকে।

সেদিন কি কান্নাই কেঁদেছিলো মেয়েটি। ঐ ক্ষুদ্র তনু-দেহটিতে এত জল ছিলো ? এত জল ছিল ওর ঐ আয়ত চোখের ভাসা চাহনিতে ? মুরাদ যখন নিজের দুর্ভাগ্যের আকস্মিকতায় বিহ্বল হয়ে বসে আছেন পর্দা ঘেরা হাওদার ভিতরে—ভিতরে বাইরে সূচীভেদ্য অন্ধকার তাঁর সারা জীবনকে আচ্ছন্ন ক'রে দিয়েছে—তখন সামনে ঐ মেয়েটি তাঁর পায়ের ওপর মুখ গুঁজে কেঁদেছিলো। সারা পথে সে কান্না তার থামে নি।

অনেক—অনেকক্ষণ পরে মুরাদ ওর মুখখানা তুলে ধরেছিলেন, একরকম জোর ক'রেই টেনে এনেছিলেন কাছে। বলেছিলেন, 'বাঈ, তুমি আমাকে সত্যিই ভালোবাসো ?'

অতিকষ্টে কান্নার ফাঁকে ফাঁকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উত্তর দিয়েছিলো সরস্বতী বাঈ, 'কেমন ক'রে সে কথা আর মুখে উচ্চারণ করবো আলিজা! এমন কাজ করার পরও—?'

'তা হ'লে আর কেঁদো না সরস্বতী বাঈ। তোমার ঐ সুন্দর চোখ দুটি নষ্ট হয়ে যাবে—কি নিয়ে আমি কারাগারে দিন কাটাবো ?'

তারপর একটুখানি কমেছিল কান্নার বেগ। নিজের সুগভীর দুঃখের মধ্যেও মুরাদ তার মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছিলেন।

কিন্তু সেদিন সরস্বতী বাঈকে চেয়ে এনে ভুল করেন নি মুরাদ। এত গুণ ঐ মেয়েটির তা কে জানতো! নৃত্যে গীতে হাস্যে লাস্যে—বন্ধুর অভাব ভুলিয়ে রেখে-ছিলো ঐ একটি মেয়ে। আর এমন নিটোল সেবা—এমন সেবা করা যে সম্ভব তা কে জানতো?

তাই বলছিলাম, গোয়ালিয়র দুর্গে মুরাদের দিন খুব খারাপ কাটছিলো না। ভালো খাদ্য, ভালো সুরা, কোমল শয্যা ও সরস্বতী বাঈ—বন্ধুরও অভাব হয় নি। স্বয়ং দুর্গাধ্যক্ষ সুবাদার খাঁ তাঁর সঙ্গে বন্ধুর মতোই ব্যবহার করেন। নিজের বাবুর্চিখানা থেকে ভালো ভালো খাবার পাঠান, নিজে প্রায়ই নিমন্ত্রণ খেতে আসেন। নৈশ আহারের পর প্রচুর মদ্যপান ক'রে দুজনে যখন পাশা খেলতে বসেন তখন একবারও মনে হয় না মুরাদ বন্দী ও সুবাদার খাঁ তাঁর রক্ষক। তাছাড়া অন্যান্য প্রহরীরাও মুরাদের দোস্ত। তাঁর সহৃদয় ও উদার ব্যবহারে, মুক্তহস্ততায়—সকলেই মুগ্ধ। তারা তাঁকে শুধু সম্মান করে না, ভালোও বাসে। শুধু এই বন্দীদশা—এছাড়া মুরাদের কোন দুঃখ ছিল না।

শুধু একটা ব্যাপারে মুরাদের বিস্ময় যেন কাটে না কিছুতেই।

প্রায়ই তিনি প্রশ্ন করেন সরস্বতী বাঈকে, 'আচ্ছা বাঈ, এক নজরে মানুষকে এমন ভালবাসা কি সম্ভব? একবার মাত্র দেখে এমন দিওয়ানা হয়ে ভালবাসতে পারে কেউ সত্যি-সত্যিই?'

সরস্বতী বাঈ একটু যেন অসহিষ্ণু হয়েই উত্তর দেয়, 'মানুষ কি এমনি একজন মানুষকে দেখেই ভালবাসতে পারে? আপনাকে কি ক'রে বোঝাবো যে আমাদের এ সম্বন্ধ জন্ম-জন্মান্তরের? আমি জন্মে-জন্মেই আপনার দাসী। কী একটা পাপে দূরে ছিটকে পড়েছিলাম, তাই এজন্মে স্ত্রী-রূপে আপনার সেবার অধিকার পাই নি। কিন্তু পূর্বজন্মের সে সংস্কার যাবে কোথায়? নইলে একবার মাত্র আপনাকে দেখে এ কথা আমার মনে হবে কেন—যে, এঁর এই পা দুটি সেবা করার অধিকার যদি না পাই তো আমার জীবনই বৃথা। এ দেহ ধারণ মিথ্যে হয়ে গেল!'

বলতে বলতেই হেঁট হয়ে সগর্বে ও সপ্রেমে দুটি পায়ে চুমো খায় সরস্বতী বাঈ।

মুরাদের সুরারক্ত চোখের দৃষ্টি থেকে স্নেহ ঝরে পড়ে। তিনি স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলেন, 'বাঈ, আর একবার বলো তো তোমার সেই গল্পটা, কেমন ক'রে এলে আমার কাছে? তোমার ঐ গল্প শুনতে শুনতে আমারও এক-একসময় সন্দেহ হয় যে

হয়ত তোমার ঐ জন্মান্তরের কিস্‌সার মধ্যে কোন-একটা কিছু আছে, নইলে আমি কে, আমার মত একটা অপদার্থ লোককে পাবার জন্য তোমার এ তপস্যা কেন?'

একটু থেমে আবার বলেন, 'বলো না বাঈ গল্পটা—'

লজ্জায় মুখটি নুয়ে আসে সরস্বতী বাঈয়ের, রজনীগন্ধার পুষ্পভার-নত স্তবকের মতই। বলে, 'কী হবে এক কথা বার বার শুনে আলিজা?......ও কথা থাক্।'

জেদ করেন মুরাদ।

অগত্যা বলতে হয়।

শোনবার মতই সে কাহিনী, পুরুষের অহমিকা চরিতার্থ হবার মতই।

সেদিন ঝরোকার মধ্য থেকে দেখার পর বহুক্ষণ কোন জ্ঞান ছিল না সরস্বতী বাঈ-এর। সারা দিন কেটেছিল একটা জাগ্রত তন্দ্রার মধ্য দিয়ে। আহারের কথা মনে ছিল না, রুচি তো ছিলই না। কে যেন জোর করে বসিয়েছিল রাত্রে থালার সামনে, কিন্তু রুটি বিষ লেগেছিল মুখে। এক গ্রাসও খেতে পারে নি। সারারাত ওর ঘুম হয় নি। ঐ কিশোরীর আঁখিপল্লবে সেদিন অপরূপ রূপের যে অঞ্জন লেগেছিল, তা ওর সমস্ত ঘুম কেড়ে নিয়েছিল বহুকালের জন্য। তাছাড়া ভয় হ'ত ওর, বুঝি ঘুমোলেই সেই অপরূপ রূপের ছবি মুছে যাবে দৃষ্টির সামনে থেকে। তাই যেন ঘুমোতে ইচ্ছাও করত না।......

দিনে দিনে শুকিয়ে উঠেছিল সরস্বতী বাঈ। ওর মা শেষ অবধি ভয় পেয়ে হাকিম ডেকেছিলেন। কিন্তু যে বিষে ওর দেহ জর্জর, সে বিষের ওষুধ হাকিম কোথায় পাবে!

অবশেষে অনেক দিন বাদে ওষুধ নিজেই খুঁজে পেয়েছিল সরস্বতী। ওরই সমবয়সী একটি মেয়ের মুখ থেকে শুনেছিল যে নগরের শেষপ্রান্তে যমুনার ধারে ফতিমা বিবি থাকে—সেই নির্বাচন করে বাদশার হারেমে যাবার মত মেয়েদের। ক্রীতদাসী হ'লে সে খরিদ ক'রে চড়াদামে বেচে। তা ছাড়াও নাচওয়ালী সংগ্রহ করে সে, সুন্দর মেয়ে দেখে গান-বাজনা শিখিয়ে তৈরী ক'রে পাঠায়—বাদশা, শাহজাদা এবং ওমরাহ্‌দের ঘরে ঘরে; মোটা বখ্‌শিশ মেলে তার। এই কারবারে ফতিমা বিবি নাকি লাখ লাখ টাকা রোজগার করেছে।

তার ঠিকানা সংগ্রহ করে সরস্বতী বাঈ। উদ্বেগে উত্তেজনায় দু'রাত তার ঘুম হয় না। শেষে এক নিশীথরাত্রে মন স্থির ক'রেই ফেলে। যা হবার তা হবে—এমন নিঃশব্দে অসহায় ভাবে জ্বলে মরার চেয়ে সোজাসুজি সে ঝাঁপ দেবে না-

হয় আগুনের মাঝে। অকূলসমুদ্রেই ভাসাবে সে তার জীবন-তরণী, ভাগ্য-দেবতাকে স্মরণ ক'রে।

সেই অন্ধকার রাত্রেই সে বেরিয়ে আসে বাড়ি থেকে, সঙ্গে নেয় পুঁটুলি বেঁধে —তার স্নেহময়ী মার নানা উপলক্ষে উপহার দেওয়া—অজস্র অলঙ্কার।

সেদিন সে বালিকার মাথায় এ কথা ঢোকে নি যে রূপসী সালঙ্কারা কিশোরীর জন্য পথের ধারে ধারে অপেক্ষা ক'রে থাকে বহু বিপদ। বহু দানব বদন ব্যাদান ক'রে বসে থাকে তারই মত আহার্যের লোভে।

অত রাত্রে কে তাকে পথ বলে দেবে?

তাই সে অনেক ভেবে চৌমোহানিতে পৌঁছে গাড়ির আড্ডা থেকে বেছে বেছে এক বৃদ্ধ একাওয়ালার কাছেই আত্মসমর্পণ করেছিল, 'পৌঁছে দেবে আমাকে দরিয়াগঞ্জে ফতিমাবিবির বাড়ি?'

'নিশ্চয়ই। এই তো আমাদের কাজ বেটী।' পক্ক-কেশ পক্ক-শ্মশ্রু বৃদ্ধ আশ্বাস ও অভয় দিয়েছিল ওকে। নিশ্চিন্ত হয়ে উঠেছিল সরস্বতী তার একায়।

সে বহুক্ষণ পর্যন্ত কোন সন্দেহ করে নি—এমন কি যখন শহরের পাথরবাঁধানো রাস্তা ছেড়ে মেঠো গ্রাম্য পথে পড়েছিল—তখনও নয়। কিন্তু একেবারে নির্জন নিরালা পথে পড়তে ওর গা ছমছমিয়ে উঠেছিল। প্রশ্ন করেছিল, 'বড় মিয়া, ঠিক যাচ্ছো তো?'

'বহুত ঠিক!' পান-খাওয়া দাঁত বার ক'রে সে উত্তর দিয়েছিল।

আরও একটু পরে আশঙ্কাই সত্য হয়ে উঠল।

অকস্মাৎ একা থামিয়ে বৃদ্ধ একটা হাত বাড়িয়ে ওর ডান হাতখানা বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরে বলেছিল, 'দেখি বিবি তোমার ঐ পুঁটুলিটা—পাড়া ভাল নয়। দামী জিনিসগুলো আমার জিম্মায় দিয়ে দাও!'

প্রথমটা এঁকেবেঁকে উদ্ধার পাবার চেষ্টা করে সরস্বতী—তারপর চিৎকার ক'রে ওঠে ভয়ে, যতটা শক্তি আছে ওর কণ্ঠে সব দিয়ে—

বৃদ্ধ তাতে হেসেছিল, বলেছিল, 'এক ক্রোশের ভেতর আর কোন মানুষ নেই বিবি, মিছিমিছিই চেঁচাচ্ছ! সুযোগ মানুষের জীবনে বেশি আসে না, খোদা সেই সুযোগ মিলিয়ে দিয়েছেন। তোমার গয়নাগুলোও নেব, তারপর খোজা মনসুরের কাছে বেচলেও চড়া দাম মিলবে। ভয় নেই বিবি, খুব নিমকহারামী করব না। খোজা মনসুর পাকা জহুরী, সে শেষ পর্যন্ত ফতিমা বিবির কাছেই পৌঁছে দেবে। তোমার কাজ ঠিকই হয়ে যাবে, মাঝখান থেকে যদি আমি কিছু পাই তো মন্দ কি?'

সরস্বতী বাঈ তার কথার চেয়েও—তার সাংঘাতিক বিষাক্ত কণ্ঠস্বরে যেন আরও ভয় পেয়েছিল। আর একবার ছাড়াবার চেষ্টা করলে সে। কিন্তু ঐ বৃদ্ধের দেহে কি আশ্চর্য শক্তি! আবারও চিৎকার ক'রে উঠল। ওর সেই বৃথা চেষ্টা দেখে বৃদ্ধও এবার হাসল। বেশ মধুর তৃপ্তির হাসি—

কিন্তু একটু ভুল করেছিল সে।

ঈশ্বর যখন কাউকে বাঁচান, তখন মরুভূমিতেও অমৃতের উৎস খুঁজে পাওয়া যায়। গহন অরণ্যে মাটি ফুঁড়ে ওঠে ত্রাণকর্তা।

সেই নির্জন বনের মধ্যে থেকে যেন মাটি ফুঁড়েই বেরিয়ে এসেছিল এক অশ্বারোহী সশস্ত্র যুবা। সিপাহীর মত পোশাক তার। এক লাফে এসে লাথি মেরে ফেলে দিয়েছিল এক্কাওয়ালাকে। নিতান্ত আর্তত্রাণেরই ব্যাপার—কিন্তু এক্কার ম্লান আলোতে সরস্বতী বাঈয়ের অবগুণ্ঠনাবৃত লাবণ্যের আভাস পেয়ে তার উৎসাহ আরও বেড়েই গিয়েছিল। সে ওর কাছ থেকে ওর গন্তব্যস্থলের নাম জিজ্ঞাসা ক'রে নিয়ে তলোয়ারের খোঁচায় এক্কাওয়ালাটাকেই বাধ্য ক'রেছিল শেষ অবধি ফতিমা বিবির বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে।

ফতিমা বিবির দরজায় নেমে যুবকটি কঠিন কণ্ঠে এক্কাওয়ালাকে বললে, 'তোমাকে জ্যান্ত কুকুর দিয়ে খাওয়ালে তবেই তোমার পাপের উপযুক্ত শাস্তি হয় —কিন্তু সে উপায় এখন হাতের কাছে নেই। তাছাড়া তুমি বুড়ো হয়েছ, দুদিন পরেই তোমাকে সবচেয়ে বড় বিচারকের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হবে, তোমার রক্তে সিপাহীর তলোয়ার কলঙ্কিত করতে চাই না। জাহান্নমে যাবার ব্যবস্থা তিনিই ক'রে দেবেন। যাও, আর কখনও এমন কাজ করতে চেষ্টা করো না।'

এক্কাওয়ালাকে আর বেশী বলতে হ'ল না—সে ইঙ্গিতমাত্র অদৃশ্য হয়ে গেল।

এইবার সরস্বতী বাঈয়ের দিকে ফিরে ওর রক্ষাকর্তা যেন একটু কম্পিতকণ্ঠেই বললে, 'এই ফতিমা বিবির বাড়ি। ওর বাড়ির দরওয়াজা দিনরাতের জন্যই খোলা থাকে, কঁড়া নাড়লেই সাড়া পাবে।···কিন্তু তুমি ওখানে যাচ্ছ—পরিণাম বুঝেই কি? তুমি নওজোয়ান মেয়ে, খুবসুরৎ—দেখলে তো ভদ্রঘরের বলেই মনে হয়। তুমি কেন ওখানে যাচ্ছ? যে কোন খানদান ঘরের ঘরণী হ'তে পারতে তুমি!'

সরস্বতী বাঈ ঘাড় হেঁট ক'রে উত্তর দিয়েছিল, 'আপনি যা বলছেন তা আমার ওপর মেহেরবাণী ক'রেই বলছেন। আপনার মেহেরবাণী আমি কোনদিনই ভুলতে পারব না। আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। কিন্তু আমাকে—আমাকে তবু ফতিমা বিবির ঘরেই যেতে হবে। আমি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই যাচ্ছি!'

বিরক্ত হয়েছিল যুবক, একটু তিরস্কারের ভঙ্গীতেই বলেছিল, 'বাদশার হারেমে এত লোভ!'

সরস্বতী বাঈ নীরবে নত মস্তকে সে তিরস্কার মেনে নিয়েছিল, প্রতিবাদ করে নি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে যুবক বলেছিল, 'যাও তবে তুমি। আমি সামান্য একজন সিপাহ্‌সালার, আমি হারেমের সুখ ঐশ্বর্য দিতে পারব না—তবে মর্যাদা দিতে পারতুম। আমি তোমাকে আজই রাত্রে বিবাহ করতে রাজী আছি—ছাখো!'

সরস্বতী তবুও নীরব।

তখন ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরেই সে বলেছিল, 'কিন্তু শেষ অবধি বাদশার হারেমে গিয়ে কি পৌছুতে পারবে বিবি, পশুরাজের ভক্ষ্য হওয়া ভাল, কিন্তু তার আগেই শিয়ালের খপ্পরে না পড়ো!'

তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'বেশ—তুমি যাও। কিন্তু এখনো রাত আছে, বিপদ-আপদ এ পথেও কম নেই। তুমি গিয়ে কড়া নাড়ো, ভেতরে ঢুকলে তবে আমি যাবো।'

সরস্বতী বাঈ ফতিমার দোরের দিকে পা বাড়াল। কিন্তু একটু গিয়েই ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলে, 'আমার প্রাণ এবং প্রাণের চেয়ে বড় ইজ্জৎ আপনি রক্ষা করেছেন, আপনার নামটা কি জানতে পারি না? প্রতিদিন পূজোর সময় ঈশ্বরের কাছে দোয়া চাইব আপনার নামে!'

যুবকটির কণ্ঠস্বর আবারও যেন কেঁপে উঠল, বললে, 'তোমার এ বান্দার নাম মীর সফি খাঁ। তোমার নাম বলতে কি কোন বাধা আছে?'

'কিছু না। আমার নাম সরস্বতী বাঈ।'

এর বেশি সরস্বতী বাঈ কোনদিন মুরাদের কাছে বলে নি। বলে নি যে এর পরও মীর সফি খাঁর সঙ্গে তার বহুবার দেখা হয়েছে। এ কথা সে উদ্ধত এবং ক্রোধী মুরাদকে কোনদিন জানায় নি যে সফি খাঁ, মুরাদের বিশ্বস্ত বান্দা সফি খাঁ কিছুদিন ধরে প্রতিদিন ফতিমা বিবির বাড়িতে গিয়ে তার জীবন বিষময় ক'রে তুলেছিল! কোন এক অজ্ঞাত প্রতিপত্তি অথবা সর্বস্বপণ-করা অর্থের প্রতিশ্রুতিতে সে ফতিমা বিবিকে বশ করেছিল। সে পাগল হয়ে উঠেছিল সরস্বতী বাঈ-এর জন্য। এমন কি তার লক্ষ্য শাহ্‌জাদা মুরাদ একথা শুনেও সফি খাঁ নিরস্ত হয় নি। অনুরোধ উপরোধ, মিনতি, ছল—শেষ অবধি বলপ্রয়োগ করারও চেষ্টা করেছে সে। একদিন কোন উপায় না দেখে সরস্বতী বাঈকে দেখাতে হয়েছে নিজের

হাতের আংটি ; সে আংটিতে ওপরে-ঢাকা রূপোর পাতের নিচে আছে পাত্র ভরা জহর, কেউটে সাপের তীব্র বিষ। সরস্বতী বাঈ সেদিন বলতে বাধ্য হয়েছিল, 'যদি সিংহের ভক্ষ্য হ'তে পারি তো হবো, নইলে এ প্রাণ স্বেচ্ছায় বার ক'রে দেব সফি খাঁ। তুমিই একদিন শৃগালের কথা বলেছিলে না? শৃগাল কুকুর—তোমার মত মূষিক—কারুর ভক্ষ্য হবারই সাধ আমার নেই। এই দেখছ পাত্রভরা জহর, তুমি কোনরকমে কোনদিন আমার দেহ স্পর্শ করলে মৃতদেহই পাবে। ছাখো, তাতে শখ আছে?'

অসহ্য ক্রোধে ও অপমানে সফি খাঁর মুখ কালো হয়ে উঠেছিল, সে অনেকক্ষণের চেষ্টায় নিজেকে সামলে নিয়ে আশ্চর্যরকম শান্তকণ্ঠেই বলেছিল, 'এত সহজে এ মূষিকের হাত থেকে অব্যাহতি পাবে না বাঈ, তাও জেনে রাখো। তুমি তো হিন্দু, তোমাদের সিদ্ধির দেবতা গণেশের বাহন এই মূষিক, তা জানো তো? ভালই করেছ ইঁদুরের সঙ্গে তুলনা দিয়ে। সিংহ থাকতে হয়ত মূষিকে মন উঠছে না—কিন্তু সিংহ না থাকলে? সিংহের প্রাণও অনেক সময় মূষিকের দয়ার ওপর নির্ভর করে বিবি!'

এসব কথা মুরাদকে বলা যায় নি। কারণ প্রথমদিন সফি খাঁর নামের উল্লেখ মাত্রেই মুরাদ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন তার প্রশংসায়। বলেছিলেন, 'বড় ভাল ছেলে সফি খাঁ। আর আমাকে খুব ভালবাসে। এই দুর্দিনেও আমাকে সে ছাড়ে নি। সব বাঁদীর বাচ্চা কুত্তীর বাচ্চা গিয়ে আওরঙ্গজেবের পা চাটছে! কিন্তু সফি খাঁ, দেখেছ তো—সে ভোলে নি। এই তো সেদিনও কত কষ্ট ক'রে হুকুম নিয়ে এখানে এসেছিল আমাকে দেখতে। একটা যেন খোশ খবরেরও আভাস দিয়ে গেল!…নাঃ, বড় ভাল লোক সফি খাঁ!'…

থাক্ স্বপ্ন নিয়ে—স্বপ্নবিলাসী মুরাদ। কী হবে ওর স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে?

কিন্তু বড় ভয় করে সরস্বতী বাঈয়ের। বড় ভয় করে ওর।

সেদিন, যেদিন গোয়ালিয়র দুর্গে সফি খাঁ আসে, সেদিন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল সরস্বতী বাঈ—পর্দার আড়াল থেকে। সেই পর্দার আড়ালে যে ও আছে তা যেন কেমন ক'রে জানতে পেরেছিল সফি খাঁ—বার বার মুখ তুলে চাইছিল সে ঐদিকে। কী ক্রূর এবং পৈশাচিক তার দৃষ্টি! সেদিকে চাইলে যেন বুকের রক্ত জল হয়ে আসে।…

সেই শেষ দেখা ফতিমা বিবির বাড়িতে—তারপর একেবারে এই!

ফতিমা বিবির বাড়িতে সেদিন থেকে সফি খাঁ আর আসে নি। অবসরও মেলে নি। ওপরওলার হুকুমে তাকে চলে যেতে হয়েছিল গুজরাত।

ফতিমা বিবিও বেশি কিছু করতে সাহস করে নি। জহরের বিবরণ সে নিশ্চয়ই পেয়েছিল সফি খাঁর কাছ থেকে! তা ছাড়া সরস্বতী বাঈ তার মার বাড়ি থেকে আনা অলঙ্কারের রাশি ফতিমা বিবিকে সঁপে দিয়েছিল শুধু একটি শর্তে যে, শাহ্‌জাদা মুরাদের হারেম ছাড়া কোথাও তাকে পাঠাবে না ফতিমা। সে ইমান তার রাখা উচিত। সুতরাং অন্য কোন চেষ্টা করে নি ফতিমা। শুধু অপেক্ষা করছিল সুযোগের। আর ইতিমধ্যে ভাল ভাল ওস্তাদ রেখে নাচ গান শেখাচ্ছিল ওকে, দাম ভাল মিলবে এই আশায়। এমনি একদলই ঠিক ক'রে রেখেছিল সে—নতুন মাল পাঠাবার হুকুম পেলেই দলকে দল সে গুজরাতে পাঠাবে। কিন্তু সে সুযোগ আসবার আগেই এসে গেল—লড়াই। ফতিমা এবং সরস্বতী দুজনেই কম্পিত বক্ষে অপেক্ষা করতে লাগল ফলাফলের। সরস্বতীর মন ঠিক করাই ছিল। যদি মুরাদের মৃত্যুই হয় তো সে হিন্দু সতীর মত সহমরণে যাবে। মৃত্যুতে হবে তাদের মিলন। যদি পরাজিত ও বন্দী হয়? তাহলে সে সেই বন্দীশালাতে প্রবেশ করবে, যেমন করেই হোক্।

তারপর খবর এল সামুগড়ের। বিজয়ী দুই শাহ্‌জাদা এলেন আগ্রার দিকে। আগ্রা দুর্গ দখল করলেন আওরঙ্গজেব। সে সুযোগ ছাড়লে না ফতিমা, ওদের শিবিরেই পাঠিয়ে দিলে একদল নাচওয়ালী, সব কটি টাটকা তাজা ফুল—অনাঘ্রাত। উজীরের কাছে মোট পাওনার 'পুর্জা' গেল! আগ্রহে আশায় উৎকণ্ঠিত, রোমাঞ্চিত হয়ে মুঘল শিবিরে প্রবেশ করল সরস্বতী বাঈ!

এই হ'ল ওর মোটামুটি ইতিহাস।

কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল, কিছুদিন লড়াই করতে হয়েছিল আরও কিছু লুব্ধ চক্ষুর সঙ্গে। কিন্তু দলে আরও অনেকে ছিল, ওর চেয়ে রূপসী মেয়েই ছিল—তাই বিপদ কোনমতে এড়িয়ে গেছে সরস্বতী। দিনেরাতে জপ করেছে সে শুধু মুরাদের নাম। তারপর?···তারপর সূক্ষ্মমাত্র ওর·ইচ্ছাশক্তিতেই বুঝি আওরঙ্গজেবের নজরে পড়েছিল ও, ডাক পড়েছিল তাঁর তাঁবুতে—আর পছন্দও হয়েছিল তাঁর। এই দুরূহ কাজের ভার পড়েছিল ওর ওপর।

কী কুক্ষণে ও কি কুক্ষণেই সে এর ভেতর দেখতে পেয়েছিল নিজের সুযোগ, রাজী হয়েছিল এমন ঘৃণ্য কাজে! সে কথা মনে হলে আজও ওর মাথা কুটে মরে যেতে ইচ্ছা করে শাহ্‌জাদার পায়ে। সেদিন ওর সে বিষ ছিল কোথায়? সেদিন মরে যেতে পারে নি সে?···

মাথাও কোটে এক-একদিন, দুঃখে ক্ষোভে।

তাকে সান্ত্বনা দেন মুরাদই। কাছে টেনে এনে বলেন, 'ভাগ্যে তুমি সেদিন

জহর খাও নি নাজ্‌নি! আওরঙ্গজেব তার উদ্দেশ্য হাসিল করতই—মাঝখান থেকে এমন জিনিসে বঞ্চিত হতাম আমি। যে ভালবাসে তার সেবাহস্তের চেয়ে দুঃখের দিনে কাম্য কি হতে পারে বলো?…না, আমি বেশ আছি। আজ আর হয়ত সাম্রাজ্যেও লোভ নেই আমার। শুধু, শুধু যা এই বন্দীদশা—'

নিঃশ্বাস চেপে যান মুরাদ—পাছে সরস্বতী বাঈ দুঃখ পায়!

৪

কিন্তু একদিন খবর এসে পৌঁছলো যে, মুরাদের বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষীর অভাব হয় নি এখনও। এখনও তাঁর কথা চিন্তা করে এমন লোক ঢের আছে। এই গোয়ালিয়রেই এসে জমা হয়েছে প্রায় এক হাজার সশস্ত্র লোক। নানা ছদ্মবেশে ও অজুহাতে এসে তারা আছে। তারা ভোলেনি দরাজ-দিল মুরাদের কথা, বীর মুরাদের কথা। এসেছে খোরাসান থেকে, কাবুল থেকে, কান্দাহার থেকে। এসেছে সিন্ধু পেরিয়ে, শতদ্রু পেরিয়ে, নর্মদা পেরিয়ে। এদের মধ্যে ধনী ব্যক্তিরও অভাব নেই। টাকা নিতে নয়—দিতেই এসেছে মুরাদের কাজে। জানে যে মুরাদ যদি আজ মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে আবার কোন সেনাবাহিনীর পুরোভাগে এসে দাঁড়াতে পারেন তো আওরঙ্গজেবের সিংহাসন কেঁপে উঠবে। অভাব হবে না টাকা বা লোকের। এবং আর যারা তাঁর বন্ধু হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের তিনি কোন সুদিনেই ভুলবেন না।

মুরাদ যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠলেন। মনে পড়লো হিন্দুস্থানের কথা। মনে পড়লো তখ্‌ত-এ-তাউসের কথা, আসমুদ্রহিমাচল বিস্তৃত সাম্রাজ্যের কথা। নিজের উচ্চাশার কথাও মনে পড়লো বৈ কি! সম্রাটের রক্ত জাগলো উচ্চাশায়, তাতারী রক্ত জাগলো প্রতিশোধের নেশায়। ওঃ, একবার যদি ছাড়া পান—একবার মাত্র—তা হলে দেখে নেবেন ঐ ভণ্ড কপট আওরঙ্গজেবকে! প্রতিশোধ নেবার পর যদি সেই মুহূর্তে মরেও যান তো দুঃখ নেই।…

চললো ষড়যন্ত্র। গোয়ালিয়র কিল্লার বাইরে থেকে দুর্ভেদ্য পাষাণপ্রাচীর ভেদ ক'রে ষড়যন্ত্রকারীদের মন্ত্রণা এসে পৌঁছতে লাগলো। কোনমতে কিল্লার বাইরে দ্রুতগামী ঘোড়ায় চেপে দুর্ধর্ষ অল্প কয়েকজন মাত্র অনুচর নিয়ে রাতের আঁধারেই সুরাট যাত্রা করবেন মুরাদ। এখানের কিল্লাদার যখন খবর পাবেন তখন যাতে সে খবর বাইরে পৌঁছে দিতে না পারেন বা মুরাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে না পারেন—তার জন্য থাকবে পাঁচশতাধিক সশস্ত্র লোক। যারা এতকাল ধরে এখানে এসে জড়ো হয়েছে। তারা ঘিরে থাকবে কিল্লা। সেই সুযোগে দিনরাত ঘোড়া ছুটিয়ে মুরাদ

নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে পৌঁছবেন। ঘোড়ার ডাক, টাকা—সব আয়োজনই প্রস্তুত আছে। সুরাটে পৌঁছলে সুরাটের হিন্দু ব্যবসায়ীরা আরো টাকা তুলে দেবে—কথা দিয়েছে তারা। বিজাপুরের সুলতান সাহায্য করবেন। সাহায্য করতে পারেন কোন কোন রাজপুত রাজা। মুরাদের পতাকা আবার উড়েছে শুনলে বহু সৈন্য আওরঙ্গজেবের পতাকা ত্যাগ করে ছুটে আসবে।

এমনি শতসহস্র আশার ছবি ভেসে ওঠে মুরাদের চোখের সামনে। আগ্রহে চোখ জ্বলে তাঁর। বহুকালের নিষ্ক্রিয়তা যেন আর সহ্য হচ্ছে না। এই মুহূর্তে কাজ চায় তাঁর সবল সক্রিয় পেশীর দল।

খবর এসে পৌঁছয়—তকী খাঁ সংবাদ সংগ্রহ ক'রে যাচ্ছিল, সফি খাঁ তার পিছনে পিছনে ছুটে গিয়ে তাকে হত্যা করেছে।

সে খবরটুকু দিয়ে আর একদিন তার উচ্চ প্রশংসা করেন মুরাদ সরস্বতী বাঈয়ের সামনেই। বলেন, 'বন্ধু যদি থাকতে হয় তো এম্‌নি। বাস্তবিক সফি খাঁর মত এমন নিমকহালাল লোক আমি কমই দেখেছি। যদি বেরোতে পারি কোন-দিন, যদি সুযোগ আসে তো এ ঋণ আমি শোধ করবই!'

শোনে আর সরস্বতী বাঈ শিউরে ওঠে। সে ভুলতে পারে না ওর চাউনি। এক অজ্ঞাত আশঙ্কা ওর মনে জাগে—।

দুর্গের ভেতর মুরাদ নিরাপদ। তাই কি ওঁকে দুর্গের বাইরে নিয়ে যাওয়ার এত আপ্রাণ চেষ্টা সফি খাঁর? ওঁর বন্দীদশা ঘোচাবার জন্য এমন প্রাণপণ চেষ্টা?

সিংহের উচ্ছিষ্টে মূষিকের অরুচি কি?

কথাটা বলতে গিয়েও চেপে যায় সরস্বতী বাঈ। মুরাদকে বলতে সাহস হয় না।

অবশেষে সেই দিনটি ঠিক হয়। সেই বহু প্রতীক্ষিত দিনটি। তারিখটি প্রতিদিন জপ করতে থাকেন মুরাদ।

শুধু কিছু বলা হয় না সরস্বতী বাঈকে। বিচ্ছেদের ইঙ্গিত মাত্রেই যেন সে আউতে প'ড়ে, নরম দোলনচাঁপা ফুলের মতো। স্বপ্নে মুরাদের অসুখ হয়েছে দেখলে চোখ ছলছল করে তার। কোন্ প্রাণে তাকে বলবেন তিনি? বিচ্ছেদ তো বটেই—এ হয়তো চিরবিচ্ছেদ হবে। তাঁর ভাগ্যদেবতা তাঁকে কোথায় নিয়ে যাবে, জীবন-স্রোতে ভাসতে ভাসতে কোথায় কোন্ ঘাটে গিয়ে ভিড়বে তাঁর জীবনতরী তার ঠিক কি? সে জীবনের মধ্যে স্ত্রীলোকের কোন স্থান নেই। থাকলেও সঙ্গিনী হিসেবে বয়ে বেড়ানো যায় না। শুধু কথায় ছলে এক-একদিন জিজ্ঞাসা করেন

হয়তো, 'আচ্ছা সরস্বতী, ধরো আমি যদি হঠাৎ কোথাও চলে যাই ?'

এদের মন্ত্রণা, এদের নিঃশব্দ গোপন গতিবিধির আভাস কি পায় না সরস্বতী বাঈ ? আশঙ্কায় বুক কেঁপে ওঠে ওর। পদ্মের পাপড়ির মতো নরম হাতখানা মুরাদের মুখে ধরে বলে সে, 'অমন কথা মুখে আনবেন না, শাহ্‌জাদা!'

হাতটা সরিয়ে মুরাদ বললেন, 'ধরো, যদি মরেই যাই ?'

'তা হ'লে আমি তখনই বিষ খেয়ে মরবো।'

'বিষ যদি হাতের কাছে না পাও ?'

'এই ওপরতলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়বো।'

'যদি তোমাকে বেরোতে না দেয় ? ঘরে বন্ধ ক'রে রাখে ?'

'পাথরের মেঝেতে মাথা কুটে মরবো। সেটা তো কেউ আটকাতে পারবে না।'

উন্মনা হয়ে চুপ ক'রে যান মুরাদ। ফুলের মালা কি লোহার বেড়ি হয়ে চেপে বসবে নাকি ? শেষে কি এর মায়ায় তিনি সমস্ত ভবিষ্যৎ খোয়াবেন ? না—তা সম্ভব নয়। পুরুষের জীবনে আরও ঢের কাজ আছে,—নারীর প্রেম উপভোগ করা ছাড়াও।

রাত্রে বিছানায় শোবার পর সরস্বতী বাঈ যখন পা টিপতে বসে, যখন তার সেই উষ্ণকোমল হাতের সেবায় আরামে শিথিল হয়ে আসে স্নায়ু—তখন এক-এক বার এ কথাও মনে হয়, এই তো বেশ আছেন তিনি। কী দরকার অত হাঙ্গামায় ? একটি নারীর হৃদয়-সাম্রাজ্যও পার্থিব সাম্রাজ্যের চেয়ে কম লোভনীয় নয়।

আবার নিজের মনোভাবে নিজেই লজ্জিত হয়ে ওঠেন।

সম্রাট শাহ্‌জাহানের পুত্র তিনি, আকবর শার প্রপৌত্র। এ কথা এত সহজে ভোলা অন্যায় তাঁর পক্ষে।

অবশেষে সেই দিনটি এলো। কৃষ্ণপক্ষের রাত। পথ সবচেয়ে অন্ধকার থাকবে, তাই সবচেয়ে নিরাপদ।

বিকেল থেকে অনেক ইতস্ততঃ করেছেন মুরাদ। বলবেন কি বলবেন না সরস্বতী বাঈকে। কিন্তু কিছুতেই পারেন নি। থাক। যখন জানতে পারবে তখনই জানুক। এখন থেকে আর বিদায় নিয়ে দরকার নেই।

শুধু বুদ্ধিমানের মতো সে রাত্রে একা থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। সরস্বতী বাঈকে আর প্রয়োজন হবে না—জানিয়ে দিয়েছিলেন। এমন এর আগেও দু-চার দিন ঘটেছে—নূতনের নেশায় শাহ্‌জাদা দুর্গরক্ষকের কাছ থেকে দু-একটি বাঁদী আনিয়ে নিয়েছেন। সুতরাং সরস্বতী বাঈ সেদিনও কোন সন্দেহ করে নি।

অধীর আগ্রহে মুহূর্ত গুণছেন মুরাদ। সেদিন মদের পাত্র স্পর্শ করেন নি। সাহস ও বুদ্ধি দুই-ই অক্ষুণ্ণ রাখা চাই আজ—মস্তিষ্ককে এতটুকু আচ্ছন্ন হ'তে দিলে চলবে না।

অবশেষে দ্বিতীয় প্রহরের ঘড়ি বাজলো। পাহারা বদল হবে এবার। আর সময় নেই। খাপ-সুদ্ধ অসি সজোরে চেপে ধরলেন মুরাদ।

সামান্য একটু কি শব্দ হলো খুট্‌ ক'রে। তাঁর মহলের তালা খুলল কে।

নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালো দুর্গেরই একটি প্রহরী। অভিবাদন ক'রে জানালো, সব প্রস্তুত। অপর প্রহরীরা এখন ওধারে গিয়েছে—ফিরে আসতে প্রায় অর্ধদণ্ড দেরি হবে। এই সামান্য সময় আছে হাতে। এখান থেকে নেমে আঁধারে আঁধারে উঠান পেরিয়ে যেতে হবে ওপাশের প্রাকারে। সেখানে একটি দড়ির সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলে শাহ্‌জাদা দেখবেন ওপাশে একটি ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। পাঁচিলের ওপর থেকে একেবারে ঘোড়ার পিঠে নেমে পড়বেন, তারপর যতটা সম্ভব সোজা যাবেন উত্তর দিকে। এই পথটুকু পেরিয়ে গেলেই পাবেন একটি ঘন বন—সেখানে অপেক্ষা ক'রে আছে আরও দশজন অশ্বারোহী। তারাই শাহ্‌জাদার সঙ্গে যাবে।

শার্দুলের মত নিঃশব্দ দ্রুতগতিতে হাতিয়ার হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলেন মুরাদ—কিন্তু দোরের কাছে এসে একবার থমকে দাঁড়ালেন। চাইলেন পিছন-পানে। এতকালের আশ্রয় তাঁর। এক বৎসর ধরে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন এই ঘরে। মায়া একটু হয় বৈ কি!

প্রহরী অসহিষ্ণুতার একটা ভঙ্গি করলো। তার জীবনেরও দাম আছে তার কাছে। কয়েক মুহূর্ত এদিক ওদিক হ'লে সর্বনাশ!

মুরাদ সম্বিৎ পেয়ে এগিয়ে চললেন। কিন্তু আবারও তাঁর গতি মন্থর হয়ে এলো। সরস্বতী বাঈয়ের ঘরের সামনে দিয়েই যেতে হচ্ছে। এই তো—!

একবার দেখা ক'রে যাবেন না? শেষ দেখাই হয়তো। জীবনে কে কোথায় ছিটকে পড়বে। হয়তো তাঁর এই পলায়নের দণ্ড ভোগ করতে হবে ও বেচারীকেই।

প্রহরী আবারও অসহিষ্ণু হয়ে উঠলো। মুরাদও পা বাড়ালেন। কিন্তু পা যেন ভারী হয়ে উঠছে—নড়তে চায় না।

এতকালের সঙ্গিনী তাঁর! তাঁকে ছাড়া আর কিছু চায় নি, আর কিছু জানে না। স্বেচ্ছায় কারাবরণ করেছে—যেন, সে-ই ওর জীবনের সবচেয়ে বেশি সুখ। সেবায় প্রেমে অভিভূত ক'রে রেখেছে এতকাল। মাটিতে এনে দিয়েছে বেহেস্তের স্বাদ। বহুনারীবল্লভ মুরাদ কখনও জানতেন না—মানুষ এত ভালোবাসতে পারে

একজন মানুষকে। এই হিন্দু নারী তাঁর মনে বিস্ময় জাগিয়েছে বার বার।...

শেষ দেখা একবার দেখে যাবেন না? শেষ চুম্বন এঁকে দিয়ে যাবেন না ওর ঐ চারু ললাটে— ? না, সে সম্ভব নয়।

নিয়তি!

মুরাদ ফিরলেন। ইঙ্গিত করলেন প্রহরীকে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করতে।

দ্রুত লঘু পায়ে পর্দা সরিয়ে সরস্বতী বাঈয়ের ঘরে ঢুকলেন।

ঘরে সেজ জ্বলছে। তারই ম্লান আলোতে দেখা যাচ্ছে ভেলভেটের সজ্জায় একমুঠো ফুলের মতো এলিয়ে শুয়ে রয়েছে সরস্বতী বাঈ।

মুরাদ এগিয়ে এসে সেই নিদ্রিতা হুরীর ললাটে একটি দীর্ঘ চুম্বন এঁকে দিলেন।

চমকে জেগে উঠল সরস্বতী বাঈ।

'এ কি শাহাজাদা, এ কী বেশ আপনার?'

'চুপ। আমি চললুম সরস্বতী বাঈ। আমি পালাচ্ছি। যদি বেঁচে থাকো, আমিও কোন দিন বিজয়ী বেশে এখানে ঢুকতে পারি তো আবার দেখা হবে। আর যদি নাই ফিরি—ইজিদ বক্স রইলো, ওকে দেখো।'

নির্বোধ মুরাদ! শেষ কথায় সর্বনাশ হয়ে গেলো। সমস্ত সতর্কতা ভুলে, সমস্ত ভালমন্দ ভুলে সরস্বতী বাঈয়ের মধ্য দিয়ে চিরকালীন ভারতীয় নারী আর্তনাদ ক'রে উঠলো, 'ওগো আমাকে তা হ'লে কার কাছে ফেলে যাচ্ছো গো। আমি কি ক'রে বাঁচব গো।'

নারীকণ্ঠের সেই আর্তনাদ নিশীথ রাত্রির অন্ধকার ও নিস্তব্ধতা চিরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হ'তে হ'তে নিমেষে ছড়িয়ে পড়ল বহুদূরে। দুর্গের বিভিন্ন দিকে যে প্রহরীরা পাহারা দিচ্ছিল তাদের সকলের কানেই গিয়ে পৌঁছল নিষ্ঠুর নিয়তির বিচিত্র উল্লাসধ্বনি—নারীকণ্ঠের সেই আর্ত আকুতি।

তারপর?

তারপরের ইতিহাস তো খুবই সংক্ষিপ্ত। হৈ চৈ ছুটোছুটি—দেখতে দেখতে চারিদিকে অসংখ্য মশাল জ্বলে উঠলো। বেরিয়ে এলেন সুখশয্যা ছেড়ে সুবাদার খাঁ, বেরিয়ে এলেন মীর সুলতান খাঁ।

যে প্রহরীটি মুরাদকে নিতে এসেছিলো সে আগেই ব্যাপারটা অনুমান ক'রে সরে পড়েছিলো। কিন্তু মহলের ফটকে চাবি দেবার সময় সে পায় নি। সেই মুক্ত দ্বার, সশস্ত্র, সুসজ্জিত মুরাদ, দুর্গপ্রাকারের ওপারে ঘোড়া—ঘটনাটা অনুমান করবার পক্ষে এই-ই যথেষ্ট।

মুরাদের পায়ে আবারও শেকল পরাবার আদেশ দিলেন সুবাদার খাঁ। তাঁর বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে এমন বিশ্বাসঘাতকতা। আর একটু হ'লে কী সর্বনাশটাই না ঘটছিল। আওরঙ্গজেবের রক্তকটাক্ষ মানসচক্ষে অনুমান ক'রে শিউরে উঠলেন তিনি।

চেষ্টা হয়েছিল—এই সংবাদেই কী হয় কে জানে। হয়তো বা সপরিবারে শূলে উঠতে হবে।......

সুবাদার খাঁ সে রাত্রেই চিঠি লিখতে বসলেন—দুশমনরা আয়োজনের কোন ত্রুটি করে নি, সব খবরই ঠিক ঠিক নিয়েছিল—কেবল এই খবরটা নেয় নি যে—শাহানশাহের এই বান্দা সারা রাত অতন্দ্র থেকে এই বিশেষ বন্দীটিকে পাহারা দেয়। তাই না সব কেঁচে গেল। বান্দা এর জন্য কোন পুরস্কার আশা করে না অবশ্য। অন্নদাতার সেবায় যে কোন ত্রুটি হয় নি, এইটেই তার চরম পুরস্কার।

৫

শাহ্জাদা মুরাদ একটু বিস্মিত হলেন। তাঁর পলায়নের চেষ্টা ধরা পড়বার পর থেকে খুব কড়া নজর রাখা হয়েছে তাঁর ওপর। খাদ্য-পানীয় পর্যন্ত পরীক্ষা ক'রে দেওয়া হয়। বাইরের জগতের সঙ্গে কোন সম্পর্ক তাঁর না থাকে—এ সম্বন্ধে সকলেই সজাগ, সতর্ক। নতুন পরিচ্ছদ অবশ্য তার পর থেকে আসেনি—শুধু একটা টুপি, তাও দুর্গাধিপতি নিজে তার সেলাই কেটে পরীক্ষা ক'রে দেখে তবে ছেড়েছিলেন!

তবে এ ব্যাপারটা কেমন ক'রে সম্ভব হ'ল?

পাছে কোন প্রহরী ওঁর উদার ও মধুর ব্যবহারে আকৃষ্ট হয় এ জন্য ঠিক তিন দিন অন্তর প্রহরী পাল্টানো হয়। চাবি রাখেন কিল্লাদার নিজে। দু বেলা খাবার দেওয়ার সময় তিনি নিজে এসে দাঁড়ান মহলের প্রবেশ-পথে। ওঁর চাকরদেরও মহলের লৌহকপাট পার হবার হুকুম নেই—কোন বিশেষ প্রয়োজন হ'লে সে বেরোতে পারে কিন্তু ফিরতে আর সে পারবে না। তার জায়গায় নতুন চাকর বহাল হবে। তাও বেরোবার সময় তাকে প্রায় উলঙ্গ ক'রে দেখা হবে—কোন কিছু সে বহন ক'রে নিয়ে যাচ্ছে কিনা।

অথচ আজ মধ্যাহ্ন-ভোজনে বসে রুটি ছিঁড়তে গিয়েই এ কী তাঁর হাতে এল?

সরু কাঠির মত জড়ানো একটি কাগজ। কাগজও ঠিক নয়, পাত্‌লা চামড়া কাগজের মত করা। তাতে এমন কালিতে লেখা যে জলে ও তাপে নষ্ট হয় নি। রুটি সেঁকবার আগেই বাবুর্চি এটা ঢুকিয়ে দিয়েছে কাঁচা ময়দার ভিতর।

তাহ'লে এখনও তাঁর বন্ধু, তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষী আছে এ দুনিয়ায় ? সবাই তাঁকে একেবারে ত্যাগ করে নি !

দরাজ-দিল শাহ্‌জাদা মুরাদের প্রতি তাদের যে প্রীতি ও আসক্তি—বাদশা আওরঙ্গজেবের অপ্রীতি ও বিদ্বেষের ভয়কেও জয় করতে পেরেছে তা হ'লে !

আশ্চর্য !

কৃতজ্ঞতা একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি এ পৃথিবী থেকে !

ভবিষ্যতের আশা ?

না, তা ঠিক মনে করেন না শাহ্‌জাদা মুরাদ ।

কী-ই বা আশা করতে পারে তারা ? কতটুকু আশা আছে আর অবশিষ্ট ভবিষ্যতের জন্য !

একদিন তবু তাঁর মুক্ত-হস্তের আশ্বাস ছিল—এখন তো আর তাও নেই। এখন এমন ক্ষমতা আর তাঁর নেই যে কাউকে একটা মোহর, এমন কি সামান্য একটা তঙ্কা পাঠান। আর এই বজ্রকঠিন বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আবার নিজস্ব সেনাবাহিনীর পুরোভাগে যে কোন দিন দাঁড়াতে পারবেন—সে আশাও সুদূরপরাহত ।

তবে কিসের লোভে ওরা মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করেছে ? সাধারণ মৃত্যুও নয়,—বেদনাদায়ক মৃত্যু। সেদিন যে প্রহরীটি তাঁকে এই মহলের চাবি খুলে দিয়েছিল, তাকে জীবন্ত সমাধি দেওয়া হয়েছে—গোয়ালিয়র দুর্গের মধ্যেই। পাছে বাইরে কোথাও দিলে স্থানীয় অধিবাসীরা প্রাণ থাকতে থাকতে তাকে উদ্ধার করে ।

মীর সফি খাঁ পালাবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু বাদশার অভ্রান্ত দৃষ্টি তাকে টেনে বার করেছে। তারপর থেকে তার আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নি। অন্ধকার কোন ভূগর্ভস্থ কারাগারে সে প্রভুভক্তির ঋণ শোধ করছে—অথবা কোন পৈশাচিক ব্যবস্থায় নিঃশব্দে সরে পড়েছে এ পৃথিবী থেকে—কে জানে !

না—যারা আজও তাঁকে এই কারাগার এবং অবশ্যম্ভাবী আসন্ন মৃত্যু থেকে উদ্ধারের স্বপ্ন দেখছে, তাদের সাহস আছে—এটা মানতেই হবে। শাহ্‌জাদা মুরাদ উদ্দেশে সেলাম জানান তাদের ।

রুটির ভেতরে পাওয়া কাগজের টুক্‌রোটা সাবধানে খোলেন। এদিক ওদিক তাকিয়ে নেন একবার তার আগে। না, কাছাকাছি কেউ নেই। যে চাকরটি নতুন বহাল হয়েছে সে যে আওরঙ্গজেবের চর, সে সম্বন্ধে তাঁর কোন সন্দেহই নেই। চর নয় কে ? সামান্য একটু সংবাদও পৌঁছে দিতে পারলে প্রচুর পুরস্কৃত হবে, আর একথা জানা থাকলে সবাই আগ্রহে গুপ্তচরের কাজ করবে ।

মুরাদ তাঁর কারাকক্ষের ঘুলঘুলি দিয়ে এসে-পড়া আলোর রেখার সামনে কাগজটা মেলে ধরলেন।

তাতে লেখা ছিল:

"নতুন বাদ্‌শা আপনাকে সরাতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু নিজে কোন হুকুম দিতে চান না। কাজীর বিচার হবে। নকী খাঁকে বধ করার অভিযোগ আনবে নকী খাঁর ছেলে নবী আখ্‌তার। বড় ছেলে রাজী হয় নি অভিযোগ করতে। ছোট ছেলেকে রাজী করানো হয়েছে। ক্ষতিপূরণের টাকা নিতে রাজী হবে না, নতুন বাদশার নির্দেশ। তাকে টাকা নিতে রাজী করানোর চেষ্টা চল্‌বে। টাকার অভাব নেই। কিন্তু সে যদি রাজী না হয়? সময় কম। এ ধাক্কা সামলাতে পারলে অন্য চেষ্টা করা যাবে। কোনমতে তাকে দলে টানা যায় না?"

চিঠিখানা আদ্যোপান্ত বার-দুই পড়লেন মুরাদ। তারপর আবার রুটির ভেতরে করেই ডালে ডুবিয়ে খেয়ে ফেললেন। আর কোন উপায়েই বাইরে ফেলা নিরাপদ নয়। বেচারী বাবুর্চির গর্দান যাবে তাহ'লে।

নিশ্চিন্ত হয়ে রুমালে হাত মুছে ঠেস দিয়ে বসলেন মুরাদ। আহারে আর রুচি নেই। খাবারের সান্‌কিগুলো ঠেলে দিলেন দূরে।

কথাটা গুছিয়ে ভাববার চেষ্টা করতেই বিচিত্র এক হাসি ফুটে উঠল শাহ্‌জাদা মুরাদের মুখে।

আওরঙ্গজেব যে অসাধারণ ধূর্ত তা সবাই জানত—মুরাদ ছাড়া। মুরাদও জেনেছেন এই কিছুদিন আগে, এক মুহূর্তের ভুলে রাজ্য, স্বাধীনতা এবং প্রাণ—বোধ হয় এই তিনটেই হারিয়ে।

কিন্তু এত বুদ্ধি তাঁর? এত আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি!

বাহ্‌বা বা! শাহানশাহ্ আকবরের প্রপৌত্র ব'লে পরিচিত হবারই যোগ্য সে।

মুরাদ যদি মরেন তো এইটুকু সান্ত্বনা নিয়ে একদিন তিনি বেহেস্তের দিকে (না জাহান্নমে—তা দয়াল খোদাই জানেন!) পা বাড়াতে পারবেন যে তাঁর প্রাণ যিনি নিলেন—তিনি বর্তমান কালের সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান লোক।

সেলাম! সেলাম ভাই সাহেব!

অজস্র বাহ্‌বা তোমাকে। এ আর কারুর দ্বারা সম্ভব হ'ত না।

নকী খাঁকে বধ করার অভিযোগ! কবেকার কথা সে! মুরাদেরই মনে ছিল না কথাটা।

চার বছর হবে বোধ হয়। গুজরাতের শাসনকর্তা তখন তিনি। আলি নকী খাঁ ছিলেন তাঁর দেওয়ান।

দেওয়ান—কিন্তু তাঁর নিযুক্ত নয়। শাহান্‌শাহ্‌ বাদশা শাহ্‌জাহান—তাঁরই বাপজান—ঐ দেওয়ানটিকে তাঁর ঘাড়ে চাপিয়েছিলেন, কর্মচারীরূপে নয়, অভিভাবকরূপে।

আলি নকী লোকটা খুব খারাপ ছিল না—এটা তিনিও মানেন। চারিদিকে যে সব মাংসলোলুপ গৃধ্রদের দল ঘিরেছিল তাঁকে, তার ভিতর ঐ সাচ্চা লোকটির আসাই উচিত হয় নি। সে এক পয়সা চুরি করত না—তঞ্চকতা করত না ব'লেই বাকী সবাইকে সে ঘৃণা করত, অবজ্ঞা করত—তার চেয়েও বেশি,—তাদের সে মানুষ ব'লেই ভাবত না। আর তার সেই সাধুতার অহংকার ও স্পর্ধাই অসহ্য লাগত লোকের। মুরাদেরও লেগেছিল।

মুরাদেরও দোষ ছিল বৈকি!

আজ এই মৃত্যুর সামনাসামনি এসে দাঁড়িয়ে একথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই—শাসক হিসাবে তিনি অকর্মণ্যই ছিলেন। বিলাসী, ব্যসনাসক্ত, মদ্যপ। সমস্ত কাজেই শিথিলতা ছিল তাঁর।

মুঘল সাম্রাজ্যের সুনাম তিনি কলঙ্কিত করেছিলেন ঠিকই। শাহ্‌জাহানের দোষ নেই—তিনি অনেক রকমেই চেষ্টা ক'রে দেখেছেন। বাল্‌খ্‌-এ পাঠিয়েছিলেন দাক্ষিণাত্যে পাঠিয়েছিলেন, শেষে এই গুজরাতে। কিন্তু কোথাও কোন কৃতিত্ব তিনি দেখাতে পারেন নি। কুশাসন এবং অমিতব্যয়িতা—উচ্ছৃঙ্খলতা ও চাটুকার-পোষণ—এর বিচিত্র ইতিহাস দিনের পর দিন দিল্লী পৌঁছত। শেষে স্নেহশীল পিতাকে হার মানতে হ'ল কর্তব্যপরায়ণ বাদশার কাছে। আলি নকীকে তিনি পাঠালেন—নামে দেওয়ান কিন্তু কার্যত মুরাদের অভিভাবকরূপে।

মুরাদ সেদিন খুশী হন নি।

মুরাদের অনুচররা তো নয়ই। কিন্তু তাদের বিদ্বেষের কারণটা সেদিন ঠিক বুঝতে পারেন নি মূর্খ শাহ্‌জাদা। আজ বুঝতে পারেন।

তারপর?

সে এক ঘৃণ্য কলঙ্কের ইতিহাস। চরম নির্বুদ্ধিতারও বটে।

আশ্চর্য, তিনি কি অন্ধ হয়েছিলেন তখন? নইলে সবচেয়ে সহজ চালাকিটাও তিনি বুঝতে পারেন নি কেন? না কি তিনি বুঝতে চান নি? সেদিন অন্তরের অন্তরে কী ছিল—আজ হলফ্‌ ক'রে বলা শক্ত।

কুতবুদ্দিন খাঁ খেশ্‌গী—পত্তনের ফৌজদারকে টাকা আত্মসাৎ করার জন্য ক'মাস আগেই তো আলি নকী জরিমানা করেছিলেন, ভয় দেখিয়েছিলেন দিল্লীতে জানাবার। নেহাৎ মুরাদের অনুরোধেই না বেঁচে গিয়েছিল? সুতরাং সেই

কুতবুদ্দিন যে আলি নকীর সঙ্গে শত্রুতা করবেন, তা কি তাঁর বোঝা উচিত ছিল না?

হয়ত ছিল—কিন্তু তিনি বুঝতে পারেন নি।

সারারাত উন্মত্ত উচ্ছৃঙ্খলতার পর শেষরাত্রে কুতবুদ্দিন চিঠিখানা এনে সামনে ধরেছিল। যেন আলি নকী দারাকে গোপনে চিঠি লিখেছেন, মুরাদকে কীভাবে ধরিয়ে দেওয়া যায় দারার হাতে—সেই পরামর্শ দিয়ে। সাজানো ব্যাপার সবটাই। আজ সেটা দিনের আলোর মত পরিষ্কার। কিন্তু সেদিন সুরারক্ত চক্ষুর সাধ্য ছিল না সে জালিয়াতি ধরবার। ক্রোধে অন্ধ হয়ে তখনই হুকুম দিয়েছিলেন আলি নকী খাঁকে ধরে আনবার। বেচারা বৃদ্ধ দেওয়ান—কোরান পড়ছিলেন বসে। হুকুম শুনে ছুটে এসেছিলেন।

মুরাদ ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে ছিলেন। ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন চিঠিখানা নকী খাঁর মুখের ওপর। এ অসৌজন্য বাদশার পক্ষেও অশোভন।

কিন্তু আলি নকী ভয় পান নি! চিঠিখানা পড়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ঈষৎ বিদ্রূপের সুরেই জবাব দিয়েছিলেন, 'এটা যে কী নির্লজ্জ জালিয়াতি সেটুকু বোঝবার মত বুদ্ধিও তোমার নেই শাহ্‌জাদা—এইটেই বড় আফসোস!'

এই বিদ্রূপের সুর আর তাচ্ছিল্য সেদিন তাঁর তাতার-রক্তে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। তিনি বিবেচনার সময় নেন নি, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বৃদ্ধকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেন নি—হাতে বর্শা ধরাই ছিল, হত্যার জন্য প্রস্তুত হয়েই যেন বসেছিলেন তিনি—মুহূর্ত-মধ্যে বর্শাখানা চালিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর শীর্ণবক্ষের পঞ্জরাস্থির ভেতর!

•

অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়ালেন শাহ্‌জাদা মুরাদ।

ঠিকই হয়েছে, আলি নকীর ছেলে আজ যদি তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায় তো মুরাদ দোষ দেবেন না নিজের নসীবকে। খোদার তো শুধু দয়ার রাজত্ব নয়—ন্যায়-বিচারের রাজত্বও। এখানে নিয়মের ব্যতিক্রম তো সম্ভব নয়। বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ করেছেন তিনি—ফল ভোগ করতে হবে বৈ কি। সান্ত্বনা এই যে আওরঙ্গজেবও বিষবৃক্ষের বীজ ছড়িয়ে চলেছেন দু হাতে।...

মুরাদ হঠাৎ হেসে উঠলেন।

দুর্ভাগ্য যখন আসে তখন কিছুরই অভাব হয় না।

চার বছর পরে আলি নকী উঠে এল তার কবর থেকে। আশ্চর্য!

খানিকটা নিঃশব্দে পায়চারি করবার পর ডাকলেন—'সরস্বতী বাঈ!'

বাইরে থেকে পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকল সরস্বতী বাঈ।

শীর্ণ হয়ে গিয়েছে। অবিরাম কান্নার ফলেই বোধ হয় চোখের কোলে গভীর কালি।

তবু এখনও সে সুন্দর, বড় সুন্দর। মুরাদ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। চামেলির একগাছি গুঞ্জমালার মতই সুন্দর ও কোমল!

এই ত নিয়তি। মৃত্যুও যদি এমনি সুন্দর হয়—এমনি কোমল, এমনি ভঙ্গুর! দুঃখ কি?

সরস্বতী বাঈ অভিবাদন ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল নতমুখে। এবার প্রশ্ন করলে, 'কিছু বলছিলেন জাঁহাপনা?'

'আর জাঁহাপনা কেন সরস্বতী বাঈ? সম্বোধন পরিহাস মনে হয় না?'

সরস্বতীর নতমুখ আরও নত হয়ে এল। মনে হ'ল যেন শিউরে উঠল সে।

মুরাদও তা লক্ষ্য করলেন। কাছে এসে সস্নেহে হাত রাখলেন ওর দুই কাঁধে। গাঢ়কণ্ঠে ডাকলেন, 'সরস্বতী বাঈ, পিয়ারী!'

দুই চোখের কূল ছাপিয়ে কি আবারও ভরে এল জল?

মুরাদ একটা হাতে ক'রেই ওর মুখখানা তুলে ধরলেন, 'পিয়ারী—জানি না আর ক-দিন বাঁচব। হয়ত আর বেশী দিন মেয়াদ নেই। এ সময়ে তুমিও কি আমায় ত্যাগ করবে?'

আবারও শিউরে উঠল সরস্বতী বাঈ। ব্যাকুল কণ্ঠে বললে, 'কেন এমন কথা বলছেন আলিজা? এমন কথা মুখেও আনবেন না! কেন আপনি একথা বলছেন?

হাসলেন মুরাদ। ওর দুটি হাত ধরে একরকম জোর ক'রেই কাছে বসালেন। একেবারে বুকের মধ্যে ওর মুখখানা টেনে এনে বলেছিলেন, 'বলছি! কিন্তু তার আগে তুমি বলো যে তুমি কেন এমন ক'রে আমাকে এড়িয়ে চলছ?'

বহুদিন পরে সেই বিশাল বুকে যেন আবারও আশ্রয় এবং প্রশ্রয় পেলে সরস্বতী বাঈ। কান্নায় ভরা কণ্ঠে বললে, 'যে দিন থেকে আপনার জীবনে এসেছি, সেদিন থেকেই শুধু দুর্ভাগ্যের বেড়ী পরাচ্ছি আপনার পায়ে; তাই আর কাছে আসতে সাহস হয় না জনাব—আমার দৃষ্টিতে, আমার নিঃশ্বাসে আরও কি অনিষ্ট আছে কে জানে!'

'কিন্তু তোমাকে নইলে আমার চলে কী ক'রে সরস্বতী বাঈ! আমায় কে আছে?'

'শুধু সেই জন্যেই তো আজও বেঁচে আছি জনাব। নইলে সেই রাত্রেই ঐ পাথরের দেওয়ালে মাথা কুটে মরে যেতাম। আপনার সেবার ভার কার হাতে

ফিরে যাবো, এই ভেবেই শুধু যেতে পারি নি।'

'তবে অমন দূরে সরে থাক কেন? সরস্বতী বাঈ, সম্রাট শাহ্‌জাহানের পুত্র আমি, আকবর শাহ্‌ বাবর শাহ্‌ আমার পূর্বপুরুষ। মরতে আমি ভয় পাই না। মরবার ভয়ে জীবন্ত মরে থাকবো সে ধাতুতে খোদা আমাকে গড়েন নি। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জীবনের সুধাপাত্র মুখের কাছেই রাখতে চাই পিয়ারী।'

সুখে ও আবেগে মুহূর্তের জন্য আজও সরস্বতী বাঈয়ের মুখ রাঙা হয়ে উঠল। কিন্তু সে জোর ক'রে নিজেকে শাহ্‌জাদার বাহুপাশ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, 'কিন্তু কথাটা আমাকে বললেন না তো?'

'বলব? আচ্ছা, বলাই ভাল হয়ত। সেবার না ব'লেই বিপদে পড়েছি।'

একটু থেমে চারিদিকে তাকিয়ে নিয়ে মুরাদ বললেন চিঠির কথাটা।

আলি নকীর কথাটাও বলতে হ'ল শেষ পর্যন্ত। যদিও আজ সেজন্য লজ্জিত বোধ করলেন। বেধে বেধে থেমে থেমে বললেন কথাটা।

সরস্বতী বাঈ স্তব্ধ হয়ে শুনল। একটা কথাও কইল না। সে যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল।

'কী হ'ল তোমার বাঈ?'

'কী করবেন তাহ'লে? কী ক'রে ওকে হাত করা যায়?'

এতক্ষণে আকুল প্রশ্ন ফুটল ওর কণ্ঠে।

'কোন উপায়ই নেই। আমি আর এখান থেকে কী করব বলো? বন্দী আমি, ঘরের বাইরে যাবার স্বাধীনতা নেই। না—সে সম্ভব নয়! তাছাড়া বান্দা নবী আখ্‌তারের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে প্রাণভিক্ষা চাইব, আমি? তৈমুরের রক্ত আমার ধমনীতে বইছে তা ভুলে যেও না।'

অস্থির হয়ে উঠে খানিকটা পায়চারি করলেন মুরাদ।

'না, তুমি অন্য কথা বলো সরস্বতী বাঈ! আমার মাথা গরম করো না।'

৬

আওরঙ্গজেব বাদশা বহুরাত্রি পর্যন্ত একা বসে রাজকার্য দেখতেন। কিন্তু সেটা নিতান্তই তাঁর ব্যক্তিগত খাটুনি ছিল। সে সময় কাউকেই তিনি কাছে রাখতেন না, কর্মচারীদেরও থাকতে বলতেন না। তবে সেটা যে কতখানি বিবেচনা এবং কতখানি সার্থকতা, তা বলা কঠিন। একা একটা ঘরে বসে কাজ করতেন এই সময়টায়। এইটেই ছিল তাঁর চিঠিপত্র লেখার সময়—এবং পড়ারও। যে সমস্ত গোপনীয় কাগজপত্র এবং গুপ্তচরদের চিঠি তাঁর কাছে আসত, তা এইসময় পড়ে

নিজ হাতে নষ্ট ক'রে ফেলতেন। কোন তথ্য কোথাও লিখে রাখার প্রয়োজন থাকলে তা নিজেই লিখে রাখতেন। পরের দিন উজীর বা বক্সীদের যে কাজের ভার দিতে হবে— সেইগুলি আলাদা ক'রে সরিয়ে রেখে তবে অন্তঃপুরে শয়ন করতে যেতেন।

তাই হঠাৎ সেদিন নিয়মের ব্যতিক্রম দেখে আসাদ খাঁ বিস্মিত হলেন। দ্বিপ্রহর রাত্রি পার হয়ে গেছে—এমন সময় বাদশার আহ্বান!

ব্যাপার কি?

শশব্যস্তে ছুটে এলেন তিনি। 'জাঁহাপনা, তলব করেছেন বান্দাকে?'

'বসুন আসাদ খাঁ।'

মধুর হাসিতে আশা-আশ্বাস ফুটে উঠল। বাঁচলেন আসাদ খাঁ—তাহ'লে কোন অপরাধ ঘটে নি কোথাও!

বাদশার গদীর নীচে গালিচা পাতা মেঝেতে হাঁটু মুড়ে পা ঢেকে বসলেন আসাদ খাঁ—নিয়ম-মাফিক।

আওরঙ্গজেব সময় নষ্ট করলেন না, সে অভ্যাসই তাঁর নেই। একেবারে আসল কথাটা পাড়লেন।

'আলি নকী খাঁকে মনে আছে আপনার আসাদ খাঁ?'

'কোন্ আলি নকী, খোদাবন্দ্? গুজরাতের দেওয়ান—যিনি শাহ্জাদার—'

'হ্যাঁ, যিনি আমার ভাই মুরাদের হাতে নিহত হয়েছিলেন! তাঁর কথাই বল্‌ছি।'

'মনে আছে বৈকি।'

'কাজটা খুবই গর্হিত হয়েছিল মুরাদের পক্ষে। সত্যনিষ্ঠ ন্যায়পরায়ণ কর্মচারী, শাহ্জাহান বাদশার একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত লোক। পিতৃবন্ধু হিসাবেই তাঁকে দেখা উচিত ছিল। আমার পিতৃদেবের কোন বিশ্বস্ত কর্মচারীর প্রতি কোন অসৌজন্য দেখিয়েছি কখনও, এমন অপবাদ আশা করি আমাকে কেউ দেবে না!'

'না, তা দেবে না জাঁহাপনা। বরং বেশি সৌজন্য দেখাবার জন্যই বাদশা এক বার আপনার প্রতি বিরক্ত হয়েছিলেন।'

'তাও আপনার মনে আছে দেখছি। শাহ্জাহান বুদ্ধিমান, তিনি ঠিকই ধরেছিলেন। দারার বিপদাশঙ্কা করেছিলেন তিনি—তাঁর হৃদয়ের দুলাল দারার!*

---

* এটা ঐতিহাসিক সত্য। আওরঙ্গজেবের বিনয় ও সৌজন্যে শাহ্জাহানের বহু কর্মচারী আওরঙ্গজেবের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁর চরের কাজ করতে থাকেন। ভবিষ্যৎ ভেবে শাহ্জাহান ওঁকে লেখেন যে সম্রাট-পুত্রের পক্ষে বেশি সৌজন্য প্রকাশ করাও অশোভন।

যাক্—এখন শুনুন, আমি ভেবে দেখলাম যে এতবড়ো অন্যায় সহ্য করা আমার মত কোন সত্যাশ্রয়ী বাদশার পক্ষে অসম্ভব। অথচ ভাই মুরাদকেও আমি আর বন্দী রাখতে চাই না। এই অপরাধের একটা যা হয় বিচার হয়ে গেলেই আমি ওঁকে মুক্তি দেব।'

'কিন্তু বিচার হবার পর আর মুক্তি পাবার প্রশ্ন উঠবে কি?' প্রাণপণে ওষ্ঠ-প্রান্তে ফুটে-ওঠা হাসি দমন করেন আসাদ খাঁ।

'কেন?' সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন আওরঙ্গজেব, 'আমি ন্যায়-বিচারই চাই। কোন প্রবীণ কাজী বিচার করবেন। তিনি মুক্তি দিতে চান দেবেন। আমাদের আইনে তো মুক্তি পাবার পথও খোলা আছে!'

'হ্যাঁ, তা আছে। যদি অভিযোগকারী ক্ষতিপূরণ হিসাবে অর্থ গ্রহণ করে। সে অর্থ—'

'সেক্ষেত্রে সে অর্থ আমিই দেব আসাদ খাঁ। ভাইয়ের মুক্তিপণের অর্থ দেব না—সে কি কথা?'

'তা তো দেবেনই। কিন্তু এক্ষেত্রে অভিযোগকারী কে? নকী খাঁর ছেলে তো?'

'সেই কথাটাই আপনার সঙ্গে পরামর্শ করব ব'লে আপনাকে ডেকেছি। মন দিয়ে শুনুন।'

আওরঙ্গজেব মুহূর্তকাল থামলেন। মুহূর্তকালই, তবু বুদ্ধিমান আসাদ খাঁর তা চোখ এড়াল না। আওরঙ্গজেব ইতস্তত করছেন বলতে—না জানি সে কি ভয়ঙ্কর কথা!

বাদশাও তাঁর চোখের দৃষ্টি লক্ষ্য করলেন। চোখটা হাতের কলমের ওপর নিবদ্ধ ক'রে বললেন, 'আলি নকী খাঁর বড় ছেলেকে প্রশ্ন করেছিলাম, সে সোজাসুজি অস্বীকার ক'রেছে। সে বলেছে বাদশা শাহ্‌জাহান আজও জীবিত, তাঁর পুত্রের নামে নালিশ করতে সে পারবে না।'

'ক-টি ছেলে আলি নকী খাঁর?' স্থির দৃষ্টিতে বাদশার মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করেন আসাদ খাঁ।

'দুটি, ছোট ছেলে নবী আখ্‌তারকেও বলা হয়েছিল—কিন্তু সেও রাজী হয়নি।'

'তাহ'লে তো হাঙ্গামা চুকেই গেল শাহানশাহ। নিহতের ছেলেরা যদি অভিযোগ না করে তো আপনার কিসের গরজ?'

'হ্যাঁ—তা বটে। আমি নিশ্চিন্তই হয়েছিলাম।' কেশে গলাটা সাফ্ ক'রে নেন বাদশা, 'কিন্তু আজ একটি অদ্ভুত চিঠি এসেছে।'

আসাদ খাঁ চুপ ক'রেই রইলেন। প্রশ্ন নিরর্থক।

বাদশা একটু থেমে নিজেই ব'লে চললেন, 'কোন কারণে এই নবী আখ্‌তারকে কয়েদ করার প্রয়োজন হয়েছিল। সেলিমগড়ে তাকে রেখেছিলাম…দৈবক্রমে আর একটি কয়েদীও সেলিমগড়ে স্থান পায়। তার নাম মীর সফি খাঁ।'

চমকে উঠলেন আসাদ খাঁ। যেমন কল্পনায় ভূত দেখলে চমকায় মানুষ— তেমনিই।

'মীর সফি খাঁ? জাঁহাপনা তার প্রাণদণ্ড দেন নি?…আমরা তো শুনেছিলাম যে হাতীর পায়ের নিচে ফেলে তাকে মারা হবে—।'

'সেই রকমই কথা ছিল বটে। কিন্তু আমি অন্য প্রয়োজন বুঝে সে দণ্ড স্থগিত রেখেছিলাম।' কেমন একরকম নিরসকণ্ঠে বলেন আওরঙ্গজেব, 'আজকেই সফি খাঁ ওখানকার রক্ষককে দিয়ে আমাকে এক চিঠি পাঠিয়েছে।'

'কি চিঠি জনাবালি?'

'লিখেছে যে—সে নবী আখ্‌তারকে চেনে। পরন্তু নবী আখ্‌তার যে বন্দী হয়েছে এবং সেলিমগড়ে আছে তা কেউ জানে না। নবী আখ্‌তার তার পিতার হত্যার প্রতিশোধ নিতে চান না তাও সফি খাঁ শুনেছে। নকী খাঁ তারও আত্মীয়। যদি তাকে দিয়ে কোন কাজ হয় ত—সে রাজী আছে তা করতে। অর্থাৎ সে নকী খাঁর আত্মীয় হিসাবে কাজীর কাছে নালিশ করতে রাজী আছে!…তার বদলে সে দুটি পুরস্কার চায়। একটি হ'ল তার প্রাণ আর—'

'আর একটি?' আসাদ খাঁ প্রশ্ন করেন।

'আর একটি সরস্বতী বাঈ—মুরাদের বাঁদী।' আওরঙ্গজেব বললেন।

কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে রইলেন আসাদ খাঁ। তারপর মুখ তুলে স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন মনিবের মুখের দিকে। অবিচল কণ্ঠেই বললেন, 'জাঁহাপনা, আপনাকে জ্ঞান দিতে যাওয়া আমার ধৃষ্টতা। কিন্তু বিশ্বস্ত ভৃত্যদের কাছে ভাল কাজ আদায় করতে গেলে তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করাই ভাল। নইলে কাজ ভাল হয় না। আসল কথাটা খুলে বলুন শাহান্‌শাহ, আপনি এইবার মুরাদের মৃত্যু চান।…তা আমাকে ঠিক কি করতে হবে?'

আওরঙ্গজেব আবারও হাসলেন, মধুর সে হাসি। তবে তা ভয়ঙ্কর নয়—তাতে অভয় ছিল। এমন কথা তাঁর মুখের ওপর আর কেউ বলতে সাহস করত না, একমাত্র আসাদ খাঁর পক্ষেই এ সম্ভব। আর সেই জন্যই এতখানি বিশ্বাসও তিনি আর কাউকে করতে পারেন না।

তিনি বললেন, 'এই জন্যই আপনাকে এত পছন্দ করি আসাদ খাঁ। আপনি ছাড়া এ কাজ আর কেউ করতে পারবে না। আপনি এখনই একবার সেলিমগড়ে

যান। এই সফি খাঁর সঙ্গে দেখা করুন। তাকে বুঝিয়ে দিন যে, পুত্র ছাড়া অন্য কোন আত্মীয়ের এই মৃত্যু-মূল্য নেবার অধিকার নেই। তেমনি সফি খাঁও যে অপরাধ করেছে তাতে তার বাঁচবার অধিকার নেই। নবী আখ্‌তার বাঁচতে পারে—তার অপরাধ এমন কিছু গুরুতর নয়। এবং যদি সে মুরাদের নামে নালিশ করে তো—সে তার মুক্তি, এক লক্ষ মোহর এবং তার মনোমত বাঁদী—সবই পাবে!'

আসাদ খাঁ কি অন্তরে অন্তরে শিউরে উঠলেন?

কিন্তু উঠলেও সে শিহরণ তাঁর মুখে প্রকাশ পেল না। বরং তিনি আশ্চর্য শান্তকণ্ঠে বললেন, 'অর্থাৎ এই সফি খাঁকে নবী আখ্‌তারের পরিচয় দিয়ে নালিশ করতে হবে এবং আসল নবী আখ্‌তার সফি খাঁর পরিচয়ে প্রাণদণ্ড ভোগ করবে—এই তো?'

আওরঙ্গজেব তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়ে বললেন, 'যে বেইমান তার বাপের হত্যার শোধ নিতে চায় না—তার প্রাণদণ্ডই বাঞ্ছনীয় নয় কি?'

আসাদ খাঁ কী যেন একটা বলতে গিয়ে চেপে গেলেন। হয়ত বা সম্রাট শাহ্‌জাহানের কথাই মনে এসেছিল তাঁর। তবে পুত্রবৎসল বাদশা শাহ্‌জাহান অবশ্য আজও জীবিত, তাঁর পরিচর্যারও কোন ত্রুটি হয় নি।

আওরঙ্গজেব যেন ওঁর মনের কথাটা অনুমান ক'রেই—সামান্য ভ্রূকুটি করেছিলেন। সেই ভ্রূকুটির আভাস পেয়ে আসাদ খাঁর উদ্যত প্রশ্ন স্তব্ধ হয়ে গেল। তার বদলে সবিনয়ে বললেন, 'কিন্তু নবী আখ্‌তারকে কি কেউ চেনে না?'

'অন্ধকার রাত্রে রওনা হয়ে অন্ধকারেই গোয়ালিয়র পৌঁছলে চেনবার কোন প্রশ্নই উঠবে না আসাদ খাঁ। কাজীরও তো চেনবার কথা নয়।'

'কিন্তু সেখানে যখন মুরাদ দেখবেন?'

'আপনি এখনও আমার ভাইকে চেনেন নি। কিন্তু আমি চিনি তাঁকে। তিনি কিছুতেই, কোন কারণেই ধর্মাধিকরণে এসে তাঁর ভূতপূর্ব কর্মচারীর ছেলের সামনে দাঁড়িয়ে তার অভিযোগের জবাব দিতে রাজী হবেন না। না, সে ভয় নেই!'

তারপর নবী আখ্‌তার কোথায় আত্মগোপন করবে—কেমন ক'রে সে তার প্রার্থিত পুরস্কার ভোগ করবে—এ সব প্রশ্ন নিরর্থক। মূর্খ সফি খাঁ!...আসাদ খাঁ বাদশাকে অভিবাদন ক'রে উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু তখনই চলে গেলেন না, একটু যেন ইতস্তত করলেন। অবশেষে কৌতূহলেরই জয় হ'ল।

বললেন, 'একটা প্রশ্ন করব জনাব? গোস্তাকী মাফ করবেন?'

সহৃদয়তার মধু কণ্ঠে ঢেলে বাদশা ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'বলুন না, বলুন কী জানতে চান?'

'আপনি কি এই কাজের জন্যই সফি খাঁকে জীবিত রেখেছিলেন জাঁহাপনা?'

'না!' আওরঙ্গজেব কলমদানে কলম রেখে উঠে দাঁড়ালেন। কাজ তাঁর মিটে গেছে—এবার অন্তঃপুরে যাবার পালা।

'না আসাদ খাঁ। মনে করেছিলাম যে নবী আখ্‌তারই রাজী হবে, তুদিন কারাবাসে থাকলেই তার ঔদ্ধত্য কমে যাবে। তবে অন্য কোন কাজে লাগতে পারে—এই ভেবেই আমি সফি খাঁকে রেখেছিলাম। আমি জানতাম যে সরস্বতী বাঈকে ও চায়—আর স্ত্রীলোকের জন্য যে ক্ষেপে ওঠে, সে সেই স্ত্রীলোকের লোভে সব কিছুই করতে পারে। এটা শিখে রাখুন আসাদ খাঁ। আপনি রাজকার্য করেন, রাজনীতিতে এ জ্ঞানটা অপরিহার্য। আপনাকে আমি আর একদিন বলেছিলাম যে, ভাই মুরাদ সাধ ক'রে নিয়তির শেকল পরেছেন। সেই শেকলে ঐ সফি খাঁও বাঁধা আছে।'

হাসলেন আওরঙ্গজেব। জটিল, বিচিত্র হাসি।

আসাদ খাঁ কুর্নিশ করতে করতে বেরিয়ে এলেন।

তিনি নিজেও বুদ্ধিমান—কিন্তু তাঁর এই মনিবের বুদ্ধির পরিধি মাপ করা তাঁরও শক্তির অতীত। তাই আজকাল যেন এক এক সময় এঁর সামনে দাঁড়িয়ে হাঁফ ধরে আসাদ খাঁর। মনে হয় ছুটে গিয়ে কোন ফাঁকা জায়গায় সাধারণ মানুষের মধ্যে দাঁড়াতে পারলে তিনি বেঁচে যান।

আজ এই মুহূর্তেও—তাঁর সেই কথাটাই মনে হচ্ছিল।

৭

নিদ্রিত মুরাদের ঘর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল সরস্বতী বাঈ। মুরাদ অনেকক্ষণই ঘুমিয়েছেন—আগে হ'লে তাঁরই পায়ের কাছে শুয়ে সেও ঘুমিয়ে পড়ত কিন্তু আজ ওর চোখে ঘুম আসে নি। আকাশ পাতাল ভেবেছে সে।

মনে পড়ে আগ্রার রাজপথে ওর মাতৃগৃহের ঝরোকা থেকে যেদিন সে প্রথম মুরাদকে দেখে মুগ্ধ হয়—সেই দিনটির কথা। কী কুক্ষণেই ওর চোখে পড়েছিলেন মুরাদ। সর্বনাশিনীর মত, সর্পিণীর মত সে তার নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে ওঁর সর্বনাশ ডেকে আনছে।

নিজের আকুল প্রবৃত্তি মেটাবার জন্য কি না করেছে সে!

শেষে আর কোন পথ না পেয়ে কুলত্যাগিনী নর্তকীদের দলে নাম লিখিয়ে

স্বেচ্ছায় ঢুকেছে মুঘলদের তাঁবুতে। আওরঙ্গজেবের ঘৃণ্য প্রস্তাবে রাজী হয়ে চরম সর্বনাশ করেছে সে মুরাদের। নিজের কাছে রাখতে পারবে এই আশায় সে-ই সহায়তা করেছে আওরঙ্গজেবকে—মুরাদকে বন্দী করতে।

তবু—তখনও যদি মুরাদ ওকে ঘৃণায় ত্যাগ করতেন! সেদিন যখন সে তাঁর শৃঙ্খলাবদ্ধ পায়ে আছড়ে পড়েছিল, তখন সেই পায়ে যদি ওকে মাড়িয়ে পিষে যেতেন! তা না ক'রে তিনি সেই পায়ের বেড়ীকেই গলায় পরলেন। নিয়ে এলেন সঙ্গে ক'রে এই কারাগারে—যা সে চেয়েছিল!...তাও যদি সেখানেই সর্বনাশের শেষ হ'ত। এই সেদিনও, যখন শাহ্‌জাদার বন্ধুরা ওঁর পলায়নের সব ব্যবস্থা করে ওঁকে ডাকতে এল—সে-ই তো সে-পথ রুদ্ধ করে দিলে! নিতান্ত গ্রাম্য নারীর মত চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠে। যদি শাহ্‌জাদা অন্তত সে সময়ে এই হতভাগিনীর কথা না ভাবতেন! যদি না বিদায় নিতে যেতেন!

উঃ, সেদিনের কথা মনে হ'লে সত্যি সত্যি মনে হয় নিজে হাতে গলা টিপে নিজেকে মেরে ফেলতে!

তাই হয়ত সে ফেলত—শুধু এই দুর্দিনে শাহ্‌জাদাকে কে দেখবে—এই চিন্তাতেই সে তা পারে নি।

তিন দিন তিন রাত্রি সে মুখে জল দেয় নি। মাটি থেকে ওঠে নি। আশ্চর্য! যে মুরাদের উচিত ছিল ওকে খুন ক'রে ফেলা—সেই মুরাদই গিয়ে তাকে তুলেছিলেন জোর ক'রে, খাইয়েছিলেন নিজের হাতে।

মুরাদ মেনে নিয়েছিলেন তাঁর নিয়তিকে।

সরস্বতী বাঈ মানতে পারছে কৈ!

সে জীবিত থাকতে এমন ভাবে মুরাদকে মরতে দিতে পারবে না। এ কথা সে কেমন ক'রে ভুলবে যে সে-ই মুরাদের এই দুর্দশার কারণ?...

সরস্বতী বাঈ পা টিপে টিপে নিজের ঘরে এল। আরও খানিকটা বসে ভাবলে সে। তারপর বিছানার নিচে থেকে বার করলে একটি মহামূল্য মুক্তার মালা। আওরঙ্গজেবের দেওয়া পুরস্কার। ঘৃণায় সে কোনদিন এটা পরে নি—বিছানার নিচেই পড়ে আছে দীর্ঘকাল। পাপের অর্থ যদি প্রায়শ্চিত্তে যায় তো যাক্‌।

পাষাণ-প্রাচীরের মধ্য দিয়ে অন্ধকার দীর্ঘ পথ! তার শেষে সুকঠিন লৌহ-কপাট। হাত মুঠো ক'রে সেই কপাটে তিনটি ঘা মারলে সরস্বতী বাঈ।

লৌহকপাটের গায়ে একটি ছোট্ট ছিদ্র—সেইখানে চোখ রেখে প্রহরী প্রশ্ন করলে, 'কী চাই?'

'সুবাদার খাঁর সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই একবার। বড় জরুরী দরকার।'

প্রহরী সরে গেল। বোধ করি প্রশ্ন করতেই গেল। খানিক পরে আরও তিন-চারজন প্রহরী এসে ঘিরে দাঁড়াল। তার পর সামান্য ফাঁক হ'ল কপাট—তারই ভেতর দিয়ে সরস্বতী বাঈ গলে বেরিয়ে এল এবং প্রহরী-বেষ্টিত হয়েই গিয়ে দাঁড়াল দুর্গাধিপতি সুবাদার খাঁর সামনে।

বহুদিন মুরাদের ঘরে পান-ভোজন করেছেন সুবাদার খাঁ। সরস্বতী বাঈকে ভাল ক'রেই চেনেন। স্নেহ-কোমল কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছ বাঈ?'

'জী হাঁ! কিন্তু'—সরস্বতী বাঈ প্রহরীদের দেখিয়ে দেয়, 'এদের বাইরে অপেক্ষা করতে বলতে পারেন না? ভাল করে দেখে নিন, আমি নিরস্ত্র।'

অপ্রতিভ দুর্গাধ্যক্ষ বললেন, 'না না—সে ঠিক আছে!'

তাঁর ইঙ্গিতে প্রহরীরা বাইরে চলে গেল। সরস্বতী বাঈ একটুখানি কাছে সরে এসে রুদ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করলে, 'কিল্লাদার—এ যা শুনছি তা কি সত্য?'

'কী শুনছ তা কেমন ক'রে জানব?'

'শুনছি শাহ্‌জাদা মুরাদের প্রাণ নেবার ইচ্ছা হয়েছে? সেই ব্যবস্থাই চলছে?'

'তোবা। একথা কে তোমাকে বললে? বিলকুল ঝুট্‌।'

'আমাকে ভোলাতে চেষ্টা করবেন না সুবাদার খাঁ! আপনার কাছে আমি মিনতি করছি, হাতজোড় করছি!'

সুবাদার খাঁর ভ্রূভঙ্গী ভীষণ হয়ে উঠল, 'কোন্‌ বেইমান খবর চালাচালি করছে এমন ক'রে? আচ্ছা, আমি দেখছি।'

সরস্বতী বাঈ বুকের ভিতর থেকে মুক্তার মালাটা বার ক'রে সুবাদার খাঁর সামনে ফেলে দিলে, তারপর একেবারে হাঁটু গেড়ে বসল ওঁর সামনে।

'যা ভাবছেন তা নয়। এরা কেউ খবর দেয় নি—আমি গোবিন্দজীর নামে শপথ ক'রে বলছি। কেমন ক'রে জেনেছি তা আপনি কোনদিনই টের পাবেন না। এই মুক্তোর মালা স্বয়ং আওরঙ্গজেব—আপনাদের বাদ্‌শা—দিয়েছিলেন—বিশ হাজার টাকা এর দাম। এটা আমি আপনাকে দিচ্ছি। আপনাকে কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে হবে না—পলায়নে সাহায্য করতে হবে না—কিচ্ছু না। শুধু আপনি এই খবরটি দিন। আলি নকীর ছেলে নবী আখ্‌তার ওঁর নামে নালিশ করেছে—এটা কি ঠিক? আমি ভিক্ষা চাইছি আপনার কাছে, শুধু এই সংবাদটি।'

সুবাদার খাঁ তাঁর চতুর্থ পক্ষের নবপরিণীতা তরুণী স্ত্রীর শখের মত কণ্ঠের

সঙ্গে এই মুক্তার মালার যোগাযোগ মনে মনে কল্পনা ক'রে নিলেন। তারপর ঈষৎ মোলায়েম কণ্ঠে বললেন, 'ঠিক।'

'কবে কোথায় সে নালিশ হবে?'

'নালিশ হয়ে গেছে সরস্বতী বাঈ। কাল গোয়ালিয়রের বড় কাজী সাহেব এখানে আসবেন বিচার করতে। শাহ্‌জাদা মুরাদকে সুযোগ দেওয়া হবে আত্ম-পক্ষ সমর্থনের।'

'তার মানে নবী আখ্‌তার গোয়ালিয়রে আছে?'

'আছে। তার রিস্‌সেদার মির্জা মহম্মদ খাঁর বাড়িতে সে এসে উঠেছে।'

সরস্বতী বাঈয়ের মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠেছে।

ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

সে আকুল হয়ে কি একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল। কী যেন ভাবলে, তারপর বললে, 'কিল্লাদার, আপনার মনে আছে কিনা জানি না, আমি বন্দী হয়ে এখানে আসি নি। কোন গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নেই আমার নামে। হুকুম-নামায় লেখা ছিল, যতদিন আমি স্বেচ্ছায় এখানে থাকতে চাইব, আমাকে থাকতে দেওয়া হবে শাহ্‌জাদা মুরাদের সঙ্গে। মনে আছে আপনার?'

'মনে আছে।'

'আমাকে একবারটি বাইরে যেতে দেবেন? একটি বার?'

'নবী আখ্‌তারের সঙ্গে দেখা করবে?'

'হ্যাঁ।'

'কোন ফল হবে না সরস্বতী বাঈ! স্বয়ং আল্লাও তাকে নড়াতে পারবেন কিনা সন্দেহ।'

'তবু আমাকে একবার শেষ চেষ্টা করতে দিন। ভেবে দেখুন সুবাদার খাঁ, আপনি সম্রাট শাহ্‌জাহানেরও নিমক খেয়েছেন। শাহ্‌জাদা মুরাদও শাহ্‌জাহানের পুত্র। তাছাড়া এতে তো আপনার কোন আদেশ লঙ্ঘন করা হবে না!'

দুর্গাধ্যক্ষ খানিক নিঃশব্দে কী ভাবলেন। তারপর বললেন, 'তোমাকে আটকে রাখার কোন পরোয়ানা আমার নেই বটে। বেশ যাও, কিন্তু এখনই যেতে হবে। ফিরে গিয়ে মুরাদের সঙ্গে দেখা করতে পারবে না।'

'শাহ্‌জাদা মুরাদ বলুন সুবাদার খাঁ। এটুকু সম্মান আজও তিনি দাবী করতে পারেন!...বেশ, তাই যাবো। এখনই যাবো।'

সুবাদার খাঁ প্রহরীদের ডেকে আদেশ দিলেন, 'একে যেন দুর্গের বাইরে যেতে দেওয়া হয়।'

নবী আখ্‌তার বিস্মিত হয়ে তাকাল। অবগুণ্ঠিত মুখ বটে তবু শুভ্র গৌর-বর্ণের আভাস পাওয়া যায় বাইরে থেকেই, এবং দেহ যে সুগঠিত তাতেও সন্দেহ নেই।

এই মেয়েটি তার সঙ্গে দেখা করতে চায়? তার সঙ্গে?

সোজা হয়ে বসে নবী আখ্‌তার।

'আমাকে কী দরকার তোমার বলো।'

'একটু নির্জনে দেখা করতে চাই আপনার সঙ্গে।'

'নির্জনে!' আরও বিস্মিত হয় সে।

কিন্তু সুন্দরী স্ত্রীলোক নির্জনে দেখা করতে চাইলে খুশী হবারও কথা। সে ইঙ্গিত করলে, যে দারোয়ান সঙ্গে এসেছিল তাকে বাইরে যেতে।

মুখের অবগুণ্ঠন সরিয়ে ফেলে সরস্বতী বাঈ বললে, 'আমি একটি ভিক্ষা চাই আপনার কাছে।'

সে প্রাণপণে মানুষটাকে দেখবার চেষ্টা করে। কিন্তু ভাল ক'রে দেখা যায় না। একটা সেজ-এর আলো জ্বলছে, তাও পিছনে। সেই সামান্য আলোতে মুখচোখ কিছুই ঠাওর হ'ল না।

কিন্তু নবী আখ্‌তারের পক্ষে তার মুখ দেখার কোন অসুবিধা ছিল না। আলোটা তার মুখেই এসে পড়েছিল। সেই অসামান্য লাবণ্যের দিকে চেয়ে নবী আখ্‌তারের নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে।

'দাঁড়াও, দাঁড়াও—তোমাকে আগে দেখি। কে তুমি, এত রাত্রে নবী আখ্‌-তারের সামনে এই অপরূপ মাধুরী নিয়ে এসে দাঁড়ালে?'

নবী আখ্‌তারের মুখের ওপর রুমাল চাপা ছিল। কণ্ঠস্বরটা স্পষ্ট বোঝা গেল না। তবু মনে হ'ল—এ গলার আওয়াজ যেন সরস্বতী বাঈ-এর পরিচিত। বহু দিনের বিস্মৃতি পেরিয়ে কোন্ ঝাপ্‌সা স্মৃতির দুয়ারে ঘা মারছে এ কণ্ঠ।

কিন্তু তখন আর মনে করবার সময় কই? সে ব্যাকুল ভাবে বললে, 'সবই জানতে পারবেন জনাব—আমার ভিক্ষা মঞ্জুর করুন।'

'তেমন ভিক্ষা হ'লে নিশ্চয়ই করব? কী চাও বলো?'

'তেমন নয় জনাব—বলুন পারলে নিশ্চয় করবেন?'

'নিজের ইজ্জৎ আর মুরাদের জীবন ছাড়া—যা চাইবে তাই দেব।'

সরস্বতী বাঈয়ের মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়। পাশের দেওয়ালটা ধরে সামলে নেয় যেন সে নিজেকে।

'কী বলো—চুপ ক'রে রইলে যে?'

অকস্মাৎ হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বলে, 'আপনি শাহ্‌জাদা মুরাদকে ক্ষমা করুন নবী আখ্‌তার। আমি সেই ভিক্ষাই চাইতে এসেছি।'

'আমার পিতৃহন্তাকে ক্ষমা করব! কখনও না।'

'এমন বিধানও তো আছে জনাব—আত্মীয়-হত্যার মূল্য নেওয়া যায়! আপনি ক্ষতিপূরণ নিতে রাজী হোন।'

'কী ক্ষতিপূরণ দেবে তোমার পেয়ারের মুরাদ? তার আর আছে কি? এক লক্ষ মোহর নগদ, দু' হাজারের মন্‌সবদারী, বাৎসরিক এক লাখ টাকা আয়ের জমিদারী, খেলাৎ—এ সব দিতে পারবে?'

সরস্বতী বাঈয়ের মুখ আবারও বিবর্ণ হয়ে ওঠে।

তবু সে গলায় জোর দিয়ে বলে, 'মন্‌সবদারী দিতে পারব না—অন্তত এখন পারব না—কিন্তু বাকীগুলো চেষ্টা করলে হয়ত হ'তে পারে। শাহ্‌জাদার ধনী বন্ধু-বান্ধবের এখনও একেবারে অভাব হয় নি।'

'শীগ্‌গিরই হবে। আওরঙ্গজেব বাদশাকে তোমরা এখনও চেন নি। যাদের প্রাণ নেবেন তিনি ঠিক করেছেন তাদের কেউ বাঁচাতে পারবে না—বিবিজান, মুরাদের আয়ুসূর্য আর সৌভাগ্যসূর্য দুই-ই অস্ত গেছে ধরে নিতে পারো। ওর উপকার যে করতে যাবে তারও বিপদ হবে। তার চেয়ে সময় থাকতে সরে পড়ো—এখনও সুযোগ আছে, অন্য লোক ধরো।'

সরস্বতী বাঈয়ের দুই চোখ ঝাপসা ক'রে জল ভরে এল।

সে পদ্মের পাপড়ির মত তার দুটি হাত জোড় ক'রে বললে, 'আমি আপনার পায়ে পড়ছি নবী আখ্‌তার। আপনি অন্ততঃ তাঁকে বাঁচবার অবকাশ দিন। তারপর তাঁর অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে।'

মদ্যপানে ঈষৎ আরক্ত চোখ বুঝি জ্বলে ওঠে নবী আখ্‌তারের।

'আমার বাপজানকে যে কুকুরের মত মেরেছিল—তা আমি ভুলব কি ক'রে?'

'আপনার বড় ভাই ভুলেছেন!'

'সে বেইমান।'

'কিন্তু আপনি কি শুধু সেই জন্যই—'

'না স্বীকার করছি, পুরস্কারের লোভও আছে। কিন্তু বাপজানের কথাও ভুলি নি।'

তারপর যথাসাধ্য দুই চোখ বিস্ফারিত করে নবী আখ্‌তার বললে, 'কিন্তু তুমি ভাবছ কেন পিয়ারী? তোমারই বা অত মাথাব্যথা কেন? তোমার রূপ-যৌবন এখনও যথেষ্ট আছে। তোমার আশ্রয়ের অভাব হবে না।'

সরস্বতী বাঈয়ের দুই কানে কে যেন আগুন ঢেলে দিলে। মুখ হয়ে উঠল সিঁদুরের মত লাল। সে চোখ নামিয়ে নিলে লজ্জায়।

নবী আখ্‌তার এইবার সোজা হয়ে বসল।

'এক শর্তে আমি রাজী হতে পারি ক্ষতিপূরণে।'

আশায়, আনন্দে একমুহূর্তে যেন নানা বর্ণের রামধনু খেলে গেল সরস্বতী বাঈয়ের মুখে। 'বলুন জনাব? কী শর্ত?'

'ক্ষতিপূরণে রাজী হবার ক্ষতিপূরণও একটা চাই। সেটা এখনই দিয়ে যেতে হবে—এই মুহূর্তে!'

মাথা থেকে শিরদাঁড়া বেয়ে কি তুষার নেমে যায় সরস্বতী বাঈয়ের?

সে বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে থাকে। অর্থটা বুঝেও যেন বুঝতে পারে না।

'ভেবে দ্যাখো—আওরঙ্গজেবের বিদ্বেষ মাথা পেতে নিতে হবে। তার ফল শেষ পর্যন্ত নিশ্চিত মৃত্যু। কিন্তু তোমার জন্য আমি সে ভয়ও মাথা পেতে নিতে পারি। তুমি—তুমি এইবার শুধু প্রসন্ন হও সরস্বতী বাঈ!'

নবী আখ্‌তার উঠে দাঁড়াল। সুরার নেশা ও রূপের নেশা তাকে উন্মত্ত ক'রে তুলেছে। সে ভুলে গেল তার অভিনয়। আরও দু পা এগিয়ে এসে দাঁড়াল একেবারে সরস্বতী বাঈয়ের সামনে।

অকস্মাৎ সরস্বতী বাঈয়ের ঝাপ্‌সা স্মৃতির রুদ্ধ দুয়ারে মাথা-খোঁড়া বন্ধ হয়। সে কপাট খুলে যায় সর্বনাশের দমকা হাওয়ায়।

এ কে? এ কে?

এ তো নবী আখ্‌তার নয়! এ যে—এ যে মীর সফি খাঁ!

'কী—কী চান বলুন।' ভগ্ন স্খলিত কণ্ঠ থেকে কোনমতে বেরিয়ে আসে কথাগুলো।

'তোমাকেই চাই। এখনই। দ্যাখো—এই একমাত্র শর্ত।'

সরস্বতী বাঈ বললে, 'আপনিই কিছু আগে বলেছেন যে ইজ্জৎ ছাড়া সব কিছু দেওয়া যায়।'

হো হো ক'রে হেসে ওঠে মীর সফি খাঁ, 'নাচউলীর আবার ইজ্জৎ! হাসালে বাইজী।'

সরস্বতী বাঈ এতক্ষণ হাঁটু গেড়ে বসেছিল, এইবার সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। বললে, 'আমি হিন্দুর মেয়ে মীর সফি খাঁ। যাকে একবার মনে মনে কামনা করি তাকেই স্বামী ব'লে আমরা জানি। শাহ্‌জাদা মুরাদের বীরমূর্তি দেখে বিচলিত হয়েছিলাম—সেই দিন থেকেই তিনি আমার স্বামী। তিনি আমাকে বাঁদী বলেই

জানেন, কিন্তু আমার কাছে তিনি স্বামী। তাঁকে যে দেহ দিয়েছি সে দেহ আর কাউকে দিতে পারব না সফি খাঁ। ক্ষমা করবেন।'

লোভে লালসায় মীর সফি খাঁর আরক্ত চোখ দুটি জলজল করছিল। সে বললে, 'ছাখো—আমি জোর করতে চাই না। এই আমার শর্ত। তোমার পেয়ারের মুরাদকে যদি বাঁচাতে হয় তো এই দামই দিতে হবে। বেছে নাও—কী চাও।'

সরস্বতী বাঈ দুহাত তুলে নমস্কার করলে ওকে। তারপর বললে, 'বুঝলাম, অদৃষ্টই বলবান। মাফ করবেন মীর সফি খাঁ—অনেকটা সময় নষ্ট করলাম।'

দ্রুতপদে—একরকম ছুটেই বেরিয়ে গেল সফি খাঁর বাড়ি থেকে সে। কে জানে লম্পটের লুব্ধ লালসা কতদূর নিচে নামবে!

ছুটতে ছুটতেই দীর্ঘ পথ অতিক্রম ক'রে সরস্বতী বাঈ প্রায় শেষরাত্রে দুর্গদ্বারে পৌঁছল। ঢুকতে চায় সে। যদি বাঁচাতে না-ই পারে মুরাদকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সুধাপাত্রকে সত্যকার সুধাপাত্র ক'রেই তাঁর মুখের সামনে ধরে রাখবে।

কিন্তু কেল্লায় ঢুকতে দেওয়া হবে না আর তাকে। দ্বাররক্ষীরা তাকে জানিয়ে দেয়।

ঢুকতে দেওয়া হবে না? তার মানে? তার মানে কি?

পাগলের মত বার বার প্রশ্ন করে সরস্বতী বাঈ।

উত্তর আসে, স্বেচ্ছায় সে বেরিয়ে গেছে। আর তাকে এখন ঢুকতে দেওয়া যায় না। বিশেষ বন্দীর কাছে তো যেতে দেওয়া যায়ই না। বন্দীর সঙ্গে বাইরের লোকের কথা চালাচালি করার জন্য মুরাদকে এত সতর্কতার সঙ্গে বন্দী ক'রে রাখা হয় নি। সেটা বুঝেই বাইরে যাওয়া উচিত ছিল সরস্বতী বাঈয়ের। বাদশার কানে কথাটা উঠলে ওদের সকলের গর্দান যাবে যে!

'বেশ, তাহ'লে অন্তত একবার সুবাদার খাঁর কাছে নিয়ে চলো।'

'হুকুম নেই।'

'একবার তাঁকে ডাকো। আমি একটু তাঁর কাছে আর্জি করি।'

'হুকুম নেই। তিনি ঘুমোচ্ছেন। তা ছাড়া জেগে থাকলেও দেখা করতেন না।'

অনুনয় বিনয়—শেষে সরস্বতী বাঈ নিজের গা থেকে অলঙ্কার খুলে সামনে ধরলে।

রক্ষীদের সর্দার জিভ কেটে বললে, 'না, বিবিজান। তা হ'লে আমাদের গর্দান যাবে। প্রাণই যদি না থাকে, টাকা নিয়ে কি করব?'

এইবার সত্যিই সরস্বতী বাঈ চোখে অন্ধকার দেখলে।

সে চেনে সুবাদার খাঁকে। শাহ্‌জাদা মুরাদ সরস্বতী বাঈকে বাইরে পাঠিয়ে পালাবার চক্রান্ত করছিলেন—সুবাদার খাঁর হুঁশিয়ারিতেই তা ব্যর্থ হয়েছে। এই খবরটি দিল্লীতে পাঠাতে পারলেই মোটা ইনাম!

নিজের হাতের কঙ্কণ, নিজেই কপালে ঠোকে সে।

সর্বনাশ, শুধু সর্বনাশই সে দু'হাতে বিলিয়ে যাচ্ছে চারিদিকে। যে যে তাকে ভালোবাসে তারই সর্বনাশ হয়েছে! ঐ সফি খাঁ—তারও তো সর্বনাশ করেছে সে-ই। ও যে আজ এত নিচে নেমেছে—সে তো তারই রূপের নেশায় উন্মত্ত হয়ে!

কী জীবনই সে পেয়েছিল বিধাতার কাছে!

সর্দারের কাছে গিয়ে মিনতি করে, 'আচ্ছা, শাহ্‌জাদাকে কি বলা হয়েছে জানো খাঁ সাহেব?'

খাঁ সাহেব হাসল। বললে, 'জানি। বলা হয়েছে তাঁর দিন ফুরিয়েছে ব'লেই তুমি তাঁকে ত্যাগ ক'রে পালিয়েছ!'

ঘৃণায়, ক্ষোভে শিউরে কেঁপে উঠল সরস্বতী বাঈ।

'খাঁ সাহেব—তোমরা এতজন, সশস্ত্র। একবারটি আমাকে শাহ্‌জাদার কাছে নিয়ে যেতে পারো না? দূর থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসব শুধু।'

'ও আশা ত্যাগ করো বিবি সাহেব। এ জীবনে আর দেখা হবে না। মুরাদ জীবিত অবস্থায় এ কেল্লা ত্যাগ করবেন না। হয়ত মরবার পরও না, এখানেই মাটি দেওয়া হবে।'

সরস্বতী বাঈ পাগলের মত ছুটে সরে এল সেখান থেকে।

আর সে শুনতে পারবে না। পারবে না।......

ঊষার রক্ত-রাগে তখন গোয়ালিয়র কিল্লার লাল পাথরগুলো আরও নিষ্ঠুর দেখাচ্ছে।

নিচের দিকে চেয়ে দেখলে সরস্বতী বাঈ। গভীর পরিখার অতল অন্ধকারে হয়ত আছে শান্তি, আছে বিশ্রাম। রহস্যময় গভীর অন্ধকার।

সামান্য উঁচু প্রাচীরের মত ব্যবধান—অনায়াসেই লাফ দিয়ে পড়া যায়।

আর ভাবতে পারলে না সে। আর সে পারছে না! শান্তি চাই তার, শান্তি! গোবিন্দজী, তুমি তো প্রেমের ঠাকুর, তুমি অপরাধ নিও না প্রভু!

'শাহ্‌জাদা, বিদায়। আগে গিয়ে অপেক্ষা করবে তোমার বাঁদী।'

অস্ফুট স্বরে আরও কী যেন বললে সরস্বতী বাঈ। বুঝিবা যে সব প্রিয় নামে সে ডাকত মুরাদের কানে কানে—তারই দু'একটি উচ্চারণ করলে, তারপর

ঝাঁপ দিয়ে পড়ল—সেই গভীর কালো অনিশ্চিত অন্ধকারের মধ্যে।

মুরাদকে সত্যিই তাই বলা হয়েছিল।

সরস্বতী বাঈ তাঁকে ত্যাগ ক'রে গেছে। তাঁর মন্দ ভাগ্যের ভারী পাথর টেনে সে আর বেড়াতে চায় না। সুখের কবুতর গেছে সুখের সন্ধানে।

কিন্তু শাহ্‌জাদা মুরাদ তা বিশ্বাস করেন নি।

তিনি চেনেন সরস্বতী বাঈকে।

সুবাদার খাঁর দিকে চেয়ে থুতু ফেলেছিলেন তিনি। ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলেছিলেন, 'হয়ত তোমার কন্যা বা ভগ্নী হ'লে তা সম্ভব সুবাদার খাঁ। বেইমানের রক্ত তোমার। সরস্বতী বাঈ ভিন্ন ধাতুতে গড়া। সে সুখের জন্য আমার সঙ্গে স্বেচ্ছায় কারাবাস করতে আসে নি। তোমরা আরও বেশি যন্ত্রণা দেবার জন্যই তাকে কোথায় সরিয়েছ—'

অপমানে কিল্লাদারের কর্ণমূল পর্যন্ত লাল হয়ে উঠেছিল, কিন্তু তবু অভ্যাস-বশতই বিনয় ক'রে বললে, 'আমি আপনাকে কেমন করে বোঝাব শাহ্‌জাদা যে সে স্বেচ্ছায়—'

'ব্যস্!···বেইমান, চুপ! আমি বাঁচব সুবাদার খাঁ—শুধু সরস্বতী বাঈকে উদ্ধার করবার জন্যই বাঁচব। দরকার হয় তো—দরকার হয় তো ঐ নবী আখ্‌তারের কাছে হাতজোড় ক'রে ভিক্ষা চাইব। সম্রাট শাহ্‌জাহানের ছেলেকে সে এটুকু না দিয়ে পারবে না।'

সুবাদার খাঁ একটু হেসে চলে গিয়েছিলেন।

সারারাত ঘুমোতে পারলেন না মুরাদ। অস্থির হয়ে পায়চারি করলেন। খাদ্য-পানীয় সব থরে থরে সাজানো রইল।

এতকাল পরে সরস্বতী বাঈ কি তাঁকে সত্যিই ত্যাগ করলে!

না, না—তা সম্ভব নয়! তিনি জানেন তা সম্ভব নয়!

তবু যেন কী এক দারুণ সংশয় সর্বাঙ্গে আগুনের জ্বালা ধরায়। নিজের আঙুল নিজেই কামড়ে রক্ত বার করেন মুরাদ।···

দুর্ভাগ্যের শেষপ্রান্তে পৌছবার পর বুঝি খোদাতালার দয়া হ'ল ওঁর ওপর।

ভোরবেলা চাকর এসে জানাল, সরস্বতী বাঈ গড়ের পরিখাতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। শাহ্‌জাদা কি তার মৃতদেহ দেখতে চান?

আঃ! কী শান্তি!

মুরাদ এত শান্তি বহুদিন অনুভব করেন নি।

'হ্যাঁ চাই। ওরে, নিয়ে আয়, নিয়ে আয় তাকে!'

রক্তাক্ত দলিত মাংসপিণ্ড মসলিনের ওড়না মুড়ে এনে নামিয়ে রাখলে ওরা। মুরাদ ইঙ্গিত করলেন সবাইকে সরে যেতে।

'অত সুন্দর মুখ তোমার, এ কী করেছ পিয়ারী? ধুলোতে রক্তেতে চুলে যে জট পাকিয়ে গেছে!'

নিজের রুমাল সুরায় ডুবিয়ে শুভ্র সুন্দর ললাট মুছে দিলেন, আঙুল দিয়ে চুলগুলো সাজিয়ে ঠিক ক'রে দিলেন।

তারপর বহুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মাথা নামিয়ে এনে ওর মৃত্যু-হিম ওষ্ঠাধরে একটা চুম্বন ক'রে বললেন, 'তুমি আমাকে বাঁচিয়ে দিলে পিয়ারী। আমাকে মুক্তি দিয়ে গেলে। তুমি জান না, তুমি আমার কী মহৎ উপকার করলে। এ জীবনে আর কোন বন্ধন, কোন আকর্ষণ রইল না।… ছেলেমেয়ে? খোদাতালা তাদের দেখবেন!'

ওড়নাটা সযত্নে টেনে দিয়ে পাশে বসে দীর্ঘদিন পরে নমাজ পড়লেন মুরাদ।

সুবাদার খাঁ প্রহরী-পরিবেষ্টিত হয়ে এসে ঢুকলেন এ মহলে।

'শাহ্‌জাদা মুরাদ, চার বছর আগে আপনারই উজীর বক্সী আলি নকীকে আপনি বিনা অপরাধে হত্যা করেছিলেন। অন্তত সেই মর্মেই অভিযোগ এনেছে তাঁর পুত্র নবী আখ্‌তার। নবী আখ্‌তার গোয়ালিয়রের প্রধান ধর্মাধিকরণে নালিশ করেছে। কাজী এসেছেন এখানে—সে অভিযোগের বিচার করতে। দুর্গের মধ্যেই বিচারালয় বসেছে। আপনার প্রতি কোন অবিচার বা অন্যায় হয় সেটা কাজী সাহেব চান না। আপনাকে তাই তিনি তাঁর সালাম জানিয়ে বলেছেন যে আপনি যদি দয়া ক'রে তাঁর সামনে গিয়ে আপনার পক্ষে কী বলবার আছে বলেন, অর্থাৎ অভিযোগের জবাব দেন তো ন্যায়-বিচারের সুবিধা হয়।'

মুরাদ পাষাণের মত ভাবলেশহীন মুখে সব শুনলেন, তারপর বললেন, 'না।'

'তার মানে? আপনি যাবেন না কাজীর কাছে? কিন্তু তার অর্থ কি জানেন?'

'জানি কিল্লাদার। তুমিও জানো। সুতরাং এ প্রহসনের প্রয়োজন কি?'

তারপর একটু থেমে পিছনদিকে কি যেন তাকিয়ে দেখলেন। হয়ত বা ওপাশে চাদরে ঢাকা একটি মৃতদেহের দিকেই। তারপর মাথা উঁচু ক'রে দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'আমার ভাই আল্লার নামে শপথ ক'রে আমাকে যে আশ্বাস আর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা তিনি ভঙ্গ করতে চান করুন। তিনি আমার প্রাণ

নিতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন যখন, তখন তা তিনি নেবেনই। আর তা না হ'লেও সামান্য প্রাণের জন্য আমি গিয়ে বান্দার বান্দা নবী আখ্তারের সামনে দাঁড়াব না। তোমাদের যা খুশী করতে পারো।'

সুবাদার খাঁ খানিকটা নতমুখে দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেলেন।

আবার মহলের লৌহদ্বারে তালা পড়ল।

নীরব হ'ল বন্দীশালা।

শাহ্জাদা মুরাদ ফিরে এসে সরস্বতী বাঈয়ের মৃতদেহের সামনে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখ উজ্জ্বল ও প্রসন্ন হয়ে উঠেছে।

খুব সন্তর্পণে ওর মুখের ওড়নাটা সরিয়ে সস্নেহে তাকিয়ে বললেন, 'আমিও আসছি পিয়ারী, আর দেরি নেই।'

* * *

সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা—গোয়ালিয়র দুর্গের প্রহরীরা পরিখার মধ্যে একটা কি ভারী জিনিস পড়বার শব্দ শুনে সচকিত হয়ে উঠেছিল। লোকজন ছুটোছুটি ক'রে মশাল আনলে, দুর্গের ফটকে ডবল পাহারা বসল। ছুটে এলেন কিল্লাদার। কিন্তু দেখা গেল কোন দুশমন আসে নি—ষড়যন্ত্রও কিছু নয়। কে একটা লোক পরিখার মধ্যে পড়ে গেছে। একজন বললে—লোকটা নাকি বিকেল থেকেই ঘোরাঘুরি করেছে ওখানে, কী সব জিজ্ঞাসা করেছে লোকজনকে। কেমন যেন পাগলের মত ভাবভঙ্গী। পাগল বা মাতাল ভেবেই ওরা ততটা গ্রাহ্য করে নি। অন্ধকার হতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। হয়ত আত্মহত্যাই করতে চেয়েছিল সে।

লোকজন আবারও নামল, আবারও তুলল মৃতদেহটা—যেমন সেদিন ভোরে সরস্বতী বাঈয়ের দেহ তুলেছিল।

কিন্তু লোকটাকে চেনা গেল না—নিচের একটা পাথরে লেগে মুখখানা একেবারে ছেঁচে গিয়েছে।

আশ্চর্য, প্রহরীরা বলাবলি করতে লাগল, ঠিক সরস্বতী বাঈ যেখানে পড়েছিল এ লোকটাও সেইখানেই পড়েছে! বিচিত্র যোগাযোগ!

তখনও ভাল করিয়া ভোর হয় নাই। গঙ্গার উপরে প্রথম শীতের ধোঁয়াটে কুয়াশা জমিয়া সামনেটা আগাগোড়া যেন একটা আব্‌ছায়ায় ঢাকিয়া রাখিয়াছে, ওপারের 'বাস'-এর আড্ডাটা পর্যন্ত দেখা যায় না! কিন্তু অত সকালেই সর্বেশ্বর দোকানের ঝাঁপ খুলিয়া দেখিল, কাশীনাথ তাহার উনানটায় ঠেস দিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া আছে।

খেয়াঘাটের উপর সর্বেশ্বরের পরোটার দোকান এ অঞ্চলে বিখ্যাত। দুই-এক প্রকার মিষ্টান্ন এবং চায়ের উপকরণও যদিচ সর্বদা মজুত থাকিত, তথাপি পরোটাই তাহার দোকানের সর্বপ্রধান পণ্য। অদূরে স্টেশন এবং বাসের আড্ডা, ওপারেও তিন-চারিটি লাইনের বাস আসিয়া জমা হয়, এপারের রেল-লাইনের যাত্রীদের নিজ-গ্রামে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য। সুতরাং খাবারের চাহিদা বেশী বলিয়া সর্বেশ্বর একটু সকাল করিয়াই দোকান খুলিত, ওধারেও অনেক রাত্রি পর্যন্ত তাহাকে দোকান খুলিয়া রাখিতে হইত। দোকান আরও কয়েকটি আছে—খাবার, মনোহারী, পানবিড়ি, মুড়ি-বাতাসা-অভাব কিছুরই নাই। কিন্তু খদ্দের সর্বেশ্বরেরই এখনও পর্যন্ত বেশি, আর সেইজন্যই তাহাকে ভোর থাকিতে দোকান খুলিতে হয়।

কিন্তু কাশীনাথকে অত ভোরে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সর্বেশ্বর একটু আশ্চর্য হইয়া গেল। সে হাঁকিয়া প্রশ্ন করিল, 'ব্যাপার কি হে কাশীনাথ, এত ভোরেই উঠেছ যে?'

বাসী উনান নিভিয়া গেলেও তখনও তাহার উষ্ণতা সম্পূর্ণ যায় নাই, তাহাতেই ঠেস দিয়া আরামে কাশীনাথের একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। সে চমকিয়া চোখ মেলিয়া সর্বেশ্বরকে দেখিতে পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর প্রচণ্ড একটা হাই তুলিয়া কহিল, 'তাড়াতাড়ি উনুনটা ধরাও দেখি, একটু চা পেটে না পড়া পর্যন্ত শরীরটা জুৎ লাগছে না! কাল রাত্রে খাই নি কিছু, দেহ যেন ঝিম্‌ঝিম্ করছে।'

বিস্মিত হইয়া সর্বেশ্বর কহিল, 'কেন, কাল কিছু খাও নি কেন?'

ঈষৎ লজ্জিতভাবে হাসিয়া কাশীনাথ জবাব দিল, 'কাল সুভাষবাবু 'বন্দীমুক্তি-দিবস' বলে হরতাল পালন করতে বলেছিলেন, সে কথাটা মনে ছিল না। যেমন বেরুই অন্যদিন, কালও বেরিয়েছিলুম। হঠাৎ দুপুরবেলা মনে পড়ল। তাই কাল আর কিছু খেলুম না!'

সর্বেশ্বর আর প্রশ্ন করিল না। কারণ কাশীনাথের এ পাগলামির কথা এখান-

কার সকলেই জানিত। জঙ্গীপুরের দিকে কোথাও কাশীনাথের বাড়ি এবং সে ভদ্রসন্তান—একথা কেমন করিয়া এখানে প্রচারিত হয় তাহা জানা নাই, তবে এখানে সে একদিন সহসাই আসিয়াছিল। শোনা যায় তাহার পিতা এখনও জীবিত আছেন এবং তাঁহার অবস্থাও খুব খারাপ নয়। তিনি কী একটা সরকারী চাকরি করিতেন, সেই সূত্রেই কোন স্বদেশী মকদ্দমায় তাঁহাকে কয়েকটি ছেলের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে হইয়াছিল। সেই ক্ষোভে কাশীনাথ বাড়ি ছাড়িয়া আসে, আর ফিরিয়া যায় নাই। এখানে সে নানা প্রকারের পণ্য ফেরি করিয়া বেড়ায়। সকালে স্টেশনে খবরের কাগজ ফেরি করে, দ্বিপ্রহরে কোনদিন কাঁচের চুড়ি, কোনদিন বা আম কপি ইত্যাদি সময়োচিত ফসল লইয়া গ্রামের মধ্যে ফেরি করিতে যায়। যেদিন আর কিছু পায় না সেদিন সাড়ে বত্রিশ ভাজা তৈয়ারি করিয়া ফেরি করে।

লেখাপড়া ভাল জানিত না সত্য—কিন্তু খবরের কাগজটি সে প্রত্যহ মন দিয়া পড়িত এবং গ্রাম হইতে ফিরিয়া প্রত্যহ বহু রাত্রি পর্যন্ত সর্বেশ্বরের দোকানে বসিয়া কংগ্রেস ও দেশের খবর লইয়া আলোচনা করিত। অন্য দোকানদাররা কেহ বা সে সব কথা বুঝিত, কেহ বা বুঝিত না, কেহ হয়ত বিদ্রূপও করিত। কিন্তু কাশীনাথের উৎসাহ তাহাতে কিছুমাত্র কমিত না।

সেদিনও সে দমিল না, সর্বেশ্বরকেই উদ্দেশ করিয়া বলিয়া চলিল, 'কথাটা তো সোজা নয়, এতগুলো লোকের জীবন-মরণের কথা, ওঁরা যা বলবেন আমরা যদি তা অক্ষরে অক্ষরে না মানি—তাহলে ওঁদের কথায় কাজ হবে কেন? সরকার ওঁদের কথা শুনবেন কেন?'

সর্বেশ্বর তখন উনানে আগুন দিতে ব্যস্ত, সে কথার জবাব দিল না। খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া কাশীনাথ আবারও বলিল, 'দেশের পরিস্থিতিটা কি রকম দাঁড়িয়েছে একবার ভাব দিকি সর্বেশ্বরদা, না না, দেশ তো শুধু আমাদের এইটুকু নয়, সারা ভারতের কথা আমাদের ভাবতে হচ্ছে যে!'

'পরিস্থিতি' কথাটা সে সম্প্রতি খবরের কাগজ হইতে শিখিয়াছে, প্রায়ই ব্যবহার করে। কিন্তু ইহাতেও সর্বেশ্বরের নিকট হইতে কোন উত্তর পাওয়া গেল না। কাশীনাথ অবশ্য উত্তরের জন্য বিশেষ ব্যস্তও ছিল না; সে একটু দম লইয়া আরও কিছু বলিবার যোগাড় করিতেছে, এমন সময় বিড়িওয়ালা দাশু আসিয়া পড়িল। সেও কাশীনাথকে দেখিয়া একটু বিস্মিত হইল, কহিল, 'আরে কাশীদা যে, এত ভোরে?'

সর্বেশ্বর মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, 'কাল কিসের হরতাল ছিল, সে কথা ভুলে গিয়ে গাঁয়ে বেরিয়েছিলেন, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যে উনি

কাল সারারাত উপোস দিয়েছেন।'

সাধারণত কাশীনাথকে কেহ ঘাঁটায় না; কিন্তু সেদিন দাশুর কি দুর্মতি হইল, সে সহসা বলিয়া ফেলিল, 'আচ্ছা কাশীদা, ভুল হয়েছিল ভুলই হয়েছিল, লোকে কথায় বলে অজান্তে সাপের বিষ খেলেও দোষ হয় না, তার জন্যে সারারাত উপোস দিয়ে কি লাভটা হল শুনি? তোমার উপোসেই ভারত স্বাধীন হবে কি?'

দেখিতে দেখিতে কাশীনাথের মুখের চেহারা ভীষণ হইয়া উঠিল। সে খানিকটা আগাইয়া গিয়া কহিল, 'ন্তাখ্‌ দেশো, এই রকম বুদ্ধি না হলে কি চিরজীবন বিড়ি পাকাতে হয়? ভুল! ভুল হয় কেন? কই খেতে তো ভুল হয় না, ঘুমোতেও ভুল হয় না! এ কত বড় পাপ জানিস? এত বড় একটা দেশের কাজে ভুল হওয়া যা, মাতৃশ্রাদ্ধে ভুল হওয়াও তাই। তোদের আর কি, পেট পুরে খালি—খেতেই শিখেছিস—অমন একটা দিন গেল কাল, তা একদিনের জন্যে, এক বেলার জন্যেও দোকান বন্ধ দিতে পারলি না! তোদের মুখ দেখতে আছে! জানিস তারা আজ ক'দিন উপোস ক'রে আছে? ছিঃ ছিঃ, তোদের সংসর্গ মহাপাপ।'

কাশীনাথ কথা কহিতে কহিতে যেন আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল, সে অকস্মাৎ তর তর করিয়া গঙ্গার পাড় বাহিয়া নিচে নামিতে লাগিল। সর্বেশ্বর পিছন হইতে ডাকিয়া কহিল, 'কাশীনাথ, চললে কোথায়, চায়ের জল বসাচ্ছি যে, খেয়ে যাও—'

পিছন না ফিরিয়াই কাশীনাথ জবাব দিল, 'আমার চায়ের দরকার নেই।' এবং পরক্ষণেই গায়ের র‍্যাপারটা চড়ায় খুলিয়া রাখিয়া একেবারে ঝাঁপাইয়া পড়িল গঙ্গার জলে।

সর্বেশ্বর দাশুকে বকিতে লাগিল, 'জানিস তো অমনি আস্ত পাগল ও, খামকা কেন ঘাঁটাতে গেলি, একে কাল সারারাত উপোস ক'রে আছে, আবার ভোর-বেলাই নামল ঠাণ্ডাজলে,—অসুক-বিসুক ক'রে না পড়ে!'

দাশু অপ্রতিভ হইয়া কহিল, 'সামান্য একটা কথাতেই যে অত ক্ষেপে যাবে কেমন ক'রে জানব বলো!'

কাশীনাথ স্নান করিয়া ভিজা গায়ে ভিজা কাপড়েই গায়ের কাপড়টা হাতে করিয়া বাড়ি ফিরিল। স্টেশনের পোর্টার নন্দ বৈরাগীর বাড়ির বাহিরের চালাটায় সে থাকে এবং দুই বেলা নন্দর বাড়িতে খায়। এই বাবদ কোনদিন সে দশ পয়সা কোনদিন বা তিন আনা নগদ খরচা দেয়। নন্দ বৈরাগীর স্ত্রী প্রথম প্রথম ভদ্রসন্তানকে ভাত রাঁধিয়া দিতে রাজী হয় নাই, কিন্তু কাশীনাথের জেদে নন্দ

শেষ পর্যন্ত তাহাকে রাজী করাইয়াছিল। নিয়মিত খরচা ছাড়াও নন্দ মধ্যে মধ্যে ধার বলিয়া কাশীনাথের নিকট হইতে কিছু কিছু পয়সা লইত, কিন্তু সে কথাটা কাশীনাথের পরের দিন পর্যন্ত কখনই মনে থাকিত না এবং নন্দও তাহা মনে করাইয়া দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিত না।

কাশীনাথ যখন বাড়ি ফিরিল তখন নন্দর স্ত্রী পারুল উঠান লেপিতেছিল, আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ছোটবাবু এত ভোরেই নেয়ে এলে যে ?'

কাশীনাথ পারুলকে 'বৌ' বলিয়া ডাকিত, পারুল বলিত 'ছোটবাবু'। উভয়েই প্রায় সমবয়সী বলিয়া পারুল তাহার সহিত কথা কহিত, হাসিঠাট্টাও করিত। কাশীনাথের কাছ হইতে জবাব না পাইয়া পারুল পুনশ্চ প্রশ্ন করিল, 'ব্যাপার কি ছোটবাবু, এই শীতে ভোরবেলাতেই নেয়ে এলে ?'

কাশীনাথের ততক্ষণে মাথা অনেক ঠাণ্ডা হইয়া আসিয়াছে ; সে মাথা চুলকাইয়া জবাব দিল, 'এমনিই। দেশোর সঙ্গে রাগারাগি ক'রে গঙ্গায় নেমে গেলুম।'

পারুল হাসিয়া কহিল, 'দাশুর সঙ্গে রাগারাগিটা আবার কিসের ? গান্ধী, না সুভাষ বোস ?'

কাশীনাথের কৃপায় এ নামগুলি ইহাদের সকলেরই প্রায় কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু কাশীনাথ রাগ করিয়া কহিল, 'ত্যাখো বৌ, খবরদার ওঁদের নাম নিয়ে ঠাট্টা ক'রো না বলে দিলুম। জিভ খসে পড়বে।'

সে মাথাটা আর ভাল করিয়া না মুছিয়াই ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। পারুল তাহার ভাবগতিক দেখিয়া আপন মনে মুখ টিপিয়া হাসিল, তারপর বালতির জলে হাতটা ধুইয়া আঁচলে মুছিতে মুছিতে কাশীনাথের ঘরের দাওয়ায় উঠিয়া কহিল, 'কাল থেকে তো দাঁতে দাঁত দিয়ে রয়েছ, তা সকালে বাইরে গিয়ে খেয়েছিলে কিছু, না শুধু ঝগড়াই ক'রে এলে ?'

কাশীনাথ মুখ ভার করিয়া শুইয়া রহিল, কথার জবাব দিল না। তখন পারুলই আবার কথা কহিল, 'ও কর্ম হয় নি—যা বুঝছি। তা এখন এক কাজ করো না, বাইরের প'ড়ো-উনুনটা জ্বেলে নিজেই একটু চা তৈরী ক'রে খাও না। হাঁড়ির মধ্যে চারটি মুড়কিও আছে বোধ হয়—'

কাশীনাথ মুখ ভার করিয়া কহিল, 'আমার দরকার নেই মুড়কি খাবার !'

পারুল হাসিয়া বলিল, 'আছে আছে। ওঠ দিকি নি, আমার ঘাট হয়েছিল গান্ধীর নাম করায়। এই নাক কান মলছি—'

অগত্যা কাশীনাথ উঠিল, কিন্তু তখনই উনান ধরাইতে গেল না, দাওয়ায় দাঁড়াইয়া কহিল, 'কোথায় পাতা, কোথায় কি, ওসব বড় ঝঞ্ঝাট, থাক না বৌ—'

পারুল ততক্ষণে নারিকেল পাতা আনিয়া হাজির করিয়াছে। সে কহিল, 'ঝঞ্ঝাট তো আমি সেরেই দিলুম, শুধু কলসী থেকে একটু জল ঢেলে নিয়ে চাপিয়ে দেবে, তাতেই এত ?'

তাহার পর মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, 'ওইজন্তেই তো বলি, ঝঞ্ঝাট পোয়াবার লোক একটা যোগাড় ক'রে ফেল। তা তো শুনবে না ; এমন অনিয়ম অনাচারে ক'দিন শরীর টিকবে—তাই শুনি ?'

কাশীনাথ তখন দেশলাইয়ের আগুনে পাতা ধরাইতেছিল, জবাব দিল না। তা ছাড়া এ কথাটাও বহু পুরাতন, বিবাহের বিরুদ্ধে যত ভাল ভাল যুক্তি ছিল কাশীনাথ সবই শেষ করিয়াছে, কিন্তু ফল হয় নাই।

পারুলও অবশ্য কোন জবাব আশা করে নাই, সে তাড়াতাড়ি উঠানের বাকী কাজটুকু সারিয়া, গোরুর ডাবায় চারটি খড় ঢালিয়া দিয়া তাহার উপর সামান্য একটু খইলের জল ছিটাইয়া দিল, তাহার পর বাঁশের আল্‌না হইতে গামছাটা টানিয়া লইয়া গঙ্গায় চলিয়া গেল।

স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিল কাশীনাথ কলাইয়ের বাটিতে চা ও কাপড়ের খুঁটে মুড়কি ঢালিয়া লইয়া খাইতে বসিয়াছে। সে কহিল, 'তোমার গাড়ির যে পাখা পড়েছে ছোটবাবু, কাগজ আনতে যেতে হবে না ?'

কাশীনাথ নিরাসক্তভাবে মুড়কি চিবাইতে চিবাইতে কহিল, 'যাবই এখন। না-হয় মাস্টার কাগজের বাণ্ডিলটা ঘরে তুলে রাখবে—মানুষের দেহ তো, বারো মাস সমান বয় কি ?'

পারুল আর কথা কহিল না, গুন্‌গুন্ করিয়া কি একটা স্তব গাহিতে গাহিতে ঘরে কাপড় ছাড়িতে ঢুকিল। কাশীনাথ বাহির হইতে হাঁকিয়া কহিল, 'বৌ, তোমার জন্যেও এক বাটি চা ক'রে গরম উহুনের ওপরে বসিয়ে রেখেছি, কাপড়টা ছেড়ে মুখে দিয়ে ফ্যালো—'

'মাইরি!'

বলিয়া ফেলিয়াই পারুল বোধ করি লজ্জিত হইল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, 'ঐ জন্যেই তো বৈরিগীকে বলি যে মনের মানুষ তো আমার ছোটবাবু, এমন মন বুঝে কাজ আর কেউ করে না। শীতে কাঁপতে কাঁপতে চায়ের কথা ভাবতে ভাবতেই আসছিলুম ছোটবাবু—'

কাশীনাথ জবাব দিল না, অন্যমনস্ক ভাবে কি একটা ভাবিতে লাগিল। পারুল কাপড় ছাড়িয়া ভিজা চুলটা পিঠে ছড়াইয়া উনানের ধারেই চা খাইতে বসিল। দুই-এক চুমুক দিয়া কহিল, 'ছোটবাবু, আমার একটা কথা রাখবে ?'

কাশীনাথ এই শ্রেণীর অনুরোধে কোনদিনই খুশী হইত না, সেদিনও ভ্রূকুটি করিয়া কহিল, 'কি কথা?'

পারুল বলিল, 'বাব্‌বা, যেন তেড়ে মারতে এল!...যাও, তোমাকে কোন কথা শুনতে হবে না।'

কাশীনাথ অপ্রতিভ হইয়া কহিল, না না, বলো না কি! আমি এমনি কি একটা কথা ভাবছিলুম।'

পারুল কহিল, 'আমার এক সই থাকে মনোহরপুরে, অনেকদিন তাকে দেখি নি, আমাকে একদিন সেখানে নিয়ে চল না—'

কাশীনাথ প্রবলবেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, 'আমি ও কারুর বাড়ি-টাড়ি যাওয়া পছন্দ করি না।'

পারুল কহিল, 'আহা, তুমি তাদের বাইরের দাওয়াতেই বসে থেকো না হয়, আর আমিও না হয় তাদের বারণ ক'রে দেব যাতে কেউ না তোমার সঙ্গে কথা বলতে আসে। তাহলেই হ'ল তো?...আমি যাচ্ছি তাদের সঙ্গে দেখা করতে, তুমি শুধু সঙ্গে যাবে, তাতে কি আর কারুর বাড়ি যাওয়া বোঝায়?'

কাশীনাথ কহিল, 'না না, সে ভারী বিশ্রী ব্যাপার, হয়ত খেতে বলবে, কিংবা জলখাবার দিতে আসবে, সে ভারি ইয়ে হবে—'

পারুল হাসিয়া কহিল, 'না গো না, কিছু ইয়ে হবে না। না-হয় ভোরবেলা রওনা হবার আগেই তোমাকে এখান থেকে চারটি খাইয়ে নিয়ে যাবো এখন, আবার ফিরে এসে খাবে। তা ছাড়া তারা সব ভদ্দরলোক, তোমার সজাত, কায়েত। আমার সই বটে, কিন্তু আমাদের মতো নয়। আমার বাপের দেশের মেয়ে, একসঙ্গে পাঠশালায় পড়তুম, খুব ভাব ছিল। নিয়ে চল না লক্ষ্মীটি, তোমার পায়ে পড়ি—'

কাশীনাথ নরম হইল বটে কিন্তু মুখ ভার করিয়া কহিল, 'ভদ্দরলোক তো কি হয়েছে? আমার কাছে জাত-টাত নেই, সর্ব ভারতবাসী আমার ভাইবোন।'

কোনমতে হাসি চাপিয়া পারুল কহিল, 'তা বটেই তো, কিন্তু আমাদের ঐ কেমন, ভুল ঘোচে না কিছুতেই—'

এবার রীতিমতো নরম হইয়া কাশীনাথ কহিল, 'কবে যাবে?'

পারুল কহিল, 'ধরো পরশু—'

কাশীনাথ জবাব দিল, 'উঁহু, পরশু সদরে মিটিং আছে, আমাকে যেতেই হবে। বরং তার পরের দিন না হয়—'

পারুল কহিল, 'সেই ভাল। তাহলে তাই ঠিক রইল, কেমন?'

আটটার গাড়ি পাশ করাইয়া মাস্টারের বাড়ির জল যোগান দিয়া নন্দ বাড়ি ফিরিল বেলায়।

পারুল তাহাকে চা ও মুড়ি খাইতে দিয়া একেবারে সোজাসুজি কথাটা পাড়িল, 'হ্যাঁ ত্যাখো, তোমার সেই গো-গাড়িওলা রহিম শেখ মনোহরপুর যাবে আজ-কালের মধ্যে ?'

নন্দ বিস্মিত হইয়া কহিল, 'কেন ?'

মাটির দিকে চাহিয়া পারুল জবাব দিল, 'বুধবার দিন ছোটবাবুকে নিয়ে মনোহরপুর যাব। সইয়ের বাড়ি ও যদি খবরটা দিত তো ভাল হ'ত। কোথাও না চলে-টলে যায়—'

নন্দ বিস্ফারিত নেত্রে কহিল, 'হঠাৎ এতদিন পরে সইকে মনে পড়ল যে ?'

পারুল জবাব দিল, 'সইয়ের মেয়েটি বেশ ফুটফুটে হয়েছে; ওরা গরীব হ'লে কি হয়, জাতে কায়েত তো, টাকা নইলে ওদের ঘরে বিয়ে হয় না—মেয়েটার গতি করতে পারছে না বলে সই সেবার বড় কান্নাকাটি করেছিল। তাই ভাবছি যে, কোনরকমে যদি ছোটবাবুর চোখে-টোখে পড়ে যায় তাহলে ওরও একটা গতি হয়, ছোটবাবুও যা হোক ঘরবাসী হয়।'

নন্দ কিন্তু কথাটায় মোটেই সুখী হইল না, বিরসকণ্ঠে কহিল, 'তোর এ নিয়ে অত মাথা-ব্যথা কেন ?'

পারুল কহিল, 'মাথা-ব্যথা আবার আমার কিসের, তবে মানুষ মানুষের জন্যে কি কিছু করে না ?'

নন্দ রূঢ়কণ্ঠে কহিল, 'না না, ও সব মতলব ছাড়্। ও ছোঁড়া তবু এখানে আছে অনেকটা আমাদের সাশ্রয় হচ্ছে, বিয়ে দিয়ে নিজের ক্ষতি করি কেন ? ও যেমন আছে তেমনি থাক্—'

পারুল মুহূর্তকাল স্তম্ভিত ভাবে স্বামীর দিকে তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, 'আহা, তোমার যা বুদ্ধি! বিয়ে হলেই বা ও যাবে কোথায় শুনি ? এইখানেই থাকবে এখন। ওসব কথা তুমি ভেবো না কিছু, বুধবার আমি যাবই—'

নন্দ অস্ফুটস্বরে স্ত্রীলোকের বুদ্ধি সম্বন্ধে একটা কটূক্তি করিয়া আবার বাহির হইয়া গেল। কিন্তু মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেও মুখে কিছু বলিল না, কারণ পারুলকে সে একটু সমীহ করিয়াই চলিত। একে পারুল পাঠশালায় পড়া মেয়ে, তাহার উপর তাহার মা সৈরভীর হাতে দু'পয়সা আছে বলিয়াই শোনা যায় এবং বলাই বাহুল্য, নন্দ একদিন সে পয়সা পাইবার আশা রাখে।

কাশীনাথ অবশ্য এসব কোন খবরই রাখিত না, এমন কি মনোহরপুর যাইবার কথাটাও সে ভুলিয়া গিয়াছিল। পারুল বুধবার ভোরবেলা উঠিয়া কথাটা স্মরণ করাইয়া দিতে অগত্যা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। বেলা নাগাদ জামার উপরেই কাঁধে একটা গামছা ফেলিয়া খালি পায়ে উঠানে নামিয়া কহিল, 'চল বৌ—'

পারুল কহিল, 'ও কি ছোটলোকের মতো যাওয়া—'

তাহাকে বাধা দিয়া বজ্রকণ্ঠে কাশীনাথ কহিল, 'বৌ, আবার ?'

অপ্রস্তুত হইয়া পারুল কহিল, 'আচ্ছা আচ্ছা, মানলুম না হয় ছোটলোক কেউ নেই, তবু কাঁধে একটা চাদর আর পায়ে একজোড়া জুতো দিতে কি দোষটা হয় শুনতে পাই ঠাকুর ?'

নাটকীয় ভাবে কাশীনাথ কহিল, 'তুমি জান বৌ, আমাদের দেশের কত লোকের গায়ে একটা গেঞ্জি পর্যন্ত জোটে না ? জানলে তুমি এমন কথা বলতে না—'

অসহিষ্ণুভাবে পারুল জবাব দিল, 'উঃ কি জ্বালায় পড়েছি গো, দোহাই তোমার ঘাট মানছি আমি। তুমি দয়া ক'রে জুতোটা পায়ে গলাও—'

কাশীনাথ বিস্মিত হইয়া কহিল, 'তুমি যাচ্ছ সইয়ের বাড়ি, খামকা আমাকে জুতো পরাবার জন্য অত জেদ কেন ?'

'না হয় পরলেই! একটা কথা শুনতে কি হয়েছে ?' পারুল জেদ করিতে থাকে।

অগত্যা শেষ পর্যন্ত কাশীনাথকে জুতা পরিতেই হইল।

দুজনে যখন মনোহরপুরে পৌঁছিল তখন দ্বিপ্রহরের আর বেশী বিলম্ব নাই। কাশীনাথ ক্লান্তভাবে বাহিরের দাওয়াটাতেই বসিয়া পড়িয়া কহিল, 'চট্‌পট্ সেরে নাও বৌ, বেশী দেরি করলে সন্ধ্যার আগে পৌঁছনো যাবে না। আমি এইখানেই রইলুম।'

পারুল প্রতিবাদ না করিয়াই ভিতরে চলিয়া গেল। কাশীনাথও গামছাটা বিছাইয়া দাওয়াটার উপর শুইয়া পড়িল এবং মিনিট খানেকের মধ্যেই তন্দ্রাচ্ছন্ন হইল। সহসা ঘুম ভাঙিল তাহার একটি অত্যন্ত মিষ্টি কণ্ঠস্বরে, 'শুনছেন ? একবার উঠুন না, মাদুরটা পেতে দিই—'

কাশীনাথ চোখ মেলিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখিল, একটি বছর-চৌদ্দ বয়সের সুশ্রী মেয়ে মাদুর হাতে করিয়া তাহাকেই ডাকাডাকি করিতেছে। এইসব ব্যাপারের ভয়েই সে আসিতে চাহে নাই, অত্যন্ত বিরক্তমুখে কহিল, 'না, আমি বেশ আছি।'

মেয়েটিও ছাড়িবার পাত্রী নয় হে। সে মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, 'মাদুরটা

পেতে দিলেই কি খারাপ থাকবেন ?'

কাশীনাথ অপ্রতিভ হইয়া কহিল, 'না, না, ওসব আমি ভালবাসি না—'

মেয়েটি মাদুরটা বিছাইতে বিছাইতে ফোড়ন কাটিয়া কহিল, 'তা হোক—তবু সব মানুষই তো আমাদের ভাই-বোন, আমাদেরও তো উচিত তাদের যত্ন করা। আমরা চুপ ক'রে থাকি কি ক'রে বলুন ?'

তাহার নিজেরই বুলি ওই একফোঁটা মেয়ের মুখে শুনিয়া কাশীনাথ এত বিস্মিত হইল যে আর কথাই কহিতে পারিল না, ধীরে ধীরে মাদুরটা টানিয়া লইয়া তাহার উপরই বসিল।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই মেয়েটি আবার একবার আসিয়া দাওয়ায় সিঁড়ির উপর গাড়ু, গামছা রাখিয়া যাইতে সে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। তাহার পর যখন আবার একথালা মিষ্টান্ন আর এক গ্লাস জল লইয়া সেই মেয়েটিরই আবির্ভাব হইল, তখন সে একেবারে লাফ দিয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িল। ক্রুদ্ধস্বরে কহিল, 'বৌয়ের সব চালাকি ! ঐজন্যই তো আমি আসতে চাইনি। চললুম আমি এখনই ফিরে—'

পারুল বোধ করি নিকটেই কোথাও অপেক্ষা করিতেছিল, সে ছুটিয়া আসিয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া কহিল, 'তুমি কি পাগল হ'লে ছোটবাবু ? মাথা খাও, এসে বসো—ফিরে। মানুষ মানুষকে যদি একটু যত্ন করে, তাতে তোমার অত লজ্জা কেন। সবাই তো তোমার ভাইবোন গো !'

কাশীনাথের মনে হইল যেন মেয়েটা কোথা হইতে তাহাদের কথা শুনিতেছে। সে রাগ করিয়া কহিল, 'যাও, তুমি ভারি ইয়ে—'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফিরিয়া আসিয়া জলখাবারের সামনেই বসিতে হইল।

জলখাবারের পর, মধ্যাহ্ন-ভোজনের পালা। কাশীনাথ কিন্তু এবার আর বেশী কিছু আপত্তি করিল না, বরং সেই টগর মেয়েটিই কেমন সুনিপুণ হস্তে ঠাঁই করা, পরিবেশন করা, মায় জল দেওয়ার কাজ পর্যন্ত অতিশয় সুন্দরভাবে সম্পন্ন করিয়া গেল, তাহাই সে অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল। এমন কি, সন্ধ্যার কিছু পূর্বে যখন তাহারা বাড়ি ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছে, তখন সে আরও গোটাকতক পান টগরের হাত হইতে সহজ ভাবেই গ্রহণ করিল।

ফিরিবার পথে শীঘ্রই অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। নির্জন পথের দু'পাশে বড় বড় আমগাছগুলার দিকে তাকাইয়া একসময় পারুল কহিল, 'ইস্—আঁধারের মধ্যে গাছগুলোর দিকে চাইলেই যেন ভয় করে—উঃ, বাব্‌বা—'

কাশীনাথ একটু অন্যমনস্ক ছিল, চমকিত হইয়া কহিল, 'কি হ'ল বৌ ?'

পারুল, কহিল, 'যা অন্ধকার, হোঁচট খেয়ে পা-ই কেটে গেল খানিকটা'—

কাশীনাথ ব্যস্ত হইয়া কহিল, 'তাই তো! অনেকখানি কাটল নাকি? তা-হলে তুমি বরং আমার হাতটা ধরো, আমি ঠিক সাবধানে নিয়ে যাচ্ছি—'

পারুল যেন বাঁচিয়া গেল। হাতটা বাড়াইয়া কাশীনাথের একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, 'বাঁচলুম, যা ভয় হচ্ছিল আমার!'

কাশীনাথ অবজ্ঞাসূচক একটা শব্দ করিয়া কহিল, 'ভয় কি! আমরা তো কোন অনিষ্ট করি নি কারুর, আমাদেরই বা অনিষ্ট লোকে কেন করবে? ওসব তোমাদের মনের ভুল বৌ।'

পারুল একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, 'গত বছরে বৈরিগীর সঙ্গে একবার এসেছিলুম, সে-ও অমনি সন্ধ্যে হয়ে গেল। বৈরিগীর কি ভয়! যেতেই চায় না, শেষে আমি কোনমতে জোর ক'রে নিয়ে এলুম। তাও কিন্তু সারাপথ আমার পেছনে রইল—'

কাশীনাথ কি একটা কথা ভাবিতেছিল, কোন কথা কহিল না। অনেকক্ষণ ধরিয়া নীরবে পথ চলিবার পর কাশীনাথ কহিল, 'তোমরা আমাকে যতটা বোকা ভাবো বৌ ততটা বোকা আমি নই, বুঝলে! আজ আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসার মতলবটা কেন করেছিলে, তা আমি বুঝেছি।'

মুখ টিপিয়া হাসিয়া পারুল কহিল, 'কি বুঝলে শুনি—'

কাশীনাথ কহিল, 'ঐ মেয়েটাকে দেখাবার মতলবই আসল, ঠিক কিনা বলো!'

পারুল জবাব দিল, 'বাঃ, এই তো বেশ বুদ্ধি আছে দেখছি! এর বেলা তো ঠিক মাথা খেলেছে—'

কাশীনাথ গম্ভীর হইয়া বলিল, 'ওসব করতে নেই, ছিঃ!'

পারুল কহিল, 'কেন, দোষটা কি?'

কাশীনাথ জবাব দিল, 'দোষ নেই! মিথ্যে ওদের একটা—না না, কাজটা ভালো করো নি বৌ—'

পারুল কৃত্রিম উষ্ণতার সহিত কহিল, 'করবে না তো কি করবে! চিরকাল কি এই পাগলামি ক'রে বেড়াতে হবে নাকি? এমনি ক'রেই চলবে বরাবর, না? অসময়ে কে মুখে ভাত-জল দেবে, রোগ হলে কে সেবা করবে শুনি!'

কাশীনাথ উচ্চাঙ্গের হাসি হাসিয়া কহিল, 'দেশের সেবা ক'রে বেড়াতে হবে আমাদের, পরিবারের সেবা নেবার ফুরসুৎ কখন? তুমি কি মনে করো যে এমনি এক জায়গায় আমি চিরদিন বসে থাকব?'

সহসা যেন পারুল চমকিয়া উঠিল, কহিল, 'কোথা যাবে আবার—'

কাশীনাথ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, 'সে কি আমি বলতে পারি? এখন কোন কাজ নেই, তাই বসে আছি এক জায়গায়, কাগজ বেচে খাচ্ছি। যদি কোন কাজ আসে, পণ্ডিতজী কি সুভাষবাবু যদি ডাকেন, তা হলেই চলে যাবো—'

পারুল যেন কতকটা জোর দিয়াই কহিল, 'আচ্ছা তা না হয় গেলে, কিন্তু সে আর ক'দিনের জন্যে? আবার ফিরবে তো! ঘরে পরিবার থাকলে ফিরে এসে সাজানো ঘর পাবে, সেই তো ভাল—'

কাশীনাথ উদাস কণ্ঠে কহিল, 'এখানেই যে ফিরব তার কি মানে? না বৌ, বাঁধন আমার সইবে না।'

মুহূর্তকাল চুপ করিয়া থাকিয়া পারুল কহিল, 'এখানে কি তোমার কোন বাঁধন নেই?'

কাশীনাথ যেন একটু বিস্মিত হইয়া জবাব দিল, 'এখানে? এখানে আর কে আছে? থাকবার মধ্যে যা একটু তোমার সঙ্গেই ভাব আছে, তা-ও কতটুকুই বা তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক, সারাদিনের মধ্যে ভাত খাবার সময় ছাড়া তো দেখাই হয় না।'

পারুল আর কথা কহিল না।

দিন-তিনেক পরে ভাত খাইতে বসিয়া কিন্তু কাশীনাথই সহসা কথাটা পাড়িল। কহিল, 'তোমার সইয়ের বাড়ি খবর দিয়েছ বৌ?'

কথাটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া পারুল কহিল, 'কি খবর?'

কাশীনাথ অকারণে লাল হইয়া উঠিল, কহিল, 'না—এই তারা মিছিমিছি হয়ত আশা ক'রে থাকবে—তাদের জানানো দরকার তো যে আশা নেই—'

চক্ষের পলকে ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া পারুল মুখখানাকে বিষণ্ণ করিয়া কহিল, 'আমি তো জবাবই দিয়েছি ছোটবাবু, তারা ছাড়ে কই? বড্ড যে কান্নাকাটি করছে—'

কাশীনাথ তখনই কোন জবাব দিল না। তিন-চার গ্রাস ভাত মুখে তুলিয়া কহিল, 'কি আছে আমার? না চাল, না চুলো, একটা হতভাগাকে ধরে মেয়ে না দিলে বুঝি তাদের আর দায় উদ্ধার হচ্ছে না?'

পারুল মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, 'কিন্তু তুমি তো সত্যিই হতভাগা নও। তুমি ইচ্ছে করলে সব করতে পারো তা তারা জানে। তুমি যা রোজগার করো, তাতে তোমার বৌকে তুমি ভাত দিতে পারো না?'

কাশীনাথ সহসা তাতিয়া উঠিয়া কহিল, 'ভাত? জান বৌ, আমি যদি তেমন

চেষ্টা করি তো টাকার আঁজলার ওপর বসে থাকতে পারি! তবে আমার সে মন নেই, তাই যা হোক দুটো ভাতের সংস্থান ক'রে ছেড়ে দিই—দেশের কাজ তো দেখতে হবে! পয়সা পয়সা ক'রে যারা উন্মাদ, তাদের দ্বারা দেশের কোন কাজ হয় না।'

পারুল কহিল, 'বিয়ে করলে কি আর দেশের কাজ হয় না ছোটবাবু?'

কাশীনাথ কহিল, 'খুব কঠিন। এই একটা সহজ কথাই ধরো না, কাল যদি আমি সত্যাগ্রহ ক'রে জেলে যাই তো বৌ থাকবে কোথায়, তাকে দেখবে কে, এই ভাবনায় অস্থির হতে হবে তো? তারপর ধরো না, ছেলেপুলে হ'লে হয় তো মায়া বসে যাবে এমন যে বাড়ি আর ছাড়তেই পারব না—'

পারুল ঘাড় নাড়িয়া কহিল, 'এ তোমার অন্যায় কথা সব। বিয়ে হ'লে কি অমনি আজই ছেলে হচ্ছে? তা ছাড়া আমি তো আছি, আমার সইয়ের মেয়ে—আমিই তাকে দেখাশুনো করব, তোমার ভাবনাটা কি?...কি বল, বলি তা হ'লে তাদের যে তোমার মত আছে—'

কাশীনাথ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া কহিল, 'না না, ও সব পাগলামি ক'রো না বৌ। লোকে কি ভাববে বল দেখি! ছিঃ ছিঃ—'

সে এক রকম ভাত ফেলিয়াই উঠিয়া পড়িল।......

রাত্রে বিছানায় শুইয়া পারুল বলিল, 'আমার ঘটকালির জোর দেখেছ, ছোটবাবুকে প্রায় কাত করে এনেছি। নিম্‌রাজী গোছ হয়েছে।'

আনন্দেরই কথা, কিন্তু নন্দর মনে হইল পারুলের কণ্ঠে কেমন যেন নিরাসক্তির আভাস। সে একটু থতমত খাইয়া কহিল, 'তা বেশ তো! কিন্তু আবার আলাদা বাসা ভাড়া করবে না তো?'

পারুল ওপাশ ফিরিয়া শুইয়া জবাব দিল, 'কে জানে বলো। ঠাকুরের অত বড় পিতিজ্ঞে তো দেখছি বাতাসেই ভেসে গেল—'

ইহার পর দিন-কয়েক উভয় পক্ষই চুপচাপ। সহসা একদিন কাশীনাথ ভোরবেলাই কোথায় বাহির হইয়া গেল, ফিরিল একেবারে রাত্রি দুপুরে। পারুল তখনও হাঁড়ি-হেঁসেল লইয়া তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে দেখিয়া ঈষৎ অপ্রস্তুত ভাবে কহিল, 'তুমি এখনও জেগে আছ বৌ? ঈস, রাতও আমার হয়ে গেল ঢের!'

পারুল বিস্মিত হইয়া কহিল, 'তুমি গিছ্‌লে কোথায়!'

কাশীনাথ কহিল, 'একটু কাজে গিছ্‌লুম, একটা মিটিং ছিল তাই—'

পারুল কহিল, 'বেশ করেছ! নাও এখন মুখ-হাত ধুয়ে তাড়াতাড়ি, আমার ভারি ঘুম পেয়েছে।'

কাশীনাথ বার দুই মাথা চুলকাইয়া কেমন যেন মরীয়া হইয়া বলিয়া ফেলিল, 'তুমিই খেয়ে নাও, আমি আর এখন খাব না। আমি—আমি একরকম খেয়েই এসেছি!'

'খেয়ে এসেছ?' পারুল বিস্মিত হইয়া কহিল, 'তোমাদের মিটিং-এ কি আজকাল খেতেও দিচ্ছে?'

ঈষৎ রাগত ভাবে কাশীনাথ জবাব দিল, 'মিটিং-এ কেন খেতে দেবে? ফেরবার পথে মনোহরপুরের রাস্তা দিয়েই ফিরছিলুম, তোমার সইদের বাড়ির লোকেরা দেখতে পেয়ে জোর ক'রে ধরে নিয়ে গেল, তা আমি কি করব বল—'

গভীরতর বিস্ময়ের সহিত পারুল কহিল, 'তুমি সইয়ের বাড়ি গিয়েছিলে? সেইখানে খেয়ে এলে?'

খাপছাড়া ভাবে কাশীনাথ জবাব দিল, 'বা-রে, আমি বুঝি সেইখানেই গিয়েছিলুম, জোর ক'রে তারা—বা-রে!'

বলিতে বলিতেই সে নিজের ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়া আগড়টা টানিয়া দিল, তাহার পর ভিতর হইতে পারুলকে শুনাইয়া বার বার বলিতে লাগিল, 'বাব্‌বা, যা ঘুম পেয়েছে! ঈস্…'

ঘুম পারুলেরও পাইয়াছিল, কিন্তু সে তখনই শুইতে গেল না, চুপ করিয়া ডিবার কম্পমান শিখাটার দিকে চাহিয়া বহুক্ষণ তেমনিই বসিয়া রহিল। যখন তাহার হুঁশ হইল, তখন তৃতীয় প্রহরের শিবাদল চিৎকার শুরু করিয়া দিয়াছে; তাহার আর খাওয়াও হইল না, রান্নাঘরের আগড়টা বন্ধ করিয়া ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল।

পরের দিন দুপুরবেলা অকস্মাৎ টগরের মা ভাইকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। উঠানে পা দিয়াই হাসি-হাসি মুখে কহিল, 'তখনই জানি যে আমার সই যখন এ কাজে হাত দিয়েছে তখন আর ভাবনা নেই। তা ভাই এতদূর যা হোক্ তো এনে দিলি, এখন যাতে তাড়াতাড়ি সব মিটে যায় সেই ব্যবস্থা একটা করে দে—'

পারুল তাহাকে দেখিয়া সত্যই বিস্মিত হইয়াছিল, হাজার হউক টগরের মায়েরা ভদ্রলোক, সে যে এমন করিয়া পায়ে হাঁটিয়া তাহার বাড়িতে আসিতে পারে তাহা পারুলের ধারণাই ছিল না। সে আশ্চর্য হইয়া কহিল, 'সই তুমি! এ কী ব্যাপার, বসো—বসো! কেন আমার পাপ বাড়ানো ভাই, ডেকে পাঠালে

আমিই যেতুম! তুমি কেন কষ্ট ক'রে হেঁটে এলে আবার!'

দাওয়ায় মাদুর বিছাইয়া দিয়া সে ছুটোছুটি করিয়া পা ধুইবার জল, গামছা পান প্রভৃতি আনিয়া দিল। তাহার পর পাশে মাটির উপরই বসিয়া পড়িয়া কহিল, 'ব্যাপার কি বল দেখি সই—?'

সই বলিল, 'তুই কিছু খবর দিস নি বটে কিন্তু কাল যখন দুপুরবেলা হঠাৎ কাশীনাথ গিয়ে হাজির হ'ল, তখনই বুঝতে পারলুম যে কাজ হাসিল ক'রে এনেছিস—'

পারুলের মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, 'দুপুরবেলা?'

টগরের মা ঈষৎ বিস্মিত হইয়া কহিল, 'হ্যাঁ, দুপুরবেলাই তো। তুই জানতিস না?'

ঘাড় নাড়িয়া পারুল কহিল, 'জানতুম, তবে ভেবেছিলুম যে বিকেলের দিকে হয়ত যাবে—'

টগরের মা কহিল, 'না। দুপুরবেলা ঐখানেই খাওয়া-দাওয়া করল যে! সারাদিন ছিল, একেবারে সন্ধ্যের পর খাইয়ে তবে ছেড়ে দিয়েছি। টগরের কাজকর্ম দেখে খুব খুশী, বললে, আমাদের বৌও সব কাজেই বেশ চৌকোস বটে কিন্তু এতটা পরিষ্কার নয়।'

পারুল আঁচলে বাঁধা দোক্তার কৌটাটা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল, কোন কথাই কহিল না। টগরের মা পুনশ্চ কহিল, 'হাওয়া বেশ ভাল দেখে আমি ফেরবার সময়ে সোজাসুজিই কথাটা পেড়ে ফেললুম, বুঝলি—'

জোর করিয়া মুখে হাসি টানিয়া পারুল জবাব দিল, 'পাকা লোক তুমি ভাই, ওকে খেলিয়ে তুলতে আর তোমার কতক্ষণ বল। তা কি বললে?'

টগরের মা জবাব দিল, 'চট ক'রে কি আর 'হ্যাঁ' বলতে পারে! জিজ্ঞেস করতেই মুখ লাল হয়ে উঠল, বার দুই মাথা চুলকে জবাব দিলে, 'আমি কিছুই জানি না, বৌ যা করবে তাই হবে—তাকেই বরং জিজ্ঞেস করবেন।' ওধারে তো ঐ কথা বললে, আবার বেরিয়ে আসবার সময় টগর যখন পান দিতে গেছে, তখন আমি আড়ি পেতে শুনি তাকে বলছে, 'দিব্যি পান সাজো তুমি, বিয়ে হ'লে এই একটা খরচ বাড়বে আর কি।'

একটা ইঙ্গিতপূর্ণ চোখের ভঙ্গী করিয়া টগরের মা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। পারুলের সমস্ত দেহ ঠিক কিসে জানি না, হয়ত বা ঘৃণাতেই, কণ্টকিত হইয়া উঠিল। এই লোকটির প্রতিজ্ঞাভঙ্গকেই সে একটা সুকঠিন কার্য মনে করিয়াছিল, আশ্চর্য! সে সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, 'দাঁড়াও ভাই, কাউকে

দিয়ে বৈরিগীকে ডাকতে পাঠাই—। দুটো মিষ্টি-টিষ্টি এনে দিক।'

টগরের মা প্রতিবাদ করিতে গেলে পারুল একরকম ছুটিয়াই বাহির হইয়া গেল। সে কখনও স্টেশনে নন্দর সহিত দেখা করিতে যায় নাই, অতি বড় বিপদে পড়িয়াও না। সেদিন একেবারে স্টেশনের ধারে গিয়া তাহার হুঁশ হইল, কিন্তু আর ফিরিল না; বিস্মিত নন্দকে কিছু মিষ্টান্ন ও চায়ের দুধ সংগ্রহ করিবার নির্দেশ দিয়া ধীর পদক্ষেপে যখন সে আবার বাড়িতে ফিরিয়া আসিল তখন তাহার অস্থিরতা সম্পূর্ণ চলিয়া গিয়াছে। টগরের মা'র অনুযোগের জবাবে হাসিয়া কহিল, 'কাকে আর পাঠাই ভাই, নিজেই গিয়ে মিন্‌সেকে বলে এলুম। অবাক হয়ে গেছে একেবারে—কখনও ইস্টিশনে যাই না তো! দাঁড়াও ভাই, চায়ের জলটা বসিয়ে দিই আগে—'

চা প্রস্তুত হইল, মিষ্টান্ন আসিল, আতিথেয়তার কোন ত্রুটিই ঘটিল না কিন্তু টগরের মা তবু মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। পারুল আসল কথাটা এড়াইয়া যাইতে চায় কেন? শেষে আর থাকিতে না পারিয়া বলিয়াই ফেলিল, 'হ্যাঁলা সই, তুই কাজের কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছিস কেন বল্ দেখি?'

পারুল কাছে আসিয়া বিষণ্ণ মুখে কহিল, 'ভাই, বড় আশা নিয়েই টগরের সম্বন্ধ করতে গিয়েছিলুম, কিন্তু এখন যেন আর লজ্জায় তোমার কাছে মুখ দেখাতে পারছি না।'

কন্যাদায়গ্রস্ত মাতার মুখ নিমেষে বিবর্ণ হইয়া উঠিল। পারুলের হাত দুইটি ধরিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল, 'কেন, কি হয়েছে পারুল? আমার মাথা খাস—সব কথা খুলে বল্ আগে!'

পারুল ঘাড় নাড়িয়া কহিল, 'ঐটি আমায় মাপ করতে হবে ভাই। তবে টগর তো আমার মেয়ের মতোই—এইটুকু বলতে পারি যে আমার নিজের মেয়ে হ'লে ও পাত্তরে আমি দিতুম না! একথা জানবার পরও যদি দিতে চাও তো বলো, আমি ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি—'

অনুনয়, বিনয়, অশ্রুজলেও ইহার অধিক কোন কথা বাহির করা গেল না। শেষকালে সন্ধ্যার কিছু পূর্বে টগরের মা চোখের জল মুছিতে মুছিতে বিদায় হইয়া গেল, পারুল তবু তাহাকে কাশীনাথের অপরাধটা কিছুতেই খুলিয়া বলিল না।

যাইবার পূর্বে টগরের মা বেড়ার ধার হইতে বলিয়া গেল, 'আমার টগরের বরাত সই, নইলে তুমিই বা এমন বিরূপ হবে কেন!'

পারুল এই কঠিন অভিযোগও নীরবে সহ্য করিল।

রান্নাবাড়া শেষ করিয়া নন্দকে খাইতে দিয়া পারুল কহিল, 'হাজার হোক আমরা মেয়েমানুষ, আমাদের আর বুদ্ধি কত বলো না! ভেবে দেখলুম যে তোমার কথাই ঠিক।'

নন্দ বহুদিন পরে স্ত্রীর মুখে নিজের বুদ্ধির প্রশংসা শুনিয়া পুলকিত হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু কারণটা বুঝিতে না পারিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

পারুল আর এক হাতা ডাল স্বামীর পাতে ঢালিয়া দিয়া কহিল, 'বিয়ের কথা না পাড়তে পাড়তেই ছোটবাবুর শ্বশুরবাড়ির দিকে যে টান দেখছি, বিয়ে হ'লে আর এক দণ্ডও এখানে থাকত না, শ্বশুরবাড়িতে গিয়েই হয়ত বাসা বাঁধত—'

নন্দ উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, 'আমি তো তখনই তোকে বলেছিলুম—'

বাধা দিয়া পারুল কহিল, 'তখন অতটা বুঝি নি, যখন বুঝলুম তখনই সে পথ মেরে দিলুম। সম্বন্ধ আমি ভেঙে দিয়েছি।'

নন্দ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'বাঁচা গেছে। আসছে মাস থেকে ঘরের ভাড়া বলেও এক টাকা ক'রে দেবে বলেছে। কিন্তু কি ক'রে ভেঙে দিলি—'

মুখে একটা তাচ্ছিল্যের শব্দ করিয়া পারুল জবাব দিল, 'বিয়ে ভাঙা তো একটা বড্ড কথা—হুঁ!'

কিন্তু উপায়টা না বলিয়াই পোড়া-বাসন মাজিতে ঘাটে চলিয়া গেল।

কাশীনাথ সেদিনও ফিরিল রাত দশটার পর। উঠানে পা দিয়াই কহিল, 'আজও একটু রাত হয়ে গেল বৌ। কিন্তু তাই বলে তুমি রাগ করতে পারবে না, তোমার জন্যে কি এনেছি দেখ—'

বগলের মধ্য হইতে খবরের কাগজ জড়ানো একখানা রঙীন শাড়ি বাহির করিয়া ডিবের আলোতে মেলিয়া ধরিয়া কহিল, 'ঘাটের ধারে বেচতে এসেছিল, গৌরহাটির তাঁতের কাপড়, তোমার জন্যে একটা কিনে ফেললাম—'

পারুল হাত বাড়াইয়া কাপড়টা গ্রহণ করিল বটে কিন্তু সেদিকে সে যেন ভাল করিয়া চাহিতেও পারিল না। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া রহস্যের সুরে কহিল, 'ঘুষ দেওয়া ব্যবসা কবে থেকে শিখলে ছোটবাবু? রাত ক'রে ফিরে রোজ যদি একটা ক'রে শাড়ি দাও তো মন্দ হয় না—'

কাশীনাথ কৃত্রিম কোপের সহিত কহিল, 'ঘুষ দিচ্ছি আমি, বটে? যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর—'

বাধা দিয়া পারুল কহিল, 'বলি হাত পা ধুয়ে নেবে, না রাত বারোটা করবে? কত রাত অবধি বসে থাকব?'

কাশীনাথ কাপড় ছাড়িয়া আসিয়া বসিলে সে ভাত বাড়িয়া দিয়া কহিল,

'আজ আমিও একটা অন্যায় করে ফেলেছি, তুমি তার জন্যে রাগ করতে পারবে না।'

বিস্মিত কাশীনাথ জবাব দিল, 'আমি রাগ করব কেন?'

তাহার পর পরিহাসের সুরে কহিল, 'বিলিতী জিনিস কিনেছ বুঝি?'

নতমুখে পারুল জবাব দিল, 'না, না। আজ বিকেলে টগরের মা এসেছিল। সে এসেই তোমার নামে এমন কতকগুলো কথা বললে, সে নাকি কার কাছ থেকে শুনেছে, যে—আমার রাগ হয়ে গেল। আমিও তাকে কতকগুলো কড়া কথা শুনিয়ে দিলুম। বলে দিলুম যে তার মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবার চেষ্টা যেন সে আর কোনদিন না করে।'

ক্ষীণ কেরোসিনের আলো, কিন্তু তাহাতেই কাশীনাথ যে কত বড় আঘাত পাইয়াছে তাহা বুঝিতে পারুলের বিলম্ব হইল না। কাশীনাথ ভাতের থালাতে হাত রাখিয়াই কাঠের মতো আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল।

পারুল হঠাৎ অনুতপ্ত হইয়া কহিল, 'তুমি কিচ্ছু ভেবো না ছোটবাবু, আমি এক হপ্তার মধ্যেই ওর চেয়ে ঢের ভাল মেয়ে এনে দেব—'

সহসা যেন কাশীনাথের চমক ভাঙিল। সে হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, 'বাঃ বেশ, তো! আমি বুঝি বিয়ে-পাগলা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তুমি অত ক'রে বললে তাই—নইলে তো আমার দেশের কাজের ক্ষতি করাই একরকম—না, না, এ ভালই হ'ল বৌ—আমি বেঁচে গেলুম।'

তাহার যে কিছুই হয় নাই, এইটাই দেখাইবার জন্য সে গোগ্রাসে আরও কতকগুলা ভাত খাইয়া উঠিয়া পড়িল। বাহির হইতে আঁচাইতে আঁচাইতে পারুলকে শুনাইয়া কহিল, 'একবার যদি বাবা খবর পেতেন তাহলে ওর মতো কত মেয়ে এনে আমার দু'পায়ের কাছে জড়ো ক'রে দিতেন। আমি করব না তাই—!'

সে আগড় দিয়া শুইয়া পড়িল।

পারুল কিন্তু সেখান হইতে উঠিল না। হাঁড়ির ভাত হাঁড়িতেই শুকাইল, সামনে এঁটো বাসন তেমনি পড়িয়া রহিল, চারিদিকে সব জিনিস ছত্রাকার হইয়া পড়িয়া—তাহারই মাঝে বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল পারুল। প্রহরের পর প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেল, শেষে এক সময় পূর্বাকাশে পাণ্ডুর উষা দেখা দিল, তবু তাহার চোখের পল্লবে তন্দ্রার আভাস পর্যন্ত নামিল না—

ভোরের দিকে ঘুম ভাঙিয়া কাশীনাথ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। পারুল একখানা ফরসা কাপড় পরিয়া তাহারই একটা আলোয়ান গায়ে জড়াইয়াছে এবং তাহাকে ডাকিতেছে। সে উঠিয়া কহিল, 'কী ব্যাপার?'

'একবার এখনই আমার সঙ্গে মনোহরপুর যেতে হবে ভাই! লক্ষীটি, না ব'লো না। তোমার কাগজগুলো ফটিক বিলিয়ে দেবে এখন—'

কাশীনাথ বিস্মিত হইয়া কহিল, 'কিন্তু এই যে কাল বললে—! আমার কি যাওয়া ভাল দেখাবে বৌ?'

পারুল অসহিষ্ণু ভাবে কহিল, 'কাল তোমাকে ঠাট্টা করেছিলুম! ঠাট্টা বোঝ না? যাও, ওঠ তাড়াতাড়ি, দোহাই তোমার, নইলে আবার ফিরতে দেরি হয়ে যাবে—'